১৬৬৮

ত এক বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, নানা অসুবিধার সংস্করণে তাহা করিতে পারিলাম না।

সুপ্রসিদ্ধ পি, এম, বাক্‌চী কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী-াহন বাক্‌চী মহাশয়, এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে ভারগ্রহণ করায়, তাদৃশ সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রচার হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় উদ্যমশীল সৎসাহিত্যের উৎসাহদাতা, আমার পৃষ্ঠপোষকরূপে না থাকিলে, এ কার্য্য ামার পক্ষে এক দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হইত। এজন্য আমি তাঁহাকে ান্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"আহিরীটোলা ইউনাইটেড্ রিডিং-রুমস্" নামক সুবৃহৎ পাঠাগারের যোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল চন্দ্র এম-এ, বি-এল, হোদয়, তাঁহাদের লাইব্রেরীর কয়েকখানি অতি প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, ামাকে সুদীর্ঘকালের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়া, কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রিয়াছেন।

বেহালা—(২৪ পরগণা)
ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫।

বিনীত গ্রন্থকার।

List of Works Consulted.

1. Beveridge's History of India (1858—62).
2. Bengal Annual, Edited by D. L. Richardson.
3. Illustrated Hand-book of Calcutta (Black & Co, (1864).
4. Blechynden (Kathleen) Calcutta Past and Present.
5. Blockmann (H.) A paper on Old Calcutta, (1864).
6. Bolts (William) Considerations on Indian Affairs (1772).
7. Buckland (C. E.) Bengal under the Lt. Governors (1901).
8. Selections from the Old Calcutta Gazettes by Long.
9. Do—Do by Setoncarr and others (6 Vols).
10. Calcutta Review—Calcutta in Olden Time Vols XVII and XXV (1852—55) by J. C. Marshman.
11. The Good Old days of Hon'ble John Company (1882) Vols. I & II.
12. Compendious Ecclesiastical and Historical Sketches of Bengal (1819).
13. Cotton's Calcutta.
14. S. C. Dey's Hoogly Past and Present.
15. Dr. Busteed's Echoes from Old Calcutta.
16. Firminger (Rev. W. K.) Thacker's Guide to Calcutta.
17. Hart (Rev. W. H.) Old Calcutta, Its Places and People One Hundred years ago. 1895.
18. Hunter (Sir William) India—2 Vols.
19. Hedge's Diary—Sir W. Hedges (1681—1688) Hakluyt Society's Edition.

20. Holwells India Tracts. (1774).

21. Hyde (Rev. H. B.) the Parish of Bengal.

22. Hamilton's East India (being the observations and remarks of Capt. A. Hamilton who resided in those parts from the years 1683 A. D. to 1728.

23. Indian Review Vol. III.

24. List of Tombs, Statues and Monuments in Bengal (1896).

25. Long (Rev. J.) Peeps into Social Life in Calcutta a century ago, & selections from Unpublished Records of the Goverment. (1748—67).

26. Mitchel (Edmund) Guide to Calcutta (1890)

27. Ray (A. K.) Census Report (Vol. VII).

28. Stewart's History of Bengal (1813—original Edition).

29. Sterndale (R. C.) Historical Account of the Calcutta Collectorate (1855).

30. Wheeler (J. Talboys) Early Records of British India (1879).

31. Wilson (C. R.) Early Annals of the English in Bengal (3 vols).

32. Biswakosha (Several vols).

33. History of Bengal (by Babu Kali Prasanna Banerji).

34. Basuka (an acconnt of the Setts and Bysacks in Old Calcutta by Babu Madan Mohan Halder.

35. Copy of a piece of rare Manuscript containing the account of Kamdeva Brahmachari the founder of Barisa Sabarna Family (kindly supplied by Babu Harish Chandra Ray Chowdhury).

36. History of Mushidabad (by Babu Nikhilnath Ray).

37. Pratapadityacharit (by Pandit Satya Charn Sastri).

38. Aitihasik Chitra (Monthy Magazine).

3 . Calcutta—(by Raja Benoy Krishna Deb).

40. Life of Maharaja Nabakrishna by Mr. N. Ghosh, Bar-at-Law

41. Bengal Past and Present (Calcutta Historical Society's Journal).

42. Kalikhestradipika etc.

43. Sahitya Parisat Patrika.

44. Calcutta Review (Old Numbers) Containing the Articles—Territorial Aristrocacy of Bengal.

45. Ghosh's History of Indian Chiefs and Zaminders.

46. History of the Supreme Court (Calcutta Review).

47. Statistical Account of Bengal (Sir W. Hunter).

48. District Gazetteers—Jessore and Hogly (New Edition).

49. The Administration of Warren Hastings by Prannath Sarwasati B. L. and several Other Works.

ভারতের বর্তমান রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

কলিকাতার ভূতত্ত্ব ও পুরাকালের কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালীপীঠ।

তৃতীয় অধ্যায়।

বঙ্গে মোগল-পাঠান সংঘর্ষ ও কামদেব ব্রহ্মচারীর কথা।

চতুর্থ অধ্যায়

বেহালা-বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশ ও কালীঘাট সম্বন্ধে নানাকথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইউরোপীয় জাতির ভারতে প্রথম আগমন—ইংরাজের অভ্যুদয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইংরাজের বঙ্গে আগমন।

সপ্তম অধ্যায়।

ইংরাজদিগের বালেশ্বর ত্যাগ ও খাসবাঙ্গালায় প্রবেশ।

(হুগলীতে প্রথম বাণিজ্যকুঠী স্থাপন)

অষ্টম অধ্যায়।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে ইংরাজ-বাণিজ্য সম্বন্ধে নানা কথা।

নবম অধ্যায়।

কলিকাতা ফোর্ট-উইলিয়মের প্রথম গবর্ণর হেজেস্ সাহেব।

দশম অধ্যায়।

কলিকাতা প্রতিষ্ঠাকারী জব চার্ণক।

একাদশ অধ্যায়।

সপ্তগ্রাম সুতালুটী বেতোড় ও প্রাচীনকালের ব্যবসায়ী শেঠবসাকগণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জব চার্ণকের আমলের অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শোভাসিংহের বিদ্রোহ ও কোম্পানীর কলিকাতা প্রভৃতি গ্রাম ক্রয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবস্থা।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

ষোড়শ অধ্যায়।

কোম্পানী বাহাদুরের বঙ্গে প্রথম জমীদারী।

সপ্তদশ অধ্যায়।

কোম্পানী-বাহাদুরের প্রথম জমীদারী ও তৎসাময়িক কথা।

সূচীপত্র।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বঙ্গে বর্গী ও তৎসময়ের কলিকাতা।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ—ক্লাইভ ওয়াট্‌সন কর্ত্তৃক পুনরুদ্ধার।

বিংশ অধ্যায়।

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে কলিকাতা।

একবিংশ অধ্যায়।

(গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমল)

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সেকালের কলিকাতার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ঘটনা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস হইতে লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলের কথা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

বর্ত্তমান কলিকাতার পথের কথা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বর্ত্তমান কলিকাতার ঐতিহাসিক পরিচয়।

শেষ অংশ।

কোম্পানীর আমলের বড়লোকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

পানীর

কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

(১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ ২৪শে আগষ্ট)

শ্রাবণের বৃষ্টি, বাঙ্গালার শস্য-শ্যামল-বক্ষকে, বর্ষার মেঘের পবিত্র ধারায় সিক্ত করিয়া বিরাম লইয়াছে। ভাদ্রের আরম্ভ। তখনও বর্ষার শেষ হয় নাই। ভাদ্রের জলভরা মেঘ, তখনও নীলাকাশের গাত্র-সংলগ্ন। সে মেঘে কখন বৃষ্টি হইতেছে, কখনও বা আকাশ সহসা ঘন ঘটাচ্ছন্ন, আবার কখনও বা মেঘ-ভাঙ্গা সূর্য্যের, স্বর্ণ-কিরণে ধরা-বক্ষ প্লাবিত ও উজ্জ্বলিত।

সলিল-সম্পদময়ী ভাগিরথী, কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। পূর্ণ যৌবনে রূপসী যেমন আরও গরীয়সী হয়, তাহার সৌন্দর্য্য-সম্ভার সকল দিকে পূর্ণতা লইয়া ফুটিয়া উঠে—ভাগিরথীর অবস্থা তখন ঠিক সেইরূপ। দুকূল-প্লাবী প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে, নদীর উভয় কূলেই ধস্ নামিতেছে। সে প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, সলিল-প্রহত শিথিল তটভূমি, গঙ্গা অঙ্গে, অঙ্গ মিশাইতেছে।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন আকাশ প্রথমটা ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল। বৃষ্টি হইয়া মেঘের বক্ষ শূন্য হওয়ায়, মেঘ সরিয়া পড়িল। আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত, পরিষ্কার, অস্তগামী রবির স্বর্ণ-কিরণ রঞ্জিত।

সন্ধ্যার এই প্রাক্কালে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিশানওয়ালা, চার পাঁচ খানি বাণিজ্য জাহাজ, গঙ্গার প্রচণ্ড শক্তিশালী উর্ম্মিমালার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে, পাইলভরে অতি ধীরে ধীরে, সূতালুটীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

সেই জাহাজ-গুলির সঙ্গে, কয়েক খানি দেশী ছিপ, বোট এবং ভাউলিয়া ছিল। সেগুলিও নদীবক্ষের নানাস্থান অধিকার করিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

জাহাজগুলি যখন সাঁথরাইলের কাছে আসিয়া পৌছিল, তখন সূর্য্য অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন। নিশাগমন-সূচিত বিরলান্ধকারে—সমস্ত মেদিনী সমাচ্ছন্না হইতেছে। আর বৃক্ষাদিপূর্ণ, জঙ্গলময় জনশূন্য, নদীকূলে অন্ধকার যেন আরও জমাট হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা মোগল-রাজত্বের মধ্যযুগের কথা বলিতেছি। আজকাল

কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

কলিকাতা সহর বলিয়া পরিচিত, সেই স্থান অধিকার করিয়া সেই সময়ে সূতালুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা বলিয়া তিনখানি গণ্ডগ্রাম ছিল। ভাগিরথীও সেই সময়ে অতি প্রচণ্ড বেগশালিনী ও বিস্তৃত-কায়া ছিলেন।

সূতালুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনখানি পাশাপাশি ছিল। ইহাদের চারিদিকেই ভীষণ জঙ্গল। গ্রাম গুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যে একটী খাত ছিল। কার সাধ্য—সন্ধ্যার পর এই সমস্ত গ্রামের পথে একাকী বাহির হইতে পারে। চারিদিকে নরঘাতী দস্যু-তস্কর।

সূতালুটীতে—গঙ্গার উপকূলে একটী ক্ষুদ্র হাট ছিল। শেঠ ও বস্যুকেরা (বসাকেরা) সেই সময়ে সূতালুটীর প্রধান অধিবাসী ছিলেন। সূতার ব্যবসায়ই তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা। সূতালুটীর হাটে, বৎসরের মধ্যে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সুতা, কাপড় প্রভৃতি বিক্রয় হইত।

এই সমস্ত পণ্য কিনিত—ইউরোপীয় বণিকগণ। সেকালে বঙ্গদেশের সূতার, সূক্ষ্ম-কাটুনি জগত প্রসিদ্ধ। ইউরোপ খণ্ডে, বাঙ্গালার ঢাকাই মস্‌লিনের বড় আদর। চরকা, কাট্‌না প্রভৃতির সহায়তায়—সেকালে যেরূপ অতি সূক্ষ্ম সূতা এদেশে জন্মিত, আজকাল কলেও সেরূপ হয় না।

তখন বঙ্গদেশে, ইংরাজ, পটুর্গীজ, দিনেমার প্রভৃতি বণিকগণ বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের পতনে, হুগলীর প্রাধান্য বাড়িয়া উঠে। এই সমস্ত ইউরোপীয় সওদাগরেরা, এদেশের উৎপন্ন অনেক দ্রব্য ইউরোপে চালান দিতেন। সূতালুটীর হাট হইতে সকলকেই সুতা ও কাপড় কিনিতে হইত।

সন্ধ্যার বিরল অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া, ধীর মন্থর গতিতে, জাহাজ কয়-খানি সাঁখরাইল ছাড়াইয়া, বর্ত্তমান খিদিরপুরের পার্শ্ব দিয়া, ধীরে ধীরে সূতালুটী গ্রামের কাছে পৌছিল। নাবিকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, সেই প্রবল তরঙ্গের উপর ক্ষুদ্র "পিনেস্" বা জালি-বোট নামাইয়া দিয়া, জাহাজ গুলি নঙ্গর করিল। তখন গঙ্গায় বয়া ছিল না, নঙ্গর করিবার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। অপরন্তু সেই জঙ্গলময় স্থানে মোটা গুঁড়িওয়ালা গাছেরও—অভাব ছিলনা। ক্ষুদ্র বাণিজ্য জাহাজগুলি—বৃক্ষের মূলেই রজ্জু দিয়া বাঁধা হইল।

সেই বজরার মধ্য হইতে, একজন ইংরাজ একখানি পিনেসের সাহায্যে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতীর হইতে সূতালুটীর বাজারের দিকে ধীর-গতিতে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে

তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। নদীতীরে বাণিজ্য কার্য্যের জন্য, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের যে কয়েকখানি মাটীর চালা ছিল—তাহার চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে—দেয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোন কোনটীর বাঁশ-বাঁখারি দরমা প্রভৃতির চিহ্নমাত্রও নাই—কেবল ভিত্তির মাটী, বর্ষার প্রবাহ-ধৌত হইয়া কুটীরের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

আর যাঁহারা তাঁহার সহিত কূলে নামিয়াছিলেন—তাঁহারাও তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। আশ্রয় স্থানের অবস্থা দেখিয়া, সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের হস্তস্থিত লণ্ঠনের আলোক—সেই অন্ধকারময় শ্মশান-বৎ নির্জ্জন স্থানের উপর পড়িয়া, অতি ভীষণ দৃশ্যের সূচনা করিল।

অগ্রগামী ইংরাজটীর বেশভূষা অন্য সকলের অপেক্ষা অনেকটা বহুমূল্য। তিনি সেই অন্ধকারময় স্থানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া—তারকাখচিত, মেঘ-মণ্ডিত, অন্ধকারময় আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিলেন। তার পর তাঁহার সঙ্গীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভাই সকল! আমরা এই সুতালুটীতে যে আশ্রয় স্থান টুকু করিয়া গিয়াছিলাম, তাহার পরিণাম ত তোমরা সবাই দেখিতেছ। বর্ষার রাত্রে, এই জঙ্গলের মধ্যে—তাঁবুতে বাসকরা বড়ই কষ্টকর হইবে। চল—আমরা আজকে রাত্রের মত জাহাজে ফিরিয়া যাই। কাল প্রাতে আবার মাল-মসলা জোগাড় করিয়া নূতন আশ্রয় স্থান করিতে হইবে।"

তাঁহার অধীনস্থ সকলেই—তাঁহারি মত সমর্থন করিল। সেই দীর্ঘকায় পুরুষ, ধীর গতিতে আবার জালি-বোটে উঠিলেন।

এই দীর্ঘাকার ইংরাজ, আর কেহই নহেন—স্বয়ং জব চার্ণক—কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা।

পরদিন প্রভাতে, পরিচিত বাঙ্গালীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, জব চার্ণক ইংরাজদিগের বাসের জন্য কয়েকখানি মৃৎকুটীর—নির্ম্মাণ করাইলেন। মাত্র একখানি কোটাবাড়ী ভাড়া লইয়া মেরামত করান হইল। কোম্পানীর কুঠীর কর্ম্মচারীরা সেই কুটীরগুলি যত শীঘ্র পারিলেন, দখল করিলেন।

এইরূপে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান প্রাসাদ-সৌন্দর্য্যময়ী কলিকাতার, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বর্ত্তমান বৎসর হইতে ২২৩ বৎসর পূর্ব্বে, আজকাল যে স্থানকে লোকে "হাটখোলা" বলে, সেই অঞ্চলেই জব চার্ণক কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, বেণিয়াটোলা ঘাটের সমীপবর্ত্তী রথতলা

ঘাটই জব চার্ণকের কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রথম স্থান। উক্ত গভীর জঙ্গলময়ী গ্রামত্রয়, কালচক্রের আবর্ত্তনে, কিরূপে বনজঙ্গল সমন্বিত বেলা ভূমি হইতে, এই সার্দ্ধ দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া বর্ত্তমান প্রাসাদময়ী নগরীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিবৃত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কলিকাতার জীবনের এই অভিনব পরিবর্ত্তনের দিনে, প্রাচীন কলিকাতার, ইংরেজাধিকৃত কলিকাতার, বঙ্গদেশ মধ্যে ভারতের শেষ রাজধানী কলিকাতার, ঘটনাময় জীবনের সমস্ত কাহিনীই আমরা এই পুস্তকে যথাযথ লিপিবদ্ধ করিব।

কাপ্তেন ব্রুক বলিয়া একজন ইংরাজ, সেই সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পোতাধ্যক্ষ ছিলেন। জব চার্ণক যে শুভমুহূর্ত্তে সুতানুটীতে উপস্থিত হন, সেই সময়ে কাপ্তেন ব্রুকও তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। সেই স্মরণীয় দিনের ঘটনা, পুরাতন কাগজ পত্র হইতে আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। কারণ ইহা ব্যতীত কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আর কোন লিখিত বিবরণই নাই।

"১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ—২৪ আগষ্ট—আজ আমরা সাঁকরাইলে আসিয়া পৌঁছিলাম। কাপ্তেন ব্রুককে আদেশ করা হইল, যেন তিনি তাঁহার অধীনস্থ বাণিজ্য পোতগুলি, সুতানুটী হাটের সন্নিকটে নঙ্গর করেন। তিনি অপরাহ্নে এই স্থানে উপস্থিত হন। এ স্থানের অবস্থা অতি শোচনীয়।" আমাদের আশ্রয় লইবার উপযুক্ত, কোন স্থানই সেখানে ছিল না। যাহা কিছু ছিল সবই গিয়াছে। দিন রাত বৃষ্টি হইতেছিল। নদীগর্ভে বোটের উপর বাসও স্বাস্থ্যকর নহে। আমরা পূর্ব্ববারে এই সুতানুটীর মধ্যে যে দুই একখানি কুঁড়ে ঘর রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। আমরা এ স্থানত্যাগ করিবার পরই, মল্লিক বরকদার (বৃকোদর মল্লিক?) ও দেশীয় লোকেরা চালাগুলি জালাইয়া দিয়াছে এবং বাঁশবেড়া ইত্যাদি যাহা ছিল, সবই লইয়া গিয়াছে। *

* 1600. August 24. This day at Sankraal ordered Captain Brooke to come up with his vessel to Chutta-nutty, where we arrived about after noon, but found the place in a deplorable condition, nothing being left for our present accomodation and the rain falling day and night. We are forced to betake ourselves to Boats, which considering the season of the year, is very unhealthey. Mullick Burcoodar and the country people at our leaving this place burning and carrying away what they could.

কলিকাতা

সেকালের ও একালের।

PUBLIC LIBRARY ★ MOHEARY ★ EST. 1883

প্রথম অধ্যায়।

কলিকাতার ভূতত্ত্ব ও পুরাকালের কথা।

অতি প্রাচীন কালে বঙ্গদেশের অবস্থা।—রাজমহলের তল-দেশে সমুদ্রের তীর-ভূমি--মন্বাদির সময়ে বঙ্গের অবস্থা—যুধিষ্ঠিরের সময়ে বঙ্গের অবস্থা—প্রাচীন তাম্রলিপ্ত—পরিব্রাজক হয়েনসাংএর কথিত কাহিনী—পৌণ্ড্র, কামরূপ, সমতট—তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি বঙ্গের পঞ্চবিভাগ—বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গের অবস্থা—রাজধানী রূপে গৌড়, রাজমহল, মুর্শীদাবাদ—বরাহ মিহিরের গ্রন্থে উল্লিখিত সমতট-ভূমি—কবিরামের দিগ্বিজয়-প্রকাশ—সেকালের শৃগালদহ (শিয়ালদহ), বালুকা (বালী), খড়্গাদহ (খড়দা) প্রভৃতি গ্রামের নামোল্লেখ—দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র গর্ভে অবস্থান—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও চরের উৎপত্তি—শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে গড়ের মাঠের কেল্লায় ও শিয়ালদহে পুষ্করিণী খননের ফলাফল—ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মত—কলিকাতা, কিলকিলা ও কালীক্ষেত্রের সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ভব।

জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে, আমরা কলিকাতার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। পাঠক হয়ত মনে করিতে পারেন, কলিকাতার আবার ভূতত্ত্ব কি? কিন্তু তাঁহারা আজকাল কলিকাতাকে যে অবস্থায় দেখিতেছেন, কলিকাতার ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা দেখিতেছেন, পুরাকালে সেরূপ ছিল না। আমরা এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া, পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করিব।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ যখন এদেশের কোন ইতিহাসই ছিল না, সেই প্রাচীনতম কালে, বর্ত্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণ ভাগ সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। আজ কালকার রাজমহল, মুরশীদাবাদ ও মালদহের সীমার মধ্যে, কোন একস্থলে সমুদ্রতীর ছিল। হিমালয় হইতে বহির্গত সমস্ত নদ-নদী সেই পূরাকালে, ঐ স্থানে আসিয়া সাগরে পড়িত। তাহাদের স্রোত-পরিচালিত বালুমৃত্তিকায়, গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপ বা ইংরাজ ভৌগলিকগণের Gangetic Delta র উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ অবস্থা হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া, দক্ষিণ বঙ্গে—সমতল ভূভাগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

শাস্ত্রাদি হইতে জানিতে পারা যায়, যে মনুর সময়ে কেবলমাত্র প্রয়াগ পর্য্যন্ত, হিন্দু আর্য্যদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আর্য্যগণ ক্রমশঃ পূর্ব্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মনু-সংহিতায় "পৌণ্ড্র-দেশ" পতিত ক্ষত্রিয়গণের আবাসভূমি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। * পৌণ্ড্র-দেশ উত্তর বাঙ্গালার প্রাচীন নাম। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে, মনুর সময়ে উত্তর বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে আর্য্যদিগের কর-তলগত হয় নাই। বৈবস্বত মনুর পুত্র, প্রথিতযশা ইক্ষ্বাকু নরপতি অযোধ্যার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অসভ্য অনার্য্য জাতিদিগকে দূরীভূত করিয়া, আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিলে, সদাচার সম্পন্ন, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ এই সকল স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

মহাভারতে দক্ষিণ বাঙ্গালার অন্তর্গত "তাম্রলিপ্ত" প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুবংশধর রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সময়ে, রাজসূয় যজ্ঞকালে পূর্ব্বদিক বিজেতা ভীমসেন ঐ সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করেন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) প্রভৃতি স্থানে, সে সময়ে পাণ্ডবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি-গণ রাজত্ব করিতেন। অধিকাংশ প্রাচীন পুরাণাদির দেশ-বিবরণ স্থানে,

---

* শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ। ৪৩।
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রাবিড়া কাম্বোজা যবনাশকাঃ। ৪৪।
মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়।

দক্ষিণ বাঙ্গালার সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অরণ্যানিপূর্ণ তাবৎ ভূভাগকে "সমতট প্রদেশ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

চীন দেশীয় ভ্রমণকারী, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হুয়েন-সাং, ভারতবর্ষের সমসাময়িক অবস্থার কথা, তাঁহার লিখিত·বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া—সেই অন্ধতমসময় যুগের ইতিহাস-রক্ষার অনেক সহায়তা করিয়াছেন। হুয়েন-সাং যখন বাঙ্গালায় আসেন, তখন ইহা পাঁচটী প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তাঁহার মতে, তৎকালে বঙ্গের উত্তরে পৌণ্ড্র, উত্তর পূর্ব্বে কামরূপ, পূর্ব্বে সমতট, দক্ষিণ পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত ও পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ বিভাগ ছিল। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, যে তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান মেদিনীপুর) হইতে দক্ষিণের সমগ্র সমতটভূমি—সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ, পাশ্চাত্য পণ্ডিত শিরোমণি, ডাক্তার কনিংহাম বলেন, খ্রীঃ পূর্ব্ব পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই আমরা ভারতের নানা স্থানের ভৌগলিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারি। ইহার পূর্ব্বের ঘটনা, কুহেলিকা-জালে সমাবৃত। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক লিখিত বিবরণের সহায়তায়, ভারতের প্রাচীনতম স্থানের অনেক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত কাহিনী হইতে, আমরা দক্ষিণে রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতির কথা জানিতে পারি। আলেকজান্দার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে পাটলী-পুত্র বা পাটনার কথা জানিতে পারা যায়। জনকপুর, শ্রাবস্তী, কুশী নগর, কপিলাবস্তু প্রভৃতি নগরীগুলি, নেপাল তিরায়ের পর্ব্বতশ্রেণীর অধিকৃত নিম্ন সমতল ভূভাগেই স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টের ছয় হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে, পাটনার দক্ষিণ প্রদেশ গুলির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে, আমরা গৌড় নগরীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে গৌড়ের ধ্বংশের সহিত তাণ্ডায় বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে মুরশীদকুলি খাঁ—মুরশীদাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিতবর কনিংহামের মতে, সমস্ত বঙ্গদেশের এইরূপ উন্নত ও জনপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হইতে তিন চারি সহস্র বৎসর লাগিয়াছে। *

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আজকাল যে কলিকাতা "সৌধময়ী—নগরী" বা City of Palaces বলিয়া এত গৌরবান্বিত, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। সমুদ্রের অনন্ত সলিলগর্ভে

* Journal of the Geological Society of London. VOL XXI 1869.

বর্ত্তমান কলিকাতার অধিকৃত ভূখণ্ড প্রোথিত ছিল। তাঁহাদের মতে, পুরাকালে রাজমহলের-নিম্নদেশ দিয়া বঙ্গোপসাগরের খরস্রোত প্রবাহিত হইত। বহুদিন ধরিয়া, ক্রম্যাগতঃ চড়া পড়িয়া, আবার গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপ, সমুদ্র গর্ভ হইতে ক্রমশঃ উত্থিত হইতে লাগিল। এই ব-দ্বীপ অতি পুরাকালে সুন্দর বনের অন্তর্গত ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ-পণ্ডিত, বরাহ-মিহির বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশকে "সমতট" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন পুরাণ উপপুরাণ কিম্বা অন্য প্রাচীন গ্রন্থে "সমতটের" নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দী হইতেই—"সমতট" একটী ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হয়। বর্ত্তমান কলিকাতা, সেই সময়ে এই সমতটের দক্ষিণে বন জঙ্গল পরিপূর্ণ অবস্থায় সুন্দরবনের গর্ভে ছিল। জনশ্রুতি এই—উক্ত প্রাচীন জঙ্গলময় স্থান আর একবার ভূগর্ভে বসিয়া যায়। তৎপরে কাল সহকারে পলি পড়িয়া, আবার উন্নত ভূভাগে পরিণত হইয়াছে।

কতদিন হইতে বর্ত্তমান কলিকাতার অধিকৃত ভূভাগখণ্ড বাসযোগ্য হইয়াছে এবং কোন সময় হইতে এখানে জনমানবে প্রথম বসবাস করিতে আরম্ভ করে, তাহার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা অতি কঠিন। সুন্দরবনের ন্যায়, এই প্রাসাদশোভাময়ী কলিকাতা, বহুপূর্ব্বে গভীর জঙ্গলময় ও ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণের বসবাস ছিল। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, নীচশ্রেণীর অসভ্য জাতিরা ক্রমশঃ ইহার জঙ্গল কাটাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তাহারা সম্ভবতঃ শাস্ত্রোক্ত কিরাত, নিষাদ, শবর অথবা কোল জাতি। তাহাদের বসবাস হেতু, এই জঙ্গল-পূর্ণস্থান ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়। তৎপরে এক শ্রেণীর অসভ্য ধীবরজাতি, এখানে আসিয়া বাস করে। তাহারা নদী হইতে মাছ ধরিয়া বা চাষ-বাস করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। ইহাই কলিকাতার বহু শতাব্দীপূর্ব্বের আনুমানিক ইতিহাস। উপরে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন লিখিত বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন পুরাণাদির উক্তি, অনুমান ও চলিত কিম্বদন্তী হইতেই, সেই অন্ধকারময় যুগের প্রাচীন বিবরণ কিছু সংগৃহীত হইতে পারে। ভবিষ্যতে কালীঘাটের কথা বলিবার সময়ে, আমরা এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব।

পণ্ডিতবর পদ্মনাথ ঘোষাল বলেন—"অতি প্রাচীন কাল হইতেই কলিকাতা সর্ব্ব সাধারণে পরিচিত। পুরাকালে হিন্দুগণ, এই স্থানকে—"কালী

ক্ষেত্র” বলিতেন। তৎকালের এই কালীক্ষেত্র, বহুলা হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেকে এই বহুলাকে বর্ত্তমান কালের “বেহালা” বলিয়া অনুমান করেন। এই “কালীক্ষেত্রের” সীমার মধ্যে, কোন একটী স্থলে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া, সতীদেহের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। এই জন্য, সেই স্থানে এক দেবীমূর্ত্তি ও একটী ভৈরব-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ভৈরবের নাম নকুলেশ্বর আর দেবীমূর্ত্তি—কালী। অনেকের মতে, এই কালীক্ষেত্র হইতেই কলিকাতা নাম হইয়াছে, এবং কালীক্ষেত্র ও কালীঘাট যে বিভিন্ন স্থান, এসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। গৌড়েশ্বর বল্লাল-সেনের সময়ে, “কালীক্ষেত্র” স্থানটী বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বল্লালের এক দান পত্র হইতে জানা যায়, যে তিনি “কালীক্ষেত্র” নামক এই বিস্তৃত ভূভাগটী এক ব্রাহ্মণকে দান-পত্র লিখিয়া দান করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই “কালীক্ষেত্রের” আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

“দিগ্বিজয়—প্রকাশ” বলিয়া একখানি সংস্কৃত ভূগোল ও ইতিহাস আছে। এই বহুমূল্য গ্রন্থখানি সেকালের একজন প্রাচীন কবি, কবিরামের রচিত। কবিরাম মগধ বা আধুনিক বিহারের কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। * কবিরামের গ্রন্থে—“কিল্‌কিলা” বলিয়া একটী স্থানের বিবরণ আছে। এই বিবরণ হইতে জানা যায়—কিল্‌কিলা একটী বিস্তৃত ভূভাগ ছিল—ও তাহার সীমার মধ্যে, অনেক বড় বড় নগর ও গ্রাম ছিল। কবিরাম—সম্ভবতঃ স্বনাম-প্রসিদ্ধ, যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। আমরা নিম্নে কবিরামের “কিল্‌কিলার” সম্বন্ধে লিখিত বিবরণটী, বিশ্বকোষ মহাভিধান হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। স্থানাভাব জন্য, মূলভাগ পরিত্যক্ত হইল।

“পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্ব্বে গঙ্গানদী ইহার মধ্যে একুশ যোজন পরিমিত কিল্‌কিলা-ভূমি। ইহা দুইভাগে বিভক্ত। দানগলী নদীর পশ্চিমে, গঙ্গার নিকটে শাড়েশ্বরী দেবী বিরাজ করিতেছেন। এখানে উপবাস করিলে কুষ্ঠাদি দারুণ রোগ, দেবীর কৃপায় আরোগ্য হয়। মাহেশ ও খড়্গদাহ (খড়দহ) গ্রামের মধ্যে, দীর্ঘ-গঙ্গার নিকট ফুলপাল নামক রাজা বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গা-নদীর তটে অনূপদেশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বার্ত্তাভূমি (?) আছে। এখানে কদলী, পৃশ্নিপর্ণী, সুপারি প্রভৃতি

* কবিরাম, পাটলীপুত্র নগরবাসী একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক। পাটলিপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া তিনি আনাম দেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি যে সমস্ত দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত “দিগ্বিজয়-প্রকাশে” লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গাছ জন্মে। পীঠমালা মতে, এখানে ভাগীরথী তীরে সতী-দেবীর শরীর হইতে বামহস্তের অঙ্গুলী পড়িয়াছিল। কালিকা-দেবীর প্রাসাদে, কিল্‌কিলা বাসীরা ধনধান্যবান হইবেন। সকল প্রকার শস্যাদি জন্মে বলিয়া, ইহাকে "ঋদ্ধ" দেশ বলিয়া থাকে। এখানে সকল বর্ণের লোক নিয়ত বাস করে। এখানকার দেশবাসীদের মতে, সমুদ্র মন্থনকালে, পৃষ্ঠস্থিত মন্দার-পর্ব্বতের ও অনন্তের ভারে অভিভূত হইয়া, পর্ব্বত-ভারবাহী কূর্ম্ম—দৈত্যগণের মোহনের জন্য এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই নিশ্বাসের কল্লোল যতদূর গিয়াছিল, ততদূর "কিল্‌কিলা-দেশ।" সতী-দেবীর বরে, মহাবলবান কুলপাল ও দেশপাল, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কুলপালের দুই পুত্র। হরিপাল ও অহিপাল। জ্যেষ্ঠ হরিপাল সিঙ্গুরের পশ্চিমে * নিজনামে হট্টবাপীযুক্ত একটী মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া, তথায় ব্রাহ্মণ, তাঁতি, গোষ্ঠী ও সাঙ্গাইদিগের রাজা হইলেন। অহিপাল, মাহেশ ছাড়িয়া ত্রিবেণীর নিকট চক্রদ্বীপ (চাকদা) ও ডুমুরদ্বীপ (ডুমুরদ) গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অহিপালের তিনপুত্র। কৃতধ্বজ, বিভাগু ও মহাবল কেশীধ্বজ। কেশীধ্বজ কিল্‌কিলার পশ্চিমে যোজনান্তরে (?) সপ্তগ্রাম মধ্যে রাজা হইয়া বেঘ (?) জাতিকে পালন করিতে লাগিলেন। কৃতধ্বজের পুত্র, মহাবল বিরলি, সুগন্ধি নামক গ্রামে বসবাস করেন। বিভাগু পূর্ব্বপারে বাণরাজার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা, জগদ্দলে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য, ভাগিরথীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের রাজা হইয়াছেন। রাজা কেশীধ্বজ, চান্দোল নামক স্থানে নানাস্থান হইতে কায়স্থ আনাইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখন ব্রাহ্মীনদীর তীরে সেই কেশীধ্বজের বংশোদ্ভব কায়স্থগণ রাজত্ব করিতেছেন। শিবপুর ও বালুকা (বালি) গ্রামের মধ্যে এবং ভদ্রেশ্বরের নিকট শ্রীরামপুরাদি গ্রামে, ব্রাহ্মণ জাতির বাস। হুগলীর নিকট বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া) প্রভৃতি গ্রাম। এখানে থলাপি নদী, দামোদর হইতে আদি-গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। থলসানি গ্রামে, ধীবর রাজার রাজত্ব। এখানে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যে পাটুলী গ্রাম, কায়স্থ অধিবাসীদের অধীন। গোবিন্দপুরাদি গ্রাম, ভট্টপল্লী, কালীদেবীর নিকটস্থ শৃগালদহ (শিয়ালদহ) এবং সারপল্লীও কায়স্থদিগের শাসনে আছে। সর্ব্বশুদ্ধ তিন হাজার গ্রাম কিলকিলার অন্তর্গত। "—— ——" বিশ্বসার-তন্ত্রের প্রথম পটলে, কিল-কিলাস্থ শিবলিঙ্গের বিষয় নিরূপিত

* এখনও তারকেশ্বর লাইনে হরিপাল গ্রাম বর্ত্তমান।

হইয়াছে। উক্ত তন্ত্র মতে কিল্‌কিলাদেশে নবদ্বীপ নগরে ব্রাহ্মণবংশে শচীসূত (চৈতন্যদেব) এবং খড়্গাদ গ্রামে, হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে নিত্যানন্দ জন্ম গ্রহণ করিবেন।" *

"দিগ্বিজয়-প্রকাশ" হইতে আমরা জানিতে পারি, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আমলে—খড়্গ-দাহ (খড়দা) মাহেশ, হরিপাল, সিঙ্গুর, ত্রিবেণী, চাকদা, ডুমুরদা, সপ্তগ্রাম, জগদ্দল, শিবপুর, বালী, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, বাঁশবেড়িয়া, খলসানি, গোবিন্দপুর, ভাটপাড়া, শিয়ালদহ প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য অবস্থায় ছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি—তাহা হইতে প্রমাণ হয়, যে সমুদ্রগর্ভ হইতেই কলিকাতার উৎপত্তি। পূর্ব্বোক্ত কিল্‌কিলা প্রদেশের অধিকাংশ স্থান—বাদাভূমি ও সমুদ্র-গর্ভজাত ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপাদি পূর্ণ ছিল। এখনও নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সুখ-সাগর, চাকদহ, ডুমুরদহ, খড়দহ, আর্য্যদহ (আরিয়াদহ বা এঁড়েদা) প্রভৃতি নাম হইতে প্রমাণ হয়, এ স্থানগুলি সমুদ্র বেষ্টিত খাড়ী, নদীগর্ভ বা জলাভূমি হইতে উদ্ভূত। পণ্ডিতপ্রবর ফরগুসান সাহেব বলেন—"দহ" শব্দটী—দ্বীপের অপভ্রংশ।

বর্ত্তমান কালে, কলিকাতার ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধে কয়েকটী পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সে পরীক্ষার ফল হইতেও—প্রমাণ হয়, যে বর্ত্তমানকালের কলিকাতা ও তাহার সন্নিকটস্থ স্থানগুলি, বহুশতাব্দী পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। কেহ কেহ বলেন—হিমাচলের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে—সমুদ্রতরঙ্গ উত্থিত হইত। কালে, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে—ভূমিখণ্ড উর্দ্ধোত্থিত হইয়া, উত্তর বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তর বাঙ্গালার যে কোন স্থানের ভূমি খনন করিলেই, এখনও গন্ধক এবং জারিত লৌহ (Vetrified Iron) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এইজন্য অনেক স্থানের মৃত্তিকা দেখিতে যেন, এক নম্বর সুরকীর মত লোহিতবর্ণ। এই লৌহে—উৎকৃষ্ট অসি প্রস্তুত হইত। "লৌহার্ণব গ্রন্থে" লিখিত আছে—"বঙ্গ-দেশজাত অসি তীক্ষ্ণ ও ছেদ-ভেদে পটু।" কুচবিহারের নিম্নে, প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ লৌহ আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, অগ্ন্যুৎপাতে উৎপন্ন দ্বীপ সমূহের উপর, হিমালয়-জাত নদী সমূহ

* কবিরাম সে সমস্ত গ্রামের ও ভূভাগের নামোল্লেখ করিয়াছেন—তাহাদের অনেকগুলি পরিবর্ত্তিত নাম লইয়া, এখনও বিরাজমান। তাঁহার উল্লিখিত রাজা ও রাজাগণের কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। বল্লালী আমলের "কালী-ক্ষেত্র" ও কবিরামের উল্লিখিত কিল্‌কিলা যে অবশ্য বর্ত্তমান কালীঘাট নহে—ইহা উল্লিখিত বিবরণ হইতেই প্রমাণ হয়। নব্যভারত ১৩০৮।

অবিশ্রান্ত কর্দ্দমরাশি সহ, নূড়ী-প্রস্তর আনিয়া ঢালিতে ঢালিতে, বহু সহস্র বৎসরের চেষ্টায়, হিমালয়কে বর্ত্তমান স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ভূতত্ত্ব-বিৎ-পণ্ডিতগণ কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী ভূমি গভীর ভাবে খনন করিয়া, ইহার প্রাচীন অবস্থার অনেক প্রমাণ পাইয়াছেন। এই সমস্ত খনিত স্থানে বসবাসের চিহ্নস্বরূপ, দগ্ধ মৃত্তিকা—বা ধাতু-দ্রব্যের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। অনেক স্থলে, কেবল উদ্ভিজ্জ-সার ও নদীর বালুকা স্তরই দেখা দিয়াছিল। লালদিঘি, গোলদিঘি, মনোহর-তালাও প্রভৃতি পুষ্করিণী খনন কালে, এরূপ অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার গড়ের মাঠের মধ্যে, ১৮১৫ খ্রীঃঅব্দের এপ্রিল মাসে একটী পুষ্করিণী খনন করান হয়। উক্ত বৎসরের মে মাসেই, "কলিকাতা গেজেটে" ইহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, চৌরঙ্গীর কোণে দীঘির নিম্নে বালুকা জমায়, গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীটী শুখাইয়া যায়। সেই জন্য উহাকে একটু বেশী গভীর করিয়া খনন করান হয়। খনন-কালে চারি ফিট নিম্নে, সারি সারি পুরাতন বৃক্ষের মূল পাওয়া গিয়াছে। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণ, সে মূল গুলি সুন্দরী-বৃক্ষের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ইহার পর, আরও কয়েকটী স্থানে পুষ্করিণী খনন কালে, ঐ প্রকার চিহ্ন দেখা যায়। সরকারী-রিপোর্ট হইতে আমরা তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

(১) শিয়ালদহ ষ্টেশনের দক্ষিণে—যে পুষ্করিণী আছে, তাহা খননকালে প্রথম স্তরের একফুট মৃত্তিকার নিম্নে, তিন ফিট্—পরিষ্কার নদীর বালুকা, তৎপরে কোন কোন স্থানে ছয় ফিট্, আবার কোথাও বা আট্ ফিট্ সূক্ষ্ম বালুকাসহ, উদ্ভিদ-সার ও ঝিনুক পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে পরীক্ষার জন্য আরও গভীর করিয়া খনন করিলে—এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের আটাল মৃত্তিকা পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মৃত্তিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবামাত্রই, ছাই হইয়া যায়। ভূতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতদের মতে, ইহা "পিট-কোল" বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঐ পুষ্করিণীটী আরও গভীর করিয়া খনন করায়, সারি সারি সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি সকল পাওয়া যায়।

(২) এই সময়ে কলিকাতার বর্ত্তমান কেল্লার মধ্যে, একটী কূপ খনন করান হয়। তাহাতেও শিয়ালদহের পুষ্করিণীর ন্যায়, মাটী ও বালী পাওয়া যায়। শেষে ১৫৯ ফিট খনন করিবার পর—হরিদ্রাবর্ণ, সূত্র-চিহ্ন-বিশিষ্ট আঁটাল মাটী পাওয়া যায়। ১৮০ ফিট্ নিম্নে, পিট্‌কোলের সহিত ছাঁচিকুমড়ার

বিচি ও ইক্ষু পত্র পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬ ফিটের নিম্নে—লৌহসংযুক্ত মৃত্তিকার চিহ্ন পাওয়া যায়। ৩৫০ ফিট নিম্নে, একটী কুক্কুরের কঙ্কাল—ও ৩৭২ ফিটের পর, একটী কচ্ছপের খোলা বাহির হইয়াছিল। ইহার পর আরও খনন করিতে করিতে, ঝিনুক, গলিত উদ্ভিজ্জ-সার ও গাছের গুঁড়ি দেখা গিয়াছিল।

এইরূপ পদার্থ সমূহের আবির্ভাব দেখিয়া, কূপটীকে ৪৮১ ফিট্ পর্য্যন্ত খনন করান হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে সমুদ্রতীরের ক্ষুদ্র বালুকা, পর্ব্বত নিঃসৃত ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড, অভ্রের খণ্ড বাহির হওয়ায় খনন কার্য্য বন্ধ করা হয়।

(৩) কয়েক বৎসর গত হইল, দমদমার নিকট একটী পুষ্করিণী খননকালে গভীর ভাবে খনিত একটী স্থান হইতে, ঐরূপ বৃক্ষ একটী হরিণের শৃঙ্গ ও কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল।

(৪) বর্ত্তমান গার্ডেনরীচের নিকট এক পুষ্করিণী খননে একখানি নৌকা বাহির হয়।

ইহা হইতে প্রমাণ হয়, গঙ্গার বদ্বীপ বা (Gangetic Delta) বহুবার বসিয়া গিয়া, এক্ষণে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসাং, তমলুক বা তাম্রলিপ্ত নগরীকে—সমুদ্র তটে দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তমলুক হইতে সাগর ৬০ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। ধরিতে গেলে, প্রতি শতাব্দীতে প্রায় পাঁচ মাইল করিয়া ভূমি ভরিয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, বরাহ মিহিরের "সমতট" ও কবিরামের "কিল্‌কিলা" প্রদেশ, বহু বহু শতাব্দীর পর বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের প্রাচীন কালের কোন ধারাবাহিক লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য এত বেশী, বহু শতাব্দী পূর্ব্বের কথা দূরে থাক—একশত বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনারও কোন লিখিত বিবরণ নাই। এরূপ অবস্থায়—বঙ্গদেশের প্রাচীন ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে, কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া অতি দুর্ঘট ব্যাপার।

মোটের উপর কথা হইতেছে এই—বর্ত্তমান কলিকাতা নগরীর অধিকৃত স্থান ও সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ, অতি পুরাকালে সমুদ্র-গর্ভমধ্যে নিমজ্জিত ছিল। চর ও বালুকাস্তর দ্বারা কালধর্ম্মে, গভীর সমুদ্রতল হইতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া, বিস্তৃত ভূখণ্ডের অস্তিত্ব জন্মিয়াছে। এই সমুদ্র-গর্ভোত্থিত, দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যেই. কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালীপীঠ ও পৌরাণিক কথা।

সতী-দেহ-ধ্বংশে পীঠস্থানোৎপত্তি—কালীপীঠ,—নকুলেশ্বর ভৈরব, চূড়ামণিতন্ত্রের উক্তি-তন্ত্রানুসারে প্রাচীন কালীপীঠের সীমা—বঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ—শাক্ত-ধর্ম্মের পুনরুত্থান—পীঠমাহাত্ম্য প্রকাশ—বল্লালসেন কর্ত্তৃক বঙ্গ বিভাগ—বাগড়ি অঞ্চলে ব্রহ্মোত্তর দান—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে কালীঘাটের অবস্থা—কালী কুণ্ড—মহানীল-তন্ত্রোক্ত গুহ্য-কালী—চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী—চিতে ডাকাত—চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি—কবিরামের দিগ্বিজয়-প্রকাশ—কিল্‌কিলাপুরীর বিবরণ—রাজা গোবিন্দ-দত্ত—তাঁহার সময়ের কালীঘাট—গোবিন্দপুর নাম করণ প্রতাপাদিত্যের সময়ের কালীঘাট।

মহাদেবঃ সতী দেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি।
তদ্দেহ বিষ্ণুণাচ্ছেত্তুং ধ্রিয়তেঽসৌ সুদর্শনঃ॥

পাঠক! একবার কল্পনার চক্ষে, দক্ষালয়ে রাজর্ষি দক্ষ-সূচিত মহাযজ্ঞের ব্যাপারের চিত্রে মনোনিবেশ করুন। যজ্ঞে সকলেই নিমন্ত্রিত। দেব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর মুনি ঋষি কেহই বাকী নাই—অতি দীন দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত যজ্ঞশালায় উপস্থিত—খালি নাই সতীর সর্ব্বস্বধন শিব! পিতৃমুখে সভামধ্যে—স্বামীর অবমাননা বাক্য শুনিয়া, পতি-প্রেমানুরাগিনী আদ্যাশক্তি সতী, অভিমানে মর্ম্মজ্বালায় দেহত্যাগ করিলেন। শিবের ও তৎসহচর প্রমথগণের উৎপাতে, দক্ষের মহাযজ্ঞ পণ্ড হইল। শিব-নিন্দার শাস্তিরূপে তাঁহার ছাগমুখ হইল। বিগত-প্রাণা সতী-দেহ স্কন্ধে লইয়া, শিব উন্মাদের ন্যায়, মহাতাণ্ডব নৃত্যে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৃষ্টি যায় যায়—হইয়া উঠিল।

শিব-ক্রোধে, প্রলয় উপস্থিত হয় দেখিয়া, দেবগণ মঙ্গলময় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু, শাণিত সুদর্শন দ্বারা সেই বিগত-প্রাণ সতী-দেহ,

DAKHINESWAR
CONJECTURAL
MAP OF CALCUTTA
IN ITS LEGENDARY PERIOD.
SCALE 3IN = 4 MILES
SALKIA BAZAR
BRAHMAS TEMPLE
CHUTTRANUTTE
KALIKOTA
SALT WATER LAKES
BALUGHATA
DHALANDA
GOVINDAPUR
BETOR
MAHESWARA'S TEMPLE
BAHULA

খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, ভারতবর্ষের নানাস্থানে নিক্ষেপ করিলেন। সতী-দেহের এই ছিন্নাংশ যেখানে যেখানে পড়িয়াছিল—সেই সকল স্থান "পীঠ" বা "শক্তিক্ষেত্রে" পরিণত হয়। "পীঠমালা" নামক গ্রন্থে, প্রধান প্রধান পীঠ-স্থানের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। হিন্দুমাত্রেই এই সকল পীঠের নাম শুনিয়াছেন—এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ সুতরাং নিষ্প্রয়োজন।

"পীঠমালায়" দেখা যায়—সতীর দক্ষিণ পদের অঙ্গুলী, কালীঘাটে পড়িয়াছিল। এই জন্য কালীঘাট পবিত্র শক্তি-পীঠ। প্রত্যেক পীঠে শিব ও শক্তি অর্থাৎ দেবতা ও ভৈরব বিরাজিত থাকেন। কালীঘাটের কালী-পীঠের দেবতা, মহাশক্তি রূপিণী কালী ও পীঠ-রক্ষক ভৈরব নকুলেশ। সতীস্নেহ বশতঃ, শিব লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া, কালীঘাটে নকুলেশ্বর নামে বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মা শিবের সন্তোষের জন্য, এই স্থানে একটী কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। চূড়ামণি তন্ত্রে আছে—

নকুলেশঃ কালী-পীঠে দক্ষ পাদাঙ্গুলীষু চ
সর্ব্বসিদ্ধিকর দেবী কালিকা তত্র দেবতাঃ॥

ইহাই কালীঘাটের উৎপত্তির পৌরাণিক ইতিহাস। কালীঘাটের বিস্তৃতি সেই পুরাকালে কতদূর ছিল, তৎসম্বন্ধে নিগমকল্পে পীঠমালায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। আমরা এই পীঠমালা হইতে দেখিতে পাই—"দক্ষিণেশ্বর হইতে বহুলা * পর্য্যন্ত দুই যোজন ব্যাপ্ত ধনুকাকার কালীক্ষেত্র। তন্মধ্যে এক ক্রোশ ব্যাপ্ত ত্রিকোণাকার স্থানের মধ্যে, ত্রিকোণে—ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং মধ্যস্থলে মহাকালী নামক কালিকাদেবী বিরাজ করেন। যেখানে নকুলেশ ও গঙ্গা বিরাজিত, সেই স্থান মহাপুণ্য ক্ষেত্র। তাহা দেবতার দুর্ল্লভ।

কাশীক্ষেত্র ও কালীক্ষেত্র উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছু নাই। এখানে মরণ মাত্রে কীট পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করে। মনুষ্যের ত কথাই নাই। এই স্থানে ভৈরবী, বগলা, কালী, মাতঙ্গী, কমলা, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও চণ্ডী এই সনাতনী অষ্টশক্তি অবস্থান করেন।

এরূপ জনপ্রবাদ—যে কালীঘাটের দেবী মন্দিরে, আজও সেই সতী-অঙ্গ-

* অনেকে অনুমান করেন—এই বহুলাই আধুনিক বেহালা। বেহালা হইতে বর্ত্তমান কালীঘাটের দূরত্ব দেড় ক্রোশের মধ্যে। কিন্তু "কালীক্ষেত্র-দীপিকা" রচয়িতা, এই বহুলাকে কালীঘাটের দক্ষিণবর্ত্তী রাজপুরের কিছু দক্ষিণ পূর্ব্ব আকনা গ্রামের সন্নিকটস্থান বোলপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বিচ্ছিন্ন অঙ্গুলি বর্ত্তমান। কালীর সেবায়েত, হালদার মহাশয়গণের মধ্যে, জ্যেষ্ঠের বংশসম্ভূত কোন ভারপ্রাপ্ত—ব্যক্তি, প্রতিবৎসর স্নানযাত্রা এবং অম্বুবাচীর শেষ দিনে, উক্ত পদাঙ্গুলির বিধিপূর্ব্বক—স্নান ও অভিষেক কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালের এই পাশ্চাত্য-শিক্ষার দিনে, অনেকে একথা অবিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—যে তাঁহারা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—রক্ষিত, মিশর দেশের "মমির" কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্যই নাই। যাঁহারা বিশ্বাসী হিন্দু, তাঁহারা শুনিয়া রাখুন—দেবী-ভাগবতের মতে, সতীর ছিন্ন-দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ, ভূমিতে পতিত হইবামাত্রই পাষাণত্ব—প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেবীভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে উক্ত আছে—

"ভূমৌ নিপতিতা—যেতুচ্ছায়াঙ্গাবয়বাঃ ক্ষণাৎ
জগ্মুঃপাষাণত্মাং সর্ব্বে লোকানাং হিত হেতবে।"

তন্ত্র-বিশেষের মতে—কালীক্ষেত্র শ্রীপীঠ বা ওংকার পীঠ। কারণ এখানে সতী-পদাঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল। কালীক্ষেত্র এই জন্যই শ্রেষ্ঠ মহাপীঠ। তাহার এ গর্ব্ব আজও খর্ব্ব হয় নাই, এবং যতদিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে ততদিন হইবে না।

সতী-অঙ্গ, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রদ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাস্থানে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, খণ্ডিত দেহাংশ হইতে, একান্ন পীঠের উৎপত্তি হইয়াছে। নিগম-কল্পের পীঠমালায় ইহা যথাযথ বর্ণিত আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। মহাদেব স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্তা এবং উত্তর-দাত্রী দেবীভগবতী। *

ইহা হইতেছে তান্ত্রিক হিন্দুর ও তন্ত্র-শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রে, এই কালী

---

* দক্ষিণেশ্বর মারাভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরী।
ধনুরাকার ক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয় সংখ্যকং॥
তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারঃ ক্রোশ মাত্র ব্যবস্থিতঃ।
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মকং॥
মধ্যে চ কালিকাদেবী—মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা।
নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র গঙ্গা বিরাজিতা॥
তত্র ক্ষেত্র-মহাপুণ্যং দেবানামপি দুর্লভং।
কাশী-ক্ষেত্র কালী-ক্ষেত্র অভেদোপি মহেশ্বর॥
কীটোঽপি মরণে মুক্তি, কিং পুনর্মানবাদয়।
ভৈরবী বগলা বিদ্যা (কালী) মাতঙ্গী কমলা তথা।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চণ্ডী চাষ্ট শক্তি বসেৎ সদা॥

ক্ষেত্রকে যে গৌরবান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আজও পর্য্যন্ত কলির এই পূর্ণ রাজত্বে, তাহা সমানভাবেই বর্ত্তমান। আজও ভক্ত হিন্দু-নর-নারী, জগতের এই মাতৃরূপিণী কালিকা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাইলে, ভক্তি ভরে—"মা! মা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। আজও এই অধর্ম্ম—অনাচারের দিনে, অর্দ্ধনাস্তিকতার আমলে, জড়বাদ ও পাশ্চাত্য-দর্শনের পূর্ণ আধিপত্য কালে, অনেক উচ্চ-শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব-স্বরূপ বাঙ্গালী, মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি পুলকিত স্বরে, তাঁহাকে "মা মা" বলিয়া ডাকিয়া, প্রাণের শান্তিলাভ করেন। সুদূর বঙ্গের চারিদিক হইতে, কেবল বঙ্গদেশ কেন—সমগ্র ভারতের সুদূর স্থান সমূহ হইতে, গৃহী-ভক্ত, সপরিবারে এই কালীক্ষেত্রে আসিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন। বিশ্ব-মাতার মন্দিরে না আসে কে? রেল পথের বিস্তার জন্য—দ্রাবিড়, কর্ণাট, ত্রৈলিঙ্গ, উৎকল, মগধ, অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ, বম্বে, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি সকল স্থানের যাত্রীই—এই মাতৃমন্দিরে পূজা, হোম ও বন্দনার জন্য উপনীত হন। যতি, সন্ন্যাসী, দণ্ডাশ্রমী, সাধু, সাধক, যাঁহারা শক্তিমন্ত্রের উপাসক ও শাক্তধর্ম্মের অনুসারী তাঁহারাই চতুর্ব্বর্গ ফললাভের জন্য, প্রতি পুণ্যদিনে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, প্রথমে আমাদের দেখিতে হইবে, কিরূপে দূরধিগম্য জঙ্গলপূর্ণ প্রদেশ হইতে, এই পীঠস্থান পরিস্ফুট হইয়া ধীরে ধীরে মানবচক্ষে আত্মগৌরব প্রকটিত করিল। কিরূপে, কোন সময়ে, কাহার দ্বারা, প্রথম মন্দির নির্ম্মিত হইল—কিরূপে জঙ্গলময় কালীক্ষেত্র বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইল। এই সমস্ত অন্ধ-তমসাবৃত কালের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করা, বড়ই দুর্ঘট ব্যাপার। আমরা কালীঘাটের প্রথম আবির্ভাব সময়ের সম্বন্ধে এইস্থলে যাহা কিছু বলিব, তাহার অধিকাংশই কিম্বদন্তী-মূলক। সকল কিম্বদন্তীই যে অসার ও ভিত্তিশূন্য, তাহাও বলিতে পারি না। তবে কালগর্ভে বিলয়প্রাপ্ত, অতীত যুগের ইতিহাসগুলি এত বিশৃঙ্খল অবস্থায় রক্ষিত বা একাধারে বিলুপ্ত, যে তাহাদের সহায়তায় কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার ভূতত্ত্ব আলোচনা কালে দেখাইয়াছি, যে নিম্ন-বঙ্গ কখনও বা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, আবার কখনও নদীবাহিত বালু-রাশি পুঞ্জীভূত হওয়ায়, সেই সুগভীর স্থান পূর্ণ হইয়া ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ সমূহের রসাতল-প্রবেশ

সমুদ্রগর্ভ হইতে পুনরুত্থানের জন্য যে বহু বহু শতাব্দী লাগিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই রামায়ণের সময়ে যে স্থান কপিলাশ্রম ও তপোবন, মহাভারতীয় সময়ে, তাহা অপরিজ্ঞেয় এবং পৌরাণিক যুগে, তাহা নিবিড় অরণ্যময়।

মহাভারতোক্ত মহারাজ জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, মগধে রাজত্ব করিতেন। পুরাণে এই সহদেব হইতে অজাতশত্রু পর্য্যন্ত পঁচিশ জন রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অজাতশত্রুর সময়ে, বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হয়েন। এই সময়ে উত্তর বঙ্গে, সিংহবাহু বলিয়া এক পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। সিংহ-বাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র—বিজয়সিংহ। বিজয়-সিংহ যৌবনের উদ্দাম-প্রবৃত্তি চালিত হইয়া, প্রজা-পীড়ন আরম্ভ করেন। এজন্য সিংহবাহুর ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ও সভাসদগণ মন্ত্রণা করিয়া রাজকুমার বিজয়সিংহকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন।

ইতিহাসের আখ্যানেই প্রকাশ, রাজকুমার বিজয়সিংহ, সাতশত সঙ্গী লইয়া অর্ণবযানারোহণে ভাগীরথীর বক্ষ বাহিয়া,—দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করেন। ভাগীরথীর মোহানা অতিক্রম করিবার পর, তিনি ভারত-সমুদ্রে গিয়া পড়েন। অনন্যোপায় হইয়া, সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ-রাশি মথিত করিয়া, অশেষ বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি পরিশেষে সিংহলদ্বীপে উপনীত হন। খৃঃ-পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে তিনি সিংহলে পৌঁছিয়াছিলেন। এই বৎসর বুদ্ধদেবও ইহলীলা সাঙ্গ করেন। রাজাদেশে রচিত, সিংহলের ইতিহাসে বিজয়সিংহের বঙ্গত্যাগের ব্যাপার উল্লিখিত আছে। কিন্তু ইহাতে বঙ্গদেশের কোনও নগরের বা তীর্থ-স্থানের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয়, এই সময়ে কালীঘাট ও তৎসংলগ্ন স্থান সমূহ নিবিড় অরণ্যময় ছিল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর, কয়েক শতাব্দীমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়িতে লাগিল। মঠ ও বিহার-প্লাবিত বঙ্গদেশে এবং মগধ-রাজ্যে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব, নবোদিত সূর্য্যকিরণের মত উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অনেক বৌদ্ধমন্দিরে, শিবলিঙ্গ ও শক্তি-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইল। * আবার উজ্জ্বল হোমাগ্নি-শিখা, অনেক দেবমন্দিরে ও গৃহচত্বরে জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণও বৌদ্ধধর্ম্মের অবসন্ন অবস্থা দেখিয়া, সাধারণের নিকট তান্ত্রিক-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

* জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর মন্দির, ঢাকার ঢাকেশ্বরী, কুচবিহারের বাণেশ্বর ও তমলুকের বর্গ-ভীমা দেবীর মন্দির দেখিলে, তাহা বৌদ্ধ-কীর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। (নব্যভারত—৩৮৮ পৃষ্ঠা)

মগধরাজ্যের উচ্ছেদের পর, পালবংশীয় নৃপতিরা, খৃষ্টের দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। এ সময়ে ভারতের সর্ব্বস্থানেই বৌদ্ধধর্ম্ম হীন-প্রতাপ। "অহিংসা-পরমোধর্ম্ম" এই পবিত্র মূল-নীতি ত্যাগ করিয়া, আবার হিংসামন্ত্রময় বলির রুধির-স্রোতে, কাপালিকের শবসাধনে ও পঞ্চম-কারময় উপাসনায়, দেশ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল।

পালবংশীয় নরপতিগণ, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও—হিন্দুগণকে কোন রূপে উৎপীড়িত ও নিরুৎসাহিত করেন নাই। তাঁহারা অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ, রাজনীতি-জ্ঞানপূর্ণ, অনেক মনীষি ব্রাহ্মণকে তাঁহারা মন্ত্রীত্ব-পদ পর্য্যন্ত প্রদান করেন। ইতিহাসে প্রকাশ—পালবংশীয় দেবপাল, নারায়ণ পাল প্রভৃতি রাজাগণ—শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনেক প্রাচীন গুপ্ত-লিপি ও অনুশাসন-পত্রে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৌদ্ধদিগের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব আবার বাড়িয়া উঠিল। তান্ত্রিক-ধর্ম্ম—নানাস্থানে আধিপত্য প্রকাশ করিতে লাগিল। তন্ত্রাচারী কাপালিকগণ, গভীর অরণ্যমধ্যে শক্তি-সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। পূর্ব্বোক্ত চূড়ামণি-তন্ত্র সেকালের একখানি প্রাচীন তন্ত্র-গ্রন্থ। এই তন্ত্র হইতে প্রমাণ হয়, সে সময়ে কালীঘাট গভীর জঙ্গলাবৃত অবস্থায়, লোক-লোচনের অগোচরে ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমিক অবনতির সহিত, এদেশে শাক্ত-ধর্ম্মের প্রভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং তান্ত্রিকগণও ক্রমশঃ "সিদ্ধ-পীঠ" সমূহের কথা জানিতে পারে।

খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—বল্লালসেন গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে—বল্লালের আমলে, অনেক—নর-নারী পাপমোচন কামনায়, কালীক্ষেত্রে গঙ্গাস্নানে আসিত। গঙ্গাতীরেই এই "কালীক্ষেত্র" ছিল। এই কালীক্ষেত্র ও কালীঘাট যে একই স্থান নয়, তাহাই বা কে বলিতে পারে।

গৌড়েশ্বর-গণের প্রচারিত অনুশাসন-পত্র গুলি হইতে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন। রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য বল্লালসেন সমস্ত বঙ্গদেশকে (১) রাঢ়, (২) বগড়ি, (৩) বরেন্দ্র, (৪) বঙ্গ, (৫) মিথিলা, এই পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ভাগিরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ অঞ্চলকে রাঢ়-দেশ বলিত। গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগিরথীর পূর্ব্বাংশ বগড়ি নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গার

উত্তর ও করতোয়ার পশ্চিম, এবং মহানন্দার পূর্ব্বাংশকে বরেন্দ্র, আর করতোয়া ও পদ্মার পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ প্রদেশকে বঙ্গ বলিত। বল্লালী-আমলের এই বগড়ী প্রদেশই আজকালকার প্রেসিডেন্সি-বিভাগ। বল্লালসেন এই বগড়ী অঞ্চলের কিয়দংশ ভূমি, দেবসেবার, জন্য এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ইহার পর হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, কালীঘাটের আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কালীক্ষেত্রদীপিকা হইতে জানিতে পারা যায়—"পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, দিল্লীর পাঠান রাজগণের সময়ে—কালীঘাটের অনতিদূরে, স্থানে স্থানে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। এ সময় কালীঘাটের চতুঃপার্শ্ব—বেত্র, কচুই প্রভৃতি লতা এবং দুশ্ছেদ্য গুল্মাদিময় ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বর্ত্তমান কালীবাটির পূর্ব্বদিকে, ঐ বনের মধ্য দিয়া এক অপ্রশস্ত পথ ছিল। এই পথ, বর্ত্তমান কালের "রসারোড" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। বন-মধ্যস্থ এই অপ্রশস্ত পথ দিয়া, কালী-দর্শনার্থী নাগা ফকির ও সন্ন্যাসীগণ, দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করিত এবং কালীঘাটের কার্য্য শেষ করিয়া, পদব্রজে গঙ্গাসাগরে "কপিলাশ্রমে" পৌছিত। কালীঘাটের দক্ষিণ প্রদেশে—সাগর সন্নিকটে, ছত্র-ভোগে, অম্বুলিঙ্গশিব ও সংকেতমাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈতন্য-ভাগবতেও এই দুই দেবস্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিতা যে প্রশস্ত নদী, এখন সমুদ্র গমনের প্রধান পথ হইয়াছে, তখন তাহা এত প্রশস্ত ছিল না। এই সংকীর্ণ নদী দিয়া, সেই পুরাকালে লোকে তমলুক, হিজলী, উৎকল প্রভৃতি স্থানে নৌকাযোগে যাতায়াত করিত। বর্ত্তমান কালীঘাটের সন্নিকটে, ভাগিরথী ক্রমশঃ ধনুকাকারে বক্র হইয়া, উত্তর-বাহিনী ছিলেন। বর্ত্তমান কালীকুণ্ড-হ্রদ, তখন গঙ্গাগর্ভে অতলস্পর্শ "দহ" বা 'দ" ছিল। *

পীঠ-স্থান বলিয়া পরিচিত হইবার বহুকাল পরেও—কালীঘাট নির্জ্জন

* নকুলেশ্বরের মন্দির হইতে আরম্ভ হইয়া, একটী রাস্তা আজকাল কালীদেবীর মন্দিরের পশ্চাতের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া, ভোগের ঘরের নিকট শেষ হইয়াছে। ভোগের—ঘরের পশ্চাতে এই রাস্তারধারে যে পঙ্কিল পুকুরটী দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই পুরা কালের "কালীকুণ্ড"। এই কালীকুণ্ডের সহিত পূর্ব্বে গঙ্গার সংযোগ ছিল—অথবা ভাগিরথী-স্রোত এই কালীকুণ্ড পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইত। চারি পাঁচশত বৎসরের মধ্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখিবেন—অতীত কালের গঙ্গাগর্ভস্থ কালীকুণ্ড—তীর হইতে বর্ত্তমানের আদিগঙ্গা কতদূরে সরিয়া আসিয়াছেন। জনপ্রবাদ এই, কালীকুণ্ড তীরেই সতীর প্রস্তরবৎ পদাঙ্গুলী পাওয়া যায়। পরে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলা হইবে।

শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য-গর্ভে, অজ্ঞাত অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল। জন-প্রবাদ এই—ভীমকায় ভৈরব ও বামাচারী কাপালিকগণ এই নির্জ্জন বন-প্রদেশস্থ কালীর পর্ণ-মন্দিরের নিকটে—জঙ্গল মধ্যে বসিয়া, বীরাচার-সম্মত উপাসনা করিত। নরবলি দিয়া ভগবতীর নৃ-কপালময় খর্পরকে রুধিরস্রোতে পূর্ণ করিত। গভীর নিশীথে তাহাদের কঠোর কণ্ঠ-নিঃসৃত ভীষণ-মন্ত্রনাদে, সেই নির্জ্জন বনস্থলী—বিকম্পিত হইয়া উঠিত। তন্ত্রাচার-সমন্বিত, উজ্জ্বল হোমাগ্নি-শিখার গর্জ্জনে,—সেই স্থান, ভীম কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিত।

আদিশূর হইতে বল্লাল-সেনের রাজত্বকালের মধ্যে, বঙ্গদেশের নানাস্থান জনপূর্ণ হইতে লাগিল। কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণ ও তদনুচর ক্ষত্রিয়গণের বংশধরেরা বঙ্গের নানাস্থানে বাস করিতে লাগি লেন। এই সময়ে বগড়ী অঞ্চলেও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর ও গ্রাম দেখা দিল। শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী জনগণের সংখ্যা-প্রাবল্য জন্য, অনেক অংশের বন-জঙ্গল কর্ত্তিত হইয়া, স্থানে স্থানে দেব-মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বীরাচারী কাপালিকগণও ক্রমশঃ এই সকল জনপূর্ণ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া, গভীরতম বনে প্রবেশ করিল।

দক্ষিণ-বঙ্গ বা বগড়ীর নানাস্থানে জঙ্গল কাটিয়া, লোকালয় নির্ম্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গদেশে শিব ও শক্তি-মন্দির প্রতিষ্ঠার ধূম পড়িয়া গেল। অবস্থাপন্ন শাক্তগণ, দশ-মহাবিদ্যার মধ্যে যিনি যে দেবীর উপাসক, তিনি তদনুরূপ মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। ভাগিরথী, সরস্বতী প্রভৃতি নদী-তীরে, অসংখ্য দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক বৌদ্ধমন্দিরও শিব ও শক্তি-মন্দিরে পরিণত হইয়া গেল। চৈতন্য-দেবের সময় পর্য্যন্ত কেবল কালীক্ষেত্রের নামোল্লেখ ভিন্ন, আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য প্রাদুর্ভূত হয়েন। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে, শ্রীচৈতন্যদেবের উৎকল হইতে প্রত্যাগমন বর্ণনার মধ্যে, বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তরাংশে পানিহাটী ও কালীঘাটের দক্ষিণ দিকে ছত্রভোগ প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের কথা কোনরূপ বিশেষভাবে উল্লিখিত না হওয়ায়, স্পষ্টই বোধ হইতেছে—পঞ্চদশ শতাব্দীর বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বৈষ্ণবলেখকগণ, সম্প্রদায়-গত বিদ্বেষবশে হউক, কিম্বা কালীঘাটের কথা সাধারণের অজানিত থাকার জন্যই হউক, তাহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই।

মহানীল-তন্ত্রে "কালীঘাটে গুহ্যকালী" বলিয়া এক দেবীর নামোল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকে, এই "গুহ্য-কালীর" পূজার্চ্চনাদি করিত। এতদ্ব্যতীত আচার-নির্গম-তন্ত্র, মহালিঙ্গ-তন্ত্র, চূড়ামণিতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থেও কালীঘাটের নামোল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই তন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে রচিত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৫৪৫ খ্রীঃঅব্দে রচিত চণ্ডীকাব্যে—গঙ্গাতীরের যে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাতে কালীঘাটের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে, ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

ত্বরায় বহিছে তরি, তিলেক না রয়
চিৎপুর, শালিখা সে এড়াইয়া যায়।
কলিকাতা এড়াইল, বেনিয়ার বালা
বেতড়েতে উত্তরিল, অবসান বেলা।
ডাহিনে ছাড়িয়া যায়, হিজলীর পথ
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত।
বালুঘাট এড়াইল, বেণের নন্দন,
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা, দিল দরশন।

অনেকে অনুমান করেন, সে সময়ে, কলিকাতা গভীর বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং এ রচনা মুকুন্দ-রামের নহে, তাঁহার চণ্ডী-কাব্য মধ্যে, অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাহাই হউক না কেন, কালীঘাট যে পঞ্চদশ শতাব্দীর পরেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। কলিকাতায় সে সময়ে আর একটী কালীমন্দির বর্ত্তমান ছিল। ইহা বর্ত্তমান কালের "চিত্রেশ্বরীর" মন্দির। এই চিত্রেশ্বরী হইতেই "চিৎপুর" নামকরণ হইয়াছে। কোন্ সময়ে, কোন্ ব্যক্তি, এই চিত্রেশ্বরীর স্থাপনা করেন,—তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতি এই, এই কালী-প্রতিমা "চিতে" নামক দস্যুদলপতি দ্বারা স্থাপিত। সেকালের ডাকাতেরা কালীর পূজা না করিয়া, কোন স্থানে ডাকাতি করিতে যাইত না। সে ভীষণ সময়ে, জলে স্থলে ডাকাতি চলিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, সর্ব্বাগ্রে এই মন্দির গঙ্গাতীরে জঙ্গলমধ্যে ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে গঙ্গার কূল ভরাট হইয়া পড়ায়, ইহা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই চিত্রেশ্বরীর মন্দিরেই ডাকাতেরা নরবলি দিত। গঙ্গাতীরস্থ বিজন অরণ্যমধ্যে এই মন্দির স্থাপিত ছিল। এই

চিত্রেশ্বরী ও কালীঘাটের কালী ব্যতীত, আর কোন বিখ্যাত কালীমন্দিরই তখন এদেশে ছিল না। কিন্তু কালীঘাট পীঠস্থান ছিল বলিয়া, পুরাতন গ্রন্থাদিতে ইহারই নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত "দিগ্বিজয়-প্রকাশ" গ্রন্থ, যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে লিখিত। দিগ্বিজয়-প্রকাশে গোবিন্দপুরের নামকরণ সম্বন্ধে, কয়েকটী ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—"হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরভূমির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। গঙ্গার পূর্ব্বপারে কালীদেবীর সন্নিকটে চারি সহস্র কল্যব্দে গোবিন্দ-দত্ত নামক একজন রাজা, গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা উদ্দেশে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থ-কার্য্য সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসেন, সেই সময়ে কালী দেবী নৌকামধ্যে তাঁহাকে এইরূপ স্বপ্নদান করেন—"তুমি আমার আজ্ঞায় অকর্ষণ-পুরীতে (অর্থাৎ যেখানে ভূমি কর্ষিত হয় নাই) তৃণগুল্মাদি পরিষ্কার করিয়া একটী মহাগ্রাম স্থাপন কর। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।" দেবীর আদেশ অবগত হইয়া, রাজা, পারীন্দ্রগ্রাম (?) হইতে নানাবিধ ধনরত্ন আনয়ন করিয়া, সুরধনীতটে বসবাস করিলেন। গোবিন্দ-দত্ত স্বপ্নকালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে একখানি স্কন্ধদ্বয় যুক্ত লাঙ্গল দেখিয়াছিলেন। ঐ লাঙ্গল সহায়তায় দেবীর আদেশে তথাকার ভূমি খনন করিয়া, প্রভূত অর্থ পাইয়াছিলেন * এবং ঐ অর্থ হইতে চতুঃষষ্টি বলি এবং হোম-যজ্ঞাদি দ্বারা দেবীর পূজা করেন। ধন-ধান্য ও বংশবলের বৃদ্ধি প্রযুক্ত, তিনি ঐ স্থানের বর্দ্ধিষ্ণু লোক হইয়াছিলেন। এইরূপ অচিন্তিত ঐশ্বর্য্যলাভে তিনি পুরীর শ্রীবৃদ্ধি ও বাসের জন্য বাস্তুযাগ করাইয়াছিলেন।" কবিরামের উল্লিখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণ হইতেছে—বনজঙ্গলময় স্থান পরিষ্কৃত হইয়া, গোবিন্দপুরাখ্য নূতন গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। গোবিন্দ দত্ত নামক একজন রাজা—কালীঘাটেরও একটু উন্নতি করেন। এইজন্য অনেকের অনুমান এই, গোবিন্দ দত্ত হইতেই গোবিন্দপুর

* ইদানীং নৃপশার্দ্দূল চরভূমৌ কথা শৃণু
কালীদেব্যাঃ সন্নিধৌচ গঙ্গায়াং প্রাচাকে তটে। (১০৫২)
গোবিন্দদত্তো রাজা চ কলিবেদাব্দসহস্রকে
সিন্ধুসঙ্গমতীর্থযাত্রাকরণার্থং সমাগতঃ। (১০৫৩)
গোবিন্দদত্ত ভূপালং, তীর্থাৎ প্রত্যাগতং শুভম্
কালীদেবী স্বপ্নছলে নৌকায়ামুবাচ হ। (১০৫৪)

নাম হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার ইতিবৃত্ত লেখক ষ্টার্ণডেলসাহেব বলেন, "গোবিন্দরাম মিত্র হইতে গোবিন্দপুর নাম হইয়াছে।" আবার অন্যদিকে কলিকাতার আদিম অধিবাসী শেঠ ও বসুকেরা বলেন—তাঁহাদের গৃহ-দেবতা গোবিন্দজীর নাম হইতেই গোবিন্দপুর নাম-করণ হইয়াছে। গোবিন্দপুর নাম-করণ যে জন্যই হউক না কেন—কবিরামের লিখিত কাহিনী হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়—যে গঙ্গাসাগর যাত্রী রাজা গোবিন্দ-দত্ত সেই ইতিহাস-বর্জ্জিত পুরাকালে জঙ্গল কাটাইয়া, কালীর স্বপ্নাদেশে কালী-ক্ষেত্রের একটু উন্নতি করিয়াছিলেন।

তান্ত্রিক-ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের সহিত, কালীক্ষেত্রের মহিমা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছিল। বল্লালসেনের সময় হইতে তান্ত্রিক-ধর্ম্ম, ক্রমোন্নতি লাভ করিতে থাকে। হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" হইতেই ইহার-পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টের সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—তান্ত্রিক ধর্ম্ম, যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এই সময়টাকে তান্ত্রিক-যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালার অবস্থা আলোচনার সহিত আমরা দেখাইব, কি করিয়া শাক্তধর্ম্ম, বঙ্গদেশে এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

অকর্ষণী পুরীং রাজন আগচ্ছ হি মমাজ্ঞতঃ
যাদর-রসা-পৃথিব্যাঞ্চ ছেদয়িত্বা তৃণাদিকম্। ১০৫৫
* * * *
কালীদেব্যা বচো জ্ঞাত্বা গঙ্গায়াশ্চ তটান্তরে
বসতিং ভূয়সীং তত্র চকার হি মুদান্বিতঃ। ১০৫৭
পারীন্দ্রগ্রামাৎ সর্ব্বাণি দ্রবিণানি মহীপতিঃ
আনয়িত্বা চ বসতিং কৃতবান্ সুরসরিত্তটে। ১০৫৮
লাঙ্গুলী দ্বিজযুতঃ দেব্যা পৃষ্ঠে চ বর্ত্ততে
যদাদেশেন তন্মূলে........................ (১০৫৯
প্রাপ্তা তেনৈব ভূপেন মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিশি
কাঞ্চনকর্ষপূরিতাশ্চালভ্যা দেবাসুরৈরপি। (১০৬০)
ভূরীণি দ্রবিণান্যেব প্রাপ্য গোবিন্দ ভূপতিঃ
চতুঃষষ্ঠী সংখ্যকৈশ্চ বলিভিঃ পূজনং কৃতম্। (১০৬১)
গোত্রবৃদ্ধা বিত্তবৃদ্ধা তেজোবৃদ্ধা হি ভূমিপ
বভূব গোবিন্দদত্তো বর্দ্ধিষ্ণুপ্রবরো মহান্। (১০৬২)
ভাগীরথী পূর্ব্বতটে পুরীবর্দ্ধনহেতবে
বাস্তবাগং দ্বিজান্ নীত্বা চকার বাসহেতবে। (১০৬৩)
বিশ্বকোষোদ্ধৃত, কবিরামের দিগ্বিজয়—প্রকাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালীপীঠ ও পৌরাণিক কথা।

সতী-দেহ-ধ্বংশে পীঠস্থানোৎপত্তি—কালীপীঠ,—নকুলেশ্বর ভৈরব, চূড়ামণিতন্ত্রের উক্তি-তন্ত্রানুসারে প্রাচীন কালীপীঠের সীমা—বঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ—শাক্ত-ধর্ম্মের পুনরুত্থান—পীঠমাহাত্ম্য প্রকাশ—বল্লালসেন কর্ত্তৃক বঙ্গ বিভাগ—বাগড়ি অঞ্চলে ব্রহ্মোত্তর দান—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে কালীঘাটের অবস্থা—কালী কুণ্ড—মহানীল-তন্ত্রোক্ত গুহ্য-কালী—চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী—চিতে ডাকাত—চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি—কবিরামের দিগ্বিজয়-প্রকাশ—কিল্‌কিলাপুরীর বিবরণ—রাজা গোবিন্দ-দত্ত—তাঁহার সময়ের কালীঘাট—গোবিন্দপুর নাম করণ প্রতাপাদিত্যের সময়ের কালীঘাট।

মহাদেবঃ সতী দেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি।
তদ্দেহ বিষ্ণুণাচ্ছেত্তুং খ্রিয়তেহসৌ সুদর্শনঃ॥

পাঠক! একবার কল্পনার চক্ষে, দক্ষালয়ে রাজর্ষি দক্ষ-সূচিত মহাযজ্ঞের ব্যাপারের চিত্রে মনোনিবেশ করুন। যজ্ঞে সকলেই নিমন্ত্রিত। দেব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর মুনি ঋষি কেহই বাকী নাই—অতি দীন দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত যজ্ঞশালায় উপস্থিত—খালি নাই সতীর সর্ব্বস্বধন শিব! পিতৃমুখে সভামধ্যে—স্বামীর অবমাননা বাক্য শুনিয়া, পতি-প্রেমানুরাগিনী আদ্যাশক্তি সতী, অভিমানে মর্ম্মজ্বালায় দেহত্যাগ করিলেন। শিবের ও তৎসহচর প্রমথগণের উৎপাতে, দক্ষের মহাযজ্ঞ পণ্ড হইল। শিব-নিন্দার শাস্তিরূপে তাঁহার ছাগমুখ হইল। বিগত-প্রাণা সতী-দেহ স্কন্ধে লইয়া, শিব উন্মাদের ন্যায়, মহাতাণ্ডব নৃত্যে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৃষ্টি যায় যায়—হইয়া উঠিল।

শিব-ক্রোধে, প্রলয় উপস্থিত হয় দেখিয়া, দেবগণ মঙ্গলময় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু, শাণিত সুদর্শন দ্বারা সেই বিগত-প্রাণ সতী-দেহ,

CONJECTURAL
MAP OF CALCUTTA
IN ITS LEGENDARY PERIOD.
SCALE 3IN = 4MILES
DAKHINESWAR
BHAGIRATHI
Chitpur Creek
BRAHMAS TEMPLE
SALKIA BAZAR
CHUTTRANUTTE
KALIKOTA
SALT WATER LAKES
BALUGHATA
DHALANDA
GOVINDAPUR
BETOR
MAHESWARA'S TEMPLE
ADI GANGA
KALIGHAT
BAHULA

খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, ভারতবর্ষের নানাস্থানে নিক্ষেপ করিলেন। সতী-দেহের এই ছিন্নাংশ যেখানে যেখানে পড়িয়াছিল—সেই সকল স্থান "পীঠ" বা "শক্তিক্ষেত্রে" পরিণত হয়। "পীঠমালা" নামক গ্রন্থে, প্রধান প্রধান পীঠ-স্থানের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। হিন্দুমাত্রেই এই সকল পীঠের নাম শুনিয়াছেন—এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ সুতরাং নিষ্প্রয়োজন।

"পীঠমালায়" দেখা যায়—সতীর দক্ষিণ পদের অঙ্গুলী, কালীঘাটে পড়িয়াছিল। এই জন্য কালীঘাট পবিত্র শক্তি-পীঠ। প্রত্যেক পীঠে শিব ও শক্তি অর্থাৎ দেবতা ও ভৈরব বিরাজিত থাকেন। কালীঘাটের কালী-পীঠের দেবতা, মহাশক্তি রূপিণী কালী ও পীঠ-রক্ষক ভৈরব নকুলেশ। সতীস্নেহ বশতঃ, শিব লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া, কালীঘাটে নকুলেশ্বর নামে বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মা শিবের সন্তোষের জন্য, এই স্থানে একটী কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। চূড়ামণি তন্ত্রে আছে—

নকুলেশঃ কালী-পীঠে দক্ষ পাদাঙ্গুলীষু চ
সর্ব্বসিদ্ধিকর দেবী কালিকা তত্র দেবতাঃ॥

ইহাই কালীঘাটের উৎপত্তির পৌরাণিক ইতিহাস। কালীঘাটের বিস্তৃতি সেই পুরাকালে কতদূর ছিল, তৎসম্বন্ধে নিগমকল্পে পীঠমালায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। আমরা এই পীঠমালা হইতে দেখিতে পাই—"দক্ষিণেশ্বর হইতে বহুলা * পর্য্যন্ত দুই যোজন ব্যাপ্ত ধনুকাকার কালীক্ষেত্র। তন্মধ্যে এক ক্রোশ ব্যাপ্ত ত্রিকোণাকার স্থানের মধ্যে, ত্রিকোণে—ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং মধ্যস্থলে মহাকালী নামক কালিকাদেবী বিরাজ করেন। যেখানে নকুলেশ ও গঙ্গা বিরাজিত, সেই স্থান মহাপুণ্য ক্ষেত্র। তাহা দেবতার দুর্লভ।

কাশীক্ষেত্র ও কালীক্ষেত্র উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছু নাই। এখানে মরণ মাত্রে কীট পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করে। মনুষ্যের ত কথাই নাই। এই স্থানে ভৈরবী, বগলা, কালী, মাতঙ্গী, কমলা, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও চণ্ডী এই সনাতনী অষ্টশক্তি অবস্থান করেন।

এরূপ জনপ্রবাদ—যে কালীঘাটের দেবী মন্দিরে, আজও সেই সতী-অঙ্গ-

* অনেকে অনুমান করেন—এই বহুলাই আধুনিক বেহালা। বেহালা হইতে বর্ত্তমান কালীঘাটের দূরত্ব দেড় ক্রোশের মধ্যে। কিন্তু "কালীক্ষেত্র-দীপিকা" রচয়িতা, এই বহুলাকে কালীঘাটের দক্ষিণবর্ত্তী রাজপুরের কিছু দক্ষিণ পূর্ব্ব আকনা গ্রামের সন্নিকটস্থান বোলপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বিছিন্ন অঙ্গুলি বর্ত্তমান। কালীর সেবায়েত, হালদার মহাশয়গণের মধ্যে, জ্যেষ্ঠের বংশসম্ভূত কোন ভারপ্রাপ্ত—ব্যক্তি, প্রতিবৎসর স্নানযাত্রা এবং অম্বু-বাচীর শেষ দিনে, উক্ত পদাঙ্গুলির বিধিপূর্ব্বক—স্নান ও অভিষেক কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালের এই পাশ্চাত্য-শিক্ষার দিনে, অনেকে একথা অবিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—যে তাঁহারা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—রক্ষিত, মিশর দেশের "মমির" কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্যই নাই। যাঁহারা বিশ্বাসী হিন্দু, তাঁহারা শুনিয়া রাখুন—দেবী-ভাগবতের মতে, সতীর ছিন্ন-দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ, ভূমিতে পতিত হইবামাত্রই পাষাণত্ব—প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেবীভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে উক্ত আছে—

"ভূমৌ নিপতিতা—যেতুচ্ছায়াঙ্গাবয়বাঃ ক্ষণাৎ
জগ্মুঃপাষাণত্বাং সর্ব্বে লোকানাং হিত হেতবে।"

তন্ত্র-বিশেষের মতে—কালীক্ষেত্র শ্রীপীঠ বা ওংকার পীঠ। কারণ এখানে সতী-পদাঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল। কালীক্ষেত্র এই জন্যই শ্রেষ্ঠ মহাপীঠ। তাহার এ গর্ব্ব আজও খর্ব্ব হয় নাই, এবং যতদিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে ততদিন হইবে না।

সতী-অঙ্গ, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রদ্বারা ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া নানাস্থানে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, খণ্ডিত দেহাংশ হইতে, একান্ন পীঠের উৎপত্তি হইয়াছে। নিগম-কল্পের পীঠমালায় ইহা যথাযথ বর্ণিত আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। মহাদেব স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্তা এবং উত্তর-দাত্রী দেবীভগবতী। *

ইহা হইতেছে তান্ত্রিক হিন্দুর ও তন্ত্র-শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রে, এই কালী

---

* দক্ষিণেশ্বর মারাভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরী।
ধনুরাকার ক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয় সংখ্যকং॥
তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারঃ ক্রোশ মাত্র ব্যবস্থিতঃ।
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মকং॥
মধ্যে চ কালিকাদেবী—মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা।
নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র গঙ্গা বিরাজিতা॥
তত্র ক্ষেত্র-মহাপুণ্যং দেবানামপি দুর্ল্লভং।
কাশী-ক্ষেত্র কালী-ক্ষেত্র অভেদোপি মহেশ্বর॥
কীটোঽপি মরণে মুক্তি, কিং পুনর্ম্মানবাদয়।
ভৈরবী বগলা বিদ্যা (কালী) মাতঙ্গী কমলা তথা।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চণ্ডী চাষ্ট শক্তি বসেৎ সদা॥

ক্ষেত্রকে যে গৌরবান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আজও পর্য্যন্ত কলির এই পূর্ণ রাজত্বে, তাহা সমানভাবেই বর্ত্তমান। আজও ভক্ত হিন্দু-নর-নারী, জগতের এই মাতৃরূপিণী কালিকা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাইলে, ভক্তি ভরে—"মা! মা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। আজও এই অধর্ম্ম—অনাচারের দিনে, অর্দ্ধনাস্তিকতার আমলে, জড়বাদ ও পাশ্চাত্য-দর্শনের পূর্ণ আধিপত্য কালে, অনেক উচ্চ-শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব-স্বরূপ বাঙ্গালী, মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি পুলকিত স্বরে, তাঁহাকে "মা মা" বলিয়া ডাকিয়া, প্রাণের শান্তিলাভ করেন। সুদূর বঙ্গের চারিদিক হইতে, কেবল বঙ্গদেশ কেন—সমগ্র ভারতের সুদূর স্থান সমূহ হইতে, গৃহী-ভক্ত, সপরিবারে এই কালীক্ষেত্রে আসিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন। বিশ্ব-মাতার মন্দিরে না আসে কে? রেল পথের বিস্তার জন্য—দ্রাবিড়, কর্ণাট, ত্রৈলিঙ্গ, উৎকল, মগধ, অযোধ্যা, ইন্দ্র-প্রস্থ, বম্বে, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি সকল স্থানের যাত্রীই—এই মাতৃমন্দিরে পূজা, হোম ও বন্দনার জন্য উপনীত হন। যতি, সন্ন্যাসী, দণ্ডাশ্রমী, সাধু, সাধক, যাঁহারা শক্তিমন্ত্রের উপাসক ও শাক্তধর্ম্মের অনুসারী তাঁহারাই চতুর্ব্বর্গ ফললাভের জন্য, প্রতি পুণ্যদিনে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, প্রথমে আমাদের দেখিতে হইবে, কিরূপে দূরধিগম্য জঙ্গলপূর্ণ প্রদেশ হইতে, এই পীঠস্থান পরিস্ফুট হইয়া ধীরে ধীরে মানবচক্ষে আত্মগৌরব প্রকটিত করিল। কিরূপে, কোন সময়ে, কাহার দ্বারা, প্রথম মন্দির নির্ম্মিত হইল—কিরূপে জঙ্গলময় কালীক্ষেত্র বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইল। এই সমস্ত অন্ধ-তমসাবৃত কালের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করা, বড়ই দুর্ঘট ব্যাপার। আমরা কালীঘাটের প্রথম আবির্ভাব সময়ের সম্বন্ধে এইস্থলে যাহা কিছু বলিব, তাহার অধিকাংশই কিম্বদন্তী-মূলক। সকল কিম্বদন্তীই যে অসার ও ভিত্তিশূন্য, তাহাও বলিতে পারি না। তবে কালগর্ভে বিলয়প্রাপ্ত, অতীত যুগের ইতিহাসগুলি এত বিশৃঙ্খল অবস্থায় রক্ষিত বা একাধারে বিলুপ্ত, যে তাহাদের সহায়তায় কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার ভূতত্ত্ব আলোচনা কালে দেখাইয়াছি, যে নিম্ন-বঙ্গ কখনও বা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, আবার কখনও নদীবাহিত বালু-রাশি পুঞ্জীভূত হওয়ায়, সেই সুগভীর স্থান পূর্ণ হইয়া ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ সমূহের রসাতল-প্রবেশ

গর্ভ হইতে পুনরুত্থানের জন্য যে বহু বহু শতাব্দী লাগিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই রামায়ণের সময়ে যে স্থান কপিলাশ্রম ও তপোবন, মহাভারতীয় সময়ে, তাহা অপরিজ্ঞেয় এবং পৌরাণিক যুগে, তাহা নিবিড় অরণ্যময়।

মহাভারতোক্ত মহারাজ জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, মগধে রাজত্ব করিতেন। পুরাণে এই সহদেব হইতে অজাতশত্রু পর্য্যন্ত পঁচিশ জন রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অজাতশত্রুর সময়ে, বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হয়েন। এই সময়ে উত্তর বঙ্গে, সিংহবাহু বলিয়া এক পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। সিংহ-বাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র—বিজয়সিংহ। বিজয়-সিংহ যৌবনের উদ্দাম-প্রবৃত্তি চালিত হইয়া, প্রজা-পীড়ন আরম্ভ করেন। এজন্য সিংহবাহুর ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ও সভাসদগণ মন্ত্রণা করিয়া রাজকুমার বিজয়সিংহকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন।

ইতিহাসের আখ্যানেই প্রকাশ, রাজকুমার বিজয়সিংহ, সাতশত সঙ্গী লইয়া অর্ণবযানারোহণে ভাগীরথীর বক্ষ বাহিয়া,—দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করেন। ভাগীরথীর মোহানা অতিক্রম করিবার পর, তিনি ভারত-সমুদ্রে গিয়া পড়েন। অনন্যোপায় হইয়া, সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ-রাশি মথিত করিয়া, অশেষ বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি পরিশেষে সিংহলদ্বীপে উপনীত হন। খৃঃ-পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে তিনি সিংহলে পৌঁছিয়াছিলেন। এই বৎসর বুদ্ধদেবও ইহলীলা সাঙ্গ করেন। রাজাদেশে রচিত, সিংহলের ইতিহাসে বিজয়সিংহের বঙ্গত্যাগের ব্যাপার উল্লিখিত আছে। কিন্তু ইহাতে বঙ্গদেশের কোনও নগরের বা তীর্থ-স্থানের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয়, এই সময়ে কালীঘাট ও তৎসংলগ্ন স্থান সমূহ নিবিড় অরণ্যময় ছিল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর, কয়েক শতাব্দীমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়িতে লাগিল। মঠ ও বিহার-প্লাবিত বঙ্গদেশে এবং মগধ-রাজ্যে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব, নবোদিত সূর্য্যকিরণের মত উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অনেক বৌদ্ধমন্দিরে, শিবলিঙ্গ ও শক্তি-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইল। * আবার উজ্জ্বল হোমাগ্নি-শিখা, অনেক দেবমন্দিরে ও গৃহচত্বরে জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণও বৌদ্ধধর্ম্মের অবসন্ন অবস্থা দেখিয়া, সাধারণের নিকট তান্ত্রিক-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

* জল্পাইগুড়ির জল্পেশ্বর মন্দির, ঢাকার ঢাকেশ্বরী, কুচবিহারের বাণেশ্বর ও তমলুকের বর্গ-ভীমা দেবীর মন্দির দেখিলে, তাহা বৌদ্ধ-কীর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। (নব্যভারত—৩৮৮ পৃষ্ঠা)

মগধরাজ্যের উচ্ছেদের পর, পালবংশীয় নৃপতিরা, খৃষ্টের দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। এ সময়ে ভারতের সর্ব্বস্থানেই বৌদ্ধধর্ম্ম হীন-প্রতাপ। "অহিংসা-পরমোধর্ম্ম" এই পবিত্র মূল-নীতি ত্যাগ করিয়া, আবার হিংসামন্ত্রময় বলির রুধির-স্রোতে, কাপালিকের শবসাধনে ও পঞ্চম-কারময় উপাসনায়, দেশ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল।

পালবংশীয় নরপতিগণ, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও—হিন্দুগণকে কোন রূপে উৎপীড়িত ও নিরুৎসাহিত করেন নাই। তাঁহারা অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ, রাজনীতি-জ্ঞানপূর্ণ, অনেক মনীষি ব্রাহ্মণকে তাঁহারা মন্ত্রীত্ব-পদ পর্য্যন্ত প্রদান করেন। ইতিহাসে প্রকাশ—পালবংশীয় দেবপাল, নারায়ণ পাল প্রভৃতি রাজাগণ—শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনেক প্রাচীন গুপ্ত-লিপি ও অনুশাসন-পত্রে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৌদ্ধদিগের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব আবার বাড়িয়া উঠিল। তান্ত্রিক-ধর্ম্ম—নানাস্থানে আধিপত্য প্রকাশ করিতে লাগিল। তন্ত্রাচারী কাপালিকগণ, গভীর অরণ্যমধ্যে শক্তি-সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। পূর্ব্বোক্ত চূড়ামণি-তন্ত্র সেকালের একখানি প্রাচীন তন্ত্র-গ্রন্থ। এই তন্ত্র হইতে প্রমাণ হয়, সে সময়ে কালীঘাট গভীর জঙ্গলাবৃত অবস্থায়, লোক-লোচনের অগোচরে ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমিক অবনতির সহিত, এদেশে শাক্ত-ধর্ম্মের প্রভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং তান্ত্রিকগণও ক্রমশঃ "সিদ্ধ-পীঠ" সমূহের কথা জানিতে পারে।

খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—বল্লালসেন গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে—বল্লালের আমলে, অনেক—নর-নারী পাপমোচন কামনায়, কালীক্ষেত্রে গঙ্গাস্নানে আসিত। গঙ্গাতীরেই এই "কালীক্ষেত্র" ছিল। এই কালীক্ষেত্র ও কালীঘাট যে একই স্থান নয়, তাহাই বা কে বলিতে পারে।

গৌড়েশ্বর-গণের প্রচারিত অনুশাসন-পত্র গুলি হইতে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন। রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য বল্লালসেন সমস্ত বঙ্গদেশকে (১) রাঢ়, (২) বগড়ি, (৩) বরেন্দ্র, (৪) বঙ্গ, (৫) মিথিলা, এই পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া ছিলেন। ভাগিরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ অঞ্চলকে রাঢ়-দেশ বলিত। গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগিরথীর পূর্ব্বাংশ বগড়ি নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গার

উত্তর ও করতোয়ার পশ্চিম, এবং মহানন্দার পূর্ব্বাংশকে বরেন্দ্র, আর করতোয়া ও পদ্মার পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ প্রদেশকে বঙ্গ বলিত। বল্লালী-আমলের এই বগড়ী প্রদেশই আজকালকার প্রেসিডেন্সি-বিভাগ। বল্লালসেন এই বগড়ী অঞ্চলের কিয়দংশ ভূমি, দেবসেবার, জন্য এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ইহার পর হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, কালীঘাটের আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কালীক্ষেত্রদীপিকা হইতে জানিতে পারা যায়—"পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, দিল্লীর পাঠান রাজগণের সময়ে—কালীঘাটের অনতিদূরে, স্থানে স্থানে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। এ সময় কালীঘাটের চতুঃপার্শ্ব—বেত্র, কচুই প্রভৃতি লতা এবং দুশ্ছেদ্য গুল্মাদিময় ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বর্ত্তমান কালীবাটির পূর্ব্বদিকে, ঐ বনের মধ্য দিয়া এক অপ্রশস্ত পথ ছিল। এই পথ, বর্ত্তমান কালের "রসারোড" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। বন-মধ্যস্থ এই অপ্রশস্ত পথ দিয়া, কালী-দর্শনার্থী নাগা ফকির ও সন্ন্যাসীগণ, দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করিত এবং কালীঘাটের কার্য্য শেষ করিয়া, পদব্রজে গঙ্গাসাগরে "কপিলাশ্রমে" পৌছিত। কালীঘাটের দক্ষিণ প্রদেশে—সাগর সন্নিকটে, ছত্র-ভোগে, অম্বুলিঙ্গশিব ও সংকেতমাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈতন্য-ভাগবতেও এই দুই দেবস্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিতা যে প্রশস্ত নদী, এখন সমুদ্র গমনের প্রধান পথ হইয়াছে, তখন তাহা এত প্রশস্ত ছিল না। এই সংকীর্ণ নদী দিয়া, সেই পুরাকালে লোকে তমলুক, হিজলী, উৎকল প্রভৃতি স্থানে নৌকাযোগে যাতায়াত করিত। বর্ত্তমান কালীঘাটের সন্নিকটে, ভাগিরথী ক্রমশঃ ধনুকাকারে বক্র হইয়া, উত্তর-বাহিনী ছিলেন। বর্ত্তমান কালীকুণ্ড-হ্রদ, তখন গঙ্গাগর্ভে অতলস্পর্শ "দহ" বা 'দ" ছিল। *

পীঠ-স্থান বলিয়া পরিচিত হইবার বহুকাল পরেও—কালীঘাট নির্জ্জন

* নকুলেশ্বরের মন্দির হইতে আরম্ভ হইয়া, একটী রাস্তা আজকাল কালীদেবীর মন্দিরের পশ্চাতের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া, ভোগের ঘরের নিকট শেষ হইয়াছে। ভোগের—ঘরের পশ্চাতে এই রাস্তারধারে যে পঙ্কিল পুকুরটী দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই পুরা কালের "কালীকুণ্ড"। এই কালীকুণ্ডের সহিত পূর্ব্বে গঙ্গার সংযোগ ছিল—অথবা ভাগিরথী-স্রোত এই কালীকুণ্ড পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইত। চারি পাঁচশত বৎসরের মধ্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখিবেন—অতীত কালের গঙ্গাগর্ভস্থ কালীকুণ্ড—তীর হইতে বর্ত্তমানের আদিগঙ্গা কতদূরে সরিয়া আসিয়াছেন। জনপ্রবাদ এই, কালীকুণ্ড তীরেই সতীর প্রস্তরবৎ পদাঙ্গুলী পাওয়া যায়। পরে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলা হইবে।

শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য-গর্ভে, অজ্ঞাত অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল। জন-প্রবাদ এই—ভীমকায় ভৈরব ও বামাচারী কাপালিকগণ এই নির্জ্জন বন-প্রদেশস্থ কালীর পর্ণ-মন্দিরের নিকটে—জঙ্গল মধ্যে বসিয়া, বীরাচার-সম্মত উপাসনা করিত। নরবলি দিয়া ভগবতীর নৃ-কপালময় খর্পরকে রুধিরস্রোতে পূর্ণ করিত। গভীর নিশীথে তাহাদের কঠোর কণ্ঠ-নিঃসৃত ভীষণ-মন্ত্রনাদে, সেই নির্জ্জন বনস্থলী—বিকম্পিত হইয়া উঠিত। তন্ত্রাচার-সমন্বিত, উজ্জ্বল হোমাগ্নি-শিখার গর্জ্জনে,—সেই স্থান, ভীম কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিত।

আদিশূর হইতে বল্লাল-সেনের রাজত্বকালের মধ্যে, বঙ্গদেশের নানাস্থান জনপূর্ণ হইতে লাগিল। কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণ ও তদনুচর ক্ষত্রিয়গণের বংশধরেরা বঙ্গের নানাস্থানে বাস করিতে লাগি লেন। এই সময়ে বগড়ী অঞ্চলেও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর ও গ্রাম দেখা দিল। শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী জনগণের সংখ্যা-প্রাবল্য জন্য, অনেক অংশের বন-জঙ্গল কর্ত্তিত হইয়া, স্থানে স্থানে দেব-মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বীরাচারী কাপালিকগণও ক্রমশঃ এই সকল জনপূর্ণ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া, গভীরতম বনে প্রবেশ করিল।

দক্ষিণ-বঙ্গ বা বগড়ীর নানাস্থানে জঙ্গল কাটিয়া, লোকালয় নির্ম্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গদেশে শিব ও শক্তি-মন্দির প্রতিষ্ঠার ধূম পড়িয়া গেল। অবস্থাপন্ন শাক্তগণ, দশ-মহাবিদ্যার মধ্যে যিনি যে দেবীর উপাসক, তিনি তদনুরূপ মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। ভাগিরথী, সরস্বতী প্রভৃতি নদী-তীরে, অসংখ্য দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক বৌদ্ধমন্দিরও শিব ও শক্তি-মন্দিরে পরিণত হইয়া গেল। চৈতন্য-দেবের সময় পর্য্যন্ত কেবল কালীক্ষেত্রের নামোল্লেখ ভিন্ন, আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য প্রাদুর্ভূত হয়েন। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে, শ্রীচৈতন্যদেবের উৎকল হইতে প্রত্যাগমন বর্ণনার মধ্যে, বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তরাংশে পানিহাটী ও কালীঘাটের দক্ষিণ দিকে ছত্রভোগ প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের কথা কোনরূপ বিশেষভাবে উল্লিখিত না হওয়ায়, স্পষ্টই বোধ হইতেছে—পঞ্চদশ শতাব্দীর বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বৈষ্ণবলেখকগণ, সম্প্রদায়-গত বিদ্বেষবশে হউক, কিম্বা কালীঘাটের কথা সাধারণের অজানিত থাকার জন্যই হউক, তাহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই।

মহানীল-তন্ত্রে "কালীঘাটে গুহ্যকালী" বলিয়া এক দেবীর নামোল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকে, এই "গুহ্য-কালীর" পূজার্চ্চনাদি করিত। এতদ্ব্যতীত আচার-নির্গম-তন্ত্র, মহালিঙ্গ-তন্ত্র, চূড়ামণিতন্ত্র প্রভৃতি কয়েক-খানি গ্রন্থেও কালীঘাটের নামোল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই তন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে রচিত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৫৪৫ খ্রীঃঅব্দে রচিত চণ্ডীকাব্যে—গঙ্গাতীরের যে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাতে কালীঘাটের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে, ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

ত্বরায় বহিছে তরি, তিলেক না রয়
চিৎপুর, শালিখা সে এড়াইয়া যায়।
কলিকাতা এড়াইল, বেনিয়ার বালা
বেতড়েতে উত্তরিল, অবসান বেলা।
ডাহিনে ছাড়িয়া যায়, হিজলীর পথ
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত।
বালুঘাট এড়াইল, বেণের নন্দন,
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা, দিল দরশন।

অনেকে অনুমান করেন, সে সময়ে, কলিকাতা গভীর বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং এ রচনা মুকুন্দ-রামের নহে, তাঁহার চণ্ডী-কাব্য মধ্যে, অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাহাই হউক না কেন, কালীঘাট যে পঞ্চদশ শতাব্দীর পরেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। কলিকাতায় সে সময়ে আর একটী কালীমন্দির বর্ত্তমান ছিল। ইহা বর্ত্তমান কালের "চিত্রেশ্বরীর" মন্দির। এই চিত্রেশ্বরী হইতেই "চিৎপুর" নামকরণ হইয়াছে। কোন্ সময়ে, কোন্ ব্যক্তি, এই চিত্রেশ্বরীর স্থাপনা করেন,—তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতি এই, এই কালী-প্রতিমা "চিতে" নামক দস্যুদল-পতি দ্বারা স্থাপিত। সেকালের ডাকাতেরা কালীর পূজা না করিয়া, কোন স্থানে ডাকাতি করিতে যাইত না। সে ভীষণ সময়ে, জলে স্থলে ডাকাতি চলিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, সর্ব্বাগ্রে এই মন্দির গঙ্গাতীরে জঙ্গলমধ্যে ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে গঙ্গার কূল ভরাট হইয়া পড়ায়, ইহা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই চিত্রেশ্বরীর মন্দিরেই ডাকাতেরা নরবলি দিত। গঙ্গাতীরস্থ বিজন অরণ্যমধ্যে এই মন্দির স্থাপিত ছিল। এই

চিত্রেশ্বরী ও কালীঘাটের কালী ব্যতীত, আর কোন বিখ্যাত কালীমন্দিরই তখন এদেশে ছিল না। কিন্তু কালীঘাট পীঠস্থান ছিল বলিয়া, পুরাতন গ্রন্থাদিতে ইহারই নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত "দিগ্বিজয়-প্রকাশ" গ্রন্থ, যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে লিখিত। দিগ্বিজয়-প্রকাশে গোবিন্দপুরের নামকরণ সম্বন্ধে, কয়েকটী ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম— "হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরভূমির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। গঙ্গার পূর্ব্বপারে কালীদেবীর সন্নিকটে চারি সহস্র কল্যব্দে গোবিন্দ-দত্ত নামক একজন রাজা, গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা উদ্দেশে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থ-কার্য্য সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসেন, সেই সময়ে কালী দেবী নৌকামধ্যে তাঁহাকে এইরূপ স্বপ্নদান করেন—"তুমি আমার আজ্ঞায় অকর্ষণ-পুরীতে (অর্থাৎ যেখানে ভূমি কর্ষিত হয় নাই) তৃণগুল্মাদি পরিষ্কার করিয়া একটী মহাগ্রাম স্থাপন কর। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।" দেবীর আদেশ অবগত হইয়া, রাজা, পারীন্দ্রগ্রাম (?) হইতে নানাবিধ ধনরত্ন আনয়ন করিয়া, সুরধনীতটে বসবাস করিলেন। গোবিন্দ-দত্ত স্বপ্নকালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে একখানি স্কন্ধদ্বয় যুক্ত লাঙ্গল দেখিয়াছিলেন। ঐ লাঙ্গল সহায়তায় দেবীর আদেশে তথাকার ভূমি খনন করিয়া, প্রভূত অর্থ পাইয়াছিলেন * এবং ঐ অর্থ হইতে চতুঃষষ্টি বলি এবং হোম-যজ্ঞাদি দ্বারা দেবীর পূজা করেন। ধন-ধান্য ও বংশবলের বৃদ্ধি প্রযুক্ত, তিনি ঐ স্থানের বর্দ্ধিষ্ণু লোক হইয়াছিলেন। এইরূপ অচিন্তিত ঐশ্বর্য্যলাভে তিনি পুরীর শ্রীবৃদ্ধি ও বাসের জন্য বাস্তযাগ করাইয়াছিলেন।" কবিরামের উল্লিখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণ হইতেছে—বনজঙ্গলময় স্থান পরিষ্কৃত হইয়া, গোবিন্দপুরাখ্য নূতন গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। গোবিন্দ দত্ত নামক একজন রাজা—কালীঘাটেরও একটু উন্নতি করেন। এইজন্য অনেকের অনুমান এই, গোবিন্দ দত্ত হইতেই গোবিন্দপুর

---

* ইদানীং নৃপশার্দ্দূল চরভূমৌ কথা শৃণু
কালীদেব্যাঃ সন্নিধৌচ গঙ্গায়াং প্রাচ্যকে তটে। (১০৫২)
গোবিন্দদত্তো রাজা চ কলিবেদাব্দসহস্রকে
সিন্ধুসঙ্গমতীর্থযাত্রাকরণার্থং সমাগতঃ। (১০৫৩)
গোবিন্দদত্ত ভূপালং, তীর্থাৎ প্রত্যাগতং শুভম্
কালীদেবী স্বপ্নছলে নৌকায়ামুবাচ হ। (১০৫৪)

নাম হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার ইতিবৃত্ত লেখক ষ্টার্ণডেলসাহেব বলেন, "গোবিন্দরাম মিত্র হইতে গোবিন্দপুর নাম হইয়াছে।" আবার অন্যদিকে কলিকাতার আদিম অধিবাসী শেঠ ও বসুকেরা বলেন—তাঁহাদের গৃহ-দেবতা গোবিন্দজীর নাম হইতেই গোবিন্দপুর নাম-করণ হইয়াছে। গোবিন্দপুর নাম-করণ যে জন্যই হউক না কেন—কবিরামের লিখিত কাহিনী হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়—যে গঙ্গাসাগর যাত্রী রাজা গোবিন্দ-দত্ত সেই ইতিহাস-বর্জ্জিত পুরাকালে জঙ্গল কাটাইয়া, কালীর স্বপ্নাদেশে কালী-ক্ষেত্রের একটু উন্নতি করিয়াছিলেন।

তান্ত্রিক-ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের সহিত, কালীক্ষেত্রের মহিমা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছিল। বল্লালসেনের সময় হইতে তান্ত্রিক-ধর্ম্ম, ক্রমোন্নতি লাভ করিতে থাকে। হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" হইতেই ইহার-পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টের সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—তান্ত্রিক ধর্ম্ম, যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এই সময়টাকে তান্ত্রিক-যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালার অবস্থা আলোচনার সহিত আমরা দেখাইব, কি করিয়া শাক্তধর্ম্ম, বঙ্গদেশে এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

অকর্ষণী পুরীং রাজন আগচ্ছ হি মমাজ্ঞতঃ
যাদর-রসা-পৃথিব্যাঞ্চ ছেদয়িত্বা তৃণাদিকম্। ১০৫৫
* * * *
কালীদেব্যা বচো জ্ঞাত্বা গঙ্গায়াশ্চ তটান্তরে
বসতিং ভূয়সীং তত্র চকার হি মুদান্বিতঃ। ১০৫৭
পারীন্দ্রগ্রামাৎ সর্ব্বাণি দ্রবিণানি মহীপতিঃ
আনয়িত্বা চ বসতিং কৃতবান্ সুরসরিত্তটে। ১০৫৮
লাঙ্গুলী দিব্যযুক্তঃ দেব্যা পৃষ্ঠে চ বর্ত্ততে
যদাদেশেন তন্মুলে........................ (১০৫৯
প্রাপ্তা তেনৈব ভূপেন মৃত্তিকাভ্যান্তরে নিশি
কাঞ্চনকর্ষপূরিতাশ্চালভ্যা দেবাসুরৈরপি। (১০৬০)
ভূরীণি দ্রবিণান্যেব প্রাপ্য গোবিন্দ ভূপতিঃ
চতুঃষষ্ঠী সংখ্যাকৈশ্চ বলিভিঃ পূজনং কৃতম্। (১০৬১)
গোত্রবৃদ্ধা বিত্তবৃদ্ধা তেজোবৃদ্ধা হি ভূমিপ
বভূব গোবিন্দদত্তো বর্দ্ধিষ্ণপ্রবরো মহান্। (১০৬২)
ভাগীরথী পূর্ব্বতটে পুরীবর্দ্ধনহেতবে
ব্রাহ্মণাগং দ্বিজান্ নীত্বা চকার বাসহেতবে। (১০৬৩)
বিশ্বকোষোদ্ধৃত, কবিরামের দিগ্বিজয়—প্রকাশ।

তৃতীয় অধ্যায়।

বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিক—তাঁহাদের নাম,—দ্বাদশ-ভৌমিকের আবির্ভাবের পূর্ব্বের কথা—বঙ্গে পাঠান-রাজত্বের অবসান—মোগল কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়—বাঙ্গলার পাঠান অধীশ্বর সুলেমান—শেষ-পাঠান নরপতি দায়ুদখাঁ—গৌড়ের রাজসভায় বাঙ্গালীর আধিপত্য—প্রতাপাদিত্যের পিতামহ রামচন্দ্রগুহ—সপ্তগ্রাম হইতে রামচন্দ্রের পলায়ন—গৌড়েশ্বর সুলেমানের মন্ত্রীত্ব লাভ—শেষ পাঠান-রাজা দায়ুদখাঁর অধীনে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের গৌড়ের মন্ত্রীত্ব—মোগল পাঠানে যুদ্ধ—গৌড়েশ্বর দায়ুদের উড়িষ্যায় পলায়ন—মুনাইম খাঁর মৃত্যু—মজঃফর কর্তৃক সুলতান দায়ুদের হত্যা—বঙ্গে পাঠান-রাজত্বের শেষ—বিক্রমাদিত্য কর্তৃক যশোর প্রতিষ্ঠা—রাজা টোডরমলের বঙ্গদেশে আগমন—বঙ্গে শান্তি স্থাপন।—প্রতাপাদিত্য—চাঁদরায় কেদাররায়—মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমন—কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ব্ব পরিচয়—কালীক্ষেত্রে অবস্থান—দেবীর পদাঙ্গুলি সম্বন্ধে অদ্ভুত ঘটনা—কামদেবের ব্রহ্মচারিত্ব-গ্রহণ—কাশীতে মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ—মানসিংহের শিষ্যত্ব স্বীকার। মানসিংহ কর্তৃক দ্বাদশ-ভৌমিকের উচ্ছেদ। প্রতাপাদিত্য ও কেদাররায়ের পতন—কামদেব ব্রহ্মচারীর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান—মানসিংহকর্তৃক গুরু-দক্ষিণা দান—কালীঘাটের প্রথম প্রতিষ্ঠা—কামদেবের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র লক্ষ্মীকান্তের মজুমদার উপাধি ও জমীদারী লাভ। বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী বংশ।

বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকগণ ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চার করিয়া, নির্জীব বঙ্গদেশে এক মহাশক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই শক্তির দমনের জন্যই, মহারাজ মানসিংহকে বঙ্গদেশে আসিতে হয়। বহুদিনব্যাপী যুদ্ধের পর মানসিংহ বঙ্গের দ্বাদশভৌমিক দিগকে দমন করিতে সমর্থ হন। বঙ্গে দ্বাদশ-ভৌমিকের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, আরও কতকগুলি আবশ্যকীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা না জানিলে, সে সময়ের অবস্থা বুঝিবার কোন উপায়ই নাই।

এই দ্বাদশ-ভৌমিকাধিকৃত বঙ্গদেশকে, সেই সময়ে "বারো-ভাটী" বাঙ্গলা বলিত। সে কয়জন প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার; রাজা উপাধি

ধারণ করিয়া, মোগল রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহা-দের তালিকা দিলাম।

(১) যশোহরেশ্বর—প্রতাপাদিত্য।
(২) বিক্রমপুরাধিপতি—চাঁদরায় ও কেদাররায়।
(৩) চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পরায় ও রামচন্দ্র রায়।
(৪) ভুলুয়ার—লক্ষণমাণিক্য।
(৫) ভূষণার—মুকুন্দ রায়।
(৬) সাতৈলের—রামকৃষ্ণ।
(৭) চাঁদপ্রতাপের—চাঁদগাজি।
(৮) ভাওয়ালের—ফজলগাজি।
(৯) খিজিরপুরের—ঈশাখাঁ মস্‌নদী।
(১০) তাহেরপুরের—কংশনারায়ণ।
(১১) দিনাজপুরের—গণেশরায়।
(১২) পুর্ণিয়ার—রাজা (নাম অজানিত)।

এই দ্বাদশজন ভৌমিকের মধ্যে, যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য, * ও শ্রীপুর—বিক্রমপুরাধিপতি রাজা চাঁদরায় কেদাররায়কে দমন করিবার জন্য, মানসিংহকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এই জন্য প্রতাপাদিত্য ও কেদাররায় সম্বন্ধে আমরা একটু বিশদ বিবরণ প্রদান করিব।

প্রতাপাদিত্য, সুন্দর-বনের অন্তবর্ত্তী যশোর নগরীর অধীশ্বর। কি করিয়া প্রতাপাদিত্য যশোর-নগরে স্বাধীন-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা বলিবার পূর্ব্বে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের একটু বিশেষ পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন।

কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে—মহাকবি শ্রীহর্ষের সঙ্গে, অগ্নিকুলোদ্ভব বিরাট-গুহ, ভৃত্য রূপে এদেশে আসেন। শ্রীহর্ষ মহাদার্শনিক ও শ্রেষ্ঠ-কবি ছিলেন। ইনিই বঙ্গের মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-গণের আদি পুরুষ। বিরাট-গুহও সেইরূপ বঙ্গের গুহ-বংশীয়দের আদি পুরুষ। এই বিরাট হইতে একাদশ পুরুষ অধঃস্তন, রামচন্দ্র নিয়োগী নামক এক দরিদ্র কায়স্থ, পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত বাকলাতে বাস করিতেন।

---

* প্রতাপাদিত্য-চরিত্র-লেখক—শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে, সাতৈলের রামকৃষ্ণের নাম নাই। কিন্তু বিষ্ণুপুরের হাম্বীর-মল্লের নাম আছে। যাহাই হউক না কেন, মাত্র দ্বাদশজন ভৌমিকই সেই সময়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র দরিদ্রের সন্তান। চাকরী-বাকরী না করিলে আর দিন চলে না দেখিয়া, ভাগ্য-পরিবর্ত্তন জন্য, তিনি সপ্তগ্রামে আগমন করেন। রামচন্দ্র সাহসী, কার্য্যক্ষম, পরিশ্রম-সহিষ্ণু ছিলেন। শ্রীকান্ত ঘোষ নামক তাঁহার স্বদেশীয় একজন লোক, সেই সময়ে সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। রামচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া, এই শ্রীকান্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সপ্তগ্রামের অবস্থা তখন বড়ই উন্নত। সপ্তগ্রাম—সে সময়ে একটী প্রধান নগর ও বন্দর। এই সপ্তগ্রামের পার্শ্ববাহিনী সরস্বতী নদী, তখন এরূপ বিশীর্ণ-কায়া ছিলেন না। সপ্তগ্রাম তখন মোগল-সরকারের একটী প্রধান সরকার বা বিভাগ ছিল। সরস্বতীর—প্রচণ্ড তরঙ্গময়ী সলিল-রাশির উপর নৃত্য করিতে করিতে, শত শত বাণিজ্য-পোত সপ্তগ্রাম বন্দরে গিয়া নঙ্গর করিত। এক কথায় সপ্তগ্রাম সেই সময়ে ধনধান্য-পূর্ণা, সৌধ-সম্পদময়ী জনপূর্ণ রাজধানী ছিল। মোগল ও পাঠান সুবাদারেরা এই স্থানে বাস করিতেন। পর্টুগীজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদের, সুবৃহৎ অর্ণব-পোতসমূহ, এই সপ্তগ্রামের বন্দর হইতে নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার লইয়া, ইউরোপের নানা দেশের বন্দরে বিক্রয় করিত।

রামচন্দ্র, শ্রীকান্তঘোষের আশ্রয়ে থাকিয়া, চাকুরীর দ্বারা নিজের অবস্থার একটু উন্নতি করিলেন। শ্রীকান্তও—রামচন্দ্রকে সাহসী, বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র দেখিয়া, তাঁহার জামাতা-পদে বরণ করেন। রামচন্দ্র, সপ্তগ্রাম সরকারে কানুনগোর দপ্তরে মুহরীর কাজ করিতেন। তখন এ সমস্ত কাজে বেশ দু'পয়সা সংস্থান হইত।

ইহার পর রামচন্দ্রের ভবানন্দ বলিয়া এক পুত্র জন্মে। ভবানন্দের পর শিবানন্দ ও গুণানন্দ বলিয়া আর দুই পুত্র হয়। সপ্তগ্রামে এই সময়ে রামচন্দ্রের ভাগ্যলক্ষ্মী বড়ই চঞ্চলা হইলেন। পুরাতন শাসনকর্ত্তার সহিত রামচন্দ্রের বেশ সদ্ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহার পরে, যিনি সুবেদার হইয়া আসিলেন, তাঁহার সহিত রামচন্দ্রের আদৌ বনিবনাও হইল না। রামচন্দ্র উপায়ান্তর না দেখিয়া, বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়-নগরীতে ভাগ্যপরীক্ষার্থে আগমন করেন।

গৌড়ে, তখন সের-সাহের বংশধরগণের হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত-প্রায়। সুলেমান কররানী ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সুলেমান সুচতুর, সাহসী, ন্যায়নিষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি গুণের মর্য্যাদা জানিতেন, জ্ঞানীর সমাদর করিতেন। তাঁহার আমলে, সমগ্র বঙ্গদেশ

আবার শান্তিময় হইয়াছিল। বুদ্ধিমান সুলেমান, দিল্লীতে প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া, সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মোগল-সরকারে নিয়মিত রূপে রাজস্ব প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

বাদসাহকে হস্তগত করিয়া, সুলেমান বঙ্গের আভ্যন্তরিণ শাসন এবং বাণিজ্য-কার্য্যের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিলেন। ভাগ্যক্রমে, রামচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই রাজ-সরকারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুলেমান তাঁহার গুণের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া—তাঁহাকে মন্ত্রীপদ প্রদান করেন।

গৌড়নগরে আসিয়া, রামচন্দ্রের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইল। এই সময়ে তিনি সপ্তগ্রাম হইতে, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণকে গৌড়ে আনাইলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ভবানন্দের তিনি ইতিপূর্ব্বেই বিবাহ দিয়াছিলেন। গৌড়ে—এই উন্নতির সময়, রামচন্দ্র পৌত্রমুখ দেখিলেন। পৌত্রের নাম হইল—শ্রীহরি। পরে এই শ্রীহরিই, বিক্রমাদিত্য নামে ইতিহাসে পরিচিত হন।

রামচন্দ্র, তাঁহার অবস্থার এই মহা-উন্নতির দিনে, আত্মীয়-বন্ধু-বর্গকে ভুলিলেন না। যে যেখানে আপনার লোক ছিল—তাহাদের সন্ধান করিয়া আনিয়া, গৌড়ের রাজসরকারে চাকরী করিয়া দিলেন। পুত্রগণকেও তিনি পারসী ও সংস্কৃত ভাষা শিখাইয়াছিলেন। তাহারাও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

সম্রাটের সহিত সন্ধি-বন্ধন ও বন্ধুত্ব করিয়াও, সুলেমান নিরাপদ হইতে পারিলেন না। উড়িষ্যার অধিপতি, গঙ্গাবংশীয় মহারাজ মুকুন্দদেব, ইতিপূর্ব্বে গৌড়-অবরোধ, সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন প্রভৃতি ব্যাপারে, বঙ্গের মুসলমান নরপতিগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুলেমান—দেখিলেন, উড়িষ্যার এই পরাক্রান্ত হিন্দু-রাজাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে না পারিলে, তাঁহার কোন শ্রেয়ঃই নাই। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণের জন্য, একদল সেনা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু গৌড়েশ্বরের সেনাগণ, উড়িষ্যার হিন্দুরাজার অমিত তেজবলে—সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। হায়! যে উড়িষ্যা-বাসীকে আজ আমরা এত হীন ও নির্ব্বীর্য্য বলিয়া ঘৃণা করি, সেই উড়িষ্যা দেশেরই একজন রাজা—বহুবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া তাহাকে মুসলমান শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হিন্দুগণের হস্তে পরাজয় বার্ত্তা শুনিয়া, সুলেমান বড়ই মর্ম্মব্যথা পাইলেন। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে অনেকেই উড়িষ্যায় যুদ্ধ-যাত্রা করিতে অনিচ্ছুক। এই সময়ে, মুসলমান ধর্ম্মে নব-দীক্ষিত এক ব্রাহ্মণ

সন্তান, গৌড়েশ্বরের নিকট, উড়িষ্যায় যুদ্ধ-যাত্রার অনুমতি চাহিলেন। সুলতান, সানন্দ চিত্তে তাঁহাকে উপঢৌকন ও খেলাতাদি প্রদান করিয়া সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। এই ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার, এক মুসলমান রমণীর সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ হইয়া—স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছিল। পাঠক ইহাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়। কালাপাহাড় বিপুল উদ্যমে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া, তথাকার দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া, নগর গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া, উড়িষ্যা বিজয় করেন। *

রামচন্দ্র এই সময়ে সাংসারিক উন্নতির সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মনুষ্য-জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ সুখ, যাহা কিছু স্পৃহনীয়, সবই তাঁহার হইয়াছিল। উচ্চ রাজপদ, অতুল ঐশ্বর্য্য, পুত্র-পৌত্র-ধন-ধান্যাদি পূর্ণ সংসার। কিন্তু ইহকালের সুখের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া, নিয়তি বশে রামচন্দ্র—ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ভবানন্দ মহা সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন।

বঙ্গেশ্বর সুলেমান, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পরও—তাঁহার পুত্রগণকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দ, তাঁহার অতি প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিলেন।

সুলেমান সাহের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ বৈজিয়দ—কনিষ্ঠ দায়ুদ। এই দুই রাজকুমারের সহিত, ভবানন্দ পুত্র শ্রীহরি ও শিবানন্দ পুত্র জানকীবল্লভের বড়ই বন্ধুত্ব হইল। বাল্যকালের বন্ধুত্ব, অতি মধুর ও অকৃত্রিম। সাহজাদাগণ—শ্রীহরি ও জানকীবল্লভের সহিত দিবসের অধিকাংশ সময় থাকিতেন। একত্রে অধ্যয়ন, মল্লক্রীড়া, অশ্বারোহণ, অস্ত্রশিক্ষা—প্রভৃতিতে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির একটা দুশ্ছেদ্য বন্ধন আঁটিয়া গেল। বিশেষতঃ সাহাজাদা দাউদ, উহাঁদের উপর এত অনুরক্ত ছিলেন, যে এক সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"আমি যদি কখনও রাজা হই, তাহা হইলে তোমাদের দুই ভাইকে মন্ত্রী করিব।"

১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গেশ্বর সুলেমান ইহ-লীলা সম্বরণ করেন। জ্যেষ্ঠ

* উড়িষ্যায় এখনও এই কালাপাহাড়ের কীর্ত্তিসূচক একটা ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়।

আইল কালাপাহাড়
ভাঙ্গিল লোহার বাড়,
খাইল মহানদী পানি
স্বর্ণ খাজিরে হেড়া পরশস্তি মুকুন্দরাণী।

রাজকুমার বৈজিয়দ, সিংহাসনে বসিলেন বটে, কিন্তু তিনি বহুদিন রাজত্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহার এক ভগ্নিপতি, গুপ্ত-হত্যার দ্বারা তাঁহার জীবলীলা শেষ করিয়া দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, কনিষ্ঠ রাজকুমার দায়ুদ গৌড়ের রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন।

দায়ুদ—গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে, ভবানন্দের পুত্র ও ভ্রাতঃপুত্রকে তাঁহার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। ভবানন্দ-পুত্র, শ্রীহরির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া হইল—বিক্রমাদিত্য। আর শিবানন্দের পুত্রের নাম—বসন্তরায় হইল।

বঙ্গেশ্বর দায়ুদ, পিতার ন্যায় উন্নত চরিত্রের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালের প্রথমাংশে, বঙ্গদেশের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। প্রজাগণ ধনধান্য-পূর্ণ-ভাণ্ডার ও পরিজন-বর্গ লইয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দে নিরাপদে কাল কাটাইতে লাগিল। দায়ুদ হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজাকেই সমান চক্ষে দেখিয়া প্রজাবর্গের সম্মান-ভাজন হইয়া উঠিলেন।

ভবানন্দের সুব্যবস্থার গুণে—রাজকোষে প্রচুর অর্থ জমিল। অনুরক্ত প্রজাবর্গ, প্রচুর ধনপূর্ণ রাজভাণ্ডার—অগণ্য সৈন্যরাজি দেখিয়া—বঙ্গেশ্বর দায়ুদ, মনে মনে গর্ব্বস্ফীত হইতে লাগিলেন। * তাঁহার পিতা মোগল-বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া যে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহা ক্ষালন করিতে মনস্থ করিলেন।

মন্ত্রীবর্গকে—নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলায়, অনেকে তাহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু দায়ুদের অধীনে কয়েকজন পরাক্রান্ত পাঠান-সেনানী ছিল। পাঠানেরা মোগলের চিরশত্রু। লুণ্ঠতরাজ যুদ্ধ-বিগ্রহ পাইলেই তাহারা সুখে থাকে। তাহারা এই সুযোগে—দায়ুদকে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। দায়ুদও—মোগলের অধীনতা-পাশ-ছিন্ন করিবার জন্য, সেনাগণকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন।

সুচতুর ভবানন্দ দেখিলেন—তাঁহার সুখ—সৌভাগ্যের অবস্থা যে আর বেশী দিন থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। কারণ প্রবল প্রতাপ সম্রাট আকবর সাহের সহিত যুদ্ধে, দায়ুদকে নিশ্চয়ই পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে। তখন আর তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না।

* প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন—সর্ব্ব-প্রকার অস্ত্র-শোভিত দুই লক্ষ সৈন্য, দায়ুদের আজ্ঞাধীন হইয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার বিংশতি সহস্র কামান, নৌসেনাও প্রচুর ছিল।

ভবানন্দ মনে মনে স্থির করিলেন—"গৌড় ছাড়িয়া, এমন এক স্থানে বাস-স্থান নির্ম্মাণ করিতে হইবে—যেখানে শত্রুগণ হইতে আমাদের কোন আশঙ্কাই থাকিবে না।" ভ্রাতৃগণ সকলেই একমত হইলে, ভবানন্দ গুপ্তভাবে—এই প্রকার আশ্রয়স্থান সন্ধানের জন্য, কয়েকজন বিশ্বাসী লোককে নানাদিকে প্রেরণ করিলেন। স্থান-নির্ব্বাচনের জন্য ভবানন্দ যাহাদের দূরতর স্থানে—প্রেরণ করিয়াছিলেন, একমাস পরে তাহাদের সকলেই ফিরিয়া আসিয়া, পরিদৃষ্ট স্থানসমূহের বিবরণ তাঁহার কর্ণ-গোচর করিল। যে ব্যক্তি দক্ষিণ প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল—তাহার বর্ণিত স্থানটীই, ভবানন্দের বিশেষ মনোনীত হইল। সে স্থানের নাম যশোর। পূর্ব্বে এ স্থান, চাঁদ—খাঁ মুসন্দরী নামক এক মুসলমান জাইগীরদারের জমীদারী ছিল। কিন্তু তিনি ফৌত হওয়ায়, আর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, তাহা তখন রাজসরকারের অধীন। ভবানন্দ—বঙ্গেশ্বর দায়ূদের নিকট প্রার্থনা করিয়া, যশোরের জমীদারীটি নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া লইলেন।

এই নব-নির্ব্বাচিত স্থানে, জঙ্গল কাটিয়া নগর বসাইতে হইবে। যশোর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ, ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ। চারিদিকেই হিংস্র-শ্বাপদগণের বিচরণ-ক্ষেত্র। নদীর মধ্যে হাঙ্গর ও কুম্ভীর যথেষ্ট। এই জঙ্গল কাটাইয়া, ভবানন্দ প্রচুর অর্থব্যয়ে, যশোর-নগরীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রচিত, স্বর্গীয় রাম-রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিতে এই জঙ্গল কাটাইবার একটী বর্ণনা আছে। তাহা আমরা এস্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"সেস্থানে লোক পাঠাইয়া (ভবানন্দ) দরবস্ত জঙ্গলসমূহ কাটাইলেন। নদী-নালার নিকট স্থানে স্থানে পুলবন্দী করাইয়া, রাস্তার নমুদ করিলেন। পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ-প্রস্থ, এমন দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্যস্থলে চারিদিকে ক্রোশাধিক আয়তন গড় কাটাইয়া, পুরীর আরম্ভ হইল। সদর মফঃস্বল ক্রমে, তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া, দিব্য ব্যবস্থিত পুরী প্রস্তুত হইল। চতুঃপার্শ্বে গোলা, গঞ্জ, সহর, বাজার, নগর, চাতর ও বাগ-বাগিচা। এই মতে সেই স্থান অতি শোভান্বিত। দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল।" * ভবানন্দ গৌড়ের, রাজসরকারে চাকরী

* প্রতাপাদিত্য চরিত। ২১ পৃঃ।

করিয়া প্রচুর ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তি-রক্ষার জন্য যশোরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রহিলেন। শিবানন্দ, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়, গৌড়-নগরে রাজদরবারে চাকরী করিতে লাগিলেন।

মোগল-পাঠানে অবশেষে যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধ বাধাইবার মূল—স্বয়ং বঙ্গেশ্বর দায়ুদ। অমিত বলদর্পিত হইয়া, তিনি মোগল-রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। এই সংবাদ, আকবর-সাহের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা—মুনাইম খাঁকে, প্রচুর সৈন্য সমেত, দায়ুদের দমনার্থে প্রেরণ করিলেন।

বঙ্গেশ্বর দায়ুদের সহিত, মুনাইম-খাঁর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা এস্থলে সম্ভবপর নহে। তবে—মুনাইম-খাঁ হাজিপুর ও পাটনার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, দায়ুদের পাঠান-সেনা এবং তাঁহার সেনাপতিগণকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে যে সমস্ত পাঠান নিহত হইয়াছিল, তাহাদের ছিন্ন-মস্তক, কয়েকখানি সুবৃহৎ নৌকা পরিপূর্ণ করিয়া, মুনাইমখাঁ দায়ুদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া দায়ুদ বুঝিলেন—মোগলের সহিত ইচ্ছা করিয়া বিবাদ বাধাইয়া, তিনি সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। মোগলসৈন্য, ধীর-পদে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে—শুনিয়া, তিনি উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। কালাপাহাড় প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাপতিরা, কুচবিহারের দিকে পলাইল। গৌড়ত্যাগ করিয়া পলাইবার পূর্ব্বে—বঙ্গেশ্বর দায়ুদ—বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত-রায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাল্যাবধি আমরা বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। আমি তোমাদের দুইজনকে প্রকৃত মিত্র বলিয়া ভাবি। যদি কখনও আবার গৌড়ের সিংহাসন উদ্ধার করিতে পারি, রাজ্য ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে তোমাদের স্মরণ করিব। আমার যাহা কিছু বহু-মূল্য ধনরত্নাদি গৌড়ে আছে, তাহা তোমরা লইয়া যাও। তদ্ভিন্ন সেগুলি রক্ষার আর কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না।" ইহার পর সহস্রাধিক বৃহৎ নৌকায় বোঝাই হইয়া গৌড়েশ্বরের সমস্ত সম্পত্তি, যশোরের রাজ-ভাণ্ডারে গিয়া পৌঁছিল।

মুনাইম-খাঁও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া, দায়ুদ-সৈন্যকে আক্রমণ করেন। দায়ুদ নিরুপায় হইয়া অগত্যা সন্ধি-প্রার্থনা করিলে—মুনাইম-খাঁ তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন।

বঙ্গদেশে, বহুদিন অবস্থান করায় ও ক্রমাগতঃ যুদ্ধ-কার্য্যের কঠোর পরিশ্রমে, মুনাইমখাঁর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিল। তিনি বাঙ্গলার কোমল মৃত্তিকার মধ্যে

সমাধিস্থ হইলেন। দায়ুদ—মুনাইম-খাঁর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া, পুনরায় সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিয়া, মোগল-দিগকে আক্রমণ করিলেন। বিজয়ী দায়ুদ, মোগলদিগকে আকমহল (বর্ত্তমান রাজমহল) হইতে তাড়াইয়া দিয়া, আকমহল-দুর্গ দখল করিলেন।

পুনরায় পাঠানগণ বিজয়ী হইয়াছে শুনিয়া, দিল্লীশ্বর আকবরসাহ দায়ুদের উচ্ছেদের জন্য, খাঁজাহান-হোসেন-কুলী, মজঃফর খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। মজঃফর-খাঁর সহিত শেষ যুদ্ধে, বঙ্গের পাঠান রাজা দায়ুদ নিহত হন। মজঃফর খাঁ—তাঁহার ছিন্নমুণ্ড আকবর-সাহের নিকট দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন

দায়ুদের মৃত্যুতে, বঙ্গে স্বাধীন পাঠান-রাজত্বের চির বিলোপ হইল। গৌড়ের রাজলক্ষ্মী জন্মের মত চলিয়া গেলেন। দায়ুদের মন্ত্রী, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় সন্ন্যাসী-বেশে পলায়ন করিলেন। মোগল-অধিকারে কিরূপ নূতন বন্দোবস্ত হয়, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহারা যশোরে ফিরিয়া না গিয়া, ছদ্মবেশে বরেন্দ্র-ভূমিতেই লুকাইয়া রহিলেন।

নববিজিত বঙ্গের শাসন-শৃঙ্খলা সমাধানের জন্য—দিল্লীশ্বর আকবর সাহ—মহারাজ টৌডরমলকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে টৌডরমল বঙ্গদেশে উপস্থিত হন।

রাজা টৌডরমল, উন্নতচেতা, চরিত্রবান, সূক্ষ্মদর্শী, ন্যায়নিষ্ঠ, শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজকার্য্যেই যে কেবল তিনি চাণক্য-সদৃশ বুদ্ধিমান ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার মত সমর-কুশল বীরও সে সময়ে অতি অল্পই ছিল। এই জন্যই বাদসাহ, সকল বিষয়েই তাঁহাকে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। টৌডরমল বাঙ্গলায় আসিয়া বুঝিলেন—বঙ্গদেশের অরাজকতা দূর করা বড় সহজ কাজ নহে। বাঙ্গলায় কিয়দ্দিন অবস্থানের পর, রাজা টৌডরমল স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন—বিদ্রোহী পাঠানগণকে দমন করিতে হইবে, অগ্রে বঙ্গের জমীদারদের হস্তগত করা প্রয়োজন। জমীদার ও প্রজা-সম্বন্ধে কোনরূপ সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত না করিলে, মোগল রাজ-সরকারের যথেষ্ট অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। বঙ্গীয় জমীদারগণ, মোগল-সরকারের নিকট মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করিলেও, ভিতরে ভিতরে তাহারা পাঠান বিদ্রোহীগণকে সাহায্য করিতেছিল। এ সাহায্য করার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, মহামতি টৌডরমল দেখিলেন, অর্থের আশাতেই, জমীদারেরা বিদ্রোহীগণকে দ্বিগুণ মূল্যে শস্য ও রসদাদি

বিক্রয় করে। তিনি বাঙ্গলার গণনীয় ভূস্বামীদের নিকট প্রস্তাব করিলেন—"আমি মোগল সরকারের পক্ষ হইতে দ্বিগুণ মূল্যে সমস্ত রসদ কিনিয়া লইব। কেন আপনারা—সামান্ত অর্থলোভে, এই বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতেছেন?" টোডরমল্লের কথায়, জমীদারেরা পাঠান-বিদ্রোহীদের নিকট রসদ বিক্রয় বন্ধ করিলেন। টোডরমল দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে তাহা মোগল তরফ হইতে কিনিয়া লইতে লাগিলেন। পাঠানগণ রসদাভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িল।

টোডরমল্লের সত্যবাদিতা ও ন্যায়-নিষ্ঠায়, বঙ্গীয় জমীদারগণও তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। অতি সহজে, রাজা টোডরমল, অবশিষ্ট অশান্ত পাঠান-বিদ্রোহীদের হীনবল করিয়া দিলেন।

রাজা টোডরমল, শান্তির এই সুখাবসরে, বাদসাহের সাধারণ প্রজাবর্গের সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি ও জমীদারদের নিকট সরকারের খাজনা আদায়ের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করেন। ১৫৮২খ্রীঃঅব্দে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যাকে কতকগুলি সরকার বা পরগণা এবং চাকলায় বিভক্ত করিয়া জমীদারদিগকে সরকার-পক্ষ হইতে রাজস্ব-সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। হিন্দুরা যে সমস্ত জায়গীর ও ভূসম্পত্তি বাদসাহের নিকট দানরূপে পাইয়াছিলেন, বা যে সকল জমীদারি তাঁহারা ভোগ করিতেছিলেন, রাজা টোডরমল কায়েমি-বন্দোবস্ত করিয়া, সেগুলি তাঁহাদের প্রত্যর্পণ করেন। ইহাতে বঙ্গদেশের জমীদারেরা পূর্ণান্তঃকরণে বাদসাহের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে ও বিদ্রোহ-সংকুল বঙ্গদেশে তখনকার মত শান্তি স্থাপিত হয়।

মহারাজ টোডরমল, ঘোষণা করিয়া দিলেন—"যাঁহারা ভূতপূর্ব্ব পাঠান নৃপতিদের আমলে, রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা বিনা-সঙ্কোচে, বিনা ভয়ে, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।" বিক্রমাদিত্যের অনুচর, আকমহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহাকে মহারাজ টোডরমলের এই অভয়-বাণীর কথা জ্ঞাপন করিল। তাঁহারা যখন বুঝিলেন, টোডরমলের সহিত সাক্ষাতে কোন ভয়ের কারণ নাই, তখন দুই ভ্রাতা মহারাজের সহিত রাজমহলে সাক্ষাৎ করিলেন।

রাজা টোডরমল গুণ-গ্রাহী ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের প্রমুখাৎ রাজস্ব ও দেশের শাসন-নীতি সম্বন্ধে সমস্ত কথা অবগত হইয়া, তাঁহাদের প্রচুর বিত্তদানে যথেষ্ট সম্মানিত করেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী যাহার প্রতি প্রসন্না, তাঁহার প্রতিভার কোন স্থানেই অনাদর

হয় না। মহারাজ টোডরমল, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা পাঠান—নরপতি, দায়ুদের নিকট যে জমীদারী পাইয়াছিলেন, তাহাও বাহাল রহিল। দিল্লী-দরবার হইতে সনন্দ আনাইয়া মহারাজ টোডরমল উভয় ভ্রাতাকে যশোহরের পশ্চিমভাগে গঙ্গানদী ও পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্র-নদের পশ্চিমভাগ এই বৃহৎ সীমা-সমন্বিত রাজ্য প্রদান করেন। *

সুবুদ্ধিমান বিক্রমাদিত্য, কনিষ্ঠ বসন্তরায়কে যশোহরে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ টোডরমলের আদেশানুসারে তিনি সরকারী জমা-ওয়াশীল-তুমার অর্থাৎ রাজস্ব বিষয়ক কাগজ পত্র প্রস্তুত করিলেন। মহারাজ টোডরমল, বিক্রমাদিত্যের কার্য্য-প্রণালী দর্শনে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রচুর ধনরত্নাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন।

এইবার বিক্রমাদিত্যের সংসারসুখ, চরম সীমায় উপস্থিত হইল। মোগল পাঠানের অনুগ্রহেই, তিনি এক বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্যও সেই সময়ে নব-যৌবনের সীমায় উপস্থিত। বিক্রমাদিত্য যশোরের কায়স্থ সমাজের অধিপতি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত, জঙ্গল-কাটান যশোর—অট্টালিকা, বিপণী, হাট, চত্বর প্রভৃতিতে দিনে দিনে শোভাসৌন্দর্য্য-ময়ী হইতেছে। রাজ-দরবারে প্রচুর সম্মান, সমাজে একাধিপত্য—ভাণ্ডারে লক্ষ্মী অচলা, ইহাপেক্ষা সুখের চরমোৎকর্ষ আর কি হইতে পারে? †

গৌড়নগরীতে যখন ভয়ানক রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা, সেই সময়ে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। ভবানন্দ তখনও ইহলোকে বর্ত্তমান। পৌত্রের মুখ দেখিয়া, ভবানন্দ হর্ষ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। পৌত্রকে পরম রূপবান দেখিয়া, তিনি তাহার "প্রতাপাদিত্য", নামকরণ করিলেন। বাল্যকালে প্রতাপ, গৌড়নগরে

---

* রাম রাম বসু ও শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য।

† এই সময়ে যশোহরের ঐশ্বর্য্য সূচক একটী কবিতা আজও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

"যশোহর পুরী কাশী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরব।"

অর্থাৎ যশোহরের অত্যুচ্চ মন্দির-সমূহ, কাশীর রমণীয় ভাব ও মণিকর্ণিকা নামক দীঘি, মণিকর্ণিকার পূতসলিলকে অনুকরণ করে। অশেষশাস্ত্রবিৎ তর্কপঞ্চানন, এই নগরের সাক্ষাৎ ব্যাসদেব এবং দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ বসন্তরায়, সাক্ষাৎ কাল—ভৈরব স্বরূপ। বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতের নাম শ্রীকৃষ্ণ তর্ক-পঞ্চানন। তিনি অতি তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনিই মহা সমারোহে প্রতাপাদিত্যকে যশোরের সিংহাসনে বসাইয়া, অভিষেকোৎসব সমাপন করেন। পরবর্ত্তী কালে মহারাজ প্রতাপাদিত্যও তাঁহাকে মহা-গুরুর মত মান্য করিতেন, সকল কার্য্যেই তাঁহার মতামত প্রার্থনা করিতেন।

পারস্ত-ভাষা শিক্ষা করেন। যশোহরে রাজধানী নির্ম্মিত হইলে, তিনি পরিজনবর্গের সহিত যশোহরে আসেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে, অস্ত্রবিদ্যা, মল্লবিদ্যা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া—প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। শর-চালনায় ও অশ্বারোহণে তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন। প্রতাপের এই বীরপ্রকৃতি, বিক্রমাদিত্য আদৌ পছন্দ করিতেন না। বাল্যকালে পণ্ডিতগণ প্রতাপের ঠিকুজী-কোষ্ঠী দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"মহারাজ! এই বালক পিতৃদ্রোহী হইবে!"

প্রতাপের প্রতি কার্য্যেই বিক্রমাদিত্য বুঝিলেন—"এই বীরত্বাভিমানই প্রতাপের সর্ব্বনাশ করিবে।" বিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক ও শান্তি-প্রিয় ছিলেন। যিনি বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী শ্রবণে আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন—তিনি যে পুত্রের এই বীর-প্রকৃতির উপর বিরক্ত হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি!

একদিনের ঘটনায়, তাঁহার মনোমধ্যে সযত্নে প্রচ্ছন্ন, এই বিরক্তি-ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। আকাশে একটী পাখী উড়িয়া যাইতেছিল, প্রতাপ শরাঘাতে সেই পক্ষী বধ করেন। ইহা দৃঢ়-লক্ষ্যের পরিচয়। বিক্রমাদিত্য যে স্থানে বসিয়াছিলেন, নিহত পক্ষী সেই স্থানে পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। পক্ষীকে এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে কে বধ করিল—এই ব্যাপারের অনুসন্ধানে, বিক্রমাদিত্য যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্র প্রতাপ কর্ত্তৃক এই শকুন শরাহত হইয়াছে, তখন তিনি প্রতাপকে ডাকিয়া যথেষ্ট ভৎ'সনা করিলেন।

মানব মাত্রেই ভ্রমান্ধ! ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কে কবে কাজ করিতে পারিয়াছে? মানুষ প্রজ্ঞাবান ও মনস্বী হইলেও, কর্ম্মফল তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া, বিপরীত পথে লইয়া যায়। প্রতাপ-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের কোষ্ঠিফল বিচার, বিক্রমাদিত্যের মনে, বড়ই আধিপত্য প্রকাশ করিয়াছিল। তিনি মনমধ্যে সর্ব্বদাই আলোচনা করিতেন—"এই পুত্র আজীবন আমার অবাধ্য হইবে।" প্রতাপের কাজকর্ম্মেও সেই ভাব সূচিত হইতে লাগিল। ইহাতে বিক্রমাদিত্যের মনে, "পিতৃদ্রোহিতার" এই সংস্কারটা আরও বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। কেবল বিক্রমাদিত্য নহেন, প্রতাপের কোন বিষয়ে অবাধ্যতা দেখিলে, অন্যান্য পরিজনেরাও তাঁহাকে পিতৃ-দ্রোহী বলিয়া ভৎ'সনা করিতেন। এই রূপ ভৎ'সনার ফল অতি বিষময় হইল!

প্রতাপ, তাঁহার বাল্যজীবন গৌড়ে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গৌড়ে

তখন হুলস্থূল ব্যাপার! সুলেমানের প্রাধান্যলাভ, তাঁহার উড়িষ্যা জয়, উড়িষ্যা-বাসী—হিন্দুরাজগণের অমিত পরাক্রম ও যুদ্ধ-কৌশল, উড়িষ্যার স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য, তদ্দেশবাসী হিন্দুদের জীবনব্যাপী চেষ্টা, প্রতাপের মনে—একটা নূতন আলোক-জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিল। প্রতাপ যখন শুনিতেন, তাহার পিতৃদেব বিক্রমাদিত্য, যুদ্ধক্ষেত্রে বঙ্গাধিপতি দায়ুদের পার্শ্বে থাকিয়া, অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন, অসমসাহসিক বীরত্বের সহিত শত্রুসৈন্য মথিত করিতেছেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার মনে শক্তিপরিচালন সম্বন্ধে একটা অনুকূল সংস্কার উপস্থিত হইল। আর এই সমস্ত ব্যাপারে প্রতাপের মনে, সেই সময়ে স্বাধীনতার একটা স্পৃহা জাগিয়া উঠে।

প্রতাপের দুইজন বাল্যসঙ্গী, এই সময়ে তাঁহার উন্মেষিত চিত্ত-বৃত্তির পূর্ণ-বিকাশের সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহাদের মধ্যে একজন শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও আর একজন সূর্য্যকান্ত গুহ। প্রতাপের সঙ্গীদ্বয়ও, তাহার ন্যায় সাহসী ও বলদর্পিত ছিলেন। তাঁহারা তিনজনেই গভীর জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতেন। কিন্তু তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন—প্রতাপাদিত্য। প্রতাপ গভীর জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যেরূপ ভাবে বরাহ-ব্যাঘ্রাদি শিকার করিতেন, তাহা দেখিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া থাকিত!

প্রতাপের এই উচ্ছৃঙ্খল জীবন-গতি অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য, বিক্রমাদিত্য কনিষ্ঠের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে, যশোহর-নগরী, নয়ন-মনোহর শোভা ধারণ করিল। এরূপ উৎসব, বহুদিন ধরিয়া কেহ দেখে নাই। বিবাহ হইয়া গেলে, নববধূ গৃহে আনিয়া বিক্রমাদিত্য মনে মনে ভাবিলেন, যে ঈশ্বরী-মায়ার আবর্ত্তে পড়িয়া সংসারে সকলেই হাবুডুবু খাইতেছে—প্রতাপ নিশ্চয়ই তন্মধ্যে পড়িয়া তাহার উগ্রস্বভাব পরিত্যাগ করিবে।

কিন্তু প্রতাপের কোন পরিবর্ত্তনই নাই। প্রতাপ সঙ্গীগণ লইয়া, মৃগয়া ব্যসনে আরও গভীর ভাবে অনুরক্ত হইলেন। প্রতাপ-চরিত্রের বৈচিত্র্যতা বিক্রমাদিত্য কোন রূপেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রতাপাদিত্য-চরিত লেখক বলেন—"তিনি যখন গৃহে থাকিতেন, সে সময়ে তিনি রাজ্যের আয়-ব্যয় ও শাসন-ব্যবস্থা অতি বিচক্ষণতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। আবার যখন কঠোর-ভাব ধারণ করিতেন, সে সময়ে তাঁহাকে 'যমের ন্যায় ভীষণ বলিয়া মনে হইত। আবার অন্য সময়ে, তাঁহার মধুর বাক্য ও সরস ব্যবহার দেখিলে, তাহাতে যে অনুমাত্র কঠোরতা আছে, তাহা বোধ হইত না।"

কিন্তু প্রতাপের অতি দুর্ভাগ্য, যে তাঁহার পিতা, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই পিতৃদ্রোহিতার আভাস পাইতে লাগিলেন। যাহাতে এই উদ্ধত পুত্রের জন্য, তাঁহাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত না হয়, সংসারে কোন অশান্তি না আসে, এই জন্য বিক্রমাদিত্য প্রতাপকে দূরতর স্থানে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

একজন কর্ম্মচারী, আগ্রার রাজদরবারে যশোর রাজসংসারের প্রতিনিধি রূপে থাকিতেন। বাঙ্গালার সকল করদাতা ভূস্বামীকে, তৎকালে বাদসাহ দরবারে, এইরূপ একজন প্রতিনিধি বা উকীল রাখিতে হইত। বিক্রমাদিত্য একদিন বসন্তরায়কে নিভৃতে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—"ভাই! প্রতাপকে আমি আগ্রার দরবারে রাখিতে ইচ্ছা করি! ইহাতে আমার সকল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে। দূরদেশে অবস্থান নিবন্ধন, আত্মীয়দিগের সহিত তাহার দূরতর সম্বন্ধ ঘটিলে, সে তাহাদের প্রতি আরও আকৃষ্ট হইবে। এই বিশাল জমীদারীর ভার, দিনকতক বাদে প্রতাপের স্কন্ধেই পড়িবে। তুমি আমি চিরদিন থাকিব না। যাহাতে প্রতাপ বাদসাহের দরবারে থাকিয়া, উজীর ও আমীর-ওমরাহদের সহিত মিলিত হইয়া, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে, ইহা দ্বারা তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। সম্রাট আকবর-সাহ গুণগ্রাহী। প্রতাপ যদি কোনরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়া, বাদসাহের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ আরও পরিস্ফুট হইবে।"

বসন্তরায় ভ্রাতাকে তাঁহার এ ভয়ানক সংকল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। অগত্যা বসন্তরায় প্রতাপকে জ্যেষ্ঠের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

কিন্তু নির্ভীক হৃদয় প্রতাপ, ইহাতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। খুল্লতাতের আদেশে, তিনি আগ্রা-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দ্রব্য-সম্ভারপূর্ণ নৌকা সকল সজ্জিত হইতে লাগিল। শুভদিনে পিতামাতা ও গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া—শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি অনুচরবর্গকে লইয়া প্রতাপ আগরা-যাত্রা করিলেন। প্রতাপকে বিদায় দিবার জন্য, যশোর নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রাজধানী প্রান্ত বাহিনী যমুনা তীরে সমবেত হইল।

এই যশোহর ত্যাগ ব্যাপারে, প্রতাপের মনে একটী মহা কুসংস্কার

আকবর।

বদ্ধমূল হইল। প্রতাপ মনে মনে ভাবিলেন—"আমার এই নির্ব্বাসনের মূলই আমার পিতৃব্য। পিতা—সকল কার্য্যেই তাঁহার মন্ত্রণাধীন। তিনিই আমার বিরুদ্ধে নানারূপ কুমন্ত্রণা দিয়া, পিতার কর্ণ বিষদিগ্ধ—করিয়া তুলিয়া এই ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। প্রতাপের এই কুসংস্কার-ফলে ভবিষ্যতে তাঁহাকে পিতৃব্য-হত্যার মহা-কলঙ্কে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

বহু বাধা-বিঘ্ন, পথকষ্ট সহ্য করিয়া, প্রতাপ আগরায় উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে উপযুক্ত উপঢৌকনাদি সহ দরবারে উপস্থিত হইয়া, সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। বিশাল-দর্শন আমখাস, দেওয়ান-খাস—তাহাদের মণি খচিত স্তম্ভ—অসংখ্য অশ্ব-হস্তী-উষ্ট্র-বাহিত অক্ষৌহিণী মোগলবাহিনী পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় পদাতিক শ্রেণী দেখিয়া, তিনি মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও শক্তির পরিচয় পাইলেন।

ক্রমে—রাজ-সভায় অনেক গণ্য-মান্য লোকের সহিত প্রতাপের আলাপ পরিচয় হইল। প্রতাপ যখন ভাবিতেন—যে এই মানসিংহের বাহুবলেই আকবর-সাহের রাজ্য সুরক্ষিত, এই টোডরমলের অমানুষিক প্রতিভাবলে, রাজ্যের আভ্যন্তরিণ শাসন-বিভাগ সমুন্নত তখন, হিন্দুর শক্তির উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এই হিন্দু—ভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তি ও অবসর যথাযথ ভাবে পরিচালনা করিলে—নিশ্চয়ই ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য সমূহে—বিভক্ত করিয়া শাসন করিতে পারিবে। এই সব ব্যাপার দেখিয়াই, তাঁহার মনে স্বাধীনতা স্পৃহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

আগরায় অবস্থান কালে, অনেক পদস্থ আমীর ওমরাহগণের সহিত প্রতাপের আলাপ পরিচয় হয়। কিন্তু ভাগ্য ক্রমে, একদিন বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহার আলাপের সুযোগ ঘটিল। আকবর সাহ, সভাসদগণকে মধ্যে মধ্যে এক একটী সমস্যা-পূরণ করিতে দিতেন। একদিন প্রতাপ রাজসভায় উপস্থিত—এমন সময়ে বাদসাহ, তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী আমীর ওমরাহগণকে বলিলেন—"সেত ভুজঙ্গিনী-যাত চলি হেঁ" এই সমস্যা পূর্ণ কর। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী কবি ও পণ্ডিত সভাসদগণ বাদসাহ প্রদত্ত সমস্যাটী প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাবে পূরণ করিলেন—কিন্তু বাদসাহ, তাহার একটীও পছন্দ করিলেন না।

প্রতাপও মনে মনে এই সমস্যার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি বাদসাহের অপরিচিত। অতি নম্রভাবে, দিল্লীশ্বরের সন্নিহিত হইয়া সসম্মানে কুর্ণীশ করিয়া, প্রতাপ বলিলেন—"জাঁহাপনা! এ দাস

আপনার সমস্যার পূরণ করিতে পারে। অনুমতি প্রদান করিলে—আমার রচিত পদটী আপনাকে শুনাইয়া দিই।”

বাদসাহ দেখিলেন, এক গৌরকান্তি, সমুন্নতকায় বাঙ্গালী যুবক, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে। তিনি তখনই সম্মতি দিলেন। প্রতাপ পদ-পূরণ করিয়া বাদসাহকে শুনাইলে, তিনি মহাসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানা-বিধ বহুমূল্য দ্রব্য পুরস্কার দেন। এই দিন হইতেই বাদসাহের সহিত, প্রতাপের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—আলাপ পরিচয় হয়। *

আগরায় অবস্থান কালে, প্রতাপ একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে বন্ধুদ্বয়ের সহিত দূর-দূরান্তর দেশে, এমন কি পঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। এইরূপে আকবর-সাহের শাসন নীতি ও সাম্রাজ্য সম্বন্ধে, তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

বহুকাল আগরায় অবস্থান করিবার পর, একদিন প্রতাপ এক দুঃসাহসিক কাজ করিলেন। যশোর হইতে যে রাজস্ব, সম্রাট-সরকারে আসিত তাহা তিনি এতদিন নিয়মিত রূপেই দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সেই বার সহসা রাজস্ব দাখিল বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম কূটনীতি। যশোর হইতে রাজস্ব না আসার কথা, ক্রমে বাদসাহের কাণে উঠিল। আকবর-সাহ ইতিপূর্ব্বেই প্রতাপকে ভালরূপে চিনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের সান্নিধ্যে আহ্বান করিয়া বলিলেন—“তোমার পিতা যশোরের খাজনা প্রেরণ বন্ধ করিলেন কেন?” প্রতাপ বিনয়ের সহিত বলিলেন—“জাহাপনা! আমার পিতৃদেব রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। খুল্লতাত বসন্তরায়ের উপর এখন রাজ্য-ভার ন্যস্ত। জানিনা কি গূঢ় উদ্দেশ্য চালিত হইয়া, আমার খুল্লতাত—আগরায় করপ্রেরণে এইরূপ

---

* প্রতাপাদিত্য আগ্রার রাজসভায় যে সমস্যাটী পূরণ করিয়াছিলেন—তাহা এই...

শোবর কামিনী নীর নিহারতি রিত ভালি হেঁ...
চিরমচরকে গঠপর বাপিকে ধারেছু চল চলি হেঁ...
রামবচোরি আপন মনমে উপমাও চারি হেঁ...
কেছঙ্গ মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী জাত চলি হেঁ।

রাম রাম বসু ও শাস্ত্রীর প্রতাপাদিত্য চরিতে

আকবরসাহ অতি গুণগ্রাহী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার সভায়, কবি, দার্শনিক সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিবর্গ, সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। রাজকার্য্যের অবসানে, চিত্তবিনোদনের জন্য কিম্বা জ্ঞানালোচনার জন্য, বাদসাহ উপস্থিত পণ্ডিতগণের সহিত নানাবিষয়িণী আলাপ করিতেন। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান, পর্টুগীজ, সর্ব্বজাতীয় লোকই এই সভায় উপস্থিত থাকিত।

শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন। আমি এ ব্যাপারের রহস্য অবগত নহি। প্রকৃত সংবাদ আনাইবার জন্য, যশোরে লোক প্রেরণ করিয়াছি। আমার বোধ হয়, যশোর রাজ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে—খাজনা পত্র আদায় হইতেছে না। এ অবস্থায়, আমিও নিজের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিতেছি না। এখন জাঁহাপনা যেরূপ আদেশ করিবেন, এ দাস তাহাই পালন করিবে।"

আকবর-সাহ, কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—"প্রতাপ! তুমি যদি সরকারের প্রাপ্য-রাজস্ব কোন উপায়ে যোগাড় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে যশোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিব। আশা করি তোমার স্থায় বুদ্ধিমান যুবক, সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য-শাসনে সমর্থ হইবে।"

প্রতাপের মনের গূঢ় বাসনা সিদ্ধ হইল। তিনি বাদসাহকে কুর্ণিস করিয়া বলিলেন—"জাঁহাপনা! এ দাসকে কয়েকদিন সময় দান করিলে বোধ হয়, আমি রাজস্ব-সংগ্রহ করিতে পারি।"

বাদসাহ ইহাতে সম্মতি দান করিলে, প্রতাপ অল্পদিনের মধ্যেই, রাজ-স্বের প্রয়োজনীয় অর্থ, আগরা হইতেই সংগ্রহ করিলেন। আগরার অনেক আমির-ওমরাহ তাঁহার বন্ধুস্থানীয় হইয়াছিলেন—তাঁহাকে বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন। কাজেই এই দূরদেশে—অর্থ সংগ্রহ করা, তাঁহারে পক্ষে বেশী অসম্ভব হইল না।

সম্রাট, প্রতাপের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে—তিন লক্ষ টাকা, তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহার আদেশে, তখনই বাদসাহী আজ্ঞাপত্র বা রাজ্য-প্রদানের "ফারমান" প্রস্তুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ফারমানের প্রতিলিপি বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল।

কেবল বাদসাহী ফারমান নহে, প্রতাপ বাদসাহের অনুমতি লইয়া সেনা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাদসাহকে বুঝাইলেন, সহসা রাজোপাধি লইয়া দেশে উপস্থিত হইলে এবং রাজ্য দখল করিবার চেষ্টা করিলে, পিতৃব্য বসন্তরায় কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে পারেন। বাদসাহের অনুমতি লইয়া, তিনি দ্বাবিংশতি সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে আগ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যথা সময়ে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন।

শঙ্করের পরামর্শানুসারে, প্রতাপ এই পুণ্য-ক্ষেত্র বারাণসীতে, খুব দান ধ্যান করেন। কয়েকটী ঘাট-প্রতিষ্ঠা—মঠধারী সন্ন্যাসীদের বৃত্তি-ব্যবস্থা

দরিদ্র বিদ্যার্থীদের অর্থদান, প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে, বারাণসীবাসী সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। নগরের অধিবাসীগণকে কয়েক দিবস ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও অর্থাদি প্রদান করেন। আজও বারাণসীতে তাঁহার কীর্ত্তি সমূহ বর্ত্তমান। *

বারাণসী ত্যাগ করিয়া নানাদেশে পরিভ্রমণান্তর, প্রতাপ অবশেষে যশোহরের সন্নিকটস্থ হইলেন। তাঁহার অধীনস্থ বিপুল-বাহিনী, পূর্ব্ব হইতেই শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সজ্জিত করিয়া, নগর অবরোধ করিলেন। পাছে পিতৃব্য বসন্তরায়, তাঁহাকে কোনরূপ বাধা প্রদান করেন, ইহাই তাঁহার প্রধান আশঙ্কা। এরূপ বিগ্রহ-ব্যাপারে, রাজকোষ হস্তগত থাকা বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া, তিনি রাজকোষ দখল করিলেন। কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য, পুত্রের এই অদ্ভুত ব্যাপারে অতিশয় বিরক্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া—ভ্রাতার সহিত প্রতাপের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। পিতা ও পিতৃব্যকে সহসা সেই ভাবে, তাঁহার স্কন্ধাবার মধ্যে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, প্রতাপ বড়ই লজ্জিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তখনই পিতা ও পিতৃব্যের চরণ-বন্দনা করিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিক্রমাদিত্য পুত্রকে অনুতপ্ত দেখিয়া, তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন—"বৎস! আমরা আর কতদিন বাঁচিব! রাজ্য ত তোমারই। তবে তোমার এরূপ ভাবে নগরাবরোধের প্রয়োজন কি? কোন্ পিতা, পুত্রের উন্নতি কামনা না করেন? তুমি কি মনে ভাবিয়াছিলে—যে তোমার স্নেহময় পিতৃব্য, তোমার রাজ্যলাভে বাধা দিবেন?"

প্রতাপ অনুতপ্ত চিত্তে, পিতা ও পিতৃব্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। সমস্ত গোলযোগ, মনান্তর, অকৌশল এই খানেই মিটিল। প্রতাপই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যেশ্বর হইলেন। বসন্তরায় ও বিক্রমাদিত্য কেবল ঈশ্বরোপাসনা ও

* অনেকে অনুমান করেন—চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাট, প্রতাপাদিত্যের ব্যয়েই নির্ম্মিত হয়। এ ঘাটটী আজও বর্ত্তমান। ধরিতে গেলে—এই ঘাট, কাশীর মধ্যে বাঙ্গালীদের অতি প্রাচীন-কীর্ত্তি। এই ঘাটের সান্নিধ্যে, ভদ্রকালী প্রতিমাও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। এই সম্বন্ধে আমাদের আর একটী কথা মনে পড়ে। একদিকে—প্রতাপের চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাট যেমন তাঁহার কাশীর প্রধান-কীর্ত্তি, আবার অন্য দিকে তাঁহার ঘোর শত্রু, মহারাজ মানসিংহ "মান-মন্দির" প্রতিষ্ঠা দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কোথায় বা প্রতাপাদিত্য—আর কোথায় বা সেই মানসিংহ—কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি আজও অবিনশ্বর ভাবে বর্ত্তমান।

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ-দাসের বিরচিত পদাবলী শ্রবণে, দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

যশোরকে একটী সুরক্ষিত ও শক্তিমান রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য, প্রতাপ নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে, তাঁহার অধিকৃত স্থান সমূহের চারিদিকে, অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মিত হইল। রডা নামক একজন পর্টুগীজ নৌ-সেনাপতির তত্ত্বাবধারণে, এই সমস্ত দুর্গ নির্ম্মিত হয়। দুর্গ-গুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হইলেও, শক্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার বিশেষ উপযুক্ত ছিল। * যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে—তাহা হইতে আমরা প্রতাপ-প্রতিষ্ঠিত সাতটী দুর্গের নাম পাইয়াছি। মাতলা, রায়গড় (বর্ত্তমান গার্ডনরিচ্), টানা, বেহালা, সালকিয়া, চিৎপুর, আটপুর, (মুলাযোড়) প্রভৃতি সাতটী স্থানে, এই সপ্ত দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অশ্বারোহী পদাতি, তীরন্দাজ, বেল্‌দার (শ্রমজীবি-সেনা) ও গোলন্দাজ প্রভৃতি কোন প্রকার সৈন্যেরই অভাব হইল না। দুই এক বৎসরের মধ্যে যশোরের যশঃ-প্রতিভা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতাপের এই উন্নতির সময়ে, তাঁহার মহাগুরু নিপাত হয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই সময়ে পরলোক গমন করেন। মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া, প্রতাপ বসন্তরায়কে পিতার ন্যায় সম্মান করিতে লাগিলেন। রাজ্য-সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত পূর্ব্ববৎ ভাবেই চলিতে লাগিল।

প্রতাপাদিত্য দেখিলেন—বঙ্গদেশের সান্নিধ্যে, উৎকলবাসীগণই তখনও অমিত শক্তিতে মোগল-পাঠানের সহিত যুঝিয়া,তাহাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। এই উৎকলীদের সাহস, শক্তি, যুদ্ধপ্রণালী প্রভৃতি দেখিবার জন্য তিনি তীর্থ-যাত্রাস্থলে, অগণ্য বাহিনী লইয়া, উৎকলে গমন করেন।

উৎকলে সে সময়ে উৎকলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এবং গোবিন্দদেব নামক শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি অতি বিখ্যাত ছিল। বসন্তরায় প্রতাপকে, এই দুইটী

---

* Maharaja Pratapaditya had through the help of Rodda the Portuguese Commander of his fleet, built several forts close to Calcutta during his transcient struggle for independence. One such fort, appears to be built at Mutla, another at Raigurh (Garden Reach), a third at Behala, a fourth at—Tannah and a fifth at Sulkia, a sixth somewhere near Chitpur and a seventh at Atpur near Mulajore * * These mud—forts were highly prized in those days for their strategic value. The River being only navigable by small sloops and boats.. (Mr. Roy's Census Report, P. 13)

বিগ্রহ সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। এই দুই বিগ্রহ আবার উৎকল-বাসীদের পরমারাধ্য দেবতা। উড়িষ্যার মধ্যভাগ হইতে সে গুলি নিরাপদ ভাবে আনয়ন করা, বড় সহজ ব্যাপার নহে! কিন্তু প্রতাপ—পূজারীদের হস্তগত করিয়া, পিতৃব্যের জন্য বিগ্রহদ্বয় সংগ্রহ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

উড়িষ্যা-বাসীরা যখন জানিতে পারিল, তাহাদের দেবতাদ্বয় অপহৃত হইয়াছে, তখন তাহারা বিগ্রহের উদ্ধার কামনায়, প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। যে উৎকলীদের বাহুর শক্তি-পরীক্ষার জন্য, তিনি এত উৎসুক হইয়া ছিলেন—কর্ম্মসূত্রে তাহা আপনিই ঘটিয়া গেল।

উৎকল-রাজগণের সহিত—প্রতাপের যুদ্ধ বাধিল। সুবর্ণ-রেখার তট ভূমে, বাঙ্গালীর প্রথম শক্তি পরীক্ষা ব্যাপারে—প্রতাপই বিজয়ী হইলেন। এ যুদ্ধে কয়েকজন উৎকল-রাজা প্রতাপের হস্তে বন্দী হন। প্রতাপ তাঁহাদের সহিত যথেষ্ট সৌজন্য ও শিষ্ট ব্যবহার করিয়া, পরিশেষে বন্দী রাজগণকে সসম্মানে মুক্তিদান করেন। এই যুদ্ধ সময়ে, প্রতাপের সহকারী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, সূর্য্যকান্ত গুহ প্রভৃতি শূরগণ, যথেষ্ট শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেরূপ ভাবে অসংখ্য শত্রু-মণ্ডলীর মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, তাঁহারা যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে অতি দুর্লভ ঘটনা। এই উৎকলেশ্বর-হরণ ব্যাপারেই প্রতাপের যশঃগৌরব বঙ্গের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। *

* প্রতাপাদিত্য-চরিত লেখক, শাস্ত্রী মহাশয়, বসন্তরায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা রমেশচন্দ্র রায়ের নিকট এই উৎকলেশ্বর মন্দিরের যে প্রস্তর—লিপি পাইয়াছিলেন—তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য, আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। মহারাজা বসন্তরায়, বেতকাশীতে (সুন্দর-বনপ্রদেশে) উৎকলেশ্বরের এক অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।' তাহার চিহ্নমাত্র নাই। তবে প্রতিষ্ঠা সময়ের প্রস্তর—লিপিখানি এখনও বর্ত্তমান আছে। প্রস্তর-লিপির মধ্যে লিখিত আছে।—

নির্ম্মমে বিশ্বকর্ম্মা যং পদ্মযোনিঃ প্রতিষ্ঠিতম্
উৎকলেশ্বর সজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্
প্রতাপাদিত্য ভূপেনানীতমুৎকল দেশতঃ
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ।

জনশ্রুতি এই—গোবিন্দদেবের এক রাধিকা ছিল। যুদ্ধ কালে সুবর্ণরেখা পার হইবার সময়, সেই রাধিকা—ঠাকুরাণী নদী মধ্যে হারাইয়া যান। গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রাজা বসন্তরায়, ঠাকুরের জন্য একটী রাধিকা নির্ম্মাণ করান। কিন্তু ঠাকুর, স্বপ্নে তাঁহাকে বলেন—"এ রাধিকা আমার মনোনীত হয় নাই।" এই জন্য একে একে অনেকগুলি রাধিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতাপ আবার এই রাধিকা-গুলির জন্য, এক একটী কৃষ্ণ নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্যের নানাস্থানে সেই যুগলমূর্ত্তি গুলি প্রতিষ্ঠা করেন।

উৎকল-বিজয়ী প্রতাপাদিত্য, যশোহরের সমীপবর্ত্তী হইতে না হইতে সমগ্র বঙ্গ-প্রদেশে তাঁহার যশোরাশি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহারাজ বসন্তরায়, বিজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্রকে—উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য, নগর সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। নগরের সর্ব্বস্থানই ধ্বজপতাকা ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইল। রাজপথের চারিদিকে সুবিস্তৃত গগনস্পর্শী তোরণদ্বার সমূহ রচিত হইল। বসন্তরায় প্রত্যুদ্গমন করিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রকে নগর মধ্যে আনয়ন করিলেন।

প্রতাপ উৎকল হইতে আনীত প্রতিমাদ্বয়, খুল্লতাতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরম—বৈষ্ণব বসন্তরায়, তাঁহার সাধনা ও আরাধনার যোগ্য বিগ্রহ পাইয়া মহা সমারোহে উৎকলেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতাপও গোবিন্দদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হন।

ইহার পরেই প্রতাপ, যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে, সকলেরই মনে বিশ্বাস জন্মিল—যে প্রতাপাদিত্য নিশ্চয়ই ভবানীর বরপুত্র। তাহা না হইলে যশোরেশ্বরী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ দিয়া মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করিলেন কেন? *

প্রচুর সেনাবলে বলীয়ান প্রতাপাদিত্য, এই সময়ে ধূমঘাটে একটী বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঁচ বৎসর কালের পর, এই দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। দুর্গটী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে পঞ্চক্রোশ। মৃণ্ময়-প্রাকারে পরিবেষ্টিত হইয়াও এই দুর্গ অতি সুদৃঢ় ছিল। তাহার চারিদিকে অনলবর্ষী কামান-শ্রেণী। এরূপ জনশ্রুতি, যে এই ধূমঘাটের মধ্যে আরও চারিটী গুপ্ত দুর্গ নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক দুর্গ সমরূপে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত। এই সকল দুর্গের মধ্যে বহুসংখ্যক গৃহ, পুষ্করিণী, উদ্যান, সুপ্রশস্ত রাজপথ ও পণ্য-বীথিকা সমূহ নির্ম্মিত হইল। পঞ্চম দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ। ধূমঘাট নির্ম্মাণ কার্য্য

* কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি আবিষ্কারের মূলে—যেমন একটী কিম্বদন্তী আছে, যশোরেশ্বরী সম্বন্ধেও সেইরূপ জনশ্রুতি বর্ত্তমান। কমল খোজা বলিয়া প্রতাপের এক বিশ্বস্ত অনুচর ইচ্ছামতী নদীতটে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া, প্রতাপকে সংবাদ দেয়। আবার যশোহরপ্রদেশের লোকেরা বলে, যশপাটনী নামক জনৈক ব্যক্তি নদীতীরে অদৃশ্য জ্যোতি দর্শন করিয়া প্রতাপাদিত্যকে সংবাদ দেন। প্রতাপাদিত্য সংবাদ পাইবামাত্রই, নদীতীরে আসিয়া দেখেন, এক শিলাখণ্ড হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতেছে। প্রতাপ, পরদিন বনজঙ্গলাদি কাটাইয়া এই প্রস্তরময়ী প্রতিমার উদ্ধার করেন। মানসিংহ যশোর জয় করিবার পর এই যশোরেশ্বরীকে তাঁহার অম্বরপ্রাসাদে লইয়া যান। আজও অম্বররাজপ্রাসাদে যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে।

শেষ হইলে প্রতাপাদিত্য শুভদিনে মহোৎসবের সহিত গৃহপ্রবেশ করিলেন। *

প্রতাপ যখন সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপস্থিত, সেই সময়ে তাঁহার গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়, বসন্তরায়ের নিকট তাঁহার রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব করিলেন। এই তর্ক-পঞ্চানন জ্ঞানে-গুণে সর্ব্বজন-পূজ্য। তাঁহার নিষ্ঠাবৃত্তি দেখিয়া, প্রতাপ তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। সন্ধিবিগ্রহাদি ব্যাপারে, গুরুর মত না লইয়া প্রতাপ কোন কাজই করিতেন না। তর্ক-পঞ্চানন মহাশয়, কাশ্যপ-গোত্র সম্ভূত-মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার এ অভিষেক-প্রস্তাব সকলকেই অনুমোদন করিতে হইল। অবশেষ মহা-সমারোহে প্রতাপাদিত্যের অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য—মৃত্যুকালে তাঁহার সমগ্র রাজ্য, দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্র ও ভ্রাতাকে দিয়া যান। রাজা বসন্তরায়—এই বিভাগানুসারে ছয় আনা ও প্রতাপ দশ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। এতদিন তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া মিশিয়া, রাজ্য-পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এ ভাবে বেশীদিন আর চলিল না। দুইজনের প্রকৃতি—দুই প্রকার। বসন্তরায়—বৃদ্ধ, ধর্ম্মভীরু ও শান্তিপ্রিয়। প্রতাপ—স্বাধীনতা-প্রয়াসী, উদ্ধত-প্রকৃতি এবং অস্থিরচিত্ত। সার্ব্বভৌমিক আধিপত্য লাভের জন্য, তিনি বড়ই উৎসুক। প্রথমতঃ প্রতাপ বসন্তরায়কে স্বমতে আনিয়া কাজ করিবার—চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। কাজেই উভয়ের মধ্যে রাজ্য-বিভাগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল।

বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ ও বরিশালের মধ্যে চক-শ্রীপুর বা চলিত কথায় "চাক্‌সিরি" বলিয়া একটী পরগণা ছিল। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থান বলিয়া, এখানে দুর্গ-নির্ম্মাণের বিশেষ সুবিধা। মগ ও পর্টুগীজ ফিরিঙ্গিদের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য, বহুদিন হইতে এই পরগণাটী প্রতাপের স্পৃহনীয়-সম্পত্তি ছিল। প্রতাপ অন্য স্থান বিনিময়ে, এই চাকসিরি পরগণা, লইবার জন্য খুল্লতাতের নিকট প্রস্তাব করেন। কিন্তু বসন্তরায়, ইহাতে সম্মত

---

* রাজ্যাভিষেকের পর প্রতাপ নিজনামে মুদ্রা-প্রচলন করেন। সেই মুদ্রার দুই অংশে নিম্নলিখিত কথা গুলি ছিল।

(সম্মুখ ভাগে) শ্রীশ্রীকালীপ্রসাদেন ভবতিঃ
শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য।

(পশ্চাৎ ভাগে). বঙ্গৎছিকাবছিম্মো জরয়ে
বাঙ্গাল মহারাজ প্রতাপাদিত্য—জয়জন্দাল।

হওয়ায়, প্রতাপ অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন। এই ঘটনায়, বসন্তরায় সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্ব ধারণা অতি প্রবলভাবে মনোমধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। তিনি পিতৃব্যের উপর মহাবিরক্ত হন।

ঢাকসিরি লাভে বিফল মনোরথ হইয়া, প্রতাপ পূর্ব্ববঙ্গে স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, আর একটী নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার কন্যা বিন্দুমতীর সহিত, চন্দ্রদ্বীপ-রাজ মহাবীর কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু এ বিবাহও সুখকর হইল না। কেন—তাহা বলিতেছি।

পিতার ন্যায় রামচন্দ্রও একজন বীরপুরুষ ছিলেন। রামচন্দ্র বহুসংখ্যক যুদ্ধে ফিরিঙ্গি, পর্টুগীজ ও মগদিগকে পরাজিত করেন। একবার রামচন্দ্র, ভুলুয়ার রাজা লক্ষণমাণিক্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দীভাবে রাজধানীতে আনেন। এরূপ বীর জামাতা পাইয়াও, প্রতাপ সুখী হন নাই। কেহ কেহ বলেন, জামাতা রামচন্দ্রকে নিহত করিয়া, তাঁহার রাজ্য নিজরাজ্য-ভুক্ত করিবার জন্য, প্রতাপ বহুচেষ্টায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। রামচন্দ্র তাঁহার শ্যালক, কুমার উদয়াদিত্যের সহায়তায় কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, বসন্তরায় ও তাঁহার পুত্রগণ, রামচন্দ্রের মনে এরূপ একটা ধারণা দৃঢ়বদ্ধ করিয়াদেন যে, রাজ্য-লোলুপ প্রতাপ তাঁহাকে হত্যা করিয়া চন্দ্রদ্বীপ-রাজ্য অপহরণ মানসে, তাঁহাকে জামাতাপদে বরণ করিয়াছেন। উপযুক্ত অবসর পাইলেই, তিনি তাহাকে নিহত করিয়া সংকল্প সিদ্ধি করিবেন।

যে কোন কারণেই হউক, প্রতাপ তাঁহার জামাতা রামচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করিলে, রামচন্দ্র, রামনারায়ণ নামক এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহায়তায়—সে যাত্রা যশোর হইতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। রামনারায়ণ প্রভুকে স্কন্ধে লইয়া গভীর নিশীথে নদীতীরে উপস্থিত হয়। ঘাটে, রামচন্দ্রের নৌকাসমূহ বাঁধা ছিল। রামচন্দ্র ষাটটী দাঁড়-বিশিষ্ট দ্রুতগামী এক নৌকায় আরোহণ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। যশোরের ঘাট ছাড়িবার পূর্ব্বে, তোপধ্বনি করিয়া প্রতাপকে জানাইলেন—"আমি চলিলাম।"

গভীর রাত্রে, সহসা বজ্রনাদী তোপধ্বনি শুনিয়া, প্রতাপাদিত্য বিস্মিত-চিত্তে কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলেন, যে তাঁহার অবরুদ্ধ জামাতা রামচন্দ্র, কারাগার হইতে পলাইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতগামী নৌকায় জনকয়েক দূতকে রামচন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য

পাঠাইলেন। কিন্তু রামচন্দ্র প্রতাপের সকল সতর্কতা এবং চেষ্টাকে অতিক্রম করিয়া নিরাপদে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ, বসন্তরায়কেই এই গৃহ-বিবাদের মূল কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাঁহার মনে একটা ধারণা জন্মিল, যে বসন্তরায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম দৃষ্টে, জ্ঞাতিত্ব-নিবন্ধন তাঁহার উচ্ছেদ-কামনা করিতেছেন। আবার এ দিকে বসন্তরায়ের মনের ভাবও এইরূপ বিদ্বেষমূলক। বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত অনলকণা নির্ব্বাপিত না করিলে, যেমন তাহা শক্তিসঞ্চয় করিয়া সহসা জ্বলিয়া উঠে, প্রতাপ ও বসন্তরায়ের মনোমধ্যে পোষিত বিরুদ্ধভাব, সেইরূপ একদিন মহা-অনর্থ উৎপাদন করিল।

বসন্তরায়ের বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। বসন্তরায় প্রতাপকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতাপও খুল্লতাতের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু সহ, তিনি বসন্তরায়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

বসন্তরায়ের পুত্র, গোবিন্দরায়, জ্যেষ্ঠকে আসিতে দেখিয়া, পিতাকে সংবাদ দিতে গেলেন। বসন্তরায় সেই সময়ে সন্ধ্যাবন্দনার আয়োজন করিতেছিলেন। নিয়তি-চালিত ঘটনাবশে, বসন্তরায় একজন পরিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গঙ্গাজল লইয়া আইস।"

প্রতাপের কর্ণে "গঙ্গাজল" শব্দ অতি ভীষণভাবে প্রতিধ্বনিত হইল। "গঙ্গাজল" বসন্তরায়ের প্রিয় অস্ত্র। "পিতৃব্য অসি আনয়ন করিতে আদেশ করিতেছেন—হয়তঃ আমাকে হত্যা করিবার জন্যই এই নিমন্ত্রণ"—এই ভাবিয়া হৃদয়ের উত্তেজনা বশে, উন্মুক্ত অসি হস্তে, প্রতাপ সহসা বসন্তরায়ের সম্মুখীন হইলেন।

এদিকে বসন্তরায়ের পুত্র, গোবিন্দরায়, প্রতাপকে অসি উন্মোচন করিতে দেখিয়া, পিতার অনিষ্টাশঙ্কায়—প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন। সে অস্ত্র প্রতাপের গায়ে লাগিল না। প্রতাপ ইহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া, গোবিন্দ রায়কে ভীমবেগে আক্রমণ করতঃ নিহত করেন।

সহসা সেই শান্তিময় রাজপুরীতে শোণিত-ক্রীড়া আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের লোকজনই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মহা হল্লা উপস্থিত করিল। প্রতাপ দ্রুত-পদে পুনরায় বসন্তরায়ের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বসন্তরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন—"শীঘ্র গঙ্গাজল অস্ত্র লইয়া আইস।" ভৃত্যবর্গ তাঁহার আদেশ পালনের পূর্ব্বেই, অসংযত-ক্রোধ প্রতাপ, সাংঘাতিক প্রহারে, পিতৃব্যের মুণ্ড

স্কন্ধচ্যুত করিলেন। পিতৃব্য—হত্যার, এই মহা-পাপেই ভবিষ্যতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

জগদানন্দ, পরমানন্দ, শ্রীরাম, রূপরাম, রামকান্ত, মধুসূদন, মাণিক্য, প্রভৃতি বসন্তরায়ের পুত্রগণ, এই ভীষণ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতাপকে সদলবলে আক্রমণ করিল। কিন্তু রণ-কৌশলী প্রতাপ, পিতৃব্য পুত্রগণকে একে একে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। শান্তিময় রাজপুরীর প্রকোষ্ঠ ও দরদালান সমূহ, পিতৃকুলের শোণিতে পরিসিক্ত হইল।

বসন্তরায়ের অনুচরগণকে নিরস্ত্র করিয়া, যাহাতে অন্তঃপুরের মধ্যে কোনরূপ অত্যাচার না হয়, প্রতাপ তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। বসন্তরায় মহিষী, তাঁহার একমাত্র শিশু-পুত্রকে—এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কচুবনের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন।* ইহাতেই সেই শিশুর প্রাণ-রক্ষা হয়।

বসন্তরায়ের জামাতার নাম—রূপরাম বসু। বসন্তরায়ের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য, তিনি অন্যান্য হিতৈষী কর্ম্মচারীদের সহিত মন্ত্রণা-মতে, রাজা বসন্তরায়ের পরমবন্ধু হিজলী-কাঁথির নবাব, ঈশা-খাঁ মছন্দরীর নিকট গমন করেন। সেখানেও মন্ত্রণায় কিছু স্থির হইল না দেখিয়া, ঈশাখাঁর সেনাপতি বলবন্ত বলিলেন,—"আমার উপর বিশ্বাস করুন, আমি যে উপায়ে পারি, প্রতাপের কবল হইতে রাজপুত্র রাঘবরায়কে উদ্ধার করিয়া আনিব।"

কচুবন হইতে রাঘবকে কুড়াইয়া লইয়া, প্রতাপ সেই শিশুকে স্বীয় মহিষীর হস্তে লালন-পালনার্থে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সিংহের গহ্বর হইতে শিকার বাহির করিয়া আনা—বড় সহজ কাজ নহে। কিন্তু বলবন্ত অসীম সাহসী। মশন্দরী সাহেবও ভাবিলেন, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই—আর সে চেষ্টার ভার যখন, বলবন্তের ন্যায় উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হইতেছে, তখন তাহা সিদ্ধ হওয়াও অসম্ভব নহে।

বলবন্ত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, একখানি দ্রুতগামী নৌকা-যোগে, যশোহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীষণ জঙ্গলময়, শ্বাপদ-সংকুল সুন্দরবনের মধ্য-দিয়া নৌকা বাহিয়া, ধুমঘাটে উপস্থিত হইয়া, বলবন্ত প্রতাপকে নিজ আগমন সংবাদ জানাইলেন।

* এইজন্য এই শিশুরাজপুত্র রাঘব, ইতিহাসে কচুরায় বলিয়া পরিচিত। বেহালা গ্রামে বসন্তরায়ের অনেক কীর্ত্তি আজিও বর্ত্তমান। অনেকে বলেন, বেহালার রায়দীঘি ও সরশুনার কয়েকটী প্রকাণ্ড দীঘি বসন্তরায়ের খনিত। কচুরায় বা রাঘব বহুদিন বেহালা প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন।

প্রতাপ যথোচিত সম্মানের সহিত বলবন্তকে গ্রহণ করিয়া, ঈশাখাঁর কুশলাদি সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। বলবন্তও যথাযথ উত্তরাদি প্রদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন;—"মহারাজ! আপনাকে গোপনে কিছু বলিতে চাই—এজন্য এক নির্জ্জন স্থানে চলুন।" প্রতাপ কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া, বলবন্তকে এক নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গেলেন। রাজ্যসম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথনে প্রতাপকে অন্যমনস্ক করিয়া, বলবন্ত সহসা ক্ষিপ্ত-ব্যাঘ্রবৎ, প্রতাপের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে ভূপতিত করিল! ভীষণ-স্বরে বলবন্ত বলিল,—"মহারাজ! আপনি এখন সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ত্তাধীন। যদি আপনি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে অব্যাহতি দিব। নচেৎ এই শাণিতাগ্রভাগ তরবারি, আপনার উত্তপ্ত রুধির পান করিবে। আমি জানি—আপনি সত্যবাদী। এজন্য প্রতিজ্ঞা করুন, বিনা আপত্তিতে রাজকুমার রাঘবকে আমার সঙ্গে যাইতে দিবেন। যতক্ষণ না আমি আপনার রাজ্যের বাহিরে যাই, ততক্ষণ আমায় কোনরূপ বাধা দিবেন না।"

প্রতাপ যখন দেখিলেন, বলবন্তের হস্তে তাঁহার নিস্তার নাই—তখন অগত্যা তিনি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। প্রতাপের কথা নড়িবার নয়। বলবন্ত এই অদ্ভুত কৌশলে—বিনাযুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, শিশু রাজ-কুমার রাঘবকে লইয়া ইশাখাঁর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ইশাখাঁ—বলবন্ত প্রমুখাৎ সমস্ত কথা অবগত হইয়া, তাঁহার বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বলবন্ত! মনে করিও না—প্রতাপাদিত্য তোমা-কর্ত্তৃক এইভাবে লাঞ্ছিত হইয়া, কোনরূপ প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে না। শীঘ্রই সে আমাদের রাজ্য-আক্রমণ করিতে পারে, অতএব এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।"

ইশাখাঁর অনুমানই সত্য হইল। নির্জ্জিত প্রতাপ, মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্থলপথে ও জলপথে বিপুল-বাহিনী লইয়া, ইশাখাঁর আশ্রয়দুর্গ হিজলী আক্রমণ করিলেন। তিনিও তাঁহার নৌ-সেনাধ্যক্ষ রডা, হিজলীর উপর ক্রমাগতঃ গোলাবর্ষণ করিয়া হিজলীবাসীদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। শঙ্কর প্রভৃতি সেনানায়ক-গণ, চারিদিক হইতে স্থলপথে ও জলপথে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষ নিক্ষিপ্ত—গোলার আঘাতে, ইশা-খাঁ-মছন্দরী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। বলবন্তও অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া, শেষরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, শত্রু হস্তে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন।

হিজলী-জয়ের পর, প্রতাপ রূপরাম ও রাঘবকে ধরিবার জন্য, সেনাপ্রেরণ করিলেন। রূপরাম—ইতিপূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়া, রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাদের ধরিতে না পারিয়া, প্রতাপ বড়ই মনঃক্ষুন্ন হইলেন। যুদ্ধান্তে হিজলীর হিন্দু রাজ-কর্ম্মচারিগণের হস্তে রাজ্যের শাসনভার দিয়া, লুণ্ঠিত দ্রব্য-সম্ভার সহ, তিনি যশোরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

প্রতাপ এই অসম্ভব বিজয়লাভে অধিকতর দর্পিত হইয়া, মহোল্লাসে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নগরবাসীগণও তোরণাদি নির্ম্মাণ দ্বারা উৎসবাদি করিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিলেন। প্রতাপ এই সমরবিজয় উপলক্ষ করিয়া, অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন ও সেনাগণকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

নিম্নবঙ্গে প্রতাপ যেরূপ বর্দ্ধিত-প্রতাপ হইয়া, স্বাধীনতা-লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তেমনি আর দুইজন শক্তিমান পুরুষ, পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, স্বাধীন-রাজ্যের সূচনা করিবার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহারা বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায় ও কেদাররায়। চাঁদরায়—কেদাররায় অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ, কেদাররায় সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, সমর-কুশল এবং প্রতাপের অপেক্ষা প্রতিভাবান ছিলেন। যে সকল কলঙ্ক, প্রতাপের জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছিল কেদাররায়ের সে সব কিছুই ছিলনা। পরে আমরা চাঁদরায়-কেদাররায় প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

প্রতাপ যখন শুনিলেন—যে বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায় ও তাঁহার কনিষ্ঠ কেদাররায়, পূর্ব্ববঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তিনি রায়-রাজাদের দমনের নিমিত্ত, এক অভিযান ব্যবস্থা করিলেন। প্রতাপের ইচ্ছা নয়, যে সমগ্র বঙ্গে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ হয়। তাঁহার মনের ইচ্ছা এই—অগ্রণীরূপে তিনি সকলের পুরোবর্ত্তী হইয়া, বঙ্গদেশকে মোগলের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করেন। কাজেই প্রতাপ—এবং তাঁহার সেনাপতিবর্গ, বিপুলবাহিনী লইয়া বিক্রমপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শঙ্কর প্রভৃতি সেনাপতিগণের পরামর্শে, তিনি চারিধার হইতে বিক্রমপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কেদাররায় এরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া, যখন তিনি বুঝিলেন—প্রতাপের সহিত বর্ত্তমান

অবস্থায় প্রতিযোগীতা করা অসম্ভব—তখন অগত্যা তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিলেন। প্রতাপও—কেদাররায়ের সহিত সন্ধি করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বর্দ্ধিত-প্রতাপ প্রতাপ, উপর্য্যুপরি কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, মত্ত যুদ্ধাশ্বের মত অতিশয় অধীর—হইয়া উঠিলেন। মোগলের বিরুদ্ধে, যুদ্ধানল প্রজ্জলিত করিয়া, শক্তি—পরীক্ষার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এ অবসরেরও অভাব হইল না।

তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি ও অমাত্যগণের সহিত—একদিনের মন্ত্রণাতেই স্থির হইল—যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ—প্রিয়সুহৃদ শঙ্কর, দেশে দেশে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া—দেশবাসীগণকে তাহাদের শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝাইয়া দিবেন, তাহাদিগের প্রাণে স্বাধীনতা-প্রয়াস উদ্দীপ্ত করিবেন। তাহাদিগকে একতা সুত্রে আবদ্ধ করিয়া, এমন এক বিরাট-শক্তির—সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশ মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে পারে। এই কার্য্য-সাধনের জন্য, সাহসে ভর করিয়া, শঙ্কর নানদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি সুদূর মিথিলায় উপস্থিত হয়েন। সমস্ত দেশকে শক্তি-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া, শঙ্কর সকলের চক্ষে পূজ্য ও বরেণ্য হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালী শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে বীর্য্যবান মৈথিলিগণ—গুরুর ন্যায় মান্য করিতে লাগিলেন। *

প্রতাপও এদিকে তাঁহার সেনাপতিগণকে বিভিন্ন কার্য্যের ভার-প্রদান করিয়া, রাজ্যের নানাস্থান যথাসম্ভব সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকান্ত, ভবানীদাস, মদন, প্রতাপসিংহ, রডা-ফিরিঙ্গি প্রভৃতি সেনাপতিগণ—দুর্গ নির্ম্মাণ, তদুপযোগী অস্ত্রাদি সংগ্রহ, সৈন্যগণকে নব-প্রণালীতে যুদ্ধশিক্ষা দান, রসদ-সংগ্রহ প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। চারিদিকেই উত্তেজনা—উৎসাহ—যুদ্ধোদ্যম। সকলেই মনে মনে ভাবিল; শীঘ্রই বঙ্গদেশে একটা মহা-বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

প্রতাপ যখন ধুমধামে বসিয়া, এই সমস্ত বিরাট আয়োজনে ব্যস্ত—সেই সময়ে প্রতাপ-সেনাপতি শঙ্কর, ঘটনাবশে রাজমহলে উপস্থিত হন। সেরখাঁ নামক একজন মোগল-কর্ম্মচারী এই সময়ে রাজমহলের শাসন কর্ত্তা

* শঙ্কর—মিথিলায় অবস্থান কালে, গণ্ডকী-তটে ভগবতীর এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। কিম্বদন্তী এই, দ্বারভাঙ্গা প্রদেশের হায়াঘাটে শঙ্কর-স্থাপিত এই প্রতিমূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান। শাস্ত্রীর—প্রতাপাদিত্য।

ছিলেন। তিনি শঙ্করের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সন্ধান পাইয়া, তাঁহার উপর জাতক্রোধ হন। আকবর-সাহের শাসন প্রণালী, সুশাসন-মূলক হইলেও, তাঁহার প্রাদেশিক কর্ম্মচারিরা আগ্রা হইতে অতিদূরে, এই বাঙ্গলায় থাকিয়া নানাবিধ অত্যাচার করিতেন। সেরখাঁ একজন উদ্ধত প্রকৃতির শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি এই সময় এক ব্রাহ্মণ অপরাধীকে বন্দী করিবার আদেশ করেন। ইতিপূর্ব্বে এই ব্রাহ্মণ, শঙ্করের শক্তি ও সাহসের কথা শুনিয়াছিলেন। অপরন্তু শঙ্কর এই সময়ে রাজমহলে অবস্থান করিতে-ছেন শুনিয়া, রাজদণ্ড-ভীত, অত্যাচার-গ্রস্ত ব্রাহ্মণ—শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। শঙ্করও সেই ব্রাহ্মণকে নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখেন।

সেরখাঁ, শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে দমন করিবার জন্য, শনির ন্যায় সূত্রানুসন্ধান করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে অতি সহজে সেই সূত্র মিলিল। সেরখাঁ শঙ্করকে বলিয়া পাঠাইলেন—"এ ব্যক্তি রাজদ্বারে অপরাধী। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিয়া ভাল কাজ করেন নাই। এখনই অপরাধীকে প্রত্যর্পণ করুন।" মহাপ্রাণ, আশ্রিত-বৎসল শঙ্কর বলিয়া পাঠাইলেন—"সাহেব! এ ব্যক্তি আমার শরণাগত। ইহার কৃত ক্ষতি, আমি পূরণ করিয়া দিতে প্রস্তুত—কিন্তু আশ্রিতকে কখন ত্যাগ করিতে পারিব না।"

এই কথায় সেরখাঁ, রাজকর্ম্মচারিগণকে কর্ত্তব্য-কার্য্যে বাধা দেওয়ার অভিযোগে, শঙ্করকে কারাবদ্ধ করেন। বিদেশে মোগল শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক—শঙ্করের কারাবরোধ বার্ত্তা, প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি অতিশয় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়া, বন্ধুর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তর্ক-বিতর্কের পর এই স্থির হইল, যে কারাগারের হিন্দু প্রহরী-গণকে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া, শঙ্করকে মুক্ত করিতে হইবে। এ উপায় ব্যর্থ হইল না। শঙ্কর কারামুক্ত হইয়া, যশোরের দিকে ধাবমান হইলেন।

পরদিন—সেরখাঁ—কারাগার হইতে শঙ্করের পলায়ন-বার্ত্তা শ্রবণে, ক্রোধান্ধ হইয়া, প্রহরীদের দণ্ডিত করিলেন এবং পলায়িত ব্যক্তির অনুসরণের জন্য—চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন। এমন কি—তাঁহার গুপ্ত-প্রণিধিগণ ছদ্মবেশে যশোহর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তাহারা শঙ্করকে পাইল না বটে—কিন্তু যশোহরে প্রতাপের যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিল, সবই, সেরখাঁকে জানাইল।

একজন বাঙ্গালী-জমীদার, সেনা-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, দুর্গ-প্রতিষ্ঠা করিতেছে, মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এ সংবাদে সেরখাঁ অধৈর্য্য হইয়া—শঙ্করকে ধৃত ও প্রতাপকে নির্জ্জিত করিবার জন্য, সৈন্যসমেত যশোহরের দিকে যাত্রা করিলেন।

প্রতাপাদিত্য তাঁহার গুপ্ত-প্রণিধিগণের মুখে সংবাদ পাইলেন, যে মোগল-শাসনকর্ত্তা সেরখাঁ, তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে যশোহরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনিও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। সেরখাঁকে বাধা দিবার উদ্যোগ আয়োজন সবই সম্পূর্ণ হইল। তিনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে সের খাঁর সেনাগণকে আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধের পরিণামে, সেরখাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মোগলের সহিত যুদ্ধে—প্রতাপ এই প্রথম জয়লাভ করিলেন।

এই অসম্ভাবিত জয়-লাভে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, প্রতাপাদিত্য, তাঁহার মিত্র-রাজ বর্গকে—এই বিজয় সংবাদ প্রদান করিলেন। এই সংবাদে, বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকগণের অনেকেই মহা-সাহসী হইয়া, মোগলদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। প্রতাপাদিত্যচরিতে লিখিত আছে—"এই সময়ে সকলেই স্বীয় শক্তি অনুসারে, মোগল-সম্রাটের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিল না। কেহ বা দিল্লীগামী মোগল-রাজকোষ লুণ্ঠন, কেহ বা মোগল-সৈন্য-নিবাসে অগ্নি প্রদান, কেহ বা অল্পসংখ্যক মোগলসেনাকে দল বাঁধিয়া আক্রমণ, কেহ বা মোগলদের যাতায়াতের পথে, রাস্তা-ঘাট-পোল সমূহ ভাঙ্গিয়া যথেষ্ট পরিমাণে—অনিষ্ট-সাধন করিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া, বিক্রমপুরাধিপতি কেদাররায়ও মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। এই সময়ে সমগ্র বঙ্গ এক প্রাণে মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল।"

প্রতাপের শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী, পরিশেষে সম্রাট-দরবারে আকবর সাহের কাণে পৌছিল। বসন্তরায়ের জামাতা—রূপরাম বসু, রাজপুত্র রাঘবকে (কচুরায়) লইয়া, দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজধানীতে পৌছিয়া, রূপরাম নানা কৌশলাবলম্বনে বাদসাহের সহিত পরিচিত হইলেন। অবসর বুঝিয়া, তিনি প্রতাপ কর্ত্তৃক তাঁহার শ্বশুরের হত্যাকাণ্ড, কচুরায়ের উদ্ধার, ঈশাখাঁর সহিত প্রতাপের যুদ্ধ, প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার, সম্রাটের কর্ণগোচর করেন। আকবরসাহ—প্রতাপের এই স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া, ইব্রাহিম খাঁ নামক একজন মোগলসেনাপতিকে, সৈন্য-সমেত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগতঃ যাত্রা করিয়া, অসংখ্যবাহিনী সমভিব্যাহারে ইব্রাহিম খাঁ মোগলের রাজধানী রাজমহলে উপনীত হন। পথক্লেশ দূর হইলে রাজমহল ত্যাগ করিয়া, তিনি সপ্তগ্রামাভিমুখে আসেন। সপ্তগ্রামে পৌছিয়া প্রণিধিগণ মুখে, তিনি সংবাদ পাইলেন—সুন্দরবন ও তৎসমীপস্থ স্থান—সমূহ নদী-সংকুল, সুতরাং এ ক্ষেত্রে নৌকাপথে সেনা লইয়া যাওয়াই ঠিক। মোগল সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ, প্রচুর রসদ সমেত অসংখ্য সেনাপূর্ণ নৌকা লইয়া, দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রতাপ প্রতিমুহূর্ত্তেই দিল্লী হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত, অভিযানের আশা করিতেছিলেন। ইব্রাহিম সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া, তিনি সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। ইব্রাহিমের আসিবার পথেই প্রতাপের মাতলা-দুর্গ। প্রতাপ, এই দুর্গকে সবল সৈন্যপূর্ণ করিয়া, অতি সুদৃঢ় ভাবে সুরক্ষিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রায়গড় দুর্গও সুরক্ষিত হইল। *

পথিমধ্যে, ইব্রাহিম খাঁ সর্ব্বপ্রথমে রায়গড়-দুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু এ অবরোধের ফল বড়ই শোচনীয় হইল! প্রতাপের যুদ্ধনীতি-জ্ঞান, ইব্রাহিম খাঁর রায়গড় আক্রমণ বিফল করিয়া দিল। বল-দর্পিত মোগল-সৈন্য, যেরূপ ভাবে রায়গড়ের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল, প্রতাপের সৈন্যেরাও সেইরূপে মোগলদিগের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া সেনাক্ষয় করিতে লাগিল।

প্রতাপ ইতিপূর্ব্বে রায়গড় অবরোধের সংবাদ পাইয়া, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে, মোগল-সেনার পার্শ্বদেশ আক্রমণের জন্য নিযুক্ত করেন। সূর্য্যকান্ত, বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, মোগলশিবিরে আগুন লাগাইয়া দেন। বায়ুবশে এই অগ্নি-শিখার জ্যোতিঃ, চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইলে, সূর্য্যকান্ত মোগলদিগকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারিয়া, ঘোরতর রূপে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে, মোগলসৈন্য বিভীষিকা-গ্রস্ত হইল! বৃথা লোকক্ষয় অপ্রয়োজন ভাবিয়া, সূর্য্যকান্ত সৈন্যসমেত মাতলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এ দিকে ইব্রাহিম-খাঁও রায়গড়ে বৃথা সৈন্যক্ষয় অবিবেচনার কার্য্য ভাবিয়া, তথায় অল্প সংখ্যক সেনা রাখিয়া, মাতলা-দুর্গ অবরোধ করিবার

* এই রায়গড় দুর্গ কলিকাতার দক্ষিণে কোনও স্থানে ছিল। 'প্রতাপাদিত্যচরিত্র-লেখক শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, এই রায়গড় বেহালা-বড়িষার সন্নিকটে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেহালা ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানগুলি রাজা বসন্তরায়ের জমিদারী-ভুক্ত হইয়াছিল'। প্রতাপের রাজ্যমধ্যে রায়গড় নামধেয় অনেক গুলি দুর্গের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

জন্য অগ্রসর হইলেন। মাতলা-দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, প্রতাপের সৈন্যগণ, মোগলসৈন্যের উপর ভীষণ গোলা-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। স্থলপথে যে সকল মোগল-সৈন্য আসিয়াছিল, সূর্য্যকান্ত ও শঙ্কর, পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ভীমাক্রমণে, তাহাদের বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিলেন। পর্টুগীজ রডা, জলপথে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। আহত ও নিহতগণের শোণিত-স্রোতে নদীর জল আরক্ত-বর্ণ ধারণ করিল। স্বয়ং প্রতাপ ও শঙ্কর, ব্যূহের নানাস্থানে উপস্থিত হইয়া, হিন্দু-সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ-যুদ্ধের পরিণামে, প্রতাপের হস্তে ইব্রাহিম-খাঁ পরাজিত হইলেন। যে স্থানে এই ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল—আজও তাহা "সংগ্রামপুর" নামে সাধারণে পরিচিত। প্রতাপ, মোগলসৈন্যকে মাতলার যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া, রায়গড়ের সাহায্যার্থে, প্রচুর সেনা প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধের পরিণামে, নানাবিধ বিজয়লব্ধ পদার্থ লইয়া, প্রতাপাদিত্য সেনাপতিগণ-সহ যশোরে ফিরিয়া আসিলেন এবং এই সমর-বিজয় সংবাদ চারিদিকে বিঘোষিত করিবার জন্য, মহা-সমারোহে যশোরেশ্বরীর পূজা ব্রাহ্মণ-ভোজন, দরিদ্রকে দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইল।

ক্রমাগতঃ উপর্য্যুপরি কয়েকটী যুদ্ধে বিজয়লাভে সাহসী হইয়া, মহারাজ প্রতাপাদিত্য পরিশেষে মোগল-সাম্রাজ্য আক্রমণের সংকল্প করিলেন। এ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে, তিনি স্বরাজ্য শাসন-সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা করেন। দূরদেশে যুদ্ধকার্য্যে ব্যস্ত থাকিবার সময় যাহাতে রাজ্যের আভ্যন্তরিণ শৃঙ্খলার কোন বিপর্য্যয় না ঘটে, তজ্জন্য তিনি তাঁহার নিকট আত্মীয় ভবানীদাস ও লক্ষ্মীকান্ত নামক এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে, রাজস্ব ও শাসন-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। প্রতাপ উপযুক্ত পাত্রেই এই দায়িত্ব-ভারার্পণ করিয়াছিলেন। এই দুইজন কর্ম্মচারী তাঁহার অবর্ত্তমানে, অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া, প্রজা সাধারণের প্রীতি-ভাজন হয়েন।

এই লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে, আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। প্রতাপাদিত্যের পরাভবের পর, মহারাজ মানসিংহ—তিনজন "মজুমদারের" মধ্যে বঙ্গরাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। "তিন মজুমদারের মধ্যে বাঙ্গালাভাগ" বলিয়া একটী প্রবাদ আজও এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। "মজুমদার" বাদসাহী আমলের উপাধি। বঙ্গের করসংগ্রাহকগণ, সরকার হইতে এই উপাধি—পাইতেন। এই তিন মজুমদারের নাম, লক্ষ্মীকান্ত,

ভবানন্দ, জয়ানন্দ। লক্ষ্মীকান্ত—বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীগণের আদিপুরুষ। জয়ানন্দ,—বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের আদিপুরুষ। আর ভবানন্দ কর্ত্তৃক, কৃষ্ণনগর রাজবংশের সূচনা হয়। আমরা কালীঘাট প্রসঙ্গে, লক্ষ্মীকান্ত সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করিব। কারণ বর্ত্তমান কালীঘাটের সহিত এই লক্ষ্মীকান্তের বংশধরগণের সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য।

প্রতাপ—লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, শুভদিনে মোগল-সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন। নদী-বহুল সুন্দরবন বিভাগে, নৌকা-যানে সেনাচলাচল করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাকর ভাবিয়া, সুবৃহৎ পোতাদি, সৈন্য ও রসদ পরিপূর্ণ করতঃ, তিনি সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-ভীতিময় স্থান সমূহের মধ্যদিয়া,নৌকা চালাইতে লাগিলেন। অগ্রপশ্চাতে কয়েকখানি পোত ব্যূহরূপে থাকিয়া, মধ্যবর্ত্তী সৈন্য-পূর্ণ নৌকাগুলির রক্ষক রূপে চলিল। প্রতাপ, সুন্দরবন পার হইয়া—গঙ্গায় পড়িলেন। সপ্তগ্রাম সেই সময়ে বাণিজ্য-পূর্ণ উন্নত বন্দর—মোগল-রাজকর্ম্মচারিদের প্রধান আশ্রয়-কেন্দ্র। প্রতাপ সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া, এক দল সেনাসহ সহসা নগর আক্রমণ করিলেন।

এই সংবাদ দেশের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইল। সুযোগ পাইয়া, উড়িষ্যার হিন্দু নৃপতিগণ ও নির্জ্জিত পাঠানগণ, নানাদিক হইতে মোগল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। দেশময় একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

মোগলদিগের গঙ্গাতীরবর্ত্তী আশ্রয়-কেন্দ্র সমূহ আক্রমণ করিতে করিতে, প্রতাপ রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহী পাঠানেরাও এই সময়ে তাঁহার সহিত যোগ দিল। মোগলের রাজমহল দুর্গ হিন্দু-সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। রসদ না পাওয়ায় ও ভবিষ্যতের শোচনীয় পরিণাম বুঝিয়া, মোগল-সেনাপতি ও সেনাগণ প্রতাপের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

রাজমহলে স্ব-নির্ব্বাচিত একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, প্রতাপ পাটনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইতি পূর্ব্বে বিহার-প্রদেশের জমীদারগণও মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। প্রতাপকে বিজয়ীরূপে আসিতে দেখিয়া, তাঁহারা তাঁহার পতাকার অধীনতা স্বীকার করিলেন। শঙ্করের সহিত বিহার প্রদেশের অনেক ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীর বন্ধুত্ব হইয়াছিল। প্রতাপ ইঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া, পাটনা-নগরী আক্রমণ করেন।

পাটনা উন্নত সহর। বিহারের মোগল—রাজধানী। মোগলের প্রধান সেনানিবেশ। প্রতাপ ইহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া, বীর-বিক্রমে, অসম সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কয়েকদিনের ভীষণ যুদ্ধে এবং

হিন্দুপক্ষের ক্রমাগতঃ গোলাবর্ষণে, দুর্গ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িলে, হিন্দুগণ দুর্গ দখল করিলেন। যুদ্ধান্তে প্রতাপ পাটনা ও বিহার প্রদেশীয় জমীদারদের হস্তে, পাটনার শাসনভারার্পণ করিয়া বিজয়ী বীররূপে, স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

ভারতসম্রাট আকবরসাহ যখন শুনিলেন—বিদ্রোহী ভূঁইয়া প্রতাপাদিত্য পাটনা ও রাজমহল দখল করিয়া, মোগল-সেনাকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি মহাক্রোধান্ধ হইয়া, আজিম-খাঁ নামক এক সুদক্ষ মোগল-সেনাপতিকে প্রতাপের দমনের জন্য প্রেরণ করেন।

আজিম-খাঁ শক্তিশালী মোগলসেনা লইয়া, কয়েক মাস ধরিয়া ক্রমাগতঃ কুচ করিয়া, কলিকাতার নিকট শিবির স্থাপন করিলেন। এ সংবাদ প্রতাপের কর্ণগোচর হইল। পথিমধ্যে আজিম-খাঁ, প্রতাপের সৈন্য হইতে কোন রূপ বাধা প্রাপ্ত হন নাই। প্রতাপ—আজিমখাঁকে কৌশলে বন্দী বা বধ করিবার জন্যই, এই উপায়াবলম্বন করিয়াছিলেন। আজিম-খাঁ তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন—প্রতিপক্ষীয়গণ শক্তির অভাবেই তাঁহাকে বাধা দিতেছে না। প্রতাপ একদিন গভীর রাত্রে, বিশ্বস্তচিত্ত আজিমখাঁর শিবির আক্রমণ করিলেন। প্রতাপসৈন্য, বীর-বিক্রমে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া,মোগলদের সঙ্গে লড়িয়া, শত্রুদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করিল। প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত লেখকের মতে,এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রায় বিংশতি সহস্র মোগলসৈন্য নিহত ও বন্দী হয়। এ ভীষণ যুদ্ধের পর, প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপযোগী সামগ্রী ও নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্যে প্রতাপের রাজ-কোষ পূর্ণ হয়। এই অসম্ভব বিজয়বার্ত্তা—তড়িতগতিতে, সমস্ত বঙ্গে প্রধাবিত হইল। সকলেই একমুখে প্রতাপের অসীম শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ শেষ হইলে, প্রতাপ যুদ্ধ-নিহত মুসলমানগণের মৃতদেহ, সমাধিস্থ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া, স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। সেকালের ঘটক-কারিকার এই মহাযুদ্ধের একটী বিবরণ আছে। পাঠকের অবগতির জন্য তাহা আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। *

* আজিমাগমন বার্ত্তাং শ্রুত্বাপি স নৃপোত্তমঃ।
অধাবৎ সিংহনাদেন স্বসৈন্য পরিবেষ্টিতঃ।
নিজগাম তদাদুর্গ-মাজিমো হি স্থিতো যথা।
নিঃস্বনং ঘোর বামিন্ত্রামাক্রম্য তৎবলংবলাৎ।
প্রগৃহ্য বিবিধানস্ত্রান্ স ববর্ষ মুহুর্মুহুঃ।
অদ্ভুতং সমরং ঘোরং, কৃতাসৌ শমনোপমঃ।
বিংশসহস্র সৈন্যানী ঘাতয়িত্বা ক্ষণং তদা।
আজিমং পাতয়ামাস তীব্রঘাতেন ভূতলে। (প্রাচীন ঘটককারিকা)

এই ভীষণ পরাজয় সংবাদ, যখন দিল্লীশ্বর আকবর-সাহের নিকট পৌছিল, তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সভাসদ—বিশেষ গণনীয় দ্বাবিংশতি জন আমীরকে, তিনি অসংখ্য সৈন্য সমেত প্রতাপের দমনের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন।

এই নব-নিযুক্ত, দ্বাবিংশতি আমীর-সেনাপতিগণ, তাঁহাদের গন্তব্য পথের মধ্যে কোন রূপ বাধা প্রাপ্ত না হইয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে যশোর-প্রান্ত-বাহিনী যমুনা-তীরে সৈন্যসমেত উপস্থিত হইলেন। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার সময়, তাঁহারা প্রতাপ-সৈন্য হইতে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হন নাই। কাজেই সকলেই বিশ্বস্ত চিত্তে, একেবারে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। এখন প্রতাপকে ধরিতে পারিলেই তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধি হয়—এই ভাবিয়া তাঁহারা অসি ও শৃঙ্খল সহ, প্রতাপের নিকট একজন দূত-প্রেরণ করিলেন। এই অসি ও শৃঙ্খল প্রেরণের অর্থ এই—"হয় বশ্যতা স্বীকার কর—না হয় যুদ্ধার্থে অগ্রসর হও।" প্রতাপ, মোগল দূতের নিকট হইতে অসিগ্রহণ করিয়া জানাইলেন—"যে তিনি বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু যুদ্ধার্থে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

দূরদর্শী প্রতাপ, এই অতর্কিত বিপদে চিন্তিত হইয়া, এক গুপ্ত মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলেন। মহাবীর শঙ্কর বলিলেন—"বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে শত্রুনাশে আমাদের বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। সুন্দরবন বিভাগের চতুর্দ্দিকস্থ জলাভূমি, বর্ষায় কিরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করে, তাহা সকলেই জানেন। শত্রুপক্ষের নৌকাগুলি নষ্ট করিয়া দিলেই, আমাদের অর্দ্ধেক কাজ হইয়া যাইবে। তারপর শমন-রাজ প্রেরিত, বর্ষার ভীষণ রোগ সমূহ একবার মোগল-শিবিরে প্রবেশ করিলে, শত্রুক্ষয় কার্য্য আরও অগ্রসর হইবে। আমার মতে খণ্ড-যুদ্ধে, মোগলসেনাকে চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিলেই আমরা জয়ী হইব।"

শঙ্করের এই মত সকলেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করায়, প্রতাপ তাঁহার নৌ-সেনাপতি মহাবীর্য্যবান পর্টুগীজ রডাকে, শত্রুর নৌকাগুলি বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। রঘু ও সুখা নামক দুইজন বীর, স্থলপথে সৈন্য লইয়া গিয়া মোগলদের রসদ-সংগ্রহ কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত, শত্রু পক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ও খণ্ড-যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন। মোগলদের রসদবাহী নৌকা-সমূহ হিন্দুদের. হাতে পড়িতে লাগিল। দেশব্যাপী সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না।

ইহার পর ভীষণ বর্ষা আসিল। কয়েক দিন ধরিয়া, অনবরত প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায়, সমস্ত দেশ জলে পরিপূর্ণ হইল। উন্নত স্থান সমূহ দ্বীপাকার ধারণ করিল। বিষাক্তসর্প, কীট, মশক, জলৌকাগণ, বাদা-ভূমিস্থিত মোগল শিবিরে—সৈন্যগণ মধ্যে মহা উৎপাত উপস্থিত করিল। সুযোগ বুঝিয়া যমরাজের প্রধান সেনানীরূপে জ্বরও মোগল-শিবিরে প্রবেশ করিল। ইহার উপর মোগল-শিবিরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এই ভীষণ সময়ে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, প্রতাপ চারিদিক হইতে শত্রু-শিবির আক্রমণ করিলেন। কয়েক দিনের দিবা-রাত্র-ব্যাপী যুদ্ধে, জনকয়েক প্রসিদ্ধ মোগল-সেনাপতি নিহত হইলেন। প্রতাপের পক্ষেও বহু লোক ক্ষয় হইল। * কিন্তু প্রতাপই পরিশেষে এই ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। এই যুদ্ধের পর, সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল-শাসন-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া, হিন্দুরাজ্যে পরিণত হইল।

এই শোচনীয় পরাজয় সংবাদ, যথাসময়ে দিল্লীতে পৌঁছিল। আকবরসাহ তখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। আগ্রার রাজপ্রাসাদ মধ্যে, তখন মহা হুলস্থূল! আগরার সিংহাসন লইয়া, তখন মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব-সূচনা দেখা দিয়াছে। মহারাজ মানসিংহ উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, ভাগিনেয় সাহাজাদা খসরুকে, সিংহাসনে স্থাপিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। সুলতান সেলিমের (ভবিষ্যৎ জাহাঙ্গীর) ভাগ্য-সূত্রও এই বিপ্লব-স্রোতে প্রবলভাবে আন্দোলিত। রাজ্যের প্রধান প্রধান মন্ত্রী, সেনাপতি ও আমীর-ওমরাহ-বর্গ উভয়পক্ষেই বিভাজিত। এই ভীষণ সময়ে, আকবরসাহের নিকট বঙ্গদেশে হিন্দু কর্ত্তৃক মোগলের পরাজয় সংবাদ পৌঁছিল।

নিয়তিবশে মহাশক্তিমান সম্রাট আকবরসাহ—ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। সেকেন্দ্রার সমাধি-গর্ভে, তাঁহার বীর-দেহ—সমাহিত হইল। "দিল্লীশ্বরোবা—জগদীশ্বরোবা" এই শৌর্য্য-বীর্য্য গৌরব-জ্ঞাপক বিশেষণ সেই দিন হইতে লোপ পাইল। মোগল-সাম্রাজ্যের চূড়া খসিয়া পড়িল।

মৃত্যুকালে আকবরসাহ, জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহাজাদা সেলিমকে, সিংহাসনের অধিকারী-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া যান। সেলিম "জাহাঙ্গীর" উপাধি ধারণ করিয়া, ভারতের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মানসিংহ ও আজিম খাঁ বিফল মনোরথ হইয়া, নব বাদসাহের কোপমুখ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

* বশীরহাটের অপর পারে, ইচ্ছামতী তটে এই লোকক্ষয়-কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়।

জাহাঙ্গীর ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, মানসিংহকে তাঁহার বড়ই প্রয়োজন। বঙ্গদেশের ভীষণ বিদ্রোহ ব্যাপার, তাঁহার হৃদয়কে বড়ই আলোড়িত করিতেছিল। মানসিংহ—বিংশতি সহস্র বলীয়ান, সুযোদ্ধা রাজপুত-সেনার অধিনায়ক। কাজেই জাহাঙ্গীর—ধীরতা অবলম্বনে মানসিংহকে বলিয়া পাঠান—"মহারাজ! আমি আপনার এবং আমার পুত্র যুবরাজ খসরুর, সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। আগরা-দরবারস্থ যে সমস্ত আত্মীয়-বন্ধু এবং আমীর-ওমরাহ ইতি পূর্ব্বে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও মার্জ্জনা করিলাম। আপনারা পুনরায় সম্রাট সরকারে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন।"

এই অভয়বাণী পাইয়া, মহারাজ মানসিংহ আগরায় ফিরিয়া আসেন। কিয়ৎদিন পরে—জাহাঙ্গীর মানসিংহকে, বঙ্গের বিদ্রোহ-দমনের, সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া, বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। জাহাঙ্গীরের মনের গূঢ় উদ্দেশ্য অন্যরূপ। তিনি মানসিংহের উপর বহুদিন হইতেই বিরক্ত। তিনি মনে ভাবিলেন—মানসিংহের মত এক প্রতাপশালী ব্যক্তিকে, সিংহাসনের এত নিকটে রাখা, কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। অথচ তাঁহাকে গোপনে হত্যা করা অতি অসম্ভব কার্য্য। বঙ্গদেশে যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হইলে, মানসিংহ রাজধানী হইতে দূরেও থাকিবেন—অথচ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যদি তিনি শত্রুহস্তে নিহত হন—তাহা হইলে তাঁহার এক প্রবল শত্রু অতি সহজেই ধরাধাম হইতে অপসৃত হইবে।

কাবুল-বিজয়ী, বীরত্বাভিমানী, মহারাজ মানসিংহ—অগণ্যবাহিনী সমেত বঙ্গ-দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া, তিনি বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার পূজাদি করিলেন। সেই সময়ে কাশীতে তাঁহার মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা হইতেছিল—তাহার সম্বন্ধেও নানাবিধ সুব্যবস্থা করিলেন।

একদিন মানসিংহ দেখিলেন—এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর, গৈরিকধারী গম্ভীর-মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া, একান্ত চিত্তে ভগবানের স্তব পাঠ করিতেছেন। তাঁহার নয়ন-প্রান্ত দিয়া, ভক্তি-অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্তব-মন্ত্র, উদাত্ত-অনুদাত্তাদি স্বরে অনুপ্রাণিত হইয়া, সেই নির্জ্জন স্থান বিকম্পিত করিতেছে।

সন্ন্যাসী গভীর রাত্রে, সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। মহারাজ মানসিংহ নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। সন্ন্যাসী এক নির্জ্জনমঠে প্রবেশ করিলেন। মানসিংহও তাঁহার অনুসরণ করিয়া মঠাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

তিনি সন্ন্যাসীর চরণ বন্দনা করিয়া, কৌশলে পরিচয় লইয়া জানিতে পারিলেন—এই তেজঃ-পুঞ্জময় সন্ন্যাসীর নাম—কামদেব ব্রহ্মচারী।

মানসিংহ যে কয়দিন বারাণসীতে ছিলেন, সেই কয়দিন কামদেব ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। ব্রহ্মচারীর শাস্ত্রজ্ঞান, নিষ্ঠাবৃত্তি দেখিয়া, মহারাজ মানসিংহ মনে মনে তাঁহার প্রতি অতীব অনুরক্ত হইলেন। এই একান্ত অনুরাগ হইতে দৃঢ় ভক্তি আসিল। মানসিংহ পরিচয়ে জানিলেন, এই নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী, সাবর্ণ-গোত্রসম্ভূত একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ। মহারাজ মানসিংহ, কামদেব ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। *

ভারত-বিজয়ী মানসিংহ, তাঁহার গুরুর নিকট হইতে কৌশলে, কথার ছলে, বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য অবগত হন। ইহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

মানসিংহ বঙ্গদেশে যাইতেছেন শুনিয়া, বহুদিন পরে কামদেবের মনে লুপ্তপ্রায় পুত্র-স্নেহ জাগিয়া উঠিল। তিনি মানসিংহকে বলিলেন—"বৎস! তোমার ন্যায় শক্তিমান পুরুষ এ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। আমি আমার শিশুপুত্রকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছি। আমার প্রাণ এখন সেই শিশুপুত্রের জন্য অতি কাতর। আমার পুত্রকে যে উপায়ে পার, সন্ধান করিয়া বাহির করিবে। জানিও—ইহাই তোমার গুরু-দক্ষিণা।"

এই কামদেব ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে আমরা দুই একটী অতি প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা নিতান্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কামদেবের বংশধরগণ—এখনও বর্ত্তমান। আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কামদেবের স্বহস্ত লিখিত এক আত্মপরিচয় পাইয়াছি। তাহা আমরা পরে সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করিব।

* অনেকে বলেন, মানসিংহ আগে বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন। এই কামদেব ব্রহ্মচারীই তাঁহাকে শাক্তমতে দীক্ষিত করেন। এ কথা কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মহারাজ মানসিংহ, যে সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া যশোহর জয় করেন, প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন, সে সময়ে তিনি ঘোর-শাক্ত। কারণ এরূপ কিম্বদন্তী আছে—যে মানসিংহ, যুদ্ধজয় হইবার পর, যশোহর নগরে প্রবেশ করিয়া, মহাসমারোহে "যশোরেশ্বরীর" পূজা করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই "যশোরেশ্বরীকে" বঙ্গদেশ হইতে নিজের অম্বর-রাজধানীতে লইয়া যান। অম্বর সহরে আজও এ মূর্ত্তি বর্ত্তমান। যশোরেশ্বরীর পূজার জন্য মানসিংহ কয়েকজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকেও সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারাই অম্বরপ্রাসাদস্থিত যশোরেশ্বরীর পূজক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের বংশধরেরা আজও তথায় অবস্থান করিতেছেন। তবে তাঁহাদিগকে সহসা বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, স্বনামধন্য বঙ্গাধিপতি আদিশূর মহারাজ, কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে, যে পঞ্চজন বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ যজ্ঞার্থে আনয়ন করেন, তন্মধ্যে সাবর্ণ-গোত্রসম্ভূত—বেদগর্ভ একজন। ইনি রাজার নিকট বটগ্রাম প্রাপ্ত হন। এই বটগ্রাম যে কোথায়, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। কান্যকুব্জাগত পাঁচজন ব্রাহ্মণের, ৫৬টী পুত্র জন্মে। আদিশূরের উত্তরাধিকারী, মহারাজ ক্ষিতিসুর এই ৫৬ জন ব্রাহ্মণকে ৫৬টী গ্রাম প্রদান করেন। এই গ্রামদান ব্যাপার হইতে "গাঁই" শব্দের উৎপত্তি হইল। "গাঁই" অর্থাৎ গ্রামাধিকারী। বেদগর্ভের দ্বাদশ-পুত্রের মধ্যে, হল নামধারী এক পুত্র "গঙ্গ" গ্রাম প্রাপ্ত হন। এই জন্য হলের সন্ততিবর্গ গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন।

এই হলের অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষে, কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। কামদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা, বল্লালের সময় কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। এই কৌলীন্য-মর্য্যাদার সমীকরণ কালে, কামদেবের পিতৃপুরুষেরা শ্রোত্রীয়-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। কামদেব শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দিবারাত্র জপ-তপ ও শাস্ত্রচর্য্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার প্রাণ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য, সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত। কিন্তু গুণবতী পত্নীর স্নেহ ও প্রেমে আবদ্ধ থাকায়, তাঁহার সে বাসনা সিদ্ধির কোন সুযোগই ঘটে নাই।

সহসা এ সম্বন্ধে একটী দৈব-প্রেরিত সুযোগ উপস্থিত হইল। ভগবানের ভক্ত—বৈরাগ্য-মার্গ অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সংসার-বন্ধন শৃঙ্খল একটী ঘটনায় ছিন্ন হইল। দারুণ প্রসব বেদনার পর, এক পুত্র প্রসব করিয়া, কামদেব পত্নী—পদ্মাবতী, দেহত্যাগ করিলেন।

সম্মুখে পত্নীর মৃতদেহ—আর তাহার ক্রোড়-পার্শ্বে সদ্যোপ্রসূত শিশু। কামদেব একদৃষ্টিতে পত্নীর মৃত-দেহের দিকে চাহিয়া আছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন—"হা ভগবান! হা প্রভু! করিলে কি? এই সদ্যোজাত মাতৃহীন বালকের উপায় কি হইবে? কোথায় আমি মায়ার বন্ধন কাটাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, তাহা না হইয়া—এই মাতৃহীন বালক আমার সংসার-বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া দিল।"

কামদেব এই সমস্ত কথা ভাবিতেছেন—এমন সময়ে সেই পূর্ণকুটীরের চালের মধ্য হইতে একটী জেঠীর (টিকটিকি) ডিম্ব, তাঁহার সম্মুখে পড়িল। পড়িবামাত্রই ডিম্বটী ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহার মধ্য হইতে একটী টিকটিকির

ছানা বাহির হইল। ঘটনাক্রমে একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা, সেই স্থানে আসিবা মাত্রই, সেই সদ্যোজাত জেঠী তাহাকে গ্রাস করিল।

কামদেব সবিস্ময় চিত্তে দেখিলেন—করুণাময় ভগবান সেই সদ্যোজাত জেঠীর আহারের ও জীবনরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেও অমনোযোগী নহেন। যিনি এই ক্ষুদ্র টিক্‌টিকির আহারের বন্দোবস্ত করিলেন, তিনি যে তাঁহার সদ্যোপ্রসূত শিশুর রক্ষা-ব্যবস্থা করিবেন না—তাহা কখনই হইতে পারে না।

কামদেবের জ্ঞান-নেত্র খুলিল। তিনি কৃতজ্ঞতা-বিমুগ্ধ-কণ্ঠে, অশ্রু-পূর্ণ-নেত্রে বলিলেন—"হে মধুসূদন! আজ তুমি আমায় যে শিক্ষা দিয়াছ, তাহাতেই আমার জ্ঞান-নেত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। এই বালক তোমারই আশ্রয়ে রহিল। তুমিই ইহাকে দেখিও।" তিনি একখণ্ড কাগজে দুইটী ছত্র লিখিয়া বালকের বক্ষের উপর রাখিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল—

কাকঃ কৃষ্ণী কৃতো যেন হংসশ্চ ধবলীকৃতঃ।
ময়ূরশ্চিত্রিতো যেন, তেন রক্ষা ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ—"যিনি কাককে কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছেন, হংসকে শ্বেতবর্ণ করিয়াছেন, ময়ূরকে বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনিই এই সদ্যোজাত বালককে রক্ষা করিবেন।"

কামদেব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া, মৃত পত্নীর দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত করিলেন, তৎপরে উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগী হইলেন। *

---

* বঙ্গদেশে গোবাটা গোপালপুর গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি। শৈশবাবধি আমি আমার আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, উপনয়নান্তে মন্ত্র-গ্রহণ পূর্ব্বক, ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া, সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া, নিজ স্ত্রী পদ্মাবতীকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া, ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ পূর্ব্বক, ইষ্ট-সাধনার্থ, পীঠমালা-গ্রন্থে লিখিত, "বঙ্গদেশে চ কালিকা," অর্থাৎ আদিগঙ্গা তীরে যে স্থানে সতী-অঙ্গ পতিত হয়, তাহা নিরাকরণার্থ ও বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত পাষাণময়ী মূর্ত্তি ও তাঁহার রক্ষক যে অনাদিলিঙ্গ—ভৈরব প্রকাশ আছে, তাহা জানিবার জন্য, মাগুরা পরগণার অন্তর্গত আদিগঙ্গাতীরে স্থান নির্ণয় পূর্ব্বক, অরণ্যমধ্যে একটী পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় স্ত্রী পুরুষে—ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন ছিলাম। প্রতি পর্ব্ব নিশিতে, যথানিয়মে দেবীর অর্চ্চনা করিতাম। একদা আমি পরম-তত্ত্ব চিন্তা করিতেছি, এমন সময় পত্নী পদ্মাবতী কহিলেন—"একি আশ্চর্য্য! এতদিন এখানে বাস করিতেছি, এরূপ আশ্চর্য্য অলৌকিক দৃশ্য কখন ত নয়নগোচর হয় নাই।" এই কথা বলিয়া, আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"প্রভো! রাত্রি কি শেষ হইয়াছে? পূর্ব্বদিকে অরুণোদয়ের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কি পদার্থ দেখিতেছি? আপনি ঐ দেখুন।" এই কথা আমার কর্ণগোচর হইবামাত্র, আমি কুটীর-দ্বার হইতে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু ঐ ব্যাপার আমার নয়নগোচর

সংসার-ত্যাগী কামদেব ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী বেশে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে বালককে তিনি নিঃসহায় অবস্থায় কুটীরে ফেলিয়া চলিয়া যান, তাহার চিন্তায়, সেই প্রশান্ত-চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল কিনা—তাহা তিনিই জানেন। এইরূপ ভাবে, কখনও বা গম্ভীর অরণ্যানী মধ্য দিয়া, কখনও বা নদীতীরাবলম্বনে, কখনও বা নৌকাপথে—তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। পাঠক যেন মনে রাখেন, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন ভারত-বিখ্যাত সম্রাট আকবর, দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট।

কামদেব পণ্ডিত—বঙ্গদেশ হইতে যে যে স্থানে গিয়াছিলেন—সেই সকল প্রদেশের পথঘাট তিনি ভালরূপই জানিতেন। তাঁহার এই বহু কষ্টার্জ্জিত জ্ঞানের ফল স্বরূপে, ভবিষ্যতে তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত একমাত্র পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

দেশে-বিদেশে কামদেব ব্রহ্মচারীর যশোগৌরব ব্যাপৃত হইল। সুদীর্ঘ দেহ—বিশালায়ত বাহুদ্বয়—আয়ত-লোচন, অকৃচন্দন-শোভিত বিস্তৃত

হইল না। "কৈ—কি দেখিলে" বলিয়া প্রশ্ন করায়, বনিতা বারম্বার—"ঐ দেখ ঐ দেখ" বলিতে লাগিলেন। আমার দুর্ভাগাবশতঃ কিছুই নয়নগোচর হইল না। আমি তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যায় পতিত হইয়া, অনশনব্রতে জগদম্বার আরাধনা করায়, তৃতীয় দিবসান্তে ঐরূপ নিশাকালে দৈববাণী—হইল—"তুমি জন্মান্তরে আমার দর্শনলাভ করিবে, আর পদ্মাবতী দেহান্তে আমাতে লীন হইবে। তোমার ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে, এক অতি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সেই পুত্র এ প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইবে এবং তাহার বংশ হইতে আমার সেবাদি প্রকাশ হইবেক।" তদনন্তর কিয়ৎ দিবস মধ্যে, পদ্মাবতী গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করিয়াই, স্বর্গারোহণ করিলে, আমি তাহার যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া, ঐ নবপ্রসূত পুত্রের জীবিকার্থ চিন্তা করিতেছি, ইতিমধ্যে পর্ণ-কুটীরের চাল হইতে একটী জোষ্টীর ডিম্ব পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ঐ অণ্ড-নিহিত শাবক ক্রমশঃ সবল হইলে, একটী পিপীলিকা হঠাৎ উহার সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র সে অনায়াসে ধরিয়া ভক্ষণ করিল। আমি মহামায়ার মায়া বুঝিতে পারিয়া জগদীশ্বরীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম—"মাতঃ! সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী! তোমার সৃজিত জীব, তোমারই পালনাধীনে থাকিল"। এই বলিয়া অপত্যমায়া পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-সম্মত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, শ্রীশ্রী৺কাশীধামে অবস্থান করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহার জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া দৈববাণী সকল প্রকাশ করণার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। ইতি—

সাবর্ণমুণির সন্তান—
শ্রীকামদেব গঙ্গোপাধ্যায়।

* কামদেব ব্রহ্মচারীর বংশধর, বড়িশা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরীর পুত্র সতীশ বাবুর নিকট আমি কামদেবের বৃত্তান্ত সম্বলিত একখানি জীর্ণ লিপি প্রাপ্ত হই। তাহারই অবিকল পাঠ উপরে প্রদত্ত হইল।

ললাট-দেশ, গৈরিক-বসন-মণ্ডিত, ত্রিশূল-ধৃত, সেই সুদীর্ঘ মূর্ত্তি—যে দেখিত, সেই সসম্ভ্রমে ভূমে অবনত হইয়া প্রণাম করিত। কামদেব সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত ছিলেন। ক্রমাগতঃ তীর্থ-ভ্রমণে, সাধুসঙ্গে, পণ্ডিতগণের সহিত আলাপে—তিনি একজন দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন। লোকে যখন তাঁহার চিত্ত-বলের কথা শুনিল, কি করিয়া পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া তিনি তাঁহার মৃতা-পত্নীর সৎকার ও সদ্যোপ্রসূত বালককে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন—এসব কথা লোকে যখন জানিতে পারিল, তখন অনেকেই তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইল।

মানসিংহের সহিত কিরূপে তাঁহার পরিচয় হয়, কি করিয়া মহারাজ মানসিংহ তাঁহার শিষ্য হয়েন, তাহা আমরা অগ্রে বলিয়াছি। এই কামদেব ব্রহ্মচারী হইতেই, বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী বংশীয় জমীদারগণের উদ্ভব। কি করিয়া এ উদ্ভব এবং প্রতিষ্ঠা হইল, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

বঙ্গ-বিজয়ের পর, মানসিংহের মনে গুরুর অনুরোধ বাক্য স্মরণ হইল। তাঁহারই আশীর্ব্বাদে, তিনি প্রতাপাদিত্য চাঁদরায় ও কেদার রায়কে নির্জ্জিত করিতে পারিয়াছেন—এরূপ একটা বিশ্বাস, তাঁহার মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয়। তিনি কামদেব ব্রহ্মচারীর বর্ণনানুসারে, গুরুপুত্রের সন্ধান আরম্ভ করিলেন। মহারাজ মানসিংহ প্যাটুলির রাজা শূদ্রমণির সহায়তায়, কামদেব ব্রহ্মচারীর পরিত্যক্ত পুত্র, লক্ষ্মীকান্তকে কালীঘাট হইতে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। শূদ্রমণি এই অনুসন্ধানের পুরস্কার রূপে, মহারাজের নিকট জমীদারী ও রাজোপাধি প্রাপ্ত হন।

লক্ষ্মীকান্তকে খুঁজিয়া পাইয়া, মানসিংহের মনে আর আনন্দ ধরে না। এই লক্ষ্মীকান্তই তাঁহার গুরু-দক্ষিণা। তিনি তাঁহার অধীনস্থ-বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা একটী নিষ্কর জমীদারীর সন্ধান কর। আমি তাহা আমার গুরু-পুত্রকে অর্পণ করিব।"

মানসিংহের আদেশ ক্রমে, লক্ষ্মীকান্ত, বড়িশার পার্শ্ব-ভুক্ত, নানাস্থানের জমীদারী ও কয়েকটী—পরগণা প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধরেরা আজও ইহার স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

ঘটক-কারিকার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া, আমরা লক্ষ্মীকান্ত সম্বন্ধে কতক-গুলি বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা হইতে, মানসিংহের বঙ্গে আগমন, রাজা শূদ্রমণির সহায়তায়—গুরুপুত্রকে অন্বেষণ, জমীদারী—দান, রায় চৌধুরী উপাধিদান, কালীঘাটের নিকটে সম্পত্তি দান প্রভৃতির কথা বিশদভাবে

উল্লিখিত আছে। পাঠকের অবগতির জন্য, আমরা প্রাচীন ঘটক-কারিকা হইতে, সেই অতি প্রয়োজনীয় স্থানটুকু এথানে উদ্ধৃত করিলাম।

বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরীর বংশপরিচয়।

শিব সহোদর জীয়ো * রাখি শিশু পুত্র
সংসার সাগর হ'তে উঠায় বহিত্র।
প্রসব হইলা পুত্র, প্রসূতির কাল
তাহাতে, দ্বিজের ঘটে বিষম জঞ্জাল।
লুকাইয়া চলি যায় বারাণসী-পুর
পরিব্রাজ-ধর্ম্ম তথা করিল প্রচুর।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু প্রতিপদ চাঁদ
পশ্চাৎ দেখিবে এটী কুল-ভাঙ্গা ফাঁদ।
ক্রমশঃ দ্বাদশবর্ষ অতীত হইল
পিতৃ অনুদ্দেশ হেতু বিপদ ঘটিল।
উপনয়ন কাল, তার ছাড়াইয়া যায়
হেন কালে সমাচার শুন মহাশয়।
মানসিংহ মহারাজ, কাশীতে আছিল
জীয়োর নিকটে তিঁহ উপদিষ্ট হ'ল।
রাজারে কহিল দ্বিজ, শুন বাপধন
শুনি করিতেছ, তুমি বঙ্গেতে গমন।
মম পুত্রে গিয়া তুমি ঠিকানা করিবা
সেই কার্য্য করি বাপ! মোরে বাঁচাইবা।
বঙ্গেতে আসিয়া রাজা, সে কার্য্য করিল
প্রথমতঃ ঐ কার্য্য—পশ্চাৎ সকল।
পাটুলীতে হয় শূদ্রমণি জমীদার
তাহারে ডাকায়ে রাজা কহে সমাচার।
রাজাজ্ঞা মতেতে সেই ঠিকানা করিল
গুরু বাক্য ঐক্য করি ঠিকানা হইল।
তার পর রাজা, গুরু-পুত্র দরশন
করিয়া হইল অতি, আনন্দিত মন।

* জীয়ো—অর্থাৎ জীয়ো গাঙ্গুলী। কামদেবের চলিত নাম।

শূদ্রমণি মহাশয় কর-যোড় করি
দেখেন রাজার মনে, আনন্দ লহরী।
রাজা বলে ওহে তুমি যে কার্য্য করিলা
তার পরিতোষ তুমি লহ এই বেলা। *

* * * *

তার পর রাজা কহে বালকের জন্য
দেখ এক জমীদারী যার কর শূন্য।
বড়িশা আদি নানা পরগণা স্থির হ'ল
শিব-শক্তির অদূরে বড়িশায় রহিল।
যেই মত গল্প শুনি, সেই মত গাই
সত্য মিথ্যা যাহা হউক, এই মত পাই।
তার পর গুরু পুত্র উপনীত হ'ল
সমাদৃত জমীদার, বিবাহ করিল। †

সাবর্ণচৌধুরী ও আমাটের গাঙ্গুলীর মহিমাকীর্ত্তন।

"ক্রমে আমাটে-গাঙ্গুলী হল ছিন্ন ভিন্ন
খড়দহে গাঙ্গ চতুষ্টয়ে বেগে প্রামাণ্য।
নিম্নকুলে কেহ যায়, কুলেতে মালিন্য
মূল হল সুবিদ্যা আর বিনয় সৌজন্য।
জীয়ো প্রভৃতি সপ্তক, না পেয়ে মর্য্যাদা
দেশত্যাগী সঙ্গহীন, চিন্তাকুল সদা।
নির্ব্বেদেতে জীয়ো হল চির কাশীবাসী
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য যে দেখে দণ্ডী অন্তেবাসী।
জীয়ো শিষ্য প্রশিষ্য, যতেক নারায়ণ
তা দেখি মানসিংহের ভক্তি অগণন।
তাই মানসিংহ তাঁর, অতিশয় ভক্ত
তাঁর শিক্ষা-দীক্ষায় ত্রিতাপে অনাসক্ত।
গুরুর আশীষে শিষ্য মানবেতে সিংহ
ভারতজয়ী হইল সে রাজা মানসিংহ।

* গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্তকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার পুরস্কার স্বরূপ শূদ্রমণি রাজা মানসিংহের নিকট রাজা উপাধি ও জমীদারী প্রাপ্ত হন।

† ঘটককারিকা হইতে উদ্ধৃত।

কি কাজে গুরুর তোষ, ইঙ্গিতেতে শুনি
তব ভ্রাতৃ-অন্বেষণ কর যাদুমণি।
মানসিংহ গুরুপুত্র করে অন্বেষণ
কালীঘাটে দেখা হল, নাম লক্ষ্মীনারায়ণ।
শিষ্ট শান্ত সুবুদ্ধি আর তেজীয়ান অতি
বালক হলেও বিজ্ঞ আছিল সুনীতি।
রাজা জিজ্ঞাসিল ভাই—মাতৃচরণ কই
চরণামৃত দাও, গুরু ঋণ-মুক্ত হই।
লক্ষ্মী নারায়ণ কহে—মাতৃ আজ্ঞা শুন
মর্য্যাদা হীন জীবনে নাহি কাজ কোন।
নৃপ বলে প্রতিজ্ঞা ত জান মোর স্থির
গুরুর আদেশ রক্ষায় আছে এ শরীর।
আজি হতে তব ইচ্ছা যত লও ভূমি
কুলীনে ধরুক ছাতা অন্নদাতা তুমি।
পিত্রাদেশ আছে এই কুল কর চূর্ণ
তাঁহার মানস তাহে হবে পরিপূর্ণ।

* * * * * * *

ভবানন্দ সহচর কানুনগুয়ার
ইচ্ছামত তব রাজ্য হবে যে বিস্তার।
উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, দ্বিজ ভক্ত এক
লক্ষ্মীর সন্ধানে ক্লেশ পায় সে কতেক।
ক্ষুদ্র ভূমীশ বটে, দেব দ্বিজেতে সুমতি
মানসিংহের আজ্ঞায় রাজস্বে নিষ্কৃতি।*
গঙ্গাবাসে স্থান নাহি চাহি যে নিষ্কর
পিতৃযজ্ঞে ভূস্বামীর পূজা শ্রেষ্ঠতর।
তথাস্তু বলিয়া তারে মহাশয় কয়।
তদবধি নারায়ণ সন্ততি মহাশয়।
লক্ষ্মীর অতুল বিত্ত রায়চৌধুরী খ্যাতি
কন্যাদানে কুল নাশে কুলের দুর্গতি।

* রাজা শূদ্রমণি।

কুন্তমাটী মত কুলীন উঠিয়া মাথায়।
পদতলে দলিত মানহীন এ ধরায়।

* * * *

লক্ষ্মীর আরাধ্য কালী, যাহে স্থিরামতি
অদূরে বড়িশা তথা করিলা বসতি।
যতকাল কালীঘাটে কালিকার স্থিতি
লক্ষ্মীনাথে কুল ভঙ্গে সাবর্ণের মতি।

* * * *

কালীঘাট কালী হ'ল চৌধুরি সম্পত্তি
হালদার পূজক এই ত তার বৃত্তি॥
ক্রমে জ্ঞাতি কুটুম্বে দেয় যতেক বৃত্ত
কুলীন কুল নাশে সবে হল প্রবৃত্ত। ৫২
মানসিংহ যদা যায়, পুনঃ কাশীবাসে
কহে গুরু আজ্ঞা সিদ্ধ, গুরু অভিলাষে।
জানুক না জানুক অন্যের কেহ বিদ্যা
সৈন্যের রক্ষণে পটু চৌধুরী অনবদ্যা। ৫৪

সারাবলীর অন্তর্গত মেলমালা।

মহারাজ মানসিংহ, বারাণসী হইতে বাহির হইয়া, বর্দ্ধমানের পথ ধরিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যও এদিকে মানসিংহের বঙ্গপ্রবেশ বার্ত্তা অবগত হইয়া, যাহাতে তিনি গঙ্গাপার হইতে না পারেন, তাহার বন্দোবস্তে ব্যস্ত রহিলেন। তাঁহার নৌ-সেনাপতি, রডা সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া মোগল-সৈন্যের পথরোধ করিবার আয়োজন করিলেন। মানসিংহ বঙ্গে আগমন সময়ে রূপরাম ও কচুরায়ের সন্ধান পান। প্রতাপের গৃহের গুহ্য কথা জানিতে পারিবেন বলিয়া, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে লন।

মানসিংহ যখন যেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেই স্থানের প্রজারা ঘরদ্বার ছাড়িয়া, মোগল-সেনাদের ভয়ে নানা স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে অনেক নগর ও গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার ও প্রজাগণের পলায়ন হেতু অনেক সময়ে মানসিংহকে রসদের জন্য বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

মানসিংহ, প্রণিধি-মুখে প্রতাপের সৈন্য-সমাবেশ ব্যবস্থা বুঝিয়া, দ্রুতপদে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন। নদীবক্ষে একখানিও নৌকা নাই, নৌকা বাহিবার

মাঝি নাই। এ সম্বন্ধে কোন কিছু সন্ধান জানিবারও উপায় নাই—কারণ নগরবাসীরা সকলই ভয়ে পলাইয়াছে। সেই জন্য শূন্য-স্থানে, এসব সন্ধান দেয় কে? মানসিংহ এই সমস্যার অবস্থায় পড়িয়া বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন। *

কিন্তু প্রতাপের ধ্বংশ ও মানসিংহের বিজয়লাভ, বিধাতার বাঞ্ছনীয়। কাজেই, এই সময়ে ভবানন্দ আসিয়া, মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হয়েন। মানসিংহ ভবানন্দের সহায়তায় নৌকা জোগাড় করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইলেন।

কিন্তু ইহার পর আবার এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল। সাতদিন ধরিয়া এমন ভয়ানক বৃষ্টি হইল—যে মানসিংহের সমভিব্যাহারী সেনাগণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবার মত হইল। আহার্য্যাভাবে তাহাদের জীবন বিপন্ন। ভবানন্দ এ বিপদ সময়ে প্রচুর রসদ জোগাইয়া, বিপন্ন মানসিংহ-সৈন্যের প্রাণরক্ষা করেন। ভবানন্দ—প্রতাপাদিত্যের সংসারে প্রতিপালিত, কিন্তু তাঁহার এই অন্যায় কার্য্যের জন্য, আজও তাঁহাকে কলঙ্ককালিমা বহন করিতে হইতেছে।

সুচতুর মানসিংহ অতীত ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া বুঝিলেন, জল-পথে সেনা লইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মোগল-সেনা-পতিগণ, এই উপায় অবলম্বনে বাঙ্গলা হইতে পরাজয়ের কলঙ্ক কিনিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ—ফিরিঙ্গি-সেনাপতি রডার চালিত, প্রতাপের নৌবাহিনী অতি প্রবল শক্তিময়। তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে জলপথে মহাবিপদ ঘটাইতে পারে। এই ভাবিয়া মানসিংহ স্থলপথে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। তিনি সরাসর নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া—গ্রাম, নগর, জঙ্গল প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিলেন। †

সপ্তদিন ব্যাপী যে ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে প্রতাপেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তাঁহার অনেক সজ্জিত রণতরী বিপর্য্যস্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। এরূপ মহা বিপত্তি ঘটিলেও প্রতাপ নিরুৎসাহ হইলেন না। চারিদিকের

---

* ততো মানসিংহো মহাপ্রাসাদোঽয়ং দেবসোত্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় বহুসৈন্যাবৃতো নিজগাম নির্গতশ্চ যত্র যত্রোবাস তস্মাত্তস্মাৎ লোকা পলায়নম্ চক্রিরে রাজ্ঞানশ্চ প্রয়োজন সাক্ষাদ্বভুবুঃ—ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতম্।

† শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—এখনও মানসিংহকৃত এই সৈন্যাগমন পথের ভগ্নাবশেষ সুন্দরবন প্রদেশে দেখা যায়। ইহা "গৌড়ের জাঙ্গাল" বলিয়া বিখ্যাত।

বন্দোবস্ত যাহাতে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। যশোর-নগরীও এই সময়ে পরিখা, খাত প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষিত হইল।

মানসিংহ উপযুক্ত স্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া, অসি ও শৃঙ্খলসহ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। দূত রাজসভায় উপস্থিত হইলে, প্রতাপ ও তাঁহার সভাসদ—কেশব ভট্টাচার্য্য, মানসিংহকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া তৎপ্রেরিত অসিগ্রহণ করেন। দূত, প্রতাপ পরিত্যক্ত সেই শৃঙ্খল হস্তে, মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথাই তাঁহাকে জানাইল।

মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের নিকট বশ্যতার আশাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ দম্ভপূর্ণ উত্তর পাইয়া, তিনি সেনাগণকে সজ্জিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। এই সময়ে কচুরায় আসিয়া মানসিংহকে বলিলেন—"মহারাজ! প্রতাপ অতি ক্রূরকর্ম্মা ও কূটকৌশলী। আপনি একটু বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবেন। কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, প্রতাপ অতিশয় দর্পিত হইয়াছে। সাধারণের মনের উপর তাহার অসীম ক্ষমতা। সাধারণে প্রতাপকে সমরে বিজয়দাত্রী, কালীর বরপুত্র বলিয়া বিবেচনা করে। প্রতাপ মোগলসৈন্যের বিনাশার্থ এই সন্নিকটবর্ত্তী প্রান্তর-সমূহ-মধ্যে বারুদ পুতিয়া রাখিয়াছে।"

মানসিংহ, কচুরায়ের পরামর্শে বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যূহ-রচনা করিলেন। দক্ষিণে অশ্বারোহী ও পদাতিক, বাম দিকে গোলন্দাজগণ, সম্মুখে গজারোহী চমূ স্থাপন করিয়া, মহারাজ মানসিংহ বীর-বিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপও তাঁহার প্রিয়-সহচরগণ অর্থাৎ—সূর্য্যকান্ত, রঘুনন্দন প্রভৃতিকে লইয়া দুর্ভেদ্য ব্যূহ-রচনা করিলেন। এবারের সমরের বিশেষত্ব এই—নবীন বয়স্ক রাজকুমার উদয়াদিত্য সেনানায়ক হইয়া, প্রতাপ-সৈন্যের এক প্রয়োজনীয় দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রতাপকে জীবন্ত ধরিতে পারিলে বা নিহত করিতে পারিলে, বাঙ্গলার যুদ্ধানল সহজেই নির্ব্বাপিত হইবে, ইহা ভাবিয়া—মানসিংহ বাছাবাছা রাজপুত, পাঠান ও মোগল-সৈন্য দ্বারা দুর্ভেদ্য ব্যূহ-রচনা করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতাপ—সৈন্যসহ মানসিংহকে আক্রমণ করেন। পূর্ব্বদিনের যুদ্ধ অপেক্ষা সে দিনের যুদ্ধ অতি ভয়াবহ। এ ভীষণ যুদ্ধে অনেক হিন্দু ও মোগল-সেনা নিহত হইল।

মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের মধ্যে, এই ভীষণ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের স্থান আমাদের নাই। দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিগ্রহে, দিন দিন সৈন্যক্ষয় হইতেছে দেখিয়া, মানসিংহ অতিশয় নিরাশ হইয়া পড়িলেন। কচুরায়, রাঘব ও ভবানন্দ প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া মানসিংহ বলিলেন—"আমি কাবুল প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করিয়াছি—কিন্তু কোথাও এরূপ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হই নাই। আমার পরাক্রমে, সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য বিকম্পিত হইয়াছে, কিন্তু আজ আমাকে প্রতাপের পরাক্রম দেখিয়া কম্পিত হইতে হইতেছে। আমি এখন বুঝিতেছি—সম্রাট আমাকে মৃত্যুর কবলগত হইবার জন্যই, বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। অপরন্তু এ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, আগ্রায় ফিরিলেও, আমি তাঁহার ক্রোধানল হইতে মুক্তি পাইব না।" * * এই কথা শুনিয়া—কচুরায়, ভবানন্দ প্রভৃতি বলিলেন—"মহারাজ! বিজয়-লক্ষ্মী আপনার অঙ্কগত-প্রায়। এরূপ সময়ে, আপনি যদি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া, ইহার সুফল ভোগ না করেন—তাহা হইলে বুঝিলাম, বীরধর্ম্ম পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি গতরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, যশোরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী, প্রতাপের উপর বিমুখ হইয়াছেন। ভগবান—রামচন্দ্র, লঙ্কাসমরে ভগবতীর উদ্বোধন করিয়া, যেরূপে বানর-চমূ মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন—আপনিও সেইরূপ মহামায়ার পূজা করিয়া, সৈন্যদের হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করুন। ইহাতে নিশ্চয়ই আপনার অভীষ্ট লাভ হইবে।" উপস্থিত অন্যান্য সকলে, কচুরায়ের এই কথার সমর্থন করিল। মহারাজ মানসিংহ, মহাসমারোহে ভগবতীর পূজা করিলেন। সৈন্য-মধ্যে এরূপ একটা জনরব প্রচার করিয়া দিলেন—"ভগবতী মানসিংহের ভক্তিতে প্রসন্না হইয়া প্রতাপের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং এখন প্রতাপকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।" * বলা—বাহুল্য, এই উৎসাহবাণী মানসিংহের সেনামধ্যে এক নূতন শক্তির সঞ্চার করিল।

তৎপর দিন, আবার উভয়পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতাপ প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন। মানসিংহও ভীমবেগে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষের রণ-মদোন্মত্ত বীরগণ, জীবনাশা ত্যাগ করিয়া মহা-সমরে প্রবৃত্ত হইল। প্রতাপের এই বার কপাল ভাঙ্গিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ—সূর্য্যকান্ত সমরে পতিত হইলেন।

সূর্য্যকান্তের পতনে, যশোরের সেনাদল উৎসাহ-হীন ও বিশৃঙ্খল

* শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য।

হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, উনবিংশ বর্ষীয় নবীন রাজ-কুমার—উদয়াদিত্য, স্বয়ং সূর্য্যকান্তের স্থলাধিকার করিয়া, সেনা-চালনা করিতে লাগিলেন। মানসিংহ—যশোর-রাজকুমারকে, রণাঙ্গণে অসীম সাহসের সহিত প্রবেশ করিতে দেখিয়া, কতকগুলি প্রবল পরাক্রান্ত হাব্‌সি ও রাজপুত-সেনা—উদয়াদিত্যের দিকে পরিচালিত করিলেন। উদয়াদিত্য, কিয়ৎক্ষণ ভীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে সমর-ক্ষেত্রে নিহত হন।

রাজকুমার উদয়াদিত্য ও সূর্য্যকান্তের পতনে—প্রতাপ-সৈন্য, বজ্রাহতের মত হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাব ধারণ করিল। পর্টুগীজ সেনাপতি রডা, এই উৎসাহ-হীন হিন্দু সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া, আবার মোগলদিগকে ভীমবেগে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনি শেষ রক্ষা করিতে না পারিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

মানসিংহ এইবার জয়াশায় উৎসাহিত হইয়া, যশোহর-দুর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রতাপের শত্রুগণ, তাঁহাকে দুর্গের দুর্ব্বল স্থান গুলি দেখাইয়া দিলে, মানসিংহ সেই সকল দিক হইতে আক্রমণ করিয়া, অতি সহজেই যশোহর-দুর্গ দখল করিলেন। প্রতাপ উপায়ান্তর না দেখিয়া, ধূমঘাট-দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

যশোহর দুর্গ জয় করিবার পর, মহারাজ মানসিংহ এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য, প্রতাপের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু প্রতাপ—ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব উপেক্ষা করায়, পুনরায় উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন অবশিষ্ট আছেন—কেবল প্রতাপ ও শঙ্কর। প্রতাপ শঙ্করকে লইয়া, আবার নবোৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এই ভীষণ যুদ্ধের শেষ বর্ণনা, আমরা শাস্ত্রী-মহাশয়ের লিখিত কাহিনী হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—"প্রতাপ শঙ্কর-সহ মিলিত হইয়া, মদস্রাবী হস্তীর ন্যায়, অরাতিকুল সংহার করিতে করিতে, মানসিংহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানসিংহ কতকগুলি সৈন্য, প্রতাপের সৈন্যের মধ্য ভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ঘোরতর বিক্রমে, বঙ্গীয় সৈন্য, দুই—ভাগে বিভক্ত করিল। প্রতাপ, স্বীয় সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মানসিংহ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন। রজনীর বৃদ্ধি সহিত যুদ্ধ ও অন্ধকার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মানসিংহের সৈন্যগণ "প্রতাপ পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন" এইরূপ শব্দ করিয়া, বঙ্গীয়-সৈন্যগণে

আক্রমণ করিল। "প্রতাপের মৃত্যু" এই শব্দ, বঙ্গীয় সৈন্যগণের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করায়, তাহারা দশদিক অন্ধকার দেখিয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মানসিংহ-সৈন্য-পরিবেষ্টিত প্রতাপ, কোনরূপেই শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। সমস্ত দিনের ভীষণ পরিশ্রম ও আহত স্থান হইতে প্রচুর শোণিতস্রাব হওয়াতে, পূর্ব্ব হইতেই প্রতাপের শরীর অবসন্ন প্রায়। এক্ষণে আবার শত্রু-প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া, যুদ্ধস্থলে তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূপতিত হন। এই অবকাশে মানসিংহ, প্রতাপের পরিশ্রান্ত সৈন্যগণকে বীর-বিক্রমে আক্রমণ করেন। বঙ্গীয় সেনাগণ—প্রতাপাদিত্যের মূর্চ্ছিত দেহ রক্ষা করিবার জন্য, অচলের ন্যায় অটল হইয়া, তাহাদের গতিরোধ করিতে লাগিল। ইহার পর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শরীররক্ষায় নিযুক্ত, একমাত্র অবশিষ্ট বীর—শঙ্করও, চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সমর-ক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই সময়ে মানসিংহ—স্বয়ং আগমন করিয়া, প্রতাপ ও শঙ্করকে বন্দী করিয়া নিজের শিবিরে লইয়া যান।

মানসিংহ বিজয়োল্লাসে উৎসাহিত হইয়া, সৈন্যগণকে ধুমঘাট এবং যশোহর-নগর লুণ্ঠন করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে, যে মানসিংহ যশোহর-বিজয়ে, অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি পাইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য-মহিষী, মহারাজের পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণে, শত্রুহস্তে পতিতা হইবার ভয়ে, যমুনাগর্ভে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। মহারাণী যে স্থলে জল নিমজ্জিতা হইয়াছিলেন—আজও পথিকগণ সে স্থানটী অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়া থাকে।

যশোর বিজয়ান্তে, মানসিংহ—বন্দী প্রতাপাদিত্য ও কচুরায় প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করেন। প্রতাপকে এইরূপ বন্দী অবস্থায়, বাদসাহের নিকট পৌছিতে হয় নাই। পথিমধ্যে—কাশীধামে প্রতাপাদিত্য ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে, যশোরের উজ্জ্বল গৌরব জন্মের মত মলিন হইয়া পড়ে।

প্রতাপের অন্যান্য পরিজনবর্গ সম্বন্ধে, দুই চারিটী কথা বলা প্রয়োজন। মানসিংহ—প্রতাপের আজীবন সহচর, বিশ্বস্ত বন্ধু, শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন—যে তিনি আর কখনও বাদসাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না। শঙ্করও এই প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণ-গণকে দান করিয়া, স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, গঙ্গাবাস উপলক্ষে বারাশত গ্রামে সপুত্র বসতি করেন।

কচুরায়, বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে জমীদারী এবং যশোরজিৎ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতী, পুনরায় স্বামীর সঙ্গে মিলিত হন। বিন্দুমতীর গর্ভে—রামচন্দ্রের, কীর্ত্তিনারায়ণ নামে এক মহাবল পুত্র জন্মে। প্রতাপ-দৌহিত্র কীর্ত্তিনারায়ণ, নৌযুদ্ধে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। তিনি মেঘনা নদীর উপকুলে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া, পর্টুগীজ দস্যুদিগকে উক্ত প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ঢাকা-নগরীর মোগল-শাসনকর্ত্তা, কীর্ত্তিনারায়ণের বীর্য্যমত্তায় মোহিত হইয়া, তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন।

প্রতাপাদিত্য-চরিতের পরিশিষ্ট ভাগে লিখিত আছে—"বসন্তরায়ের মৃত্যুর সময়, রমানাথ নামক তাঁহার এক পুত্র, পূর্ব্বদেশে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। কচুরায়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পর, তিনি যশোহরে আগমন করিলে, পৈত্রিক বিষয়, রাজা উপাধি, এমন কি গুরু-পুরোহিত অবধি প্রাপ্ত হন নাই। রমানাথ যশোহর ত্যাগ করিয়া, প্রথমতঃ ফতুল্লাপুর গ্রামে নন্দকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করেন। ইহাঁর সন্ততিগণ পরে পুঁড়াগ্রাম নিবাসী, শ্রীযুক্ত রামভদ্র বসু মহাশয়ের যত্নে, পুঁড়াগ্রামে বাস করেন। রমানাথের সন্ততিগণ এখনও পুঁড়া, ঘোড়গাছি প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। কচুরায় নিঃসন্তান ছিলেন। উদয়াদিত্য ব্যতীত, প্রতাপের মুকুটমণি বলিয়া এক পুত্র জন্মে। রাজকুমার মুকুটমণির সম্বন্ধে কোন বিবরণ জানিবার উপায় নাই।"

প্রতাপের জন্ম বা মৃত্যুর কোন সময় নিরূপিত হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে প্রতাপ ১৬০৬ খৃঃ অব্দে বা ১০১৫ হিজরীতে সংসারলীলা সম্বরণ করেন। সম্ভবতঃ ১৫৬৮ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার জন্ম হয়

প্রচলিত কিম্বদন্তী ও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে, যে সমস্ত পুস্তক বঙ্গ-ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রতাপের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়াছি। প্রতাপ, বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার সম্বন্ধে সমকালীন মুসলমান লিখিত ইতিহাসে, এমন কি আইন-ই-আকবরীতেও কোন কথা নাই। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত ও শাস্ত্রী মহাশয়ের ও নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে যাহা আছে, তদপেক্ষা আরও কিছু বেশী জানিবার চেষ্টা করিয়া, আমরা তৎকালীন দুর্লভ ইতিহাস
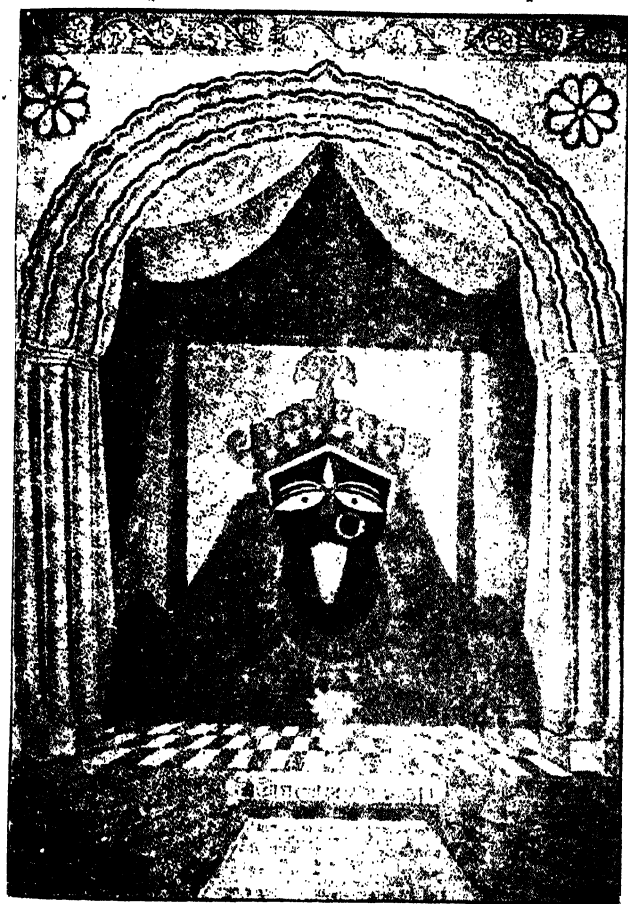
ও অন্যান্য লিখিত কাহিনী হইতে, যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা পাঠক বর্গকে জানাইয়া, প্রতাপাদিত্য প্রস্তাব শেষ করিব। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি হইতে, প্রতাপাদিত্য, ইশাখাঁ ও বসন্তরায় সম্বন্ধে, পাঠক অনেক কথা জানিতে পারিবেন। এগুলি পরিত্যাগ করিলে, প্রতাপ-প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। হয়তঃ এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি, সাধারণ পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস-ভক্ত পাঠক, ইহাতে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইবেন।

বঙ্গে দ্বাদশভৌমিকের আবির্ভাব সময়ে, কয়েক জন পর্টুগীজ মিশনারী সেই সুদূর ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে আসেন। তাঁহাদের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে, চণ্ডীখাঁ (যশোহর) শ্রীপুর ও বাকলা প্রভৃতি স্থানের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

দুঃখের বিষয়, সমসাময়িক কোন মুসলমান ইতিহাস-লেখকই, প্রতাপ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। আকবর-নামায় "প্রতাপবেজেরা" বলিয়া একটী নাম পাওয়া যায়। এই প্রতাপ, মোগল সুবাদার খাঁ-জাহানের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তায়, খাঁ-জাহান ভাটির জমীদার ইশাখাঁকে পরাজিত করেন। এই "ভাটী" সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম প্রদেশ। ইশাখাঁ অবশ্য খিজিরপুরের ইশাখাঁ মসনদী—কিন্তু "প্রতাপ বেজেরাই" কি প্রতাপাদিত্য? ইহার বিশেষ প্রমাণ কই? চাঁচরা (যশোহর) রাজবংশের ইতিহাসেও প্রতাপের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ইতিবৃত্তের এক স্থানে লিখিত আছে,—"তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ ভবেশ্বর, চারিটী পরগণা (অর্থাৎ আমিদপুর, মুড়াগাছা, মল্লিকপুর ও সৈয়দপুর) বাদসাহের নিকট প্রাপ্ত হন। এই গুলি প্রতাপাদিত্যের সম্পত্তি। আইন-আকবরী হইতে জানা যায়—জেসার (যশোহর) সাধারণতঃ রসুলপুর বলিয়া পরিচিত হইত। এই রসুলপুর—সরকার খালিফাতাবাদের অন্তর্গত ছিল। এই মহলের রাজস্ব, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রতিবৎসরে ১৭২৩০৫০ দাম (৪৩০৯৬৮ টাকা) এই সরকার হইতে, মোগলবাদসাহ রাজকররূপে প্রাপ্ত হইতেন।

১৫৯৩ খৃঃ অব্দে মুসলমানের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা দেখিতে পাই, মহারাজ মানসিংহ, বিদ্রোহী পাঠান জায়গীরদারদিগকে অনুগত করিবার জন্য এই খালিফাতাবাদ পরগণা, জাইগীর রূপে তাঁহাদের দান করেন। এই জায়গীর-গৃহীতা গণের নাম—খাজা সুলেমান, খাজা বাকির এবং ওসমান। মানসিংহ মনে ভাবিয়াছিলেন—পাঠান জায়গীরদারেরা এই নূতন জায়গীর পাইয়া, উড়িষ্যা ত্যাগ করিবে, বিদ্রোহাচরণ হইতে ক্ষান্ত থাকিবে, এবং

ইহাদের সহায়তাবলেই, বিদ্রোহী ভূঁইয়াগণও দমন হইবে। কিন্তু মানসিংহ পরে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। এই দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ, পরিশেষে ইশার্থা প্রভৃতি বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকগণের সহিত মিশিয়া, তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছিল। আইন-আকবরীতে * আবুলফজল, ইশাখাঁর নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে "মার্জবান্-ই-ভাটী" (নিম্নভূমি প্রদেশাধিপতি) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবুলফজল প্রদত্ত, এই সংজ্ঞা হইতে প্রমাণ হইতেছে—ইশাখাঁ চট্টগ্রাম অঞ্চলে, সমুদ্রতটস্থ নিম্নভূমিময় (ভাটী) প্রদেশ-সমূহের অধিপতি ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কয়েকজন পর্টুগীজ মিশনারি সেই সুদূরবর্ত্তী অতীত কালে, বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। রাল্‌ফ্‌ ফিচের নাম, ইতিহাস পাঠকের নিকট পরিচিত। কিন্তু এই ফিচ্ ব্যতীত, আরও কয়েকজনের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে, আমরা পূর্ব্ববঙ্গের তৎকালীন অবস্থা জানিতে পারি। এই সমস্ত পর্টুগীজ-লেখকগণ, সমসাময়িক ঘটনার যে চিত্রাঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সেই অতীত যুগের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

পর্টুগীজ্ জ্যারিক, এই দ্বাদশ-ভৌমিকদের সম্বন্ধে, অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপের রাজত্বকালে দুইজন জেস্যুইট মিসনারী, বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। জ্যারিক একস্থানে লিখিতেছেন—"এই সমস্ত ভূঁইয়াগণ কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। মোগল-বাদসাহকে তাঁহারা রাজকর দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রচুর সেনা সামন্ত সংগ্রহ করিয়া, প্রকৃত রাজার ন্যায় দেশ-শাসন করিতেন, কিন্তু "রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন নাই। "ভুঁইয়া" বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহাদের মধ্যে তিনজন হিন্দু। অপরেরা মুসলমান।†

ইহার পর ডিএভিটি নামক একজন পর্টুগীজ, বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকদের

---

* Ain Akbari—Blockman 1.341:2. Westland's Report. P. 45.

† They obeyed no one, paid no tribute and though they displayed a royal splendour, did not call themselves Kings but Boiones. Three of these chiefs, observed the religion of the country viz—" Chandican us Siripuranuset Bakalamis (চণ্ডীখান—শ্রীপুর ও বাকলা) and remained nine were Mehomedans. এই চণ্ডীখানই যশোহর। কিন্তু জ্যারিক বোধ হয়, দ্বাদশ-ভৌমিকের তিনজনকে হিন্দু ও অপর সকলকে মুসলমান বলিয়া একটা ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—মিশনরীরা যশোহর, বাকলা ও বিক্রমপুরের সহিত যতটা মেশামেশি করিয়াছিলেন, অপর সকলের সহিত সেরূপ ভাবে মিশিতে পারেন নাই। কাজেই, তাঁহারা এই তিন প্রদেশাধিগণের সম্বন্ধে, কোন রূপ ভ্রম করেন নাই। যাহাই হউক না কেন—জ্যারিকের লিখিত বৃত্তান্ত হইতেই আমরা যশোহর, বিক্রমপুর ও বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) সম্বন্ধে—অতি পরিস্ফুট বিবরণ পাইতেছি।

শক্তি-সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ডি এভিটির লিখিত বৃত্তান্ত, ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের—প্যারি-নগরীতে প্রথম মুদ্রিত হয়। ডি এভিটি, জ্যারিকের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, তবে তিনি ইশাখাঁ মসনদীকে, সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ডি এভিটি বলেন—"শ্রীপুর ও চণ্ডীখাঁর রাজাগণ প্রতাপশালী বটেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে, "মাসন্দলিন" (ইশাখাঁ মসনদী) সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান।" ইহার পর সিবাষ্টিয়ান মানরিকো বলিয়া, একজন স্পেন-দেশীয় মিসনরী, এই দ্বাদশ-ভৌমিকের কথা তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মানরিকো ১৬২৮ হইতে ১৬৫১ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি বলেন, বঙ্গদেশ দ্বাদশভাগে বিভক্ত ছিল। চণ্ডীখাঁ—তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান বিভাগ। গৌড়ের রাজা, দ্বাদশজন প্রতিনিধিকে বঙ্গ-শাসনের ভার দেন। ইহাঁরাই—"Boiones de Bengala" বা বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিক। *

উল্লিখিত বৃত্তান্তসমূহ হইতে, অনেক কথা জানিতে পারা যায়। প্রথমতঃ বঙ্গদেশ যে দ্বাদশ-ভৌমিকের মধ্যে বিভাজিত ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ,—সেই ভৌমিকগণের মধ্যে, যশোর ও শ্রীপুর-রাজগণ ও ইশাখাঁ মসনদী যে, অন্য ভৌমিকদের অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তাহাও প্রমাণ হয়। এই সকল ভুঁইয়াগণ, যে স্বাধীন ভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন, মোগল সরকারের অধীনতা অগ্রাহ্য করিতেন—তাহাও জানা যায়।

এক্ষণে চণ্ডী-খাঁ অর্থাৎ যশোহরের কথা আলোচনা করা যাউক। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেব, * নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন—চণ্ডীখানই প্রতাপাদিত্যের—যশোহর। আমরা এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে—প্রকাশিত, বেভারিজের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটী অনুবাদ করিয়া দিলাম।

তিনি লিখিতেছেন—"১৫৯৯ ও ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে, দুইজন জেসুইট পাদরী, বাকলা প্রদেশে (বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ ও ঢাকা) এবং যশোহরে ভ্রমণার্থে আসেন। ইহাঁদের লিখিত বৃত্তান্ত হইতেই, সেকালের সুন্দরবন বিভাগ সম্বন্ধে অনেক

* The most powerful he (Sebastian Manrique) informs us, were those of Sripur and Chandikan but the greatest of all was Masondolin or Masudalian i.e. Masnad-i-Ali the title of Ishakhan of Khizirpur. Again Sebastian Manrique, a Spanish monk of the order of Saint Augustine states in his Itinepary that the kingdoms of Bengal, were divided into 12 Provinces, among which he mentions Chandican.

(Bengal Gazeteer Jessore P 30)

কথা জানিতে পারা যায়। নিকোলাস পিমেণ্টা বলিয়া,একজন পর্টুগীজ,তাঁহার তৎসময়ে লিখিত, পত্রাবলী ইউরোপে মুদ্রিত করেন। এই পত্রগুলি, পরিশেষে লাটিন ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পিমেণ্টো—গোয়ার প্রধান মিসনরী ছিলেন। তিনি গোয়াতেই থাকিতেন। ১৫৯৮খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফার্ণাণ্ডেজ ও জোসা নামধেয়—দুইজন পাদরীকে বঙ্গদেশে প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। এই দুই জন পাদরী ১৫৯৮ খ্রীঃব্দের ৩রা মে কোচিন হইতে যাত্রা করিয়া, আঠার দিন পরে. "পোর্ট-পিকানোতে" (সপ্তগ্রামে) উপস্থিত হন। তাহার পর নদীপথে তাঁহারা "গুলো বা গোলি"তে উপস্থিত হন। এই গোলিই, হুগলীর নামান্তর। তাঁহাদের এই "গোলিতে" অবস্থান কালে—চণ্ডীখানের রাজা, তাঁহাদিগকে—তাঁহার রাজ্য দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। ফার্ণাণ্ডেজ, রাজার অনুরোধ রক্ষার জন্য, জোসাকে চণ্ডীখানে পাঠাইয়া দেন। জোসা, রাজার দরবারে মহা সম্মানের সহিত গৃহীত হন। এই ঘটনার এক-বৎসর পরে, পিমেণ্টা—ফন্‌সেকা ও বাউজ নামক দুইজন মিসনরীকে আবার বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, সম্ভবতঃ তাঁহারা চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বরে, ফার্ণাণ্ডেজ, পিমেণ্টোকে শ্রীপুর হইতে এক পত্র লেখেন। এই শ্রীপুর—চাঁদরায় ও কেদাররায়ের রাজধানী। ইহার কয়েক মাস পরে (২০ জানুয়ারি ১৬০০) খ্রীঃঅব্দে, ফন্‌সেকা চণ্ডী-খাঁ হইতে পিমেণ্টাকে গোয়াতে একপত্র লেখেন। এই পত্রে কি করিয়া, তিনি চট্টগ্রাম হইতে যশোহর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন—পথিমধ্যে তাঁহাকে কি কি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়,—আসিবার সময়, বাকলা রাজধানীতে (প্রতাপ-জামাতা, রামচন্দ্ররায়ের রাজধানী) কিরূপ আদর অভ্যর্থনা পান, এই সব কথাই লেখা ছিল। ফন্‌সেকার এই পত্রখানি নানাবিধ জ্ঞাতব্য-কথায় পরিপূর্ণ। প্রতাপজামাতা রামচন্দ্র রায় সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—"বাকলার

---

* মিঃ হেনরী বেভারিজ, বঙ্গের একজন সুবিখ্যাত সিবিলিয়ান। সিবিল সার্ব্বিস হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে, তিনি আলিপুরে ও মুর্শিদাবাদে ছিলেন। সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা। তাঁহার আলিপুরে অবস্থান সময়ে, ঘটনাক্রমে,এই দীন লেখকের সহিত, তাঁহার পরিচয় হয়। সেই পরিচয়, পরিশেষে আত্মীয়তায় দাঁড়াইয়াছিল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিনি সেই সময়ে "কলিকাতা-রিভিউ"—নামক পত্রিকায়, নন্দকুমারের ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমিও সেই সময়ে, পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত, সে-কালের ভারতীতে,নন্দকুমার লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। বেভারিজ সাহেব, হাইকোর্ট হইতে নন্দকুমারের মোকদ্দমা ঘটিত, যে সমস্ত কাগজ পত্রের নকল পান, সবই আমায় ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। তিনি ও তাহার বিদূষী-পত্নী এনেট, মোগলরাজত্বের আকবরী-আমলের ইতিহাস ও ইংরাজের প্রথম আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। মিসেস

রাজা অতি শিশু। তাহার বয়স আট বৎসরের বেশী বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই বালক-রাজা, তাঁহার বয়সের অপেক্ষাও সুচতুর এবং বুদ্ধিমান। রাজা—আমায় পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে, হাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—"আপনি বাক্‌লা হইতে আর কোথায় যাইবেন?" আমি বলিলাম—"আমি এখান হইতে সরাসর চণ্ডীথানে যাইব। সেখানে আপনার ভবিষ্যৎ শ্বশুর মহাশয়ের, দরবারে কিছু দিন থাকিব"। ফনসেকার এই কয়েকটী কথা হইতে প্রমাণ হয়, যে সেই সময়ে রামচন্দ্র রায়ের সহিত, প্রতাপকন্যা—বিন্দুমতীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। তাহা না হইলে ফনসেকা এরূপ কথা লিখিতেন না।

ফনসেকা, ২০এ নভেম্বর চণ্ডীথানে উপস্থিত হন। ডমিনিক ডিঃ জোসা নামক যে পাদরী, ফার্ণাণ্ডেজের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও তথন চণ্ডীথানে উপস্থিত। চণ্ডীথান বা যশোরেশ্বর রাজা প্রতাপাদিত্য, অতি সৌজন্যতার সহিত ফনসেকাকে গ্রহণ করেন। প্রতাপের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া, ফন্‌সেকো একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন—"এই হিন্দুরাজা যেরূপ সদাশয়তার সহিত আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ সদ্ব্যবহার আমি কোন খৃষ্টান রাজার নিকট পাইতাম কি না সন্দেহ।"

প্রতাপাদিত্য ফন্‌সেকার প্রার্থনা মতে, তাঁহার রাজধানীতে, একটী ক্রিষ্টান—গির্জ্জা নির্ম্মাণের অনুমতি দেন। ইহাই বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম—গির্জ্জা। কিন্তু ফার্ণাণ্ডেজ ও ফনসেকাকে বহুদিন ধরিয়া এ রাজানুগ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। ফার্ণাণ্ডেজ ১৬০২ খৃঃ চট্টগ্রামে কারাবদ্ধ হন ও সেই কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজাদেশে তাঁহার একটী চক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর; প্রতাপ পর্টুগীজ মিশনরীদিগকে তাঁহার রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। কি করিয়া পর্টুগীজদের এই ভীষণ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল, তাহা একটু আলোচনা করা উচিত।

প্রতাপাদিত্য, কার্ভালোকে কেন হত্যা করিলেন, তাহা, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রমাণ হয়। * কার্ভালো বিক্রমপুরাধিপতি রাজা কেদার রায়ের

বিভারিজের আকবরচরিত ও বিভারিজের আকবরনামার অনুবাদ, তাঁহাদের ঐতিহাসিক জীবনের প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই মহাত্মা বিভারিজের নিকট, এই দীন লেখক, অনেক উপকার ও অকৃত্রিম স্নেহলাভ করিয়াছেন।

* After Fernandez had been killed at Chittagong in 1602, the Jesuit priests went to Sondip and they soon left it and went with Carvalho, the Portuguese Commander to Chiandecan. The King of Ciandecan, promised to befriend them, but in fact, he was determined to

নৌ-সেনাপতি। এই কার্ভালো, প্রতাপের নৌ-সেনাপতি রডার অপেক্ষাও ক্ষমতাবান। কার্ভালোর নাম শুনিলে, লোকে ভয়ে কাঁপিত। সন্দ্বীপ কেদাররায়ের রাজ্যভুক্ত ছিল। মোগলেরা তাহা দখল করিলে, কেদার রায়, কার্ভালেকো ইহা পুনরুদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করেন। কার্ভালো অসীম বীরত্ব প্রকাশের পর, মোগলদের হাত হইতে সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া লয়েন।

এই সময়ে, মেংরাজজী আরাকানের অধিপতি। তিনি সেলিম-সা উপাধি গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত দেশ সমূহ, তাঁহার অধিকারে ছিল। পর্টুগীজদিগের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত। তাহাদের দমনের জন্য, তিনি বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কার্ভালো সন্দ্বীপ অধিকার করিয়াছে শুনিয়া, তিনি দেড়শত সজ্জিত রণতরী ও কামান, সন্দ্বীপ দখলের জন্য পাঠান। কার্ভালো—কেদাররায়ের নিকট সেই সংবাদ পাঠাইলে, কেদার রায়—তাহার সাহায্যের জন্য একশত খানি কামান ও বন্দুক-সজ্জিত "কোষ" শ্রীপুর হইতে প্রেরণ করেন। একদিকে বাঙ্গালী, পর্টুগীজ ও অপরদিকে মগ। কার্ভালো কেদাররায়ের নিকট সাহায্য পাইয়া, বিপুল বিক্রমে সেলিমসার রণতরী সমূহ আক্রমণ করেন। মগরাজ এইযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। তাঁহার সমস্ত রণতরীগুলি, কার্ভালোর হস্তগত হয়। কার্ভালোর এই অসীম বীরত্বের ফলে, সনদ্বীপ কেদাররায়ের দখলেই রহিল।

এই সনদ্বীপ লইয়া, আরাকান রাজের সহিত কেদাররায়ের ক্রমাগতঃ বিবাদ চলিতে লাগিল। এই সময়ে মানসিংহ, মন্দারায়কে কেদাররায়ের রাজ্যাক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, রাজা কেদাররায়, আবার প্রচুর সেনা-সমেত কার্ভালোকে—মোগল-সৈন্যগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোগলসেনা—কার্ভালোর বীর বিক্রমে সন্ত্রস্ত ও ভীত হইয়া, পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে।

এই যুদ্ধের পর, কার্ভালো প্রতাপের রাজধানী চণ্ডীখানে উপস্থিত হন। প্রতাপের আহ্বানেই, কার্ভালো তাঁহার রাজধানীতে যান। তাঁহার নৌ-সেনাপতি রডার অপেক্ষা, আর কেহ যে সমধিক প্রতাপশালী হয়—ইহা প্রতাপের ইচ্ছা নহে। বিশেষতঃ—এই কার্ভালোর সহায়তায়, কেদাররায় যে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া পরিচিত হইবেন, ইহাও তাঁহার সহ্য হইল

kill Carvalho and thereby make friends with the king of Arakan, who was then very powerful and had already taken possession of the kingdom of Bakla. The king there-fore sent for Carvalho to "Josor" and there had him murdered (Du Jarric).

া। মগরাজ সেলিম-সাও, এই কার্ভালোর সর্ব্বনাশের জন্য মহা-ব্যস্ত। প্রতা-পর সহিত মগরাজের এ সম্বন্ধে, সমস্ত কথাবার্ত্তা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। গর্ভালোকে নিজের রাজধানীতে পাইয়া, প্রতাপ তাহাকে ঘাতকদ্বারা গুপ্তভাবে নিহত করেন। কার্ভালো যখন যশোহরে আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে, উক্ত পর্টুগীজ পুরোহিতদ্বয়ও আসিয়াছিলেন। কার্ভোলোকে হত্যা করিয়া, প্রতাপ নিজের ও মগরাজের চিত্ত তুষ্টি করিলেন।

এখন দেখা যাউক—যশোরের নাম "চণ্ডীথান" হইল কিরূপে? আর এই চণ্ডীথানের অবস্থান স্থান কোথায়? আমরা যতদূর বিচার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, চণ্ডীথানই—প্রতাপের ধূমঘাট। আজকালকার, কালীগঞ্জের নিকট সেকালের এই ধূমঘাট-দুর্গ ও রাজধানী ছিল। পর্টুগীজ লেখকেরা বলেন—এই চণ্ডীথান নাম—"চাঁদখান" এই শব্দের বিকারমাত্র। রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য হইতে জানিতে পারা যায়—প্রতাপের পিতা, বিক্রমাদিত্য, যে সময়ে গৌড়ের-সম্রাট দায়ুদের নিকট হইতে, যশোর সাম্রাজ্যের সনন্দ প্রাপ্ত হন—তখন ইহা চাঁদখাঁনের বা "চাঁদখাঁর" জমীদারী-ভুক্ত ছিল। চাঁদখাঁর সন্তানাদি ছিল না এবং তিনিও তখন মৃত। কাজেই প্রার্থনামাত্রেই, গৌড়েশ্বর দায়ুদ, তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাদিত্যকে, এই জমীদারীর সনন্দ দেন। বেভারিজ সাহেব বলেন—যশোরপ্রদেশ পূর্ব্বে খাঞ্জা-আলি (খাঁজাহান) নামক, এক জন সুবেদারের দখলে ছিল। ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, খাঞ্জা-আলির মৃত্যু হয়। ইহার ১২০ বৎসর পরে, বিক্রমাদিত্য যশোরে নগর স্থাপন করেন। খাঞ্জা আলির যিনি উত্তরাধিকারী ছিলেন—খুব সম্ভবতঃ, তাঁহার নাম চাদখাঁন, আর তাঁহার অধীনস্থ জমীদারী, তাঁহার নামানুসারেই সাধারণে পরিচিত ছিল। বিক্রমাদিত্য—জমীদারী দখল লইবার পরও, হয় ত উহা "চাদখানের জমীদারী" এই সংজ্ঞায় তখনও অভিহিত হইত। এই চাদ-খাঁ হইতে, সম্ভবতঃ "চণ্ডীথান" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বিদেশীয় পর্টুগীজ লেখকগণ, এই চাদখানকেই—Chandecan বা Ciandecan বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। *

আমরা প্রতাপাদিত্যের সম-সাময়িক লেখকগণের ইতিবৃত্ত হইতে, যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য—যে তিনশত বৎসরের পূর্ব্বে, সেই ঘটনাসঙ্কুল সময়ের কোন ইতিহাসই নাই। যদি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও রামরাম

* Were the Sunderbans inhabited in ancient times? J. A. S. B. vol. XLV.

বসুর ও শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য না থাকিত, তাহা হইলে প্রতাপের স্মৃতি এতদিন বঙ্গ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

প্রতাপাদিত্যের পিতা, বিক্রমাদিত্যের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন কিরূপে হয়, কিজন্য গৌড়-সম্রাট দায়ুদ, তাঁহার উপর এত অনুরক্ত হন, সে সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—দায়ুদের শ্রীধর (শ্রীহরি) বলিয়া, একজন উচ্চপদস্থ বিশ্বাসী মন্ত্রী ছিলেন। দায়ুদের প্রধান সচিব, আমীর-উল-উমরা লোদী খাঁ। আর ইউসফ্, গৌড়েশ্বরের ভ্রাতষ্পুত্র। ইউসফ্—লোদী খাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দায়ুদ, ইউসফ্‌কে গোপনে হত্যা করেন। লোদি খাঁ—এই বিপত্তিতে গৌড় ত্যাগ করিয়া, জৌনপুরের মোগল-শাসনকর্ত্তা, মুনাইম খাঁর আশ্রয় লয়েন। কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়ায় ও তাঁহার বন্ধুগণ—শ্রীহরি, জালাল খাঁ ও কালাপাহাড়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন দেখিয়া, লোদি খাঁ—সাহাবাদের রোটাসগড়ে আশ্রয় লয়েন।

দায়ুদ খাঁ, নানাবিধ কৌশলাবলম্বনে, লোদীখাঁকে গৌড়ে আনয়ন করিয়া বন্দী করেন। বন্দীর রক্ষার ভার, তাঁহার প্রধান অমাত্য শ্রীহরির উপর দেন। শ্রীহরিও কতলুখাঁর পরামর্শে, দায়ুদ—পরাক্রান্ত লোদী খাঁকে-হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হন। ইহার পর শ্রীহরি * বিক্রমজিৎ (বিক্রমাদিত্য) উপাধি ও যশোরের জমীদারী প্রাপ্ত হন।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে, একজন ইংরাজ-লেখক যাহা লিখিয়াছেন—তাহার মর্ম্মানুবাদ আমরা নিম্নে দিতেছি। তিনি বলেন—"প্রতাপাদিত্য প্রথম প্রথম ক্রমশঃ উন্নতির স্তরে উঠিতেছিলেন। তাঁহার সময়ে, যশোহর বহু হর্ম্ম্যমালায় বিভূষিত হয়। নানাস্থানে জঙ্গল কাটাইয়া, তিনি পথঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দীর্ঘিকা-খনন, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা—দেবমন্দির ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ ইত্যাদি, প্রজাহিতকর অনেক কার্য্য তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। দিন দিন তাঁহার রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের, রাজ্য তিনি বাহুবলে করায়ত্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি, তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত ভূভাগের একচ্ছত্র অধীশ্বরত্ব লাভ করিলেন। এমন কি, দিল্লীর বাদসাহকেও অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছিলেন। এইরূপ

* Akbarnama. Elliot's History of India VI 41. অনুবাদে শ্রীহরির নাম Sayid Hari (সৈয়দ হরি) লিখিত হইয়াছে। শ্রীহরিকে "শ্রীধর বাঙ্গালী" বলিয়া মুসলমান গ্রন্থকারগণ একটু গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

অতিরিক্ত সাফল্যে, প্রতাপ অতিশয় গর্ব্বিত ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার প্রজাদের সামান্য অপরাধের জন্য, ভীষণ দণ্ড দিতে লাগিলেন। অতি তুচ্ছ অপরাধের জন্য, অপরাধীর শিরচ্ছেদের আজ্ঞা দিতে লাগিলেন। এই কারণেই, তাঁহার রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন।"

প্রতাপ যখন যশোহরে যশোরেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দেবী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ দিয়া বলেন—"যতদিন না তুমি আমাকে চলিয়া যাইতে বলিবে—ততদিন আমি তোমায় ত্যাগ করিব না।" প্রতাপ যখন প্রজা-নিগ্রহে ব্যস্ত, সেই সময়ে যশোহরেশ্বরী তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তিনি তাঁহার নিকট চিরবিদায় লইবার জন্য, তাঁহার কন্যামূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রকাশ্য দরবার মধ্যে উপস্থিত হন। *

প্রতাপ, একদিন রাজসভায় বিচারাসনে উপবিষ্ট। এক মেথরাণী, তাঁহার সম্মুখে, রাজবাড়ীর উঠান ঝাঁট্ দিয়াছিল—এজন্য প্রতাপ, তাহার এ ধৃষ্টতার জন্য, বড় রুষ্ট হইয়া, তাহার স্তনদ্বয় কর্ত্তন করিয়া দিবার আদেশ দেন। প্রতাপ যখন এই নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতেছেন, সেই সময়ে যশোরেশ্বরী তাহার কন্যা মূর্ত্তি ধরিয়া, রাজ-সভামধ্যে উপস্থিত হন। প্রকাশ্য রাজসভায় কন্যাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, প্রতাপ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তখনই কন্যাকে বলেন—"যা—যা—এখান হইতে এখনই চলিয়া যা। আর তোর মুখ দেখিব না। এ পুরীর মধ্যেও তোর স্থান নাই।" এই সময়ে দেবী নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, প্রতাপকে বলেন—"তুমি যখন আমায় তাড়াইয়া দিয়াছ—তখন আর আমি এখানে থাকিব না। আমি চলিলাম!"

মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়া, জীবিতাবস্থায় দিল্লীতে বাদসাহের নিকট লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই, যে তিনি প্রতাপকে

* For a time—says tradition, Pratapaditya, prospered exceedingly. He adorned his kingdom with noble buildings, made roads, built temples, dug tanks and wells and in fact, did everything that a soverign could do, for the welfare of his subjects. The limit of his kingdom, quickly extended, for he made war on his neighbours and came off victorious in every battle, till all the surrounding country, acknowledged his rule. Ultimately he declared himself independent of the Emperor of Delhi and so great was his power, that he managed to defeat one after another, the generals sent against him. He was a favorite to goddess Jessoreswari, for her favour was at last withdrawn for Pratrpaditya swolen with pride, became very tyranical with his subjects, beheading them for the least offence. B. Gazeteer P, 26.

সিংহের মত এক পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। দিল্লীতে আরও অধিক লাঞ্ছনা ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায়—প্রতাপাদিত্য, গরলগর্ভ অঙ্গুরীয় লেহনে, পথিমধ্যে কাশীতে আত্মহত্যা করেন।

প্রতাপাদিত্যের বংশবৃক্ষ।
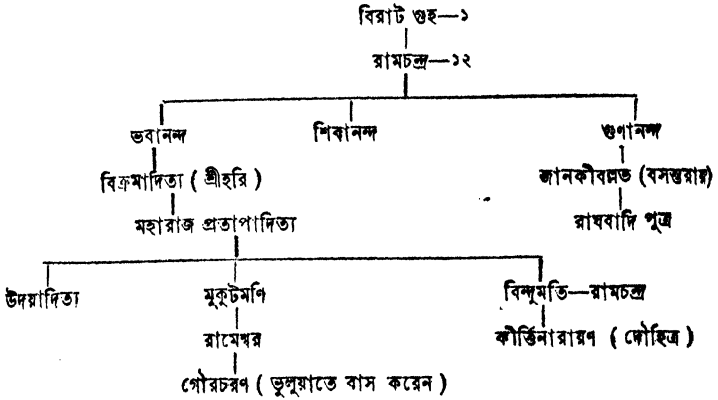
শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বংশবৃক্ষ।
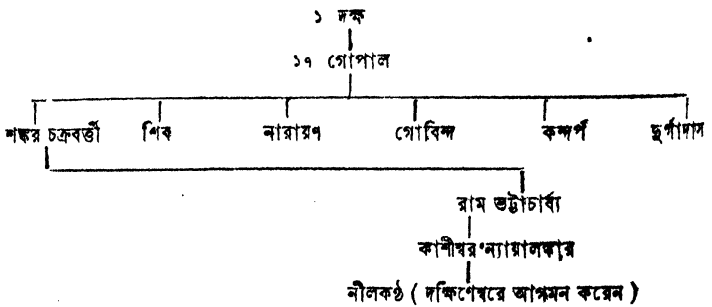
যশোরে মোগল-পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মানসিংহ এইরূপে প্রতাপাদিত্যের ধ্বংশ-সাধন করিলেন। ভবানন্দ, বহু চেষ্টায় যে রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিনাশ, প্রতাপের পতনের সঙ্গেই সূচিত হইল।

প্রতাপের সম-সাময়িক আর যে দুই জন ভৌমিক, সেই সময়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন—এইবার তাঁহাদের কথা বলিব।

বাঙ্গালার দ্বাদশ-ভৌমিকগণের মধ্যে, যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্য ও বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায় ও কেদাররায় নামক দুই ভ্রাতাই, বিশেষ গণনীয়। প্রতাপ—স্বল্প দিবসব্যাপী যুদ্ধের পর, মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত ও

অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্য পক্ষে—কেদাররায়, মানসিংহকে শ্রীপুর জয়ে বিশেষ কষ্ট দিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের জীবনী-কথা, এক্ষণে তিন চারি খানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়া, তাঁহার নাম সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আছে—

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বর পুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হল্‌কা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

কিন্তু বিক্রমপুরাধিপতি কেদাররায়ের কাহিনী, এখনও সম্পূর্ণভাবে সাধারণের নিকট প্রচলিত হয় নাই। তাঁহার জীবনের ঘটনা অবলম্বনে এ পর্য্যন্ত কোন কাব্যাদি রচিত হয় নাই। মাত্র—একখানি ঐতিহাসিক নাটকে, তাঁহাদের কীর্ত্তি-কথা বিবৃত হইয়াছে। এইজন্য, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা চাঁদরায় ও কেদাররায় সম্বন্ধে দুই চারি কথা সংক্ষেপে বলিব।

পূর্ব্ব বাঙ্গালায়—বিক্রমপুর প্রদেশের অধিপতি, এই চাঁদরায় ও কেদার রায়। শ্রীপুর, তাঁহাদের রাজধানী ছিল। প্রসিদ্ধ পর্টুগীজ ভ্রমণ-কারী ফার্ণাণ্ডেজ সাহেব, ষোড়শ শতাব্দীতে, প্রতাপের যশোহর ও চাঁদরায়ের শ্রীপুরের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে প্রমাণ হয়, শ্রীপুর রাজধানী অতি ঐশ্বর্য্যময়ী অবস্থায় ছিল। ফার্ণাণ্ডেজ—আরাকান, শ্রীপুর (চণ্ডীপুর), চণ্ডীখাঁ (যশোহর) এই তিনটী রাজ্যকে প্রধান বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—"মোগলদের প্রবল পরাক্রম সত্ত্বেও, ঐ দুই প্রদেশাধিপতিগণ যথেষ্ট প্রভুত্ব উপভোগ করিতেন। বিশেষতঃ চণ্ডীখান্ ও শ্রীপুরাধিপতিরা, মোগল-অধীনতা স্বত্ত্বেও স্ব স্ব রাজ্যে সর্ব্বময়কর্ত্তা ছিলেন। *

শ্রীপুর—গগনস্পর্শী অতুল্য হর্ম্ম্যমালায় সুশোভিত ছিল। রায়-রাজগণ, বহু যত্নে ও চেষ্টায় শ্রীপুরে সমাজগঠন ও নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদাররায় সেই সময়ে, বিক্রমপুর-সমাজের অধিপতি

* Early Travels in India—By Fernandez. P. 3 & 11.

ছিলেন। আর এই সামাজিক আধিপত্য জন্যই, তাঁহাদের অন্নভোজী আশ্রিত কর্ম্মচারী, শ্রীমন্তের কূটনীতি কৌশলে—তাঁহাদের অধঃপতনও ঘটিয়াছিল। যথাস্থানে, আমরা এ বিষয় বর্ণন করিব।

বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকগণ, ব্যক্তিগত প্রাধান্য রক্ষার জন্য, চেষ্টা না করিয়া যদি একযোগে কাজ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ পরাজয় সুদূর-পরাহত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই—এবং সেই জন্যই তাঁহাদের অধঃপতন হয়। দ্বাদশ-ভৌমিকদের অগ্রণী, মহারাজ প্রতাপাদিত্য—ভবানন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্য হারাইয়া, মোগল সেনাপতির হস্তে বন্দী হন। আবার অন্য পক্ষে, কেদাররায়, তাঁহার অধীনস্থ শ্রীমন্ত চৌধুরী নামক জনৈক কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায়, মানসিংহের নিয়োজিত গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হন। এই শ্রীমন্তই—রাজা কেদাররায়ের ও বিক্রমপুর রাজ্যের অধঃপতনের কারণ। *

---

* কেহ কেহ চাঁদরায় ও কেদাররায়কে, পিতা—পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আবার আজকাল এ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। বর্ত্তমানে দুই একজন স্থানীয় ঐতিহাসিক চাঁদরায় ও কেদাররায়কে "সহোদর-ভ্রাতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজাবাড়ীর যে স্মৃতি স্তম্ভটী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফলডার কর্ত্তৃক নবসংস্কৃত হয়, তাহাতে "দুই ভ্রাতা" এই কথাই উল্লেখ আছে। আমরা আধুনিক মতই অবলম্বন করিলাম। নিম্নে এতৎসম্বন্ধীয় একখানি পত্রও প্রকাশ করিলাম। চাঁদরায় ও কেদাররায়, এই দুজনের মধ্যে সম্বন্ধ লইয়া, বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে, অল্প বিস্তর আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। চাঁদরায় ও কেদাররায় দুই ভাই ছিলেন—বিদ্যমান কালে এই মতই পরিগ্রাহ্য। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু—দীনেশ বাবু এ সম্বন্ধে প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে, প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ও রামানন্দ বাবু যাহা আমাকে পাঠান, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দিতেছি। ইহা হইতে নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ হয়—তাঁহারা দুই ভ্রাতাই ছিলেন।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়!

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক, শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, গত ভাদ্র সংখ্যা "প্রবাসীতে" "জ্যোতি-নির্ব্বাণ" নামক যে উপন্যাসটীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কেদাররায়কে, চাঁদরায়ের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে, আমাদের একটু সন্দেহ আছে। আশা করি—হরিসাধন বাবু, আমাদের সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া বাধিত করিবেন।

পদ্মার উত্তর পারে, রাজবাড়ী নামক যে গ্রামটী বর্ত্তমান আছে, সেই গ্রামে একটী অতি প্রাচীন ও অতি উচ্চ মঠ বর্ত্তমান থাকিয়া, এখনও চাঁদরায়ের অতুল কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। ঐ মঠের গাত্রে, একটী শ্বেত-প্রস্তরফলকে ইংরাজিতে যে কয়টী কথা খোদিত আছে, তাহা পাঠ করিলে—হরিসাধন বাবুর লিখিত চাঁদরায় ও কেদাররায়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে, বড়ই খট্‌কা লাগিয়া যায়। আমরা নিম্নে ঐ প্রস্তর-ফলকের লেখায় অবিকল নকল দিতেছি :—

"This Structure being an ancient and sacred Hindu Monument and a valuable Landmark for the District, erected by Chand Roy and Kedar Roy, over the Funeral Pyre of their Mother, in the Sixteenth Century, was repaired in 1896 at the cost of Raja Srinath Ray of Bhagyakul by Sasi Bhuson Mitter District Engineer, under the orders of C. J. S. Faulder Esqr., I. C. S. Collector of Dacca."

একটী সামান্ত সামাজিক বিষয় লইয়া, কেদাররায়ের সহিত তাঁহার অমাত্য, শ্রীমন্তের মনোবাদ উপস্থিত হয়। শ্রীমন্ত—শ্রোত্রিয়-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সমাজ-বন্ধনের মুখে, রাজা কেদাররায়, শ্রীমন্তকে গোষ্ঠীপতিত্ব প্রদান না করিয়া, কোটিশ্বরের দেবল—ব্রাহ্মণদের গোষ্ঠীপতিত্ব প্রদান করেন। শ্রীমন্ত এ ব্যাপারে, যথেষ্ট প্রতিকূলতা করিয়াও, সিদ্ধকাম হইতে পারিল না। শ্রীমন্তের বিচারে, দেবল-ব্রাহ্মণগণ—হীন-ভাবাপন্ন। এ সম্বন্ধে প্রতিবাদে কোন ফল হইল না দেখিয়া, শ্রীমন্ত রায়-রাজগণের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইল। কি প্রকারে তাঁহাদিগকে রাজশ্রী-হীন করিবে, কি প্রকারে তাঁহাদের ধ্বংশ সাধন করিবে, দারুণ মনস্তাপে অধীর হইয়া—শ্রীমন্ত সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল এবং এজন্য তাহাকে অধিকদিন সুযোগ অপেক্ষা করিতে হইল না। বিধাতা—শীঘ্রই এক উপযুক্ত অবসর ঘটাইয়া দিলেন।

বাঙ্গালার দ্বাদশ-ভৌমিকগণের মধ্যে, চট্টগ্রামাধিপতি নবাব ইশাখাঁ মসনদী, একজন গণনীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইশাখাঁর পিতা—কালিদাস, হিন্দু ছিলেন—পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইশাখাঁর রাজধানী—চট্টগ্রামের অন্তর্বর্ত্তী—খিজিরপুর। দ্বাদশ-ভৌমিকদের বিদ্রোহ সময়ে, ইশাখাঁর নাম যে জাহির হয় নাই—তাহার প্রধান কারণ এই,—তিনি ইতিপূর্ব্বেই আকবর-সাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ঘটনাটী এই—ইতিপূর্ব্বে মানসিংহ যখন ইশাখাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন, সেই সময়ে ইশাখাঁ বীর-বিক্রমে মানসিংহের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে—উভয় পক্ষের জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়ায়, ইশাখাঁ মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। এই যুদ্ধে মানসিংহের তরবারি ভঙ্গ হয়। ইশাখাঁ ইচ্ছা করিলেই, অস্ত্রহীন মানসিংহকে হত্যা করিতে পারিতেন। কিন্তু—তিনি প্রাণের উদারতাবশে তাহা না করিয়া, মানসিংহকে একখানি নূতন তরবারি প্রদান করেন এবং পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করেন। মানসিংহও—ইশাখাঁর হৃদয়ের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া, তাঁহাকে বন্ধুভাবে

পরিশেষে "প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট, আমাদের বিনীত নিবেদন এই—যে পদ্মা যেরূপ দ্রুতগতিতে উক্ত মঠের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে হয়, চাঁদরায়ের যে কীর্ত্তি এতকাল বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহার নাম ঘোষিত করিতেছিল—তাহা বা দুই এক মাসের মধ্যেই পদ্মা-গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় "সচিত্র প্রবাসীতে" যদি ইহার একটী ছবি তুলিয়া রাখেন, তবে একটী স্থায়ী চিহ্ন থাকিয়া যায়। এই বিষয়ে তাঁহাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। ইতি—

বিনীত নিবেদক
শ্রীদীনেশচরণ বসু।

আলিঙ্গন করেন। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। মানসিংহ—ইশাখাঁকে আগরায় লইয়া গিয়া,আকবর সাহের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। বাদসাহ ইশাখাঁর গুণাবলীর ও মহত্বের পুরস্কার স্বরূপ, তাঁহাকে শিরোপা, খেলাৎ ও চট্টগ্রাম প্রদেশের একাধিপত্য প্রদান করেন।

এই ইশাখাঁর সহিত, বিক্রমপুরের রাজা চাঁদরায়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ইশাখাঁ, মধ্যে মধ্যে শ্রীপুরে আসিয়া, চাঁদরায়ের আতিথ্য-স্বীকার করিতেন। চাঁদরায়ও বন্ধুর পদোপযুক্ত সমাদর করিয়া, তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন।

কিম্বদন্তী এই—যে নবাব ইশাখাঁ,কোন এক সময়ে তাঁহার বন্ধু, চাঁদরায়ের আতিথ্য-স্বীকার করেন। এই সময়ে, একদিন তিনি ঘটনাক্রমে, চাঁদরায়ের পরম রূপবতী বিধবাকন্যা, সোণামণিকে দেখিতে পান। সেই দেবদুর্ল্লভ অনিন্দ্যরূপরাশি, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মহত্বময় হৃদয় অধিকার করিল। দুর্দ্দমনীয় রিপুর তাড়নায়, তিনি প্রাণের স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব হারাইলেন। সোণামণির লোকলোচন-দুর্লভ অতুলনীয় রূপরাশি, আর তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা, ইশাখাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক উদারতার বিলোপ করিয়া, ঘোর নীচতা আনিয়া দিল। প্রাণের মধ্যে, সোণামণির রূপের ছবি আঁকিয়া লইয়া, ইশাখাঁ নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু সহস্র কার্য্যের মধ্যেও—তিনি সেই অতুলনীয় রূপসী সোণাকে ভুলিতে পারিলেন না। সেই লোক-ললাম-ভূতা, সুন্দরীর রূপ-জ্যোতিতে আত্ম-হারা হইয়া, তিনি সোণামণির হস্ত প্রার্থনা করিয়া, চাঁদরায় ও কেদাররায়ের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন।

ইশাখাঁর এই নীচজনোচিত প্রার্থনায়, চাঁদরায় ও কেদাররায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন। ইহার পর, কেদার রায়, এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য, ইশাখাঁর কলাগাছিয়ার দুর্গ অবরোধ করেন। ইশাখাঁ—আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, তাঁহার ত্রিবেণী দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেদাররায়, ত্রিবেণী-দুর্গ অবরোধ করিয়া, খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। এই সব ব্যাপারে, ইশাখাঁর চৈতন্যোদয় হইল! হিন্দুর নিকট কন্যা-প্রার্থনা করিয়া, তিনি যে কি ভয়ানক কাজ করিয়াছেন—তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন। তিনি যখন এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় চিন্তায় ব্যস্ত—সেই সময়ে অযাচিত ভাবে, বিধাতা-প্রেরিত এক মহাসুযোগ, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

এই সময়ে শ্রীমন্ত চৌধুরী, চাঁদরায়ের সহিত খিজিরপুরে অবস্থান করিতেছিল। দুষ্টবুদ্ধি শ্রীমন্তের—মনের ভাব চিরদিনই একরূপ। "বর্ত্তমান যুদ্ধে—রাজা কেদার-রায় ইশাখাঁর নিকট পরাজিত হউন, রায়-রাজ্য বিক্রমপুর উৎসন্ন যাউক—" সে মনে মনে এইরূপ ভাব পোষণ করিলেও মুখে বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া চলিত। কুটিলমতি শ্রীমন্ত, মনোভাব গোপনে এত চতুর ও সুকৌশলী ছিল, যে চাঁদরায় তাহাকে একজন অন্তরঙ্গ হিতৈষী মিত্র, বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কেদাররায় যখন খিজিরপুর লুণ্ঠনে ব্যস্ত, সেই সময়ে অতি গোপনে এই প্রভু-দ্রোহী শ্রীমন্ত, ইশাখাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে। খাঁ-সাহেব তাহার মনোভাব অবগত হইয়া, এই বিশ্বাসঘাতককে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, খোদা ইচ্ছা করিয়াই, এই শ্রীমন্তকে—তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

উভয়ের মধ্যে একটা গুপ্ত বন্দোবস্ত হইল। সেই বন্দোবস্তের জন্য অথবা পূর্ব্বকার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই হউক, শ্রীমন্ত ইশাখাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করিল—যে কোন উপায়েই সে, চাঁদ-রায় কন্যা, পরমা সুন্দরী সোণামণিকে ইশাখাঁর অঙ্কশায়িনী করিবে। বলা বাহুল্য, প্রচুর পুরস্কার ও জমীদারী-লাভের লোভেই, শ্রীমন্ত এই কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

চাঁদরায় ও কেদাররায় উভয় ভ্রাতাই, যখন ইশাখাঁর সহিত যুদ্ধব্যাপারে ব্যস্ত, শ্রীমন্ত—সেই সময়ে শ্রীপুরে ফিরিয়া আসিয়া প্রচার করিল,—"রাজ ভ্রাতাদ্বয়, ইশাখাঁ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন। ইশাখাঁ—অচিরাৎ শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া—সোণামণিকে লুঠ করিয়া লইয়া যাইবে।" এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্রই, রাজপুরীতে হাহাকার শব্দ উঠিল। কিরূপে শ্রীপুর রাজধানী ও বিধবা রাজকন্যা সোণামণিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ চলিল। শ্রীমন্ত অবসর বুঝিয়া, রাজ-পরিবারবর্গকে পলায়নের উপদেশ দিল। কিন্তু প্রধান-মন্ত্রী, বৈদ্যবংশীয় রঘুনন্দন চৌধুরী, শ্রীমন্তের এ পরামর্শ সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তিনি প্রবল উৎসাহের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণী, রাজ্যরক্ষার জন্য যতটা ব্যস্ত না হউন—কন্যাকে রক্ষার জন্য বড়ই উতলা হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্তের পরামর্শই তাঁহার পক্ষে সমীচিন বলিয়া বোধ হইল।

চন্দ্রদ্বীপে—সোণামণির শ্বশুরালয়। গুপ্ত পরামর্শে স্থির হইল—

সোণামণিকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠানই উচিত। শ্রীমন্ত, রাণীর অনুরোধে—সোণাকে চন্দ্রদ্বীপে পৌছাইয়া দিবার ভারগ্রহণ করিল। রাজকন্যা সোণামণি শ্রীমন্তের রক্ষাধীনে, চন্দ্রদ্বীপ যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন।

পাপিষ্ঠ শ্রীমন্ত, ইতিপূর্ব্বেই প্রচুর অর্থদানে, মাঝিদের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। মাঝিরা সেই উপদেশ অনুসারে এবং প্রচুর অর্থের প্রলোভনে, নৌকাখানি চন্দ্রদ্বীপের দিকে না চালাইয়া, সুবর্ণ-গ্রামের দিকে চালাইল। শ্রীমন্তের পরামর্শ-ক্রমে, সেই সময়ে এই সুবর্ণ-গ্রামেই, ইশাখাঁ মসনদী অবস্থান করিতেছিলেন।

শ্রীমন্ত—বিনা প্রতিযোগিতায়, বিনা সন্দেহে, সুবর্ণগ্রামে নবাব ইশা-খাঁর নিকট—সোণামণিকে পৌছাইয়া দিল। এ ব্যাপার এত গুপ্তভাবে ও কৌশলের সহিত সমাধা হইল—যে চাঁদরায় ও কেদাররায়, ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারিলেন না। যথাসময়ে—এই ঘটনা, সর্ব্বপ্রথমে চাঁদরায়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি দারুণ মর্ম্ম-যাতনায় ও ঘৃণায়, যুদ্ধভার কেদার-রায়ের উপর সমর্পণ করিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া কন্যা-শোকে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।

চাঁদরায় রাজধানীতে পৌছিয়া, অমাত্য বন্ধু-বান্ধব কাহারও সহিত ব্যাকালাপ করিলেন না। কেবল মাত্র অনশন-ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক, কোটী-শ্বরের মন্দিরে শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রবাদ আছে—এই অবস্থায় দুই দিবস অতীত হইবার পর, তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলি-লেন—"বৎস! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন এই লোক-ক্ষয় কর যুদ্ধ হইতে, তোমাদের বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ। ভবিষ্যৎ বিপদ—এতদপেক্ষা আরও বেশী। তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হও।"

দেবীর এই প্রত্যাদেশ পাইয়া, চাঁদরায় মনে মনে ভাবিলেন—"সোণা-মণিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও, তিনি তাহাকে গৃহে স্থান দিতে পারিবেন না। সমাজে—সোণার কোন স্থানই নাই। বিশেষতঃ মোগল-বাদসাহের সহিত যেরূপ বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে, তাহাতে কখন কি হয় বলা যায় না। অতএব, এই যুদ্ধ হইতে এখন বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ। এই উদ্দেশ্য চালিত হইয়া, তিনি রাজা কেদাররায়কে এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

কেদাররায়, এদিকে বীর-বিক্রমে ইশাখাঁর ত্রিবেণীদুর্গ পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু

াদরায়ের আদেশ প্রাপ্তিমাত্রই, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত—শ্রীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঈশাখাঁ পরম রূপবান পুরুষ ছিলেন। বার—ভুইয়াঁ প্রবন্ধ-লেখক আনন্দবাবু বলেন—"ঈশাখাঁ সম্বন্ধে সোণামণির মনোগত ভাব কিরূপ ছিল, তাহা পরিগ্রহ করিবার কোন উপায়ই নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে ও ঈশাখাঁর প্রতি তাঁহার অনুরাগের বিষয় ভাবিলে, মনে এই উপলব্ধি হয়, যে সোণামণি, ঈশাখাঁকে প্রাপ্ত হইয়া অনুমাত্র অসুখী হন নাই। বরঞ্চ তাঁহার জীবনের কতকগুলি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে, ঈশাখাঁর আশ্রয়ই তাঁহার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল।" হিন্দুরমণীর এইরূপ প্রবৃত্তি, জানি না—তৎকালীন বিক্রমপুর সমাজে কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছিল! *

সোণামণি. ঈশাখাঁর করতলগত হইয়া, সোণাবিবি ও বিবি আলি নেয়ামত নামে পরিচিতা হইলেন। ঈশাখাঁ প্রথমে—হুসেন সাহের দৌহিত্রী করিম ফতেয়া-খাতুনের পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু ঈশাখাঁ—তাঁহার দুই পত্নীর মধ্যে, সোণাবিবিকেই সমধিক সম্মান করিতেন।

এদিকে চাঁদরায়, সোণামণির ব্যাপারে—হৃদয়ের বল হারাইলেন। তাঁহার বংশগৌরবে ঘোরতর কালিমা নিক্ষিপ্ত হইল। গর্ব্বিত সম্মান, পূর্ব্ববঙ্গের সামাজিক-নেতৃত্ব, সম্পূর্ণরূপে অবনত হইল। চাঁদরায়—ভগ্নহৃদয়ে শয্যা আশ্রয় করিলেন। এই শয্যাই তাঁহার অন্তিমশয্যা! কোটীশ্বরের পদমূলে আশ্রয় পাইয়া, তিনি সকল জ্বালাযন্ত্রণা হইতে এড়াইলেন। আর সেই বিশ্বাস-ঘাতক শ্রীমন্ত, খিজিরপুরে—ঈশাখাঁর আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল।

কেদাররায়,. বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এই সময়ে আকবরসাহের দেহ, সেকান্দ্রার অন্ধতমসাবৃত সমাধি-ক্ষেত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। সুলতান সেলিম, জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। এই সময়েই বঙ্গের ভূঁইয়াগণ প্রতাপাদিত্যকে অগ্রণী করিয়া, মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। মহারাজা মানসিংহ, কি উপায়ে প্রতাপের ধ্বংশ-সাধন করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রতাপের ধ্বংশের পর, তখনও দুই জন ভূঁইয়া মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম—ভুষণাধিপতি মুকুন্দরায়, দ্বিতীয়—বিক্রমপুরাধিপতি কেদাররায়। * মুকুন্দরায়ের ভুষণা আক্রমণ করিয়া, মানসিংহ অতি

* নব্যভারতের আনন্দ বাবুর প্রবন্ধ।

সহজেই তাঁহাকে বিধ্বস্ত ও করতলগত করেন। ইহার পর মানসিংহের দৃষ্টি শ্রীপুরের উপর পড়িল।

মানসিংহ—সসৈন্যে শ্রীপুরের সন্নিহিত হইয়া, রাজা কেদাররায়ের নিকট এক দূত-প্রেরণ করিলেন। এই দূতের হস্তে তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল—"যদি কেদাররায় শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া, বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে না। অন্যথা তরবারি গ্রহণ করিয়া, যদি শত্রুভাব প্রকাশ করেন—তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করা হইবে।" এই সঙ্গে একখানি পত্রও প্রেরিত হয়। দূত, মানসিংহ—প্রেরিত তরবারি এবং ঐ লিপিখানি কেদাররায়ের হস্তে দিল।

কেদাররায় প্রথমে মানসিংহ প্রদত্ত লিপি পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল।—

ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী, কাক-কুলী চাকালী।
সকল পুরুষ মেতৎ, ভাগ যাও পালায়ী॥
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি।
বিষম সমর সিংহোমানসিংহঃ প্রযাতি॥

কেদাররায় এই পত্র পাঠান্তে—অসিগ্রহণ করিয়া, দূতকে বলিলেন—"তোমার প্রভু মহারাজা মানসিংহকে বলিও, আমি তাঁহার প্রেরিত, তরবারিই গ্রহণ করিলাম। তাঁহার যতদূর ক্ষমতা থাকে, তাহা প্রয়োগ করিতে তিনি যেন কুণ্ঠিত না হন। হয়—তাঁহার অস্ত্রাঘাতে, আমার মস্তক দেহবিছিন্ন হইবে, নতুবা তৎপ্রদত্ত এই অসির আঘাতে—তাঁহারই মস্তক দেহ-বিচ্যুত হইয়া, এই যুদ্ধের অবসান হইবে।" কেদাররায় উক্ত পত্রাংশের উত্তরে, যে শ্লোকটী মানসিংহের নিকট প্রেরণ করেন, তাহাও আমরা আনন্দ বাবুর প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিলাম। কেদাররায়ের উত্তর এই—

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ-কুম্ভং।
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং॥
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে।
তথাপি সিংহঃপশুরেব নান্যঃ॥

মানসিংহ কেদার-রায়ের এই দম্ভ-সূচক লিপি পাইয়া, সৈন্যগণকে শ্রীপুর রাজধানী আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। মোগল-সৈন্য পঙ্গপালের মত, শ্রীপুরের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল।

কেদাররায়ের গুরু, গোঁসাই ভট্টাচার্য্য—সহসা এই মহাবিপদ উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহার শিষ্যকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কেদাররায়, সে কথায় কোন কর্ণপাত না করিয়া, গোঁসাই ঠাকুরকে বলিলেন—"গুরুদেব! আপনি এমন কোন দৈবানুষ্ঠান করুন, যাহাতে আমি যুদ্ধে জয়ী হই।" কেদাররায়, ছিন্নমস্তা দেবীর উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব, শিষ্যের মঙ্গলার্থে, সমর-বিজয়-দায়িনী, কালিকার মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, তৎপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রবাদ আছে—গোঁসাই ভট্টাচার্য্য, বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। ইঁহারা বৈদিকাচারী বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত কোন পূজা-অর্চ্চনাদি, প্রায়ই অনাহারে অনুষ্ঠান করিতেন না। তন্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা, ইষ্ট-দেবীকে অন্নব্যঞ্জনাদি উৎসর্গ করিয়া, ঐ প্রসাদ গ্রহণান্তর, গভীর নিশীথে পুনরায় দেবীর পূজার্চ্চনাদি করিতেন। গোঁসাই-ঠাকুর দিবসে আহার করিয়া, রাত্রে দেবীর পূজা করিতে যাওয়ায়, কেদাররায় উহাতে মনে মনে রুষ্ট হন। কিন্তু তিনি এ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া, গুরুদেবকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেও কিছু বলিতে পারেন না। এক দিন গুরু গোঁসাই-ঠাকুর, মধ্য রাত্রে পূজা শেষ করিয়া নির্ম্মাল্য লইবার জন্য, কেদাররায়কে বার বার ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহ্বানে, কেদাররায় উপস্থিত না হওয়ায়, গুরুদেব মনে মনে ভাবিলেন—কেদাররায় তাঁহার অনুষ্ঠিত শক্তি-পূজার প্রণালী দেখিয়া, নিশ্চয়ই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন—এবং এই জন্যই দেবীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে আসিতেছেন না।

গোঁসাই-ঠাকুর—কেদাররায়ের এই প্রকার ধৃষ্টতায়, বড়ই অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি সমবেত জন-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ! মৎকৃত দেবার্চ্চনার প্রতি তোমাদের রাজার বড়ই সন্দেহ ও ঘৃণা জন্মিয়াছে। আমি তাঁহার কল্যাণ-কামনায়, নানাবিধ হিতকর উপদেশ প্রদান করিয়াছি—এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বারবার পরামর্শ দিয়াছি, বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিয়াছি—কিন্তু তিনি যখন তাহা শোনেন নাই, তখনই জানিয়াছি—তাঁহার কল্যাণ অসম্ভব। আমি এই দৈব-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিলেন। অতএব তাঁহার অশুভ অনিবার্য্য। তোমরা স্বচক্ষে আমার প্রভাব অবলোকন কর।"

এই কথা বলিয়া, গুরুদেব গোঁসাই-ঠাকুর, শাণিত খড়্গ লইয়া সেই মৃণ্ময়ী

প্রতিমার বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই প্রহত স্থান হইতে অবিরল ধারায়, শোণিত-প্রবাহ বাহির হইতে লাগিল। উপস্থিত সকলেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইহার পর গোঁসাই ঠাকুর, রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া—সহসা অদৃশ্য হইলেন। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা, কেদাররায়ের কর্ণে পৌছিলে, তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া ত্বরিতপদে দেব-মন্দিরে আসিলেন। গুরুর অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন—কিন্তু তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। *

মানসিংহ—প্রচণ্ড সেনাবলসহ, বিক্রমপুর আক্রমণ করিলেন। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও, মহাবল কেদাররায় সাহসহীন হইলেন না। তিনি অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কখনও বা তিনি প্রচণ্ড বিক্রমে মান-

---

* এই সময়ে বঙ্গে যে শক্তি-পূজার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্য—যশোরেশ্বরীর পূজা করিতেন। চাঁদরায় ও কেদাররায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি এখনও বিক্রমপুরে বর্ত্তমান। কিন্তু কেদাররায় প্রতিষ্ঠিত, ছিন্নমস্তা মূর্ত্তির, কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী দেবী এখনও বিদ্যমান।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে "বসুমতী" পত্রিকায়, আমি "কেদাররায়" সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধ বাহির হইবার পর, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে একজন লেখক, কেদাররায় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী বসুমতীতে প্রকাশিত করেন। তাহা এস্থলে সবিস্তারে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, আপনার বসুমতী পত্রিকাতে গত ৫ই শ্রাবণ তারিখে বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকের অন্যতম, কেদাররায়ের জীবনবৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন। বঙ্গের ইতিহাসে, এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই, সুতরাং কেদাররায়ের জীবন বৃত্তান্তও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আছে। কেদাররায়ের সম্বন্ধীয় একটী বিশেষ সত্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে—সাধারণের অবগতি ও অনুসন্ধানের জন্য, আমরা লিখিতেছি—অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন:—নদীয়া জেলার অন্তর্গত পোষ্ট কালীগঞ্জের অধীন লাখুরিয়া গ্রামে, শ্রীযুক্ত বাবু ষষ্ঠীদাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে, যে ৺ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি আছেন, তাঁহার পাদপদ্মে "শ্রীকেদার রায়" নামাঙ্কিত আছে। ঐ দেবী কেদার রায়ের উপাস্য-দেবী বলিয়া চির প্রসিদ্ধ আছে। ষষ্ঠী বাবুর পূর্ব্ব পুরুষের বাস পূর্ব্ববঙ্গে ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবি কণ্ঠহার দ্বারা, যে সময়ে সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা নামে, তাঁহাদের জাতীয় কুলপঞ্জিকা লিখিত হইয়াছিল; তাহার পূর্ব্বে, ষষ্ঠীবাবুর পূর্ব্ব পুরুষ, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া লাখুরিয়া গ্রামে বাস করেন। "এই কেদাররায়ের প্রতি দেবীর আদেশ ছিল, "যবন দর্শন হইলে তোমার পুরী পরিত্যাগ করিব।" কেদাররায় রাজকরের জন্য বাদসাহের লোক কর্ত্তৃক বন্দী হইলে, দেবী তাঁহার আলয় পরিত্যাগ করেন ও ষষ্ঠীবাবুর পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীরায়ের ভবনে আসেন। তদবধি ঐ বংশেই পূজিতা হইতেছেন। কেদাররায়ের আলয় হইতে, শ্রীরায় ও গোপীরায়ের বাটীতে দেবীর আগমন নিরূপণ করা তত কঠিন নহে, কারণ কেদাররায় ও শ্রীরায় এতদুভয়ের মধ্যে বংশগত সামাজিক বা বন্ধুত্বসূত্রে কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। কেদাররায়ের অভীষ্ট দেবী সংক্রান্ত অনেক কিম্বদন্তী আছে। জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহা নিশ্চয় করা যায় না। হরিসাধন বাবু যে ইষ্টদেবীর পূজাকালে, কেদার রায়ের ঘাতক হস্তে মৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত যবন দর্শন মাত্র দেবীর পুরী পরিত্যাগ বৃত্তান্তের, অনেকটা সাদৃশ্য অনুমান করা যায়। ৺ভুবনেশ্বরী দেবীর পদাঙ্কিত, কেদাররায়ের নাম দেখিতে ইচ্ছা করিলে, ষষ্ঠী বাবুর বাটীতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়।

সিংহের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন—আবার কখনও বা মোগল-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া, কৃতান্তের ন্যায় মথিত করিতে থাকেন। এই ভাবে নয়দিন ধরিয়া, ভয়ানক যুদ্ধ চলিল।

দশম দিবসে, গভীর নিশীথে—ইষ্টদেবীর উপাসনার্থে, রাজা কেদাররায় দশ-মহাবিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করেন। তিনি যখন ইষ্টপূজায় একান্তচিত্তে নিমগ্ন, ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বাহ্যজ্ঞানবিহীন, সেই সময়ে বিশ্বাসহন্তা শ্রীমন্তের সহায়তায়, মানসিংহ-নিয়োজিত গুপ্তঘাতক, সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কেদাররায়কে অতর্কিত আক্রমণে, অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। মান-সিংহের এই কাপুরুষতা ও শ্রীমন্তের এই বিশ্বাসঘাতকতা, অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের নামে গভীর কলঙ্ক-কালিমা বিলেপিত করিয়া রাখিবে।

কেদাররায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে—আর একটী বিবরণ, আজকাল প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মতে প্রকাশ—যে কেদাররায় মানসিংহের নিয়োজিত গুপ্ত-ঘাতকগণ দ্বারা, ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে নিহত হন। কিন্তু ঐতিহাসিক চিত্রে, কেদাররায়ের মৃত্যু-সম্বন্ধে যে বিবরণটী প্রদত্ত হইয়াছে—তাহা অন্যরূপ। আমরা কেদাররায় প্রসঙ্গের শেষাংশটী পাঠকের গোচরার্থে এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"পাঠান রাজলক্ষ্মী, গৌড় হইতে চির নির্ব্বাসিত হইলেও, বাঙ্গলার শস্য-শামল প্রান্তর হইতে, দুর্দ্দমনীয় শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। দায়ুদের পর কতলুর্খাঁ, ইশার্খাঁ ও ওসমান খাঁ সেই শক্তিকে জাগরিত করিয়াছিলেন। ওসমানের বিজয়ভেরী, প্রথমে উড়িষ্যায় নিনাদিত হইয়া, পরে পূর্ব্ববঙ্গে মহান্দোলন উপস্থিত করে। সেই ব্যোমবিজয়ী, বিজয়ভেরীর গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত মোগল-সেনাপতি বাজবাহাদুর তাহার নীরবতা সাধনের জন্য, নানা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ওসমানের ভেরী-নিনাদ কিছুতেই নিবৃত্ত না হওয়ায়, মানসিংহ স্বয়ং বাজবাহাদুরের সাহায্যের জন্য, পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন। মিলিত মোগলসৈন্যের হুঙ্কারে, কিছুকালের জন্য ওসমানের বিজয়ভেরী, নীরব ভাবে অবস্থান করে। ইহার পর, বাজবাহাদুর ইশাখাঁ—ও কেদাররায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। ওসমান, ইশাখাঁ ও কেদাররায়ের প্রতিযোগীতায়—মোগল সেনাপতিগণ—পূর্ব্ববঙ্গে শান্তিস্থাপন করিতে পারেন নাই। বাজ-বাহাদুরকে, সোনারগাঁ ও বিক্রমপুর অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগী দেখিয়া, ওসমান পুনর্ব্বার মোগলের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করেন। মানসিংহ

আবার তাঁহার দমনের জন্য অগ্রসর হন। ওসমান পরাস্ত হইয়া, শান্তভাব ধারণ করিলে, মানসিংহ বিক্রমপুর ও শ্রীপুর অধিকারের জন্য, মনোনিবেশ করেন। কেদাররায়ও তাঁহাকে বাধা প্রদানের জন্য উদ্যোগী হন। কেদাররায়, অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, মানসিংহকে চমকিত করিলেন। কিন্তু পরিণামে তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল। কথিত আছে—যে মানসিংহ কেদাররায়কে তাঁহার রাজ্য পুনঃ প্রদান করেন। এই সময়ে কেদাররায়ের কুলদেবতা, শিলামাতাকেও মানসিংহ অম্বরে লইয়া যান। প্রবাদ এই শিলামাতা আজও জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বরে বিরাজ করিতেছেন।*

কেদাররায় পরাস্ত হইয়া, মানসিংহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পুনরায় আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আরাকান রাজ সেলিম-সাও, তাঁহার গোলন্দাজ সেনা ও রণতরী লইয়া, বাঙ্গলা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি কেদাররায়ের পরাক্রম, বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কেদাররায়ের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তিনি যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, ইহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। এজন্য তিনি কেদাররায়ের সহিত মিলিত হইয়া, পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান অধিকারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেদাররায় তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, উভয়ে একযোগে, অনেক স্থান মোগলের শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়েন। ইতি পূর্ব্বে ইশাখাঁর মৃত্যু হওয়ায়, সোণারগাঁ—মগরাজ ও কেদাররায়ের হস্তে পতিত হয়। কথিত আছে—সোণারগাঁ আক্রমণ কালে, চাঁদরায়ের কন্যা সোণাবিবি, কেদাররায় ও মগদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদাররায় লজ্জায় ও ক্ষোভে, সোণারগাঁ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। মোগলসৈন্যেরা তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান—মগরাজ ও কেদাররায়ের অধীনে আসে।

পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গে অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হইলে, মানসিংহ তাহা নির্ব্বাণের জন্য, বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাকে সেলিমসা ও কেদাররায়, উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে হয়। কিন্তু সুচতুর মানসিংহ, একবারে উভয়কে আক্রমণ করা যুক্তি সঙ্গত মনে না করিয়া, প্রথমে সেলিমসার বিরুদ্ধে

* প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী জাগ্রত দেবতা। তাঁহার প্রত্যাদেশ না লইয়া, প্রতাপ কোন কার্য্যই করিতেন না। রাজা কেদাররায়ের ছিন্নমস্তাও (শিলামাতা?) সেইরূপ ছিলেন। জনপ্রবাদ এই—মোগলঘাতক কর্ত্তৃক কেদাররায়ের ভূলুণ্ঠিত মস্তক—"ছিন্নমস্তে-নমস্তে"—বলিয়া নিজের ইষ্ট-দেবীর নামোচ্চারণ করিয়াছিল। (আনন্দবাবুর দ্বাদশভৌমিক)

দ্ধযাত্রা করিবার সঙ্কল্প করেন। আরাকানীরা জল ও স্থলযুদ্ধ, উভয় ব্যাপারেই পারদর্শী ছিল। কাজেই, মানসিংহকে প্রথমে তাহারই আয়োজন করিতে হয়। তৎপূর্ব্বে আরাকানরাজ ও কেদাররায়ের মধ্যে সন্ধি ভঙ্গ হওয়ায়, মানসিংহের পক্ষে মহা-সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই, আরাকানরাজ সেলিমসার সৈন্যগণকে আক্রমণ করেন। মানসিংহ, সেলিমসাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত করেন।

মগরাজকে দমন করিয়া, মানসিংহ পুনর্ব্বার কেদাররায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসুক হন। মগদিগের সহিত এই যুদ্ধে তাঁহার অনেক সেনা নষ্ট হইয়াছিল। ১৬০৪ খৃ অব্দে মানসিংহ, নবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, কেদাররায়ের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন। কেদাররায় এই সময়ে পাঁচশত রণতরী সংগ্রহ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাও ছিল। মানসিংহ প্রথমতঃ মোগল-সেনাপতি কিলমক্‌কে, কেদাররায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করেন। কিলমক, সসৈন্যে শ্রীনগর নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, কেদাররায়ের সেনাগণ তাঁহাকে চারিদিক হইতে অবরোধ করিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলে। মানসিংহ, কিলমকের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া, তাহার সাহায্যের জন্য একদল মোগলসেনা পাঠাইয়া দেন। পুনরায় কেদাররায়ের সেনাদলের সহিত, মোগলসৈন্যের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। বাঙ্গালীর অত্যদ্ভুত বীরত্বে, মোগল ও রাজপুতগণ চমকিত হইয়া গেল। এই যুদ্ধে, কেদাররায় নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাপরাক্রম প্রদর্শন করিয়া, মোগলের বিশ্ব-ধ্বংশকর গোলা উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া, উভয় পক্ষের ভয়াবহ অগ্নিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে কেদাররায় আহত হইয়া পড়িলেন। মোগলেরা জয়লাভ করিয়া, তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল ও সেই অবস্থায় মানসিংহের নিকট, লইয়া গেল। মানসিংহের নিকট, সেই শোচনীয়, আহত অবস্থায় আনীত হইবার অল্পক্ষণ পরে, কেদাররায় এ নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অক্ষয়ধামে চলিয়া যান।*

* Kedar Roy, the Lord of Sripur was suddenly assaulted with 100 Koshas sent by Raja Mansing, who having subjected that tract, to his master, sent forth his navy against Kedar Roy * Munda Roy the Admiral of Raja Mansing was slain after a bloody fight.

ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, রাজা মানসিংহ, জলপথে ও স্থলপথে সেনা চালনা করিয়া কেদাররায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদাররায়ের, নৌসেনাবলও বড় কম ছিল না।

কেদাররায়, বিক্রমপুর সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে তিনি ভূমি-দান করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে বঙ্গজ কায়স্থদের, তিনটী সমাজ, পরস্পরের গৌরব-বর্দ্ধনের চেষ্টা করিত। শ্রীপুরের রাজবংশ—বিক্রমপুরের, বাকলার রাজবংশ—চন্দ্রদ্বীপের ও যশোরের রাজ-বংশ—যশোরসমাজের, গোষ্ঠীপতি থাকিয়া স্ব স্ব সমাজের গৌরবরক্ষার জন্য সতত যত্ন করিতেন। এই তিন সমাজে অবস্থিত, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি, অনেক ভূসম্পত্তি ও বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষ-পরম্পরাক্রমে আপনাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই সমস্ত ব্রহ্মোত্তর দান ব্যতীত—চাঁদরায় ও কেদাররায়, অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘিকা-খনন করিয়া, আপনাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া +

মুহূর্ত্ত মধ্যে, তিনি একশত "কোষ" বা বৃহৎ নৌকা সজ্জিত করিতে পারিতেন। প্রতাপাদিত্যের রডার ন্যায়, ফ্রান্সিস কার্ভালো, তাঁহার পটুগীজ নৌসেনাপতি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য পরিশেষে এই কার্ভালোকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

কেদাররায়ের অসীম ক্ষমতা ও যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ভ্রমণকারী Ralph Fitch সাহেব, যাহা লিখিয়াছেন তাহাও এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

Raja Mansinga, after defeating the Magh Raja, turned his attention towards Kaid Rai (Kedar Roy) of Bengal, who had collected nearly 500 vessels of war and had laid siege to Kilmack, the Imperial Commander in Srinagar. Kalmack held out till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcome the enemy and after a furious cannonade, took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds, soon after he was brought before the Raja. (Inayatulla's Takmillui Akbarnama. Elliot's History of India. vol, vi.)

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে, কেদাররায়ের মৃত্যুবৃত্তান্ত যেভাবে বর্ণিত আছে, তাহার সহিত তুলনায় আনন্দ বাবুর লিখিত বৃত্তান্ত ঠিক বিপরীত। এ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক। সুবুদ্ধিমান পাঠক স্ব স্ব অভিমত সংগঠন করিয়া লইবেন।

+ নব্যভারতের প্রবন্ধ লেখক, আনন্দবাবু বলেন,—বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে দুইটী কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটী চাঁচুরতলার "ঠারিণ-বাড়ী" (ঠাকরুণ বাড়ী?) অপরটী মাঐসারে "দিগম্বরী-বাড়ী" বলিয়া বিখ্যাত। প্রবাদ—চাঁচুরতলাতে ব্রহ্মাণ্ডগিরি এবং মাঐসারে গোঁসাই ভট্টাচার্য্য, শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই দুই স্থানে আজও কি স্বদেশী কি বিদেশী, হিন্দুরা পূজা বন্দনাদি করিয়া থাকে। কেদাররায় মাতৃনির্দ্দেশ ক্রমে, এই পীঠস্থানবৎ চাঁচুরতলার নিকটে, অপর একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা আজও "রাজাবাড়ী" বলিয়া বিখ্যাত। এই স্থানে বাস করিয়া, দেবীর অর্চ্চনা করা যাইবে, এই মানসেই ঐ বাড়ী নির্ম্মিত হয়। আবার এই সময়ে, এ প্রদেশে কলিকাতার সান্নিধ্যে কালিকাদেবীও জনসাধারণে পরিচিত হন। কালীঘাট সম্বন্ধে আলোচনাকালে, পাঠক বঙ্গে শক্তি-পূজা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। প্রতাপাদিত্যের কর্ম্মচারী লক্ষ্মীকান্ত, মানসিংহের অনুগ্রহে, যে সময়ে বঙ্গদেশে প্রচুর জমীদারী লাভ করেন, সেই সময়ে তিনি—কালীক্ষেত্রের উন্নতির দিকে মনোযোগ দেন। এই সমস্ত ঘটনা হইতে আমরা দেখিতে পাই, ষোড়শশতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গে তান্ত্রিক-ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রাবল্য হইয়াছিল।

গিয়াছেন। কেদাররায়ের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মুর্ত্তি, নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার, লাথুরিয়া গ্রামের চৌধুরী মহাশয়দের বাটীতে অদ্যাপি বিরাজিত। দেবীর পদোপরি—কেদাররায়ের নাম খোদিত। কেদারবাটী নামক স্থানে কেদাররায়ের খনিত দুইটী বৃহৎ পুষ্করিণী, আজও তাঁহার কীর্ত্তিঘোষণা করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা "রাজাবাড়ী মঠ" তাঁহাদের বিরাট কীর্ত্তির পরিচায়ক। *

কেদাররায়ের পতনে, বিক্রমপুর রাজ্যের মুকুটমণি খসিয়া পড়িল। মহারাজ মানসিংহ, প্রতাপাদিত্য ও কেদাররায়ের মত, দুইজন পরাক্রান্ত ভৌমিককে পরাজিত করিয়া, বঙ্গদেশে—"ভুঁইয়া-বিদ্রোহের" যবনিকা পতন করেন।

রাজা কেদাররায়ের এই আকস্মিক মৃত্যুতে, তাঁহার অধীনস্থ সেনা ও সেনাপতিগণ বড়ই ভীত হইয়া পড়েন। যুদ্ধ স্থগিত রাখাই, সকলের মত হইল। কিন্তু মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী ও সেনাপতি কমলশরণ রায়, কোনমতে ভীত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সেনা-নায়কগণের মধ্যে, কালিদাস ঢালি, রাজাসরদার, পর্টুগীজ ফ্রান্সিস্ ও সেখ কালু, তাঁহাদের সহায়তা করিতে লাগিল। কিন্তু পরিণামে সেখ কালু ও ফ্রান্সিস্, বিপক্ষ পক্ষের সহিত যোগদান করে। মহারাজ মানসিংহ রাজমন্ত্রী রঘুনন্দনকে বলিয়া পাঠাইলেন—"যদি আপনারা যুদ্ধে ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে আমি বিক্রমপুরের উপর কোন অত্যাচারই করিব না। বরঞ্চ রাণীকে রাজ্য ভার দিয়া বাঙ্গলা হইতে চলিয়া যাইতে পারি।"

রঘুনন্দন যখন দেখিলেন, তাঁহাদের দল হইতে বিশ্বাস-ঘাতকগণ মোগল পক্ষে যোগদান করিতেছে, সেনাগণও রাজা বিহনে নিরুৎসাহ হইয়াছে এবং রাণীও আর অনর্থক লোকক্ষয়ে ইচ্ছুক নহেন—তখন তিনি, কমলশরণ প্রভৃতি সেনা-নায়কগণকে সঙ্গে লইয়া, মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। মহারাজা মানসিংহও, রাজা কেদাররায়ের পত্নীর হস্তে

* জয়পুরের চারণ-কবিদের কবিতায়, কেদাররায়ের কথা উল্লেখ আছে। অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, মানসিংহের বঙ্গবিজয় কীর্ত্তিকাহিনী, রাজপুতানায় বিঘোষিত করিবার জন্য, চারণগণ তাঁহার গুণগরিমা প্রকাশক—এই সমস্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি।

"তখ্‌তপর বৈঠকর্ সেলিমনে আপনা নাম জাঁহাগীর রখ্‌থা। উস্‌মে মানসিংজীকো বঙ্গালাকে পূর্ব্বপ্রান্ত মৈ, হিন্দুয়োকো স্বতন্ত্র রাজমে উন্‌কো দবানে কে লিয়ে ভেজা। মানসিংজী পরতাপআদিতা কো জীত্ কর, রাজা কেদার কে রাজপর চড়াই্ কৈ। বহ জাতিকা কায়স্ত থা। ঔর সগ্রামাতা নাম্নী দেবী উস্‌কো ইষ্ট থা।" বঙ্গদেশের কোনও গাথায়, কেদাররায়ের বীরত্ব সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ না হইলেও, সুদূর রাজপুতানার চারণগণের কবিতার মধ্যে, তাহার কীর্ত্তি কাহিনী সুরক্ষিত হইয়াছে—ইহাই বঙ্গবাসীর গৌরবের কথা।

বিক্রমপুরের শাসনভার অর্পণ করেন। এই খানেই বিক্রমপুরের শেষ অধঃপতন হইল।

কেদাররায়ের রাণী লোকান্তরিত হইবার পর, মোগলরাজ প্রতিনিধির আদেশমত, চাঁদরায়ের রাজ্য তিন চারি ভাগে বিভাজিত হইল। রঘুনন্দন বিক্রমপুর, কমলশরণ ইদিলপুর ও সেথ কালু কার্ত্তিকপুরের জমীদারী প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ-বংশীয় কালিদাস ঢালি, রামরাজ সরদার, দেওভোগ ও মূলপাড়া নামক দুইটী পৃথক তালুক প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে সমগ্র বিক্রমপুর রাজ্য নানা অংশে বিভাজিত হইয়া পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়।

কালীমূর্ত্তির প্রথম আবিষ্কার।

লক্ষ্মীকান্ত কর্ত্তৃক, মানসিংহের প্রদত্ত জমীদারি-লাভের পরের কথা—লক্ষ্মীকান্তের বংশধরগণের নিমতায় ও বড়িশায় আগমন—কালীমূর্ত্তির প্রথম আবিষ্কার—কবি বিপ্রদাস বর্ণিত কালীঘাট—কামদেব ব্রহ্মচারীর কালীঘাটে অবস্থান—জনৈক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক কালীকুণ্ড হ্রদতীরে পদাঙ্গুলি প্রাপ্তি—মুখের প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্তি—নকুলেশ্বর ভৈরবের সন্ধান প্রাপ্তি—কালীমূর্ত্তি—প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে, কয়েকটী কিম্বদন্তী—বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায় কর্ত্তৃক—জঙ্গলমধ্যে কালী প্রতিমা দর্শন—তাঁহার পিতা কেশবরায়ের উপর দেবীর স্বপ্নাদেশ—বর্ত্তমান পোস্তার নিকট কালীমূর্ত্তির প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে জনপ্রবাদ—সন্ন্যাসী ও কাপালিকগণ কর্ত্তৃক সেই মূর্ত্তি, কালীঘাটের জঙ্গলে আনয়ন—শাঁখারিটোলা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক কালীমূর্ত্তি দর্শন—জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী কর্ত্তৃক কালীমূর্ত্তির—আবিষ্কার সম্বন্ধে জনপ্রবাদ—ভুবনেশ্বর (চক্রবর্ত্তী) ব্রহ্মচারী—বসন্তরায় কর্ত্তৃক, কালীর সেবায় ভুবনেশ্বরের নিয়োগ। বসন্তরায় কর্ত্তৃক প্রথম কালীমন্দির নির্ম্মাণ। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর উত্তরাধিকারীগণ—কালীমাতার সেবায়েত—বর্ত্তমান হালদার মহাশয়গণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত—তাঁহাদের বংশপরিচয়—কালীঘাট হইতে হালদারগণের গোবিন্দপুরে বাস—সন্তোষরায় কর্ত্তৃক বিবিধ দেবোত্তর সম্পত্তি দানের তায়দাদ—কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি—কালীকুণ্ড হ্রদ—কালীর বর্ত্তমান মন্দির—কালী মূর্ত্তির অলঙ্কারাদি—নিত্যপূজা ও আয়ব্যয়—শ্যামরায় বিগ্রহ—স্বয়ম্ভূলিঙ্গ নকুলেশ্বর—কালীঘাট সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথা।

লক্ষ্মীকান্ত হইতেই, বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমীদার-বংশ আরম্ভ হয়। মানসিংহের নিকট প্রচুর অর্থ, জমীদারী ও রাজসম্মান লাভ করায়, বঙ্গদেশের মধ্যে, বিশেষতঃ বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে, লক্ষ্মীকান্ত একজন সর্ব্বজন-জানিত লোক হইয়া উঠেন। মানসিংহ, বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে—লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারকে, মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর এই পাঁচটী পরগণার ও হেতেগড় পরগণার কিয়দংশের জাইগীর এবং সনন্দ আনাইয়া দেন। বাদসাহী সনন্দ পাইলেও, লক্ষ্মীকান্ত এই সমস্ত পরগণা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বাধীনে আনিতে সমর্থ হন নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি—হুগলী জেলার গোহট্ট-গোপালপুরে, লক্ষ্মীকান্তের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। শুনিতে পাই, উক্ত গ্রামে লক্ষ্মীকান্তের পরিখা-বেষ্টিত আবাসভূমির ধ্বংসাবশেষ আজও

দৃষ্ট হইয়া থাকে। লক্ষ্মীকান্ত—পুত্র গৌরহরি মজুমদারকে, জমীদারীর উত্তরাধিকার দান করিয়া, আশী বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। গৌরহরি ও তাঁহার পুত্র শ্রীমন্তও, সম্রাট-প্রদত্ত পরগণাসমূহ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হন নাই। গৌরহরি—প্রাপ্ত জাইগীরের রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য, গোপালপুর হইতে বর্ত্তমান দমদমার নিকটবর্ত্তী, নিমতা বিরাটী গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে, লক্ষ্মীকান্তের বংশধর-গণের আর কোন প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৭২২ খ্রীঃ অব্দে, নবাব মুরশীদ-কুলী-খাঁ বাঙ্গালার নূতন রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে, সুবে-বাঙ্গালার অন্তর্গত তাঁহার অধিকৃত স্থান সমূহ, তেরটী চাকলা ও বহু পরগণায় বিভক্ত হয়। প্রত্যেক চাকলায়, রাজস্ব আদায়ের জন্য, এক একজন রাজ-কর্ম্মচারী, নবাব সরকার হইতে নিযুক্ত হন। চাকলার কর্ম্মচারীরা, প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। মোগল-সুবাদার—চাকলার কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতে বাদসাহী-রাজস্ব বুঝিয়া লইতেন। এই সময়ে, শ্রীমন্তের পুত্র ও লক্ষ্মীকান্তের প্রপৌত্র, কেশব মজুমদার বাঙ্গালার দক্ষিণ চাকলার রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। তিনি নবাব সরকার হইতে রায়চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইহার কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে, বাদসাহ আলমগীরের (ঔরঙ্গজেব) পৌত্র, সুলতান আজিম ওসানের বাঙ্গালা শাসন সময়ে, ইংরাজেরা সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রামত্রয়, সুবাদারের নিকট হইতে ষোল হাজার টাকায় ক্রয় করেন। এই গ্রামত্রয়ের জন্য ইংরাজ কোম্পানীকে নবাব সরকারে নিয়মিত বাৎসরিক খাজনা দিতে হইত।

কেশব রায়ের জমীদারীর মধ্যে তিনটী গ্রাম, ইংরাজদের হস্তগত হওয়ায় দক্ষিণ অঞ্চলের জমীদারী তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে, রায়মহাশয় নানা অসুবিধা ভোগ করিতে থাকেন। এদিকে ১৭১৬ অব্দে হামিণ্টন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক, দিল্লীর সম্রাট ফেরোকসিয়ারের পীড়া আরোগ্য করিয়া, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৭টী মৌজা ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইংরাজেরা এই জমীলাভের সনন্দ প্রাপ্ত হইলে, নবাব মুরশীদকুলী খাঁ অতিশয় ক্ষুন্ন হন এবং কলিকাতার সমীপস্থ পরগণার, জমীদারগণ অর্থাৎ যাঁহারা রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মচারী ছিলেন—তাঁহাদের গোপনে নিষেধ করিয়া দেন—"তোমরা কেহই ভবিষ্যতে ইংরাজ-কোম্পানীকে জমী বিক্রয় করিওনা।" এই সময়ে কেশব

রায় দেখিলেন, নিজের জমীদারীর কেন্দ্রস্থলে না থাকিলে, জমীদারী শাসনও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য তিনি নিমতা-বিরাটী ত্যাগ করিয়া, কালীঘাটের প্রায় তিনক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে, ভাগিরথীর অপর পারে বড়িশাগ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে ১৭১৬ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে, সাবর্ণ রায়-চৌধুরী জমীদারদের বড়িশায় বাস আরম্ভ হইয়াছে।

বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরীদের কথা, এত বিশদভাবে বলিবার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ—কালীঘাটের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা, কালীমূর্ত্তির প্রথমাবিষ্কার ইত্যাদি ব্যাপারের সহিত, তাঁহাদের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। দ্বিতীয়তঃ—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ভবিষ্যতে যে সমস্ত পরগণার স্বত্ব লাভ করেন, তাহার সহিত সাবর্ণদের বিশেষ সম্পর্ক। কি সূত্রে, কেশবরাম চৌধুরী, নিমতা ত্যাগ করিয়া বড়িশায় আসেন, তাহা উল্লিখিত ঘটনা হইতে প্রমাণ হইতেছে। এক্ষণে আমরা প্রাচীন কালীঘাটের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে, অন্যান্য কথার অবতারণা করিব।

খ্রীষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কালীঘাট নিশ্চয়ই একটী সর্ব্বজন জানিত স্থান হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ-ব্যাপী সময়ের মধ্যে, অতি ধীরে ধীরে, এই উন্নতি সংসাধিত হয়। উলা নিবাসী, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কবি—"গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" নামক কাব্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি কালীঘাটের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়—কালীঘাটের সে সময়ে অতি সমৃদ্ধিশালী অবস্থা। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—

চলিল দক্ষিণ দেশে, বালি ছাড়া অবশেষে,
উপনীত যথা কালীঘাট।
দেখেন অপূর্ব্ব স্থান, পূজা হোম বলিদান,
দ্বিজগণে করে চণ্ডী পাঠ॥

আবার ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত, কবিকঙ্কণের বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই—

বালুঘাটা এড়াইল, বেণের নন্দন,
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা, দিল দরশন।
তীরের প্রমাণ যেন চলে তরীবর,
তাহার মেলানি রাহে মাইননগর॥

উল্লিখিত দুইটী কবিতা হইতেই প্রমাণ হইতেছে—কালীঘাট উক্ত

সময়ের মধ্যে তীর্থস্থান রূপে সাধারণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিল।

কালীমূর্ত্তির প্রথম আবিষ্কার কে করিল, ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলা অতি কঠিন। তবে এ সম্বন্ধে, বহুবিধ অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাহার সকলগুলিই আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠককে জানাইতেছি।*

ইহার প্রথম গল্পটি এই—বর্ত্তমান কালী-মন্দিরের অনতিদূরে,অরণ্য মধ্যে এক পর্ণকুটীরে, কোন ব্রাহ্মণ বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক, তপস্যা করিতেন। একদিন সায়ংকালে, তিনি ভাগীরথী তীরে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেছেন, এমন সময়ে, অদূরে তীব্র জ্যোতির্ম্ময় এক আলোকছটা, তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। আর কখনও সেরূপ উজ্জ্বল আলোক, তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। এই অপূর্ব্ব দীপ্তিময় আলোকছটার সহসা আবির্ভাব দেখিয়া, ব্রাহ্মণের কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তিনি আলোক-রেখা লক্ষ্য করিয়া, সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—ভাগিরথীর ঘূর্ণায়মান, অতলস্পর্শ এক দহের (বর্ত্তমান কালীকুণ্ড হ্রদের) নিকটস্থ একটী স্থান হইতে ঐ দিব্যালোক বিচ্ছুরিত হইতেছে। ব্রহ্মচারী, ইহার কারণানুসন্ধান করিতে না পারিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ের ক্রমাগতঃ চিন্তায়, তাঁহার কৌতুহলের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। পরদিন দিবাভাগে, ব্রাহ্মণ—পুনরায় ঐ স্থান লক্ষ্য করিয়া গিয়া দেখিলেন, যে কালীদহের তীরে—একটী প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে এবং তৎসন্নিকটে—সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চাকচিক্যময়, মনুষ্যাঙ্গুলির সদৃশ্য—এক প্রস্তরবৎ অঙ্গুলি পড়িয়া রহিয়াছে। এই অঙ্গুলিকেই, ব্রহ্মচারী পূর্ব্বরাত্রের আলোক দর্শনের কারণ বলিয়া অনুমান করিলেন এবং এরূপ জনসমাগম-শূন্য অরণ্য মধ্যে,প্রস্তর-খোদিত মুণ্ড ও প্রস্তরময় পদাঙ্গুলি দেখিয়া,তাঁহার বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। কিন্তু এই ব্যাপারের কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, ব্রাহ্মণ অতিশয় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই গভীর বনমধ্যে ত জনমানব বাস করে না। সুতরাং এ মুখ ও অঙ্গুলি, নিশ্চয়ই কোন দৈব-ব্যাপার, এই ভাবিয়া—ব্রাহ্মণ সেই প্রস্তর-মূর্ত্তির ও পদাঙ্গুলীর যথারীতি পূজার্চ্চনা করেন। গভীর রাত্রে, ভগবতী সেই ব্রাহ্মণকে প্রত্যাদেশ করিলেন,—"কুণ্ড-তীরে প্রস্তরবৎ যে অঙ্গুলি দেখিয়াছ, উহা সতী-দেহ-বিচ্ছিন্ন অঙ্গুলি। সুদর্শনচক্রে ছিন্ন হইয়া, তাহা এই কালীদহে আসিয়া পড়িয়াছে।"

* কালীক্ষেত্র-দীপিকা—৫৫ পৃঃ।

তৎপরে ব্রহ্মচারী অনুসন্ধান করিতে করিতে, অদূরে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ নকুলেশ্বর ভৈরব রহিয়াছেন, দেখিতে পাইলেন। তদবধি ঐ ব্রহ্মচারী, উক্ত প্রস্তরময় সতী-অঙ্গ, যত্নপূর্ব্বক ঐস্থানে রাখিয়া, প্রত্যহ সেই নির্জ্জন বনপ্রদেশে আসিয়া, উক্ত কালীমূর্ত্তি ও নকুলেশ্বরের পূজা করিতেন। ইহার পর ক্রমশঃ—এই ব্যাপার জনসমাজে পরিজ্ঞাত হয়। আজও এই জনরবটী, কালীঘাট অঞ্চলের বৃদ্ধলোক পরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়। জন-প্রবাদ এই—পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীর নাম—আত্মারাম ব্রহ্মচারী।

দ্বিতীয় জনপ্রবাদ এই—দিবা অবসান প্রায়। কলিকাতার দক্ষিণে বড়িশার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, সাবর্ণ-গোত্রজ সন্তোষ রায়-চৌধুরী মহাশয়, একদা অরণ্য-পরিবৃত কালীঘাটের তীরবর্ত্তী, ভাগিরথী-বক্ষোপরি নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য মধ্যে, শঙ্খঘণ্টা প্রভৃতির ধ্বনি শুনিয়া, তিনি অতীব বিস্মিত হইলেন। কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য, তিনি ঐ স্থানে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া, সেই শঙ্খঘণ্টার শব্দ লক্ষ্য করিয়া, বনমধ্যে প্রবেশ করেন। গভীর বন-স্থানে উপস্থিত হইয়া, তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন,—সেই বিরাট জঙ্গল-সমাবৃত, নিস্তব্ধ বনপ্রদেশে, এক ব্রহ্মচারী—পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তির, সায়ংকালোচিত আরতি করিতেছেন। সন্তোষরায়, শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করিয়া, ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে, ভক্তিপূর্ণ প্রাণে, সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। আরাত্রিক কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, তিনি সেই বিজনবাসী ব্রহ্মচারীর সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন, যে—ঐ স্থানে সতী-অঙ্গ নিপতিত হইয়াছিল, সেই অঙ্গ—ব্রহ্মচারীই সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পান। তৎপরে দেবাদেশে তিনি সেই দিন হইতেই ঐ স্থানে, দেবীমূর্ত্তির ও ভৈরবের পূজা করিয়া আসিতেছেন। এই ঘটনার পর হইতে, সন্তোষরায়—মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানে কালীমূর্ত্তিদর্শন করিতে আসিতেন। ইহার পরে, জন-সমাজে এই কালীমূর্ত্তির কথা প্রচারিত হয়।

তার পর তৃতীয় জনরব এই—যে বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমীদারগণের পূর্ব্বপুরুষ, কেশব রায়-চৌধুরী, আপন জমীদারী ভুক্ত গঙ্গাতীরে, গভীর অরণ্য মধ্যে, জপ-তপাদি করিতেন। তিনি ঘোর শাক্ত ছিলেন। একান্ত মনে কিয়দ্দিবস শক্তিসাধনার ফলে, তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। দেবী—তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন—"যদি আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাস্—তাহা হইলে কালীকুণ্ড-তীরে আমাকে অনুসন্ধান কর্। সেখানে তুই আমার প্রস্তর-

খোদিত মুখমণ্ডল দেখিতে পাইবি। উহা যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া, আমার পূজার্চ্চনাদি দ্বারা, তুই অভীষ্টমত সিদ্ধিলাভ করিতে প্যারিস্।"

এই প্রত্যাদেশ পাইয়া, কালীকুণ্ড তীরে অনুসন্ধানের ফলে, তিনি ব্রহ্মার স্থাপিত, বর্ত্তমান কালীদেবীর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন এবং ঐ কালীকুণ্ডের পশ্চিম তীরে,যেথানে বর্ত্তমান কালী-মন্দির আছে, তথায় প্রতিষ্ঠা করেন। অপরন্ত—কালীর সেবার জন্য, উক্ত স্থানের জমী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, মনোহর ঘোষাল নামক এক ব্যক্তিকে কালীদেবীর পরিচারক নিযুক্ত করেন। কালীঘাটের বন কাটাইয়া তিনিই প্রথমে কালীর ক্ষুদ্রমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কেশব রায়ের চতুর্থ পুত্র—সন্তোষ রায়, পিতৃ-আজ্ঞা-ক্রমে কালীর ক্ষুদ্র ইমারতের স্থানে, প্রথমতঃ একটী ছোট খাট মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। পরে এই ছোট মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সাবর্ণ-চৌধুরী বংশীয় রাজীবলোচন রায় চৌধুরী মহাশয়, আলিপুরের তদানীন্তন কলেক্টার মিঃ ইলিয়াট সাহেবের অনুমতি ক্রমে, বর্ত্তমান বড় মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সন্তোষ-রায়ই এই বড় মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি ইহার পরিসমাপ্তি দেখিতে পান নাই।*

আর একটী জনপ্রবাদ এই—বর্ত্তমান কলিকাতার পান-পোস্তার দক্ষিণে যে, স্থানকে পুরাতন পোস্তা বলে—পূর্ব্বে সেই স্থানে,একটী ক্ষুদ্র কালী-মন্দির ছিল। কোনও সময়ে, সেই ক্ষুদ্র পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ায়, সেই পুরাতন তীর্থস্থান লুপ্ত হয়। এই মন্দিরের নিকট, গঙ্গাতীরে একটী সুবিস্তীর্ণ পোস্তা গাঁথা ছিল। কালীতীর্থ-দর্শনার্থীদের ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীদের সুবিধার জন্য,সেই পোস্তায় একটী করিয়া হাট বসিত। মন্দির পড়িয়া গেলেও, পোস্তা বর্ত্তমান থাকায়, হাট বসিবার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা হইত না। ক্রমে কালীঘাট নাম লুপ্ত হইয়া, উহা "পোস্তার-হাট" বলিয়া সাধারণের পরিচিত হয়। বহুকাল পূর্ব্বে,এক দল কাপালিক—গঙ্গাসাগরে তীর্থ-যাত্রা করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহারা উপরোক্ত মন্দিরের ভগ্নস্তূপ মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া ইষ্টক-রাশির মধ্য হইতে, চারিটী ছিদ্র-সংযুক্ত ত্রিকোণাকৃতি একখানি প্রস্তর-ফলক প্রাপ্ত হন। জনরবে প্রকাশ—ইনিই কালীঘাটের কালী। এই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড লইয়া, তাঁহারা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের তন্ত্র-সম্মত পূজায়, সময়ে সময়ে নরবলির প্রয়োজন হয়—এজন্য লোকালয়ের নিকট উক্ত কালী-মূর্ত্তির পূজা নিতান্ত সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া, তাঁহারা—কালী-

* কালীক্ষেত্র দীপিকা—৫৮ পৃঃ।

ঘাটের বন-জঙ্গলাদি-পূর্ণ নিভৃত স্থানে,সেই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড আনিয়া লুকাইয়া রাখেন। সে সময়ে কালীঘাটের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি, গভীর বন-জঙ্গলে সমাবৃত ছিল। এই নিভৃত জঙ্গলমধ্যে, তৃণ-কাষ্ঠাদি দ্বারা—এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহারা কালীর পূজা করিতেন। বাহিরের অতি অল্প লোকেই তখন এই কালী-মূর্ত্তির সন্ধান জানিত।

অপর কিম্বদন্তী এই—ভবানী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, শাঁখা বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন তিনি শাঁখা বিক্রয় করিবার জন্য, গঙ্গাতীর দিয়া যাইতেছিলেন। এক সধবা ব্রাহ্মণী, সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া—শাঁখা পরিতে চাহিলেন। শাঁখা-বিক্রেতা ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত কালীকুণ্ড তীরে শাখা পরাইয়া দেন। শাঁখা পরাণ শেষ হইলে, ব্রাহ্মণ শাঁখার মূল্য চাহিলেন। ব্রাহ্মণী—"স্নান করিয়া আসিয়া মূল্য দিব"—এইকথা বলিয়া, কালীকুণ্ড-হ্রদে নিমজ্জিতা হইলেন। স্ত্রীলোকটী হয়তঃ দৈব-দুর্ঘটনা বশে জলমগ্ন হইল ভাবিয়া—ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি জলে নামিতে যাইতেছেন, এমন সময়—সেই জলনিমজ্জিতা ব্রাহ্মণী, সলিলমধ্য হইতে, সেই শাঁখাপরা-হাত দুইখানি তুলিয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তখনই আকাশবাণীতে সেই ব্রাহ্মণের প্রতি, দেবীর প্রত্যাদেশ হইল—"বৎস! আমি কালিকা। তুমি এই কালীকুণ্ড তীরে আমার পূজা প্রচলিত কর। তোমার গৃহে—অমুক স্থানে, আমি একটি কৌটার মধ্যে আছি। গৃহে গিয়া আমাকে দর্শন করিও।"

ব্রাহ্মণ—দ্রুতপদে, বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে,কম্পিত-কলেবরে,গৃহে গিয়া দৈববাণী নির্দ্দিষ্টস্থানে, সেই কৌটাটী পাইলেন। সেই কৌটাটী খুলিবামাত্রই,শতসূর্য্যের ন্যায়, জ্যোতিঃ বাহির হওয়ায়, ব্রাহ্মণ ভয়-চকিত ও বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই আকস্মিক ভয়-সঞ্জাত মোহ অপসৃত হইলে—ব্রাহ্মণ দেখিলেন, যাহা হইতে এই অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইতেছে, তাহা পাষাণময়ী পদাঙ্গুলি মাত্র! উহা মস্তকে ধারণ করিয়া, কুণ্ডতীরে আসিয়া, ব্রাহ্মণ মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন। এই প্রস্তরময় মুখমণ্ডল সেই স্থানে স্থাপিত করিয়া, তিনি কালীর পূজা প্রবর্ত্তন করেন। ইহা হইতেই—কালীঘাটের কালীমূর্ত্তির প্রকাশ।

আর একটী কিম্বদন্তী এই—যে এক ব্রাহ্মণ, গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিবার সময়, বনমধ্যে একটী অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটা দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করেন। এইরূপ ভাবে অনুসরণ করিতে করিতে, তিনি বর্ত্তমান কালীকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হন। কালীকুণ্ড-তীরে, 'কালীর মুখ

এবং প্রস্তরের মত একটী পদাঙ্গুলি দেখিতে পান। তাহার পরই, তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ পাইলেন,—"যে অঙ্গুলী তুমি এই কুণ্ডতীরে পাইয়াছ, তাহা বিষ্ণু কর্ত্তৃক সুদর্শন-ছেদিত সতী-অঙ্গ। আর ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-ফলক দেখিতে পাইতেছ, তাহা ব্রহ্মার নির্ম্মিত কালী-মূর্ত্তি।" ব্রাহ্মণ—দেবীর এই প্রত্যাদেশ পাইয়া, যত্ন করিয়া ঐ উভয় খণ্ডই একত্রিত করিলেন এবং তাহার নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। ইহার পর গভীর জঙ্গল-মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া, তিনি নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গও প্রাপ্ত হন।

কালীমূর্ত্তির আবিষ্কার সম্বন্ধে—আমরা আরও দুই একটী কিম্বদন্তী এস্থানে উল্লেখ করিব। এগুলিও পাঠকের শুনিয়া রাখা উচিত। নবদ্বীপাধিপতি স্বনাম ধন্য, বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, এক সময়ে নবাব-সরকারে বারলক্ষ টাকা খাজনার দায়ে ঋণী হওয়ায়—মুর্শিদাবাদের নবাব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন।*

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগরিমার কথা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। অবকাশ সময়ে, তাঁহার নিকট হিন্দুধর্ম্মের আচার-ব্যবহার ও মহাভারতাদির উপাখ্যান কথা শ্রবণ করিতেন।

একদিন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া নৌকা-বিহারে যাত্রা করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নবাবকে নিজের জমীদারীর অবস্থা দেখাইবার জন্য, কৌশলে কলিকাতা পর্য্যন্ত লইয়া আসেন। নৌকা হইতে নামাইয়া, জঙ্গলমধ্যবর্ত্তী ভূভাগ-সমূহ, নবাবকে দেখাইয়া দিয়া, কৃষ্ণচন্দ্র বলেন'—জাঁহাপনা! ঐ শুনুন—ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির ভীষণ গর্জ্জন! আমার এই জঙ্গলময় জমীদারী, হস্তী-ব্যাঘ্র-বরাহাদি প্রজাপূর্ণ। ইহাতে মানুষের বসবাস নাই—কেবল বন্য-শ্বাপদগণ বাস করে। এ জমীদারীর খাজনা আমি কাহার নিকট হইতে আদায় করিব? এই জন্যই নবাব সরকারে আমার রাজস্ব এত বাকী পড়িয়াছে।" বলা বাহুল্য—নবাব, স্বচক্ষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, সরকারের প্রাপ্য-খাজনা মহকুব করিয়া দেন।†

---

* কলিকাতা রিভিউএর লেখক, গৌরদাসবাবু বলেন—এই বাকীখাজনার পরিমাণ ৫২লক্ষ। কালীময় ঘটক মহাশয়ের মতে, রাজার পিতার আমলের দশলক্ষ, ও তাঁহার নিকট হইতে দশলক্ষ, এই কুড়িলক্ষ টাকার দায়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কারারুদ্ধ হন।

† Maharaja Krishna Chunder, was the constant companion of Alivardi Khan (Mahabat Jung) and that during his trips on the river, he used to read and explain the Mahabharata to him. It is also said, that he succeeded in obtaining from the Nawab, a remission of arrears of revenue due from him to the amount of fifty two lakhs or so, by cleverly taking

ইহার পর মহারাজা, নবাবকে গঙ্গাতীরস্থ এক জঙ্গলে লইয়া যান। গঙ্গা-তীরে উপনীত হইয়াই, তাঁহারা উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই জঙ্গল মধ্যে এক নির্জ্জন মৃৎ-কুটীরে, জনৈক সন্ন্যাসী—এক কালীমূর্ত্তির পূজা করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র, দেবীমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলেন। ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথনে তিনি জানিতে পারিলেন—এই স্থানেই সুদর্শন-ছিন্ন, সতীদেহের একাংশ পতিত হইয়া,তাহা পবিত্র পীঠ-স্থানে পরিণত হইয়াছে, আর এই কালী হইতেই, এই স্থানের নাম "কালীঘাট" হইয়াছে। কি প্রকারে,দেবীর নিত্য-পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়—এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করায়, ব্রহ্মচারী বলিলেন—"যদিও এ স্থান জঙ্গলাবৃত—তত্রাপি দেবীর উপাসনার জন্য কোন জিনিসের অভাব হয় না।" মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথনে বুঝিলেন—ব্রাহ্মণ অতি নির্লোভী! জগদম্বার উপর তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসী, এবং মায়ের সেবার জন্য, কাহারও সাহায্যপ্রার্থী নহেন।" মহারাজার ন্যায়, নবাবও—ব্রাহ্মণের এই প্রকার একনিষ্ঠা, নির্ভীকতা ও দেবদেবীর প্রতি একান্ত বিশ্বাস দেখিয়া, বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। রাজার অনুরোধে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, উক্ত প্রদেশ কালীর সেবার জন্য প্রদান করিলেন। জগদম্বার সেবাকার্য্যের উপলক্ষ্য স্বরূপ হওয়ায়, তিনিও মহারাজের উপর কৃপা করেন। কারণ মুর্শীদাবাদে ফিরিয়া গিয়া, নবাব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বাকী-খাজনার সমস্ত টাকাই ছাড়িয়া দেন।

আর একটী কিম্বদন্তী হইতে জানা যায়, যে—দশনামী শৈব-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত, জঙ্গল-গিরি নামক এক সন্ন্যাসী—শিষ্যসহ গঙ্গাসাগরে যাইতে ছিলেন। তিনি আদি-গঙ্গা-তীরে, কালীর প্রস্তর-খোদিত, মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া, উক্তস্থানে কুটীর বাঁধিয়া পূজা-প্রবর্ত্তন করেন। কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থানের পর, তিনি এক প্রিয় শিষ্যের হস্তে, সেই কালীমূর্ত্তির সেবার ভার দিয়া, গঙ্গাসাগরে চলিয়া যান। কিম্বদন্তী ব্যতীত—কোন দেবদেবী মূর্ত্তিরই আবিষ্কার দেখা যায় না। চৌরঙ্গী-সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক—কালীমূর্ত্তি আবিষ্কারের মূলে, কাজেই একটী অদ্ভুত কিম্বদন্তী বিজড়িত। সেই আখ্যানটী

on one of these river trips, the Nawab's party, on shore, on the Northern side of Calcutta, where there were settlements, and leading the Nawab on towards the South, where, in the distant thickets and woods, the roar of the tiger was heard and wild elephants were seen, pointing to him the nature of "his Zamindary and the obvious reasons of his having been a defaulter. (Kalighat and Calcutta by Mr. G. D. Basyck, Calcutta Review).

এই—চৌরঙ্গী একদিন দেখিলেন, বনমধ্যে একটী গাভী এক স্থানে দাঁড়াইয়া মৃত্তিকার উপর, অজস্র দুগ্ধধারা বিসর্জ্জন করিতেছে। সন্ন্যাসী এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, কৌতুহলাবিষ্ট চিত্তে সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করেন, এবং খনিতস্থান-মধ্য হইতে, কালীর প্রস্তরময় মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন। সেই মুখই এখন কালীমূর্ত্তি রূপে মন্দিরমধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

এই সমস্ত কিম্বদন্তীর মধ্যে অনেক গোলযোগ আছে, অনেক অপ্রামাণিক কথা আছে। সে গুলির যথাসম্ভব আলোচনা না করিলে, প্রকৃত-ব্যাপার যে কি—তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আধুনিক উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, নব্য যুবকগণ, এ সমস্ত কিম্বদন্তী উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারেন, ইহাতে বিশ্বাস না করিতেও পারেন। তাহাতে আমাদের কোন আপত্তিই নাই। কিন্তু যে সমস্ত মহাপ্রাণ হিন্দু, এই সমস্ত কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জন্য—আমরা এ বিষয়ে আরও একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। এ সম্বন্ধে কালীক্ষেত্র-দীপিকা-কারও একটা বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এস্থলে আমরা তাঁহার অভিব্যক্তিগুলি, সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কালীক্ষেত্র-দীপিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই—কালীঘাটে কালীমূর্ত্তির প্রথম আবিষ্কারের বিষয়ে, যে কয়েকটী কিম্বদন্তীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা পরস্পর বিরোধী। কেশবরায়ের পুত্র সন্তোষরায়, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তদনুসারে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও কেশবরায়ের বর্ত্তমান থাকা ধরিলে, তাঁহাদের দ্বারা কালীমূর্ত্তির প্রকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ কেশবরায়ের সময়ের একশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, মুকুন্দ রামের চণ্ডীকাব্যে, পীঠস্থান কালীঘাট ও তাহার অদূরবর্ত্তী স্থান সমূহের উল্লেখ আছে। দেবীর প্রত্যাদেশ অনুসারে, কেশবরায় কর্ত্তৃক কালীঘাটের কালীমূর্ত্তির প্রথম আবিষ্কার হইলে, তাহার বহু পূর্ব্বে রচিত মুকুন্দরাম কবির গ্রন্থে কালীঘাটের উল্লেখ থাকিত না। আর কেশবরায়ের পুত্র, সন্তোষরায় কর্ত্তৃক কালীঘাটের প্রথম আবিষ্কার হইলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গা-ভক্তিতরঙ্গিণীতে—কালীঘাটে বলিদান ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক চণ্ডীপাঠের কথার কোন উল্লেখ থাকা সম্ভবপর নহে। একটী জনশ্রুতিতে প্রকাশ—যে সন্তোষ-রায়—শঙ্খঘণ্টার শব্দ পাইয়া, গভীর বনমধ্যে উপস্থিত হন এবং তথায় একজন ব্রহ্মচারীকে কালীর আরতি করিতে দেখিতে পান। এই ঘটনা দ্বারাই প্রমাণ হয়, যে কালীর সেবার জন্য নিশ্চয়ই তখন কোন সেবায়েৎ নিযুক্ত হইয়াছিল।

আর একটী বিবরণে প্রকাশ, যে কেশবরায়, মনোহর ঘোষাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে, কালীর সেবায়েত নিযুক্ত করেন। সাবর্ণ-চৌধুরীগণের প্রদত্ত দেবোত্তর-সম্পত্তির, একটী তায়দাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠক, এই তায়দাদ হইতে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

কালীক্ষেত্র-দীপিকার লেখক মহাশয় বলেন—"উল্লিখিত একটী বিবরণের মধ্যে, কেশবরায় কর্ত্তৃক মনোহর ঘোষাল নামক, জনৈক ব্রাহ্মণকে সেবায়েত নিযুক্ত করা ও দেবোত্তর-জমি চিহ্নিত করিয়া দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু সন্তোষরায় এই মনোহর ঘোষালকে, কালীর সেবার্থে যে ভূমি দান করেন, তাহাতে দেখা যায়, ১১৫৭ সালে—মনোহর ঘোষাল, সন্তোষরায়ের নিকট দেবোত্তর-ভূমি প্রাপ্ত হন। সুতরাং কেশবরায়ের প্রথমাবস্থায়, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, এই মনোহর ঘোষালের বর্ত্তমান থাকা সন্দেহজনক। আর যদিও বা বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে তখন তাঁহার বাল্যাবস্থা। ঐরূপ বয়সে কালীর সেবায়েত, নিযুক্ত হওয়া কতদূর সম্ভব, তাহাও বলা যায় না। বিশেষতঃ কেশবরায় কর্ত্তৃক—দেবোত্তর দানের, কোন তায়দাদ দেখা যায় না। সন্তোষরায় কর্ত্তৃক জমী-দানের তায়দাদে, মনোহর ঘোষাল ব্যতীত—অপরাপর অনেককে দেবসেবার্থ ভূমিদান করা প্রমাণ হইতেছে। তন্মধ্যে কালীঘাটের জনৈক সেবায়েত গোকুল-হালদারের নামও দেখা যায় এবং তিনিও ১১৫৭ সালে ভূমিদান গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বর নামক যে ব্রহ্মচারী, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কালীর সেবায়েত ছিলেন—এই গোকুল-হালদার, উক্ত ভুবনেশ্বর হইতে অধঃস্তন সপ্তম পুরুষে বর্ত্তমান ছিলেন। কেশবরায় কর্ত্তৃক, মনোহর ঘোষাল সেবায়েত নিযুক্ত হইলে, এক সময়ে উক্ত গোকুলহালদার ও তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতিগণ এবং উক্ত মনোহর ঘোষালের কালীর সেবায়েত রূপে বর্ত্তমান থাকা প্রমাণ হইতেছে। সুতরাং কালীর বর্ত্তমান সেবায়েত হালদারগণ—কিরূপে মনোহর ঘোষালের দৌহিত্র-বংশোদ্ভব হয়—তৎসম্বন্ধে গোলমাল দাঁড়ায়। উক্ত তায়দাদে, যে সমস্ত গ্রামের নামোল্লেখ আছে—তাহার একটীও কালীঘাট গ্রামে নহে। এই সকল ঘটনা হইতে—কেশবরায় এবং সন্তোষরায় সম্বন্ধীয় বিবরণ সমূহের মধ্যে একটা সন্দেহের ছায়া আসিয়া পড়ে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান সম্বন্ধেও কোনরূপ বিশ্বাস্য প্রমাণ নাই।*

* কৃষ্ণনগর রাজবংশপ্রদীপ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক কালীদেবীকে কোন প্রকার ভূসম্পত্তি দান সম্বন্ধে কোন দলিল-পত্রাদি পাওয়া যায় না। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্রের দের রাজস্ব মার্জ্জনা করিতে পারেন, কিন্তু কালিকা-দেবীর জন্য, তিনি যে কোনরূপ সম্পত্তি, দান করিয়াছিলেন—ইহা অপ্রামাণ্য। তবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে মধ্যে মধ্যে, কালীঘাটে আসিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কলিকাতায় কালীদর্শনে আসিয়া, পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতার কুঠীর অধ্যক্ষ গবর্ণর ড্রেক্ সাহেবের সহিত দেখা করিয়া যান।

(অবিকল প্রতিলিপি)

কৈফিয়ৎ বাজে জমীর রেওয়া মোতালকে জেলা ২৪ পরগণা।

সাবেক নম্বর	কি প্রকার বাজে জমী	ভূমিদাতার নাম	ভূমিগৃহীতার নাম	ভোগাবানের নাম	কি সুরতে জমী পায়	সনন্দের সন তারিখ	গ্রামের নাম	জমীর পরিমাণ	পরগণা	সনন্দের নকল	দাখিলের সন তারিখ
তায়দাদ ৯৭৩৫ ১২০৪ সাল ৭ জ্যৈষ্ঠ	দেবোত্তর	সন্তোষ রায়	৺কালী ঠাকুরাণী সাং ৺কালীঘাট	৺কালী ঠাকুরাণীর সেবায়েত মনোহর ঘোষাল	সেবার্থে	সন ১১৫৭	চক দুলালপুর	২৭/০	মাগুরা	নাই	১২০৯ সাল ২৮ আগষ্ট
৯৭৩৮ তায়দাদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সন ১১৫৭ ১২ জ্যৈষ্ঠ	চক সীতারাম	ঐ	ঐ	নাই	১২০৯ সাল
১২০৪ সাল ৭ জ্যৈষ্ঠ	ঐ	ঐ	৺ দক্ষিণরায় ঠাকুর সাং গগণ-গোহাল	মনোহর ঘোষাল	ঐ	সন ১১৬০ ৮ই জ্যৈষ্ঠ	বড় গগণ গোহাল	৩/০	ঐ	ঐ	ঐ
২২০৮ তায়দাদ	ঐ	সন্তোষ রায়	৺পঞ্চানন ঠাকুর	ঐ	ঐ	১১৫৭ ১৮ শ্রাবণ	ঐ	৩/০	ঐ	ঐ	ঐ
১২০৪ ৭ জ্যৈষ্ঠ ৮২০২ তায়দাদ	দেবোত্তর	সন্তোষ রায় চৌধুরী জমীদার	শ্রীশ্রী৺কালী ঠাকুরাণীর সেবায়েত গোকুলচন্দ্র হালদার সাং কালীঘাট	পার্ব্বতী চরণ হালদার সাং কালীঘাট	৺কালীঠাকুরাণীর সেবার্থে	ঐ	গড়পা	৯।০	খাসপুর	১১৬৫ সাল নাগাইদ ১১৯০ সালে যখন কোম্পানি বাহাদুর সরকারে জব্দ হই-	

যাহা হউক, উল্লিখিত বিশৃঙ্খল বিবরণ সমূহ হইতেও প্রমাণ হয়, বঙ্গে দ্বাদশ-ভৌমিকের আবির্ভাব সময়ে, তান্ত্রিক-ধর্ম্ম অতি প্রবল হইয়া উঠে। এই সময়ে, বঙ্গে শক্তি-পূজার অধিকতর প্রচলন হয়। লুপ্ত তীর্থস্থান সমূহ—বামাচারী কাপালিকগণের, তামসিক শব-সাধনার কবল হইতে মুক্ত হইয়া, সাধু-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের আয়ত্বাধীনে আসে। এই সময় হইতেই কালীঘাট তীর্থস্থান বলিয়া সাধারণের চক্ষে—পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যদিও কালীঘাট, বল্লালী-আমল হইতে তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত ছিল, তাহা হইলেও—ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার যেরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—এরূপ আর কোন সময়ে হয় নাই। ঘটক-কারিকা হইতে প্রমাণিত হয়, বঙ্গে আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত, যাজ্ঞিক পঞ্চমহর্ষির সময়েও কালীঘাট, তীর্থাবাস বা মহাতীর্থ রূপে, সেই পুরাকালেও সাধারণের নিকট পরিজ্ঞাত ছিল।

স্ত্রীপুত্র সমেত পঞ্চমহর্ষির রাঢ়ে আবাস-গ্রহণের সময়, কোন্ স্থান কাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, হরিমিশ্রের কুলগ্রন্থ মধ্যে প্রদত্ত তালিকায়—তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই তালিকা হইতে প্রমাণ হয়, সে সময়েও কালীঘাট ও নকুলেশ-ভৈরবের অস্তিত্ব ছিল। কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চজন পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ছাত্রদের শিক্ষা-বিধানার্থ, তীর্থবাস জন্য, গঙ্গাতীরে যে সমস্ত গ্রাম দেওয়া হইয়াছিল—তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। *

যাজ্ঞিক পঞ্চ-মহর্ষির নামাদি।

মহর্ষির নাম	গোত্র	জীবিকার্থ বাসস্থান	অধুনাতন নাম	তীর্থাবাস ও চতুঃস্পাঠী
(১) ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	পঞ্চকোটী	পঞ্চকোট বা মানভূমি	কালীঘাট।
(২) শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	কঙ্কগ্রাম	বাণকুণ্ডা (বাঁকুড়া)	অগ্রদ্বীপ।
(৩) দক্ষ	কাশ্যপ	কামকোটি	বীরভূম কামকোটী	ত্রত্তীপুর।
(৪) বেদগর্ভ	সাবর্ণি	বটগ্রাম	বর্দ্ধমান (বড়গ্রাম)	গুপ্তপল্লী।
(৫) ছান্দড়	বাৎস্য	হরিকোটী গোপ ব্রহ্মপুরী	(হরিকুঠী গোপ) মেদিনীপুর	ত্রিবেণী।

* পরম প্রাজ্ঞ, সম্বন্ধনির্ণয়কার পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়, তাঁহার সম্বন্ধ

কামদেব ব্রহ্মচারী, ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী, মহারাজা প্রতাপাদিত্য, সম সাময়িক ব্যক্তি। প্রতাপের সময়ে, কালীঘাট তাঁহার তীর্থাবাসস্থান ছিল। তবে সেই সময়ে কালীমূর্ত্তি গভীর জঙ্গল মধ্যে থাকায়, চারিদিকে তাহার এত নাম ডাক হয় নাই। পাদ-টীকায় উদ্ধৃত, দিগ্বিজয়-প্রকাশের শ্লোকাংশ হইতে প্রমাণ হয়, কালীঘাট সে সময়ে যশোর-রাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল। * তবে প্রতাপ, যুদ্ধবিগ্রহাদিতে ক্রমাগতঃ ব্যস্ত থাকায়, কালীক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়, পরম বৈষ্ণব হইয়াও, কালীর সেবার ও নিত্যপূজার জন্য, তাঁহার গুরুদেব ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে, কালীঘাটে প্রেরণ করেন। ভুবনেশ্বরের পূর্ব্বে, কামদেব ব্রহ্মচারীর কালীঘাটে অবস্থানের কথাও, আমরা কামদেবের লিখিত বৃত্তান্ত হইতেই পাইয়াছি। কামদেব—কালীঘাটের যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা "ফকিরডাঙ্গা" বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল। কামদেবের পর, তাঁহার বংশ-ধরগণ, কালীর মন্দির-নির্ম্মাণ ও সেবাদির সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা করেন। কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণই, ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর দৌহিত্র বংশোদ্ভূত।

এক্ষণে আমরা কালীর সেবায়েত ও অধিকারী হালদারবংশ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। বর্ত্তমান হালদার মহাশয়গণের পূর্ব্ব-পুরুষগণ, অতি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারাই—ভবানীপুর, কালীঘাট, গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থান ব্রাহ্মণ-পূর্ণ হইয়া উঠে। এই হালদার-বংশ কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, তাঁহাদের মধ্যে, কোন কোন ব্যক্তি, কালীঘাট হইতে গোবিন্দপুর ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী একটী তালিকা হইতে প্রমাণিত হইবে।

কালীর সেবায়েতগণের মধ্যে, ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী,—কুল-ব্রহ্মচারীর নাম প্রথমই পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর সর্ব্বদা যোগসাধনায় রত থাকিতেন। তৎকালের লোক-লোচনাদৃশ্য কালীঘাটেই—তাঁহার নির্জ্জন সাধনার পবিত্র-বেদী সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রসন্ন-সলিলা, পূত-প্রবাহময়ী, আদি গঙ্গাতীরে

নির্ণয়ের, ক্রোড়পত্রের ১১পৃষ্ঠায়, এড়ু মিশ্রের বচনোদ্ধৃত করিয়া, এবং তৎপর পৃষ্ঠায়—যাজ্ঞিক পঞ্চ মহর্ষি অর্থাৎ ভট্টনারায়ণ শ্রীহর্ষাদির, বল্লাল-প্রদত্ত জীবিকার্থ বাসস্থান তীর্থবাস ও চতুষ্পাঠী প্রভৃতি সম্বন্ধে, যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার মতে—"নাকুলীশিকং" এই শব্দে নকুলেশ্বর-ভৈরব সম্বন্ধীয় পীঠস্থান ও "কৌশিকি" শব্দে কালী বুঝাইতেছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়—কালীঘাটের অস্তিত্ব অতি প্রাচীন—তবে কখনও বা লোকচক্ষে প্রকাশিত কখনও বা রাষ্ট্রবিপ্লবাদি নানাকারণে লুপ্ত।

* প্রতাপাদিত্য ভূপস্য যশোরভূমিপস্যচ গঙ্গাবাসো স্থলোরাজন ইদানীং বর্ত্ততে নৃপ।

দিগ্বিজয়-প্রকাশ (৬৯৬ শ্লোক)।

জঙ্গল-সমাকীর্ণ নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া, ভগবতীর পূজা ও ধ্যানে তাঁহার জীবন কাটিয়া যাইত। কথিত আছে,—তিনি অন্তর্যোগে নিমগ্ন থাকিয়া, ধ্যানে কালীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। যে সকল নাগা, দণ্ডী, ভৈরব, অবধূত শ্রেণীভুক্ত সন্ন্যাসীরা, কালীপীঠ দর্শনার্থী হইয়া, সেই স্থানে আগমন করিতেন তাঁহারা তাঁহাকে "গুরু-ব্রহ্মচারী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভুবনেশ্বরের এই অলৌকিক সাধনা ও নিষ্ঠাবৃত্তি, এবং যোগ-শক্তি দেখিয়া, যশোরের রাজা বসন্ত-রায় তাঁহার শিষ্য হন।

সন্তানাদির মধ্যে, ভুবনেশ্বরের এক কন্যা ছিল। খনিয়ান নিবাসী, ভবানী দাস চক্রবর্ত্তীর সহিত—ভুবনেশ্বর সেই কন্যার বিবাহ দেন। ভবানীদাস—সুরাই মেলের, কাশ্যপ-গোত্রীয়, চণ্ডীবর চক্রবর্ত্তীর (তপস্বী) সন্তান। ভবানী-দাসের পিতার নাম—পৃথ্বীধর। পৃথ্বীধর, তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া দীর্ঘকাল গৃহে প্রত্যাগমন না করায়, ভবানীদাস পিতৃ-অন্বেষণে বাহির হইয়া, নানা-স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে পরিশেষে কালীঘাটে উপস্থিত হন। *

ভবানীদাস কালীঘাটে পৌছিয়া, ভুবনেশ্বরের নিকট আশ্রয়-গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বর, ভবানীদাসের পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার গুণে মোহিত হইয়া, তাঁহার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ভবানীদাস ইতিপূর্ব্বেই বিবাহিত, কিন্তু তিনি ভুবনেশ্বরের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহার কন্যাকে, দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।

এই ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর সময় নিরূপণ করিবার জন্য, একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। ভবানীদাসের পিতা পৃথ্বীধর, চণ্ডীবর চক্রবর্ত্তীর (তপস্বী) পুত্র। এই চণ্ডীবর দেবীবর ঘটকের মেল-বন্ধন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং সুরাই-মেলে পরিগণিত হন। অতএব দেখা যাইতেছে, দেবীবরের অব্যবহিত পরেই, ভুবনেশ্বর বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে দেবীবরের সময় নির্ণীত হইলেই, ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর সন্ধান পাওয়া যাইবে।

যখন স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য,বঙ্গের বর্ত্তমান আচার-ব্যবহার বিধিপ্রবর্ত্তক স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহ করেন, নিমাই গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগী হইয়া, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ ও ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন এবং মহাপণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি, মিথিলার প্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, ন্যায়-শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যে, সমগ্র ভারতে ও নবদ্বীপে, তাঁহার প্রাধান্য সংস্থাপন করেন এবং "চিন্তামণি-দীধিতি" নামক, প্রসিদ্ধ ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই

* কালীক্ষেত্র দীপিকা।

সময়ে ভট্টনারায়ণ হইতে অধঃস্তন ষোড়শ পুরুষে, বন্দ্যবংশে—সর্ব্বানন্দ ঘটকের ঔরসে, দেবীবর জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ের প্রাচীন ঘটক-কারিকায় দেবীবর সম্বন্ধে যে উক্তিটী আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

এইকালে রাঢ়ে বঙ্গে, লেগে গেল ধূম
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম।
কিছু পরে সংকেতের বংশে এক ছেলে,
নামে খ্যাত দেবীবর, লোকে যারে বলে। *
সেই ছোঁড়া মনে করে, কুলে করে ভাগ
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ।
দোষ দেখে কুল করে, একি চমৎকার
অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার।

(প্রাচীন ঘটক-কারিকা)

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের কিছু পরে, দেবীবর ঘটক—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মেলবন্ধন করেন। ১৪০৭ শকে অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দে, ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা—তিথিতে, সায়ংকালে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। ১৫০৯ খ্রীঃ অব্দে ২৪ বৎসর বয়সে, তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে অন্তর্ধ্যান হয়েন। †

মেলবন্ধনের তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই, বহুরূপ হইতে অধঃস্তন নবম পুরুষে, এই চণ্ডীবর তপস্বী ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। চণ্ডীবরের পুত্র, পৃথ্বীধরের অন্ততঃ ১৫৫০ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। এই পৃথ্বীধর ও কালীর প্রথম সেবায়েত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী-সমকালীন ব্যক্তি। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে—ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী বর্ত্তমান ছিলেন। কালীঘাট—এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী জনসমাজে অবশ্য বিশেষ রূপেই পরিচিত ছিল। কালীদেবীর নাম—তখন বর্দ্ধমান, হুগলী, যশোহর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তাহা না হইলে, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের মধ্যে কালীঘাট ও তৎসমীপবর্ত্তী ভূভাগ—সমূহের অতটা বিবরণ পাওয়া যাইত না।

* দুর্ব্বলীর পুত্র সংকেত, সংকেতের পুত্র অনন্ত, অনন্তের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত, লক্ষ্মীকান্তের পুত্র সর্ব্বানন্দ, ও সর্ব্বানন্দের পুত্র দেবীবর।

† শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে আছে—

চোদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুনে
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণে
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন। (আদিলীলা)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যশোহরের রাজা বসন্তরায়, ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন। ভুবনেশ্বরের সময়ে, কালীঘাট অতি সামান্য অবস্থায় ছিল। রাজা বসন্তরায়—কালীর পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া, এক [illegible] নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাহার পর বর্ত্তমান মন্দিরের প্র[illegible] বর্ত্তমান মন্দির বড়িশার জমিদার, সন্তোষরায়ের আমলে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি বসন্তরায়ের সময়ে কালীঘাট প্রদেশ, যশোরের জমিদারী-ভুক্ত ছিল। কিন্তু রাজা বসন্তরায়, কালীর সেবার জন্য, কোনরূপ ভূমিদান ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কি না—তাহার কোন প্রমাণই নাই।

কালীক্ষেত্র-দীপিকাকারের মতে—"এ সময়ে কালীঘাটের অবস্থা অতি সামান্য ছিল। কালীর ক্ষুদ্র মন্দির ব্যতীত, এখানে আর কোন ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহাদি ছিল না। চতুস্পার্শে বন—আর মধ্যে মধ্যে, দুই চারিটী পর্ণ-কুটীর। ব্রহ্মচারিগণের শিষ্যাদি হইতে প্রাপ্ত—অর্থ এবং ভূমির উৎপন্ন ফল মূল ও শস্যাদি ব্যতীত, কালীর আর কোন কিছুই আয় ছিল না। এই ষোড়শ শতাব্দীতে, কালীঘাট যদি অধিকতর উন্নত অবস্থায় উপনীত হইত—অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইত—তাহা হইলে নিশ্চয়ই, ইহা হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষী কালা-পাহাড়ের কু-দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী, কালীদেবীর এই ক্ষুদ্রমন্দির মধ্যে—অনেকগুলি শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। সেগুলি আজও মায়ের মন্দির মধ্যে বর্ত্তমান। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, ভুবনেশ্বর শক্তি-মন্ত্রোপাসক হইলেও, তান্ত্রিক কাপালিকদের মত-বিষ্ণু-দ্বেষী ছিলেন না।

ভুবনেশ্বরের এই একমাত্র কন্যা ব্যতীত, আর কোন পুত্র-সন্তানাদি ছিল না। এই সময়ে কালীঘাটের আয় দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছিল, এজন্য তাঁহার জামাতা ভবানীদাস, কালীঘাটে বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। কালী-ঘাটে, ভবানীর—রাঘবেন্দ্র নামে এক পুত্র হয় ও পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভে, যাদবেন্দ্র ও রাজেন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। ভুবনেশ্বরের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, ভবানীদাস—শ্বশুরের স্থানে কালীর সেবায়েত ও অধিকারী

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরী
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি,
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ
চৌদ্দশত পঞ্চান্ন হইলা অন্তর্ধান। (চৈতন্যচরিতামৃত)

হয়েন। যথাস্থানে আমরা ভুবনেশ্বরের ও ভবানীদাসের বংশবৃক্ষ প্রদান করিলাম।*

সাবর্ণ-বংশীয় কামদেব ব্রহ্মচারী হইতেই—কালীমূর্ত্তির সহিত, সাবর্ণ-বংশের প্রথম সম্বন্ধ। কামদেবের একমাত্র নিরুদ্দিষ্ট পুত্র—লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, এই সাবর্ণ-পরিবারের আদি পুরুষ। লক্ষ্মীকান্ত, মানসিংহের নিকট জমীদারী প্রাপ্তির পরও, কালীর সেবার জন্য—কোন সম্পত্তি স্থায়ী-ভাবে দান করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—সেই সময় বঙ্গদেশের চারিদিকেই রাষ্ট্র-বিপ্লব। বাদসাহ-প্রদত্ত, জমিদারীর শাসন-শৃঙ্খলা সাধন করিতে, প্রায় দুই পুরুষ সময় লাগিয়াছিল। এই জমিদারীর শৃঙ্খলা সাধনের জন্যই, নবাব মুরশীদকুলীখাঁর আমলে, লক্ষ্মীকান্তের বংশধরগণ নিমতায় আগমন করেন—তৎপরে তাঁহাদের বড়িশায় বাস হয়। এই জন্যই, আমরা তাঁহার বংশধর কেশবরায় ও সন্তোষরায়ের (শিবদেব) আমলে, কালীঘাটের সহিত তাঁহাদের বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। সন্তোষ-রায়—নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর আমলের লোক। পরে ইঁহার বিষয় বিশদ-রূপে বিবৃত হইবে।

কালীঘাটের উন্নতি সম্বন্ধে, প্রধান উপলক্ষ্য এই সাবর্ণ-জমিদার। ইহাদের সহায়তা না থাকিলে, কালীঘাটের বর্ত্তমান উন্নতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। বর্ত্তমান কালের—এ সুবৃহৎ মন্দিরও নির্ম্মাণ হইত না। সাবর্ণ-জমিদারগণ—কলিকাতার দক্ষিণ-অঞ্চলের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা না পাওয়াতেও, পরিণামে—চারি-মেলের কুলীন-সন্তান গণের সহিত, কন্যার বিবাহ দিয়া, সামাজিক প্রাধান্য লাভ করেন।—কেবল কলিকাতার দক্ষিণ-অঞ্চলে নহে—তৎকালীন কলিকাতা সমাজেও, ইহাঁদের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। সন্তোষরায় প্রসঙ্গে, পাঠক পরে সে সব ঘটনা জানিতে পারিবেন।

নিম্নে আমরা একটী তালিকা প্রদান করিতেছি। ইহা হইতে পাঠক ষোড়শ শতাব্দীতে, কামদেব ব্রহ্মচারীর সময় হইতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ১৮০৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত—বড়িশার সাবর্ণী-জমিদার ও কালীর সেবায়েত হালদার বংশের ও তাঁহাদের সমকালীন ব্যক্তিগণের প্রাদুর্ভাব, তুলনায় সমালোচন

* অনেকে অনুমান করেন, ভবানীদাসের বংশধরগণ, বংশ-বিস্তারের সহিত, কালীঘাট, ভবানীপুর, চর্ড়কডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। ধরিতে গেলে, ভবানীদাস ও তাঁহার বংশধরেরা, কালীঘাটের ও ভবানীপুরের জঙ্গল-কাটানো, অধিবাসী। অনেকের অনুমান এই, ভবানীদাস হইতে ভবানীপুর নামকরণ হইয়াছে।

করিতে পারিবেন। যথোপযুক্ত স্থানে হালদার মহাশয়দের ও সাবর্ণ-চৌধুরিদিগের বংশবৃক্ষও সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। *

কালীর সেবায়েতের নাম	সাবর্ণ-চৌধুরী জমীদার	প্রাদুর্ভাবের সময়	মন্তব্য
ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী (কালীঘাট)		১৬ শতাব্দীর মধ্যভাগ (আকবর বাদসাহের সময়)	রাজা বসন্ত রায় ও প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক
(১) ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী (জামাতা	কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় (ব্রহ্মচারী)	১৬ শতাব্দীর শেষ ভাগ	
(২) রাঘবেন্দ্র (পুত্র)	লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার (পুত্র) (গোপালপুর)	১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগ (মানসিংহের সমকালীন)	
(৩) রামগোপাল (পুত্র)	গৌরহরি (পুত্র) (নিমতা বিরাটী)	ঐ মধ্যভাগ	
(৪) রামবল্লভ (পুত্র)	শ্রীমন্ত (পুত্র)	ঐ শেষভাগ	
(৫) বিশ্বনাথ (৩য় পুত্র)	কেশবরাম রায়চৌধুরী (জমীদার বড়িশা)	১৮ শতাব্দীর প্রথম। নবাব (মুরশীদকুলীখাঁর আমল)	
(৬) গোকুল হালদার (পুত্র)	সন্তোষ রায়চৌধুরী (৪র্থ পুত্র)	ঐ মধ্য ও শেষ ভাগ। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর আমল (১৭৫১)	
(৭) পার্ব্বতী হালদার (ভ্রাতষ্পুত্র)	রাজীবলোচন রায়-চৌধুরী (ভ্রাতষ্পুত্র)	১৯ শতাব্দীর প্রথম ভাগ	

* উপরোক্ত তালিকায় ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর আমল—অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের—সময় হইতে, নবাব আলিবর্দ্দির আমলের প্রথম অংশ পর্য্যন্ত, কালীদেবীর সেবায়েত ও অধিকারীগণের নাম প্রদত্ত হইল। সমগ্র বংশবৃক্ষের তালিকা পূর্ণভাবে প্রদান করা আমাদের এগ্রন্থে অসম্ভব। এই বংশবৃক্ষের জন্য, আমরা কালীক্ষেত্র-দীপিকার গ্রন্থকার

কালীর সেবায়েত হালদার-মহাশয়গণের বংশবৃক্ষ।

কেশবরায় কি উদ্দেশ্য, বড়িশাগ্রামে আগমন করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যথাস্থানে, আমরা সাবর্ণি-চৌধুরীদেরও একটী বংশবৃক্ষ প্রদান করিলাম। ইহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, কেশবরায়ের পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহার চতুর্থ পুত্র শিবদেবই, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও দানশীল ছিলেন। তখন এ অঞ্চলে তাঁহার ন্যায়, বলীয়ান ব্যক্তি খুব কম ছিল। তিনি ভীমের ন্যায় আহার করিতে পারিতেন। আর এই প্রচুর আহারের ফলেই, তিনি নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর নিকট আবজাখালী-মহল "খোরাকী-মহল"রূপে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।*

সূর্য্য বাবুর নিকট ঋণী। তিনি এই সমস্ত প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে, এতদিনে ইহা হয়তঃ বিস্মৃতি-গর্ভে নিমজ্জিত হইত। উল্লিখিত বংশাবলী হইতে, স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ও তাঁহার দৌহিত্রবংশ হইতেই—কালীদেবীর নিয়মিত সেবা আরম্ভ হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা—জ্ঞাতিবিবাদে, কালীঘাট হইতে ভবানীপুর ও সেকালের গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। হালদারদের যত্নেই, ইহাঁদের আত্মীয়-কুটুম্বগণ ভবানীপুর কালীঘাট, ও গোবিন্দপুরে বসবাস করিয়া, এই সকল স্থানে ব্রাহ্মণ অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এই জন্য—কলিকাতার সামাজিক ইতিহাসে, এই হালদার মহাশয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

* জনপ্রবাদ এই—বঙ্গে বর্গীর-হাঙ্গামার সময়ে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, সন্তোষরায়ের নিকট অনেক টাকা, বাকী রাজস্বের জন্য দাবী করেন। সন্তোষরায় টাকা দিতে না পারায়,

এই সন্তোষরায়ের দান-শক্তির জন্য, তাঁহার নাম চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। যে কেহ প্রার্থী হউক না কেন—তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা লইয়া গেলে, নিরাশ হইত না। কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়, গৃহনির্ম্মাণ, চতুষ্পাঠী-স্থাপন, ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রার্থী, প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদের সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতেন বলিয়া—"সন্তোষ" নামে পরিচিত হন। নবাবী আমলের সেহাএবং নানাবিধ প্রাচীন দানপত্র ও দলীলে, তিনি "সন্তোষরায়" এই নামেই পরিচিত। তাঁহার প্রকৃত নাম "শিবদেব" বলিলে লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। কেশবরায়ের পর, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে এই সন্তোষরায়ই—বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে, এদেশে বর্গীর-হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ইহা সেকালের বাঙ্গলার একটী স্মরণীয় ঘটনা। লুণ্ঠন-পরায়ণ, মহারাষ্ট্রীয় দস্যুবর্গের উৎপাতে, শান্তিময় বঙ্গদেশ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বর্গীর জ্বালায়, লুণ্ঠনের ভয়ে, লোকে গ্রাম নগর ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে পলাইতে লাগিল। গ্রাম জনশূন্য, ক্ষেত্র শস্যশূন্য—সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত। বড় বড় জমীদার-গণও এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ—চৌথ দানে স্বীকৃত হওয়ায়—বর্গীরা শান্তভাব ধারণ করে।

বর্গীরা ত শান্ত হইল। কিন্তু এ "চৌথ" আদায় হইবার উপায় কই? চৌথ দূরে থাক, চাষবাস না হওয়ার জন্য, বাঙ্গালার তৎকালীন জমীদারেরা প্রজার নিকট হইতে কিছুই আদায় করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া—বাঙ্গলার নবাব ছাড়িবেন কেন? তিনি জমীদারদিগকে পীড়ন

নবাব কর্তৃক বন্দী হন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—যে সন্তোষরায় প্রচুর আহার করিতে পারিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব-কারাগারে, অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় থাকিয়া—এবং নিজের অভ্যাসমত আহারাদি না পাইয়া, তাঁহার বড়ই কষ্ট হইতেছিল। একদিন তিনি, নবাবের এক ছাগরক্ষকের হস্ত হইতে, একটী ছাগল কাড়িয়া লন। নিজের পাচকের দ্বারা, সেটী পাক করাইয়া, সমগ্র ছাগমাংস একাই আহার করেন। কথাটা নবাবের কর্ণগোচর হইলে—তিনি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, সন্তোষরায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করেন। সন্তোষরায়ের কথায় বিশ্বাস না হওয়ায়, নবাব তাঁহাকে পরদিন আর একটী ছাগ প্রদান করেন। একটী সমগ্র ছাগমাংস, রায় মহাশয়কে, বিনাকষ্টে ভক্ষণ করিতে দেখিয়া—নবাব বলিলেন—"আমি তোমার এই অদ্ভুত আহার দৃষ্টে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে লোক নিজে এরূপ অতিভোজন করে, সে কখনও আমার রাজস্ব দিতে পারিবে না। অতএব আমি তোমার নিকট প্রাপ্য-খাজনা মকুব করিয়া, এবার তোমায় মুক্তি দিলাম। আর ভবিষ্যতে, যাহাতে এই আহারের দায়ে খাজনা বাকী না ফেল—তজ্জন্য তোমায় একটী মহল নিঃস্বত্বে দান করিতেছি।" সন্তোষরায় নবাবের নিকট হইতে, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী "আবজাখালী-মহল" তাঁহার খোরাকী বাবত ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন।

করিতে আরম্ভ করিলেন। জমীদারেরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে, প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে—নদীয়ার রাজা, স্বনামপ্রসিদ্ধ বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কর্ত্তৃক, বাকীখাজনার দায়ে কারাবদ্ধ হয়েন। এই দাবীর পরিমাণ বার লক্ষ টাকা। বড়িশার সাবর্ণ-জমীদার সন্তোষরায়ও—এই সময়ে সরকারী খাজনার দায়ে, মুরশীদাবাদে কারাবদ্ধ হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নবাব আলিবর্দ্দীকে—তাঁহার কলিকাতার জমীদারী-মধ্যে, সিংহ-ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শোনাইয়া, বাকী-খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। আর সন্তোষরায় কি উপায়ে, নবাবের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন—তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

সন্তোষরায়, মুরশীদাবাদ হইতে নিরাপদে প্রত্যাগমন করিয়া, অতি সমারোহে কালীঘাটে মায়ের পূজা করেন। এতদুপলক্ষে অসংখ্য ব্রাহ্মণ-ভোজন করান এবং কালীঘাটের সেবায়েতগণের মধ্যে অনেককে ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে, বিস্তর দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দান করেন। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমির তায়দাদে দেখা যায়—যে ১১৫৭ সালে অর্থাৎ ইং ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে, মনোহর ঘোষাল ও কালীঘাটের তদানীন্তন সেবায়েত, জনৈক গোকুল হালদার ও অপরাপর অনেককে, সন্তোষরায়—তাঁহার জমীদারীর নানাস্থানে, বিস্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। সন্তোষরায়—ঘোর শাক্ত ছিলেন। তিনি বড়িশার মধ্যে, নানাস্থানে শিবমন্দির ও কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দির, নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শিব মন্দিরগুলি আজও অর্দ্ধভগ্নাবস্থায়, বড়িশায় বর্ত্তমান। কথিত আছে—মুরশীদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর, জীবদ্দশাকালের মধ্যে, সন্তোষরায় লক্ষবিঘা দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর, ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া "সন্তোষ" নামের সার্থকতা দেখাইয়া গিয়াছেন। *

* আমরা একটী প্রাচীন কিংবদন্তী শুনিয়াছি—যে এক সময়ে, কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত, সন্তোষরায়ের কালীঘাটে সাক্ষাৎ হয়। মহারাজ, তাঁহার রাজোচিত সমৃদ্ধি দেখাইবার জন্য, অনেক আশা-শোটা, নকীব, বরকন্দাজ, হাতী, ঘোড়া, পালকী ইত্যাদি সঙ্গে আনেন। সন্তোষরায় সামান্য বেশে, সামান্য ভাবে, তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় ও অল্প-সংখ্যক ভৃত্য ও শরীররক্ষক লইয়া কালীঘাটে গিয়াছিলেন। তাঁহার অলক্ষ্যে, মহারাজার পক্ষ হইতে একজন লোক বলেন—"শুনিয়াছি—সন্তোষরায় লক্ষবিঘা ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছেন, মস্ত জমিদার, কিন্তু তাঁহার হাতী ঘোড়া, আশাশোটা, বরকন্দাজ একটীও নাই।" কথাটা সন্তোষরায়ের কাণে যায়। তিনি তখনই চারি-মেলের শতাধিক গণ্যমান্য—সুপণ্ডিত কুলীনসন্তানগণকে মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলেন—"মহারাজ! ইঁহারাই আমার আশা-শোটা ও বরকন্দাজ। ইঁহারাই আমার হাতী ঘোড়া এবং উট-পালকী। চারি মেলের এই নবধা-কুললক্ষণ-বিশিষ্ট, মহাকুলীনগণকে—আমি ব্রহ্মোত্তর দিয়া বাস করাইয়াছি।" বলা বাহুল্য—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই ব্যাপারে বড়ই অপ্রতিভ হন। বস্তুতঃ—সে সময়ে, সন্তোষরায়ের মত দাতা

প্রাচীন কলিকাতা সহরের নক্সা। (১৭৪২ খৃঃ অব্দ)
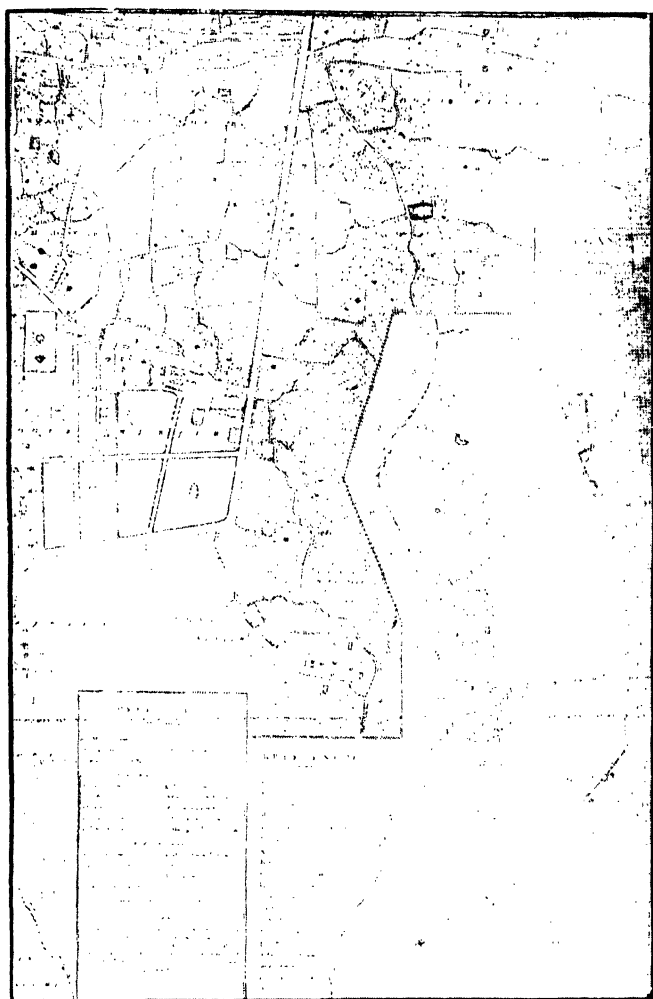
কালীমূর্ত্তি প্রকাশের পর—কোন সময়ে, কোন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি দ্বারা, কালীর প্রথম মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর সময়ে, কালীর একটী মাত্র ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। এই মন্দির যশোহরের, রাজা বসন্তরায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত—এইরূপ প্রবাদ আছে। বসন্তরায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, ঐ ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে, কালীমূর্ত্তি এক পর্ণ-কুটীর-মধ্যে রক্ষিত হইত।

একটী প্রবাদ আছে—যে কেশবরায়, কালীর জন্য এক ক্ষুদ্র ইমারত প্রস্তুত করাইয়া দেন এবং তাঁহার পুত্র সন্তোষরায়, ঐ ইমারতের স্থানে, একটী ছোট মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু ইহাও প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বাঙ্গালাদেশের মন্দির প্রভৃতি ইমারত—বহুদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। এখনও তিন চারি শত বৎসরের পুরাতন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তোষরায় যে ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সময়ে ভাঙ্গিয়া গেল, একথা প্রামানিক নহে। তবে—একটী ঘটনা, যাহা আমরা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি—তাহা যদি নিতান্ত কল্পিত না হয়, তাহা হইলে বোঝা যায়—কোন সামাজিক কারণে, সন্তোষরায় সমাজপতি রূপে অনেক টাকা প্রাপ্ত হন। সেই টাকাটা, তিনি সমাজে বিতরণ না করিয়া, বর্ত্তমানের সুবৃহৎ কালীমন্দির নির্ম্মাণার্থে দান করেন। এই ব্যাপারে সন্তোষরায় নগদ পঁচিশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। সম্ভবতঃ—সন্তোষরায় কালীর সাবেক মন্দিরটী অতি ক্ষুদ্র ভাবিয়া, তাহা বড় করিয়া নির্ম্মাণের জন্য, এই টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক না—কেন, কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দির, সন্তোষরায়ের আমলেই, তাঁহার প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই—তিনি এই সুবৃহৎ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই। সন্তোষরায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র রামলাল রায়, ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন রায়ের যত্নে, বর্ত্তমান বড় মন্দির, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে—সম্পূর্ণ হয়। আজকাল আমরা যে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দেবী-কালিকার পূজা দিয়া থাকি—তাহা এক শতাব্দীর উপর নির্ম্মিত। আজও অচল অটল ভাবে থাকিয়া, এই মাতৃমন্দির সন্তোষরায়ের স্বর্ণময় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে—বিরাজমান রহিয়াছে। কালীক্ষেত্র-দীপিকাকার বলেন—

কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে খুব কম ছিল। তাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর লইয়া, এখনও অনেকে জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, শিবমন্দির, কালীঘাটের কালীমন্দির এখনও তাঁহার কীর্ত্তি-ঘোষণা করিতেছে।

"সন্তোষরায় কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতার তদানীন্তন প্রধান ধনী, বাবু কালীপ্রসাদ দত্ত, কোন সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে, দক্ষিণ সমাজের ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করেন। সন্তোষরায় বড়িশা, সরশুনা, বেহালা, কালীঘাট প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণগণকে উক্ত কালীপ্রসাদ দত্তের বাটীতে, সভাস্থ হইতে অনুমতি দান করেন। এই জন্য ব্রাহ্মণদিগের সম্মান ও বিদায় জন্য, কালীপ্রসাদ দত্ত ২৫ হাজার টাকা, সমাজপতি সন্তোষরায়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাবর্ণ মহাশয়েরা ঘোর শাক্ত। বিশেষতঃ এই সময়ে—কালীঘাটের অনতিদূরে কলিকাতার উন্নতির সহিত, কালীঘাটে যাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু দেবীর—তদুপযুক্ত মন্দিরাদি ছিল না। বহুকালের পুরাতন, যে ছোট মন্দির ছিল, তাহা ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। এই জন্য কালীপ্রসাদ দত্ত প্রদত্ত টাকা, সামাজিক ব্রাহ্মণগণকে বিভাগ করিয়া না দিয়া, সন্তোষরায় সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণের অভিমত লইয়া, সেই টাকায়—কালীর পুরাতন ছোট মন্দির ভাঙ্গিয়া, বড় মন্দির নির্ম্মাণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

কিন্তু কি ব্যাপারে, কালীপ্রসাদ দত্তের নিকট, সন্তোষরায় এই পঁচিশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন—তাহার একটী সুন্দর গল্প, প্রাণকৃষ্ণ বাবু, লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেটী—আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সকল গল্পই একেবারে ভিত্তিহীন হয় না। তাহার মূলে কিছু না কিছু—সত্য থাকে। এই গল্পটী হইতে, তৎকালীন সমাজের লোকের অবস্থা, মতিগতির ও রেষারেষির ব্যাপার জানিতে পারা যায়। যে সামাজিক দলাদলির ব্যাপার লইয়া, সেই সময়ে কলিকাতায় একটা মহা হুলস্থূল ঘটিয়াছিল—তাহা এই।

শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ মহারাজ, পলাশী-যুদ্ধের পরে, প্রচুর ধনশালী ও প্রতিষ্ঠাবান হওয়াতে—সে কালের বনিয়াদি ধনবানদের অনেকেরই চক্ষুশূল হন। চূড়ামণি দত্ত—নামক এক ধনী-কায়স্থ, রাজার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁহার পুত্র—কালীপ্রসাদ দত্তের নামে, গ্রে-ষ্ট্রীট হইতে চিৎপুর-রোড পর্য্যন্ত একটী বিস্তীর্ণ রাস্তা আজও বর্ত্তমান। পূর্ব্বে উহা রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে, নীলমণি সরকারের লেন, যেখানে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে পড়িয়াছে, ঠিক তাহার সম্মুখে, চূড়ামণি দত্তের দক্ষিণ-মুখী দরোজা ছিল। ফটক নহে—বৃহৎ চৌকাট-ওয়ালা দরজা। গৃহমধ্যে সুপ্রশস্ত চাঁদনী-ওয়ালা উঠান এবং তাহার চারিদিকে

দ্বিতল গৃহ। গৃহের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। পশ্চিম সীমা বালাখানা ষ্ট্রীট। উত্তর সীমার অধিকাংশ, রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জমী।

এই চূড়ামণি দত্তের সহিত, সামাজিক ব্যাপার লইয়া, রাজার বিবাদ বিসম্বাদ চলিত। উভয়ে উভয়কে—ঠকাইবার চেষ্টা করিতেন। এ সম্বন্ধে, একটী চিত্তরঞ্জক গল্পের উল্লেখ করা বোধ হয়, এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গল্পটী এই—একদিন এক ব্রাহ্মণ, একটী ছোট পাথরবাটী লইয়া, রাজা নবকৃষ্ণের বাটীতে গিয়া, তৎপুত্র গোপীমোহন বাবুকে বলেন—"আমার ছেলের কাণ পাকিয়াছে, একটু পচা আতর যদি দেন—তাহা হইলে তাহার কাণে দিই।" রাজকুমার সরলচিত্ত ব্রাহ্মণকে, আতরের জন্য বাটী আনিতে দেখিয়া, আমোদ করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর! চূড়ামণিবাবুর নিকটেই এইরূপ আতর আছে, কিন্তু তিনি যে রকম উঁচু মেজাজের লোক, আপনি অত ছোট বাটী হাতে করিয়া গেলে, হয়ত তিনি বিরক্ত হইতে পারেন। যদি তাঁর কাছে যান—ত একটা কলসী লইয়া যাইবেন।" সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ, রহস্য বুঝিতে না পারিয়া—তাহাই করিলেন। চূড়ামণি বাবু—তখন তৈল মাখিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া, পুত্র কালীপ্রসাদকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"আগে গন্ধী (আতরওয়ালা) ডাকাইয়া, এই ব্রাহ্মণকে এক কলস আতর দাও, পরে আমি স্নান করিব।" ব্রাহ্মণের সম্মুখেই আড়াই হাজার টাকার আতর কিনিয়া, তাঁহার কলসী ভরিয়া দিয়া বলা হইল—"দেখ ঠাকুর! গুপী ছেলে-মানুষ। তুমি নবকে গিয়া এই আতর দেখাইয়া, আবার আমার নিকট লইয়া আইস।" চূড়ামণিবাবু বয়োজ্যেষ্ঠ। এই জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণকে "নব" বলিয়া ডাকিতেন।

ব্রাহ্মণ রাজবাটীতে গিয়া, সেই আতর-ভরা কলসী দেখাইয়া আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে, চূড়ামণি দত্ত এই আতর-ঘটিত সমস্ত রহস্য ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"নব আমাকে অপ্রস্তুত করিবার জন্যই, কলসী দিয়া পাঠাইয়াছিল। তা সে আমাকে কোনরূপে ঠকাইতে পারিল না। তা ঠাকুর! এত টাকার আতর লইয়া তুমি কি করিবে? তোমায় নগদ আড়াই হাজার টাকা—যাহা এই আতরের মূল্য, তাহাই দিতেছি।" ব্রাহ্মণ, টাকা লইয়া অতি আনন্দিত চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু জেদে পড়িয়া কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য, চূড়ামণি বাবুর পাঁচহাজার টাকা খরচ হইয়া গেল।

আর একটী গল্প এই—একবার কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে, চূড়ামণি দত্তের কন্যা, রাজবাটীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে যান। তাঁহার অঙ্গুরীতে একখানি

বৃহৎ অথচ বহুমূল্য নীলকান্ত-মণি ছিল। দত্ত-কন্যা, নিমন্ত্রণ-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিবামাত্র, উপরিস্থিত লোহিতবর্ণের সামিয়ানা, ময়ূরপংখীর রং ধারণ করিল এবং চারিদিক হইতেই এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। রাজা ইহার কারণানুসন্ধান করায়, বাটীর মহিলাগণ, দত্ত-কন্যাকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া, উক্ত নীলাযুক্ত অঙ্গুরী দেখান। রাজা নবকৃষ্ণ, অঙ্গুরীনিবদ্ধ প্রস্তরের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কন্যা গৃহে আসিয়া, পিতাকে সমস্ত ঘটনা বলিলে, তিনি অন্য উপহারের সহিত, উক্ত অঙ্গুরীয়টীও রাজবাটীতে প্রেরণ করেন।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর, শয়ন-গৃহের খট্টোপরি, নিদ্রিতাবস্থায় সকলের অলক্ষিতে, মহারাজ নবকৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। সে কালে গঙ্গাতীরস্থ হইয়া মৃত্যু না হইলে, লোকে তাহাকে অপঘাত মৃত্যু বলিয়াই বিবেচনা করিত। সজ্ঞানে, গঙ্গায় ত্রিরাত্রবাস করিয়া, নাভিদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইয়া, "গঙ্গানারায়ণ-ব্রহ্ম" জপ করিতে করিতে, হরিনামোচ্চারণ করিয়া যে মৃত্যু—তাহাই সেকালের হিন্দুরা বাসনা করিতেন। সুতরাং রাজার মৃত্যুতে, সাধারণ লোকে একটু কাণাঘুষা করিতে থাকে। চূড়ামণি দত্তের পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিবামাত্রই, তিনি বহুসংখ্যক ঢুলি আনাইয়া, নিজে একখানি রৌপ্যের চতুর্দ্দোলে বসিয়া, গঙ্গাযাত্রায় চলিলেন। অগ্রপশ্চাৎ—অসংখ্য লোহিত-বর্ণের পতাকা, দলে দলে নগরকীর্ত্তন! চতুর্দ্দোলটী—নানা রকমে সাজান। নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসীমালার ঝালর, চারিদিকে তুলসীগাছ, আর তার মধ্যে চূড়ামণি দত্ত—আসন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, পৃষ্ঠে নামাবলী ও গলায় এবং হাতে জপমালা। অগ্রে ঢুলিরা "চূড়া যায় যম জিন্‌তে" এইবোল বাজাইতে লাগিল। কীর্ত্তনীয়ারা গাহিতে লাগিল—

"আয়রে আয়—নগরবাসী! দেখবি যদি আয়।
জগৎ জিনিয়া চূড়া—যম জিনিতে যায়।
যম জিনিতে যায়রে চূড়া—যম জিনিতে যায়।
জপ-তপ কর, কিন্তু মরিতে জানিলে হয়।"

রাজবাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এই গান গাহিবার পর, চূড়ামণি দত্ত সদলবলে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজবাটীর লোকে, চূড়ামণি বাবুর এই কঠোর-বিদ্রূপে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। কয়েক দিন গঙ্গাবাস করিয়া, চূড়ামণি দত্ত; পরিশেষে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন।

এদিকে আবার নূতন বিভ্রাট উপস্থিত! মহাসমারোহে, চূড়ামণি দত্তের

শ্রাদ্ধের জোগাড় হইতেছে, এমন সময়ে চারিদিকে জনরব উঠিল—যে কালী-প্রসাদ বাবু, এক মোগল-বাইওয়ালীর গৃহে প্রায়ই রাত্রিযাপন করেন, সুতরাং তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে, কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত হইবেন না। কায়স্থ-শ্রেণীর জন্য, কর্ম্মকর্ত্তা কালীপ্রসাদ দত্ত, ততটা উদ্বিগ্ন হন নাই, কারণ সে সময়ে কলিকাতার কায়স্থদিগের অনেকগুলি দল ছিল। তিনি আশ্বাস পাইলেন, রাজাদের দল ব্যতীত, অন্য সকল দল উপস্থিত হইবে—কিন্তু ব্রাহ্মণদলের জন্য তাঁহার বড়ই চিন্তা হইল। কলিকাতা ও তৎসন্নিকটস্থ ব্রাহ্মণগণ, রাজবাটীর বৃত্তিভোগী ও অনুগত। ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত না থাকিলে এবং দানগ্রহণ না করিলে, কিরূপে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইতে পারে? এই বিপদে পড়িয়া, কালীপ্রসাদ বাবু সে কালের রামদুলাল সরকার মহাশয়ের সহিত (ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের আদিপুরুষ) পরামর্শ করিতে গেলেন। সরকার মহাশয়, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া, বড়িশায় আসিলেন এবং বৃদ্ধ সন্তোষ রায়ের নিকটে, কালীপ্রসাদের উপর সমাজের সমস্ত অত্যাচারের কথা জানাইলেন। পরিশেষে এই মহাদায়োদ্ধারের জন্য, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করায়, সন্তোষরায় তাঁহাদের নির্ভাবনায় থাকিতে বলেন।

সন্তোষরায়, সেই সময়ে কুলে-শীলে ধনে-মানে একজন নামজাদা লোক। যিনি নবাব আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে "খোরাকী-মহল" আদায় করিতে পারেন, তিনি বড় সহজবুদ্ধির লোক নহেন। ধরিতে গেলে, দক্ষিণ-বঙ্গের মধ্যে তিনিই তখন সমাজপতি। অসংখ্য ব্রাহ্মণ—তাঁহার পিতা কেশবরায়ের ও তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়া, আজও জীবনযাপন করিতেছেন। সন্তোষরায়, কালীপ্রসাদ বাবুকে অভয় দিয়া, এই সমস্ত দলস্থ ব্রাহ্মণকে লইয়া, শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হন। কালীপ্রসাদ বাবু, এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণদের বিদায়ের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করিলে, সন্তোষরায় ব্রাহ্মণদের বলেন—"দেখুন! আমরা যদি এই টাকা লই, তাহা হইলে লোকে বলিবে, যে আমরা টাকার লোভে পড়িয়া, এক পতিত-ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলাম। এ অপবাদ-ভার বহন করা অপেক্ষা, এই টাকা ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিলে, কেহ একটি কথাও বলিতে পারিবে না।" সন্তোষরায়ের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য, সকলেই এক মতে গ্রহণ করায় ঐ টাকা কালীর মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রদত্ত হইল।

মায়ের বর্ত্তমান মন্দিরটী, আটকাঠা ভূমির উপর নির্ম্মিত। ইহা উচ্চে ৬০ হাত। ইহার ভিতরের পরিসর ৫০ হাত। এই মন্দির নির্ম্মাণ হইতে, সাত

আট বৎসর লাগিয়াছিল। সেকালে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের ত্রিশ হাজার টাকা ইহাতে ব্যয় হইয়াছে। সন্তোষরায়ও—এ মন্দির-নির্ম্মাণে নিজ তহবীল হইতে এসম্বন্ধে বহু অর্থ-ব্যয় করেন।

এক্ষণে এই কালীমন্দির সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিয়া, আমরা কালীঘাট-বৃত্তান্ত শেষ করিব।

কালীর মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে ৫৯৫।৪।৶· বিঘা ভূমি, কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চান্নগ্রামের খাসপুর-মহলের অন্তর্গত ৬ সংখ্যক প্রাচ্য ডিভিজনের E. F. M. P. Q. প্রভৃতি সব-ডিভিজানে—এই সমস্ত দেবোত্তর ভূমি আজও দেখা যায়। এই দেবোত্তর দান সম্বন্ধে, অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন—এ সমস্ত সন্তোষরায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত। অন্য মতে, পুরাকালের হিন্দু ক্ষত্রিয়-রাজগণ, ঐ ভূমি—দেবোত্তর রূপে দান করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটী বিরুদ্ধ মতের সমর্থক কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। আমরা এ সম্বন্ধে কালীক্ষেত্র-দীপিকাকারের মীমাংসা, এস্থলে সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি।

সাবর্ণ-চৌধুরীদের প্রদত্ত ভূমির তায়দাদে (পূর্ব্বে দেখুন) কালীঘাট গ্রামের দেবোত্তর ভূমির কোন উল্লেখ দেখা যায় না। উক্ত তায়দাদের লিখিত ভূমি, কালীঘাটের বাহিরে, অন্যান্য গ্রামের ও ভিন্ন ভিন্ন পরগণার অন্তর্গত। এই তায়দাদে দেখা যায়—যে কালীর সেবায়েত ব্যতীত, অন্যান্য বহুতর লোককে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও লাখেরাজ দান করা হইয়াছে। এ সকল দানও ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে। একটীও কালীঘাটের মধ্যে নহে। কালীমাতার সমস্ত সম্পত্তি—সাবর্ণ-চৌধুরী মহাশয়দের প্রদত্ত হইলে, কোন না কোন তায়দাদে তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ থাকিত। ঐ তায়দাদ দৃষ্টে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যে সাবর্ণ-চৌধুরী সন্তোষরায় মহাশয়, আপন জমীদারীর অন্তর্গত অন্যান্য গ্রামের ভূমি, কালীর সেবার জন্য দান করিয়াছেন। সন্তোষরায়ের উক্ত ভূমি দানের সময়, কালীঘাট গ্রাম দেবোত্তররূপে বর্ত্তমান না থাকিলে, দেবোত্তর দানের চিঠায়, অগ্রে কালীঘাটের জমীর দান লিখিত হইত। কালীর পুরীর নিকটের জমি অধিকারে থাকিতে—কালীর সেবায়েতগণ, দূরে দেবোত্তর জমি কেন দানরূপে পাইলেন—ইহার কারণ বুঝা যায় না। এতদ্ব্যতীত সন্তোষরায়ের পিতা কেশবরায় কর্ত্তৃক এরূপ কোন দেবোত্তর-দানের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেশবরাম রায় চৌধুরী, ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের পর, নিমতা-বিরাটী হইতে বড়ি

শায় আসিয়া বাস করেন। এই সময়ে, কলিকাতার সন্নিহিত গ্রামসমূহ অতি জঙ্গলময় অবস্থায় ছিল। তবে মধ্যে মধ্যে লোকজনের বাস ছিল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পর, ইংরাজেরা গোবিন্দপুর হইতে অধিবাসীদের বাস উঠাইয়া দিলে, তাঁহাদের অনেকে ভবানীপুর, কালীঘাট প্রভৃতি অদূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহে গিয়া বাস করেন। তখন এ সকল স্থানে যথেষ্ট ব্যাঘ্রাদির ভয় ছিল। *

গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া আসিয়া, কালীঘাটে ও উহার উত্তর প্রান্তে চড়কডাঙ্গায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার পর, কালীর সেবায়েত ভবানীদাসের পৌত্রগণ, বল্লালী-মতে কুলক্রিয়া আরম্ভ করেন। তাঁহারা ভাগিনেয় বা দৌহিত্র-দিগকে, কালীঘাটে বাসজন্য, দেবোত্তর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। ধরিতে গেলে, এই সময়কে ভবানীপুর ও কালীঘাট গ্রামের সংস্থাপনের সূত্র-পাত বলা যাইতে পারে। কালীর সেবায়েতগণের যত্নেই, কালীঘাটে কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রথম বাস হয়।

পরে ইংরাজেরা কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন করিলে, ইহা ক্রমশঃ জনাকীর্ণ হইতে থাকে। ইহা হইতে দেখা যায়, বড়িষার সাবর্ণ-চৌধুরীদের প্রাধান্যের পূর্ব্বেই, কালীঘাট গ্রাম, কালীর সেবায়েৎগণের হইয়াছিল। তবে কি সূত্রে, তাহা উহাঁদের হস্তগত হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ক্ষত্রিয়-রাজগণ যে পূর্ব্বকালে কালীর-সেবার জন্য—ভূমিদান করেন তাহারও কোন অনুশাসন-পত্র নাই। বল্লালী আমলে, এই কালীঘাট, তীর্থ-বাস রূপে, কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের একজনকে দেওয়া হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু সে সময় কালীঘাটের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন বিবরণ জানিবার উপায় নাই। বরঞ্চ প্রমাণ হয়, প্রতাপাদি-ত্যের সময়েও, কালীঘাট ভীষণ বনজঙ্গল-সমাচ্ছন্ন, তন্ত্রাচারী, ভীমকায় কাপা-লিকদের নিবাস-ভূমি। অশোক, শিলাদিত্য, দেবপাল, ভীমপাল, মহীপাল প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ-রাজগণের দান সম্বন্ধে, অনেক তাম্রলিপি ও অনুশাসন-পত্র দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাদের কোনটীতেও কালীঘাটের ভূমিদানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেন-বংশীয় রাজাগণ, কিম্বা মুসলমানাধিকারের পর, যে সমস্ত হিন্দুরাজা, বঙ্গদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব

* ইহার অম্লান পঞ্চাশ ষাট বৎসরের পরেও, কলিকাতা ভবানীপুরের পার্শ্বস্থ-স্থানের জঙ্গল, সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয় নাই। এরূপ শোনা গিয়াছে—ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব, বর্ত্তমান হরিণবাড়ী জেলের নিকটস্থ বনে, হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া—বন্যবরাহ ইত্যাদি শীকার করিতেন। ইহার পর প্রাচীন কলিকাতার স্থান সমূহের বর্ণনা কালে আমরা দেখাইব—কিরূপে, কোন সময়ে, নানা স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া এই কলিকাতা মহানগরীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়।

করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কোনরূপ দান-পত্র নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, রাজা বসন্তরায়—যে সময়ে তাঁহার গুরু ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে, কালীঘাটে প্রতিস্থাপিত করেন, এ দান হয়ত সেই সময়ের অনুষ্ঠিত। কিন্তু এসম্বন্ধেও কোন দানপত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৫৮২খৃঃ অব্দে সম্রাট আকবরের সময়, "ওয়াশীল-তুমার-জমা" নামে বাঙ্গালার রাজস্বের যে হিসাব প্রস্তুত হয়, তাহাতে প্রজাদিগের সহিত রাজস্ব-বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হয়। সম্রাট-কর্ম্মচারীরা, প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিয়া, বাদসাহ সরকারে পাঠাইয়া দিতেন। ১৭২২ খৃঃ অব্দে, নবাব মুরশীদ কুলীখাঁর সময়ে, রাজস্বের তৃতীয়বার বন্দোবস্ত হয়। সেই সময়ে কেশব রায় এ অঞ্চলের জমীদার ছিলেন। এ সময়েও, কালীঘাটের রাজস্ব আদায় করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। কোম্পানীর জমীদারী প্রাপ্তির পরও দেখা যায়, কালীঘাট—সাবর্ণদিগের বা কোম্পানীর জমীদারীভুক্ত ছিল না। অথচ এ সময়ে কালীর সেবায়েতগণ, কালীঘাটের ভূমিগুলি, তাঁহাদের ইচ্ছামত কুলীন-ব্রাহ্মণদের দান করিয়াছিলেন। সাবর্ণ জমিদারগণ তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, যে সাবর্ণ-জমীদারগণের বড়িশাবাসের অর্থাৎ ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, কালীঘাটের ভূমি, কালীর সেবায়েতগণের দখলে ছিল।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, পলাশী যুদ্ধের পর, ইংরাজ কোম্পানী বর্দ্ধিত-প্রতাপ হইয়া উঠেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, কোম্পানী—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। রাজস্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যবস্থা এই সময়ে কোম্পানীর হাতে আসে। *

হুজুরীমল বলিয়া একজন পঞ্জাবী, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, বক্সারযুদ্ধের সময় কোম্পানীর যথেষ্ট উপকার করেন। হুজুরীমল—উমিচাঁদের নিকট-আত্মীয়। আজও "হুজুরীমল্‌স ট্যাঙ্ক লেন" বলিয়া, একটী গলি এই কলিকাতা সহরে তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে। তদনীন্তন ইংরাজ গবর্ণর ভেরেলষ্ট সাহেব, হুজুরী-মলের এই সহায়তার জন্য, তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলে, তিনি অন্য কোন পুরস্কার না লইয়া, কালীঘাটের মধ্যে ১২ বিঘা জমী প্রার্থনা করেন। ভেরেলষ্ট সাহেব, কালীঘাটের দেবোত্তর সম্পত্তিভুক্ত—বার বিঘা জমী, কালীর সেবায়েৎ

* এই দেওয়ানী প্রাপ্তির মঙ্গল কামনায়—তৎকালীন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর—অধ্যক্ষেরা তাঁহাদের অধীন, কলিকাতার হিন্দু সিপাহীদিগকে কালীঘাটে কালীর পূজা দিবার জন্য শতাধিক টাকা দিয়াছিলেন, এরূপ একটী জনশ্রুতি আছে।

গণের নিকট হইতে লইয়া, তৎপরিবর্ত্তে মুদী-সাহানগরে ১২ বিঘা জমী, হালদার মহাশয়দের "এওয়াজি" রূপে নিষ্কর করিয়া দেন। কালীঘাটের বাজার ও পুলিস, এখন যে স্থানে অবস্থিত - তাহাই হুজুরীমলের ঐ বারবিঘা জমী-ভুক্ত। এখন এই স্থান, আলিপুরের কালেক্টার সাহেবের অধীন। *

ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের আমলে—১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে, জমীদারদের সহিত একটী রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত হইয়াছিল। টেলর ও রিচার্ড নামক দুইজন কালেক্টর, সমস্ত জমী জরিপ করিয়া, তাহার এক নক্সা প্রস্তুত করেন। নক্সা প্রস্তুত হইলে - জমীদারদের সহিত পাঁচবৎসরের জন্য, জমী-সম্বন্ধে বন্দোবস্ত হয়। কালীঘাট—এই ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের নক্সার মধ্যেও পড়ে নাই। ইহাতে বোধ হয়, "দেবোত্তর" বলিয়া কালীঘাট এই নক্সাভুক্ত করা হয় নাই।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস, রাজস্ব সম্বন্ধে আর এক নূতন বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত প্রথমতঃ দশবৎসরের জন্য হয়। বাঙ্গলার দক্ষিণ বিভাগের রাজস্ব-বন্দোবস্ত, সন্তোষরায়ের সহিত হয়। পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা "চির-স্থায়ী-বন্দোবস্তে" দাঁড়ায়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের এ বন্দোবস্তেও, কালীঘাট সম্বন্ধীয় রাজস্বের কোন উল্লেখ মাত্র নাই। সুতরাং এই সময়েও উহা সন্তোষরায়ের জমীদারী কিম্বা ইংরেজ-কালেক্টর, কাহারও অধীনে আসে নাই। পূর্ব্বাবধি যেরূপ ছিল—সেই রূপই রহিয়া গেল। কালীঘাটের ভূমির খাজনা, জমীদারও পাইতেন না—ইংরাজ কালেক্টরও লইতেন না। তজ্জন্য কালী-ঘাটের দেবোত্তরভূমি, এতগুলি রাজস্ব বন্দোবস্তের পরও, কোনরূপ রাজকরের অধীন হইল না। পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, মেজর আর স্মাইথ সাহেব, আর এক-বার ২৪ পরগণা জরীপ করেন। আলীপুরের ডেপুটী কালেক্টর, বাবু গোবিন্দ-প্রসাদ পণ্ডিতের সময়ে, কালীঘাটকে, "ইংরাজদের ডিহি-পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত এবং এজন্য করভুক্ত হওয়া উচিত"—এই দাবীতে ক্রোক করা হয়। সমস্ত বিষয়ে তদন্ত করিয়া, কালেক্টার সাহেব এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কাগজপত্র দাখিল করেন। ইহার অব্যবহিত পরে প্রসিদ্ধ সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবার বিলম্ব ঘটে। বিদ্রোহশান্তির পর, ১৮৬১ সালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কালীঘাটকে কর হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

* হুজুরীমল কোম্পানীর নিকট দানরূপে যে জমী পান, তাহা তিনি ব্যবহার করেন নাই। বোধ হয়, দানের জমীতে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠায় পুণ্য-সঞ্চয় হইবে না—এইরূপ ভাবি-য়াই, তিনি নিজব্যয়ে স্বতন্ত্রভাবে গঙ্গারঘাট ও চাঁদনি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য আমরা এই মোকদ্দমা-ব্যাপার ঘটি এক খানি প্রাচীন ইংরাজী দলিলের ও আরজীর নকল—নিম্নে অবিক উদ্ধৃত করিলাম।—

FROM

GOVINDA PROSAD PUNDIT,
DEPUTY COLLECTOR OF 24 PERGUNAHS.

TO

THE COLLECTOR OF 24 PERGUNAHS
Dated Alipore, 15th January 1855.

Sir,

I have the honour to submit for sanction, the accompanying cases of boundary disputes and Debsheba claims, which have been decided by me, in connexion with the settlement of Mehal Punchannagram.

2nd. In these cases, the Holdings, noted on the margin, are declared by their occupants to consist of Rent-free Debotter lands of Iswary Kally Thakurani of Kalighat, the profits of which, have from time immemorial, been exclusively appropriated to the Sheba of that Idol.

It is moreover declared, that the entire Mouzah Kalighat, in which, the lands are situated, does not belong to Punchannagram but to Purgunah Khaspore.

3rd. With respect to the merits of these claims I beg to submit my opinion as follows :—

I have personally inspected all the Holdings and found them situated in Mouzah Kalighat as you will likewise perceive, from the accompanying maps. No assessment, appears to me, to have been ever fixed on these lands.

I have examined the Chittas and Jamanbundee papers of 1200 B. S. of Punchannagram and of 1190

B. S. of Purgunah Khaspure ,neither of them comprise the lands of Mouzha Kalighat.

Whatever may have been the reason, for this exclusion of the lands, from those measurements, there is no doubt, however, that the profit of the same, are appropriated to the Sheba of the above-named Idol. The Mouzah itself, is called after her name. According to the tradition and the Shastras of the Hindus, Kalighat is revered as a place of sanctity, from time immemorial. Hindu pilgrims, daily resort to the place, from every part of India and the worship of the Kali, is performed with solemnity from the profits of the lands, dedicated to her and the offerings paid at her shrine, by the pilgrims. The management of this worship and of the funds dedicated to this purpose, being in the hands of the Haldars of Kalighat, most of the lands have been found in their occupation—there being no suspicion as to the fact, of the appropriation of the profits of the lands to the service of the Idol (as it is well known to the public), evidence of witnesses to establish this, seems unnecessary. From the manner in which the Sheba of the Idol is daily performed I am of opinion, that the lands ought to be exempted from assessment with reference to the provisions of Regulation XIX of 1810 Sec.XVI.

4th. With reference to the Khaspore claim, I have made every enquiry to ascertain whether Mouzha Kalighat belongs to Punchannagram or to Purgunah Khaspore. I can trace out nothing on record, by which I can declare, that the Mouzha belongs to Punchannagram. The chittas of 1200 B. S. do not mention that Mouzha, nor shew the lands to have been measured as appertaining to Punchanna-

gram, although Estate Huzoorimal which is situated in Mouzha Kalighat has been resumed and found out appertaining to Punchannagram. Yet I should think this circumstance alone, cannot form a sufficient ground, for considering the Mouzha or the lands under reference to belong to Punchannagram for estate Hoozurmal has been resumed as Lawaris property to which the right of Government no doubt extends, wherever it may be situated.

5th. On the other side, the lands are not also mentioned in the chittahs of 1190 B. S. of Purgunah Khaspur. This would tend to the claim of the occupants, but then they say—as Mouzah Kalighat entirely consisted of rent-free lands, which have from time immemorial, been dedicated to the Sheba of Kali, they were excluded from the measurement of 1190 B. S. as unfit for assessment. This does not seem improbable, for had the Mouzah been left unmeasured in 1190 B. S. from the consideration that it belonged to Punchannagram, it would come under measurement in 1200 B. S. From the Collectorate and Civil Court Fysalas and Roobkaris which have been produced by the occupants, from the Sunnunds &c shewn by the collectorate record-keeper, agreeably to all the local enquiries held by me in person and from the deposition of several witnesses, which have been taken down, it would appear, that the lands of Mouzha Kalighat belong to Purgunah Khaspure.

6th. Under this circumstances, therefore, I have excluded the lands from assessment subject to confirmation of higher authorities. My vernacular proceedings dated 7th Instant, herewith accompany and will furnish any further information on the subject that may be required,

I have &c.

(Sd.) GOVINDA P. PUNDIT,

Deputy Collector.

শ্রীহরি

শরণং।

কমিশনারের রেজেষ্টারির ৮১ নং শেহা

নং ৩৬ সন ১৮৬০। সন ১৮৬১।৬২

রোধকারি নদীয়া প্রদেশের, রেভিনিউ কমিশনার কাছারি, হাল মোকাম আলীপুর, বৈঠক শ্রীযুক্ত এফ্ লসিংটন সাহেব কমিসনার সন ১৮৬১ সাল তারিখ ৩১ মে।

জেলা চব্বিশ পরগণা সংক্রান্ত

গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ... ... বাদী।

৺কালীঠাকুরাণীর সেবাইত আনন্দচন্দ্র হালদারপ্রভৃতি......প্রতিবাদীগণ। ফকিরচন্দ্র হালদার ও ভগবতীচরণ হালদার ও কালীচন্দ্র হালদার ও রামচন্দ্র হালদার ও কিন্নরাম হালদার ও প্রাণকৃষ্ণ হালদার ও নেপালচন্দ্র হালদার ও বীরেশ্বর হালদার ও বিশ্বেশ্বর হালদার ও যজ্ঞেশ্বর হালদার ও শ্যামাচরণ হালদার ও শিবচন্দ্র হালদার ও হরিমোহন হালদার ও ঈশ্বর চন্দ্র হালদার ও ঈশান চন্দ্র হালদার ও মহিমানাথ হালদার ও দীননাথ হালদার ও রামগোপাল হালদার ও শ্রীমত্যা জগদম্বা দেব্যা ও সুখময় হালদারের মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেব্যা ও রাজচন্দ্র হালদার ও শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেব্যা ও নিবারণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রামকুমারী দেব্যা ও দেবনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত হালদার সায়েলান্।

গবর্ণমেণ্টের খাস মহল ৫৫ গ্রামের অন্তঃপাতী ডেপুটী কালেক্টর শ্রীল শ্রীযুক্ত মেঃ হেসাম সাহেবের প্রেরিত লিষ্টির লিখিত ৫৯৫।৪।৵৫ বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর ভূমির সিদ্ধাসিদ্ধের তদন্তের বিষয়।

অত্র পূর্ব্বে, উক্ত জেলার শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব সন ১৮৬০ সালের ১২ মার্চ্চ দিবসীয় রোবকারী এবং ইংরাজী রায়ের লিখিত বিবরণ মতে বিবাদী ৫৯৫।৪।৵৫ বিঘা ভূমির মধ্যে ।০৶ কাঠা ভূমির খারিজ বাদে ৫৯৫৴৪।৫ বিঘা ভূমি কালীঘাটের অসিদ্ধ নিষ্কর বিবেচনায়, বাজেয়াপ্ত অভিপ্রায় করিয়া নথির কাগজাৎ সন ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১০ ধারার বিধান মতে এস্তাহার জারী হওয়াতে, সায়েলান্ উক্ত ভূমি সিদ্ধ দেবোত্তর প্রমাণার্থ সন ১২০৪ সালের তায়দাদের নকল ইত্যাদি দলিলাত সম্বলিত, উক্ত ভূমি কর-গ্রহণের শ্রেণী হইতে মুক্ত পাইবার প্রার্থনা করাতে, তাহা নথির কাগজাতের সহিত অবলোকন ও প্রণিধানানন্তর সন ১৮৬০ সালের ২৯ আগষ্ট

দিবসীয় ১৬৩ নম্বরি রিপোর্টে, বিরোধীয় ভূমি গবর্ণমেণ্টের খাস-মহল ৫৫ গ্রামের মধ্যগত না থাকায়, ঐ ভূমির উপসত্ব ধর্ম্ম বা দানের কর্ম্মে ব্যয় হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ লিপি পূর্ব্বক বোর্ডের সন ১৮৪০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দিবসীয় ৫৪২ নম্বার সাধারণ লিপির ৪ দফার মর্ম্মানুসারে কর-গ্রহণের শ্রেণী হইতে মুক্ত দিবার অভিপ্রায়ে, বোর্ডে পাঠান হইয়াছিল। প্রতাপান্বিত বোর্ডের সাহেবান্, নথীর কাগজাৎ তলব ও অবলোকন করিয়া, সন ১৮৬০ সালের ১৪ ডিসেম্বর দিবসীয় ৬৬৫ নম্বরী রিপোর্টে বিস্তারিত বিবরণ লিপি পূর্ব্বক এ পক্ষের মঞ্জুর করিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন। তথাকার চলিত সনের ১৬ জানুয়ারী দিবসীয় ৬৪A নম্বরি চিঠির দ্বারা ঐ অভিপ্রায় মঞ্জুর হওয়াতে, এ পক্ষের তলব মতে বোর্ডের ১৯ ফেব্রুয়ারী দিবসীয় ৮৫ নম্বরি চিঠীর দ্বারা কাগজাৎ পুনরাগত হওয়াতে, সন ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২১ ধারার মর্ম্মমত, উক্ত ভূমি মুক্ত দিবার হেতুবাদ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। যদিচ শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব, স্বীয় সন ১৮৬০ সালের ২৭ মার্চ্চ দিবসীয় রোবকারী এবং ইংরাজী রায়ে লিখিতেছেন যে বিবাদী ভূমির চারিদিকেই ৫৫ গ্রামের জমী থাকা বিধায়ে ঐ ভূমি ৫৫ গ্রামের শামিল বিবেচনা করিয়া সন ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে তায়দাদ দাখিল না থাকা হেতু ঐ জমী লাখেরাজ হইতে না পারা বোধে, হুজুরিমল্ল বাবুর নামীয় সন ১১৭৬ সালের ১৮ চৈত্র দিবসীয় এয়াজী জমীর সনন্দের নকল অমূলক জ্ঞানে বাজেয়াপ্তের অভিপ্রায় করিয়াছেন। কিন্তু সায়েলান্ এ পক্ষের সমীপে সন ১২০৪ সালের তায়দাদের যে নকল দাখিল করিয়াছে, তাহাই উক্ত ২৫ ধারার বিধানোক্ত লাখেরাজের রেজেষ্টরি প্রযুক্ত। সেই রেজেষ্টরিতে উক্ত ভূমি ৺কালী ঠাকুরাণীর দেবোত্তর সংজ্ঞায় লিখিত থাকার প্রমাণ হইয়াছে এবং সেই রেজেষ্টরির কৈফিয়াতে ইংরাজী ১৭৮০ সাল বাঙ্গালা সন ১১৮৭ সালের মূল সনন্দ, গৃহদাহে নষ্ট হওয়ার বিবরণ এবং সত্যযুগে সতী অঙ্গ পতন সময়ে, ক্ষত্রিয় নৃপতিতে উক্ত ভূমি দান করার কথা লিখিত আছে। সেই নৃপতিরা কত শত বৎসর পূর্ব্বে, এতদ্দেশে রাজত্ব করিয়াছে। তৎকর্ত্তৃক ঐ ভূমি দান হওয়ার বিষয় উপন্যাসের স্বরূপ জনশ্রুতি অনুসারে সচরাচর গোচর আছে। আর সরকারের রাজ্যাধিকারের অর্থাৎ দেওয়ানী আমলের পূর্ব্বাবধি, কালীঘাটের ভূমি যে নিষ্কর দেবোত্তর ছিল, তাহা গবর্ণমেণ্টের অর্পিত, হুজুরীমল্ল সীকের নামীয় সন ১১৭৬ সালের ১৮ চৈত্র দিবসীয় সনন্দের দ্বারায় প্রতীয়মান হইতেছে, যেহেতুক গবর্ণমেণ্ট ঐ হুজুরীমল্লের কৃতকর্ম্মের

উপকার স্বীকার পূর্ব্বক তাহাকে ভূমি দান করিয়া, যে সনন্দ অর্পণ করিয়াছেন, ঐ সনন্দে খাসপুর পরগণায়, কালীঘাটের দেবোত্তর ভূমির মধ্য হইতে ১১/০ বিঘা জমি লইয়া, তৎপরিবর্ত্তে ঐ কালীঠাকুরাণীর সেবাইতদিগকে সরকারের খাসমহল ৫৫ গ্রামের অন্তঃপাতী, মুদিসাহানগর মৌজায়, তৎতুল্য পরিমাণ এয়াজ দিবার কথা লিখিত আছে। অতএব এক্ষণে যে ভূমির সম্বন্ধে নিষ্কর সিদ্ধাসিদ্ধির তদন্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উক্ত সনন্দভুক্ত ভূমির অবশিষ্ট অংশ থাকার স্বরূপতায় বিষয়ে, অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আর প্রতিবাদী হালদারেরা বিরোধীয় ভূমি গবর্ণমেণ্টের খাসমহল ৫৫ গ্রামের সীমার বহির্গত থাকার প্রমাণ পক্ষে যে আপত্য করিয়াছে, তাহা যথার্থই স্বীকার করিতে হইবেক। কারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যাধিকারের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে, ঐ ৫৫ গ্রাম দিল্লাধিপতি বাদসাহার স্থানে দান পাইয়াছিলেন। তাহাতে খাসপুর পরগণার কোন গ্রাম যদিও ঐ ৫৫ গ্রামের শামিল হইয়া থাকে কিন্তু ৫৫ গ্রামের সন ১১৮৮ ও সন ১২০০ সালের জরিপী-চিঠায় তাহার শামিল ৺কালীঘাট নামক গ্রাম জরিপ হওয়া দেখা যায় না। অতএব কালীঘাটের দেবোত্তর ভূমির প্রতি, কর অবধারিত দাওয়া করিতে হইলে, গবর্ণমেণ্ট ৫৫ গ্রামের জমিদারী সত্বে কি রাজত্ব সত্বে তাহা করিবেন, এই তর্কের মীমাংসাও সুকঠিন। অতএব ঐ ভূমি বহুকাল হইতে দেবোত্তর সংজ্ঞায় দান হওয়া তাহার উপসত্ব অবিচ্ছেদে সেবা ও পূজা আদি ধর্ম্ম বা দানের কার্য্যে ব্যয় হইয়া আসা এবং কালীঘাট যে হিন্দুদিগের প্রকাশ্য দেবস্থলি পীঠস্থান, তাহা ভারতবর্ষীয় আপামর সাধারণে ব্যক্ত থাকায়, এপক্ষ কর্ত্তৃক উক্ত ভূমি কর গ্রহণের শ্রেণী হইতে মুক্ত দিবার যে অভিপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত বোর্ড রেবেনিউর সাহেবান্ তাহাই গ্রাহ্য পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে অনুরোধ করাতে, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর উক্তভূমি কর-গ্রহণের শ্রেণী হইতে মুক্ত দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন অতএব—

হুকুম হইল যে বিরোধিয় ৫৯৫৮/৪১৫ বিঘা ভূমি কর-গ্রহণের শ্রেণী হইতে মুক্ত দেওয়া যায়, আর মিছিলের কাগজাৎও বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের চিঠির নকল এই রোবকারীর প্রতিলিপীর দ্বারায়, শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠান যায়, আর সায়লানের দাখিলি-দলিল ফেরত দেওয়া যায় ইতি।

অদ্য আগত হইয়া হুকুম হইল যে, রেজেষ্টরিতে দরজ করা যায়, অত্র রোবকারীর লিখিত ভূমি ৫৫ গ্রাম হইতে খারিজ দেওয়া যায়

এবং নকসার চিহ্নিত করা যায়, আর কাগজাৎ ইনফেসানিতে রাখা যায়। *

কালীঘাটের সীমার মধ্যে, মৃন্ময়ী-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, কোন দেবী-পূজা করিবার প্রথা নাই। যদি কেহ তাহা করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে, কালীর নিকটেই সে সমস্ত করিতে হয়। কালীঘাটের সীমার মধ্যে অপর দেবী-প্রতিমার গঠন করিয়া পূজা করার কোন বিধি নাই।

কালীমন্দিরের পশ্চিমদিকে, শ্যামরায় বিগ্রহ অবস্থান করিতেছেন। শ্যামরায়ের মন্দিরের পার্শ্বেই—তাঁহার দোলমঞ্চ। আর এক শ্যামরায় ঠাকুর, মন্দিরের বাহিরে, অর্থাৎ কালী মন্দিরের প্রবেশদ্বারের নিকট অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার দরজার উপর লেখা আছে—"আদি শ্যামরায়"।

এই দুইটী শ্যামরায়ের—মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। কালীর সেবায়েত হালদারগণের পূর্ব্বপুরুষ ভবানী-দাস বৈষ্ণব ছিলেন, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্যামরায় বিগ্রহকে, তিনি কালীঘাটে স্থাপন করেন। কালীর-মন্দির সে সময়ে অতি ক্ষুদ্র ছিল। স্থানাভাবে শ্যামরায়কে তিনি কালীর মন্দির মধ্যেই স্থাপন করেন।

১৭২৩ খৃঃ অব্দে, মুর্শীদাবাদের জনৈক ধনী কানুনগো, কালীঘাটে আসিয়া শ্যামরায়কে কালীর মন্দিরে অধিস্থাপিত দেখিয়া, নিজব্যয়ে শ্যামরায়ের জন্য একটী ছোট ঘর প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহার এক শত কুড়ি বৎসর পরে, চব্বিশ পরগণা বাওয়ালীর জমিদারদিগের পূর্ব্বপুরুষ উদয়-নারায়ণ মণ্ডল মহাশয়,শ্যামরায়ের সেই ছোট ঘরটী ভাঙ্গিয়া,তৎস্থানে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাওয়ালীর মণ্ডল-জমীদারগণ—বৈষ্ণব ধর্ম্মানুসারী। টালিগঞ্জে ও তাঁহাদের আদি বাসস্থান বাওয়ালীতে, তাঁহাদের রাসবাড়ী ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, নবরত্ন প্রভৃতি আজও তাঁহাদের কীর্ত্তি-ঘোষণা করিতেছে। এখনও প্রতিবৎসর রাসের সময়, টালিগঞ্জের মণ্ডলদের দেবালয়ে—মহাসমরোহে রাসোৎসব হইয়া থাকে। শ্যামরায়ের মন্দির-সংলগ্ন যে দোলমঞ্চটি আছে, তাহা সাহানগর নিবাসী, মদনকলে নামক এক ধনী ব্যক্তির কীর্ত্তি। দোলযাত্রা শ্যামরায়ের একটী প্রধান উৎসব। প্রতিবৎসর, রামনবমীর সময়ে উহা মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই রামনবমীর দোলোৎসব শ্যামরায়ের মন্দির মধ্যে হইত। ধর্ম্মপ্রাণ—কলে মহাশয়, একটী

* বর্ণাশুদ্ধি সমেত উপরে মূল দলিলের অবিকল লিপি প্রদত্ত হইল।

দোল-মঞ্চের অভাব উপলব্ধি করিয়া ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে তাহা প্রস্তুত করাইয়া দেন।

কালীর পুরীর বাহিরে, শ্যামরায় বিগ্রহের মন্দিরের পশ্চিমে, আর একটী শ্যামরায়-বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন এবং বাহিরের এই বিগ্রহ-মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর "পুরাতন শ্যামরায়" বলিয়া লেখা আছে। ইহা হালদার মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নহে। এইরূপ জনরব—যে এই শ্যামরায়, শেঠ ও বসূকদিগের। ইহা বহুকালের পুরাতন বিগ্রহ। এই বিগ্রহ পূর্ব্বে গোবিন্দপুরে ছিল। সেকালের গোবিন্দপুরের মধ্যে, শেঠ ও বসূকগণ অতি প্রাচীন অধিবাসী। এই বিগ্রহের অপর নাম--গোবিন্দরায়। ইংরাজেরা গোবিন্দপুর গ্রাম ক্রয় করিলে, অধিবাসীগণকে তথা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে, সম্ভবতঃ এই বিগ্রহটী কালীঘাটে আনা হইয়াছে। এই বিগ্রহেরও রাসাদি-উৎসব হইয়া থাকে। একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ এখন ইঁহার সেবায়েত। * যাত্রীপ্রদত্ত অর্থাদি, সেবায়েতরাই লইয়া থাকেন। হালদার মহাশয়দের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

শিব ও শক্তির পূজা যে এদেশে বহু কালাবধি প্রচলিত আছে, তাহা আর স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ সহকারে বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে শিব ও শক্তিমাহাত্ম্য বিশেষরূপ বর্ণিত আছে। খৃষ্টের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের যত্নে, শৈবমত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়। অনেকানেক প্রাচীন রাজ-বংশীয়দের প্রচলিত মুদ্রায়, শিবের বৃষ ও ত্রিশূল প্রভৃতির প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে ও এতদ্দেশে, শিবলিঙ্গ-সমন্বিত বহুতর প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক-ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার প্রথমেই, শৈবধর্ম্ম ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়। শৈবদিগের মধ্যে অধিকাংশই উদাসীন সম্প্রদায়ী। ইহাদিগকে সচরাচর সন্ন্যাসী বলিয়া থাকে।

* আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, এই দুই শ্যামরায়েরই মন্দির দেখিতে যাই। বাহিরের পুরাতন শ্যামরায়ের মন্দিরটী, অতি জীর্ণ ও সংস্কারাভাবে অতি শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। আমি এই বিগ্রহের জনৈক প্রাচীন সেবায়েতের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাঁহার নিকট হইতে, এই শ্যামরায়ের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চাই। ব্রাহ্মণ—কোন রূপেই আমাকে কোন কথা বলিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল—তিনি এ সম্বন্ধে কোন প্রাচীন বিবরণ জানেন না। বাহিরের এই শ্যামরায় বিগ্রহটী, অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, যে মূর্ত্তিটী কাষ্ঠ-খোদিত। কিন্তু এদিকে আবার আর একটী জনরব প্রচারিত আছে—যে শেঠ ও বসূকদিগের আদি গোবিন্দজী এখনও বড়বাজারে আছেন।

শিবের উপাসনার মধ্যে, লিঙ্গ-পূজাই সমধিক প্রবল। ভারতের নানা স্থানে—শৈবদিগের মঠ আছে। নির্গুণ উপাসনা ও তত্ত্ব-জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশে, ঐ সকল মঠ স্থাপিত হয়। কন্যা-কুমারিকার নিকট শৃঙ্গগড় মঠ, বদরিকা আশ্রম, কেদারনাথ, বদরি-নাথ, চট্টগ্রামের নিকট চন্দ্রনাথ, মধ্য-ভারতের ওঁকার-মান্ধাতা ও উজ্জয়িনীর মহাকাল প্রভৃতি তীর্থগুলি প্রসিদ্ধ শিবপীঠ। কালীঘাটেও ত্রিকালেশ্বর নামে সন্ন্যাসীদিগের একটী মঠ আছে। তথায় সময়ে সময়ে বহুতর উদাসীন সমাগত হয়। কালীর পুরীর সম্মুখের ঘাটের উপর,সম্প্রতি দাক্ষিণাত্যের শৈব-সম্প্রদায়ী শেঠীদিগের একটী মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। নির্গুণ উপাসনা, মঠের উদ্দেশ্য হইলেও অধিকাংশ মঠে সাকার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুরাণে দেখা যায়, সতীদেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যে যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মহারুদ্র—সতীস্নেহ বশতঃ, সেই সেই স্থানে, লিঙ্গরূপে অবস্থিতি করিলেন।* শিবের প্রতিমূর্ত্তি পূজা অতীব বিরল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই লিঙ্গ-পূজা প্রচলিত। সাধারণ মতে—শিব সংহার-কর্ত্তা। কিন্তু শৈবেরা—শিবকে সংহার-কর্ত্তা ও সৃজন-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। শিবের লিঙ্গ মূর্ত্তি, সেই সৃজন-শক্তির পরিচায়ক। শিব-গীতাতে, শিবের নিরাকার ও সাকার উভয়রূপই বর্ণিত আছে।

লিঙ্গ-পুরাণে দুই প্রকার শিবের বিষয় লিখিত আছে। অলিঙ্গ ও লিঙ্গ। অলিঙ্গ-শিব, নির্গুণ-স্বরূপ আর লিঙ্গ-শিব জগতের সৃষ্টির কারণ।

জগদ্যোনি মহাভূতং স্থূল সূক্ষ্ম মজং বিভুং।
বিগ্রহং জগতাং লিঙ্গং অলিঙ্গাদভবৎ স্বয়ং॥

লিঙ্গপুরাণ তৃতীয় অধ্যায়।

স্থূল, সূক্ষ্ম, অজন্মা, সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ ও জগতের কারণ মহাভূতস্বরূপ লিঙ্গ শিব, অলিঙ্গ শিব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

লিঙ্গ শিব দ্বিবিধ, অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ ও বাণ-লিঙ্গকে অকৃত্রিম লিঙ্গ কহে। আর মনুষ্য কর্ত্তৃক দ্রব্য বিশেষ—যথা স্বর্ণ,রজত, তাম্র, প্রস্তর, মৃত্তিকা, গোময় প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যে গঠিত লিঙ্গকে—কৃত্রিম লিঙ্গ কহে। নর্ম্মদা নদীতীরে, যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণ-খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাহার নাম বাণ-লিঙ্গ। বাণরাজার দ্বারা প্রথমে পূজিত হয় বলিয়া, উহার বাণ-লিঙ্গ নাম হইয়াছে। যে সকল লিঙ্গ, কোন মনুষ্যের দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই এবং যাহার

* কালিকা উপপুরাণ—২৮ অ। ৪৭ শ্লোক।

মূল দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাকে স্বয়ম্ভু বা অনাদি-লিঙ্গ কহে। * কালীঘাটের নকুলেশ্বর-ভৈরব—স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। কালীর মন্দিরের অদূরে ঈশান-কোণে ইনি অবস্থিত। সুদর্শন-ছিন্ন সতী-অঙ্গ পতনে ইঁহার উদ্ভব ধরিতে হইবে। কালী-মূর্ত্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়।

কালীঘাট জনসমাজে প্রকাশিত হইবার অনেক পরে, বহুকাল পর্য্যন্ত নকুলেশ্বরের কোন মন্দিরাদি ছিল না। বিগ্রহের উপর সামান্য পর্ণকুটীরের আচ্ছাদন মাত্র ছিল। কালীর বড় মন্দির, ভোগঘর, শ্যামরায়ের অধিষ্ঠান মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত হইবার অনেক পরে, নকুলেশ্বরের প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাও বহুদূর প্রদেশবাসী জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর যত্নে হইয়াছে। পঞ্জাব প্রদেশীয় বিখ্যাত ধনী, তারা-সিংহ নামে জনৈক শিখ শৈব, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে প্রস্তর আনিয়া, নকুলেশ্বরের মঠ ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

নকুলেশ্বরের মঠ-মন্দির এ প্রদেশীয় সাধারণ মন্দিরের মত নহে। ইহার সমস্তই প্রস্তর নির্ম্মিত আর সুদৃশ্য প্রস্তর-স্তম্ভের উপর, ছাদ রক্ষিত হইয়াছে।

তারাসিংহের এই মন্দির নির্ম্মাণের বিষয়ে, একটী আশ্চর্য্য গল্প শ্রুত হওয়া যায়। তারাসিংহ একবার ব্যবসায়ে আশাতীত লাভ পান। সেই লাভের অর্থ, নিজে ব্যয় না করিয়া, বারাণসীতে সন্ন্যাসীদের জন্য একটী মঠ-স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। সঙ্কল্পিত মঠ-নির্ম্মাণের উপযোগী প্রস্তরাদি, নৌকায় বোঝাই দিয়া, তিনি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন। নাবিকগণ সেই বোঝাই-নৌকা, বারাণসীর ঘাটে কোন ক্রমে লাগাইতে পারিল না। নৌকা—স্রোত-মুখে ভাসিয়া আসিয়া, কালী-ঘাটে থামিল। তারা-সিংহ তীরে উঠিয়া, নকুলেশ্বরের দুরবস্থা দেখিয়া ঐ সকল প্রস্তরের দ্বারা তাঁহার এই মঠমন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন।

শিবরাত্রি ও নীলাষষ্ঠী (অর্থাৎ বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন)

* নানাছিদ্র সুসংযুক্তং নানাবর্ণ-সমন্বিতং।
অদৃষ্ট মূলং যল্লিঙ্গং কর্কশং ভুবি দৃশ্যতে॥
ষট্‌কর্ম্মদীপিকা।

যে সকল লিঙ্গ নানা ছিদ্রযুক্ত ও নানা বর্ণ বিশিষ্ট ও যাহার অঙ্গ কর্কশ এবং যাহার মূল দৃষ্ট হয় না, তাহার নাম স্বয়ম্ভু বা অনাদি-লিঙ্গ। বারাণসীর বিশ্বেশ্বর, উজ্জয়িনীর মহাকাল, নর্ম্মদাতীরস্থ সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতা-রাজ স্থাপিত ওঁকারমান্ধাতা, ও ৺তারকনাথ দেব এই অনাদি-লিঙ্গ শ্রেণীভুক্ত।

এই দুইটী পর্ব্বে, নকুলেশ্বরের স্থানে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্ব্বে নকুলেশ্বরের চড়কপর্ব্ব, বড় সমারোহে সম্পাদিত হইত। কালীঘাটের উত্তর পূর্ব্ব সীমা, বর্ত্তমান চড়কডাঙ্গায়—চড়ক-পর্ব্ব হইত এবং তদুপলক্ষে তথায় প্রতিবৎসর ঐ সময়ে একটী মেলা হইত। নকুলেশ্বরের চড়ক-পর্ব্ব ঐ স্থানে সমাধা হইত বলিয়া, ঐ স্থান অদ্যাবধি "চড়কডাঙ্গা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

নকুলেশ্বরের মঠমন্দির ব্যতীত, কালীঘাটের স্থানে স্থানে, অতি প্রাচীন অনেক শিব মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ মন্দিরগুলি সেবাইত হালদারগণ ও নানা-স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সকল মন্দির মধ্যে, কালীর পুরীর মধ্যস্থ দুইটী শিব-মন্দির ও পুরীর সম্মুখীন গঙ্গার ঘাটের উপর হুজুরিমল্ল নির্ম্মিত মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

ইতিপূর্ব্বে—কালিকাদেবীর কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত মুখমণ্ডল প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবাদমতে, ইহা মনুষ্যকৃত নহে—ব্রহ্মার স্থাপিত। এই মুখমণ্ডল, জনসমাজে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে—পবিত্র কালীকুণ্ডের পশ্চিম পারে, স্মরণাতীত কাল হইতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে, ঐ মুখমণ্ডল বরাভয়-কর-সংযুক্ত ও অসি-শোভিত হইয়া, মন্দিরমধ্যে প্রতিমারূপে বিরাজ করিতেছে। মায়ের নেত্রদ্বয় স্বর্ণালঙ্কৃত—শিরোদেশে সোনার-মুকুট। মুকুটের উপর স্বর্ণময়—মতির-ঝালর দেওয়া ছত্র বিরাজিত। হস্তে তীক্ষ্ণধার হিরণ্ময় অসি—ও করে স্বর্ণময় নৃ-মুণ্ড। উক্ত মুখমণ্ডল প্রাপ্তির পর হইতে, এ সমস্ত অঙ্গ-সজ্জা কালে কালে সঞ্চিত হইয়া, কালীদেবীর বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছে। বহু ধর্ম্মপরায়ণ শাক্তের, একান্ত ভক্তির জন্য, বা কোন মানসিক বাসনা-সিদ্ধির ফলে, এ গুলি ভক্তি-উপহার রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। এখন এ গুলির একটু পরিচয় দিব।

মন্দিরের মধ্যস্থলে—উপর্য্যুপরি প্রস্তর সাজাইয়া, তদুপরি ব্রহ্মার নির্ম্মিত মুখমণ্ডল সংস্থাপিত করা হইয়াছে। লৌহময় হুকে—অসিমুণ্ডাদি ধৃত, হস্ত চতুষ্টয় সংযোজিত হইয়াছে। জনশ্রুতি এই—ঐ স্তূপীকৃত প্রস্তরগুলির মধ্যে, কালীদহে নিপতিত, বিষ্ণুর সুদর্শনছেদিত—প্রস্তরবৎ সতীঅঙ্গ, সযত্নে রক্ষিত আছে। স্নানযাত্রা—অম্বুবাচী—প্রভৃতি পুণ্যদিনে, মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, ঐ প্রস্তরময় পদাঙ্গুলীর স্নান ও পূজার্চ্চনাদি হয়। হালদার মহাশয়গণের মধ্যে, জ্যেষ্ঠের বংশোদ্ভূত যে কেহ থাকেন—তিনিই এই স্নান কার্য্যে ব্রতী হন।

প্রথমে খিদিরপুর নিবাসী—দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়, কালীর চারিটী রৌপ্যময় হস্ত নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইনি ভূকৈলাসস্থ ঘোষাল রাজ-বংশের পূর্ব্ব-পুরুষ। নবাবী আমলের অবসান হইলে, ইনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে, দেওয়ান নিযুক্ত হন।

তৎপরে কলিকাতা নিবাসী—বাবু কালীচরণ মল্লিক মহাশয়, বর্ত্তমান চারিটী স্বর্ণনির্ম্মিত হস্ত প্রদান করিয়াছেন। চারি হস্তের চারিগাছি স্বর্ণময় কঙ্কণ—চড়কডাঙ্গা নিবাসী ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদান করেন। কলিকাতা বেলিয়াঘাটার, রামনারায়ণ সরকার নামক জনৈক ধনী চাউলব্যবসায়ী, কালীর স্বর্ণময় মুকুটটী দিয়াছেন। দেবীর হস্তস্থিত অসুরের মুণ্ড, কাহার প্রদত্ত—তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। কালীর স্বর্ণময় জিহ্বাটী, পাইকপাড়ার রাজবংশাবতংস, স্বর্গীয় রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর দিয়াছেন। কালীর মস্তকোপরি সুশোভিত স্বর্ণছত্রটী, নেপালরাজ্যের প্রধান সেনাপতি—স্বনাম-খ্যাত, স্বর্গীয় স্যর জঙ্গ বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত। অসংখ্য ভক্তকর্ত্তৃক ভক্তি উপহাররূপে প্রদত্ত, মায়ের অলঙ্কারগুলি এইরূপে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিয়াছে। ১৮৭৮ সালে, কালীর মন্দিরে একবার চুরী হয়। তজ্জন্য কতক অলঙ্কার চুরী গিয়াছিল। কালীক্ষেত্র-দীপিকারের মতে—"এই সমস্ত অলঙ্কারাদি বহুতর ধনাঢ্য লোকের প্রদত্ত। অপর কেহ কোন উৎকৃষ্ট অলঙ্কারাদি প্রদান করিলে, পূর্ব্বেরটী খুলিয়া,—নূতনটী কালীদেবীকে পরাইয়া দেওয়া হয় এবং পূর্ব্বের অলঙ্কার যে সেবায়েতের যজমানের প্রদত্ত—তাঁহারই প্রাপ্য হয়।"

কালীর নিত্য পূজা—পুরাকালে কিরূপ ভাবে হইত, তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। যখন এই কালীমূর্ত্তি কাপালিক ও তান্ত্রিক-সন্ন্যাসী-গণের হস্তে পতিত হয়, তখন তাহারা সম্ভবতঃ তামসিক নিয়মেই, কালীদেবীর পূজাদি করিত। এই ভীষণ সময়ে, তাহারা পশুবলি ও নরবলি দিয়া জগন্মাতার আরাধনা করিত—এরূপ জনশ্রুতি আছে। বর্ত্তমান সেবায়েত হালদারগণের পূর্ব্ব-পুরুষ, ভবানীদাসের সময় পর্য্যন্ত, সেবায়েতগণ—স্বহস্তে দেবীর পূজাদি করিতেন। ভবানীদাস—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি সাত্ত্বিকভাবে নিরামিষ নৈবেদ্যাদি সহকারে, জপ ও হোমাদি দ্বারা কালীর নিত্যপূজা সমাধা করিতেন। প্রাত্যাহিক ভোগের জন্য, তিনি ছাগবলি দিতেন না। কেবলমাত্র দুর্গোৎসবের নবমীর দিন, একটী মাত্র পশু-বলি দিতেন। কালীর বর্ত্তমান অধিকারীদের মধ্যে, এখনও ভবানীদাস প্রবর্ত্তিত এই পুরাতন নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে—সমাগত যাত্রীগণের প্রদত্ত, ছাগবলি

হইতে, মায়ের নিত্য-ভোগ হইয়া থাকে। এইজন্ত প্রতিদিন যে ছাগটী প্রথম বলি হয়—তাহাই দেবীর ভোগের জন্ত সংগৃহীত হয়। হালদারগণ আজও পশুবলি প্রদান করেন না। তবে তাঁহাদের মধ্যে, কেহ কেহ মাতামহ-কুলের প্রথা, কেহবা পৈতৃক প্রথানুসারে চলিয়া থাকেন।

ভবানীদাসের মৃত্যুর পর, তাঁহার পৌত্রগণের সময় হইতে, স্বতন্ত্র পুরোহিত দ্বারা দেবীর পূজাদি নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই নিত্য-পূজার ব্যয়, অধিকারীগণ—পালাক্রমে বহন করেন। বংশবিস্তারের সহিত,উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যাধিক্য হওয়ায়, এই পালার বা পূজার-দিনাংশ সৃষ্টি হইয়াছে। যে দিন যাঁহার সেবার পালা পড়ে, তিনি সেই দিনের পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। ভবানীদাসের পৌত্রগণের সময়ে, নিত্য-পূজাদির ব্যয়—যেরূপ নির্দ্ধারিত ছিল, এখনও সেইভাবে চলিয়া আসিতেছে। আমিষ-ভোগের জন্ত, পালাদারের কোন ব্যয় নাই—কারণ তাহা যাত্রীগণ-প্রদত্ত প্রথম বলি হইতে নির্ব্বাহিত হয়।

যে কালী-কুণ্ড হ্রদ-তীরে, সতীর প্রস্তরময় ছিন্ন পদাঙ্গুলি পাওয়া যায়, যে হ্রদতীরের গভীর বনমধ্যে—কামদেব-পত্নী পদ্মাবতী—এক অপূর্ব্ব জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া, স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"ঐ দেখ—ঐ দেখ", প্রচলিত প্রবাদ মতে, সতী-পদাঙ্গুলি এই কালী-কুণ্ড হ্রদ-তীরেই, পাষাণবৎ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আমরা এই "কালীকুণ্ড" সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্ব্বাংশে এই—কালীকুণ্ড-হ্রদ। বর্ত্তমানে ইহা সামান্ত পঙ্কিল পুষ্করিণীর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান আয়তন কমবেশ দশ কাঠা মাত্র। পূর্ব্বে ইহার আয়তন সমধিক বিস্তৃত ছিল। এই হ্রদ-তীরেই কালীর পাষাণ-মূর্ত্তি প্রথমে পাওয়া যায়। যাঁহারা এই কালীকুণ্ডের কথা অবগত আছেন, তাঁহারা গঙ্গাস্নান করিবার পুর্ব্বে, এই হ্রদে অবগাহন করিয়া থাকেন। * কিন্তু অতি অল্প লোকেই ইহার সন্ধান জানেন। অতীতকালে ইহা অতলস্পর্শ দহ বা "দ" ছিল। ক্রমে চর পড়িয়া, গঙ্গার পূর্ব্ব তীরস্থ তট উন্নত হওয়াতে, উহা হ্রদরূপে পরিণত হইয়াছে। কালীক্ষেত্র-দীপিকার

* এই কালীকুণ্ড-হ্রদ, বর্ত্তমানে যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, আর কিছুদিন পরে, ইহার স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। ভবিষ্যতে আরও পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় হইলে,ইহাতে মিউনিসিপালিটার কোপদৃষ্টি পড়িতে পারে। কালীকুণ্ড হ্রদটীর স্মৃতি রক্ষা করা, হালদার মহাশয়গণের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। বারাণসীতে "জ্ঞানবাপী" মহা পবিত্র স্থানরূপে আজও সুরক্ষিত। বাপীটী সুন্দররূপে বাঁধান ও তাহার চারিপাশে নাটমন্দির ও চত্বর। হালদার মহাশয়েরা একটু চেষ্টা করিলেই এই হ্রদটীর পুনঃ সংস্কার করিয়া, ইহার চারিদিকে ঘাট বাঁধাইয়া দিতে পারেন। যাত্রীর প্রদত্ত অর্থেই এই ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

মতে—এই "দহ" গঙ্গার তলদেশ অপেক্ষা সমধিক গভীর ও তথায় স্রোতের আধিক্য থাকা বশতঃ, উহা পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং ঐ দহের পশ্চিমে, গঙ্গার তলদেশ ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া উঠিলে, গঙ্গার স্রোত ঐ স্থান হইতে সরিয়া গিয়া, দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং কালস্রোতে পলী পড়িয়া, উহা একটী ক্ষুদ্র হ্রদরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ যেমন সমুদ্র-সম্ভব, কালীকুণ্ড-হ্রদও সেইরূপ নদী-সম্ভব। তবে চিল্কা-হ্রদ বহুযোজন ব্যাপী, আর কালীকুণ্ড-হ্রদ অতি ক্ষুদ্র। গঙ্গার তীর হইতে এমন কি চারি পাঁচ শত হস্ত দূরে, কালীঘাট বা তৎসন্নিহিত স্থানে কূপ-খনন সময়ে, সমুদ্র-তটের সিকতাময় ভূমির সদৃশ, স্তর স্তর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত গলিত-উদ্ভিদ-ময় মৃত্তিকা দেখা যায় না। ইহাতে সুচারুরূপে প্রতীয়মান হয়, যে কালীঘাটের গঙ্গার, ঈষদ্দূরবর্ত্তী স্থান সকল, পূর্ব্বে গঙ্গার গর্ভে নিমগ্ন ছিল এবং কালক্রমে স্তর পড়িয়া, ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া, উচ্চভূমির আকারে পরিণত হইয়াছে ও তৎপরে ইহা মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছে।

কালীর পুরী হইতে, প্রায় দুই শতাধিক হস্ত পশ্চিমে, এখন আদি-গঙ্গা প্রবাহিতা রহিয়াছেন। কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণ—কালীঘাটের প্রথম অধিবাসী। কিন্তু কালীর পুরীর পশ্চিমে, উহাদের বাস দেখিতে পাওয়া যায় না। কালীক্ষেত্রের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে, হালদারগণের নির্ম্মিত প্রাচীন এমারতগুলি দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, যে হালদারগণের প্রথম বাসের সময়, গঙ্গা—কালীপুরীর আরও নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। কালীকুণ্ড হ্রদের পশ্চিমে, গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানের মধ্যে কোথাও একটীও প্রাচীন বৃক্ষ দেখা যায় না। ঐস্থানে আবহ-মান কাল উচ্চভূমি থাকিলে, উক্ত স্থানে অন্ততঃ একটীও প্রাচীন অশ্বত্থ, বট বা অন্য কোন বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত। কালীঘাট এখন সমুদ্র-তল হইতে ১১।১২ হস্ত উচ্চ হইয়াছে, কিন্তু তবুও আদিগঙ্গায় জোয়ার আসিলে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী অধিকাংশ স্থল জলমগ্ন হইয়া যায়।

এই কালী-কুণ্ড হ্রদের পঙ্কোদ্ধারের জন্য, দুই তিন বার চেষ্টা করা হয়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে, কালীর সেবায়েতগণ, আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া, ইহার সামান্য সংস্কার করেন। পরে ১৮৮৭ অব্দে, আলিপুরের মিউনিসিপ্যালিটী হইতে—ইহার পঙ্কোদ্ধার করা হয়। কিন্তু খনকেরা, ইহার সমুদায় জল বহু চেষ্টা দ্বারাও একবারে সেচন করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সুগভীর ও গঙ্গার নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, জলসেচন করিলেও ইহা ক্ষণমধ্যে আবার জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহাই "কালীকুণ্ডের" ইতিহাস। এই কুণ্ড—হিন্দুর চক্ষে কাশীর জ্ঞানবাপীর ন্যায়—অতীব পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র। এই হ্রদতীরেই কালী-দেবীর প্রস্তরময় মুখমণ্ডল এবং পদাঙ্গুলি পাওয়া যায়। কালীকুণ্ডের পবিত্র নাম, কালীঘাটের স্থাপনা এবং প্রাচীন স্মৃতির সহিত সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত।

দেবীর নিত্যপূজার জন্য, যেমন একজন পুরোহিত নিযুক্ত আছেন—তেমনি তাঁহার নিত্য-বেশ-ভূষা ও সাজ-সজ্জাদি পরাইবার জন্য,বেশকারগণও আছেন। ইহাঁরা কালীর "মিশ্র" বলিয়া আখ্যাত হন। কোন্ সময়ে, কাহার আমল হইতে, ভবানী-দেবীর এই বেশকার-মিশ্রগণ নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা ঠিক করা সুকঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে পূজার জন্য স্বতন্ত্র পুরোহিত নিযুক্ত হইবার সময় বা তাহার কিছু পরবর্ত্তী সময়ে—এই বেশকার-মিশ্রগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। পুরোহিত ও বেশকার-মিশ্রগণ, কালীর অধিকারী হালদারগণের মত, পুরুষ-পরম্পরায় ঐ পদের উত্তরাধিকারী হইয়া আসিতেছেন। আরতির পর, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করা ও পুনরায় প্রাতে দ্বারোদ্ঘাটন করার ভার, এই মিশ্রগণের উপর সংন্যস্ত। তবে অধিকারীগণ তাঁহাদের কার্য্যের উপর তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন।

যে যে বিষয়ে কালীর নিত্য আয়-ব্যয় সংকুলান হয়, তাহার একটী মোটামুটী তালিকা, আমরা নিম্নে সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

আয়।

১। দর্শনার্থী—যাত্রীগণ প্রদত্ত অর্থ (কালী, নকুলেশ, শ্যামরায় ও মনসার প্রণামী)।
২। যাত্রীগণ প্রদত্ত পূজার দ্রব্যাদি।
৩। পশুবলির দক্ষিণা।
৪। উৎসর্গীকৃত ছাগমুণ্ড।
৫। অতিরিক্ত পূজা—প্রণামী ও ভক্তগণ প্রদত্ত বিবিধ উপহার।
৬। কালীর নামের দেবোত্তর সম্পত্তির উপস্বত্ব প্রভৃতি।

ব্যয়।

নিত্য-পূজার নৈবেদ্যাদি।
পুরোহিতের দক্ষিণা।
বেশকার-মিশ্রগণের দৈনিক বেতন।
বাদ্যকার, ঘড়িয়াল (যে ঘণ্টা বাজায়), পশু-বলির কর্ম্মকার প্রভৃতির দৈনিক বেতন।
৫। মন্দির রক্ষার আটজন প্রহরীর দৈনিক বেতন।
পাচক ও পুরী—সম্মার্জ্জকের দৈনিক বেতন।
কালীমাতা ও শ্যামরায়বিগ্রহের ভোগের দ্রব্যাদি ও বৈকালিক।

প্রথমে প্রত্যহ হালদার মহাশয়গণ কর্ত্তৃক মায়ের নিত্য-পূজা হয়। পালাদারের অনুষ্ঠিত নিত্য-পূজাদি ব্যতীত, যাত্রীপ্রদত্ত পূজা সমস্ত দিনই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অনেক ধনাঢ্য হিন্দু—প্রত্যহ নিয়মিতরূপে, কালীর পূজা দিয়া থাকেন। অনেক ধনী ব্যক্তির, বেতনভোগী পুরোহিতগণও তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া, মায়ের নিত্যপূজা করেন এবং এ সকল পূজার অধিকাংশই, মায়ের মন্দির-সম্মুখস্থ "নাট-মন্দিরে" হইয়া থাকে। তবে যে সমস্ত ধনবান ব্যক্তি, কালীঘাটে নিত্য বা বিশেষ পূজা দেন—তাঁহাদের অভিলাষ অনুসারে, পূজা ও বলি সর্ব্ব প্রথমে হইবার কোন বাধাই নাই। বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমীদারগণের অভ্যুদয় সময়ে, তাঁহারা বড়িশা হইতে নিত্য কালী-দেবীর পূজাদি পাঠাইতেন। তাঁহাদের পূজা সর্ব্বাগ্রে সম্পাদিত হইত। পাইক-পাড়ার স্বর্গগত রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, কালীঘাটে মায়ের নিত্য-পূজা দিতেন। তাঁহার আমলে, তিনি কালীর সামিষ-ভোগের নিত্য-ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত বলির পশু, সর্ব্বাগ্রে নিবেদিত হইত। বর্ত্তমানে আর কোন ধনবান ব্যক্তির, ঐরূপ ভাবে মায়ের নিত্য-পূজাদির ব্যবস্থা আছে কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। *

কালীর প্রাত্যাহিক পূজা, অধিকারীগণ দ্বারা পালাক্রমে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্নান-যাত্রা, দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা, অধিকারীগণের সাধারণ পূজা। সেই সকল পর্ব্বদিনে, যাঁহাদের পালা পড়ে, তিনি নিত্য-পূজার নিয়মানুসারে, সেই দিনে প্রাত্যাহিক পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। সাময়িক উৎসবের ব্যয়, সমস্ত অধিকারীগণ চাঁদা করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা একত্রে উৎসব-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। সমস্ত অধিকারীর নামে সংকল্প হইয়া, পূজা সমাপ্ত হইয়া থাকে।

শারদীয় পূজার তিনদিন, বিশেষতঃ মহাষ্টমীর দিন, ভোগের ব্যাপার—অতি বিরাট। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, সমস্ত নাট-মন্দির, পর্ব্বতপ্রমাণ নানাবিধ সামিষ ও নিরামিষ অন্নে—পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। একদফা, এই ভাবে উৎসর্গীকৃত হইলে—আবার সেই স্থান গঙ্গোদক-মার্জ্জিত হইয়া, নূতন ভোগের স্থান করিয়া দিত। অন্নপূর্ণার বিরাট অন্ন-ক্ষেত্রের সে স্মৃতি, আজও

* পশুবলির দক্ষিণা সকলের পক্ষে সমান নহে। সাধারণকে প্রতি ছাগবলির জন্য, চারি আনা করিয়া দিতে হয়। কিন্তু পুলিসের লোকের নিকট দুই আনা ও সেনা-বিভাগের হিন্দু সিপাহীর নিকট এক আনা লওয়া হয়। মহিষ-বলির দক্ষিণা—এক টাকা। (কালীক্ষেত্র দীপিকা।) শারদীয়া মহাষ্টমী, কালীপূজা ও অন্যান্য শাক্ত পর্ব্বতিথিতে বলির বৃত্তি অনেক আদায় হইয়া থাকে।

আমাদের মনে জাগরিত আছে। এখনকার ভোগের ব্যাপারও বড় কম নহে।

অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়নাদি, কালীঘাটে মানসিক ক্রমে, দেবীর সম্মুখেই হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে, নব ব্রহ্মচারীকে তিন দিন দণ্ডীরূপে পৃথক গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ড ভাসান হইয়া যায়।

করুণাময়ী মায়ের দ্বারে, অনেক নিরাশ্রয় অভুক্ত অতিথি, সন্ন্যাসী ও দরিদ্রগণ সমবেত হয়। পূজাদি শেষ হইলে—মধ্যাহ্নের পর, ইহারা মায়ের প্রসাদ পায়। ভোগের পরই মন্দির-দ্বার নিত্য আবদ্ধ হয়। সন্ধ্যার সময় তাহা খোলা হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন মহানুভব ব্যক্তিদিগের দ্বারা নির্ম্মিত, কালী-পীঠ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান দেবোত্তর ইমারত প্রভৃতির তালিকা।

বর্ত্তমান কীর্ত্তি	নির্ম্মাণের সময় (খৃঃ অব্দ)	কাহা দ্বারা নির্ম্মিত।
কালীর সম্মুখীন গঙ্গারঘাট	১৭৭০।৭১	পঞ্জাব প্রদেশবাসী প্রসিদ্ধ সৈনিক হুজুরিমল্ল।
কালীর বর্ত্তমান মন্দির	১৮০৯	বড়িশার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, সন্তোষ রায় চৌধুরী ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ।
দুটী ভোগঘর ...	১৮১২	গোরক্ষপুর নিবাসী টীকারায়।
পুরীর তোরণ-দ্বার ও নহবত খানা ...	১৮১২	ঐ ঐ
নাট্যমন্দির ...	১৮৩৫	আন্দুলের প্রসিদ্ধ জমীদার রাজা কাশীনাথ রায়।
শ্যামরায় বিগ্রহের অধিষ্ঠান মন্দির ...	১৮৪৩	বাওয়ালী নিবাসী বৈষ্ণব—প্রধান জমীদার উদয় নারায়ণ মণ্ডল।
তৃতীয় ভোগঘর ...	১৮৪৩	শ্রীপুর নিবাসী জমীদার রায় তারক চন্দ্র চৌধুরী।
চতুর্থ ভোগঘর ...	১৮৪৪	তেলিনীপাড়া নিবাসী জমীদার কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান কীর্ত্তি	নির্ম্মাণের সময় (খ্রীঃ অব্দ)	কাহা দ্বারা নির্ম্মিত।
নকুলেশ্বরের মঠ মন্দির	১৮৫৪	পঞ্জাব প্রদেশীয় ব্যবসায়ী তারাসিংহ।
পুরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ গমনাগমনের পথ ...	১৮৫৮	গড়িয়া নিবাসী গোবিন্দ সাধু খাঁ ও কলিকাতা যোড়াসাঁকো নিবাসী রামচন্দ্র পাল এবং পরে ছাপরা নিবাসী গোবর্দ্ধনদাস আগরওয়ালা।
শ্যামরায়ের দোলমঞ্চ ...	১৮৫৮	সাগানগর নিবাসী মদন কলে।
অবশিষ্ট ভোগঘর ...	১৮৭৮	ছাপরা নিবাসী গোবর্দ্ধন দাস আগরওয়ালা।
গঙ্গার ঘাট হইতে কালীর মন্দির পর্য্যন্ত গমনাগমনের পথ ...	১৮৭৮	যোড়াসাঁকো নিবাসী রামচন্দ্র পাল ও গোবর্দ্ধন দাস আগরওয়ালা।
শ্মশানের ঘাট, বিশ্রাম ঘর ও যাতায়াতের পথ	১৮৭৯	কালীর সেবাইত ৺ গঙ্গানারায়ণ হালদারের বনিতা, বিশ্বময়ী দেবী (৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের জননী।)
শ্মশানের বড় বিশ্রাম ঘর ও শিব মন্দির ...	১৮৮০	হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বেঞ্চক্লার্ক বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু।
কালীর মন্দিরের বায়ু কোণে মনসা-তলা প্রস্তর দিয়া নির্ম্মাণ ...	১৮৮০	বেহালা নস্করপুর নিবাসী গোবিন্দ চন্দ্র দাস মণ্ডল।

হিন্দুর পবিত্র-তীর্থ, কালীঘাটের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—তাহা পাঠকবর্গের গোচরার্থে লিপিবদ্ধ করিলাম। খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই যে বঙ্গের প্রধান শক্তিপীঠ কালীঘাট সাধারণে বিশেষভাবে পরিচিত হয়, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলী হইতেই প্রমাণিত হইবে। এই কালীঘাটের প্রতিষ্ঠার সহিত, বড়িশা সাবর্ণ-চৌধুরী জমীদারগণের বিশেষ সম্বন্ধ। আমরা পরপৃষ্ঠায় তাঁহাদের একটী সংক্ষিপ্ত বংশবৃক্ষ প্রদান করিয়া, কালীঘাট-প্রস্তাব শেষ করিলাম।

বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশবৃক্ষ।
লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার (রায় চৌধুরী)।
জন্ম—১৫৭০ খৃঃ অব্দ, মৃত্যু—১৬৪৯।
(আকবর বাদসাহ ও জাহাঙ্গীরের সময়।)
রাম রায় (১৫৯০—১৬৫০)
গৌরী রায় (১৬০০—১৬৬৯)
গোপাল রায়
বিশ্বেশ্বর রায় (চক্রবর্ত্তী)
কৃষ্ণ রায় (সিংহ)
গোপী রায়
মহাদেব রায় (১৬১৯—১৭১০)
রামবল্লভ
সুবধি
জগদীশ (১৬২০—১৬৯০)
গন্ধর্ব্ব ১৬১৮
জনার্দ্দিন ১৬২০
কৃষ্ণরাম (১৬৬৮—১৭৩৭)
শ্রীমন্ত (১৬২৫—১৬৮১)
কুলেশ্বর
বিদ্যাধর ১৬৪০— ১৭২০
রঘুদেব ১৬৪২— ১৭২২
রত্নেশ্বর ১৬৭০— ১৭২০
রামেশ্বর ১৬৭৪— ১৭৩৯
রামকৃষ্ণ ১৬৫২
মনোহর (সিংহ) ১৭৩০ *
দয়ারাম
রাধাকৃষ্ণ
কেশবরাম (১৬৫০—১৭১৬)
রামচাঁদ * ১৬৫৮-১৭৩২
দুর্গারাম
বাসুদেব ১৬৬০-১৭১০
মনোহর সিংহ * ১৭৩০
বলাই ১৬৯৯— ১৭৬০
শুকদেব ১৬৭৫-১৭৩৮
রাধাবল্লভ ১৭৭৬
বিনোদরাম ১৬৯৫—১৭১৯
রামদেব ১৬৮০-১৭২৬
কৃষ্ণদেব ১৬৮২
রঘুদেব
শিবদেব বা (সন্তোষরায়) ১৭১০—১৭৯৯
কুশল
রামগোপাল ১৭২৫—২৬
রামভদ্র *
নন্দলাল ১৭২২
বলরাম
কৃষ্ণচাঁদ ১৬৭৬
কালীচরণ
জয়রাম ১৬৮৩
কিনুরাম
যুগল
রামজয়
রামশঙ্কর
গঙ্গানারায়ণ
* মন্তব্য—যাঁহাদের নামে তারা-চিহ্ন * আছে, তাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কলিকাতা বিক্রয় করিয়া-

পঞ্চম অধ্যায়।
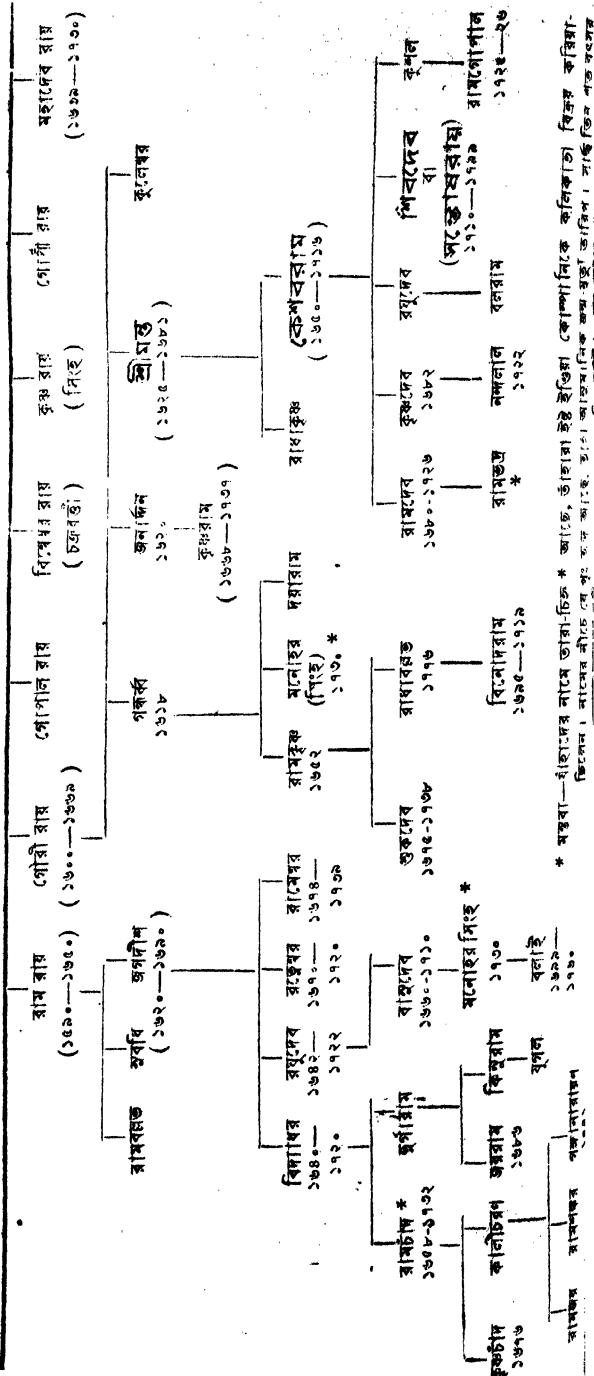
ইউরোপীয় জাতির ভারতে আগমন—ইংরাজের অভ্যুদয়।

ভারতে ইউরোপীয় জাতির প্রথমাগমন। খৃঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে ইউরোপের সহিত ভারতের সংস্রব। পারস্যরাজ দেরায়স কর্ত্তৃক সিলাক্সকে ভারতে প্রেরণ—সিলাক্সের লিখিত বৃত্তান্ত—আলেকজান্দার কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ—ইউরোপ-খণ্ডে ভারতের কথা প্রচার—মিগাস্থিনিস কর্ত্তৃক লিখিত, প্রাচীন ভারতের বৃত্তান্ত, পাটলীপুত্রের ঐশ্বর্য্যময় অবস্থা—পর্টুগীজগণের প্রথম ভারতে আগমন—পর্টুগীজদের প্রভাব বিস্তার—পর্টুগীজগণের অধঃপতন—ইংরাজ কোম্পানীর প্রথম আবির্ভাব—ড্রেক, ক্যাবেণ্ডিস, প্রভৃতি ইংরাজ নাবিকগণের ভারতে প্রথমাগমন-শুভমুহূর্ত্তে লণ্ডন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—ভারতে ইংরাজের প্রথম বাণিজ্যারম্ভ—রাজ্ঞী এলিজাবেথের সনন্দ—জেমস ল্যাঙ্কেসটারের প্রথম ভারতযাত্রা। আকবরের সভায়, জন মেইডেনহল নামক জনৈক ইংরাজের আগমন—কাপ্তেন হকিন্স—জাহাঙ্গীরের সভায় হকিন্সের অবস্থান—হকিন্সের উপর সম্রাটের প্রীতি—প্রীতির ফলে সম্রাট কর্ত্তৃক হকিন্সের বিবাহ-চেষ্টা। বিবাহের পরিবর্ত্তে—বাণিজ্য-স্বত্ব প্রার্থনা—পর্টুগীজদের প্রতিযোগীতা—সুরাটে ইংরাজ জাতির প্রথম বাণিজ্যাগার—সুরাট কুঠীর প্রথম অধ্যক্ষ বেষ্ট সাহেব—পর্টুগীজদের প্রতিযোগীতা—সুরাটের ইংরাজ-কুঠীর বিপন্ন অবস্থা—স্যর টমাস রোর জাহাঙ্গীরের দরবারে আগমন—সম্রাট দরবারে রো'র দীর্ঘকাল অবস্থান—বঙ্গদেশে বাণিজ্যস্বত্বলাভ—সুরাটের বাণিজ্যকুঠীর ক্রমোন্নতি—শিবাজীর অভ্যুদয়—মোগলের সহিত প্রতিযোগীতা—শিবাজী কর্ত্তৃক সুরাট লুণ্ঠন—ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট অক্‌সেনডেনের সহিত শিবাজীর যুদ্ধ—শিবাজীর পরাজয়—ঔরঙ্গজেবের নিকট ইংরাজ প্রেসিডেণ্টের খেলাত প্রাপ্তি। মান্দ্রাজের বাণিজ্য-কুঠীর উন্নতি—মান্দ্রাজ কুঠীতে প্রথম গবর্ণর নিয়োগ-সেকালের ইংরাজ গবর্ণরের বাবুয়ানা—ইংরাজের বোম্বাই লাভ ইত্যাদি।

অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠামধ্যে আমরা দেখিতে পাই, যে সিলাক্স (Scylax) নামক একজন গ্রীক্, খৃঃ পূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে, সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আসেন। পারস্যাধিপতি দরায়ুস রাজা, সিন্ধুনদীর তীর-ভূমিস্থিত জনপদগুলির সন্ধান লইবার জন্য, সিলাক্সকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। সিলাক্স ভারতের একাংশ দেখিয়া, তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে, তাঁহার সমকালবর্ত্তী গ্রীসীয়গণ, ভারত সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা

জানিতে পারেন। সিলাক্সের কথিত বৃত্তান্ত, নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল।

সিলাক্সের লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া, পরবর্ত্তী যুগের গ্রীসিয়দের মনে ভারত-ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। ইহার পর আমরা হেরোডটাসের গ্রন্থে, ভারতের আংশিক বিবরণ দেখিতে পাই। খৃঃ পূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ সেকেন্দার-সাহ (আলেকজান্দার) ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার সঙ্গে, কয়েকজন প্রথিতনামা গ্রীসিয় ইতিবৃত্ত-লেখক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের লোকবিশ্রুত ঐশ্বর্য্য, গগণস্পর্শী উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গময় পর্ব্বতমালা, মৃদুসমীরান্দোলিত শস্যক্ষেত্র, শ্যামল প্রান্তর, তিমিরময় খনিমধ্যে, স্বর্ণ ও হীরকস্তূপ ও নাগরিকদের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে. অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

আলেকজান্দারের সমকালবর্ত্তী, মিগাস্থিনিসের গ্রন্থে, প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্য-প্রবাদ সম্বন্ধে, অনেক কথা তৎকালীন ইউরোপে প্রচারিত হয়। মিগাস্থিনিস, ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায়, বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রথমত সেলুকসের দূতরূপে, তিনি বহুকাল পাটলীপুত্রে অবস্থান করেন। এই মিগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতেই, আমরা জানিতে পারি—"ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ছয়লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা ছিল। নয় হাজার হস্তী, সর্ব্বদা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের অধীনস্থ এই সমস্ত অক্ষৌহিণী সেনা—যুদ্ধকুশল, রণনীতিদক্ষ ও অত্যন্ত বলীয়ান ছিল। তাঁহার আমলে পুলিস বন্দোবস্ত এতদূর সুন্দর ছিল, যে সেরূপ সুবন্দোবস্ত ইউরোপীয় প্রদেশ সমূহেও দেখা যাইত না।"

আমরা কলিকাতার ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি। ইহার সহিত, ভারতে ইউরোপীয়দের আগমন ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত। পর্টুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, এই ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহাদের সকলেরই প্রধান লীলাক্ষেত্র—এই বঙ্গদেশ। হুগলী চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, সুতালুটী ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ঘটনাবলীর সহিত তাঁহাদের কর্ম্মময় জীবনের অতীত ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে-বিজড়িত। অন্যান্য ইউরোপীয়দের বর্জ্জন করিয়া, ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজদের প্রতিই অবশেষে প্রসন্না হন। ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি জাতির স্মৃতি, বঙ্গদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছে। ফরাসীর ক্ষুদ্র অধিকার চন্দননগর এখনও এই বঙ্গে, উক্তজাতির পূর্ব্ব অস্তিত্বের স্মৃতি আজও অতি ক্ষীণভাবে রক্ষা করিতেছে। দিনেমার ওলন্দাজের কথা আমরা ত একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছি। চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও

কাশিমবাজারের বক্ষস্থিত কয়েকটী সমাধিক্ষেত্রে, আজও সেকালের দিনেমার ও ওলন্দাজ বণিকদিগের অস্থিরাশি, বাঙ্গালার কোমল মৃত্তিকায় প্রোথিত রহিয়াছে। ইংরাজজাতি ভারতে বাণিজ্য করিতে না আসিলে, আজ আমরা। ব্রিটিশ-শাসনের সুখ, শান্তি, গৌরব ও সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারিতাম না। আজ আমরা ভারতেশ্বরী মাতৃপ্রতিম মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার পৌত্র সম্রাট জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরীকে,এই কলিকাতা রাজধানীতে ভারত সম্রাটরূপে দেখিতে পাইতাম না। এই উচ্চশিক্ষা, অনাবিল সুখশান্তি, উচ্চরাজপদ, আর জগতব্যাপী নাম লইয়া, বঙ্গবাসী আজ সমগ্র ভারতের শীর্ষস্থানে দাঁড়াইতে পারিত না। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী, কতকষ্ট সহ্য করিয়া, কত বাধা-বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া, এদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, বাণিজ্যের ফলে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ গুলিতেই পাঠক জানিতে পারিবেন।

ইংরাজেরা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে, পর্টুগীজগণ প্রথমে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে প্রবেশ করেন। ভারতের পশ্চিমোপকূলে তাঁহাদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৪৯৮ খৃঃ অব্দের ২২এ মে, ভাস্কোডিগামা নামক একজন পর্টুগীজ নাবিক, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া, প্রচণ্ড ঝড়ঝটিকা ও সমুদ্র-যাত্রার অসংখ্য বাধা বিঘ্ন সহ্য করিয়া, কালিকটে উপস্থিত হন। তখন কালিকটে জামোরিন্ বলিয়া একজন ক্ষমতাপন্ন রাজা ছিলেন। তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া, পর্টুগীজেরা তাহাদের একটু আশ্রয়স্থান করিয়া লইলেন। তৎপরে সাহস ও উদ্যম সহায়ে, এই পর্টুগীজগণ, মালাবার উপকূল হইতে পারস্যোপসাগরের তীর পর্য্যন্ত, প্রধান প্রধান বন্দর গুলিতে আধিপত্য বিস্তার করেন। একশত বৎসর মধ্যে, আরবউপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহারা আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করতঃ প্রাচীন জাপানের সন্ধান পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন।

পর্টুগীজ বণিকগণ, ভারতের পশ্চিমকূলস্থ বন্দর গুলির সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া, প্রচুর ধন সঞ্চয় করিতে লাগিল। ভারতের ঐশ্বর্য্য-প্রবাদ ভারতীয় বাণিজ্য দ্রব্যাদির সহায়তায়, ইউরোপের নানাস্থানে প্রচারিত হইতে লাগিল। সমগ্র ইউরোপীয় জগত, স্তম্ভিতনেত্রে ভারত প্রত্যাগত এই পর্টুগীজ বণিকগণের ঐশ্বর্য্য ও উন্নতি দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভারতের সহিত বাণিজ্যে, সহজে যে এত ধনশালী হওয়া যায়, ইহা দেখিয়া ইংরাজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি জাতিরা, পর্টুগীজদের মত ভারতের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিল।

পিড্রো এল্‌ভারেজ্‌ ক্যাব্রাল নামক একজন পর্টুগীজ-ব্যবসায়ী—১৫০০ খ্রীঃ অব্দে, কালিকটে প্রথম ফ্যাকটারী বা বাণিজ্য-নিবাস স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে, পর্টুগীজেরা ভারতীয় বন্দরাদি হইতে মাল সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে চালান দিতেন। পর্টুগালের লিস্‌বন নগরী, সেই সময়ে ভারতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রধান ইউরোপীয় বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। দেখিতে দেখিতে লিস্‌বন নগরী—সেই পুরাকালে, ভারতের রপ্তানি দ্রব্যসমূহের প্রধান আড়ত হইয়া পড়িল। সমগ্র ইউরোপীয় জাতিই, লিসবনের বাজারে ভারতীয় মাল কিনিতে আরম্ভ করিল।

ক্যাব্রালের তিন বৎসর পরে, আলফান্‌সো আবুকার্ক নামক একজন পর্টুগীজ সেনানীর অধিনায়কতায়—পর্টুগীজেরা তাহাদের ফ্যাক্‌টরী বা বাণিজ্য-নিবাসের রক্ষা জন্য একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহাই ভারত-বর্ষে—ইউরোপীয় জাতির প্রথম দুর্গ। ১৫০৬ হইতে—১৬৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত, ভারতের পশ্চিমোপকূলে, বঙ্গোপসাগরে ও সমুদ্র-তটবর্ত্তী প্রধান প্রধান বন্দর সমূহে—পর্টুগীজ দিগের বাণিজ্য সম্বন্ধে, বিশেষ আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু ১৬৬৮ হইতে পর্টুগীজ ক্ষমতা ক্রমশঃ হীনশক্তি হইতে থাকে।

পর্টুগীজদিগের অবনতিতে, দিনেমারেরা ভারতোপকূলে বাণিজ্যের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৫৮০ খৃঃ স্পেন ও পর্টুগাল একজন রাজার শাসনাধীনে আসে। দিনেমারেরাও এই সময়ে এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়। এতাবৎকাল দিনেমারেরা লিস্‌বন বন্দর হইতেই—ভারতের আমদানি দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিত। কিন্তু পর্টুগীজেরা মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া, দিনেমারদিগকে বড়ই নিগৃহীত করিতে লাগিল। এক সময়ে দিনেমারদের কয়েকখানি জাহাজ, বাণিজ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য, লিসবন বন্দরে উপস্থিত হইলে—পর্টুগীজেরা তাহা আটক করিয়া, দিনেমার ব্যবসায়ী, পোতাধ্যক্ষ দিগকে কারানিক্ষিপ্ত করিল।

এই সমস্ত—কারানিক্ষিপ্ত দিনেমার কয়েদীদিগের মধ্যে, একজন কোন পর্টুগীজ কয়েদীর নিকট হইতে, ভারতের বাণিজ্য-দ্রব্যাদি ও ঐশ্বর্য্য-প্রবাদ, এবং ভারতে আসিবার সহজ পথ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার কথায় কথায় জানিয়া লয়। তাহার পর সেই অপরাধী মুক্তিলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। তাহার মুখে, ভারতের ঐশ্বর্য্য-প্রবাদ অবগত হইয়া, ডেনমার্কের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী—অনতিবিলম্বে

দুই চারি খানি দ্রব্য-সম্ভার পূর্ণ বাণিজ্য জাহাজ সংগ্রহ করিয়া, ভারতের দিকে প্রেরণ করেন।

পর্টুগীজগণ তখন বুঝিল—দিনেমারেরা, একবার ভারতে প্রবেশ করিতে পারিলে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে। ভারতের সহিত বাণিজ্যে তাহাদের অন্য প্রতিদ্বন্দী জুটিলে, তাহাদেরই ব্যবসা মাটী হইবে। কাজেই তাহারা উত্তমাশা অন্তরীপের পথ আটক করিল। দিনেমারেরা পর্টুগীজদিগের প্রতিযোগীতায় বিফল মনোরথ হইয়া, আবার চারি খানি বাণিজ্য জাহাজ, অন্য পথে ভারতের দিকে প্রেরণ করে।

দিনেমারগণ ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে ভারতের উপকূলে—বাণিজ্য আরম্ভ করে। এই সময়ে মোগল সম্রাটগণের শাসন-কঠোরতায়, পর্টুগীজগণ হীনশক্তি হইয়া পড়িতেছিল। এজন্য তাহারা ভারতের পশ্চিমোপকূল ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোপকূলে আশ্রয় লইবার যোগাড়-যন্ত্র করিতে লাগিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে, সম্রাট সাহজাহানের আমলে, প্রসিদ্ধ ফরাসী-ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার—বহুদিন দিল্লী ও আগরায় সম্রাট-দরবারে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই বর্ণিয়ারের লিখিত—বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়—"১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে দিনেমারদের আগ্রাসহরে একটী ফ্যাক্‌টারী ছিল, সেখানে চার পাঁচজনের বেশী লোক ছিলনা। বঙ্গদেশ, পাটনা, সুরাট প্রভৃতি স্থানেও তাহাদের ছোট ছোট বাণিজ্য-কুঠী ছিল।" বার্ণিয়ারের এই বিবরণ হইতে আরও জানিতে পারা যায়—যে দিনেমারেরা—পর্টুগীজ দিগের পরে, ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

পর্টুগীজ ও দিনেমারদিগের পর, ইংরাজ ও ফরাসীগণ—এদেশে [illegible]জ্য করিতে আসেন। ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য, যে [illegible]ণিক-সমিতি সংগঠিত করেন—তাহাই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এই কোম্পানী, কিরূপে বাণিজ্যের সহিত রাজ্য অর্জ্জন করেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। তাহার পূর্ব্বে ইষ্ট-ইণ্ডিয়াকোম্পানীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইল; তাহা পাঠকের জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

আজও লোকে—"কোম্পানীর মুল্লুক—কোম্পানীর পথঘাট"—প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হইতেই, এই সমস্ত আখ্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইংরাজ যখন—পর্টুগীজ ও দিনেমারদিগের মত এদেশে

কেবল বাণিজ্য উদ্দেশে আগমন করেন, তখন তাঁহারা জানিতেন না—যে ভাগ্য-লক্ষ্মী প্রসন্না হইয়া—এই সমগ্র ভারতরাজ্য, তাঁহাদের হস্তেই সমর্পণ করিবেন। সামান্য একটু আশ্রয়-স্থান, একটী ক্ষুদ্র বাণিজ্য কুঠী স্থাপনের জন্য মোগল-বাদসাহের কর্ম্মচারীদের নিকট, তাঁহাদিগকে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কতবার তাঁহারা অধিকার-চ্যুত হইয়া—একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। মোগল-বাদসাহের অধীনস্থ প্রাদেশিক কর্ম্মচারীরা—এই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর—কর্ম্মচারীগণকে কতই না নিগৃহীত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ইংরাজ-জাতি, উদ্যম, অধ্যবসায় ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা বলে, সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, শেষ এই ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌমিক সম্রাট পদ লাভ করিয়াছেন। কি করিয়া এই কোম্পানীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল, এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক্।

ক্যাবট্, ভাস্কোডিগামা, আবুকার্ক প্রভৃতি পর্টুগীজগণ, এদেশের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া—কিরূপ সাফল্য লাভ করেন, তাহা ইউরোপের সর্ব্বত্রই উপকথার মত প্রচারিত হইতে লাগিল। ইংরাজজাতি এই সমস্ত অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া, ভারতের সহিত বাণিজ্য-সংশ্রবে আসিতে বড়ই উৎসুক হইলেন। ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেন্‌রী ও ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ডের আমলেই, ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডের বড় বড় আমীরগণ, তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন তুলিয়া ফেলিলেন। এই নব-গঠিত ইংরাজ কোম্পানী প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া, ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য, অজস্র অর্থব্যয় করিলেন। সকল কথা বলিতে গেলে, আমাদের স্থানে কুলাইবে না। তবে পাঠক জানিয়া রাখুন, ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস্ ড্রেক নামক একজন দুর্দ্দমনীয় উৎসাহী ইংরাজ, প্লাইমাউথ বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া, জাভাদ্বীপে উপস্থিত হয়েন। ড্রেকের এই সাফল্য দেখিয়া, ইংরাজ-জাতি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন বটে, কিন্তু এই পথ—নিতান্ত সুগম বলিয়া বোধ না হওয়ায় পরিশেষে ইহা পরিত্যক্ত হয়।

এই ঘটনার কুড়িবৎসর পরে, ১৫৮৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে, টমাস ক্যাভেণ্ডিস্ নামক আর একজন সুদক্ষ নৌ-সেনাপতি তিনখানি জাহাজ লইয়া আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পথ অবলম্বন করেন। তিনি আমেরিকার

উপকূল বাহিয়া, আটলাণ্টিক সাগরের মধ্য দিয়া, লানড্রোন্ ও জাভা দ্বীপে উপস্থিত হন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে, তিনি Cape of Good Hope বা উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া, আবার প্লাইমাউথে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে আসিবার এই দুইটী পথ আবিষ্কৃত হওয়ায়, তৎকালীন ইংরাজজাতি মহোল্লাসিত হইলেন। ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য, ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিনে, শুভমুহূর্ত্তে, এলডারম্যান গর্ডার্ড নামক এক ইংরাজের বাটীতে, "লণ্ডন-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া" কোম্পানীর প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। * এই সমিতিতে যে কয়জন ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা উচ্চদরের ধনী ব্যবসায়ী। কাজেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাণিজ্য-জাহাজ ও তদানুসঙ্গিক আয়োজনাদির জন্য প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে, ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রদত্ত সনন্দবলে বলীয়ান হইয়া, এই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে প্রথম যাত্রা করেন। এই সনন্দের অন্যান্য স্বত্বের মধ্যে, একটী প্রধান ও গণনীয় স্বত্ব ছিল—যে কোম্পানী ইচ্ছা করিলে, প্রাচ্যদেশে ভূমিক্রয় বা অন্য কোন কায়েমী বন্দোবস্তে জমী দখল করিয়া বাণিজ্যব্যবসায় কুঠী স্থাপন করিতে পারিবেন। পনর বৎসরের জন্য, অবাধ বাণিজ্যাধিকার এই কোম্পানীকে দেওয়া হয়। পাঁচখানি জাহাজ বাণিজ্যার্থে সজ্জিত হয় এবং কাপ্তেন জেমস ল্যাঙ্কেষ্টার নামক একজন ইংরাজ-নাবিক, জাহাজগুলির প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

মহা শুভক্ষণে, মাহেন্দ্রযোগে, টরবে বন্দর হইতে, এই জাহাজগুলি ভারতাভিমুখে যাত্রা করে। † এক বৎসর সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিয়া, জাহাজগুলি সুমাত্রা-দ্বীপের আচিন নামক স্থানে উপস্থিত হয়। আচিনের অধিবাসীরা, ল্যাঙ্কেষ্টারের দলের সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিল না। বরঞ্চ তাহাদের সহিত বাণিজ্য-সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইল। ল্যাঙ্কেষ্টারের

* আমরা তিনশত বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। বহুদিন পর্য্যন্ত, লণ্ডন সহরের এই প্রসিদ্ধ বাটীটি "Founder's Hall" বলিয়া পরিচিত ছিল। এই বাটীর ভাগ্যেই, ইংরাজ আজ ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

† ইংরাজ বণিকগণের যে চারিখানি জাহাজ, সর্ব্বপ্রথমে ভারতসমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হয়—তাহাদের নামগুলি অতি বিচিত্র। ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠক ইহার রসগ্রহণ করুন। জাহাজগুলির নাম—The Scourge, The Susan, the Hector, the Ascension. শেষোক্ত জাহাজখানি পিনেস।

জাহাজে, যে সমস্ত লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রাদি ও বিলাতী বাণিজ্য-দ্রব্যাদি ছিল, তাহারা তাহা কিনিয়া লইল। কাপ্তেন ল্যাঙ্কেষ্টারও মালয়-দ্বীপজাত নানাবিধ ফল, মরিচ, কর্পূর, মুসব্বর, গুল্‌গুল্‌, দারুচিনি, সোনামুখী প্রভৃতি দ্রব্য খরিদ করিয়া, জাভা-দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই যাত্রায় তাঁহারা ভারতের কোন বন্দরে প্রথম উপস্থিত হন—তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে মালয় ও জাভা-দ্বীপের সহিত বাণিজ্যে, এই নব প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই।

১৬০০ খৃঃ অব্দে জন্‌ মেইডেন হল (John Maidanhall) নামক একজন ইংরাজ সওদাগর, আকবরের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মেইডেন-হল, কতদিন মোগল-দরবারে ছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে সম্রাট আক্‌বরের অনুকম্পায় বাণিজ্য সম্বন্ধে একখানি অনুমতি পত্র ও ফারমান পাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেইডেনহল ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া, পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু এবার আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হয় নাই। আগরায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ধরিতে গেলে, জাহাঙ্গীর বাদসাহের আমলেই, ইংরাজের বাণিজ্য-লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-স্বত্ব লাভের জন্য, কাপ্তেন হকিন্স নামক একজন ইংরাজ ভারতে প্রেরিত হয়েন। ১৬০৯ খৃঃ অব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে, হকিন্স প্রবাসযাত্রার পথে, বহু কষ্ট ভোগ করিয়া মোগল-দরবারে উপস্থিত হন।

হকিন্স তুরুস্কের ভাষা জানিতেন। কাজেই বাদসাহের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে, তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। জাহাঙ্গীরও তাঁহার উপর যথেষ্ট সন্তুষ্ট হন। বাদসাহের এ সন্তোষের পরিণাম পরিশেষে এতটা বেশী হইয়া পড়ে—যে তিনি এক সুন্দরী আরমানী যুবতীকে নির্ব্বাচিত করিয়া, তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য, হকিন্সকে মহা পীড়াপীড়ি করিয়া বসেন। কিন্তু হকিন্স ত এদেশে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে আবদ্ধ হইতে আসেন নাই। কাজেই নিজের স্বার্থ বশে, এই স্ত্রীরত্নের জন্য তিনি ব্যাকুল না হইয়া, স্বদেশীয়, স্বজাতীয় বণিকগণের স্বার্থরক্ষার জন্য বাদসাহের নিকট এক জোর আরজী করিয়া বসিলেন।

তাঁহার বাসনা সিদ্ধ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে হইল না। বাদসাহ ইংরাজ-

বণিকগণকে, দীর্ঘকালের জন্য ভারতবর্ষে বাণিজ্য স্বত্বদানে অনেকটা সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু পটু‌গীজদের প্রতিযোগিতায় হকিন্সকে সে যাত্রা বিফল মনোরথ হইতে হইল। আকবর-সাহের আমল হইতে মোগল-সম্রাট দরবারে, পটু‌গীজ পাদরী-সম্প্রদায় ভুক্ত জেস্থুইট-গণের প্রবল আধিপত্য ছিল। এই জেস্থুইটগণ যখন সম্রাটের পার্শ্বচরগণকে বুঝাইলেন—যে ইংরাজ এই বাণিজ্য-স্বত্ব লাভ করিলে, পটু‌গীজদিগের তাহাতে সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তখন তাঁহারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া, বাদসাহের কাণ ভারি করিলেন। হকিন্স এত কষ্ট করিয়া, এদেশে আসিয়া, প্রায় আড়াই বৎসরকাল আগরায় কাটাইয়া ছিলেন। কিন্তু ইহার ফল বিশেষ আশাপ্রদ হইল না। পটু‌গীজ-দিগের প্রতিযোগীতাতেই তাঁহার আশাসিদ্ধির যথেষ্ট অন্তরায় ঘটিল। কেবল মাত্র সুরাট বন্দরে বাণিজ্য-কুঠী স্থাপনের সামান্য স্বত্ব লাভ করিয়া, হকিন্স—বিলাতে ফিরিয়া যান। যাহা হউক, এত প্রতিযোগীতার মধ্যেও ১৬১১ খ্রীঃ অব্দে সুরাটে ইংরাজের প্রথম বাণিজ্য-কুঠী স্থাপিত হইল।

বেষ্ট নামক একজন ইংরাজ নৌসেনাপতি, সুরাটের প্রথম প্রতিষ্ঠিত কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। বেষ্ট অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও জবরদস্ত লোক ছিলেন। পটু‌গীজেরা তাঁহাকে নানাবিধ বিপত্তিতে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—তাঁহার কুঠী-স্থাপনের ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের পথে, অনেক বাধা উপস্থিত করিয়াছিল—কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। জবরদস্ত বেষ্ট, স্থানীয় মোগল শাসনকর্ত্তাকে হস্তগত করিয়া, বাদসাহী ফারমানের জোরে—সুরাটে বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করিলেন। ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে—অর্থাৎ কুঠী-স্থাপনের প্রায় দুই বৎসর পরে, বেষ্ট ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান।

বেষ্টের পরে, কাপ্তেন ডাউন্‌টন নামক আর একজন ইংরাজ, সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৬১৫ খ্রীঃ-অব্দে, ডাউন্‌টন সুরাটে উপস্থিত হন। তিনি কোম্পানীর বাণিজ্য-কুঠীর অবস্থা যাহা দেখিলেন—তাহাতে বড়ই আতঙ্কিত হইলেন। তিনি দেখিলেন—"কুঠীতে মোটে তিনজন মাত্র ফ্যাক্টর আছেন—বাকী ফ্যাক্টরেরা পলাইয়া গিয়াছেন। আত্মবিবাদ এবং চক্রান্তেই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।" ডাউন্‌টন, একটু কড়ামেজাজে কাজ আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার যথেষ্ট শত্রুবৃদ্ধি হইল। পটু‌গীজদিগের শত্রুতা ছাড়া—স্থানীয় মোগল-সুবাদারগণও তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন। ইহার উপর সুরাটের

জলহাওয়াও তাঁহার সহিল না। কঠিন রোগে পীড়িত হইয়া—তিনি সুরাটেই সমাধিস্থ হইলেন। কেরিজ্ বলিয়া একজন ফ্যাক্টর, তাঁহার স্থানাধিকার করিলেন।

বিলাতের কর্ত্তারা, তাঁহাদের সুরাটের বাণিজ্য-কুঠীর অন্ধকারময় অদৃষ্টের কথা অবগত হইয়া, ইংলণ্ডাধিপ জেম্‌সের নিকট আরজী করিয়া, স্যার টমাস রোকে দূতরূপে জাহাঙ্গীরের সভায় প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। রো-সাহেব, ১৬১৫ অব্দে ৬ই মার্চ্চ বিলাত ছাড়িয়া, সাত মাস পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে সুরাটে উপস্থিত হন। সুরাট হইতে তিনি বুরহানপুর যাত্রা করেন। সম্রাটপুত্র তখন বুরহানপুরের শাসনকর্ত্তা। রো-সাহেব নানা উপায়ে সাহাজাদা খুরমকে (পরে সাজাহান) সন্তুষ্ট করিয়া আজমীর অভিমুখে যাত্রা করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর, বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য, তখন আজমীরে অবস্থান করিতেছিলেন। স্যর টমাস রো ১৬১৫ খ্রীঃঅব্দের ২৩এ ডিসেম্বর আজমীরে উপস্থিত হন। এতকষ্ট করিয়া আজমীরে আসিয়াও, তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে প্রায় মাসাবধিকাল সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে হয়।

সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, স্যার টমাস রো তাঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরের পত্র ও তৎপ্রেরিত বিচিত্র উপঢৌকনাদি প্রদান করিলেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহ, ইংলণ্ডের রাজদূতকে সম্মানের চক্ষে, প্রীতির চক্ষে দেখিলেন। রো সাহেবও নিজের স্বভাবগুণে, সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইলেন।

রো-সাহেব দুইটী প্রার্থনা লইয়া সম্রাট-দরবারে উপস্থিত হন। (১) ইংরাজ বণিকগণ যাহাতে মোগল-রাজত্ব মধ্যে, নির্ভয়ে নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য করিতে পান, তাহার আদেশ। (২) যে সকল মোগল রাজকর্ম্মচারীরা সুরাটে ও অন্যান্য স্থানে ইংরাজ-ফ্যাক্টারের বা কর্ম্মচারীদের নিকট জবরদস্তিতে অর্থশোষণ করিয়াছিলেন, ঋণ বলিয়া অর্থগ্রহণ করিয়াও তাহা প্রত্যর্পণ করেন নাই, তাহার পুনরুদ্ধার। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া, মোগল-রাজসভায় অবস্থান করিবার পর, স্যর টমাস রো সাহেব, বাদসাহের নিকট হইতে, সমগ্র মোগলরাজ্যে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে—বিনা বাধায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। মোগল-রাজকর্ম্মচারীগণ এতাবৎ কাল জবরদস্তিতে কোম্পানীর নিকট যে অর্থগ্রহণ করিয়াছিলেন

তাহারও পুনরুদ্ধার করিয়া দিয়া, স্যর টমাস রো সাহেব স্বদেশে প্রস্থান করেন।

ইহার পর, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরিয়া, ইংরাজ-কোম্পানী সুরাটে আপনাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরের বিশেষ কোন লিখিত বিবরণ নাই। যাহা আছে—তাহাও বিশৃঙ্খল। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে, সাহজান বাদসাহের আমলে, ডাক্তার ফ্রায়ার, সুরাট ফ্যাক্টরির বা বাণিজ্যাগারের উন্নতি সম্বন্ধে, অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। ফ্রায়ার সাহেব—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপনিবেশের ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার মতে—"সুরাটে ইংরাজ বাণিজ্যের অবস্থা, তখন বেশ সমুন্নত। ইংরাজ ফ্যাক্টারির অধ্যক্ষের বার্ষিক বেতন, তখন পাঁচশত পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক বেতন, তিনি হাত খরচ বাবত হিন্দুস্থানে পাইয়া থাকেন। বাকী অর্দ্ধেক, তাঁহার নামে কোম্পানীর খাতায় বিলাতেই জমা থাকে। তহবিল তছরূপ বা অন্য কোনরূপ কুব্যবহারের জামিন স্বরূপ, তাঁহাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের এক সিকিউরিটি বা জামিন-নামা দিতে হইয়াছে। ফ্যাক্টারির প্রধান হিসাব-রক্ষকের বার্ষিক বেতন ৭২ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে পঞ্চাশ পাউণ্ড, তিনি এখানে লইয়া থাকেন। বাকী টাকা বিলাতে জমা হয়। বিলাত হইতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী মাত্রেই এই রূপ আধা বেতন। বাকী সকলেই পূরা বেতন পাইয়া থাকেন।"

প্রথম অবস্থায়, সুরাটের ফ্যাক্টারি "এজেণ্ট" উপাধিধারী এক কর্ম্মচারীর অধীনে ছিল। রিভিঙ্গটন সাহেব সুরাট ফ্যাক্টারির শেষ এজেণ্ট। ইহার পরই "প্রেসিডেণ্ট" পদের সৃষ্টি হয়। সুরাট ফ্যাক্টারির তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট স্যর জর্জ্জ অক্সেনডেনের, আমলে—মহারাষ্ট্রপতি শিবাজি, সুরাট বন্দর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। ইহার পরে অনারেবল জেরাল্ড অঙ্গিয়ার প্রেসিডেণ্ট হন। ইনি যুদ্ধ করিয়া শিবাজীকে সুরাট হইতে হঠাইয়া দেন। *

---

* স্যরজন অক্সেনডেন সত্যসত্যই একজন বাহাদুর পুরুষ। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখন ভারতের একছত্রসম্রাট। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ভিন্ন, দাক্ষিণাত্যে তাঁহার আর কোন প্রবল শত্রুই ছিল না। শিবাজী—মোগলদিগকে উত্যক্ত করিবার জন্য, যখন মোগল-রাজত্বের দক্ষিণ সীমান্ত আক্রমণ করেন, সেই ভয়ানক সময়ে স্থানীয় মোগল-শাসনকর্ত্তা দুর্গের ফাটক বন্ধ করিয়া, নিশ্চিন্ত চিত্তে আত্মরক্ষায় মনোযোগী হন। প্রজার ধনসম্পত্তি ও জীবনরক্ষা অপেক্ষা, তিনি নিজের জীবনকেই বহুমূল্য ভাবিয়াছিলেন। সুরাটের উপকূলে ইতিপূর্ব্বে একখানা দিনেমার বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়া যায়। সেকালে সমস্ত ইউরোপীয় জাহাজ, জলদস্যু বা সামুদ্রিক বোম্বেটেদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য জাহাজে কামান রাখিত। মোগল

কয়েক বৎসরের মধ্যে, করমণ্ডল উপকূলে ও ইংরাজ-বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দিনে দিনে ব্যবসার উন্নতিতে, সম্পত্তি-বৃদ্ধিও যথেষ্ট হইয়াছিল। সম্পত্তি হইলেই, সকলেই তাহা সুরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির কর্ম্মচারীরা স্থির করিলেন—সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন বাণিজ্যোপযোগী স্থান কিনিয়া লইয়া বা জমা করিয়া আত্মরক্ষার জন্য, একটী ছোট-খাট কেল্লা নির্ম্মাণ না করিলে, আর কোনমতেই শ্রেয়ঃবোধ হইতেছে না। সেই সময়ে, শিবাজীর অমিত প্রতাপে, সমস্ত দাক্ষিণাত্যের চারিদিকেই অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। গোলকন্দা প্রদেশেও যথেষ্ট গোলমাল। বাদসাহী সৈন্যেরা বা তাহাদের প্রতিপক্ষেরা, ক্রমাগতই যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত। চারিদিকেই লুটপাট অশান্তি ও অরাজকতা।

এই সময় বাণিজ্যকার্য্য অবাধে চালাইবার জন্য, ইংরাজ-ফ্যাক্টরীর প্রেসিডেণ্ট সাহেব, প্রথমতঃ স্থানীয় মোগল সুবাদারগণকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পশ্চিমোপকূলে বাণিজ্য-বিস্তার সম্বন্ধে, কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, তাঁহারা ভারতের পূর্ব্বোপকূলে একটু সুবিধামত স্থানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাগ্যের অবস্থানুসারে, মানুষের বুদ্ধিও পরিচালিত হয়। সৌভাগ্য-সূচনার সময় সুবুদ্ধিই আসিয়া জুটে। ইংরাজ-প্রেসিডেণ্ট অনেক চেষ্টায়, ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে, একখণ্ড জমীর সন্ধান পাইলেন। এই ভূমিখণ্ড চন্দ্রগিরির রাজার অধীন। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে প্রচুর অর্থ দিয়া, এই জমী ইংরাজ-কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ জমা লইলেন। ছয় মাইল লম্বা এবং এক মাইল প্রশস্ত, এই স্থানের জন্য, ইংরাজেরা বাৎসরিক ছয়শত পাউণ্ড বা নয় হাজার টাকা রাজস্ব দিতে বাধ্য হন।

সুবাদার সাহেবের ক্ষুদ্র দুর্গে কেবল সেই সমুদ্রমগ্ন জাহাজ হইতে সংগৃহীত, কয়েকটী কামান দুর্গ-প্রাকারে সাজান ছিল। তিনি দুই একবার তোপধ্বনি করিয়া, আত্মরক্ষা মঙ্গলপ্রদ ভাবিয়া, দুর্গের দ্বার বন্ধ করিলেন। শিবাজীর অধীনস্থ সেনারা, নগর লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া ইংরাজ-ফ্যাকটারি আক্রমণের চেষ্টা করে। অক্সেনডেন মহা সাহসের সহিত—মারহাট্টী সেনার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শিবাজীকে অক্সেনডেনের সহিত যুদ্ধে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। মারহাট্টারা বেগতিক দেখিয়া, কেবল লুটপাট করিয়া সে যাত্রা সুরাট ত্যাগ করে। তাঁহার এই অসীম সাহসের জন্য, মহাসন্তুষ্ট হইয়া, সম্রাট ঔরঙ্গজেব অক্সেনডেনকে একখানি তরবারি ও খেলাত এবং তাহাদের বিলাতি আমদানী বাণিজ্য দ্রব্যের উপর পরমিটের শুল্ক লাঘব করিয়া দেন। বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেকটারেরাও অক্সেনডেনকে "Preserver is not less than conquerer." অর্থাৎ "রক্ষাকর্ত্তা বিজেতার অপেক্ষা কম নহেন" এই গৌরবান্বিত বিশেষণ সমেত একপত্র লেখেন ও সকৌন্সিল অক্সেনডেনকে পুরস্কৃত করেন। Forrest's State Papers (Bombay Series Letter rom the Surat Council.)

উপকুলতীরস্থ, সমুদ্রমুখী জমীর একাংশে দুর্গ নির্ম্মিত হইল। চন্দ্রগিরির রাজার নাম শ্রীরঙ্গ। জমী ইজারা দেওয়ার সময়—অন্যান্য স্বত্বের মধ্যে এই স্বত্ব রহিল, যে এই নবনির্ম্মিত বন্দরটীর নাম, তাঁহার নামানুসারে "শ্রীরঙ্গরাজ পত্তনম্" নাম হইবে। রাজা একখণ্ড স্বর্ণপত্রে খোদিত করিয়া, ইংরাজদিগকে জমীর পাট্টা প্রদান করিলেন। ১৭৪৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মীস্বরূপ,এই সোণার দানপত্রখানি সযত্নে রাখিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধকালে, দানপত্র খানি লুণ্ঠিত হয়, কিম্বা হারাইয়া যায়। ইহার পর, এইস্থান চিঙ্গুলপুরের নায়ক রাজার অধীনে আসে। নায়ক রাজা, ইংরাজদিগকে এই স্থানের "চিনাপত্তন" নামকরণ করিতে আদেশ করেন। এই চিনাপত্তনই বর্ত্তমান মান্দ্রাজ-নগরী। এখনও পর্য্যন্ত মান্দ্রাজের দেশীয় অধিবাসীরা, ইহাকে "চিনাপত্তনই" বলিয়া থাকে।

১৬৩৯ খৃঃ অব্দ, ইংরাজদের পক্ষে একটা স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরই ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রথম দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে, মান্দ্রাজে এজেন্টের পরিবর্ত্তে, একজন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

১৬৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজের আর কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৬৭২ খৃঃ অব্দে ইংরাজের মান্দ্রাজ-ফ্যাক্টরী একটা বিশেষ গণনীয় বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে। সুরাটের মত, মান্দ্রাজের ফ্যাক্টারিও ঐশ্বর্য্যপুর্ণ অবস্থায় উপনীত হয়। মান্দ্রাজের বাণিজ্য-কার্য্যালয়ে, এই সময়ে একজন গবর্ণর ও তাঁহার তিনজন সহকারী নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত রাইটার প্রভৃতি আরও অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত কর্ম্মচারিরা, সকলেই কোম্পানীর খরচায় বাসস্থান ও আহার্য্যাদি পাইতেন।

মান্দ্রাজের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর, প্রথম গবর্ণর স্যর উইলিয়ম ল্যাংহরণ। ইনি ১৬৭০খৃঃ অব্দ হইতে, সাত বৎসর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পরে ষ্ট্রিন্‌সাম্‌মাষ্টারস্ নামক এক ব্যক্তি, মান্দ্রাজের গবর্ণর পদে বরিত হন। তাহার পর ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে, আমরা মিঃ উইলিয়াম গিফোর্ডকে গবর্ণররূপে দেখিতে পাই।

উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে প্রমাণ হইতেছে, ইংরাজ কোম্পানীর অভ্যুদয়ের দিন, ক্রমাগতঃ ধীরগতিতে উন্নতির শিখরে উঠিতেছিল। সুরাট ও মান্দ্রাজে পর্টুগীজ আধিপত্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বে দুই একটা, সামান্য বাণিজ্য-স্বত্ব লাভের জন্য, মোগল-দরবারে ইংরাজকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে ও প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে, করমণ্ডল উপকূলে এখন তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন। তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য, তখন মান্দ্রাজ এবং বোম্বে-নগরীতে দুর্গ-নির্ম্মাণ করিয়াছেন।* মারহাট্টা ও মোগলদিগের আক্রমণ হইতে কোম্পানীর সম্পত্তি-রক্ষার জন্য, তাঁহারা প্রয়োজনমত সেনাদল রক্ষার বন্দোবস্তও করিয়াছেন। ধরিতে গেলে, এই ফ্যাক্টরী গুলি ইংরাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্য। এই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে, তাঁহারা একচ্ছত্র-সম্রাট আর ইংরাজ-প্রেসিডেণ্ট বা তাহাদের অধ্যক্ষ, সেই ক্ষুদ্র রাজ্যমধ্যে একটী ছোট খাট নবাব।

ভারতের পশ্চিমোপকূলে সুরাট ও বোম্বে, পূর্ব্বোপকূলে মান্দ্রাজ, এইকয়টী বিশিষ্ট স্থান পাইয়া, কোম্পানী ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করিতে লাগিলেন। এই ক্ষুদ্র নগরী বোম্বাই ও মান্দ্রাজ যে ইংরাজের ভবিষ্যৎ সাম্রা-

---

* মান্দ্রাজ প্রসঙ্গে বোম্বের কথাটাও একটু বলিয়া রাখা ভাল। কি করিয়া বোম্বাই ইংরাজের দখলে আসিল, তাহার একটু ইতিহাস আছে। তখন বোম্বে সমুদ্রতীরস্থ একটী ক্ষুদ্র বন্দর মাত্র। কিন্তু ইহা প্রকৃতির সমুদ্র ও শৈলবেষ্টিত স্বাভাবিক দুর্গ। সমুদ্রপথই ইংরাজের সহজগম্য। আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইলে, এই সমুদ্রই তাহাদের প্রধান সহায় হইবে। এইজন্য সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষেরা, বহুপূর্ব্ব হইতেই বোম্বের প্রতি লোলুপ-দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিলেন। রেভারেণ্ড এণ্ডারসন নামক একজন ইংরাজ পাদরীর, সেই সময়ের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি—"ইংরাজ ও দিনেমারগণ একযোগে কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া বোম্বাই আক্রমণের চেষ্টা করেন (১৬২৭)।"

একদিক হইতে বোম্বে আক্রমণ ও অন্য দিক হইতে লোহিতসমুদ্রের পথরোধ করিয়া পর্টুগীজ দিগের শক্তিলোপ করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু দিনেমার দিগের যুদ্ধ-জাহাজের অধ্যক্ষ Van Speultএর আকস্মিক মৃত্যুতে এই ব্যাপার অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহার ছাব্বিশ বৎসর পরে—আমরা দেখিতে পাই—ইংরাজেরা তখনও বোম্বাই দখলের চেষ্টা করিতেছেন। সেই সময়ে ইংলণ্ডে Common wealth বা সাধারণতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের প্রভাব। স্বনামখ্যাত ক্রমওয়েল তখন ইংলণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ ক্রমওয়েলকে বোম্বাইএর ব্যাপারে অনুরোধ করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। ১৬৬১ খৃঃঅব্দে পর্টুগালরাজকন্যা ইন্‌ফ্যাটা ক্যাথারিণার সহিত, ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লসের শুভোদ্বাহ হয়। ক্যাথারিণার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ, পর্টুগালাধিপ ইংলণ্ডেশ্বরকে বোম্বে অর্পণ করেন। এই দানস্বত্বে বলীয়ান হইয়া, ইংলণ্ডেশ্বরের আদেশে আরল অব মারলবরা ইংলণ্ড হইতে বোম্বে দখল করিতে আসেন। (১৬৬১ সেপ্টেম্বর) আরল মারলবরা বিলাত হইতে অত কষ্ট করিয়া আসিলেন বটে—কিন্তু পর্টুগীজগণ কোন মতেই তাহাদের সাধের বোম্বে ছাড়িতে চাহিল না। মারলবরা তাহাদের শক্তিবলে পরাজিত করিতে না পারিয়া, বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পর পাঁচবৎসরের চেষ্টায় ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সার জার্ভেস লুকাস নামক এক সাহসী সেনানীর চেষ্টায় পর্টুগীজেরা বোম্বাই পরিত্যাগ করে। ইংলণ্ডাধিপ যখন বুঝিলেন সুদূর ভারতে তাহার এই যৌতুকের সামান্য সম্পত্তিটুকু রক্ষার জন্য আয়ের অপেক্ষা চতুর্গুণ ব্যয় করিতে হইতেছে, তখন এরূপ সম্পত্তি রাখায় কোন লাভ নাই দেখিয়া, তিনি এক রাজকীয় সনন্দ দ্বারা ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বোম্বে অর্পণ করেন। কোম্পানীর সহিত স্বত্ব রহিল, তাঁহারা ইংলণ্ডের রাজসরকারে বার্ষিক দশপাউণ্ড করিয়া খাজনা দিবেন।

ন্সের দুইটী প্রেসিডেন্সি রূপে পরিণত হইবে, তাহাই বা কে জানিত? সুরাটের ইংরাজ কুঠীর প্রেসিডেণ্ট. দেশীয় লোকের চক্ষে একটী ছোট খাট নবাবের মত হইয়া উঠিলেন। তিনি কিরূপভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, রেভারেণ্ড এণ্ডারসন নামক একজন সমসাময়িক পাদরি, তাহার একটী কৌতুকময় ইতিবৃত্ত বলিয়া গিয়াছেন। এই পাদরী সাহেব বলেন—"সেকালের সুরাটের প্রেসিডেণ্ট একটী ক্ষুদ্র রাজার মত জীবনযাপন করিতেন। তিনি যখন রাজপথে বাহির হইতেন—তখন একজন পতাকা-বাহক, তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিত। তাঁহার অগ্র-পশ্চাতে ইংরাজ শরীররক্ষী। চল্লিশজন দেশীয় পদাতিক, তাঁহার পুরো-ভাগে থাকিত। যখন তিনি আহারে বসিতেন—চাকরেরা নানাবিধ খাবার লইয়া, তাঁহার খানার টেবিলে সাজাইয়া দিত। প্রত্যেকবার এক একরকম খাদ্য আনিবার সময়, বাহির হইতে বাদ্য বাজিয়া উঠিত। তাহাতে তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ বুঝিতেন, নূতন ধরণের খাদ্য আসিতেছে। একদল বেতন ভোগী বাদ্যকর এই খানার সময় বাজনা বাজাইত। যখন তিনি এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতেন, সেই সময়ে রূপার আশাসোটা লইয়া, চাকরেরা তাঁহার আগুপাছু যাইত। ফ্যাকটারি হইতে রাজপথে বাহির হইবার সময়, তিনি হয় পালকী, না হয় অশ্বপৃঠে যাত্রা করিতেন। কিম্বা দুইটী শ্বেতবর্ণ, বৃহৎকায় বলীবর্দ্দ-চালিত এক্কা, তাঁহার ভারবহন করিতে নিযুক্ত হইত। রূপার কাজকরা, চর্ম্মসজ্জায় সজ্জিত অশ্ব দুই চারিটা, এই দলের শোভাবৃদ্ধির জন্য বাহির হইত। তাঁহার মাথার উপর এক রেশমের ছত্র ধরা হইত।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টারদের কর্ণে, এই নবাবীর কথা পৌছিলে তাঁহারা বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ব্যবসা করিতে, ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের অধীনস্থ ভৃত্যেরা প্রভুর কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় করিয়া, যে এতটা নবাবী করিবে, তাহা তাঁহাদের সহ্য হইল না। বিলাতের ডিরেক্টারেরা, সুরাটের প্রেসিডেণ্টকে যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন—তাহার মর্ম্ম এই—"আমাদের এই কষ্টার্জ্জিত অর্থ, তোমরা যে বাবুয়ানী ও নবাবীতে অপব্যয় করিবে, তাহা আমাদের সহ্য হইবে না। যাহাতে ভবিষ্যতে এ সব আর না শুনিতে হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবে। সামান্য ব্যবসায়ী কোম্পা-নীর কর্ম্মচারী হইয়া, নবাবের মত এইরূপ জাঁকজমক যাহাতে আর না করিতে পার, তজ্জন্য আমরা তোমার বেতন বাৎসরিক তিনশত পাউণ্ড করিয়া দিলাম। এখন হইতে তোমাদের প্রেসিডেণ্ট নামও ঘুচিয়া গেল।

তোমরা ভারতীয় বাণিজ্যকেন্দ্রে ইংরাজ-কোম্পানীর "এজেণ্ট" বলিয়া আখ্যা লাভ করিলে।" বলাবাহুল্য—বিলাতের ডাইরেক্টারদের এই কঠোর আদেশে প্রেসিডেণ্ট সাহেব বিশেষ সায়েস্তা হইয়াছিলেন।

কি করিয়া এই ব্যবসায়ী ইংরাজ-কোম্পানী, বোম্বাই ও সুরাট প্রদেশে শক্তি-সঞ্চয় করেন, তাহা বুঝিতে হইলে, বোম্বাই ও সুরাটের কথা আরও একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ-কোম্পানী সামান্য ব্যবসায়ী হইতে কিরূপ শক্তি-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিরূপে ধীরে ধীরে ভগবানের বিধানে, তাঁহাদের নৌশক্তি ও সেনাশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিরূপে সেই সেনাশক্তির সহায়তায় তাঁহাদের শত্রুদের অধঃপতন হইয়াছিল, তাহা বুঝাইতে হইলে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজের অভ্যুদয়ের কথা একটু বিস্তারিত ভাবে বলিতেই হইবে।

অক্সেনডেনের পর, জেরাল্ড অঙ্গিয়ার বোম্বাই কুঠির অধ্যক্ষ হন। ধরিতে গেলে অঙ্গিয়ার হইতেই, বোম্বের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয়। অঙ্গিয়ার বোম্বাই কুঠীর অধ্যক্ষতা লাভ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ইংরাজের অবস্থা তথায় আদৌ নিরাপদ নহে। মালাবার উপকূলে, জলদস্যুরা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সমুদ্রে দিনেমারগণ বলসঞ্চয় করিতেছে, বোম্বের আশপাশে, জলদস্যুদিগের আক্রমণ হইতে বোম্বাইকে রক্ষা করিবার জন্য, অঙ্গিয়ার সমুদ্রকূলে প্রকাণ্ড দুর্গ-প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। ইহাই পরে "মার্টেলো-টাউয়ার" বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। দুর্গনির্ম্মাণ কার্য্যে তাঁহাকে অনেক বাধা-বিঘ্ন পাইতে হইয়াছিল। বিলাতের ডাইরেকটারগণ, প্রথমে ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু অঙ্গিয়ার নিজের উদ্ভাবনী শক্তিবলে, বোম্বাইনগরীতে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ-প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানীর খাসদখলে, যে সমস্ত হিন্দু-মুসলমান প্রজা বাস করিত, তাহাদের মধ্যে বাছা বাছা লোক লইয়া, তিনি এক ক্ষুদ্র সেনাদল (militia) গঠন করেন। ব্রাহ্মণ ও বেনিয়ারা বাৎসরিক কিছু "তন্খা" বা বৃত্তি-দানে বন্দুক ঘাড়ে করার দায় হইতে নিস্কৃতি পাইল। বোম্বের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীবর্গকে এইভাবে সৈনিকরূপে গ্রহণ করিয়া, অঙ্গিয়ার ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে ছয়শত প্রজাসৈন্য, চারিশত ইউরোপীয় সেনা ও চল্লিশজন সেনানায়ক সমেত একটী ক্ষুদ্র সেনাদল সৃষ্টি করেন। রাজপুতগণকে লইয়া আর একটী সেনাদল গঠনের বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে, কিন্তু উপযুক্ত সুযোগাভাবে তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

১৬৭৩ খৃঃ অব্দে, শিবাজী আবার সুরাট আক্রমণ করেন। এই ব্যাপারে অঙ্গিয়ারের নবগঠিত সেনাদলের শক্তি-পরীক্ষা হয়।* বলা বাহুল্য, শিবাজীকে এই যুদ্ধে হারিয়া যাইতে হয়। ইহার পর দিনেমার আড্‌মিরাল ভানগোয়েন, বোম্বাইয়ের উপকূলদেশে, ইংরাজের বাণিজ্য-জাহাজের প্রধান আশ্রয়স্থল, Swally Marine নামক বন্দরাংশ আক্রমণ করেন। বলা বাহুল্য, ডচ্‌-এড্‌মিরালকে অঙ্গিয়ারের তোপের মুখে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

ইংরেজ সমর-শক্তির যশঃপ্রভা এইরূপে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মোগল-শাসনকর্ত্তারাও বুঝিলেন, ইংরেজ-বণিক উপেক্ষার যোগ্য নহে। অঙ্গিয়ার, সুরাটের অরক্ষিত অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, সুরাটের ন্যায় অরক্ষিত স্থান কোন ক্রমেই ইংরাজের পক্ষে সুবিধাকর নহে। দিনেমার, পর্টুগীজ, মারহাট্টা, মোগল, সবই ইংরাজের শত্রু। অঙ্গিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বোম্বের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কোম্পানির সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে, নিরাপদে থাকিতে হইলে,সমুদ্র-মেখলা বোম্বাই তাহার উপযুক্ত স্থান। তিনি সুরাটের উপর আর তত মনোযোগ না করিয়া, বোম্বাইয়ের উন্নতিকল্পে মনোযোগ দিলেন। কলিকাতাও যেমন প্রথম অবস্থায় জঙ্গল ও বাদাভূমি পূর্ণ ছিল, বোম্বের অবস্থাও সেই সময় তদ্রূপ। তিনি নানাস্থানের জঙ্গল কাটাইয়া, খাত ভূমিগুলি ভরাট করিয়া, বোম্বাইকে একটী ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত করিলেন।

বোম্বে ইংরাজের খাস সম্পত্তি। সুরাট, মোগলদের রাজত্বের সীমার মধ্যে। ইংরাজের ন্যায়, ব্যবসায়ী ধনী প্রজা, সুরাট ত্যাগ করিলে সরকারী রাজস্বের বিশেষ ক্ষতি। ইহা ভাবিয়া,তৎকালীন মোগল সুবাদার, অঙ্গিয়ারকে বলিয়া পাঠাইলেন—"যদি ইংরাজেরা সুরাট ত্যাগ করেন, তাহা হইলে এতজ্জন্য সরকারী রাজস্বের যে ক্ষতি হইবে, তাহা তাঁহারা বার্ষিক মূদ্রা দানে পুরণ করিতে বাধ্য।" সাহসী অঙ্গিয়ার বলিয়া পাঠাইলেন, "ইংরাজ স্বাধীন বনিক। কাহারও গোলাম বা কয়েদী নহেন। সুবাদারের এ আদেশ তিনি মান্য করিতে বাধ্য নহেন।" সুবাদার সাহেব তাঁহার জেদ বজায় রাখিবার জন্য, ইংরেজদিগকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, দুইহাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। অঙ্গিয়ার সম্রাটকে এই ব্যাপার জানাইবেন

* "এই নবসংগৃহীত ইউরোপীয় সেনাদলে, ইংরাজ ব্যতীত পাঠান, পর্টুগীজ প্রভৃতিও ছিল। লণ্ডন সহরের জেল-ফেরত আসামী, দুর্দ্দান্ত বদমায়েসও যে এই দলে ছিলনা, তাহা নয়। টুপীওয়ালা বলিয়া, ইহাদিগকে লোকে "টোপাস" সৈন্য বলিত।

বলিয়া ভয় দেখাইলে, মোগল-সুবাদার—ইংরাজদের আর কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিলেন না।

অঙ্গিয়ার বোম্বের মধ্যে একটী টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্র বোম্বেবাসী হিন্দু মুসলমান ও পর্টুগীজ তাঁহাদের প্রজা। বোম্বাই তখন ইংরাজের খাস-জমিদারী। ইংলণ্ডের সম্রাটের বিবাহ-প্রাপ্ত যৌতুক। কাজেই ইংরাজের এই টাঁকশাল স্থাপন সম্বন্ধে, মোগলপক্ষ কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিলেন না। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লসও, এসম্বন্ধে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অনুমতি দান করিলেন। ধরিতে গেলে, ইহাই ভারতে ইংরাজের প্রথম টাঁকশাল। *

ইংরাজের অঙ্কিত মুদ্রাগুলি, ভারতের পশ্চিম উপকূলে খুব বেশী ভাবে চলিতে লাগিল। টাকাগুলির ওজন খাঁটী এবং খাদও কম, কাজেই ব্যবসায়ীরা ইংরাজের সহিত এই মুদ্রার বিনিময়েই দ্রব্যাদির আদান প্রদান করিতে লাগিল। "সাহী" মুদ্রার একদিকে, পারশী লেখা ছিল বলিয়া, মোগল-সুবাদার এজন্য একটু আপত্তি করিয়া বসিলেন। কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না।

অঙ্গিয়ারের যতই দোষ থাকুক না কেন, তিনি সেই প্রাচীন কালের ইংরাজের আদর্শ ছিলেন। ধরিতে গেলে, তিনি রাজবুদ্ধি লইয়া জন্মিয়া ছিলেন। হিন্দু মুসলমান প্রজার প্রতি, তিনি অতিশয় সমবেদনা পূর্ণ ছিলেন। তাঁহার সম-সাময়িক বৃত্তান্ত হইতে, আমরা তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা গুলি তুলিয়া দিলাম। "অঙ্গিয়ার একজন রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তিনি দেশীয় প্রজাবর্গের প্রধানগণকে একত্রিত করিবার জন্য, একটী সমিতি সংগঠন করেন। পর্টুগীজদিগের আমলে, প্রজারা জমীর উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ কর স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হইত। অঙ্গিয়ার বাৎসরিক একটী টাকা বৃত্তি লইয়া, প্রজাকে এই করভার হইতে মুক্ত করেন। যাহাতে প্রজাগণ, কৃষকগণ, তাহাদের পরিশ্রমের ফল পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারে, ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের সম্বন্ধে বেশী লাভবান হইতে পারে, তিনি তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন। যাহাতে

* বোম্বে টাঁকশালে নিম্ন লিখিত মুদ্রাগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল।

(১) জেরাফিন্—মূল্য ১ শিলিং ৮ পেন্স
(২) পারসী সাহী „ ৪ শিলিং (কাসগারের সহিত বাণিজ্য জন্য)
(৩) প্যাগডা „ ৯ শিলিং (কালিকটের সহিত বাণিজ্য জন্য)

লাগিল, কিন্তু মোগল-বাদসাহ ঔরঙ্গজেব, দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে ব্যস্ত এবং স্থানীয় মোগল শাসনকর্ত্তারাও শক্তিহীন—কাজেই তাঁহাদের কেহই প্রজাদের রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন না। কিন্তু এই মহাপ্রাণ ইংরাজ অঙ্গিয়ারের চেষ্টায়, জল-দস্যুদের উপদ্রব কমিয়া গেল। ইংরাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরিগুলি, কামান লইয়া, ক্রমাগতঃ ভারতের পশ্চিমোপকূলে পাহারা দিতে লাগিল। ইহাতে জলদস্যুদের উপদ্রব অনেকটা প্রশান্ত হয়। ইহার পর ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ক্লাইভ্, এই দস্যুকুলকে সমূলে নির্ম্মল করেন।

এখন ইংরাজের শত্রু রহিল—কেবল মারহাট্টাগণ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অঙ্গিয়ার মনে মনে স্থির করিলেন, যে উপায়েই হউক, মহারাষ্ট্রীয়গণকে হাত করিতেই হইবে। তাহা না করিলে, ভারতের পশ্চিমোপকূলে ইংরাজের বাণিজ্য আদৌ নিরাপদ নহে। আবার অন্যপক্ষে, মহাবীর শিবাজীও ভাবিলেন "এই রণকৌশল-সম্পন্ন, সাহসী ইংরাজগণের সহিত শত্রুতা রাখা, কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। ঔরঙ্গজেব বিপুল-বাহিনী লইয়া, দাক্ষিণাত্যে আসিতেছেন। মহারাষ্ট্র-ভূমে প্রবেশের অন্য পথগুলি শিবাজী নিজের আয়ত্বে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বোম্বায়ের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই।" শিবাজী ভাবিলেন—মোগলসম্রাট, ইংরাজদিগকে হস্তগত করিয়া, অনায়াসে বোম্বায়ের মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে পারেন।

ইংরাজদের বীরত্বের পরিচয়ও তিনি দুইবার পাইয়াছেন। অক্সেনডেন ও অঙ্গিয়ার ১৬৬২ ও ১৬৭০ খৃঃ অব্দে, মারহাট্টা আক্রমণকে কিরূপে ব্যর্থ করিয়াছিলেন, তাহাও যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে। শিবাজীরও তিনখানি যুদ্ধ-জাহাজ ও পঁচাশী খানী সমুদ্রগামী নৌকা ছিল। কিন্তু ইংরাজ যুদ্ধ-জাহাজের তুলনায়, তাঁহার নৌ-শক্তি অতি হীন। তিনি পশ্চিমোপকূলের বন্দরগুলি দখলে রাখিয়া, মোগল-বাদসাহকে জব্দ করিতে ইচ্ছুক। এসব করিতে হইলে,ইংরাজদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিতেই হইবে।

কিন্তু মানের কান্নার দায়ে, শিবাজী এক মহা সমস্যায় পড়িলেন। উপযাচক হইয়া,তিনি ইংরাজদিগকে সন্ধির জন্য অনুরোধ করিতে পারেন না। যিনি অক্ষৌহিণী বাহিনীর নায়ক, মহাশক্তিমান মোগল-সম্রাট যাঁহার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত ও অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি কোন্ মুখে ইংরাজকে বলিবেন, "ওগো! তোমরা আমার সহিত সন্ধি কর—আমি তোমাদিগকে চাই।" এদিকে অঙ্গিয়ারও শিবাজীর ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণরূপে সশঙ্কিত চিত্তে সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিতেন।

শিবাজী আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য, ইংরাজের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র, হুবলী আক্রমণ করিলেন। হুবলী—ধারওয়ার বিভাগের কার্পাস-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। এই কার্পাস, তখন ইংরাজের প্রধান বাণিজ্য। শিবাজী সহসা ভীমবেগে আক্রমণ করিয়া, ধারওয়ার পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিলেন। অতর্কিত রূপে, হুবলী লুণ্ঠিত হওয়ায়, অঙ্গিয়ার কোনরূপ বাধা প্রধান করিতে না পারিয়া শিবাজীকে অর্থপ্রদানে এই বিগ্রহ ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিলেন।

মহাশক্তিমান শিবাজীর, নৌবিভাগে তিনখানি বড়জাহাজ ও ৮৫ খানি, সুবৃহৎ দাঁড়ওয়ালা নৌকা ছিল। তুলনার সমালোচনায়, শিবাজী বুঝিলেন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তুলনায়, তাঁহার নৌশক্তি তত প্রবল নহে। বোম্বে বন্দর তাঁহার চক্ষে যেন কণ্টকবৎ প্রতীয়মান হইল। এই বোম্বাই, ইংরাজের দখলে। তাঁহার প্রধান শত্রু, মোগল-বাদসাহ ইংরাজদিগকে হস্তগত করিতে পারিলে, অনায়াসে বোম্বাই বন্দর সাহায্যে, মহারাষ্ট্র-রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপ স্থলে ইংরাজপক্ষের সহায়তা, তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। দুইটী প্রবল শত্রুর সৃষ্টি না করিয়া, একটী রাখাই কর্ত্তব্য।

হুবলী লুণ্ঠনের পর, ইংরাজদের সহিত শিবাজীর একটা মৌখিক সন্ধি হইল; ইহার পর ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে শিবাজী মহাসমারোহে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। *

এই অভিষেক সময়ে, প্রকাশ্যভাবে মোগল-সম্রাটের ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া, শিবাজী আপনাকে মহারাষ্ট্র-ভূমের, স্বাধীন ভূপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। এই অভিষেক উপলক্ষে, একটী বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। বোম্বের ডেপুটী-গবর্ণরও এই উৎসব উপলক্ষে, শিবাজী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। অভিষেকোৎসব শেষ হইয়া গেলে, শিবাজী ইংরাজদের সহিত এই সর্ত্তে সন্ধি করেন, যে তাঁহারা ভারতের পশ্চিমোপকূলের সকল স্থানেই ফ্যাক্টারী বা বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করিতে পারিবেন। কেবলমাত্র তাঁহাদিগের শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা হিসাবে আমদানী-শুল্ক দিতে হইবে। ইংরাজেরা মহারাষ্ট্র রাজ্য মধ্যে প্রচলিত,বাজার দরে সমস্ত জিনিসপত্র কিনিতে পাইবেন। তাঁহাদিগকে কোনরূপ কষ্টম বা শুল্ক দিতে হইবে না। †

* India under the Restoration P. 223.

† Treaty Signed on 4th April 1674 Summerised by Sir W. Hunter from Fryer, Grant Duff and Rev. Anderson.

নিম্নে আমরা শিবাজীর অভিষেক উৎসব ও ইংরাজের সহিত সন্ধি-ব্যাপারের একটী বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি। ইংরাজ দূত ফ্রায়ার সাহেব, যখন মহারাষ্ট্র-পতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সে সময়ে তাঁহার যশঃসূর্য্যের তীব্র কিরণরাশি, উজ্জ্বলভাবে কঙ্কণের পার্ব্বত্য প্রদেশ ও রায়গড়ের মেঘমণ্ডিত গিরিশিখরে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইতেছিল। ঔরঙ্গজেবকে কয়েকটী যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া, শিবাজী সেই সময়ে রাজোপাধি ধারণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

রাজ্যের চারিদিকে আনন্দকোলাহল। দৃঢ়কায় মহারাষ্ট্রীয়গণ, নানাবিধ অভিষেকোপযোগী দ্রব্যাদি লইয়া রায়গড়ে উঠিতেছে। যোদ্ধারা নূতনসাজে ভূষিত হইয়া, দুর্গাধিপের জয়ঘোষণার নিমিত্ত, পর্ব্বতের চারিদিকে শিবির স্থাপন করিয়াছে। শিবাজীর অধীনস্থ পেশোয়া, ভোঁসলা ও অন্যান্য সামন্তবর্গের পরিবারেরা, উৎসব দেখিবার জন্য রায়গড়ের উপত্যকা ধীরে ধীরে অতিক্রম করিতেছেন; দুর্গপ্রাকার হইতে শিবাজীর বিজয়নিশানের পৎপৎ শব্দ, মহারাষ্ট্র সৈনিকের "হর হর মহাদেও" শব্দের সহিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এহেন মঙ্গলময় উৎসব সময়ে, ইংরাজদূত ডাক্তার ফ্রায়ার রায়গড়ের নিম্নস্থ "পঞ্চারা" নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হইলেন।

তিনি "পঞ্চারা" হইতেই শুনিলেন, যে নূতন মহারাজ শিবাজী কোন অদূরবর্ত্তী তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছেন; এবং দুই এক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া রাজোপাধি গ্রহণ করিবেন। নারায়ণ পণ্ডিত নামক শিবাজীর অন্যতম বিশ্বস্ত অমাত্যের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। তিনি সর্ব্বাগ্রে নারায়ণজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও এক বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া, তাঁহার সহায়তালাভের পথ আরও সুগম করিয়া লইলেন।

অত্যন্ত গ্রীষ্মাধিক্য হেতু, পঞ্চারাতে অবস্থান করা ইংরাজ-দূতের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তিনি পাহাড়ের উপর উঠিবার জন্য, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শিবাজী প্রতাপগড় হইতে "বায়রীতে" ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াও নারায়ণজীর সহায়তায়, পাহাড়ে উঠিবার অনুমতি লাভ করিয়া, ইংরাজদূত রাজদর্শনে চলিলেন।

"বায়রী" বা "রায়গড়" পার্ব্বত্য-দুর্গ। নিম্নে পাষাণবক্ষ দৃঢ়কায় পাহাড়। এ পর্ব্বত-প্রাচীর দুর্ভেদ্য, অজেয়। উপরে নীচে, আশে পাশে, উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে, নানাবিধ দীর্ঘবিস্তৃত, স্বল্পায়ত, শ্যামল তরুরাজিপূর্ণ

বন-প্রদেশ। প্রকৃতির সহায়তায়, এই পার্ব্বত্য-দুর্গ চারিদিক হইতেই অজেয়। অন্তঃশত্রুর বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন, ইহার পরহস্তগত হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

কয়েকটী পার্ব্বত্যপথ বহুকষ্টে অতিবাহিত করিলেই, রায়গড়ের ক্ষুদ্র সহর। অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্যাদি অপেক্ষা, অস্ত্রশস্ত্রেই রায়গড়ের বিশেষ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ। রমণীর কলকণ্ঠ সেখানে সর্ব্বদা শোনা যাইত না। কেবল অশ্বের হ্রেষারব, সৈনিকের অস্ত্র-ঝঞ্চনা ও কঠোর বাহ্বাস্ফোট, গম্ভীর কণ্ঠস্বর "হর হর মহাদেও" শব্দে, সেইস্থান প্রতিধ্বনিত ও শব্দাকুলিত। মেঘের কোলে অবস্থিত রায়গড়ে তখন তিন শতের অধিক আবাসবাটী ছিল না।

ডাক্তার ফ্রায়ার পাহাড়ে উঠিয়া, চারি দিন রায়গড়ে বিশ্রাম করিলেন। তাঁহার পরম সুহৃদ্ নারায়ণজী পণ্ডিত, তাঁহাকে দরবারে অভিষেক দেখিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন প্রভাতের প্রথম বিকাশ-কালে তিনি বহুমূল্য উপহার দ্রব্যের সহিত দলবল লইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিলেন।

রায়গড়ের পার্ব্বত্য-বারদোয়ারী জনতা পরিপূর্ণ। শিবাজী রত্নময় সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যুন্নত আসনে বসিয়া তাঁহার বংশধর শম্ভুজী ও মন্ত্রিবর পেশওয়া মোরো পণ্ডিত। সেনাধ্যক্ষ ও সেনানায়কেরা অস্ত্রশস্ত্রের উজ্জ্বলতার মধ্যে নির্ব্বাকভাবে সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। সভার উপরে, আশে পাশে, হর্ম্ম্যভিত্তিতে, স্তম্ভগাত্রে নানাবিধ সুবাসিত ফুলমালা, বহুবিধ কঠোর ক্ষুরধার শাণিত কৃপাণের মধ্যে শোভিত হইয়া, বিভীষিকাময় কঠোর—কোমল দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। সহসা রণভেরী বাজিয়া উঠিয়া সভারম্ভ ঘোষণা করিয়া দিল।

সর্ব্বপ্রথমে বেদগান ও ঈশ্বরের স্তুতিপাঠ করিয়া, ব্রাহ্মণেরা শস্য ও দুর্ব্বার দ্বারা, নবীন মহারাজের জয়োচ্চারণ করতঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্তুতিপাঠকেরা গুরুগম্ভীরকণ্ঠে,তাঁহার বীরত্ব কাহিনী গান করিল। প্রথম মাঙ্গলিক ব্যাপার শেষ হইলে,নারায়ণজী ইংরাজদূতকে মহারাষ্ট্রপতির সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

প্রথামত "সেলাম" করিয়া, ডাক্তার ফ্রায়ার নবীন মহারাজের সম্মুখে বহুবিধ বহুমূল্য উপহারদ্রব্য-সম্ভার স্থাপিত করিলেন। শিবাজী সহাস্য আস্যে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, ইংরাজদূতকে সিংহাসনের নিকটস্থ হইতে বলিলেন। দুই চারিটী বিষয়ে দ্বিভাষীর সাহায্যে সামান্যরূপ কথোপকথনের পর, দূতবর সে দিনের মত বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

শিবজী, অভিষেকের পূর্ব্বদিনেই সন্ধির সত্ত্বাদির এক খসড়া করিতে স্বীয় পেশওয়া মোরোজী পণ্ডিতকে অনুমতি দিয়াছিলেন। অভিষেকের পরদিন তাঁহার "তুলা" হইবার দিন।

অষ্টবিধ শস্য, ঘৃত, কৌষেয় বস্ত্র, চন্দনকাষ্ঠ, গন্ধদ্রব্য ও স্বর্ণমুদ্রায় মহারাষ্ট্রের প্রভাতসূর্য্যস্বরূপ, বীরকেশরী শিবজী, দ্বাদশবার তৌলিত হইলেন এবং তুলা-সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্যাদি—কঙ্কণ, মহারাষ্ট্র ও পুনার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরিত হইল। ডাক্তার সাহেব বলেন, এই শুভদিনে বিতরিত স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ দুই লক্ষ যাট হাজার।

ইহার কয়েকদিন পরে, নারায়ণ পণ্ডিতের সহায়তায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া, শিবজীর শীলমোহর সংযুক্ত হইল। তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী স্বত্ব ছিল ;—

১। ইংরাজ বণিকগণ মহারাষ্ট্রপতির রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে, সকল স্থানে অবাধ বাণিজ্য করিতে স্বত্ববান হইলেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল ভূভাগ মহারাজের নূতন অধিকার ভুক্ত হইবে, তাহাতেও বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা, তাঁহার বিবেচনাধীন হইয়া রহিল।

২। ইংরাজের স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা, কঙ্কণে এবং মহারাষ্ট্র-রাজ্যের মুদ্রা, পুনা ও বোম্বাইয়ে চলিবে। এ সম্বন্ধে প্রকাশ থাকে যে, ইংরাজের মুদ্রাগুলি অবশ্য বাদসাহী মুদ্রার ন্যায় নিখাদ ও বিশুদ্ধ হওয়া চাই।

৩। ইংরাজের বাণিজ্যপোত যাহাতে তাঁহার অধিকৃত বন্দর সমূহে নিরাপদে থাকে, তাহার আদেশপত্র প্রচারিত হইবে। অন্যান্য বিদেশীয় জাতির সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম আছে, সেই নিয়মানুসারে ঝটিকা-তাড়িত বা সমুদ্র-মগ্ন ভগ্ন জাহাজ মালামাল সহিত, কঙ্কণের চির প্রচলিত প্রথানুসারে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

এতদ্ব্যতীত, ইহাতে আরও কয়েকটী সামান্য স্বত্ব রহিল। তৎপরে শিবজী তাহাতে নিজের মোহর সংযুক্ত করিয়াদিলেন, এবং তাঁহার পেশওয়া ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন।*

শিবাজী ইংরাজদের সহিত এইরূপ স্বত্বে সন্ধি করিয়া,তাহাদিগকে হস্তগত করিলেন। শিবাজীর মনে এরূপ একটা ধারণা ছিল—যে তিনি একদিন ঔরঙ্গজেবের শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিবেন। মোগল তাঁহার প্রবল শত্রু। এরূপ সময়ে বৃথা শত্রুসংখ্যা

* মৎপ্রণীত প্রবন্ধ "শিবজীর দরবারে ইংরাজদূত"। (সাহিত্য—১৩০০)

বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়া, শিবাজী, ঔরঙ্গজেবের উপর এইরূপ একটি নূতন চাল চালিলেন।

অঙ্গিয়ারের সময়ে, ভারতের পশ্চিমপোকূলে বোম্বে একটী প্রধান বন্দর হইয়া উঠে। পর্টুগীজদের আমলে, বোম্বের অধিবাসী সংখ্যা দশহাজার ছিল। অঙ্গিরায়ের আমলে, বোম্বের লোকসংখ্যা ৬০ হাজারে দাঁড়ায়। পূর্ব্বে বোম্বে বন্দরের রাজস্ব ছিল ২৮২৩ পাউণ্ড। অঙ্গিয়ারের সময়ে, তাহা ৯২৫৪ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। বোম্বের এই অসম্ভব উন্নতি, মোগল-সম্রাট ও মহারাষ্ট্র পতি শিবাজী, উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

শিবাজীর সহিত ইংরাজের এ আত্মীয়তা, দাক্ষিণাত্য উপকুলের মোগল রাজকর্ম্মচারীদের বড় ভাল লাগিল না। শিবাজী যে ইংরাজদিগকে অবাধে বাণিজ্য-সত্বাদি দানে হস্তগত করিয়াছেন, তাহার প্রতিকারের কোন উপায়ই নাই। মোগল-শাসনকর্ত্তারা নানা দিক হইতেই ব্যতিব্যস্ত। ভারতের পশ্চিমোপকুলে ইংরাজের ও শিবাজীর নৌ-বাহিনী একত্র সন্মিলিত। মালাবার উপকুলে, সিদ্দিজাতীয় আরব-জলদস্যুদের প্রভাব দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত। এই সিদ্দিগণ, এতদূর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল, যে প্রয়োজন হইলে, তাহারা দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মুসলমান প্রদেশাধিপতিদের সেনা প্রদানে সাহায্য করিত। এমন কি, মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবও কোন কোন সময়ে, এই ভীষণ জলদস্যুদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ১৬৭২খৃঃ অব্দে এই সিদ্দি দস্যুগণ, বোম্বাই উপকুলে নামিয়া, মহারাষ্ট্র রাজ্য লুণ্ঠনের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। কিন্তু অঙ্গিয়ার ঘৃণার সহিত তাহাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। ইহাতে সিদ্দিরা ক্রুদ্ধ হইয়া, নানা উপায়ে অঙ্গিয়ারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু তিনি অসীম সাহসের সহিত তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই প্রতিযোগীতা করিতে লাগিলেন। শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব, কেহই ইংরাজ বণিকদের এই কার্য্য-প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হয়েন নাই। অঙ্গিয়ারের চেষ্টায়, বোম্বাই সেই সময়ে—দেশীয় অধিবাসীদের চক্ষে, বিপন্নের আশ্রয় স্থান বলিয়া বোধ হইল। হিন্দু মুসলমান অধিবাসী, বিশেষতঃ হিন্দু বেনিয়া ও আরমাণী ব্যবসায়ীরা, বোম্বের নিরাপদ অবস্থা অনুভব করিয়া, তথায় বসবাস করিতে লাগিল। অঙ্গিয়ারের চেষ্টাতেই ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই, তৎকালে ভারতের পশ্চিমোপকুলে এক সুরক্ষিত বন্দররূপে পরিণত হয়। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দের ৩০ জুন তারিখে,সুরাটে অঙ্গিয়ার দেহত্যাগ করেন।

জব চার্ণকের নাম, যদি কলিকাতা প্রতিষ্ঠার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত

থাকিতে পারে, তাহা হইলে বোম্বের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির সহিত, অঙ্গিয়ারের নাম কখনই বিচ্ছিন্ন হইবে না। বোম্বে ও মান্দ্রাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা দেখানই আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে সবিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে গেলে, একখানি সুবৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। মোটের উপর কথা হইতেছে এই যে—এই মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে, প্রথমে ইংরাজের সামান্য বাণিজ্য-কুঠী স্থাপিত হয়। তৎপরে ইংরাজেরা তথায় দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অঙ্গিয়ার, সার জন চাইলড্ প্রভৃতি কোম্পানীর সাহসী ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের চেষ্টায়, বোম্বায়ে ইংরাজ কোম্পানীর নৌ-সেনাবল প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবাজীর ও ঔরঙ্গজেবের মহাসমরের ফলে, যখন দাক্ষিণাত্যে মহাবিপ্লবের ও অরাজকতার সুচনা হয়—সেই সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর মনীষি কর্ম্মচারীগণ, তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর পরামর্শে, ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লয়েন।
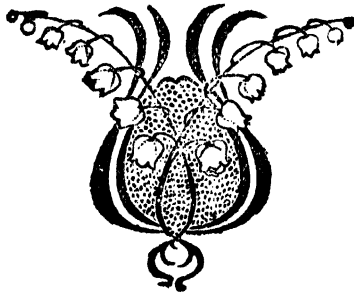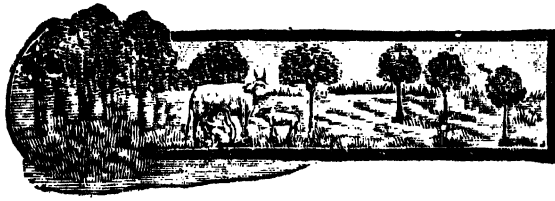
ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইংরাজের বঙ্গে আগমন।

বঙ্গে পর্টুগীজ প্রভাব—ইংরাজদের সহিত পর্টুগীজগণের বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রতিযোগীতা—তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের অবস্থা—সপ্তগ্রামের বাণিজ্য বিস্তার—সিজার ফ্রেডরিক প্রভৃতির লিখিত সপ্তগ্রামের বিবরণ—পর্টুগীজ বণিকদের ভারতে আগমন—ভাস্কো-ডি-গামার ভারতে আগমন—ভারতে পর্টুগীজ বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাত—আবুকার্ক—আকবরের রাজ সভায়—পর্টুগীজদের প্রতিপত্তি—পর্টুগীজদের প্রথম বঙ্গে আগমন—হুগলীর সান্নিধ্যে ব্যাণ্ডেলে বাণিজ্য কুঠী স্থাপন—হুগলীতে পর্টুগীজ বাণিজ্য—হুগলীর অভ্যুদয় ও সপ্তগ্রামের অধঃপতন—হুগলীতে পর্টুগীজগণ কর্ত্তৃক দুর্গ নির্ম্মাণ—চট্টগ্রাম উপকূলে পর্টুগীজ প্রভাব—পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে পর্টুগীজ বোম্বেটেদিগের প্রভাব—আকবর কর্ত্তৃক পর্টুগীজ প্রভাব দমন চেষ্টা—ইসলাম খাঁর সাফল্য—জাহাঙ্গীরের আমলে কাশেম খাঁ কর্ত্তৃক পর্টুগীজ দমন—ইব্রাহিম খাঁর আমলে বঙ্গে পর্টুগীজদের অবস্থা—সাহজাদা খুরমের (পরে সাহজাহান) পিতৃদ্রোহিতা—বিদ্রোহীরূপে তাঁহার বঙ্গদেশে পলায়ন—বর্দ্ধমানে অবস্থান—পর্টুগীজ গবর্ণর রডারিকের নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা—সম্রাট সৈন্যের হস্তে সাহজাহানের পরাজয়—জাহাঙ্গীরের মৃত্যু—সাহজাহানের সিংহাসনাধিরোহণ—পর্টুগীজদের উচ্ছেদ সাধন জন্য কাশেম খাঁর বাঙ্গালায় আগমন—আল্লাইয়ার খাঁ ও খাজাসের প্রভৃতি মোগল-সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক হুগলী অবরোধ—সার্দ্ধ তিনমাস ব্যাপী যুদ্ধের পর পর্টুগীজদের অধঃপতন—সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে বন্দর স্থাপন—পর্টুগীজগণের অধঃপতনের সহিত ইংরাজের অভ্যুদয়।

এই ভারতে, বাণিজ্য ব্যাপারে ইংরাজের প্রধান ও প্রথম প্রতিদ্বন্দী ছিল—পর্টুগীজ। পরে ফরাসীরা কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল বটে—কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে মহাশক্তিবান পর্টুগীজগণ, ইংরাজের বাণিজ্য ব্যবসা ও প্রতিপত্তি ধ্বংশের জন্য বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিল। বোম্বাই উপকুল হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই, তাহারা ইংরাজদিগের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী, ইংরাজের প্রতি প্রসন্ন—এইজন্য পর্টুগীজগণই ধ্বংশ হইল। পর্টুগীজ-ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গেই, ইংরাজের উন্নতির সূচনা। তাহা না হইলে আজ আমরা ইংরাজ-রাজত্বের সুখসমৃদ্ধি ভোগে অধিকারী হইতে পারিতাম না।

এই পর্টুগীজ জাতি, বঙ্গদেশে কিরূপভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিয়া, কিরূপে একটী ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল, বঙ্গের সমুদ্রোপকূলে জলদস্যুরূপে, লুণ্ঠনাদি করিয়া, কিরূপে বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল—এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তবে পাঠক এইটুকু মনে রাখিবেন, প্রথমে পর্টুগীজেরা বঙ্গদেশের বন্দরে বাণিজ্য করিবার জন্যই আসে। তৎপরে যখন তাহারা দেখিল, বাণিজ্যের অপেক্ষা লুণ্ঠনে বেশী অর্থাগম হয়, তখন তাহারা চট্টগ্রাম উপকূলে জাঁকিয়া বসিল। চট্টগ্রাম প্রদেশের আশে পাশে, প্রচণ্ড নৌ-সেনাবল লইয়া, ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। যে মালাবার উপকূলের গোয়া প্রদেশে, তাহারা প্রথম বাণিজ্য করিতে আসে, তাহার কথা ভুলিল। এই সময়ে বঙ্গে পর্টুগীজগণের প্রভাব প্রতিপত্তি এত বেশী, যে, কার্ভালো রডা, গঞ্জালিস প্রভৃতি পর্টুগীজ জলদস্যুনায়কগণ, প্রতাপাদিত্য, রাজা কেদাররায় প্রভৃতির অধীনে সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিয়া, মোগলদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিত। আকবরের আমলে, পর্টুগীজদের অত্যাচার এত ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল, যে তাহাদের নাম শুনিলে, লোকে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত।

ষোড়শ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম, বঙ্গের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। চট্টগ্রাম প্রদেশের উপকূলে, বাণিজ্য জাহাজাদির যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল—বলিয়া, পর্টুগীজেরা চট্টগ্রামকে "পোর্টগ্রাণ্ডী" বা বৃহৎ স্বর্গ এবং সপ্তগ্রামের বন্দরকে "পোর্ট-পিকোনো" বা ক্ষুদ্র স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করিত। যে সপ্তগ্রাম পার্শ্ববাহিনী স্বরস্বতী, কালধর্ম্মে এখন ক্ষীণকায়া ও বিরল সলিলা হইয়া পড়িয়াছেন—তিনশত বৎসর পূর্ব্বে, তাহার এ অবস্থা ছিলনা। সেই সময়ে সুবৃহৎ বাণিজ্য-পোতসমূহ, অগণিত বাণিজ্য দ্রব্য-সম্ভার লইয়া মৃদু বায়ুভরে হেলিতে দুলিতে, সপ্তগ্রামে উপনীত হইত। সপ্তগ্রামের হাট বাজার, চত্বর গঞ্জ, কমলার ক্রীড়া-কানন-ভূমিরূপে বিরাজিত ছিল। আকবরসাহের সময়ে এই চট্টগ্রাম একটী প্রধান সরকাররূপে পরিগণিত হইত। বস্তুতঃ সে সময়ে এরূপ বাণিজ্য-দ্রব্য-পূর্ণ বন্দর, জনপূর্ণ সহর, বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। মোগল-রাজশক্তির বিরুদ্ধে, যাহারা চক্রান্ত করিত, তাহারা এই জনপূর্ণ "সাতগাঁয়ে" বিদ্রোহের মন্ত্রণাগার স্থাপন করিত। এই জন্যই আকবরসাহ, এই স্থানকে "বুলঘকৃখানা" বা বিদ্রোহীদিগের আবাসস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁর সে সময়ের ঐশ্বর্য্য—অবর্ণনীয়। সিজার ফ্রেডরিক

১৫৭০ খৃঃ অব্দে সপ্তগ্রাম দর্শন করিয়া যান। সে সময়ে বাণিজ্য-ব্যাপারে সপ্তগ্রামের অবস্থা অতি সমুন্নত! কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে বর্ণিত, সপ্তগ্রামের বিবরণের সহিত, ফ্রেডরিকের লিখিত এই বিবরণ, একই ভাবে সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য—জ্ঞাপক। এতদ্ভিন্ন ডি, লেইএট, এডমিরাল ওয়ারউইক প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণ, সকলেই সপ্তগ্রামের বাণিজ্য ঐশ্বর্য্যের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সপ্তগ্রামের গঞ্জে, রেশম, কার্পাস, গালা, চিনি, কার্পাসবস্ত্র ও চাউল প্রভৃতির আড়ত ছিল। এই সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য, ইউরোপের নানা-বন্দর, নানাদেশে বিক্রয় করিবার জন্য, সর্ব্বজাতীয় ইউরোপীয় বণিকেরা এই সাতগাঁর বন্দরে উপস্থিত হইয়া, বিশালকায়া স্বরস্বতী বক্ষ, নানাবর্ণের পোত-শ্রেণীতে সুশোভিত করিত।

ইতিহাসের কাহিনীতে প্রকাশ, যে ভাস্কোডিগামা নামক এক পর্টুগীজ নাবিক, কেপ-অব-গুড্‌হোপ বা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া, সর্ব্বপ্রথমে সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৪৯৮ খৃঃ অব্দের, ২৬ আগষ্ট তারিখে তিনি কালিকটে উপস্থিত হন। ১৪৯৯ খৃঃ অব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় হইতে, পর্টুগীজ ব্যবসায়ীগণ, ভারতক্ষেত্রে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ভারতোপকূলে গোয়া, সিংহল, মলাক্কাদ্বীপ, ও অরমজ্ বন্দরে পর্টুগীজগণ স্থানাধিকার করিয়া, বাণিজ্য-কুঠী নির্ম্মাণ করেন। আবুকার্ক নামক একজন সাহসী সেনানীর বাহুবলেই, এই সমস্ত ক্ষুদ্র অধিকার স্থাপিত হয়। ইংরাজগণ, লর্ড ক্লাইভকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আবুকার্কের এই বীরত্বের জন্য, পর্টুগীজেরা তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখিত। ১৫১৫ খৃঃ অব্দের ১৬ ডিসেম্বর, আবুকার্ক গোয়াতে প্রাণত্যাগ করেন। আবুকার্কের পর আরও কয়েকজন পর্টুগীজ বাণিজ্যাধ্যক্ষ, ভারতে পর্টুগীজ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন।

মহা গৌরবান্বিত, সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে সমদর্শী, সম্রাট আকবর যখন "দীন্-ইলাহি" নামক নূতন ধর্ম্মের প্রচার চেষ্টা করেন, সেই সময়ে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে, কতকগুলি সত্য অবগত হইবার জন্য, তিনজন পর্টুগীজ পাদরীকে তাঁহার রাজসভায় আনয়ন করেন। মহা পণ্ডিত আবুলফজল ইহাদের একজনকে পাদরী রডাফ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম একোয়াভিভা। আকবরের সময়ে, পর্টুগীজগণ সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থে প্রবেশ করে। হুগলীর উপকণ্ঠে, বাণ্ডেলই তাহাদের প্রথম আশ্রয়ভূমি। এই বাণ্ডেল সম্ভবতঃ "বন্দর" শব্দের অপভ্রংশ।

পর্টুগীজদিগের এই ভীষণ অত্যাচারে, একটা দেশব্যাপী মহা আতঙ্ক উত্থিত হইল। সে আতঙ্ক-কাহিনী দিল্লীশ্বরের সিংহাসন তলে গিয়া পৌছিল। বাদসাহের আদেশে, পর্টুগীজদিগের অত্যাচার প্রশমিত করিবার জন্য, বঙ্গের রাজধানী, রাজমহল হইতে ঢাকায় পরিবর্ত্তিত হইল।

ইসলাম খাঁ এই সময়ে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইসলাম খাঁ ঢাকায় আসিয়া, পর্টুগীজদের দমনের জন্য, নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার এ সম্বন্ধে পরিশ্রমও বৃথা হইল না। বঙ্গের পূর্ব্বোপকূলে, পর্টুগীজগণ তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে শান্তভাব ধারণ করিল। তিনি পর্টুগীজদিগকে একবারে বিধ্বস্ত করিতে না পারিলেও তাহাদের দমনে রাখিলেন।

১৬১৩ খৃঃ অব্দে ইস্‌লামখাঁর মৃত্যু হয়। কাসেম খাঁ তাঁহার স্থলে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কাশেমখাঁও, পর্টুগীজদিগকে তাঁহার শাসনাধীনে সংযত রাখিয়াছিলেন। কাশেমখাঁর পর ইব্রাহিমখাঁ—বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা বা সুবেদার নিযুক্ত হন।

ইব্রাহিম খাঁ, অসম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। কেবল তাই নয়, তাঁহার আমলে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সর্ব্ববিধ্বংসী উৎপাত ও বিঘ্ন বাধা দূর করিয়া তিনি বঙ্গীয় প্রজাকে শান্তিময় শাসনাধীনে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে, বঙ্গদেশ আবার অত্যাচারের পরিবর্ত্তে, সুখশান্তি পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইব্রাহিমখাঁ আর কিছুদিন এইভাবে কাজ করিতে পারিলে, বঙ্গদেশ হইতে পর্টুগীজ প্রভাব হয়ত একবারে বিলুপ্ত হইত। কিন্তু বঙ্গের ভবিতব্য অন্যরূপ। সহসা এমন এক ঘটনাচক্রের সৃষ্টি হইল—যাহাতে ইব্রাহিমখাঁ, সম্পূর্ণরূপে তাহার অধীন হইয়া পড়িলেন। সেই ঘটনার সহিত বঙ্গে পর্টুগীজ-প্রভাব ধ্বংশের বিশেষ সম্বন্ধ।

জাহাঙ্গীর অতি শান্তি প্রিয় বাদসাহ ছিলেন। স্যার টমাস রো অবশ্য তাঁহাকে এই ভাবেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রো একস্থলে বলিয়াছেন—"জাহাঙ্গীরের গুণ অনেক, কিন্তু তিনি কখনও কাহার ক্ষমতার অপব্যবহারে বাধা দিবার ইচ্ছা করিতেন না। প্রকৃত পক্ষে তিনি তাঁহার প্রধানাবেগম নূরজাহানের শক্তির একান্ত অধীন। প্রকারান্তরে সর্ব্ববিষয়েই তিনি নূরজাহানের হস্তের ক্ষমতাবিহীন ক্রীড়াপুত্তলী।"

প্রকৃতপক্ষে ঘটনাও তাই। জাহাঙ্গীরের পুত্রগণের মধ্যে, সাহাজাদা খুরম, শক্তিশালী ও বিশেষ বুদ্ধিমান ছিলেন। খুরম, রাজপুত্রোচিত

গুণাবলী বিভূষিত হইলেও, সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁহাকে আদতে দেখিতে পারিতেন না। জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র, সাহাজাদা সাহরিয়ারকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। কারণ সম্পর্কে সাহরিয়ার আবার তাঁহার জামাতা। পূর্ব্বস্বামী, সের আফ্‌গনের গর্ভজাত এক কন্যার সহিত নূরজাহান সাহরিয়ারের বিবাহ দেন। নূরজাহানের ইচ্ছা, সাহরিয়ারই দিল্লী সিংহাসনের অধিকারী হন। এইজন্য সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার জামাতার পক্ষ সমর্থন করিতেন।

এই অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ফল, বড়ই বিষময় হইল। সাহাজাদা খুরম (পরে সাহজাহান) পিতৃদ্রোহী হইলেন। ১৬২১ খৃঃঅব্দ বিদ্রোহী হইয়া খুরম, সসৈন্যে দিল্লীনগরী অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দিল্লীর যুদ্ধে—তিনি সম্রাট-সৈন্যের হস্তে পরাজিত হন। সম্রাট-সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে, তিনি সুদূর বঙ্গদেশে পলায়ন করিয়া বর্দ্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সম্রাট-কুমার খুরম, নানা কারণে বাধ্য হইয়া বর্দ্ধমানে শিবির স্থাপন করিলেন। সম্রাট পুত্র বিদ্রোহী হইয়া, হুগলীর অতি সন্নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া, হুগলীর তৎকালীন পর্টুগীজ গবর্ণর, মাইকেল রডারিকো (Michael Rodriques) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিদ্রোহী সম্রাট-পুত্র, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য চালিত হইয়া, মহাসমাদরে তাঁহাকে শিবিরে গ্রহণ করেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, সাহাজাহান রড়ারিকোকে বলিলেন—"আপনি যদি আমার এই বিপত্তির সময়ে, আমাকে কয়েকটী কামান ও আপনার ইউরোপীয় সেনা দিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব, এবং আমার শুভদিন সমুপস্থিত হইলে এ কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিব।"

রডারিকো এইবার এক মহা সমস্যার মধ্যে পড়িলেন। বিদ্রোহী সম্রাট-পুত্রকে সাহায্য করিলে, নিশ্চয়ই তিনি জাহাঙ্গীরের বিষনয়নে পড়িবেন। একদিন না একদিন, সম্রাট-পুত্রের এই বিদ্রোহ প্রশমিত হইবে। কিন্তু এইরূপ অসঙ্গত সাহায্যের জন্য, সমগ্র পর্টুগীজ জাতিকে বঙ্গদেশ হইতে, এমন কি--ভারত হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া, তিনি বিদ্রোহী সম্রাট-পুত্রের প্রস্তাবের, স্পষ্টরূপে কোন উত্তর না দিয়া, স্বস্থানে চলিয়া আসেন।

সাহাজাদা খুরম, পর্টুগীজদিগের নিকট—সাহায্য প্রার্থনায় বিফল

মনোরথ হওয়ায়, তাহাদের উপর অতিশয় জাতক্রোধ হইলেন। কিন্তু ক্রোধ দেখাইবার সময় তখন নহে। কাজেই তিনি শান্তভাব ধারণ করিয়া, তাঁহার অধীনস্থ সেনাগণকে একত্রিত করিলেন। সাহসে বুক বাঁধিয়া, জাহ্নবী তীরস্থ প্রান্তরে, মোগল-সুবাদারকে আক্রমণ করিলেন। মোগল-সুবাদার প্রাণপণে যুঝিয়া, রণ ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন। ১৬২২ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে।

বিদ্রোহী রাজ-কুমার খুরম, কাজেই বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইলেন। সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার দণ্ডমুণ্ডের ব্যবস্থাধীন হইল। দুই বৎসর কাল তিনি এইভাবে বঙ্গদেশে অবস্থান করেন। এদিকে সম্রাট, পুত্রের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া, দিল্লী হইতে এই বিদ্রোহ দমন জন্য, বঙ্গদেশে এত প্রচণ্ডবাহিনী প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য—কুমার খুরম, এই যুদ্ধে পিতৃসৈন্যের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েন। পরিশেষে পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায়, এই পিতৃদ্রোহিতার শান্তি হয়।

১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের শ্বাসরোগ ছিল। লাহোরে অবস্থান কালে, এই রোগ সহসা প্রবল ভাব ধারণ করে, এবং তাহাতেই তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়। পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াই, সাহাজাদা খুরম "সাহজাহান" উপাধি ধারণ করিয়া, আগরার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

সাহজাহানের রাজত্বকালের এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও তিনি পর্টুগীজকৃত পূর্ব্বদিগের অপমানের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে, তিনি কাশেম খাঁ, নামক এক অনুগৃহীত সেনানীকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

সম্রাটের আদেশ ছিল—"আমি তোমায় বঙ্গদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ও শাসনভার দিয়া পাঠাইতেছি। তুমি আমার অনুগৃহীত ও নির্ব্বাচিত ব্যক্তি। তুমি সাবধানে পর্টুগীজদিগের কার্য্য-প্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখিবে। তাহারা কোথায় কি করিতেছে, তৎপ্রতি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। আমি আমার বঙ্গীয় প্রজাগণকে, পর্টুগীজদের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে চাহি। যখন দেখিবে, তাহারা কোনরূপ বিধি, বিগর্হিত অন্যায় কার্য্য করিতেছে—তখনই সরকারে এতেলা করিবে। এতেলা পাইলে যেরূপ হুকুম দেওয়া প্রয়োজন, আমি তখনই তাহা দিব।"

Hoogly Past & Present by S. C. Day. Bengal Gazeteer—Hoogly.

কাশেমখাঁ—বাঙ্গলায় আসিয়া, ক্রুদ্ধ শনির স্থায়, পর্টুগীজদের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে, ছুইটী বৎসর কাটিয়া গেল। পরিশেষে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল। কাশেমখাঁ—সম্রাট সরকারে যে এতেলা পাঠাইলেন—তাহার সার মর্ম্ম এই—(১) পর্টুগীজেরা বলপূর্ব্বক ও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সম্রাটের প্রজাগণকে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। (২) সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত, ছুই এক স্থলে ছুর্গনির্ম্মাণও করিয়াছে। (৩) তাহাদের বাণিজ্যালয়ের বা ফ্যাক্টরীর নিকট দিয়া, যে সমস্ত বাণিজ্য-নৌকা যাতায়াত করে, তাহাদের নিকট হইতে বলপ্রয়োগে শুল্ক আদায় করিতেছে। (৪) বাদসাহের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর সপ্তগ্রামের সম্পূর্ণ অনিষ্টসাধন করিয়াছে।

সম্রাট সরকারে এই এতেলা পৌছিবামাত্রই, ঘৃতসিক্ত বস্ত্রে অগ্নি-সংযোগ হইলে যে ব্যাপার ঘটে, তাহাই হইল। সম্রাট তখনই আদেশ দিলেন—"পর্টুগীজদিগকে বাঙ্গালা হইতে একবারে বিতাড়িত করিয়া দাও। তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ কর।"

বাদসাহ যত সহজে এই আদেশ প্রদান করিলেন, পর্টুগীজদিগকে সমূলে বিতাড়িত করা তত সহজ বলিয়া বোধ হইল না। কারণ পর্টুগীজদিগের হুগলী-ছুর্গ, কামানদ্বারা সুন্দররূপে সুরক্ষিত।* তাহারা শিক্ষিত সেনাসহায়ে এই সুরক্ষিত স্থানের মধ্যে থাকিয়া, মোগলসৈন্যকে যে যথেষ্ট বাধা দিতে পারিবে, তাহাও খুব সম্ভব। এইজন্য সুচতুর কাশেমখাঁ, ধীরে ধীরে পর্টুগীজ-ধ্বংশরূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কাশেমখাঁ, তাঁহার পুত্র এনায়েৎউল্লা এবং আল্লাইয়ারখাঁ নামক একজন সেনানীকে হুগলী—আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। এনায়েৎখাঁ একজন সুদক্ষ সেনানী—পিতার উপযুক্ত পুত্র। অন্যদিক হইতে খাজা সেরও হুগলির পথ ধরিলেন। এতদ্ব্যতীত মাসুম খাঁ (ইশাখাঁর বংশধর), বাহাদুর কুম্বু প্রভৃতি সেনাপতিগণও এই যুদ্ধে যোগদান করেন। এই সময়ে ডি, মিগনেল ডি নোরোনহা পর্টুগীজ অধিকার সমূহের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। এ যুদ্ধ

* William Bruton Quarter Master of the Hopewell, East Indiaman, who wrote an account of his party, describes Hoogly (in 1632) as "an island made by the Ganges, having several thousand Portuguese Christians in it. A writer in Stewart's Descriptive Catalogue represents Hoogly as "protected in one side by the river and on the other three by a deep ditch which was filled by water."

ব্যাপার বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে গেলে, আমাদের স্থানে কুলাইবে না। এজন্য আমরা ঐতিহাসিক চিত্র হইতে অতি সংক্ষেপে নিম্ন লিখিত ঘটনাবলী স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পাছে পর্টুগীজগণ এই আক্রমণের সন্ধান পায়, এই আশঙ্কায় বাদসাহী সৈন্যগণ, হিজলী অধিকারের জন্য যাইতেছে, এই কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল। আল্লা ইয়ারখাঁ, হিজলী যাত্রার অছিলায়, বর্দ্ধমান নগরে অবস্থিতি করিয়া খাজা সের প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খাজা সের শ্রীপুর হইতে * রণতরী সমেত পর্টুগীজদিগের নদীমুখে পলায়ন-পথ রুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রণতরীর বহর, মোহানাতে উপস্থিত হইলে, আল্লাইয়ার খাঁ হুগলীতে উপস্থিত হইয়া, পর্টুগীজদিগকে আক্রমণ করিবেন—এইরূপ স্থির হয়। খাজা সের মোহানাতে উপস্থিত হইলে, আল্লাইয়ার খাঁ বর্দ্ধমান হইতে যাত্রা করিয়া, সপ্তগ্রাম ও হুগলীর মধ্যস্থ হলদীপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হন। খাজা সেরও মোহানা হইতে হুগলীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময়ে বাহাদুর কুম্বু, মুরসুদাবাদ হইতে পাঁচশত অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক লইয়া আল্লাইয়ার খাঁর সহিত যোগদান করেন।

সেনাপতি খাজা সের এমন এক স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে অতি সহজেই হুগলীর পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল মধ্যে, একটী সংকীর্ণ স্থান সেতুদ্বারা বন্ধ করিলে, পর্টুগীজদিগের পলায়ন পথ বদ্ধ করা যায়। এইরূপ ব্যবস্থা করায় পর্টুগীজেরা আর কোনরূপে জাহাজে আরোহণ করিয়া সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করিতে পারিল না।

যদিও পর্টুগীজগণের গতিরোধ করিয়া, বাদসাহী সৈন্য হুগলী অধিকারের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি তাহারা পর্টুগীজদিগকে দমন করিতে সক্ষম হয় নাই। হুগলী বন্দরের প্রতিষ্ঠা করিয়া, পর্টুগীজেরা তথায় এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ করিয়া রাখিয়াছিল, যে সহসা সেদুর্গমধ্যে প্রবেশ করা সহজ কাজ নহে। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ, নদী, ঝিল ও পরিখাদ্বারা বেষ্টিত।

* সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক ইলিয়াট ও ষ্টুয়ার্ট সাহেব, এই শ্রীপুরকে শ্রীরামপুর বলিয়া, বোধহয় যেন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কাশিমখাঁ, ঢাকা হইতেই যুদ্ধযাত্রার আদেশ প্রদান করেন। খুব সম্ভবতঃ ঢাকার নিকটবর্ত্তী পদ্মার উপরই বাদসাহী রণতরী থাকিত। শ্রীপুর পদ্মার তীরবর্ত্তী ও সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী। শ্রীপুর হইতে নদীপথে হুগলী পর্য্যন্ত আসার পথও নির্দ্দিষ্ট ছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলবাবু বলেন—"প্রকৃতপক্ষে, শ্রীরামপুর নহে—শ্রীপুর" এ বিষয়ে নিখিলবাবুর সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই।

বুরূজে বুরূজে—বজ্রনাদী কামান। বাদসাহী-সৈন্য, জলে স্থলে তিনমাস কাল হুগলী-দুর্গ অবরোধ করিয়া, প্রায় সাড়ে তিনমাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়।* এই সময়ের মধ্যে বাদসাহের সেনাপতিগণ, দুর্গের বহির্ভাগস্থ নদীর উভয় তীরবর্ত্তী—নানা স্থানে সৈন্য পাঠাইয়া, খৃষ্টানদিগকে বন্দী করিয়া আনিতে আরম্ভ করিলেন। সেইসঙ্গে পর্টুগীজদিগের নিযুক্ত বহুসংখ্যক বাঙ্গালী নাবিককে ধৃত করিয়া আপনাদের পক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন।

বাদসাহী সেনাকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া, পর্টুগীজেরা সময়ে সময়ে আত্মরক্ষার জন্য সামান্য যুদ্ধ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা, সন্ধির প্রস্তাবও করিয়াছিল। এই সন্ধি ব্যাপারে, তাহারা আত্মরক্ষার জন্য লক্ষ মুদ্রা দিতে চায়। কিন্তু গোয়া ও অন্যান্য পর্টুগীজ অধিকার হইতে সাহায্য পাইবার আশায়, তাহারা সহসা আত্মসমর্পণ করিল না।

পর্টুগীজদিগের অধীনে সাত হাজার বন্দুক-ধারী সেনা ছিল। তাহারা এই কয়মাস কাল অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণে, বাদসাহী সেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপে প্রায় সাড়ে তিন মাস অতীত হয়

দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর অক্টোবর মাসে বাদসাহ পক্ষ, দুর্গ জয়ের জন্য, উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। সুড়ঙ্গে বারুদ পূর্ণ করিয়া, তাঁহারা হুগলী-দুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পর্টুগীজদিগের গির্জ্জার নিকটে যে পরিখাটি ছিল, তাহা অতি সংকীর্ণ। কোন কৌশলে, সেই অপ্রশস্ত খাতের জল বাহির করিয়া দিয়া, তাহা বারুদে পরিপূর্ণ করা হইল। বলা বাহুল্য—পর্টুগীজেরা এই বারুদপূর্ণ সুড়ঙ্গটীর সন্ধান পাইয়া তাহা অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল। মধ্যস্থলে যে সুড়ঙ্গটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার উপরিস্থ এক বৃহৎ অট্টালিকায় বহু পর্টুগীজ বাস করিত। বাদসাহী সৈন্যগণ, সেই অট্টালিকার সম্মুখে সমবেত হইয়া, পর্টুগীজগণকে তথায় উপস্থিত করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। পর্টুগীজেরা মোগল-সৈন্যের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া, সেই স্থলে আসিবামাত্রই, বাদসাহী সৈন্য সুড়ঙ্গে অগ্নিপ্রদান করিল। বলা বাহুল্য মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই অট্টালিকা ভূমিসাৎ ও বিলুপ্ত হইল।

---

* আবদুল হামিদ লাহোরীর "বাদসানামায়" উল্লিখিত আছে—বাদসাহী সৈন্য, সার্দ্ধ তিনমাস হুগলী অবরোধ করিয়াছিল, কিন্তু "তারিখ-ই-খাফি-খান্" বা খাফিখাঁর ইতিবৃত্তে অবরোধের সময় তিনমাসকাল বলা হইয়াছে। তারিখ গ্রন্থখানি—বাদসানামার পরে রচিত। যাহা হউক এই দুইখানি গ্রন্থের উক্তি হইতেই প্রমাণ হয়, বাদসাহী সৈন্যকে তিন বা সাড়ে তিনমাসকাল ধরিয়া পর্টুগীজ ক্ষমতা ধ্বংশ করিবার জন্য বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল।
Elliot's History of India Vol. Vii. Day's Hoogly Past & Present. P. 17.

ইংরাজের উড়িষ্যায় প্রবেশ।

কি কারণে এবং কোন সময়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মান্দ্রাজ উপকূল হইতে বাণিজ্যার্থে উড়িষ্যাদেশে প্রবেশ করেন, এইবার সেই কথাই বলিব। ইংরাজের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য মসলিপট্টনের ছিট ও কাপড়। মসলিপট্টনের ছিট আজও বাজারে প্রাধান্য লাভ করিয়া আছে। ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষেরা দেখিলেন—নানা কারণে মসলিপট্টনের কাপড়ের বাজার মন্দা হইয়া পড়িতেছে। রপ্তানির কাজ ভালরূপে চলিতেছে না এবং ব্যবসায়ে কোম্পানীর ক্ষতি হইতেছে। মসলীপট্টনের কুঠীর অধ্যক্ষেরা এজন্য সংকল্প করিলেন—গঙ্গানদীর উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে বাণিজ্যের চেষ্টা করিতে হইবে। ১৬৩৩ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, এ সম্বন্ধে সমস্ত পরামর্শ ও বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল। একদল ইংরাজ, একখানি সুবৃহৎ দেশীয় নৌকায় আরোহণ করিয়া কটকের দিকে যাত্রা করিলেন। এই নৌকার মধ্যে আরোহী রহিলেন—মাত্র আটজন ইংরাজ কুঠীয়াল। তাহা ছাড়া, দেশী মাঝি মাল্লাও তাহাতে আবশ্যক মত ছিল।

সমুদ্র-তরঙ্গরাজি বিভিন্ন করিয়া, অদৃষ্টের ও সমুদ্রের স্রোতে ভাসিয়া, এই নৌকাখানি যথা সময়ে হরিশপুরে আসিয়া পৌছিল। * হরিশপুর উড়িষ্যার পাটুয়া নদীর উপর। পাটুয়া নদীবক্ষে প্রবেশ কালে, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা, এ দেশীয় নৌকায় মালপত্র বোঝাই করিয়া নদীপথে যাত্রা করিলেন। এই ভাবে চারি ক্রোশ রাস্তা যাইবার পর, এই ইংরাজ বণিকদল কোসিদা নামক স্থানে পৌছিলেন। কোসিদা হইতে কটক পর্য্যন্ত সরকারী রাস্তা ছিল। কটক হইতে এই ইংরাজদল মালকাণ্ডি বা মুকুন্দ-দেবের রাজধানীতে পৌছিলেন। মুকুন্দ দেবের রাজধানীর নাম বারবাটী।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে—সেই সময়ে, এই সকল স্থান অতিশয় দুর্গম ছিল। সকলে সে দিকের পথ ঘাট জানিত না—জানিলেও বলিয়া দিত না। তাহার উপর এই আটজন ইংরাজ, সেই দেশের ভাষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। দেশীয় লোকদেরও তাঁহারা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। এত অসুবিধা ও বিপদের মধ্যে পড়িয়া, কেবল মাত্র উদ্যমবশে তাঁহারা মুকুন্দদেবের

* বর্ত্তমানকালে এই স্থান "হরিশপুর গড়" বলিয়া পরিচিত।

রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। এই দলের মধ্যে উইলিয়াম ব্রুটন বলিয়া একজন ফ্যাক্‌টার ছিলেন। কিরূপ কষ্টের মধ্যে পড়িয়া এই অষ্টজন ইংরাজ, সর্ব্বপ্রথমে উড়িষ্যা ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, তাহার একটী "রোজনামচা" ব্রুটন নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন। * আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে দিতেছি।

"২২শে (১৬৩৩ খৃঃ অব্দ) মার্চ্চ। আমরা তখন করমণ্ডল উপকূলে। মসলিপট্টনে আমাদের ফ্যাক্‌টরি ছিল। আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ জন নরিস। আমাদের মধ্যে পরামর্শ মতে স্থির হইল, বাঙ্গলাপ্রদেশে ফ্যাক্‌টারী বা বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে হইবে। বঙ্গ দেশের শাসনকর্ত্তাদের দিবার জন্য, আমরা নানারূপ উপঢৌকন সংগ্রহ করিয়া, মসলীপট্টন হইতে এ দেশীয় এক সমুদ্রগামী বৃহৎ নৌকায় উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করিলাম। আমরা বহুকষ্টে সমুদ্র পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, হরিশপুরে উপস্থিত হইলাম। আমরা যে সময়ে হরিশপুরে নঙ্গর করিলাম, সেই সময়ে দেখিলাম, একখানি পর্টুগীজ জাহাজও আমাদের অতি নিকটেই নঙ্গর করিল। তাহাদের উদ্দেশ্য যে সৎ নহে, ইহা বুঝিয়াই আমরা আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত রহিলাম। ২৪শে তারিখে, আমাদের দলস্থ মিঃ কার্টরাইট ও মিঃ কলি, হরিশপুরের শাসনকর্ত্তার সহিত দেখা করিতে গেলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন দেশীয় গুণ্ডা ও বদমায়েস লইয়া, পূর্ব্বোক্ত পর্টুগীজ জাহাজের নাবিকগণ—আমাদের আক্রমণ করিল। তাহারা হয়ত আমাদের হত্যা করিত, অথবা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। কিন্তু রাজা লক্ষ্মীপের লোকেরা সেই স্থানে দুই শত লোক লইয়া আসিয়া, মিঃ কার্টরাইটের জীবন রক্ষা করেন। †

এই দাঙ্গার ফলে মিঃ টমাস কলি দক্ষিণ হস্তে ভয়ানক আঘাত পান। আমাদের একজন লোক পায়ে ও মস্তকে অত্যন্ত আঘাত পায়। বিপক্ষ পক্ষের একজন "নাখোদা" (নৌকাচালক) অতি ভীষণরূপে আহত হয়। এই বিবাদে আরও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারিত। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায়, তাহা হয় নাই।

২৭শে এপ্রিল। আমরা তিনজন অর্থাৎ কার্টরাইট, আমি ও ডসন, হরিশপুরের রাজার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। মিঃ কলি আহত, এজন্য তিনি

---

* *News from the East Indies or a Voyage to Bengalla written by* William Bruton ; Wilson's Early Annals. † ব্রুটন ইহাকে Harsapoore বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই রাজাকে Lucklip the rogger বলিয়াছেন।

হরিশপুরেই রহিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের অন্যান্য সঙ্গিগণও রহিল। আমরা মালকাণ্ডীর (মুকুন্দদেব) সহিত সাক্ষাতার্থে যাত্রা করিলাম। পশ্চাদ্‌গামী সঙ্গীদের বলিয়া গেলাম, পথে যাহা কিছু ঘটিবে, তাহাদের সংবাদ পাঠান হইবে। ইতোমধ্যে মিঃ কলিও আরোগ্যলাভ করিবেন। আমাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইলে তাঁহারা গন্তব্য পথাভিমুখী হইবেন, ইহাই স্থির রহিল।

আমরা নানাবিধ সুগন্ধি মসলা, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র প্রভৃতি বাণিজ্য দ্রব্যে, আমাদের নৌকা বোঝাই করিলাম। আমরা যে সকল সুগন্ধি মসলা সঙ্গে লইয়াছিলাম, তাহা এ অঞ্চলে পাওয়া যায় না। নদীপথ শেষ হইবার পর, আমরা মাল-পত্রগুলি গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলাম।

২৮এ এপ্রিল। প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতকালেই—সেই নগরের শাসনকর্ত্তা আমাদের শিবিরে আসিলেন। আমাদের প্রধানের পরিচয় পাইয়া, তিনি তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন। অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের বিনিময় হইল। তিনি আমাদের কথাবার্ত্তায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব, আপনাদের উপকার করিব।" তিনি বাস্তবিকই অতি ভদ্র। যাহা বলিলেন—তাহাই করিলেন। তিনি আমাদের আরোহণের জন্য কয়েকটী অশ্ব পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের হুকুম তামিল করিবার জন্য, কয়েকজন কুলি পাঠাইয়া দিলেন। কারণ এই সহরে, আমাদের দ্রব্যাদি—লোকজনের দ্বারাই বহন করাইতে হইবে। গাড়ীর আর তেমন সুবিধা হইবে না। আমরা গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিলাম। শাসনকর্ত্তা আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তাঁহার লোকজনেরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আমরা সে দেশের পথ ঘাট কিছুই জানি না। কাজেই পথ ঘাট দেখাইয়া দিবার জন্য এবং রাজার প্রদত্ত অশ্বগুলি ফিরাইয়া আনিবার জন্য, শাসনকর্ত্তার লোকেরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বেলা এগারটা বারটার সময় আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। এপ্রিল মাস, ভয়ানক গরম! চারিদিকে যেন আগুনের হল্‌কা ছুটিতেছে। আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, একস্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তিন চারি ঘণ্টা বিশ্রামের পর অপরাহ্ন আসিল। এখান হইতে আমরা "হরহরাপুরের" (হরিহরপুর)

দিকে যাত্রা করিলাম। দুই ঘণ্টার মধ্যে আমরা হরিহরপুরে পৌঁছিলাম। হরিহরপুরে পৌঁছিবার পর একজন লোক, আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—"আমাদের রাজা আপনাদের আগমন সংবাদ ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। তিনি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

একজন শাসনকর্ত্তা আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছেন, এ সংবাদে আমরা বড়ই কৃতার্থমন্য বোধ করিলাম। তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতার্থে গমন করিলাম। একটি প্যাগোডা বা দেব-মন্দিরের নিকট তাঁহার তাঁবু পড়িয়াছিল।*

সেই রাজকর্ম্মচারী আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। রাত্রিতে বিরাট ভোজ হইল। আমাদের অবস্থান জন্য সরাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা আহারান্তে সরাইয়ে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের সঙ্গের মালপত্র, সবই সেই থানাতেই হেপাজতে রহিল। মির্জ্জা মমিন, তাঁহার সঙ্গীদের সহিত সে রাত্রিতে তাঁহার নিজের শিবিরেই রহিলেন।

৩০ এপ্রিল। আমরা অদ্য প্রভাতে কটকের (Coteke) পথ ধরিলাম। কটক খুব বড় সহর। কটক হইতে মুকুন্দদেবের (Malkundy) রাজধানী এক মাইলের উপর। মিঃ কার্টরাইট, আমাদের সঙ্গে আসিলেন না। কারণ তিনি মির্জ্জা মমিনের সঙ্গে আসিবেন। সমস্তদিন পথ চলিয়া, আমরা সন্ধ্যার সময় গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। সমস্ত দিবাভাগে, কটক পর্য্যন্ত আমরা আট মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি। রাত্রি একটার সময়, মিঃ কার্টরাইট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে আমরা স্বদল বলে মির্জ্জা মমিনের বাটিতে উপস্থিত হইলাম। মির্জ্জা মমিন, মহাসমাদরে আমাদের ভোজ দিলেন। তিনি নবাবকে সংবাদ পাঠাইলেন—"আটজন ইংরাজ সওদাগর আমার বাটীতে অতিথি হইয়াছেন।" যথাসময়ে আমাদের আগমন

* হরিহরপুরে এখনও এক শিবমন্দির ধ্বংসাবস্থায় বর্ত্তমান। স্থানীয় লোকে, ইহাকে "সোমনাথ-মন্দির" বলে। যে রাজকর্ম্মচারী, এই ইংরাজ বণিকদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম Mirza Momeine (মির্জ্জা মমিন) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবেরা তাঁহাকে Mersy Momeine (মর্সি মমিন) বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু দেবমন্দিরে তাঁহার অবস্থান সম্ভবতঃ অসম্ভব। তবে অনুমানতঃ এই বোধহয়—মন্দির সমীপে কোন উন্মুক্ত স্থানে, তাঁহার শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেইখানেই তিনি ইংরাজ বণিকগণকে প্রত্যুদ্গমন করেন। Wilson's Early Annals.

সংবাদ পাইয়া, নবাব এক সিধা পাঠাইয়া দিলেন। এমন সুন্দর ও উপাদেয় ভোজ, আমাদের অদৃষ্টে বহুদিন মিলে নাই। সেইদিন মির্জ্জাসাহেবের বাটীতেই বিশ্রাম করিলাম। বেলা তিন চারি ঘটিকার সময় সংবাদ আসিল— "রাজা আমাদের সহিত সাক্ষাতার্থে প্রস্তুত।"

ইংরাজ সদাগরেরা (Court of Malcundy.) বলিয়া একটা কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা কটকের মোগলসুবাদার আগামহম্মদ জামানের সভায় উপস্থিত হন। এই "মালকাণ্ডি" নাম কোথা হইতে আসিল, তাহার একটু আলোচনা করিব। উড়িষ্যায় শেষ হিন্দু রাজা মুকুন্দদেব। মুকুন্দদেব ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন হুমায়ুন বাদসাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ইহার ছয় বৎসর পরে আকবর-সাহ দিল্লীর সম্রাট হন। ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে সুলেমান সাহ কিরাণী, বাঙ্গালার মোগল সুবাদার বা রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। সুলেমান, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়কে উড়িষ্যাজয়ে প্রেরণ করেন। যাজপুরের যুদ্ধে মুকুন্দদেব নিহত হন। উড়িষ্যার এই শেষ স্বাধীন হিন্দুনৃপতি, কটকে এক প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। *

ইংরাজ কুঠিয়াল বা ফ্যাকটারেরা যখন কটকে উপস্থিত হন, তখন উড়িষ্যা প্রদেশ আকবরসাহের কর-কবলিত। মুকুন্দদেবের দুর্গে, যে প্রকাণ্ড

---

* আবুলফজল আইন-আকবরীতে মুকুন্দদেবের এই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—"The City of Cuttack has a Stone Fort situated at the bifurcation of the two Rivers, the Mohanadi held in high veneration by the Hindus and the Katjuri. It is the Residence of the Governor and contains some fine buildings, for 5 or 6 Kos round the Fort. During the rains the country is under water. Raja Mukund Deo built a Palace here with nine Courts (literally of nine Ashianahs or nest) (Ain-Akbari—Blockman's Trs.)

এই দুর্গ "বারবাটীর কেল্লা" বলিয়া পরিচিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন—রাজা অনঙ্গভীম দেব কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হয় (খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী)। এখন এ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়। মুকুন্দদেবের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখন জঙ্গলে সমাবৃত। ইহার প্রস্তরখণ্ড লইয়া বঙ্গের পবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট, লাইট-হাউস, (বাতিঘর) ও হাঁসপাতাল নির্ম্মাণে ব্যবহার করিয়াছেন। তবে অতীতের স্মৃতিস্বরূপ এই দুর্গ-পরিখা ও ভগ্ন-তোরণদ্বার এখনও বর্ত্তমান।

রাজভবন ছিল, সেই স্থানে উড়িষ্যায় মোগল সুবাদার, আগামহম্মদ অবস্থান করিতেছিলেন।

ব্রুটন ও তাঁহার সঙ্গীরা নবাবের আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। সে দেশে আর কখনও কেহ ইংরাজ দেখে নাই। কাজেই "সাদালোক" দেখিয়া তাহারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে, নবাবের ভৃত্যেরা আসিয়া কার্পেট পাতিয়া দিল। সেই কার্পেটের উপর মছলন্দের বিছানা ও স্বর্ণ-খচিত তাকিয়া পড়িল। ইহাই নবাবের বসিবার আসন। চারিটী স্বর্ণদণ্ডে পরিধৃত, মখমলের চন্দ্রাতপ সেই স্থানে খাটান হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটা রব উঠিল, নবাব-সাহেব দরবারে আসিতেছেন। সকলে সম্মানের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নবাব দুইজন লোকের স্কন্ধে, বাহুর ভর দিয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে একজন সুন্দর কান্তি যুবক উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পাহারা দিতে লাগিলেন। ইনিই নবাবের ভ্রাতা। নবাবের পশ্চাতে পঞ্চাশজন সভাসদ।

নবাব সেই মখমল-মণ্ডিত, বিছানার উপর বসিলেন। তাঁহার পারিষদ-বর্গ তাঁহার আশে পাশে বসিল। ইংরাজ বণিকগণ, নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের আনীত উপহার-দ্রব্যাদি তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। নবাব তাহা স্পর্শ মাত্র করিয়া, ইংরাজদের আপ্যায়িত করিলেন। ইংরাজ বণিকেরা, নবাবের নিকট বাণিজ্য-স্বত্ব লাভের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নবাব তাহার কোনরূপ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই—"নামাজের আজান-ধ্বনি" হইল। কাজেই সেদিন আর কোন কাজের কথা হইল না। তখন অপরাহ্ন সময়। নবাব ও তাঁহার সঙ্গিগণ, সেই সভাতে বসিয়াই নামাজ করিলেন। নামাজ শেষ হইলে—ভৃত্যেরা সেই দরবার-দালানের মোমবাতিপূর্ণ ঝাড়গুলি জ্বালিয়া দিল। রাত্রি আটটা নয়টার সময়, ইংরাজ বণিকগণ কটকে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রুটন এই নবাবের কোন নামোল্লেখ করেন নাই। এই নবাবই কার্টরাইটকে উড়িষ্যাদেশে অবাধ বাণিজ্যের স্বত্ব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭০৪ সালের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুরাতন কাগজপত্র হইতে, উইলসন সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন—এই নবাবের নাম আগামহম্মদ জামান্। পারস্যের তারহান (টিহারাণে?) ইঁহার জন্মস্থান। জাহাঙ্গীরের আমলে, ইনি একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। আগামহম্মদ বহুদিন এই বঙ্গদেশে ছিলেন। কয়েক বৎসরের জন্য, তিনি শ্রীহট্টের ফৌজদার ও তালুকদার নিযুক্ত হন। সাজাহানের আমলে, তিনি মাসিক দুই

হাজার মুদ্রা বেতন পাইতেন ও একহাজারী মন্সবদার ছিলেন। বাদসানামার মতে, ১৬৩০-৩১ খৃঃ অব্দে তিনি বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পর বৎসর তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হয় এবং তিনি মন্সবদারীতেও উন্নীত হন। ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে তিনি আগরায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে, তিনি সম্রাটকে বঙ্গদেশ হইতে আনীত দুইটী হস্তী ও আটটী উৎকৃষ্ট অশ্ব উপঢৌকন প্রদান করেন। ঐ বৎসরে, তিনি ইস্‌লামখাঁর সহিত পুনরায় বঙ্গদেশে আসেন। ইহার তিন বৎসর পরে, ইস্‌লাম খাঁ তাঁহাকে কুচবিহার জয় করিতে পাঠান। কুচবিহার ও আসামের যুদ্ধে জয়লাভ করায় আগামহম্মদের আরও পদোন্নতি হয়। ১০৫১ হিজিরাব্দে সাজাহান, তাঁহার পুত্র সাহাজাদা সুজাকে উড়িষ্যা-প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। সুজাকে তিনি বলিয়া দেন, "মহম্মদ জামান তাহারানী"কে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া দিও। তিনি একজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা।" ইহার পরে তাহারানী উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বাল্‌খ্‌ প্রদেশে গমন করেন। সেই সময়ের ইংরাজদিগের অতি প্রাচীন কাগজ পত্র হইতে প্রমাণ হয়, মহম্মদ জামান দুইবার উড়িষ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন।

ইংরাজ বণিকগণ, তাঁহাদের লিখিত কাহিনীতে এই মহম্মদ জামানকেই "নবাব" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রথমদিনে কার্য্যসিদ্ধি হইল না দেখিয়া, ইংরাজগণ পরদিন পুনরায় নবাব দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, হরিশপুরে যে দুর্দ্দান্ত পর্টুগীজ নাখোদার সহিত তাঁহাদের বিবাদ হইয়াছিল, সে সশরীরে সেই নবাব-দরবারে উপস্থিত। ইতিপূর্ব্বেই সে নবাবের একজন সভাসদকে হস্তগত করিয়া, নালিশ রুজু করিয়া দিয়াছে—"যে ইংরাজগণ, তাহার জাহাজের দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লোকদিগকে আহত করিয়াছে।"

কিন্তু তখন ইংরাজের সৌভাগ্যোদয় আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই এ নালিশ টিকিল না। নবাব, পর্টুগীজদের ছলনায় ভুলিলেন না বটে—কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, জাহাজ দুখানি পিপ্‌লি বন্দরের, আর সে বন্দর মোগলের অধীনে, তখন তিনি সেই জাহাজ দুখানি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন। ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন, নবাব পর্টুগীজ জাহাজ দুখানি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাদেরই দিবেন। কিন্তু তাহা না হওয়ায়, কার্টরাইট্‌ অতিশয় ভগ্নমনোরথ হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—"আপনার নিকট

আমরা সুবিচার পাইলাম না। কিন্তু অন্যত্র সুবিচার পাইবার চেষ্টা করিব।” এই বলিয়া তিনি ক্রোধবশে, নবাবকে অভিবাদন না করিয়া, সহসা সেই সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।*

কার্টরাইট ক্রোধভরে সভাগৃহ ত্যাগ করিলে, উপস্থিত সকলেই, এই ইংরাজের সাহসদৃষ্টে একটু বিস্মিত হইয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কার সাধ্য—যে দেশের মালিক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, নবাবের সহিত এরূপ উদ্ধতভাবে ব্যবহার করিতে পারে? এই ঘটনার পরদিনে, ধীরভাবে বিবেচনার পর, নবাব তাঁহার প্রধান দেওয়ানজীকে ইংরাজ সওদাগরদের ডাকিয়া আনিতে পাঠান। কার্টরাইট প্রমুখ ইংরাজগণ,পুনরাহুত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সে দিনের দরবার খুব জাঁকাল। নবাব কার্টরাইটকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“আপনি যে গতকল্য ওরূপ ক্রোধভরে আমার দরবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ইহার কারণ কি?” কার্টরাইট বলিলেন—“জাঁহাপনার কল্যকার বিচারে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আপনি আমাদের প্রভু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর অন্যায় আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদিগের ন্যায্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, এজন্য আমি মনের দুঃখে ক্রোধে ক্ষোভে ঐরূপ করিয়াছিলাম।”

নবাব দ্বিভাষিগণের সাহায্যে জানিতে পারিলেন, যে ইংরাজেরাই প্রকৃত ব্যবসায়ী বণিক। মালাবার উপকূল, পারস্য, বাণ্টাম্, জাপারো, জাম্বী ও ম্যাকসারে তাঁহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত। তাঁহারা পর্টুগীজদিগের মত ব্যবসায়ের ভাণ করিয়া দস্যুতা করিতে এদেশে আসেন নাই। প্রকৃত বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া, ধনোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ভারতের নানাস্থানে বাণিজ্যাগার স্থাপন করিয়াছেন ও বাদসাহের অন্যান্য প্রজার ন্যায় নির্ব্বিবাদে ব্যবসাবাণিজ্য করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

* Our merchant seeing that he could not make prize of the vessels or goods nor have any satisfaction for the wrongs which he and our men had received, he rose up in great anger and departed saying that if he could not have right Justice here, he would have it in another place, and so went his way nor taking leave of the Nabob nor of any other.

Early Annals of the English in Bengal.—Wilson.

বলা বাহুল্য, কার্টরাইটের এইরূপ অসমসাহসিক ব্যবহারেই, ইংরাজগণ সে যাত্রা তরিয়া গেলেন। নবাব নিম্নলিখিত স্বত্বে, ইংরাজদিগকে উড়িষ্যায় বাণিজ্যাধিকার দিলেন। উড়িষ্যা যদি ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিভাগানুসারে, বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ধরিতে গেলে, উড়িষ্যা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই, ইংরাজের বঙ্গে প্রথম আগমনকাল সূচিত হইয়াছে। নবাব সদয় হইয়া নিম্নলিখিত স্বত্বে, তাঁহাদের বাণিজ্য চালাইবার আদেশ দিলেন।

(১) নবাবের, বা তাঁহার প্রভু বাদসাহের, অথবা সাধারণ প্রজাবর্গের কোন জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি ঝটিকা-তাড়িত হইয়াই হউক বা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াই হউক, যদি কোনরূপ বিপন্ন অবস্থায় উপস্থিত হয়, আর তাহাদের সেইরূপ বিপন্ন অবস্থা, এই ইংরাজ কর্ম্মচারীরা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বতঃপরতঃ সেই বিপন্ন পোতগুলিকে সাহায্য প্রদানে বাধ্য রহিলেন।

(২) যদি কোন বাদসাহী জাহাজ, বোট বা নৌকা, নঙ্গরাভাবে, খাদ্যাভাবে, পানীয়জলাভাবে বা অন্য কোনরূপ বিপাকে পড়িয়া বিপন্ন হয়, আর যদি তাহা ইংরাজ কোম্পানীর কোন সমুদ্র বা নদীগামী জাহাজ জানিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা সেই বিপন্ন ও অভাবগ্রস্ত বাদসাহী জাহাজ বা নৌকাকে সাহায্য করিতে বাধ্য রহিলেন।

(৩) বাদসাহের অধিকারভুক্ত প্রদেশ-সমূহের কোনও বন্দরে, ইংরাজ-কোম্পানী, অন্য কাহারও জাহাজ আটক করিতে বা তাহা দখল করিয়া লইতে পারিবেন না। তবে, সমুদ্রপথে তাঁহাদের এরূপ স্বাধীনতা দেওয়া গেল।

এই কয়েকটী স্বত্ব স্থির হইয়া গেলে, নবাবের মীরমুন্সী সন্ধিপত্রের সার মর্ম্ম বাদসাহপক্ষ হইতে সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিলেন। এই আদেশ-পত্রের মর্ম্মানুযায়ী, ইংরাজ বণিকগণ, উড়িষ্যা দেশের সর্ব্ব স্থানেই বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। অপরন্তু উড়িষ্যা মধ্যে, যে কোন সুবিধাকর স্থানে, কুঠী খুলিবার অনুমতিও তাঁহারা পাইলেন। তবে এই করার রহিল, যাহাতে সম্রাটের প্রজাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, ইংরাজেরা সেইভাবে কুঠী বা বাণিজ্যাগার স্থাপন করিবেন। নবাবের নিম্ন কোন শাসনকর্ত্তাই, ইংরাজদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবেন না। করিলে, তাঁহাদের কৈফিয়ৎ ও রাজদণ্ডের অধীন হইতে

হইবে। যদি কোন বিষয় লইয়া, ইংরাজের ও সম্রাটের প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শাসন-কর্ত্তারা তাহা সরাসর নবাবের গোচরে আনিবেন। তিনি তাঁহার নিজ দরবারে এরূপ মামলা সমূহের বিচার করিবেন। এতদর্থে ১৬৩৩ খৃঃ অব্দের মে মাসে, এই আদেশ বা ছাড়পত্র স্বাক্ষরিত হইল।

৪ঠা মে। নবাব আমাদের প্রধান বণিককে (মিঃ কার্টরাইট্) এক জবর খানার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। মির্জ্জা মমিনের কাছেই (Mersey Momiene) * অবশ্য এ খানার সওগাদ আসিল। সে দিনের দরবারে, যে আমীর, আমাদের শত্রু পর্টুগীজদের স্বপক্ষে দুই চারি কথা কহিয়াছিলেন, পর্টুগীজদের কার্য্য-প্রণালীর সমর্থন করিয়াছিলেন, তিনিও আমাদের উপর অতি প্রসন্ন হইয়া, এক বস্তা চিনি, একবোতল উৎকৃষ্ট মদিরা ও নানাবিধ দেশীয় মিষ্টান্ন প্রভৃতি স্বয়ং সঙ্গে লইয়া আসিলেন। মিঃ কার্টরাইটকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সেদিনকার দরবারে আমি যে প্রতিকূলতা করিয়াছিলাম, সে কথা আপনারা ভুলিয়া যান। ইংরাজ কোম্পানীর উপকার করিতে এখন আমি সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত।" এই আমীরটী বালেশ্বরের (Bollasoriye) শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার নাম মীরকাশেম (Mercossem)। আমরা বালেশ্বরের দিকে যাত্রা করিব শুনিয়া তিনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

৫ ই মে। (১৬৩৩ খৃঃ অব্দ) নবাবের আহ্বানক্রমে, আমরা পুনরায় তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের সেই দিন পরোয়ানা বা বাণিজ্য-সম্বন্ধে আদেশপত্র প্রদান করিলেন। এই আদেশপত্রের বলে, আমরা তাঁহার অধানস্থ প্রদেশ সমুহে, অবাধ বাণিজ্যের অধিকারী হইলাম।

৬ই মে। (১৬৩৩ খৃঃ অব্দ) আজ নবাব ইংরাজদিগকে তাঁহার সভায় আহ্বান করিয়া, একটী উপাদেয় ভোজ দিলেন। নবাবের মাথার উপর যে মখমলের চন্দ্রাতপখানি ছিল—তাহা চারিবর্ণের। এই দরবারে আমাদের প্রধান বণিক ও দলপতি মিঃ কার্টরাইট এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ, সম্মানের খেলাৎ রূপে প্রাপ্ত হন। পরদিন আমরা আবার রাজসভায় যাই। যাহাতে নবাবসাহেবের অধীনস্থ স্থান সমূহে, আমরা অবাধে ভ্রমণ করিতে পারি, তাহার জন্য আর একখানি ছাড়ও আমরা এই দিনে পাইলাম। দেখিলাম

* ব্রুটন এ দেশের ভাষানভিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই তিনি তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তে নামগুলি যেরূপ বানান করিয়া গিয়াছেন—আমরা বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজীতে অবিকল তাহাই দিলাম।

নবাব একটী যুদ্ধের আয়োজনে বড়ই ব্যস্ত। তাহা হইলেও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির কোনরূপ ব্যাঘাত হইল না। ৮ই মে, আমরা নবাবের নিকট বিদায় লইয়া গন্তব্যপথে যাত্রা করিলাম।"

উপরে আমরা ব্রুটনের রোজনামচা হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা বিবৃত করিলাম, তাহা হইতে পাঠক জানিতে পারিবেন, ইংরাজ বণিকগণ কতকষ্টে, সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গপ্রদেশ-ভুক্ত উড়িষ্যার মধ্যে, বাণিজ্য ব্যাপারের ছাড় ও স্বত্ব লাভ করেন। এই উড়িষ্যার বাণিজ্য-স্বত্ব লাভই, ইংরাজের বঙ্গের বাণিজ্যের প্রথম সোপান। এজন্য আমরা আবার ব্রুটনের কাহিনী অনুসরণ করিতেছি।

মিঃ ব্রুটন বলিতেছেন—"মালকান্দির রাজসভায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা আমি সরলভাবে বলিয়া গেলাম। এক্ষণে নবাব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। নবাব এই পাষাণ প্রাচীরময় দুর্গমধ্যে, দরবারাদি করিলেও এবং এই দুর্গমধ্যে অসংখ্য প্রাসাদ কক্ষ বর্ত্তমান থাকিলেও, তিনি এতন্মধ্যে না থাকিয়া রাত্রিতে স্বতন্ত্র তাঁবুতে অবস্থান করিতেন। এই তাঁবুর মধ্যে তাঁহার বিশ্বাসী অনুচরবর্গ, সেনা ও সেনাপতিগণ ভিন্ন আর কেহই থাকিতে পারিত না। উড়িষ্যার স্বাধীন হিন্দু নৃপতি, মুকুন্দদেবের পরিত্যক্ত প্রাসাদে নবাব যে রাত্রি যাপন করিতেন না, তাহার কারণ এই—তাঁহার মনে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল, যে অপরের ব্যবহৃত রাজপুরী, কখনও মোগল শাসন-কর্ত্তার আরামকক্ষে পরিণত হইতে পারেনা। নবাবের নৈশ-শিবিরে তিন শত রমণী বাস করিতেন। তাঁহাদের সকলেই সদ্বংশজাত। *

(৯ই মে)। নবাবের রাজসভা হইতে বিদায় লইয়া, আমরা সমস্ত জিনিষ পত্র বাঁধিয়া কটকাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ১০ই তারিখের অপরাহ্নে

* Although the Palace of the Nabob be so large in extent and so magnificient in structure, yet he himself will not lodge in it but every night he lodgeth in tents with his most trusty servants and guards about him. For it is an abomination to the Moghals (Which are whitemen) to rest or sleep under the roof of a house that another man hath built for his own house. And therefore he was building a palace which he purposed should be a fabric of rest and future remembrance of his renown ; he likewise keepeth three hundred women who are all of them the daughters of the best and ablest subjects that he hath." Bruton's Narrative (Wilson). পাঠক! ইহা হইতেই অনুমান করিয়া লউন, সেকালের একজন প্রাদেশিক মোগল শাসনকর্ত্তা' কিরূপভাবে দ্বিতীয় বাদসাহের ন্যায় ঐশ্বর্য্যময় জীবনযাপন করিতেন।

আমরা হরহরাপুরে (হরিহরপুর) উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আমাদের কোন আশ্রয়স্থান ছিল না, কাজেই আমরা আমাদের দলের মধ্যে যে দ্বিভাষী ছিল, তাঁহার বাটিতেই সে রাত্রে রহিলাম। আমাদের আগমন-বার্ত্তা নগরের শাসনকর্ত্তাকে জানাইয়া, ফারমান ও ছাড়পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইলাম। শাসনকর্ত্তা সেই ফারমানখানিকে মোগল সম্রাটের হুকুমনামা ভাবিয়া, দুই তিনবার সম্মানের সহিত মস্তকে স্পর্শ করিলেন। তৎপরে প্রসন্নভাবে আমাদিগকে বলিলেন, "যখন বাদসাহী ফারমান আপনাদের সঙ্গে, তখন আমি আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিব।" আমরা সেই শাসনকর্ত্তাকে কিছু নজর উপহার দিলাম।

(১২ই তারিখ।) মিঃ কলি ও অন্যান্য যে সব সহযাত্রীকে, আমরা পশ্চাতে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, তাঁহাদের সকলেই এই স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। আমরা জিনিষপত্র রাখিবার জন্য একটী বাড়ী ভাড়া লইলাম। ইহাই আমাদের অস্থায়ী আশ্রয়স্থান হইল।

হরিহরপুর সহরটী ছোট হইলেও বেশ জাঁকালো। অনেক লোকজন এখানে বাস করে। নগরটী দীর্ঘ ও প্রস্থে ছয় সাত মাইল। এখানে অনেক ব্যবসায়ী আছেন। বাজারে নানাবিধ মালপত্রও যথেষ্ট। এই নগর তন্তুবায় প্রধান স্থান। সহরে তিনহাজার তাঁতি বাস করে। কাপড়-চোপড় এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

(১৪ই মে।) অদ্য আমাদের দলের কয়েকজন সহর পরিভ্রমণে গিয়া বাদসাহের প্রতিনিধি প্রদত্ত ফারমানের বলে বসবাসের জন্য এক ভূমিখণ্ড নির্দ্ধারিত করিয়া আসিলেন।

(১৫ই মে।) অদ্য আমরা জন মজুর সংগ্রহ করিয়া, আমাদের দখলীভূত জমীটুকু মাপ করিলাম এবং ইহার উপর নূতন কুঠীর ভিত্তিস্থাপন করিলাম। যাহাতে গৃহনির্ম্মাণকার্য্য শীঘ্র হইয়া যায়, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে এত বৃষ্টি হইল, ও আমাদের মিস্ত্রিরা যতখানি গাঁথিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এমনভাবে ধুইয়া গেল, যেন ইতিপূর্ব্বে তথায় কোন কিছুই করা হয় নাই।

(১৬ই জুন।) আমাদের অগ্রণী মিঃ কার্টরাইট্ তাঁহার দুইজন সঙ্গীকে লইয়া বালেশ্বর (ব্রুটন লিখিয়াছেন Ballazary) যাত্রা করিলেন।† তাঁহার মনের ইচ্ছা, বালেশ্বর হইতে তিনি খাস বঙ্গদেশে প্রবেশ করিবেন।

† ব্রুটন যে ভাবে নামগুলির বানান করিয়াছেন আমরা সেইরূপই রাখিলাম।

ঠিক এই সময়ে, বিলাত হইতে "সোয়ান" বলিয়া একখানি জাহাজ মসলীপত্তনে উপস্থিত হয়। "সোয়ান" অনেক মালপত্র আনিয়াছিল। মসলীপত্তনের কর্ত্তারা যখন সংবাদ পাইলেন, উড়িষ্যার মধ্যে আমরা বাণিজ্যাধিকার লাভ করিয়াছি, তখন তাঁহারা বড়ই আনন্দিত হইলেন। মসলীপত্তনের ফ্যাক্টার তখনই এক মন্ত্রণাসভার অধিষ্ঠান করিয়া স্থির করিলেন, যে "সোয়ান" বিলাত হইতে আসিবার পথে, যে সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহা বঙ্গদেশে বিক্রয়ের চেষ্টা করা হইবে।" তখন পারস্য, আরব, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বন্দর ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাণিজ্যদ্রব্যের আদান প্রদান জন্য, চাউল, চিনি, মাখন, গম্‌ল্যাক্ (ল্যাক্) রেশম, রেশমীবস্ত্র, স্যাশ্, (পাগড়ীর কাপড়), আলিজা (পাঁচগজ লম্বা রেশমী কাপড়), ছিট্, সাদাকাপড় প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্যরূপে নানা দেশে ক্রীত ও বিক্রীত হইত।

মসলীপট্টন হইতে যাত্রা করিয়া "সোয়ান" জাহাজ, হরিশপুরে পৌছিল। ইংরাজগণ জাহাজের উপস্থিতি জ্ঞাপনের জন্য, সমুদ্রবক্ষ হইতে তিনবার তোপধ্বনি করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বকথিত ফ্যাক্টারগণ হরিহরপুরে ছিলেন। এজন্য সোয়ানের কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের তোপধ্বনির কোন উত্তরই পাইলেন না। কোন সংবাদ না পাইয়া সোয়ানের কাপ্তেন পরদিন প্রভাতে, হরিশপুর হইতে নঙ্গর তুলিয়া বালেশ্বরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বালেশ্বরে তাহারা মিঃ কার্টরাইটের সন্ধান পান। *

কিন্তু সোয়ান জাহাজের মালপত্র, দুর্ভাগ্যক্রমে কোন স্থানেই বিক্রীত হইল না। "সোয়ান" প্রচুর পরিমাণে বনাত, সীসা ইত্যাদি জিনিসের বোঝাই লইয়া আসিয়াছিল। বালেশ্বরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী বন্দর সমূহে তাহার খরিদ্দার জুটিল না। এক বৎসরকাল সেই মাল অবিক্রীত অবস্থায় বালেশ্বরে পড়িয়া রহিল। সেকালের ইংরাজ নাবিকগণ, প্রবৃত্তি সংযমের মর্য্যাদা জানিতেন না। তাঁহাদের অনেকে নানাবিধ ফলমূল ও বালেশ্বর জাত "আরক" নামধেয় মদিরা পানে পীড়িত হইয়া পড়িল। জ্বর, কলেরা রোগেও অনেকে মরিল। টমাস কীল, জ্বরে ভুগিয়া দেহত্যাগ করিলেন। উড়িষ্যার মৃত্তিকায় তাঁহার সমাধি হইল।

উড়িষ্যায় বাণিজ্য করিতে আসিয়া, দৈবপ্রতিকূলতাবশে, ইংরাজদের নানা বিপত্তি ঘটিল। স্থানীর শাসনকর্ত্তাদের দ্বারা তাঁহারা আদৌ উৎপীড়িত না হইলেও,তাহাদের অনেকেই রোগে ভুগিয়া উড়িষ্যার বালুকাময় মৃত্তিকাগর্ভে

* Bruton's Voyages. Hedges Diary Vol. III P. 179. (C. R. Wilson).

সমাধিরচনা করিয়া লইল। এক বৎসরের মধ্যে, পাঁচ ছয়জন ফ্যাক্টার মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। "সোয়ান" জাহাজের পর "টমাস" বলিয়া আর একখানি জাহাজ বাণিজ্য-দ্রব্যাদি লইয়া পুনরায় উড়িষ্যার বন্দরে উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে জল-হাওয়ার দোষে, টমাস পোতবক্ষ মধ্যে, চারিজন নাবিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং জাহাজের অনেক মাঝি-মোল্লা ভয়ানকরূপে পীড়িত হইয়া পড়ে। *

বিধাতার একান্ত ইচ্ছা, যে কর্ম্মবীর ইংরাজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থে প্রবেশ করিবেন। এই বঙ্গদেশ হইতেই, তাঁহাদের সৌভাগ্যসূচনা হইবে, এই শস্য-শ্যামলা, ফলজলপূর্ণা বঙ্গে, তাঁহারা রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবেন, একদিন সমগ্র ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইবেন, কাজেই তাঁহাদের উড়িষ্যার বাণিজ্য সম্বন্ধে নানাবিধ দৈববিপত্তি উপস্থিত হইল। এই সময়ে আবার মগ জল দস্যুরা, উড়িষ্যার উপকূলে ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিল। তাহারা ইংরাজ-দের কয়েকখানি বোট আটক করিয়া, বাণিজ্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। ইহার উপর পর্টুগীজ ও দিনামারেরাও ইংরাজদের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল। এই সমস্ত অসুবিধার সহিত, ক্রমাগতঃ প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া, কার্টরাইট্ বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। হরিহরপুর ও বালেশ্বরে তাহাদের যে কুঠী স্থাপিত হয়, তাহাই কেবল বর্ত্তমান রহিল। কার্টরাইট্, পুরী ও হিজলীতে দুইটী নূতন বাণিজ্য কুঠী খুলিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। ঘটনাবশে হরিহরপুর যে নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, তাহাতে ক্রমশঃ চর পড়িতে লাগিল।

কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংরাজেরা উড়িষ্যার কুঠী লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মান্দ্রাজে উড়িষ্যার কুঠীর বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে, ক্রমাগত অভিযোগ পত্র যাইতে লাগিল। ইহার ফলে, মান্দ্রাজ হইতে একজন অধ্যক্ষ প্রেরিত হইলেন। তিনি বহু অনুসন্ধানের ও চিন্তার পর বালেশ্বর সহরেই একটী নূতন বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করেন। এই কুঠীর কর্ম্মচারী সংখ্যাও বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তিনি যতদিন বালেশ্বরে ছিলেন, কর্ম্মচারীরা ততদিন কোন বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিল না, বা অবাধ্যতা দেখাইল না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিবার পরই, বালেশ্বরের

* Hedges Diary. III, 181.
Do Do III. 181.

ইংরাজকর্ম্মচারিগণ, কুঠীর কার্য্যের অসুবিধা সম্বন্ধে নানা অভাব অভিযোগ করিতে লাগিলেন। কুঠীগুলির "বামণ গেলোঘর" গোছ অবস্থা দাঁড়াইল। আর এই সমস্ত অসুবিধা বিশৃঙ্খলতা ও অভিযোগের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মান্দ্রাজের ও বিলাতের কর্ত্তাদের নিকট পৌছিল।

সপ্তম অধ্যায়।

ইংরাজদিগের বালেশ্বর ত্যাগ ও খাসবাঙ্গালায় প্রবেশ।

(হুগলীতে প্রথম বাণিজ্যকুঠী স্থাপন)

(১৬৫০-১৬৫৭)

ইংরাজের উড়িষ্যার বাণিজ্যের অসুবিধা—বালেশ্বরত্যাগ—খাসবঙ্গদেশে প্রবেশ, বাণিজ্যস্বত্বলাভ—দৈবপ্রেরিত সুযোগ—সাহাজাহান বাদসাহের কন্যা সাহাজাদী জাহানারার দৈববিপত্তি—ডাক্তার বৌটনের বাদসাহকন্যার চিকিৎসা জন্য আগরায় গমন—সম্রাট পুত্র সাহসুজার সহিত বৌটনের পরিচয়—হুগলীতে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের জন্য ব্রিজমান ও ষ্টিফেন্‌সের চেষ্টা। বৌটনের চেষ্টায় বঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের স্বত্বলাভ—হুগলীতে প্রথম ইংরাজ কুঠীস্থাপন—হুগলীর কুঠীতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা—প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজ কোম্পানী—বেনামী বাণিজ্য—বিলাতের কর্ত্তাদের চেষ্টায় বিশৃঙ্খলার প্রতিকার—সাহাজাহানের মৃত্যু—বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বসূচনা—সম্রাট পুত্রগণের সিংহাসনলাভের জন্য আত্মবিগ্রহ—ঔরঙ্গজেবের জয়লাভ—"আলমগীর" উপাধি ধারণ ও সিংহাসনে অধিরোহণ—সাহাজাহানের মৃত্যু—মীরজুমলার বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ—এই রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনে ইংরাজবণিকদের বিপত্তি—হুগলীর ফৌজদারের অত্যাচার—মীরজুমলার সহিত ইংরাজের বাৎসরিক তিন সহস্রমুদ্রা রাজস্বদানের বন্দোবস্ত—কুচবিহার ও আসামে বিদ্রোহ—মীর-জুমলার মৃত্যু—নবাব সায়েস্তা খাঁর বঙ্গে আগমন—ইংরাজ বাণিকের প্রতি নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রীতি—সুবিধাকর বাণিজ্য স্বত্ব দান—বাঙ্গালার ইংরাজ ফ্যাক্‌টারিতে পুনরায় গোলযোগ—বিলাত হইতে ষ্ট্রিনশ্যাম মাষ্টারের গবর্ণর পদ লাভ—ষ্ট্রিনশ্যামের বঙ্গে যাত্রা—তাঁহার সময়ে বঙ্গের ইংরাজ বাণিজ্যের অবস্থা—হিজলী দুর্গ—বেতোড়—থানা দুর্গ (মেটিয়া বুরুজ)—প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রাম বরাহনগর ও চন্দননগরে দিনেমার ও ফরাসী বণিকদের কুঠী—বরাহনগর নাম হইবার কারণ—চুঁচুড়ার দিনেমার ফ্যাক্‌টারি—হুগলী ঘোলঘাট—সেকালের কাশিমবাজার—কাশিমবাজারের বাণিজ্য—কাশিমবাজারের কুঠীর আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা—রঘু পোদ্দার ও অনন্তরামের ব্যাপারে মাষ্টার কর্ত্তৃক তদন্ত—কাশিম বাজার বাণিজ্যকুঠির মধ্যে বিশৃঙ্খলা—মালদহে প্রথম কুঠী স্থাপন—ষ্ট্রিন-শ্যাম মাষ্টারের মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন—তিন বৎসর পরে পুনরায় বঙ্গে আগমন কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ভিন্‌সেণ্ট সাহেব—তাঁহার আমলে ইংরাজ

বাণিজ্যের উন্নতি—ভাগিরথী বক্ষে ইংরাজের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ "ফ্যাকনের" প্রবেশ—জাহাজের কাপ্তেন ষ্টাফোর্ড সম্বন্ধে একটী রহস্যজনক ঘটনা—কার্য্য-সূত্রে ইংরাজের সহিত বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রথম পরিচয়—রতন সরকারের সম্বন্ধে রহস্যকর ঘটনা—সেকালের বাঙ্গালীর ইংরাজীজ্ঞানের নমুনা।

বালেশ্বরে ইংরাজ কুঠীর কর্ম্মচারীদের অবস্থা যখন এইরূপ বিশৃঙ্খল, এবং তাঁহারা বালেশ্বর ত্যাগ করিয়া, খাসবাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তখন আরও কয়েকটী ঘটনা, ইংরাজদিগকে বালেশ্বর ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। এই সময়ে মান্দ্রাজ ও মসলিপট্টনের বাণিজ্য, ক্রমে হতশ্রী হইয়া পড়িতেছিল। অপরন্তু ঐ সকল প্রদেশে, দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে, ক্রমাগতঃ আত্ম-দ্রোহ-জনিত যুদ্ধবিগ্রহে এবং করাল দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে, করমণ্ডল উপকূলের ইংরাজ-বাণিজ্য অতি শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইল।

এই সকল কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরা, করমণ্ডল উপকূল ও বালেশ্বরের বাণিজ্যের উপর নির্ভর না করিয়া, খাস বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। বিধাতা তাঁহাদের প্রতি সদয় হইয়া এ সম্বন্ধে একটা সুবিধাও ঘটাইলেন।

কোম্পানীর "হোপ্‌ওয়েল" জাহাজের ডাক্তার ছিলেন—গেব্রিয়েল বৌটন। এই বৌটন সাহেব, সেকালের ইংরাজদের মধ্যে আত্মত্যাগের আদর্শ। তাঁহার অমানুষিক স্বার্থত্যাগের জন্যই, তিনি স্বজাতির যথেষ্ট উপকার করিতে সমর্থ হন। বৌটন ইচ্ছা করিলে, এই ঘটনা উপলক্ষে নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি স্বজাতির স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহা করেন নাই। এজন্য তিনি ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

ব্যাপারটী কি, তাহা বলিতেছি। সাহাজাদী জাহানআরা দিল্লীশ্বর সাহজাহানের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠ কন্যা। পিতার কক্ষ হইতে একদিন গভীর রাত্রে, নিজ কক্ষে প্রত্যাগমনকালে, কক্ষগাত্রস্থ দীপালোকে, তাঁহার ওড়নায় একাংশে আগুন ধরিয়া যায়। যেস্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে, সেস্থানে চীৎকার করিবারও কোন উপায় ছিল না। পাছে রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত চীৎকার, পুরুষের কর্ণগোচর হয়, আর সে চীৎকার ধ্বনি রঙ্গমহলের বাহিরে যায়, এই ভয়ে নারীসম্ভ্রম রক্ষার জন্য, সেই বিপদময় জলন্ত অবস্থাতেই, সাহজাদী জাহান-আরা, নিজকক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনের কোন

আশাই ছিলনা।* তখন বৌটন সাহেব, সুরাটে ছিলেন। সম্রাট-কন্যার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে জোর তলব হয়। সুরাটের মোগল শাসনকর্ত্তা আসালত খাঁ, ডাক্তার বৌটনকে আগরায় পাঠাইয়া দেন। ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে, বৌটন আগরা রাজধানীতে উপস্থিত হন। স্বভাবগুণে ও চিকিৎসা-পটুতায় বৌটন সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হয়েন।

আগরায় অবস্থানকালে, সম্রাটপুত্র সাহসুজার সহিত, তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্টতা হয়। ইহার পর সাহসুজা, বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। সে সময়ের কাগজপত্র হইতে জানিতে পারা যায়, বৌটন সাহেব রাজমহলে সাহজাদা সুজার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন।

এদিকে বিলাতের কর্ত্তাদেরও মতি-গতি ফিরিল। তাঁহারা যখন বুঝিলেন, দিনেমারেরা গাঙ্গ্য-প্রদেশে বাণিজ্য দ্বারা যথেষ্ট ফল পাইতেছে, তখন তাঁহাদের মনে বঙ্গদেশে ফ্যাক্টরী বা বাণিজ্যাগার খুলিবার বাসনা অতি প্রবল হইয়া উঠিল। এই ভাবিয়া তাঁহারা বিবিধ বাণিজ্য-দ্রব্যপূর্ণ "লিয়নেস্" নামক একখানি জাহাজ ভারতে প্রেরণ করিলেন।

২২ সে আগষ্ট তারিখে (১৬৫০) "লিয়নেস্" মান্দ্রাজে আসিয়া নোঙ্গর করে। মান্দ্রাজ ফ্যাক্টারীর কর্ত্তারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে নবাগত জাহাজখানিকে সরাসর বঙ্গদেশের মধ্যে, হুগলীতে না পাঠাইয়া, প্রথমে বালেশ্বরে নোঙ্গর করান হউক। জাহাজ বালেশ্বরেই থাকিবে, কেবল কয়েকজন ফ্যাক্টার হুগলী পর্য্যন্ত গিয়া, তথাকার সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া, যথাবিহিত কর্ত্তব্য করিবেন। দিনেমার জলদস্যুদের হস্তেও পথিমধ্যে বিপদ ঘটা খুব সম্ভব, এইজন্য জাহাজখানিকে অতি সাবধানতার সহিত পরিচালিত করিতে হইবে। সকলেই এই মত সমীচিন বলিয়া বোধ করিলেন। ব্রুক হাভেন নামক একজন দক্ষ ইংরাজের অধীনতায়, কয়েকজন ফ্যাক্টর "লিয়নেস" জাহাজকে লইয়া বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সোরা, চিনি ও রেশম, এই তিনটী তখনকার কালে, বঙ্গদেশের প্রধান লাভকর বাণিজ্য-দ্রব্য। কাপ্তেন ব্রুক হাভেন্ বালেশ্বরে পৌছিয়া, তাঁহার

* সম্রাটকন্যার এই দুর্ঘটনার তারিখ লইয়া অনেক গোলমাল আছে। মুসলমান ইতিহাস লেখকদের মতে, এই ঘটনা ১৬৪৩-৪৪ খৃঃ অব্দে হয়। বৌটন ১৬৪৫ খৃঃ অব্দের প্রথমে সুরাট হইতে প্রেরিত হন। উক্ত ইতিহাস-লেখকেরা আরও বলেন, যে লাহোর হইতে এক জন দক্ষ হকিম আসিয়া সম্রাটকন্যার দগ্ধক্ষতের চিকিৎসা করেন। বৌটন বিলম্বে পৌছিয়াছিলেন। এ মত বিভিন্নতা স্বত্বেও, বৌটন যে দিল্লীর সম্রাট-দরবারে একটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের, এই কয়টী দ্রব্যের ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রচলন সম্বন্ধে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করেন এবং তাহাদিগকে সময়োপযোগী নানাবিধ উপদেশ দিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

এই উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া, ব্রিজম্যান ও ষ্টিফেন্স নামক দুইজন ফ্যাক্টার ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে হুগলীতে বাণিজ্যকুঠী স্থাপনের জন্য যাত্রা করেন। গেব্রিয়েল বৌটন সাহেবও উন্মুক্তনেত্রে ইংরাজ বণিকদিগের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতে ছিলেন। কারণ, তিনি ইতিপূর্ব্বেই তিনহাজার মুদ্রা নজরানা দিয়া, সম্রাট-পুত্র সাহসুজার নিকট হইতে, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রেই বিনাশুল্কে ইংরাজদের বাণিজ্যের অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই অনুমতি পত্রের বলে, ইংরাজগণ বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। হুগলী ও বালেশ্বরে তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে সোরা ক্রয় করিতে পারিবেন, এরূপ আদেশও ইহাতে থাকে।

ইহার পর, সেকালের কাগজপত্র হইতে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা বড় আশাপ্রদ নহে। ইংরাজ স্থাপিত হুগলীর প্রথম বাণিজ্যাগার, নানা কারণে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সকল দিকেই ঘোর বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ। বেগতিক দেখিয়া,মান্দ্রাজের কর্ত্তারা বাঙ্গালা হইতে দপ্তর তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতার লিপিবশে,এই সময়ে ইংলণ্ডে ঘোরতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ইংলণ্ড তখন সাধারণ-তন্ত্র-বিধায়ক ক্রমওয়েলের শাসনাধীন। প্রজাতন্ত্র শাসনের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব। কোম্পানীর বিলাতের কর্ত্তারা, সুযোগ বুঝিয়া ক্রমওয়েলের নিকট তাঁহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় চার্টারটী নূতন করিয়া লইলেন। *

১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার প্রতিকারের উপায় হইল। ইংলণ্ডীয় রাজ-স্বত্বাধীনে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে গঠিত হইয়াছিল, তাহারা ব্যতীত, আরও অনেকে, নূতন কোম্পানী গড়িয়া ভাগ্য-পরীক্ষার্থে, ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ক্রমওয়েলের আমলে, বিলাতের অধ্যক্ষেরা তাঁহার নিকট নূতন "চার্টার" প্রাপ্ত হন।

* হুগলীর বাণিজ্য-কুঠির অবস্থা বস্তুতই এই সময়ে অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মান্দ্রাজ কৌন্সিল, বিলাতে যে পত্র লেখেন, তাহার একাংশ এই—"বাঙ্গলার ফ্যাক্টারেরা ...রী হইয়াছে। বাদশাহী ছাড় ও নিশান তাহাদের হস্তগত থাকায়, তাঁহারা নিজেরাই বেনামে ব্যবসা চালাইতেছে। ইহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থ ক্ষতি হইতেছে। গেব্রিয়েল বৌটন মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী একজন ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছেন। এই নবদম্পতি এক্ষণে একযোগে, কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের নিকট, বৌটনের প্রাপ্য আদায়ের জন্য এক দাবি উপস্থিত করিয়াছেন।"

ক্রমওয়েলও ইহাঁদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। যাহাতে ইংরাজ কোম্পানী, দিনেমার ও পর্টুগীজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায়, ভারতীয়গণের চক্ষে হেয় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহার প্রতিকার জন্যও তিনি সুব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিলাতে আটঘাট বাঁধিয়া, কোম্পানীর কর্ত্তারা, তাঁহাদের ভারতীয় ফ্যাক্টারীগুলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। নানাস্থানের ফ্যাক্টারেরা বেনামী বাণিজ্য, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দ্বারা কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থ ক্ষতি করিতেছিল। বিলাতের কর্ত্তারা এতৎ প্রতিকারার্থে এক বিধান করিয়া পাঠাইলেন—"কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারিই বেনামে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচারীদের অর্থলোলুপতা দূর করিবার জন্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল, এই বর্দ্ধিত হারে বেতন গ্রহণের পূর্ব্বে, তাঁহাদিগকে এক সিকিউরিটী বণ্ড বা জামিননামায় স্বাক্ষর করিতে হইবে। তাঁহারা কোম্পানীর ভারতীয় কুঠীতে যে দিন যে কাজ করিবেন, তাহার রোজনামচা বা ডায়ারি করিয়া, তাহার নকল বিলাতের কর্ত্তাদের গোচরার্থে পাঠাইবেন। কোম্পানীর ভারতীয় বাণিজ্যকুঠী সমূহের ফ্যাক্টরগণ—সুরাটকুঠীর অধীনস্থ হইবেন। বাণ্টাম, মান্দ্রাজ, পারস্য ও বঙ্গদেশে চারিটী বাণিজ্য-এজেন্সি স্থাপিত হইবে। ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশ, কাশিমবাজার এবং পাটনা প্রভৃতি স্থানে "সব-এজেন্সি" স্থাপিত হইবে। শেষোক্ত কয়টী স্থানের কুঠি হুগলীর কর্ত্তাদের অধীন থাকিবে। *

এই নূতন বিধানের বলে, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দের ২৭ শে ফেব্রুয়ারির ডেস্‌পাচ্ বা আদেশপত্র মতে, জর্জ্জ গটন সাহেব হুগলীর প্রধান "এজেণ্ট" নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার একশত পাউণ্ড বা আধুনিক হিসাবে পনর শত টাকা বাৎসরিক বেতন ধার্য্য হয়। তাঁহার অধীনে চারিজন "ফ্যাক্টার" রহিলেন।

* এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনও হইয়াছিল। কোম্পানীর সেই সময়ের বিবরণে প্রকাশ—"ব্রিজম্যান ও তাঁহার বন্ধুগণ যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সততা সম্বন্ধে কোম্পানীর কর্ত্তাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়। (In fact Bridgeman and his friends were acting irregularly and dishonestly). হিসাব নিকাশ করিতে বলায়, ব্রিজম্যান ও ব্লেক ভয়ে চাকরী ছাড়িয়া পলায়ন করেন। ওয়ালিডি গ্রেভ্ নামক আর একজন ফ্যাক্টার হুগলী কুঠী ছাড়িয়া মান্দ্রাজে আসিতেছিলেন। তাঁহার নিকট কোম্পানীর দরকারী কাগজ পত্র ও সেরেস্তা ছিল। তিনি পথিমধ্যে এই প্রয়োজনীয় কাগজগুলি হারাইয়া ফেলেন। ইহার মধ্যে সম্রাটপুত্র সাহসুজার ফারমান ছিল, সেখানিও খোয়া গিয়াছে।"

Hedges Diary III.

Danver's Bengal its chief Agents and Sovernors.

Bruces Annals Vol I.

হপ্‌কিন্‌স বালেশ্বরের প্রধান এজেন্ট হইলেন। এই সময়ে কেন্‌ও কাশিম-বাজারের প্রথম ফ্যাক্টার বা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। চেম্বারলেন পাটনার নবস্থাপিত কুঠীর কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। আর কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা, জব চার্ণক, কাশিমবাজার কুঠীর চতুর্থ সহকারীরূপে নিযুক্ত হন।

বিলাতের কর্ত্তারা, বাঙ্গলায় ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠীর এইরূপ একটা সুব্যবস্থা করিয়া, অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু এই সময়ে, ভবিতব্যবশে ভারতেও এক মহা রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। বঙ্গদেশেও সে পরিবর্ত্তনের প্রবল-স্রোত পৌঁছিল। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর, সম্রাট সাহজাহান মূত্রকৃচ্ছ রোগে পীড়িত হন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। ঔরঙ্গজেবই সর্ব্বশেষে এই বিবাদে বিজয়লাভ করিয়া, দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দের ২২ সে জুলাই ঔরঙ্গজেব "আলম্‌গীর" উপাধি ধারণ করিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইহার কয়েক মাস পরে, আরাকানে সম্রাটের অন্যতম পুত্র, ইংরাজ বণিকদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক, সাহসুজার শোচনীয় পরিণাম ঘটে এবং নূতন বাদসাহের আদেশে, সেনাপতি মীরজুমলা বঙ্গদেশের শাসন-ভার-প্রাপ্ত হন।

স্থানীয় মোগল শাসনকর্ত্তারা, এই বিপ্লবের সুযোগে ইংরাজবণিকদিগকে নানারূপ অসঙ্গত দাবি দাওয়ায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। হুগলীর ফৌজদার বলিয়া পাঠাইলেন—"সম্রাট সাহজানের রাজ্যচ্যুতির সহিত, আপনাদের পূর্ব্ব-গৃহীত সনন্দ ও নিশান সমূহের চলিত স্বত্ব লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগকে নূতনভাবে সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইংরাজ কোম্পানীকে বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্কাদি বাবত, বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্ব দিতে হইবে।" এই সঙ্গে সঙ্গে বালেশ্বরের মোগল-শাসনকর্ত্তাও সমুদ্রোপকূলস্থ ইংরাজ জাহাজের উপর নঙ্গরী-মাশুলের হার চড়াইয়া দিলেন। বঙ্গদেশের মধ্যে, ভাগীরথী বক্ষে তখন বোম্বেটিয়া দস্যুদের বড়ই উৎ-পাত। তাহারা প্রচুর বাণিজ্য-দ্রব্য-পূর্ণ কোন নৌকা দেখিলেই, সুবিধামত লুঠ করিয়া লইত। এই সমস্ত বিপত্তির উপর, আর এক নূতন বিপত্তি ঘটিল। পাটনা হইতে সোরা বোঝাই লইয়া, ইংরাজ কোম্পানীর যে সব নৌকা আসিতেছিল, স্বয়ং মীরজুমলা সাহেব, সে গুলিকে রাজমহলে আটক করিলেন। চারিদিক হইতেই, ইংরাজেরা এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বাণিজ্যসূত্রে দেনা-পাওনার অনাদায়ী টাকার জন্য,

এই সময়ে ঘটনাবশে ইংরাজেরা একখানি মালপূর্ণ দেশীয়-নৌকা আটক করিলেন। কথাটা বঙ্গেশ্বর মীরজুমলার কাণে পৌছিল। মীরজুমলা হুগলীর কুঠীর অধ্যক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন—"পত্রপাঠ আপনারা যে মহাজনী নৌকা আটক করিয়াছেন, তাহা খালাস করিয়া দিবেন। অন্যথায় আমি হুগলী আক্রমণ করিয়া আপনাদের উচ্ছেদ করিব ও বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতেই ইংরাজ-বণিককে জন্মের মত বিতাড়িত করিব।" তখন ট্রিভিসা বলিয়া একজন ইংরাজ, হুগলীর কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে মান্দ্রাজের কর্তৃপক্ষদের আদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করিলে, মান্দ্রাজের কর্ত্তারা বলিয়া পাঠাইলেন,—"মীরজুমলার সহিত বিবাদে কোন প্রয়োজন নাই, যে নৌকা তোমরা আটক করিয়াছ, তাহা ছাড়িয়া দাও এবং সুবাদারের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর"। ট্রিভিসা সে যাত্রা এই ব্যবস্থায় মীরজুমলার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন এবং ইংরাজ কোম্পানীকে মোগল শাসন-কর্ত্তার অভিপ্রায়মত, বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রা, শুল্করূপে দিতে হইল।

এত কষ্ট, এত পীড়ন, এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও ইংরাজেরা হুগলী ও বঙ্গদেশের অন্যান্য বাণিজ্যাগারগুলি রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইংরাজদের পরম সৌভাগ্য, যে বঙ্গের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা মীরজুমলা সাহেব আর একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া, এসব ছোটখাট ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিলেন না। কারণ, এই সময়ে কুচবিহার ও আসাম-সীমান্তে মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মীরজুমলা সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য, রাজধানী রাজমহল ত্যাগ করিলেন। এই যুদ্ধান্তে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া, তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসেন এবং ঢাকাতেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

মীরজুমলার মৃত্যুর পর, নবাব সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশের গবর্ণর বা শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হন।

ইংরাজবণিকগণ সায়েস্তা খাঁর আমলে, অনেকটা সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বপ্রথামত বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রাই বাণিজ্য-শুল্করূপে মোগল-সরকারে প্রদান করিতে বাধ্য রহিলেন। ইহার পর ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে, নবাব সায়েস্তা খাঁ, ইংরাজদের পূর্ব্ব-প্রাপ্ত বাণিজ্য স্বত্বাদির সমর্থন করিয়া, আর এক নূতন পত্র আদেশ প্রচার করেন। তাহার সারমর্ম্ম এই—"এতদ্দ্বারা বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তাদের আদেশ করা যাইতেছে, যে

Bruce's Annals Vol. 1. Stewart's Bengal. P. 189.

ইংরাজেরা বলেশ্বর, পাটনা, কাশিমবাজার, হুগলী প্রভৃতি বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতে, তাঁহাদের মাল-পত্রাদি স্বচ্ছন্দে আমদানী রপ্তানী করিতে পারিবেন। যাহাতে এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়, স্থানীয় মোগল-শাসনকর্ত্তারা, সে দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। যাহাতে তন্তুবায়গণ, সওদাগরগণ বা ব্যবসায়ীগণ, ইংরাজ কোম্পানীকে ঠকাইতে না পারে, তদ্বিষয়েও সর্ব্ব বিভাগের শাসনকর্ত্তাদের দৃষ্টি থাকা উচিত। দিনেমারেরা যাহাতে বঙ্গের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য করিতে না পারে, তাহার সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে এক আদেশ প্রচার করিয়াছি। অপরন্তু ইংরাজগণ যাহাতে এ দেশে অবাধে বাণিজ্য করিতে পারেন, স্থানীয় শাসনকর্ত্তাগণ, তাহার সুব্যবস্থা করিবেন। ভবিষ্যতে যেন এ বিষয়ে ইংরাজদিগের নিকট হইতে আমাকে কোন প্রকার অভিযোগ না শুনিতে হয়।”

এইরূপ সুবন্দোবস্তাদি হইলেও, বাঙ্গলার নানাস্থানের ফ্যাক্টারিগুলির কাজকর্ম্ম উত্তমরূপে চলিতে ছিল না। কোম্পানীর বিলাতের কর্ত্তাদের আদেশ ছিল, যে মান্দ্রাজের (ফোর্ট সেণ্টজর্জ্জ) ফ্যাক্টারীর প্রধান-কর্ত্তা বা গবর্ণরকে, অধীনস্থ ফ্যাক্টরিগুলি প্রধান বলিয়া মান্য করিবেন। কোম্পানীর বঙ্গীয় বাণিজ্য-কেন্দ্রসমূহ, মান্দ্রাজের কর্ত্তাদের হুকুমানুসারে পরিচালিত হইবে। কিন্তু হুগলী, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানের ফ্যাক্টারেরা, এ সব কথা প্রায়ই কাণে তুলিতেন না। তাঁহারা কেবল আত্মবিবাদ, বৃথা তর্কে প্রমত্ত হইয়া, কোম্পানীর লাভালাভের অনিষ্ট করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া বিলাতের-কর্ত্তারা মনে মনে ভাবিলেন, বিলাত হইতে একজন শক্ত লোক না পাঠাইলে ভারতীয় বাণিজ্যাগার সমূহের উন্নতি ও সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা অতি সুদূর-পরাহত। এইজন্য তাঁহারা বিলাত হইতে ষ্ট্রীনশ্যাম মাষ্টার বলিয়া এক সুদক্ষ ইংরাজকে মান্দ্রাজের কুঠী সমূহের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া পাঠান। ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইনি ইংরাজের সুরাট ফ্যাক্টারীর গবর্ণর রূপে, যথেষ্ট যশঃ সঞ্চয় করিয়া বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

মাষ্টারকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন—“বঙ্গদেশের ও উড়িষ্যার কুঠীর কর্ম্মচারিগণ, অতিশয় যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইয়াও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক রেশমের গুপ্ত-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ায়, আমাদের যথেষ্ট অর্থ ক্ষতি হইতেছে। আপনি বঙ্গদেশে ও উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে এই গুপ্ত-বাণিজ্যের মূলোচ্ছেদ করিবেন। বিলাত হইতে আমরা যে সমস্ত মাল,

বিক্রয় জন্য ভারতে রপ্তানী করি, কিম্বা বঙ্গদেশ হইতে যে সকল মাল আমদানী হয়, তাহার ক্রয়বিক্রয় সৌকর্য্যার্থে সুবিধাকর বন্দোবস্ত করিবেন। প্রত্যেক ফ্যাক্টারীর মালপত্র ও হিসাব, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তজ্‌বিজ্‌ করিবেন। ফ্যাক্টারদিগের মধ্যে কে কিরূপ চরিত্রের লোক, তাহারও এক কাগজ প্রস্তুত করিবেন। যাহাতে তাহারা বৃথা বিবাদবিসম্বাদ ও হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া, কোম্পানীর কার্য্যে মনোযোগী হয়, তাহারও সদুপায় করিবেন। কাশিমবাজার কুঠীতে রঘু-পোদ্দারের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহারও একটা তদন্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।"

এইরূপভাবে উপদেশ পাইয়া, মাষ্টার সাহেব ১৬৭৬ খৃঃ অব্দের ৮ই জানুয়ারী, বিলাত ত্যাগ করেন। বিলাত ছাড়িবার সাত মাস পরে, তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। জুলাই মাসে "ইগল" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া, তিনি বালেশ্বরের নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার বঙ্গে আগমনের এক খানি ডায়ারী বা রোজনামচা রাখিয়া গিয়াছেন। এখানি আজও বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সুরক্ষিত। এই রোজনামচা হইতে বঙ্গদেশের সম্বন্ধে প্রায় আড়াই শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা জানিতে পারা যায়। আমরা এই রোজনামচা হইতে পুরাতন স্থানসমূহ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি।

এই সময়ে বঙ্গদেশের উপকূলে বালেশ্বর, মধ্যভাগে হুগলী ও কাশিমবাজার, উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে পাটনা, সিংহিয়া * পূর্ব্ব প্রান্তে ঢাকা, ইংরাজের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এতদ্ব্যতীত রাজমহলেও একটী ক্ষুদ্র এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছিল।

বালেশ্বরের তীরভূমিতে "ইগলকে" ত্যাগ করিয়া মাষ্টার একখানি এদেশীয় ক্ষুদ্র জাহাজে উঠিলেন। ইগল জাহাজ, বালেশ্বর বন্দরেই নঙ্গর করিয়া, রহিল। মাষ্টারের ক্ষুদ্র তরণী, সাগর সঙ্গমের পথে, বঙ্গের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইল। এই মোহানার মুখে, সেই সময়ে অনেক গুপ্ত-চড়া ছিল। তাহাতে অনেক নৌকার বিপত্তি ঘটিত। চড়াগুলি সাবধানে পার হইয়া, মাষ্টারের তরণী ভাগিরথীবক্ষে প্রবেশ করিল। মাষ্টার লিখিয়াছেন, "জাহাজ নঙ্গর করিবার পর, জেলেরা নানারকমের মাছ বিক্রয়

---

* সিংহিয়ার অপর নাম লালগঞ্জ। গণ্ডকের পশ্চিম তীরে ইহার অবস্থান। কোম্পানীর পুরাতন কাগজপত্রে ইহা সিঙ্গি বলিয়া উল্লিখিত। এই সিংহিয়ার নিকটেই সোরার খনি ছিল। সোরা কোম্পানীর একটী প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। বেশীরভাগ সোরা এইস্থান হইতেই সংগৃহীত হইত।

করিতে আসিল। চারি পয়সার এত মাছ দিল, যে তাহাতে প্রায় দশ জনের খোরাক হয়। এইস্থানে নদীর মোহানা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বভাগে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। মোহানার পশ্চিমে, হিজলী দুর্গ। এই দুর্গ মোগল-সম্রাটের নির্ম্মিত। হিজলীর নিকট বাদসাহী লবণের কারখানা ছিল। সুন্দরবন হইতে সংগৃহীত মধুচক্রসমূহ হইতে, মোমও যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এগুলি মোগল-সম্রাটের একচেটিয়া ব্যবসা। নদীর এই স্থানের নাম "রোগ্‌স-রিভার" (Rogue's River), ইহা আরাকানী বোম্বেটিয়াদের প্রধান আড্ডা। সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক আরাকানী জলদস্যুদের ধ্বংসসাধনের পূর্ব্বে, নদীর এই অংশ বিনা বিপদে অতিক্রম করা বড়ই দুরূহ ছিল।

পরদিন মাষ্টারের ক্ষুদ্র তরণী বেতোড়ে উপস্থিত হয়। এই বেতোড় হইতেই, স্বরস্বতী নদীতে অতি পূরাকালে শত শত পর্টুগীজ জাহাজ বাণিজ্যার্থে সপ্তগ্রামের বন্দরে যাইত। তখন ইহার দুই দিকেই মোগলের থানা ছিল। এপারে বর্ত্তমান মেটিয়াবুরুজ ও ওপারে কোম্পানীর বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধুনাতন আবাসবাটীর স্থান অধিকার করিয়া, মোগলের থানা বা তাহার অপভ্রংশ "থানা" নামক মৃৎদুর্গদ্বয় বর্ত্তমান ছিল। এই দুর্গ দুইটী বর্ত্তমান থাকায়, পর্টুগীজ ও মগ জলদস্যুরা ভাগিরথীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহার পরেই ভাগিরথীর দক্ষিণকূলে জঙ্গলাবৃত গোবিন্দপুর গ্রাম। শেঠ ও বসুকেরা এখানে বাস করায়, গোবিন্দপুরের জঙ্গল অনেকটা পরিস্কৃত হইয়া আসিতেছিল। গোবিন্দপুরের দক্ষিণে আদিগঙ্গা এবং আদিগঙ্গার উপকূলে কালীতীর্থ। গোবিন্দপুরের নিকটেই কলিকাতা। কিন্তু তখন তাহা গভীর জঙ্গল সমাকীর্ণ।

মাষ্টার তাঁহার গন্তব্য-পথের অনেক স্থলেই "হলাণ্ডার্স" বা ডচ্‌দিগের সৌভাগ্য চিহ্নের পরিচয় পান। বরাহনগরে উপস্থিত হইয়া, তিনি ডচ্‌দিগের শূকরের কারখানা দেখিতে পান। এইস্থানে বড় বড় শূকর বধ করা হইত এবং লবণ-জারিত করিয়া তাহা ইউরোপে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইত।* চন্দননগরেও তিনি ডচ্‌দিগের একটী সুন্দর উদ্যানবাটী দেখিতে পান। ইহার পরেই ফরাসীদিগের ধ্বংশ প্রায় ফ্যাক্টারী, তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয়।

* অনেকে বলেন—বরাহনগরের চারিদিকে শূকরের বা বরাহের উৎপাত ছিল বলিয়া, ইহা "বরাহনগর" আখ্যালাভ করিয়াছে। শূকরঘটিত এ কিম্বদন্তী যে একেবারেই অমূলক নহে, তাহা মাষ্টারের লিখিত কাহিনী হইতেই প্রকাশ। আমাদের বোধ হয়, বরাহনগরে

চুঁচুড়াতে সে সময়ে ডচ-দিগের প্রবল আধিপত্য। ডচ্ ফ্যাক্টারী গুলি যেন সমুদ্রোপকূলস্থ ক্ষুদ্র নগরীর ন্যায় সদা হাস্যময়ী। সন্ধ্যার সময় তিনি হুগলী ঘোলঘাটে অবতীর্ণ হন। ইহার পর, তিনি হুগলি হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হয়েন। এই উদ্যানবাটীতে বিশ্রামান্তে তিনি কাশিমবাজারের দিকে অগ্রসর হন।

পাঁচদিন পরে কাশিমবাজারে উপস্থিত হইয়া,মাষ্টার সাহেব ইংরাজ কুঠীর মধ্যে প্রবেশ করেন। কাশিমবাজার তখন বাণিজ্যৈশ্বর্য্যে হুগলীর সমকক্ষ। মাষ্টার সেই সময়ের কাশিমবাজারের যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহা এই—"কাশিমবাজার একটী ক্ষুদ্র সহর। দুই মাইল ইহার বিস্তৃতি। রাস্তাঘাট অতি কম চওড়া। বিশেষতঃ যেখানে বাজার আছে, সে স্থানের পথ এত অপ্রশস্ত, যে একখানি ক্ষুদ্র পাল্‌কীও সুবিধার সহিত যাতায়াত করিতে পারে না। অধিকাংশ গৃহই মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। দেয়াল মেঝে সবই মাটীর। সকল বাড়ীর পিছনে বা পার্শ্বে, দুই চারিটী ক্ষুদ্র খাত আছে। এই জন্য এ স্থানটী বড়ই অস্বাস্থ্যকর। মৃত্তিকা অতি কোমল ও উর্ব্বর। কাষ্ঠ বড়ই দুর্ম্মূল্য। কাশিমবাজারের চারিদিকের ভূমিখণ্ডে তুঁতগাছের চাষ। এই তুঁতগাছের কচি পাতাই গুটীপোকার খাদ্য। এখানে যে রেশম উৎপন্ন হয়, তাহা হরিদ্রাবর্ণের। কিন্তু কাশিমবাজারের রেশম-ব্যবসায়ীরা, কলার বাসনার ছাই দ্বারা, এই রেশমকে কাচিয়া পরিষ্কার করে। তাহা প্যালেষ্টাইনের শ্রেষ্ঠ রেশম অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে।"*

মাষ্টার সাহেব সম্ভবতঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর কাশিমবাজারে উপস্থিত হন। কাশিমবাজার ফ্যাক্টারিতে পৌঁছিয়াই, তিনি মুক্সুদাবাদে মোগল শাসনকর্ত্তার নিকট তাঁহার পৌঁছান-সংবাদ প্রেরণ করেন এবং কাশিমবাজারে তিনি ছয় সপ্তাহের উপর কাল অবস্থান করিয়া, কোম্পানীর ফ্যাক্টারীর, সম্বন্ধে নানাবিধ সুবন্দোবস্ত করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোম্পানীর কুঠীর, ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা আন্তরিক সদ্ভাব ও বন্ধুত্বের ভাব খুব কম ছিল। এজন্য তাঁহার নিকট অনেক মামলা উপস্থিত হইল। ছোট খাট গোলমালগুলির মীমাংসা করিয়া, তিনি রঘু পোদ্দারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। এ ব্যাপারটী বিলাতের কর্ত্তাদের

ডচ্ দিগের এই বরাহ-মাংস জারণের কারখানা ছিল বলিয়াই, সম্ভবতঃ ইহা বরাহনগর বা তদপভ্রংশে বরানগর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ষ্ট্রেনসাম মাষ্টারস ১৬৭৬—৭৭ পৃঃঅব্দে বরাহনগর দর্শন করেন।

* Tavernier's Voyages. Vol. II.

কাণে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। রঘু পোদ্দার বহুদিন ধরিয়া, কোম্পানীর অধীনে খাজাঞ্চীর কাজ করিয়া আসিয়াছে। কাশিমবাজার কুঠীর তদানীন্তন অধ্যক্ষ ভিন্‌সেণ্ট সাহেব—রঘুকে কারাবদ্ধ করেন। রঘু পোদ্দার, কোম্পানীর নিকট কিছু টাকা ধারিত, তজ্জন্যই এই অবরোধ। ভিন্‌সেণ্ট সাহেব কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বলে গেলে, অনন্তরাম বলিয়া জনৈক ব্যক্তির উপর কারাবদ্ধ রঘুর রক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। এই অনন্তরাম কোম্পানীর অধীনে দালালী করিত। অনন্তরামের সহিত রঘুর পূর্ব্ব শত্রুতা ছিল। সে ভিন্‌সেণ্ট সাহেবের অনুপস্থিতির সুযোগে, রঘুকে অত্যন্ত প্রহার করে এবং তাহাতেই রঘুর প্রাণবিয়োগ হয়। তাহাতে স্থানীয় অধিবাসীরা অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠে। রঘু, মোগল বাদশাহের প্রজা—কাজেই ব্যাপারটা মোগল-শাসনকর্ত্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই ব্যাপার লইয়া, সেই সময়ে একটা মহা হুলস্থুল বাধিয়া যায়। তেরটী হাজার টাকা গণিয়া দিবার পর, ব্যাপারটা চাপা পড়ে। ষ্ট্রেন্‌সাম মাষ্টার, প্রায় দুইপক্ষকাল ধরিয়া এ হত্যাব্যাপার সম্বন্ধে তদারক করেন।

এই অনুসন্ধান ব্যাপারের সময়, কাশিমবাজারের কুঠীর ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে, মাষ্টারের নিকট নানাবিধ অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান ব্যাপার, ক্রমশঃ জটিল হইয়া দাঁড়াইল। মাষ্টার সাহেব বাঙ্গলার ফ্যাক্টারীতে নূতন আগন্তুক মাত্র, কাজেই এই সমস্ত অভিযোগ ব্যাপারের কোন সূক্ষ্ম মীমাংসাই হইল না। তবে মাষ্টার কার্য্যক্ষেত্রে "মাষ্টারের"মত কাজ করিলেন। তিনি এই সব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট,সমস্ত কর্ম্মচারীদের তিরস্কার করিয়া—তাহাদের মধ্যে কর্ত্তব্য বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহাদের কৃত প্রত্যেক কার্য্যের রিপোর্ট, যাহাতে মান্দ্রাজের সদর ফ্যাক্টারীতে যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই মালদহে নূতন ফ্যাক্টারী বা বাণিজ্যাগার স্থাপিত হইল। মালদহের এই নবস্থাপিত ফ্যাক্টারিটী লইয়া বাঙ্গলায় তখন ইংরাজের ছয়টী বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইল। ষ্ট্রেন্‌সাম মাষ্টার, বঙ্গের ইংরাজ কুঠীগুলির সম্বন্ধে নানাবিধ সুব্যবস্থা করিয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করেন।

১৬৭৯ খৃঃঅঃ, তিনি পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনবৎসর পূর্ব্বেতিনি বাঙ্গলার কুঠীগুলির যেরূপ অবস্থা দেখিয়া গিয়াছিলেন, এবারে আসিয়া দেখিলেন, তাহাদের যেন অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, কর্ম্মচারিগণ তাহাদের স্বভাবদোষ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ভিন্‌সেণ্ট

সাহেব তখনও কাশিমবাজারে বর্ত্তমান। ভিন্‌সেণ্টকে তিনি স্থানচ্যুত করিলেন না বটে, কিন্তু যাহাতে কুঠীগুলির কার্য্যসমূহ উত্তমরূপে চলে,তাহার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কুঠীর কর্ম্মচারীদের পরিচালিত ও সংযত করিবার জন্য, আরও কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত হইল। তখন কাশিমবাজারে ইংরাজের বাণিজ্যাগার স্থায়ীভাবে নির্ম্মিত হয় নাই। মাষ্টারই, কাশিমবাজার কুঠীর মৃৎকুটীরগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া, সেইস্থানে ইটের কোটা করিয়া দেন।

ভিন্‌সেণ্ট লোক ভাল ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার আমলে বাঙ্গলায় ইংরাজবাণিজ্য বড়ই তেজে চলিতেছিল। ১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দে ৬৫ হাজার পাউণ্ড মূল্যের বাণিজ্য দ্রব্য ইংরাজ-ফ্যাক্টারদের হস্তে সংন্যস্ত হয়। প্রয়োজন ঘটিলে, তাঁহারা আরও কুড়িহাজার টাকার মালপত্র চাহিতে পারিবেন, এ বন্দোবস্তও হইল। এই অর্থদ্বারা, রেশম, বাফ্‌তা, বৎসরে ছয়শত টন সোরা, উৎকৃষ্ট সাদা চিনি, সুতা, হরিদ্রা, মধুথ (মোম) প্রভৃতি কেনা হইত। ইহার দুইবৎসর পরে, বিলাতের বাজারে ঢাকা ও মালদহের রপ্তানী মালের কাটতি অতি প্রবল হয়। তাহাতে কোম্পানীও আশাতিরিক্ত লাভবান হন। এই লাভ দৃষ্টে প্রলুব্ধ হইয়া, তাঁহারা রপ্তানী বাণিজ্যের মূলধন একলক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেন। ইহার ফলে—বাঙ্গলায় ইংরাজের-বাণিজ্য খুব উন্নত হইয়া পড়িল। মান্দ্রাজ হইতে যে সমস্ত চালানী-মাল বিলাতে পৌছিত, তাহার চৌদ্দ আনা অংশ, বঙ্গদেশের ফ্যাক্টারী হইতে প্রেরিত হইত। ১৬৮০ খৃঃ অব্দের পুরাতন কাগজ পত্র হইতে জানা যায়, যে বাঙ্গলার ফ্যাক্টারদের হস্তে এই সময়ে দেড় লক্ষ টাকা মূলধন রূপে ন্যস্ত হয়।

এতদিন ইংরাজের বাণিজ্য-জাহাজ সমূহ বালেশ্বর পর্য্যন্ত আসিত। ভাগীরথী বক্ষ বাহিয়া,হুগলী প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করিতে পারিত না অথবা নানা কারণে সাহসও করিত না। সন ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে, ইংরাজের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ "ফ্যাকন" সর্ব্বপ্রথমে হুগলীতে উপস্থিত হয়। ইহা ইংরাজ কোম্পানীর বণিক্‌-জীবনের এক নূতন ঘটনা। কাপ্তেন ষ্টাফোর্ড, এই জাহাজের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাই ভাগীরথী বক্ষ প্রবেশকারী, ইংরাজের প্রথম বাণিজ্য-জাহাজ।

এই জাহাজ বর্ত্তমান গার্ডেনরিচ্ বা মেটিয়া-বুরুজে আসিয়া নঙ্গর করে। এই ফ্যাকন জাহাজের নঙ্গর-করা ব্যাপারের সহিত একটী রহস্যজনক গল্প জড়িত আছে। সে সময়ে গার্ডেনরিচ্ বা মেটিয়াবুরুজ * বাণিজ্য-পোতাদির নঙ্গর

* মেটিয়া বা মাটিয়া (মৃত্তিকা) বুরুজ (কেল্লা) ইহাই মেটিয়াবুরুজ শব্দের সহজ ব্যুৎপত্তি।

করিবার বিশেষ সুবিধাকর স্থান ছিল। জাহাজের অধ্যক্ষ ষ্টাফোর্ড সাহেব, এ দেশের ভাষা জানিতেন না। তবে তিনি শুনিয়াছিলেন যে গোবিন্দপুরের শেঠ-বসাকেরা কিছু কিছু ইংরাজী বুঝিতে পারেন। কাজেই ষ্টাফোর্ড গোবিন্দপুরে শেঠ-বসাকদের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দিয়া অনুরোধ করেন—"আমাদের একজন ডুবাসের বা দ্বিভাষির প্রয়োজন, তাহাকে ত্বরায় পাঠাইয়া দিবেন।"

শেঠ-বসাকেরা "ডুবাস" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া, সাহেবেরা একজন ধোপা চাহিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে, রতন সরকার নামক একজন ধোপাকে, তাঁহারা সাহেবদের জাহাজে পাঠাইয়া দেন। রতন একটু আধটু ইংরাজী বুঝিত। সে কতকগুলি উপঢৌকন লইয়া, ভদ্রলোকের মত পোষাক পরিয়া, জাহাজের কাপ্তেনের সহিত দেখা করিল। রতন ধোপার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তায়, কাপ্তেন সাহেব বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। রজক, রতনই ইংরাজের প্রথম দ্বিভাষীর পদ লাভ করিলেন। †

এক্ষণে আমরা এই হুগলী ফ্যাক্টারির অবস্থা ও কোম্পানীর তৎসাময়িক কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে আরও দুই চারি কথা বলিব। আমরা এই সন্দর্ভে আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বের ইংরাজদের কথা বলিতেছি, পাঠক যেন একথাটী মনে রাখেন। এখনকার সহিত তুলনায়,সেই সুদূরবর্ত্তী সময়ে, আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল। তখন মোগল এ দেশের অধিপতি। কোম্পানী বাহাদুর সামান্য ব্যবসাদার ও প্রজামাত্র। তাঁহারা এদেশের নানাস্থানে বাণিজ্যাগার স্থাপন করিয়া, এদেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করেন ও ইউরোপের নানা বন্দরে চালান দেন। কিম্বা ইউরোপ হইতে মালামাল রপ্তানি করিয়া এদেশের বাজারে বেচিয়া লাভ করেন। এই বিরাট ব্যবসায়ের মালিক, বিলাতের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে, বাছাই করিয়া একটী কোট অব ডিরেক্টার সভা বিলাতে সংগঠিত হইয়াছিল। তাঁহারাই ইতিহাসে "কোর্ট" নামে পরিচিত। বোম্বে, মান্দ্রাজ, সুরাট, বালেশ্বর ও বঙ্গদেশে

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মেটিয়াবুরুজে ও তাহার অপর পারে—জলদস্যুদের আগমন পথ রোধ করিবার জন্য, নবাব সায়েস্তা খাঁ—দুইটী মাটির কেল্লা প্রস্তুত করেন। ইহা হইতেই মেটিয়া বুরুজ নামকরণ হইয়াছে ও সেই নাম এখনও চলিয়া আসিতেছে।

† অনেকে অনুমান করেন,—বর্ত্তমান মাথাঘষা গলির সন্নিকটবর্ত্তী যে রাস্তাটী Rutton Sarker's Garden Street বলিয়া পরিচিত, তাহা এই রতনের নামে হইয়াছে এবং আজও রতনের নাম লোকের স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়াছে।

ইংরাজের বাণিজ্যকুঠী সমূহের সমস্ত কার্য্য তাঁহাদেরই আদেশে পরিচালিত হইত। এ বিরাট বাণিজ্য ব্যাপারে, তাঁহাদেরই মূলধন খাটিত। লাভ লোকসান তাঁহাদের—সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদের। পর্টুগীজ, দিনেমার, ডচ্ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক্ সম্প্রদায়ের প্রতিযোগীতা এবং বাধা বিপত্তির সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশে, উল্লিখিত স্থান সমূহে বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বাণিজ্য কুঠীর কার্য্য পরিচালনার জন্য তাঁহারা এজেণ্ট, ফ্যাক্টার, রাইটার, পরসার প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কর্ম্মচারীর সৃষ্টি করেন। কোম্পানীই বিলাত হইতে নিযুক্ত করিয়া এই সমস্ত কর্ম্মচারীকে এদেশে পাঠাইয়া দিতেন। এতদিন ইংরাজ কোম্পানী ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত পশ্চিম ও পূর্ব্ব উপকূলে বাণিজ্য কার্য্যেই বেশী মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু বালেশ্বরে কুঠী স্থাপনের পর হইতে, তাঁহারা শস্যশ্যামলা, ফলজলপূর্ণা, ঐশ্বর্য্যময়ী বঙ্গদেশের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

হুগলী ফ্যাক্টরীর অসম্ভব উন্নতি—আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে হুগলী ও ব্যাণ্ডেলের অবস্থা—হুগলীর-কুঠীর কর্ম্মচারিগণ—তাঁহাদের শাসনে রাখিবার জন্য বিবিধ কঠোর ব্যবস্থা—সেকালের ইংরাজদের দৈনিক জীবন—আহার ও অবস্থান প্রণালী—ইংরাজদের এ দেশীয় স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ—আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজদের আমোদপ্রমোদ ও শিকার। কোম্পানীর কুঠীর ইংরাজকর্ম্মচারী-দের বিশৃঙ্খল জীবন—তাহার প্রতিকারার্থে, নৈতিক-জীবন গঠনের চেষ্টা—বাঙ্গা-লীর সহিত ইংরাজের কার্য্যসূত্রে প্রথম সম্বন্ধ—ইংরাজের বাঙ্গালীর-প্রীতি—ইংরাজের বাণিজ্যে বাঙ্গালীর সহায়তা—ইংরাজ কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মানুরাগী করি-বার জন্য মাষ্টারের চেষ্টা—তৎসম্বন্ধে বিবিধ কঠোর ব্যবস্থা প্রচলন—তাহাদের নৈতিক-জীবন সংগঠন জন্য কঠোর বিধান—সেকালের অপরাধ—জরিমানা ও শাস্তি—ফ্যাক্টারদের শাসনে রাখিবার জন্য দ্বাদশটী আদেশ—সম্রাট ঔরঙ্গ-জেবের আমলের ইংরাজ সমাজ—কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের পাটনায় নিয়োগ—কাশিমবাজার ত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ—চার্ণকের অবাধ্যতা—বাঙ্গালার কুঠীসমূহের স্বাধীনতা—বঙ্গীয় কুঠীর প্রথম গবর্ণর হেজেস্—ইণ্টারলোপারদের প্রাধান্য—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজন্য বাণিজ্য ক্ষতি—হেজেস্ কর্ত্তৃক ইণ্টারলোপারদের ধ্বংসসাধন—ভিন্-সেণ্ট ও পিটের কথা—মোগল শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচার বৃদ্ধি—হুগলীর বাণিজ্যের সঙ্কটাবস্থা—হেজেসের মহাবিপত্তি—ঔরঙ্গজেবের দরবারে নূতন ফারমানের চেষ্টা—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফারমান—নূতন ফারমানে নূতন বিপত্তি—ইংরাজের উপর সম্রাটকর্ত্তৃক জিজিয়াকর স্থাপন—পরমেশ্বর দাসের ও বালচন্দ্রের ইংরাজনিগ্রহ—ইংরাজ-বাণিজ্যের প্রতিকূলতা—পরমেশ্বর দাসের ইংরাজদের প্রতি অত্যাচার—এ অত্যাচার প্রতিকার প্রার্থনায় গবর্ণর হেজেসের ঢাকায় গমন—বালচন্দ্র কর্ত্তৃক গবর্ণরের নৌকা আক্রমণ—কাল্‌কাপুরে জব চার্ণকের সহিত বিবাদ-প্রতিকার পরামর্শ—ঢাকায় নবাবের সহিত হেজেসের সাক্ষাৎ—নবাবের সহানুভূতি—এ মূল্যহীন সহানুভূতির ফলে মোগল কর্ম্মচারীদের উৎ-পাত বৃদ্ধি—বালচন্দ্র ও পরমেশ্বর দাস কর্ত্তৃক নূতন অত্যাচার।

সম্রাট সাহাজাহান ও সাহাজাদা সাহসুজা প্রভৃতির ফারমানের বলে বলীয়ান হইয়া ইংরাজেরা কি অবস্থায় হুগলীতে প্রথম বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করেন এবং তৎপরে কাশিমবাজার, ঢাকা, পাটনা, রাজমহল, সিংহিয়া, মাল-দহ প্রভৃতি বিভিন্নস্থানে তাঁহাদের বাণিজ্যকুঠী সমূহ স্থাপিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। এই যে আসমুদ্র হিমাচল-ব্যাপী ভারতবর্ষ, ইংরাজের গৌরবময় সাম্রাজ্যরূপে, সিংহ-চিহ্নিত ব্রিটিশ রাজপতাকা মণ্ডিত হইয়া, ধরণীপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রথম বীজ, এই হুগলীতেই

রোপিত হইয়াছিল। যেমন অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে কালে প্রকাণ্ড শাখা পল্লবময় বিরাট বটবৃক্ষের উদ্ভব হয়, সেইরূপ হুগলীর বাণিজ্যকুঠীরূপ ক্ষুদ্রবীজ হইতে, এই বিশাল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত-সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যে ভারতে ইক্ষ্বাকু, দিলীপ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, পৃথ্বীরাজ ইত্যাদি হিন্দুনরপতিগণ এবং আকবর,জাহাঙ্গীর,সাহজাহান,ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি মোগলসম্রাটগণ একছত্র আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, সেই জন্যই আজ আমরা সমগ্র ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটরূপে, আমাদের সর্ব্ব-জনপ্রিয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরীকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা ও রক্ষাকর্ত্তারূপে দেখিতে পাইতেছি। এ প্রসঙ্গে আমরা আড়াই শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা আলোচনা করিতেছি। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে পরিশ্রমী,অধ্যবসায়ী, কর্ম্মবীর, ইংরাজ জাতির মায়াময় করস্পর্শে, ভীষণ জঙ্গলাবৃত সুতালুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার জঙ্গলের মধ্য হইতে,বর্ত্তমান প্রাসাদময়ী, বিদ্যুতা-লোকোজ্জ্বলিত, প্রশস্ত রাজবর্ত্ম পূর্ণ, বিশাল জনসংঘ সম্বলিত, শকট ঘর্ঘর নিনাদিত, বর্ত্তমান মহানগরী কলিকাতার উদ্ভব হইয়াছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে, ইংরাজগণ কিরূপ অবস্থায় এদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, এখন আমরা সেই কথাই বলিব। বঙ্গের এই বাণিজ্য-ব্যবসা রক্ষা করিতে তাঁহাদের যে কত কষ্ট,কত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার এবং নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল—তাহাই বলিব। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে, বঙ্গে ইংরাজবাণিজ্য চরম উন্নতির মুখে আসিয়াছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁর অনুকম্পায়, ইংরাজেরা তাঁহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বাধাবিপত্তি হইতে অনেকটা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তখন বঙ্গদেশের ফ্যাক্টরী গুলিতে দেড়লক্ষ পাউণ্ড খাটিতেছিল। সর্ব্ব প্রথমে, মোটে পাঁচশত টাকা লইয়া, হুগলী ফ্যাক্টরীর প্রথম বাণিজ্য আরম্ভ হয়, শেষ তাহা দেড়লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল। ধরিতে গেলে, বঙ্গদেশে হুগলীর বাণিজ্য-কুঠীই ইংরাজের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সুচনা করিয়া দেয়।

কিন্তু বাণিজ্যের অসম্ভব উন্নতি সংসাধিত হইলেও হুগলী সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না। সমুদ্রবক্ষেই ইংরাজের প্রভাব ও কার্য্যকুশলতা। জাহাজ লইয়াই ইংরাজের শক্তি। এ শক্তি হুগলীতে বিকাশ করিবার কোন উপায় ছিল না। গঙ্গাসঙ্গম স্থানও হুগলী হইতে অনেক দূরে। আজকাল ভাগিরথীর যে অবস্থা হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না। সেই সুদূর অতীতে, রণোন্মাদিনী মূর্ত্তিতে দুই-কূল ভাঙ্গিয়া, ভাগীরথী মহাবেগে-সাগর সঙ্গমের দিকে ছুটিতেন। নদীর নানা-

স্থানে প্রচণ্ডদহ ও ঘূর্ণায়মান আবর্ত্ত ছিল। সমুদ্রমুখ হইতে হুগলী বহু দূরে। সেই সময় বৃহৎকায় জাহাজাদির অবাধ যাতায়াত, নানা কারণে সুবিধাকর ছিল না। তাহার পর হুগলী সহরের মধ্যেই, কোম্পানীর ফ্যাক্টারী অবস্থিত ছিল। অনতিদূরে মোগল-সুবাদারের আবাসবাটী। সেই আবাসবাটীর সন্নিকটেই মোগলের সেনানিবাস। কোনরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই,মোগল সুবাদার বা ফৌজদারগণ, তখনই সেনাসংগ্রহ করিয়া অতি সহজেই ইংরাজ-পক্ষকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারিতেন।

সেই আড়াইশত বৎসরের পূর্ব্বে, হুগলী সহরের অবস্থাও তত ভাল ছিল না। চারিদিকে ক্ষুদ্র গলি, নদীরকূলে দুই মাইল ব্যাপী অপ্রশস্ত পথ। উত্তরে ব্যাণ্ডেল গ্রাম। ইহা পর্টুগীজদের আশ্রয়স্থান। দক্ষিণে চূঁচুড়া। এখানে দিনেমার দিগের উপনিবেশ। গঙ্গার ধার হইতে আরম্ভ করিয়া সহরের মধ্যে তিনশত গজ বিস্তৃত এক খাত। সময়ে সময়ে নদীর জল বৃদ্ধির সহিত ইহা একটী প্রকৃত ঘূর্ণাবর্ত্তে পরিণত হইত। * চারিদিকে ছোট ছোট ইষ্টক এবং মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাসগৃহ। তাহার মধ্যে মোগল-ফৌজদারের বাস-ভবন। ইংরাজেরা তাঁহাদের বুদ্ধির দোষেই হউক, বা ভবিতব্য চালিত হইয়াই হউক, ফৌজদারের বাটীর সান্নিধ্যেই তাঁহাদের কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য পরে তাঁহাদের মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছিল।

সুরাট ও মান্দ্রাজ ফ্যাক্টারীর তুলনায়, হুগলী ফ্যাক্টারী যেন সমুদ্র নিকটে গোষ্পদ তুল্য। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত, তাঁহারা সহরের মধ্যেই বাটীভাড়া করিয়া থাকিতেন। ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে হুগলীর কুঠী পরিদর্শন করিতে আসিয়া, ষ্ট্রেন্সাম মাষ্টার সাহেব, ইহার ঘরবাড়ীগুলির অনেকটা উন্নতি করিয়া যান। এই সময়ে কতকগুলি কার্য্যালয় ও মালগুদাম নির্ম্মাণ করা হয়। কয়েক স্থানে কর্ম্মচারীদের জন্য নূতন আবাস-গৃহও নির্ম্মিত হয়। কিন্তু তাহাতেও সকলের স্থান সংকুলান হইল না।

এই সময়ে,হুগলীর কুঠীতে চারিজন প্রধান কর্ম্মচারী থাকিতেন। ইহাঁদের সর্ব্বপ্রধানের পদবী—এজেণ্ট। এজেণ্টের নিম্নে, হিসাব-রক্ষক, গুদাম-রক্ষক ও ধনাধ্যক্ষ। একজন সেক্রেটারীও তাঁহাদের সহায়তার্থে নিযুক্ত হন। সেক্রেটারীকে প্রত্যেক মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত থাকিয়া, কেরাণীর কাজ করিতে হইত। মন্ত্রণা-সভার অধিবেশনে যে কোন কাজ হইত, তাহার

* ইহাই 'ঘোলঘাট' নামে পরিচিত।

মন্তব্যের নকল, তিনি মান্দ্রাজে পাঠাইতেন ও মান্দ্রাজ হইতে তাহা বিলাতের কর্ত্তাদের নিকট পৌছিত। এজেণ্ট বা সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর বেতন বাৎসরিক দেড় হাজার টাকা ছিল। কিন্তু ১৬৮২ খৃঃ অব্দে ইহা দুইশত পাউণ্ড বা আড়াই হাজার করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া কুঠীর মধ্যে, মারচ্যাণ্ট ফ্যাক্‌টার, রাইটার, এপ্রেণ্টিস্ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল। রাইটারেরা বৎসরে দেড়শত টাকা পাইতেন। সেকালের আট-টাকার গোমস্তার বা নায়েবেরও দোল-দুর্গোৎসবের কথা শুনা গিয়াছে। মাহিনার টাকার উপর ইহারা বড় একটা নির্ভর করিতেন না। নানারূপ বেনামী বাণিজ্যে, কোম্পানীর ছাড় ও নিশানের অন্যায় ব্যবহারে, ইহাঁদের প্রচুর অর্থাগম হইত। কোম্পানী বাহাদুরের বেতনভোগী ভৃত্য হইয়াও, ইহাঁরা প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতেন। কোম্পানীর প্রত্যেক কর্ম্মচারীই বিনাব্যয়ে থাকিবার স্থান ও খাইবার খরচা পাইতেন। বিনাব্যয়ে আলো ও চাকর পাইতেন। খানা-গৃহে একটী প্রকাণ্ড টেবিল ছিল। আহারের ঘণ্টা হইবামাত্র, সকলে ঐ টেবিলের নিকট উপস্থিত হইয়া, স্ব স্ব পদ মর্য্যাদানুসারে আসনগ্রহণ করিতেন। তখন ইংরাজগণ, দুইবারমাত্র খানা খাইতেন। ইহাই ডিনার ও সপার। যাঁহারা পরিবার লইয়া স্বতন্ত্র স্থানে থাকিতেন, কোম্পানী তাঁহাদের খোরাকীর জন্য, ভাতা বা (Diet-money) দিতেন। তাহারাও বিনা খরচায়, চাকর এবং রাত্রে জ্বালাইবার জন্য মোমবাতি পাইত।

ইংরাজেরা তখন এদেশের ভাষা জানিতেন না, অথচ দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই তাহাদের সর্ব্বদাই ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত থাকিতে হইত। এজন্য দেশীয় দালাল ভিন্ন, তাঁহাদের কাজ চলিত না। এই দেশীয় দালালেরা মাত্র গোটাকতক ইংরাজী শব্দ জানিত। তাহারই সাহায্যে, তাহারা মনোভাব প্রকাশ করিত এবং কাজকর্ম্মও চালাইয়া লইত। দালালেরা গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঘুরিয়া, ক্রয়ার্হ মালপত্র সন্ধান করিত, তাহার দর দস্তুর করিত এবং চালানীদ্রব্যে শতকরা তিন টাকা হিসাবে কমিশন পাইত।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সংযত রাখিবার জন্য, নানাবিধ কঠোর বিধান প্রচলিত হইয়াছিল। ফ্যাক্টারীর মধ্যস্থ কোন কর্ম্মচারীরই কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাহিরে রাত্রিযাপন করিতে পারিত না। *

* Hedges Diary II First Bengal Chaplain p.p. 3 and 5 (Indian Church Quarterly Review) Ovington's Voyages to Surat &c.

আজকালকার অনেক কলেজের বোর্ডিংয়ের বা গোরা-বারিকের বন্দোবস্ত যেরূপ কঠোর, সেকালের ইংরাজ কুঠীর বন্দোবস্তও তদ্রূপ ছিল। প্রাতঃ-কালে নয়টা হইতে বারটা পর্য্যন্ত আফিস বসিত, আবার অপরাহ্নে বেলা চারিটা অবধি আফিসের কাজ চলিত। সাধারণ সময়ে বড় বেশী কাজ থাকিত না। তবে যে সময়ে মান্দ্রাজ হইতে জাহাজগুলি মাল লইতে বা পৌছাইয়া দিতে আসিত, সেই সময়ে কাজের ঝঞ্ঝাট বড়ই বাড়িয়া যাইত। মধ্যাহ্নকালে, সমস্ত কর্ম্মচারীই কুঠীর হলের মধ্যে মধ্যাহ্ন ব্যাপার শেষ করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটী প্রকাণ্ড টেবিলের চারিপার্শ্বে সকলেই পদমর্য্যাদানুসারে উপবিষ্ট হইতেন। সকল কুঠীতেই ভারতীয়, পর্টু-গীজ, ইংরাজ এবং ফরাসী পাচকগণ বেতন ভোগীরূপে নিযুক্ত থাকিত। সে সময়ে বঙ্গদেশে প্রচুর মৎস্যমাংস ও ফলমূলাদি পাওয়া যাইত, এজন্য আহারের কোন কষ্টই ছিল না। একটী সুবৃহৎ রৌপ্যপাত্রে কর্ম্মচারীরা আহারান্তে হস্ত-প্রক্ষালন করিতেন। সেরাজী ও মিশ্র-আরক (Arack Punch) সে সময়ের বিখ্যাত মদ্য ছিল। সে সময়ে উচ্চ শ্রেণীর বিলাতী মদিরা, খুব কমই এদেশে আসিত। বিলাতী মদ্য ও বিয়ার যে সময়ে বড়ই বহুমূল্য জিনিষ ছিল। পর্ব্বদিনে ও রবিবারে, শিকারলব্ধ পশুপক্ষীর মাংস দ্বারা, নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত হইত। এই সময়ে, বিশেষ উৎসব দিনে, ইংরাজ-ফ্যাক্টারগণ মদ্যপানকালে, ইংলণ্ডের সম্রাট ও তাঁহাদের প্রভু কোম্পানী বাহাদুরের স্বাস্থ্যপান বা হেল্‌থ-ড্রিঙ্ক করিতেন। এ সময়ে চা-পান প্রথাও প্রচলিত ছিল। রাত্রের ভোজন ব্যাপারও উল্লিখিতরূপে সমবেতভাবে শেষ হইত। ঠিক রাত্রি নয়টার সময়, ফ্যাক্টারীর সদর দরজা বন্ধ হইয়া যাইত। সে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে অনেক ইংরাজ অবিবাহিত অবস্থাতেই এ দেশে আসিতেন। বিবাহিতের সংখ্যা বড় কম ছিল। কারণ বিলাত হইতে সে সময়ে ভারতে আসিতে, ছয় সাত মাস সময় লাগিত। এদেশে পরিবার লইয়া থাকিতে হইলে, একটা ব্যয়বাহুল্যও ছিল। এজন্য অনেক বিবাহিত ব্যক্তি, বিলাতেই তাঁহার পরিণীত-পত্নীকে রাখিয়া আসি-তেন। আবার, অনেক অবিবাহিত যুবক, এদেশেই যোগাড়যন্ত্র করিয়া বিবাহ করিতেন। * সেই সময়ে অনেক ইংরাজই, এদেশের নিয়মানুসারে

---

* Unfortunately there was few of them (English Ladies) the hard-ships and dangers, of the long voyage being very great and a large number of the Company's Servants had to find their wives in this country. (Wilson's Early Aunals. P. 65.).

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। যখন তাঁহারা ফ্যাক্টারী হইতে দূরতর স্থানে যাইতেন, তখন মুসলমানদিগের মত, মাটীতে কার্পেট বা সতরঞ্চ বিছাইয়া খানা খাইতেন। * অনেকে এদেশের ঢিলা পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে ভাল বাসিতেন। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন। সমাজ-সংগঠন করিয়া একস্থানে বাস করিতে গেলে, সেই সমাজের উপযুক্ত আমোদ প্রমোদও চাই। কেবল অক্লান্ত কর্ম্মময় জীবন লইয়া থাকিলে, মানুষ বাঁচিতে পারে না। এখন যেমন, বল, থিয়েটার, পিক্‌নিক্, ইভ্‌নিং-পার্টি ইত্যাদি নানারূপ আমোদ ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে, বঙ্গদেশীয় ইংরাজগণের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন, অতি সামান্যভাবেই হইত। পর্ব্বদিনে কিম্বা ছুটীর দিনে, তাঁহারা নিকটস্থ জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতেন। কখনও বা কোন এদেশীয় পদস্থ আমীর-ওমরাহের সঙ্গে জুটিয়া, শিকারের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। ফ্যাক্টারী হইতে বেশী দূরে যাইবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। হুগলীর ইংরাজ-ফ্যাক্টারীর দুই মাইল উত্তরে কোম্পানীর একখানি সখের-বাগান ছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা, সাধারণতঃ এই বাগানেই আমোদ-প্রমোদ করিতে যাইতেন। বাগানের সীমা অতিক্রম করিয়া, দূরতর স্থানে যাইবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। বাগানে গিয়া পুষ্করিণীতে অবগাহন স্নান, বায়ুসেবন, খোস গল্প, আর মদিরা ও মোরব্বা-ভোজন ইহাই আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশীয় ইংরাজের আমোদ-আহ্লাদের চূড়ান্ত ব্যবস্থা ছিল। সামাজিকতা হিসাবে, প্রতিবাসী ডচ্‌দিগের সহিত, ইংরাজদের কখন কখন নিমন্ত্রণের আদানপ্রদান চলিত। কখনও বা ডচেরা তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতেন, আবার কখনও ইংরাজেরা ডচ্‌দিগকে প্রীতিভোজ দানে প্রফুল্লিত করিতেন। ফ্যাক্টারীর "চীফ" বা বড়কর্ত্তা এবং তাঁহার সহকারী, কেবলমাত্র "পাল্‌কী" ব্যবহার করিতে পারিতেন। পাদরীসাহেবদের কেবলমাত্র ছাতা ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল। পথ চলিবার সময় বেতনভোগী ছত্রধারীরা, বড় বড় ছাতা দিয়া তাহাদের মাথা রক্ষা করিত। ইহাদিগকে "ছাতা-বরদার" বলিত। কিন্তু এই ছত্র-ছায়া

* In those days of greatest isolation the tendency to gravitate towards the local ways of living and acting was very strong. They took their meals when away from the Factory lying on carpets ; they wore the Indian dress, they married Indian wives. (Ovington's voyages 491, Wilson).

সুখ-সম্ভোগ করিবার ক্ষমতা, নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের ছিল না। পাঠক! হুগলীর ফ্যাক্টোর ইংরাজদের সেই সুদূর অতীত কালের বিলাসিতার সহিত একবার বর্ত্তমান যুগের, বেরুচ, ফিটান্, ভিক্টোরিয়া ডগ্‌কার্ট ও মোটারাদি বিলাসময় যানবাহনের সুখটা, তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখুন। এই আড়াই শত বৎসরের মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। *

মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, সেকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অনেকেই অতি হীন প্রবৃত্তির লোক ছিলেন। সুদূর ভবিষ্যতে, যে ভারতে এলফিনষ্টোন, মনরো, ম্যাকম্, টড্, হেনরি ও জন্ লরেন্স, মারটিন, হিবার প্রভৃতি মহাপ্রাণ দেবতুল্য ইংরাজগণ, আবির্ভূত হইয়া, ভারতক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের দেবচরিত্রের ও মহাপ্রাণতার সহিত তুলনায়, সেকালের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অনেকেই অতি হীন মতি ছিলেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে দেশকাল পাত্র ও ঘটনাচক্রবশে তাঁহাদিগকে এইরূপ হইতে হইয়াছিল। সে সময়ে যে সমস্ত ইংরাজ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ম্মচারীরূপে এ দেশে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকেই অনভিজ্ঞ ও তরুণ বয়স্ক যুবক। ইহাদের মধ্যে, অধিকাংশই আবার অবিবাহিত অবস্থায়, নির্ব্বাসিত ব্যক্তির ন্যায় সুদূর ভারতে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের অনেকেরই আয় কম, খরচ বেশী। কোম্পানীর কর্ত্তারা বিলাতে থাকিতেন, আর বিলাত হইতে বহুদূরে ছয় মাসের পথে, সুদূর বঙ্গদেশে বসিয়া তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা রক্ষক হইয়াও ভক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। প্রভু সম্প্রদায়ের উৎক্রোশ দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া, অনেকে বেনামী বাণিজ্য, ছাড় ও নিশান বিক্রয় প্রভৃতি নানাবিধ বিধি-বিগর্হিত উপায়ে, প্রভুর অনিষ্ট করিয়া ধনাগমের চেষ্টা করিতেন। স্বার্থসংঘর্ষ জন্য, তাহাদের মধ্যে প্রায় আত্মবিবাদ উপস্থিত হইত। এই সকল বিবাদের মীমাংসার জন্যই, ষ্ট্রেনসাম মাষ্টার দুই দুইবার বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সেকালে সামাজিক ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দিবার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। নৈতিক নিয়মে বদ্ধ করিবার পথই ছিল না, কাজেই বিবেক-ভয়-শূন্য-চিত্তে তাঁহারা অনেক অপকর্ম্ম করিয়া বসিতেন। কোম্পানীর বাণিজ্য-কুঠীর ইংরাজ কর্ম্মচারিদের মধ্যে, কেহ কাহারও উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। সকলেই সুযোগ পাইলে পরস্পরের নিন্দাবাদ ও অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন। এইজন্য নবাব

* Hedges Diary. 1. 66. Ovington's Voyages 400. Mandelslo's Voyages (Quoted by Prof. Wilson.)

সায়েস্তা খাঁ, এক সময়ে ইংরাজ বণিকদের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমকালের ইংরাজ বণিকদিগকে নীচপ্রকৃতি, বিবাদ বিসম্বাদপরায়ণ, হীন ব্যবসায়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। * মোটের উপর কথা হইতেছে এই, ইংরাজের মধ্যে একতার একটা অভাবলক্ষ্য করিয়াই মোগল শাসনকর্ত্তাগণ, তাহাদের নানা উপায়ে, উত্যক্ত করিতেন।

সেকালের ইংরাজ-বণিকদিগের কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি সম্বন্ধে, যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের স্বদেশীয়দের দ্বারাই হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ যে সম্পূর্ণরূপে মহত্ব-বর্জ্জিত ছিলেন এরূপ নহে। তাঁহাদের প্রধান গুণ এই যে, দেশীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি, তাঁহারা কোনরূপ অত্যাচার করিতেন না। সেকালের হিন্দুরা, এই ব্যবসায়ী ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে, বিপন্নের আশ্রয়, ন্যায়ের মর্য্যাদারক্ষক বলিয়া বিবেচনা করিত। ইংরাজের সহিত ব্যবসায় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, লেন-দেনের হিসাবে কথনও কোন হিন্দু ব্যবসায়ীর একটী পয়সাও নষ্ট হয় নাই। বিলাতের কর্ত্তারাও পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন—"কোন দেশীয় লোকই অভিযোগ করিতে পারেন না, যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থাপনাবধি, তাহাদের প্রাপ্য একটী সামান্য পয়সার গোলমাল হইয়াছে।"† সে সময়ে বাদসাহের কর্ম্মচারিগণ দেশীয় প্রজাদের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন। প্রজার কোন একটী সামান্য প্রার্থনা পূরণ বা অভিযোগের তদন্ত করিতে হইলেই, মোগল রাজকর্ম্মচারীদের উৎকোচ দিতে হইত। ঢাকার শাসনকর্ত্তা আবার অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণতার সীমায় আনিয়াছিলেন। মনুষ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় চাউল, লবণ ইত্যাদি, এমন কি—তাঁহাদের অধীনস্থ সেনাগণের ঘোড়ার ঘাস, জ্বালানি কাঠ পর্য্যন্ত ফৌজদার ও সুবেদার সাহেবেরা একচেটিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইজন্য সময়ে সময়ে, সেই স্বচ্ছলতার দিনে, জিনিসপত্রের দরও চড়িয়া যাইত। জোর করিয়া, ব্যবসায়ীদের চড়া দরে জিনিসপত্র কিনিতে বাধ্য করা হইত। মুসলমান মহাজনদিগের নিকট উচ্চ সুদে হিন্দুরা টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হইতেন। ঋণ

* A Company of base, quarrelling people and foul dealers. (Wilson—P. 66).

† "Never" Says the Court in 1693 "never any Native of India lost a Penny Debt by this Company from the time of the first institution thereof in Queen Elizabeth's days till this time (Wilson's Early Annals. P. 67).

রিশোধের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে, মায় সুদ টাকা আদায় করা হইত। স্তু এ দেশীয় জন সাধারণ যখন দেখিল, ইংরাজগণ দেনাপাওনার ব্যাপারে ড়ই উদার, তাহারা ন্যায্য মূল্যে জিনিষপত্র ক্রয় করে, লোকের পাওনা বাকী খে না,তাহাদের নিজের ছাড় ও নিশান দিয়া মোগল কর্ম্মচারিদের অত্যাচার ইতে প্রজাদের রক্ষা করে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের আশ্রিত ব্যক্তিগণের জ্য মোগলের নিকট দরবার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, তখন তাহারা স্বভা- তঃই ইংরাজদের মহৎগুণাবলীর দিকে আকৃষ্ট হইল। পূর্ব্বে আমরা দেখাই- ছি, বঙ্গদেশের ফ্যাক্টারী সমূহে, দেড়লক্ষ পাউণ্ড মূলধন ন্যস্ত হইয়াছিল। ংরাজের বঙ্গীয় বাণিজ্যের এই অসম্ভব শ্রীবৃদ্ধি, যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের হানুভূতিতেই হইয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ইংরাজ কোম্পানীর মান্দ্রাজের কুঠীর অধ্যক্ষ বা প্রেসিডেণ্টই, সেকালের ারতীয় ইংরাজদের ভাগ্য-নিয়ন্তা বা ফ্যাক্টারির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। াহাতে কর্ম্মচারিগণ সচ্চরিত্র ও সুনীতি পরায়ণ হন, তৎসম্বন্ধে চেষ্টার কোন টিই তাঁহারা করেন নাই। এই জন্যই ষ্ট্রেনসাম মাষ্টারের মত দৃঢ় চরিত্রের লাক, দুই দুই বার বাঙ্গলায় আসিয়ছিলেন। তখন পাদরী ছিল না, গির্জ্জা ছল না,উপাসনার নির্দ্ধারিত স্থান ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এ সম্বন্ধীয় সকল বন্দোবস্তই হইয়াছিল। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে জন ইভান্স নামক একজন পাদরী কাম্পানীর দ্বারা নিয়োজিত হইয়া বঙ্গদেশে আসেন। ইনিই বঙ্গের প্রথম পাদরী। বাঙ্গলার সহিত তুলনায়, সুরাটের ইংরাজদের নৈতিক অবস্থা অনেকটা উন্নত ছিল। এইজন্য ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজের গভর্ণর বঙ্গদেশে আসিয়া, পাদরীদিগের সহিত পরামর্শমতে, কতকগুলি নীতিগর্ভ নিয়ম প্রচলন করেন। এই নিয়মগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, কোম্পানী বাহা- দুরের কর্তৃপক্ষীয়েরা, তাঁহাদের বঙ্গদেশস্থ সহযোগীগণের নৈতিক উন্নতি সাধ- নার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বের এ নৈতিক নিয়মগুলি অতি কৌতুহলজনক। পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য, আমরা এস্থলে সেগুলি আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত করিলাম।

এইকটী বিধিপত্রে লিখিত ছিল—

(১) যাহাতে ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত হয়, যাহাতে সকল কর্ম্মে তাঁহার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়, এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ভজনাগারে নিত্য প্রার্থনা করিবেন।

(২) মিথ্যা বলা, শপথ করা, অভিশাপ প্রদান, মাতলামি প্রভৃতি

দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্র দিন অপবিত্র করিবে না।

(৩) রাত্রে, কেহই ফ্যাক্টারী অথবা তাহাদের সহরের আবাসবাটী ছাড়িয়া, বাহিরে অন্য কোন স্থানে রাত্রি যাপন করিতে পারিবে না।

(৪) সকলেই পাদরীসাহেবের উপদেশে মনোযোগ প্রদান করিবেন। যিনি তাহা না করিবেন বা ভজনালয়ে প্রার্থনার সময় নিত্য উপস্থিত না হইবেন, তাঁহাকে অপরাধীরূপে বিচারাধীনে আনা হইবে।

(৫) যদি কেহ রাত্রি নয়টার পর বাটী হইতে বাহিরে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দশ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

(৬) যদি কেহ অযথা শপথ করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক শপথের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বার পেনি জরিমানারূপে আদায় করা হইবে।

(৭) মাতলামির প্রত্যেক অপরাধের জন্য, অপরাধীকে পাঁচ শিলিং করিয়া জরিমানা দিতে হইবে।

(৮) লর্ডস দিনে, প্রার্থনাক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকিলে, এক শিলিং জরিমানা দিতে হইবে।

(৯) যদি চাহিবামাত্র জরিমানার টাকা আদায় না হয়, তাহা হইলে অপরাধী ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা তাহা আদায় করা হইবে।

(১০) প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান মাত্রেই, প্রভাত ও সন্ধ্যার ভজনা সময়ে নিয়মিতরূপে গির্জ্জাগৃহে উপস্থিত থাকিবেন। অনুপস্থিতির সন্তোষজনক কারণ না দেখাইতে পারিলে, অপরাধীকে প্রত্যেক অপরাধের জন্য ১২ পেনি জরিমানা দিতে হইবে।

(১১) এই সমস্ত আদেশ বৎসরে দুইবার ফ্যাক্টারির কর্ম্মচারিগণকে পড়িয়া শুনান হইবে।

(১২) একজন ফ্যাক্টার বা রাইটার এই সমস্ত জরিমানা আদায়ের সেরেস্তা রাখিবেন। অপরাধী ফ্যাক্টার ও কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত জরিমানার টাকা, হুগলীর অধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে। হুগলীর অধ্যক্ষ, তাহা মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার হাত দিয়া সেই অর্থ, দরিদ্রদের মধ্যে বিতরিত হইবে।

"উল্লিখিত বিধানগুলি যথাযথ ভাবে পালিত হইলে, ফ্যাক্টারির কর্ম্মচারিগণের যথেষ্ট নৈতিক-উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এই উন্নতির ফলে, ভারতে ইংরাজের জাতীয় গৌরব, তাঁহাদের অন্নদাতা কোম্পানীর নামও গৌরবান্বিত হইবে। কিন্তু এই কঠোর বিধান প্রচলনের ফলেও, যদি

কোন কুচরিত্র ব্যক্তির স্বভাব-দোষ বিদূরিত না হয়, তাহা তাহাকে বাঙ্গলা-দেশ হইতে মান্দ্রাজে চালান দেওয়া হইবে এবং সেই স্থানে তাহার অপ-রাধের কঠোরতর শাস্তি বিধান করা যাইবে। *

সেকালে অর্থাৎ আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে, ইংরাজগণের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কয়েকটী বিশদ চিত্র আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিলাম। আশা করি, এগুলি তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে।

উইলিয়াম হেজেস্—বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর।

(১৬৮২—১৬৮৩)

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন। মূলধন খাটাইয়া, সকল ব্যবসাদারে যেমন লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবসা করে, তাঁহারাও সেইরূপ করিতেন। কিসে সরঞ্জামী খরচা কম হয়, কিসে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুবিধার দরে ক্রীত হয়, কিসে সেগুলি যথা সময়ে জাহাজ-বন্দী হইয়া বিলাতে পৌছায়, সেগুলি বিলাতের বাজারে বিক্রয় করিলে, কিসে দুপয়সা বেশী লাভ হয়, ইহাই সেকালের কোম্পানীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। ষ্ট্রেনসাম মাষ্টার অত খরচ পত্র করিয়া দুই দুইবার বাঙ্গালায় আসিলেন, কিন্তু তাহাতে ফ্যাক্টারদের মামুলী অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হইল না দেখিয়া, কর্ত্তারা ষ্ট্রেনসামের ও তাঁহার কার্য্য প্রণালীর উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন।

কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা,—জব চার্ণক সাহেব, প্রথমে পাটনার কুঠীতে ছিলেন এবং তৎপরে কাশিমবাজারে আসেন। এই সময়ে ষ্ট্রেনসাম মাষ্টারও দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে আসেন। তিনি চার্ণককে আদেশ করিয়া পাঠান—"বিলাতের কর্ত্তারা আপনাকে কৌন্সিলের দ্বিতীয় সদস্য করিয়াছেন। অতএব যে সমস্ত সোরা, পাটনার গুদামে মজুত আছে, তাহা নৌকায় চালান দিয়া, সরাসর এখানে চলিয়া আসিবেন।" কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, চার্ণক কাশিমবাজার ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ

* If any by these penalties will not be reclaimed from their vices or any shall be found guilty of adultery, fornication uncleanness or any such crimes, or shall disturb the peace of the Factory by, quarrelling or fighting and will not be reclamied, then they shall be sent to Fort St. George, there to recieve condign punishment. (Wilson's Early Annals. P. 69.) and Hugly Diary 1679.

করিতে লাগিলেন। ইহাতে ষ্ট্রেনসাম মাষ্টার, বড়ই বিরক্ত হইয়া চার্ণককে লিখিলেন—"আপনার এই অবাধ্যতায় আমি বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে কোম্পানীরও কার্য্যক্ষতি হইয়াছে। আমি আপনাকে কাশিমবাজার হইতে হুগলীতে বদলী করিলাম।"

নানাকারণে চার্ণক তখন হুগলীতে আসিলেন না। এদিকে ষ্ট্রেনসাম মাষ্টার যে পাঁচ বৎসরের জন্য কোম্পানীর এজেণ্ট ও ফোর্ট সেণ্টজর্জ্জের গবর্ণর হইয়াছিলেন, তাহাও শেষ হইয়া গেল। কোম্পানী কতকগুলি কারণে ষ্ট্রেনসামকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। উইলিয়ম গিফোর্ড, তাঁহার স্থানে ফোর্ট-সেণ্টজর্জ্জের বা মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে বঙ্গের ও উড়িষ্যার উপকূলবর্ত্তী বাণিজ্য-ব্যাপার সম্বন্ধেও আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। বাঙ্গলার কুঠী সমূহকে, মান্দ্রাজের অধীনতা হইতে বিমুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। কোম্পানীর বাঙ্গলার কুঠীগুলির উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য, মান্দ্রাজের প্রথানুসারে একজন এজেণ্ট বা গবর্ণর সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত হইলেন। উইলিয়ম হেজেস্, এই নবনির্ব্বাচিত গবর্ণর।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী, চার্টার-প্রাপ্ত ও ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমোদিত কোম্পানী। কিন্তু স্বাধীন দেশ, কর্ম্মভূমির প্রশস্ত ক্ষেত্র ইংলণ্ডে, উদ্যমশীল লোকেরও অভাব ছিল না। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া বেশ দুপয়সা উপায় করিতেছেন দেখিয়া, অনেক ভাগ্য-পরীক্ষার্থী ইংলণ্ডেশ্বরের রাজসনন্দ না লইয়া, এদেশে গুপ্তভাবে বাণিজ্য করিতে আসে। ইহারা এদেশে আসিয়া, নানা উপায়ে অর্থ ও উৎকোচদানে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে ছাড় ও নিশান সংগ্রহ করিয়া, বাণিজ্য দ্বারা বেশ লাভবান হইতেছিল। ক্রমে ইহাদের প্রভাব এত বাড়িয়া উঠে, যে বিলাতের কর্ত্তারা তাহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠেন এবং ইহাদের উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইহারাই ইতিহাসে "ইণ্টারলোপার্স" বলিয়া পরিচিত।

এই ইণ্টার-লোপারদের অগ্রণী ছিলেন—পিট। পিটের মত অমন ডানপিটে লোক বোধ হয়, বাঙ্গলায় তখন ছিল না। পিট তাহার সহযোগীদের সহিত ব্যবসা চালাইত। সে সময়ে ভাড়াটিয়া জাহাজের অভাব ছিল না। অর্থ দিলেই পর্টুগীজ, দিনেমার ও ডচেদের জাহাজ ভাড়া পাওয়া যাইত। পরিশেষে এই পিট এত বর্দ্ধিতপ্রতাপ হইয়া পড়ে, যে সে তুর্কী সওদাগরদিগের সহায়তায়, এক নূতন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিতে উদ্যোগী হয়।

হেজেসের উপর কড়া হুকুম ছিল—"বাঙ্গালার কুঠীর শাসন ও সুবন্দোবস্ত করিয়া, "ইণ্টারলোপারদের" সমূলে ধ্বংসসাধন করিবে।" হেজেস্ ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দের ২৮জানুয়ারী বাঙ্গলায় আসিবার জন্য "ডিফেন্স" জাহাজে আরোহণ করেন। এদিকে ২০এ ফেব্রুয়ারী তারিখে, ইণ্টারলোপারদিগের সর্দ্দার পিটও "ক্রাউস্" নামক এক জাহাজ আরোহণে বঙ্গদেশের দিকে যাত্রা করেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদের আদেশ ছিল—"বাঙ্গালায় পৌছিয়াই হুগলীকুঠীর অধ্যক্ষ ভিনসেণ্টকে বন্দী করিবে"। এইজন্য হেজেসের সহিত কয়েকজন গোরা-সৈনিক দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, হেজেস তাঁহার বিলাতের প্রভুদের আদেশপালন করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই, পিট যে জাহাজে আসিতেছিলেন, তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়। কাজেই হেজেসের পরে যাত্রা করিয়াও, পিট তাহার এগার দিন আগে বালেশ্বরে পৌছিল ও তথায় প্রচার করিয়া দিল, বিলাতের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী দেউলিয়া হইতে বসিয়াছেন। এজন্য এক নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। আমিই তাহার এজেণ্ট।*

হেজেস হুগলীতে আসিতেছেন শুনিয়া, হুগলীর কুঠীর অধ্যক্ষ ভিনসেণ্ট বুঝিলেন—তাঁহারও দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিনি হেজেসকে চুঁচুড়ায় ডচ্‌দিগের বাগানে মহা সমারোহে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আত্মরক্ষার জন্য, তিনি ৩৫জন বন্দুকধারী পর্টুগীজ, পঞ্চাশজন রাজপুত ও আরও কয়েক-জন দেশী সৈন্য লইয়া উপস্থিত হন। হেজেস তাঁহাকে কোম্পানীর আদেশ-পত্র দেখাইলেন। ভিন্‌সেণ্ট বলিলেন—"ইহার উত্তর আমি বিলাতে গিয়া দিব।"

এদিকে পিটও এক কাণ্ড করিয়া বসিল। সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গেও লাল-কুর্ত্তী-ওয়ালা পর্টুগীজ ও দেশীয় সেনা। সঙ্গে তিনখানি বাণিজ্য-জাহাজ। মহাসমারোহে তীরে নামিয়া, পিট চুঁচুড়ায় বাস করিতে লাগিল। এইস্থানে কোম্পানীর কর্ম্মচারী ভিন্‌সেণ্টও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন। ডচ্‌ ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সাহায্যে, পিট চুঁচুড়ায় এক বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণ করিল এবং হুগলীর শাসনকর্ত্তাকে হাত করিয়া লইয়া বেশ জোরের সহিত ব্যবসা চালাইতে লাগিল। নিজেকে নূতন

* এই পিট্ বড় যে সে লোক নহেন। বিলাতের ভবিষ্যৎ যুগের রাজমন্ত্রী স্বনামখ্যাত উইলিয়ম পিট্ ইহারই বংশধর।
Hedges Diary. 1. 52. 130.

ইংলিস-কোম্পানীর এজেন্ট বলিয়া পরিচয় দিয়া স্থানীয় শানসকর্ত্তার নিকট হইতে বাণিজ্যস্বত্ব ও বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণের ক্ষমতাও পাইল।

হেজেস্ এই সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বুঝিলেন, পিটকে ধ্বংস করা, বা কয়েদ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কাজেই তিনি ঢাকার শাসনকর্ত্তাকে সকল কথা খুলিয়া লিখিয়া, পত্র-ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। তখন হুগলীতে বালচন্দ্র বলিয়া বাদসাহের একজন পরমিটকর্ম্মচারী ছিলেন। মোগল-শাসনকর্ত্তা এই বালচন্দ্র এবং হুগলীর শাসনকর্ত্তার উপর,ঢাকা হইতে হুকুম পাঠাইলেন – "পিট ও তাহার সহযোগী ডরেলকে কয়েদ করিবে।"কিন্তু পিট হুগলীর মোগল-শাসনকর্ত্তাকে বুঝাইলেন,—"সম্রাটের যাহা প্রাপ্য, তাহা আমি যখন দিতে প্রস্তুত, তখন আমার সঙ্গে এ সব হাঙ্গাম কেন?" ফৌজদার দেখিল, এ ব্যাপারে সরকারের লাভ হইতেছে। পিটই হউক, আর যেই হউক, সরকারের আয় বৃদ্ধি হইলেই তাহার খোসনাম। এই ভাবিয়া স্থানীয় ফৌজদার, পিটের অনুকূলে মোগল শাসনকর্ত্তার নিকট রিপোর্ট করিলেন। হেজেস এত চেষ্টা করিয়াও পিটকে উচ্ছেদ করিতে পারিলেন না। পূর্ণ এক বৎসরকাল এই ভাবেই চলিল। ক্রমাগতঃ নবাব সায়েস্তা-খাঁর সহিত এই সম্বন্ধে লেখাপড়া করায়, নবাব হুগলীর শাসনকর্ত্তার উপর পুনরায় হুকুম দিলেন—'এই নূতন কোম্পানীকে উচ্ছেদ করিয়া দাও।" নূতন দল, পূর্ব্ব কথিত বালচন্দ্রকে হাত করিয়াছিলেন। হুগলীর ফৌজদারও তাঁহাদের পক্ষে। অন্যপক্ষে বালচন্দ্র, নবাব সায়েস্তাখাঁকে জানাইলেন—"সাবেক কোম্পানী অপেক্ষা ইহারা বড় ভাল লোক। সাবেক কোম্পানীর উদ্দেশ্য সমস্ত বাণিজ্য একচেটিয়া করা। ইহাদের সেরূপ উদ্দেশ্য নহে। তাহার উপর ইহারা শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক দিতে প্রস্তুত।" বলা বাহুল্য, নবাব সায়েস্তা খাঁ এই সংবাদ পাইয়াই তাঁহার পূর্ব্বাদেশ প্রত্যাহার করিলেন। ইণ্টারলোপারদের আর ধ্বংসসাধন হইল না।

"ইণ্টারলোপার"দিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য,হেজেস যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। এই ইণ্টারলোপারদের ব্যাপার ছাড়া, তিনি আরও কয়েকটী সাংঘাতিক ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ে মোগল-শাসনকর্ত্তাগণ, ইংরাজদের উপর বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে হুগলীর বাণিজ্যকুঠীর ও বাণিজ্যের অতি সঙ্কটময় অবস্থা উপস্থিত হয়। ঘটনাটা কি সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সম্রাট-কুমার সাহসুজার নিকট হইতে কোম্পানী যে ফারমান্ বা বাণিজ্যস্বত্ব লাভ করেন, তাহাতে বঙ্গের বাণিজ্যসম্বন্ধে তাঁহাদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। ইহার উপর নবাব সায়েস্তাখাঁর হুকুমনামাও বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতির উত্তরসাধক হইয়াছিল। ১৬৭৭ খ্রীঃঅব্দে নবাব সায়েস্তাখাঁ বাঙ্গলা ত্যাগ করেন। ফেদাই খাঁ তাঁহার স্থানে গবর্ণর নিযুক্ত হন। ফেদাই খাঁ, নবাব সায়েস্তাখাঁর বিধান অমান্য করিয়া, স্বাধীনভাবে কাজ করিতে লাগিলেন। ইংরাজদের পরম সৌভাগ্য, পর বৎসর ঢাকায় ফেদাইখাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁহার স্থানে সাহজাদা মহম্মদ আজাম নিযুক্ত হন। এই সময়ে ভিনসেণ্ট হুগলীর কুঠীর অধ্যক্ষ। ভিনসেণ্ট পুনরায় চেষ্টা করিয়া রাজ-কুমারের নিকট হইতে নূতনভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা লাভ করেন। (১৬৭৮)* মোগল শাসনকর্ত্তাদের নিকট এইরূপ সনন্দ আনাইতে হইলে, প্রতিবারে নজরানা ও উৎকোচ প্রভৃতিতে অনেক খরচপত্র হইত। প্রতিবার প্রত্যেক নূতন শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে প্রচুর অর্থদানে, নূতন সনন্দলাভ করিতে, কোম্পানী আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। এই জন্য তাঁহাদের আদেশে, বাঙ্গলার অধ্যক্ষেরা খোদ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে অনুমতি-পত্র আনিতে আদিষ্ট হইলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ যখন বাঙ্গলা হইতে অবসর লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া যান, তখন একজন ইংরাজ-প্রতিনিধি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহারা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে নূতন ফারমান্ লাভ করিলেন। এই সংবাদ হুগলিতে পৌঁছিবামাত্র ভারি ধূম পড়িয়া গেল। সম্রাটের ফারমানে লিখিত ছিল—

> ঈশ্বরের নাম জয়যুক্ত হউক। সুরাটের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মচারী যাঁহারা সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইতে ইচ্ছুক; তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইল, যে ইংরাজ কোম্পানী এপর্য্যন্ত শতকরা দুই টাকা হিসাবে তাঁহাদের বাণিজ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক দিয়া আসিতেছেন। এখন হইতে আদেশ হইল, তাহার উপর শতকরা দেড় টাকা হারে "জিজিয়া" শুল্ক আদায় করা হইবে।
>
> এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে, এসকলস্থানে শওয়ালের প্রথম দিবস হইতে আমাদের রাজত্বের এই ত্রয়োবিংশতি বৎসরে, ঐ সকল লোক, শুল্ক হিসাবে শতকরা সাড়ে তিন টাকা ভবিষ্যতে কর দিতে বাধ্য রহিল। অন্য সকল স্থানে এই জন্য তাহাদিগকে যেন উত্ত্যক্ত না করা হয়। রাহাদারী, পেশকাস, ফরমায়েস প্রভৃতি আদায় করা আমার আদেশে রহিত হইল। কেহই এ সম্বন্ধে কোন কিছু বাজে আদায় করিতে পারিবে না। তারিখ ২৩এ সফর। রাজত্বের ২৩ বৎসরে লিখিত।

* Stewart's Bengal PP 190—91

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের উক্ত আদেশপত্র হইতে, হিতে বিপরীত হইল। আদেশপত্রের অর্থ এদেশে অন্যরূপ দাঁড়াইল। সম্রাটের এ আদেশ পত্র হইতে ইংরাজেরা বুঝিলেন, কেবল সুরাটেই জিজিয়া-কর আদায় হইবে ও তজ্জন্য বৰ্দ্ধিতহারে শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু বঙ্গদেশের মোগল শাসন-কর্ত্তারা ইহার অর্থ করিলেন—সুরাট ও অন্য সকল স্থানে বৰ্দ্ধিতহারে শুল্ক দিতে হইবে। সায়েস্তার্খা এই সময়ে পুনরায় বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিয়া-ছিলেন। তিনিও সনন্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়া, ইংরাজদের উপর "জিজিয়া" প্রচলন করিলেন।

ইহার উপর এই সময়ে বালচন্দ্র রায়ের অত্যাচারে * ইংরাজের হুগলীর বাণিজ্য অতি সংকট অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে পরমেশ্বর দাসও উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। সে নানাপ্রকারে ইংরাজদের উত্ত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। হেজেস—এই বিপদের প্রতিকারের জন্য স্বয়ং ঢাকায় গিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। হেজেস্ মনে মনে স্থির করিলেন, কাশিমবাজার ঘুরিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। জব চার্ণক কাশিমবাজারে আছেন। তিনি একজন প্রধান ও অভিজ্ঞ কৰ্ম্মচারী। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একটা পরামর্শ করা প্রয়োজন।

পরমেশ্বর দাস যখন শুনিলেন, যে ইংরাজ গবর্ণর হেজেস্, তাঁহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার জন্য ঢাকায় যাইতেছেন, তখন তিনি বড়ই চটিয়া গেলেন। এই ব্যাপার লইয়া উভয়পক্ষে অনেক বাদ-প্রতিবাদ ও লেখা-লেখি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। কিন্তু পরমেশ্বর দাসের এমন কোন ক্ষমতা নাই, যে তিনি হেজেস্‌কে আটকাইয়া রাখিতে পারেন। কাজেই হেজেসের ঢাকায় যাওয়া বন্ধ হইল না।

দুইখানি বজরা ও কয়েকখানি এদেশীয় নৌকা সজ্জিত হইল। ২৩ জন ইংরাজ শরীররক্ষী, পনরজন রাজপুত ও কয়েকজন পদাতিক লইয়া গবর্ণর হেজেস্ ১০ই অক্টোবর, ঢাকার দিকে শুভযাত্রা করিলেন। এই বহর সমেত কাশিমবাজার ত্যাগ করিয়া, হেজেস্ সর্ব্বপ্রথমে হুগলীতে ইংরাজ-কোম্পানীর বাগানে উপস্থিত হন।

হেজেস্ যাহাতে নিরাপদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ না করিতে পারেন,

* বালচন্দ্র রায়, সম্রাটের তরফে, হুগলীর পরমিট-শুল্কের অধ্যক্ষ ছিলেন। আজ কাল যাহাকে Superintendent Of Customs বলে, ইহা সেই পদ। বালচন্দ্র ইংরাজ কোম্পানীর উপর আদ্যোপান্তই নারাজ ছিলেন। পরমেশ্বর দাস তাঁহারই সহকারী কৰ্ম্মচারী।

পরমেশ্বর দাস এজন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এতদর্থে সে গুপ্তভাবে কতকগুলি লাঠিয়াল ও বন্দুকধারী সেনা সংগ্রহ করিয়া, নিশাকালে ইংরাজ পক্ষকে নদীর উপরেই আক্রমণ করে। ইংরাজদের দুইখানি বোট তাহার হস্তগত হয়। ইংরাজপক্ষীয়গণ এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া প্রথমে ভাবিলেন, হয়ত ইহা---ডাকাতি। কিন্তু ঘটনার অবস্থা তদন্তে বোধ হইল, ইহা যে সে ডাকাতের কাজ নহে। নিশ্চয়ই পরমেশ্বর দাস এ ব্যাপারের মধ্যে আছে। হেজেস্, যদি সাহসের সহিত বন্দুক চালাইতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত প্রকৃত ডাকাতদের পথ দেখিতে হইত। কিন্তু হেজেসের মনে একটা দৃঢ়সংস্কার জন্মিল, ইহা প্রকৃত ডাকাতি নহে, পরমেশ্বর দাসের রাহাজানি মাত্র। পরমেশ্বর দাস, মোগল-বাদসাহের কর্ম্মচারী। তাহার দলের লোকজনকে নিহত করিলে পরে মহা বিপদে পড়িতে হইবে, এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া, হেজেস্ এই হাঙ্গামার পর ভাগীরথীবক্ষ ত্যাগ করিয়া সুন্দরবনের পথ ধরিয়া ঢাকা গমনে সঙ্কল্প করিলেন।

২০এ অক্টোবর হেজেস্, জলঙ্গী ও গঙ্গারসঙ্গম স্থানের অনতিদূরে উপস্থিত হন। কালকাপুরে পৌঁছিলে, জব চার্ণক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। চার্ণকের সহিত উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা ও পরামর্শ হয়।

ইহার পাঁচদিন পরে, অর্থাৎ ২৫এ অক্টোবর, হেজেস্, ঢাকায় উপস্থিত হন। তখন নবাব সায়েস্তা-খাঁ ঢাকার লালবাগে থাকিতেন। এই স্থানেই তাঁহার দরবারাদি হইতে। লালবাগ ইষ্টক নির্ম্মিত দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ছিল।*

হেজেস্ ঢাকায় উপনীত হইয়া, দেড়মাস কাল নবাবের দর্শনাশায় অপেক্ষা করিলেন। দেড়মাসের পর, তিনি সায়েস্তা-খাঁর অনুগ্রহ লাভ করেন। হেজেস্, সায়েস্তা-খাঁর নিকট যে সমস্ত আবেদন উপস্থিত করিয়াছিলেন, নবাব তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি দান করিলেন।

এত কষ্ট করিয়া ঢাকায় আসিয়া, হেজেস্ নবাব সায়েস্তা-খাঁর নিকট তাঁহার প্রার্থিত দাবিগুলি পাইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কোন

* সায়েস্তা-খাঁর এ দুর্গের চিহ্ন এখন কিছুই নাই। নদীও অনেকদূরে সরিয়া আসিয়াছে। এখন কেবল একটী পুরাতন ভগ্ন মস্জীদ ও সায়েস্তা-খাঁর কন্যা পিয়ারে-বিবির, শ্বেত মর্ম্মরময় সমাধিস্তম্ভ ভিন্ন, পুরাতনের চিহ্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

† আশা-সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া, হেজেস্ তাঁহার রোজনামচার একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—"I bless God for this great success I have had, beyond all men's expectations in my Voyage to Dacca,

বিশেষ ফল দেখিতে পাইলেন না। ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। অত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া এবং বিপদ মাথায় লইয়া ঢাকায় গিয়া সম্রাটের প্রতিনিধি নবাব সায়েস্তা-খাঁর সহিত সাক্ষাত করিয়া, কোন ফলই হইল না দেখিয়া, তিনি বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন,সায়েস্তাখাঁর অনুকূল আদেশসত্ত্বেও সম্রাটের কর্ম্মচারীরা, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সহিত পূর্ব্ববৎ বিবাদ-বিসম্বাদ করিতেছে। এত ব্যাপারের পরও সেই উপদ্রব, সেই অত্যাচার—সেই অশান্তি। বালচন্দ্র, প্রকাশ্যভাবে কোন উৎপাত না করিলেও, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী পরমেশ্বর দাসকে ভিতরে ভিতরে টিপিয়া দিলেন। পরমেশ্বর দাস, প্রভুর প্রীতিসম্পাদন জন্য কোম্পানীর বাণিজ্য-দ্রব্যবাহী নৌকাগুলি আটক করিতে লাগিল। নৌকা হইতে ইংরাজ কোম্পানীর মালামাল জোর করিয়া উঠাইয়া লইতে লাগিল। তখন হেজেস্ স্পষ্ট বুঝিলেন, পূর্ব্ববৎ উৎকোচ প্রদান ভিন্ন, মোগল-কর্ম্মচারীদের অত্যাচার প্রতিকারের আর কোন উপায়ই নাই। যথা পূর্ব্বং—তথা পরং। বাহিরের শত্রুর ত এই অবস্থা ইহার উপর হেজেস্ কয়েকদিন হুগলীতে থাকিয়া বুঝিলেন, কুঠীর ইংরাজ কর্ম্মচারীরা অতি অসংযত ও অবাধ্য। প্রধান কুঠীর অধীনস্থ অন্যান্য বাণিজ্য কুঠীর অবস্থাও এইরূপ বিশৃঙ্খল। হেজেস্ মনে মনে মতলব স্থির করিলেন, ঘরের শত্রু দমন না হইলে, বহিঃশত্রুর তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। ইহার পর গবর্ণর হেজেস্ কি করিলেন, পরের পরিচ্ছেদে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

নবম অধ্যায়।

গবর্ণর হেজেস কর্ত্তৃক কুঠীর আভ্যন্তরিণ গোলযোগ মীমাংসা-চেষ্টা—কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে আত্মবিবাদ—তাঁহাদের আনীত অভাব অভিযোগের তদন্ত—ইণ্টারলোপার বা গুপ্ত-বণিকদিগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি—এতজ্জন্য কোম্পানীর ব্যবসায়ের ক্ষতি—ইণ্টারলোপার বা গুপ্ত ব্যবসায়ীদের দমন চেষ্টা—এ চেষ্টার ফলে হেজেসের সহিত জব চার্ণকের মনান্তর—অনন্তরামের ব্যাপার—নানাবিধ অভিযোগের নিষ্ফল তদন্ত—হেজেসের পদচ্যুতি—তৎপদে গিফোর্ডের নিয়োগ—গিফোর্ডের আগমনে নূতন বিশৃঙ্খলা—তাঁহার মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন—বেয়ার্ডের এজেণ্ট বা গবর্ণর পদে নিয়োগ—শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য বেয়ার্ডের ব্যর্থচেষ্টা—ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া বেয়ার্ডের হুগলীতে মৃত্যু—ইংরাজজাতির শক্তি-নীতি প্রতিষ্ঠার মূল—হেজেস—তৎকর্ত্তৃক সাগরদ্বীপে দুর্গ প্রতিষ্ঠার কল্পনা—বাহুবলই আত্ম-রক্ষার উপায়—ভবিষ্যতের ফোর্টউইলিয়াম দুর্গ হেজেসের কল্পনার ফল—আত্ম-রক্ষার জন্য দুর্গনির্ম্মাণে বিলাতের কর্ত্তাদের আশঙ্কা ও আপত্তি—মোগলের সহিত বিবাদে অনিচ্ছা—পরে এ সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন—চট্টগ্রামে ইংরাজের প্রথম দুর্গ নির্ম্মাণ সংকল্প—ইংলণ্ডেশ্বর জেম্‌সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা—মোগল রাজ্য আক্রমণ জন্য বিলাতে নৌ-বাহিনী সংগ্রহ—সম্রাট জেম্‌সের সহানুভূতি—সুরাটকে কেন্দ্র করিয়া মোগলের সহিত শত্রুতার সংকল্প—বঙ্গদেশেও এই প্রকার প্রতিযোগীতার প্রস্তাব—কোম্পানী কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম আক্রমণ সংকল্প।

বিলাতের কর্ত্তাদের নিয়োগ মতে, এই উইলিয়াম হেজেসই ধরিতে গেলে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর প্রথম গবর্ণর বা এজেণ্ট। ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, হেজেস্—প্রথমতঃ তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সায়েস্তা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকারের গবর্ণর হইলেও তাঁহার অধীনে একটী মন্ত্রণাসভা ছিল। কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীবর্গ লইয়াই এই সভা গঠিত হইত। তখন এই সভায়, জব চার্ণক, জন বেয়ার্ড, জনরিচার্ড, ফ্রান্সিস্ ইলিশ্, জোজেফ্ উড্ ও উইলিয়াম জন্‌সন্ বলিয়া সাত-জন সদস্য ছিলেন।

হেজেস যদি একটু মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া, বিবেচনার সহিত কাজ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইত না। ঢাকায় অবস্থানকালে, তিনি জব চার্ণকের চরিত্রের বিরুদ্ধে, অনেক কথা শুনিয়া আসেন। এই জব চার্ণকই মন্ত্রীসভার অভিজ্ঞ সদস্য এবং বহুদিন ধরিয়া তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারীরূপে নানাস্থানের বাণিজ্য-কেন্দ্রে কাজ

করিয়াছেন। হেজেস এই অবস্থাভিজ্ঞ জব চার্ণককে সন্দেহ করিয়া, এক মহাভ্রমে পড়িলেন।

এই মন্ত্রী-সভা বা কাউন্সিলের মধ্যে, উইলিয়াম জন্‌সন্‌ বলিয়া এক অপরিণত বয়স্ক যুবক ছিলেন। হেজেস, এই যুবককে বড়ই স্নেহ করিতেন। এই যুবক জন্‌সনের উপর, তাঁহার খুব বিশ্বাস। কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারীদের তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তাঁহার প্রিয়পাত্র জন্‌সন্‌কে, তাহাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দারূপে নিযুক্ত করেন। জন্‌সন্‌—এই নূতন চাকরী পাইয়া, অন্যান্য সদস্যগণের ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত রহিলেন। অনেকের অনেক গুহ্যকথা, হেজেসের কাণে তুলিয়া তাঁহার কাণ-ভারি করিতে লাগিলেন।

একদিন জন্‌সন্‌, কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য জন বেয়ার্ডের একখানি গুপ্ত-চিঠির সন্ধান হেজেস্‌কে বলিয়া দেন। এই চিঠিখানি হেজেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ পূর্ণ। বেয়ার্ড, এই চিঠিখানি হেজেসকে না জানাইয়া, গোপনে বিলাতের কর্ত্তাদের নিকট পাঠাইতেছিলেন। গোয়েন্দা জন্‌সন্‌, এই চিঠিখানি সংগ্রহ করিয়া, হেজেস্‌কে পড়িতে দেন। হেজেস্‌ সে চিঠি খানি পড়িয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং সেই পত্র খানি বিলাতে না পাঠাইয়া, নিজের কাছে রাখিলেন। এই পত্রে বেয়ার্ড তাঁহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহার যথার্থতা প্রমাণ করাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

মন্ত্রীসভার সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে, বেয়ার্ডকে অভিযুক্ত করিবার জন্য, হেজেস্‌ হুগলীতে আসিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তিনি বেয়ার্ডের কিছু করিতে না পারিয়া, কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য, ফ্রান্সিস্‌ এলিসের উপর পড়িলেন। একজন গোয়েন্দা সংবাদ দিল, এলিস্‌ সাহেব চারি হাজার টাকা ঘুষ লইয়া কোম্পানীর গুদামের কতক মাল সরাইয়া দিয়াছেন। এলিসের বিরুদ্ধে প্রমাণও অনেক পাওয়া গেল। এলিস্‌, স্বমুখে নয়শত টাকা ঘুষের কথা স্বীকার পর্য্যন্ত করিলেন। অনেক এদেশী মহাজন এলিসের শত্রু ছিল, তাহারাও সুযোগ বুঝিয়া এলিসের অপরাধ প্রমাণের সহায়তা করিল। ইহার ফল এই হইল, যে এলিসের চাকরীটি গেল। বিলাতের কর্ত্তারা হেজেসের হস্তে বাহাল ও বরতরফের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। হেজেস্‌, এলিস্‌কে কর্ম্মচ্যুত করিলেন

---

* Hedges Diary. II. 18-19. 43-44.

এবং জোসেফ্ উড্ নামক একব্যক্তি তাঁহার স্থানে কোম্পানীর মাল-খানার কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

পাঠক! মনে রাখিবেন—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী তখন ব্যবসায়ী বণিক-সম্প্রদায় ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য খরিদ করা, আর জাহাজে করিয়া বিলাতে চালান দেওয়া এবং বিক্রয়ান্তে তাহার লাভ-ভাগী হওয়াই, তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। যে যে স্থানে তাঁহাদের বাণিজ্য-কুঠী ছিল, সেই সেই স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য, যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী থাকিতেন, তাঁহাদের পরিচালিত করিবার জন্য একজন কর্ত্তা থাকিত। এই কর্ত্তাই "এজেণ্ট বা গবর্ণর" ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত হইতেন। কৌন্সিল বা মন্ত্রণা-সভা, বর্ত্তমান কালের রাজ্য পরি-চালনের সভা নহে, বিদ্যমানকালের লাট-কৌন্সিলও নহে। কোম্পানীর এই সব কাউন্সিলে, কেবল কোম্পানীর বাণিজ্যস্বার্থ, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির কথা, কর্ম্মচারীদের দোষগুণের বিচার, ডিক্রী—ডিস্‌মিস্ এই সবই আলোচিত হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে লিপিবদ্ধ হইত। হেজেস্—এই ভাবেই হুগলীর কুঠীর শাসনকর্ত্তা বা গবর্ণর ছিলেন। পাঠক মনে রাখিবেন, তাঁহার অধীনস্থ মন্ত্রী-সভা, বাণিজ্য সম্বন্ধীয় মন্ত্রী-সভা বই আর কিছুই নহে।

এই সময়ে "ইণ্টার-লোপারদিগের" উৎপাত বড়ই বেশী হইয়া পড়ে। "ইণ্টার-লোপার"দের উৎপাতে কোম্পানী বাহাদুরের ব্যবসা মাটী হইতে ছিল। "ইণ্টার-লোপার" কথাটী কি, পাঠককে একটু বুঝাইয়া বলিব।

কোম্পানীর যে সমস্ত কর্ম্মচারী তখন এদেশে ছিলেন, তাঁহারা ধরিতে গেলে—একরূপ ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত রূপেই থাকিতেন। তখন ষ্টীমার ছিল না, আল্প-পর্ব্বত-বক্ষভেদী ওভার-ল্যাণ্ড রেল ছিল না, সুয়েজের সোজাপথ ছিল না, দ্রুতগামী মেল-ষ্টীমারও ছিল না। বিলাত হইতে এক খানা জাহাজ যাওয়া আসা করিতে একটী বৎসর কাটিয়া যাইত। পাঠকের যেন মনে থাকে, এই সমস্ত জাহাজ, আজকালকার বৈদ্যুতিক আলোক-শোভিত, প্যাসেঞ্জার-ষ্টীমার নহে—পাইল-ওয়ালা জাহাজ মাত্র।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে, যাঁহারা অনেকদিন এদেশে বাস করিয়া মালামাল খরিদ ও চালানী কাজে অভিজ্ঞ হইতেন, আড়ঙ্গের কাজ বুঝিতেন, তাঁহারা স্পষ্টচক্ষে দেখিলেন—গোপনভাবে বেনামীতে ব্যবসা চালাইলে, বেশ দু'পয়সা উপরি রোজগার হয়। কিন্তু এ গুপ্ত-ব্যবসা চালাইতে হইলে কিম্বা তদুদ্দেশ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মালামাল চালান দিতে গেলে,

কোম্পানীর দস্তকী ছাড় ও নিশান ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই। কোম্পানীর ছাড় ও দস্তকী না থাকিলে, মোগলের কুত্‌ঘাটার কর্ম্মচারীরা, নৌকা আটক করিত। এবং তাহা যে কোম্পানীর নৌকা, তাহার প্রমাণ না পাইলে, ক্রোক পর্য্যন্ত করিত। এইজন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাই, অসদুপায়ে অর্থলোভের জন্য, প্রভুদের অধিকৃত বাদসাহী সহী-মোহর যুক্ত "ছাড়"ও "নিশান" ব্যবহার করিয়া বাণিজ্য চালাইতেন। তাঁহাদের এই গুপ্ত ব্যবসায়ে কোম্পানীর যথেষ্ট লোকসান হইত। কোম্পানীর কর্ত্তারা বিলাত হইতে এই সমস্ত "ইন্টার-লোপার" দমনের জন্য, বহুবার আদেশ প্রদান করেন—কিন্তু রক্তবীজের ন্যায়, ইহাদের দল পরিপুষ্ট হওয়ায়—এ দেশীয় কর্ত্তারা ইহাদের আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। আর এক শ্রেণীর "ইন্টার-লোপার" ছিল—তাহারা ইংরাজ বটে, কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর বেতনভোগী কর্ম্মচারী নহে। ইহাদের দল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণশক্তি ছিল, কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারী নহে বলিয়া, শাসন করিবার ক্ষমতাও কোম্পানীর কর্ত্তাদের ছিল না।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে, যাঁহারা বেনামী বাণিজ্য করিতেন বা অন্য কোন উপায়ে কোম্পানীর ব্যবসায় হানি করিতেন, হেজেস্—তাহাদের দমনের জন্য বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন সেই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিলেন। দ্বিতীয়বার কাশিমবাজারে আসিয়া, তিনি সর্ব্ব প্রথমেই নেলার নামক একজন কর্ম্মচারীকে পাকড়াও করিলেন।

হেজেসের সম্বন্ধে আমরা একটু বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি, তাহার কারণ এই, কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী জব চার্ণকের সহিত, এই হেজেসের বিশেষ সম্বন্ধ। চার্ণকের প্রধান শত্রু ছিলেন—এই হেজেস্! হেজেসই চার্ণকের চরিত্রে, কলঙ্ক-কালিমা নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। হেজেস্ তাঁহার কার্য্যকালের একখানি "ডায়েরী" বা রোজনামচা রাখিয়া গিয়াছেন। কোম্পানীর পুরাতন আমলের ইতিহাসের কথা ইহাতে অনেক আছে। এই হেজেস-ডায়েরী ইতিহাসের হিসাবে অতি-মূল্যবান্ সম্পত্তি।

কাশিমবাজারের কুঠীর কর্ত্তা ছিলেন—জব চার্ণক। নেলর, জব চার্ণকের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। ইনি কোম্পানীর গুদামে, রেশমের "রং-দার" বা Dyer ছিলেন। তখন কাশিমবাজার রেশম-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। অপরিষ্কৃত রেশম, ও বাফ্‌তা এখানে প্রচুরভাবে উৎপন্ন হইত। কাশিমবাজারের কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অনেকে এই রেশমের গুপ্ত-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। হেজেসের নিয়োজিত, পূর্ব্ব কথিত জনসন্ তাঁহাকে সংবাদ দিল—বেনামে

রেশম ও বাফ্‌তা কিনিবার প্রধান সহায় এই নেলর। আর জব চার্ণক—তাঁহার প্রধান মুরুব্বি। হেজেস্‌ কৌন্সিলের প্রকাশ্য অধিবেশনে, নেলারের অপরাধের বিচার করিলেন। নেলারের নিজের হাতে লেখা, চিঠিপত্র হইতেও প্রমাণ হইল, যে অভিযোগ-কথা আদৌ মিথ্যা নহে। হেজেস্‌ আদেশ দিলেন—"নেলর নজরবন্দী হইয়া থাকিবে এবং তাহার স্থাবর—অস্থাবর সম্পত্তি ও কাগজ-পত্রাদি ক্রোক হইবে।"

ইহার পর হেজেস্‌, জব চার্ণকের উপর পড়িলেন। চার্ণক বহুদিন এদেশে আছেন। চার্ণককে ধরিতে হইলে, তাহার গুপ্তজীব হার্ডিংকে প্রথমে ধরা আবশ্যক। এই হার্ডিং ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানীর রাইটার হইয়া আসেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ইঁহার চাকরী যায়। জব চার্ণক ইঁহাকে বেতন-ভোগী নিজস্ব কর্ম্মচারী রূপে নিয়োগ করেন। ফ্যাক্টারীর অন্যান্য কর্ম্মচারীরা হার্ডিং এর শত্রু ছিল। তাহারাই চেষ্টা করিয়া হার্ডিং এর বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করাইল ও সাক্ষ্য-সাবুদ জোগাড় করিতেও ত্রুটি করিল না।

চার্ণকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই, তিনি অনন্তরাম নামক এক বদ্‌মায়েসকে কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। * চার্ণক যতদিন কাশিমবাজারে আসিয়াছেন—ততদিন অনন্তরাম, তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারীরূপে নিয়োজিত রহিয়াছে। অনন্তরামকে তলব করিয়া এই কথার প্রমাণ লওয়া হইল বটে, কিন্তু হেজেস্‌ চার্ণকের বিরুদ্ধে, কোন কিছু কঠোর আদেশ প্রদান করিতে পারিলেন না। জব চার্ণক, তখন এদেশে একজন ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। তাঁহার উপর জুলুম করিলে, একটা ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া হেজেস্‌—চার্ণকের কিছু করিতে না পারিয়া ওয়াট্‌সন্‌ নামক আর একজন কর্ম্মচারীর উপর পড়িলেন।

ওয়াট্‌সনের বিরুদ্ধে হেজেসের নিকট, নালিশ উপস্থিত হইল—যে সে বড় রুক্ষভাষী, সর্ব্বদাই লোকের সহিত বিবাদ করে, কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। হেজেস্‌ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সংযত ও শিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কাজেই তিনি ওয়াট্‌সন্‌কে তলব করিয়া পাঠান।

ওয়াট্‌সন্‌ এই কথা শুনিয়া, রুষ্টভাবে প্রত্যুত্তর দিয়া পাঠাইল, "এজেন্ট হেজেস্‌ সাহেবকে বলিও, তিনিও কোম্পানীর কর্ম্মচারী, আর আমিও

---

* এই অনন্তরামের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অনন্তরাম, একজন মহাজনকে বিনাদোষে ফাটকবন্দী করিয়া, তাহাকে নির্দ্দয় প্রহার করে। মনের দুঃখে সেই মহাজন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। মিঃ ভিন্‌সেন্টের আমলে এই ঘটনা হয়। বিলাতের কর্ত্তারা এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, ইহার তদন্তের আদেশ পর্য্যন্ত দেন।

বিলাত হইতে কোম্পানী কর্ত্তৃক এই কর্ম্মে বাহাল হইয়াছি। তাঁহার কোন ক্ষমতাই নাই—যে আমাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে পারেন।”

হেজেস্, ওয়াটসনের এই অস্বাভাবিক স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে সস্‌পেণ্ড করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইলিস্‌ও কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। হেজেসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু হইলেন—জব চার্ণক। তিনি প্রকাশ্যভাবে সকলের সাক্ষাতে বলিতে লাগিলেন—“হেজেসের দিন ফুরাইয়াছে। কোম্পানী তাঁহাকে শীঘ্র জবাব দিবেন।” মোট কথা এই, একদিকে জব চার্ণক ও তাঁহার বন্ধুগণ এবং অন্যদিকে একা হেজেস্। হেজেস্ নিজের বুদ্ধির দোষে শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন মাত্র। এজেণ্ট বা প্রধান হইয়াও তিনি তাঁহার অধীনস্থদিগের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব হারাইলেন।

জব চার্ণক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই পরিণামে সত্য হইল। ১৬৮৪খৃঃ অব্দের ১৭ই জুলাই “টমাস্” নামক একখানি জাহাজ মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া পৌঁছে। এই জাহাজের অধ্যক্ষ হো সাহেব, হেজেস্‌কে জানাইলেন, “কোম্পানী আপনাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। বেয়ার্ড সাহেব বাঙ্গালার এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। গিফোর্ড করমণ্ডল উপকূল ও বঙ্গদেশের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।” হেজেস্ এ হুকুম প্রাপ্তে পদত্যাগ করিলেন এবং কোম্পানীর বঙ্গীয় বাণিজ্য কুঠীগুলি পুনরায় পূর্ব্ববৎ মান্দ্রাজের কর্ত্তাদের অধীন হইয়া তাহাদের স্বাধীনতা হারাইল।

জুলাই এর মধ্যভাগে, হেজেস্ বিলাতের কর্ত্তাদের নিকট পদচ্যুতি পত্র প্রাপ্ত হন এবং নূতন প্রেসিডেণ্ট গিফোর্ড সাহেবও হুগলীতে উপস্থিত হয়েন। গিফোর্ড হুগলীতে পৌঁছিবার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই, কৌন্সিলের সদস্যগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সেক্রেটারী, সর্ব্বসমক্ষে কোম্পানীর শীলমোহর যুক্ত কমিশন বা তাঁহার নিয়োগপত্র পাঠ করিলেন।

হেজেস্—কার্য্যক্ষম ও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বড়ই দুর্ব্বল চিত্ত বলিয়া, তাঁহার অভিপ্সিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। অন্যপক্ষে গিফোর্ডের অন্য কোন বিশেষ গুণ থাক্ আর নাই থাক্—অপরের কৃতকার্য্যগুলি নষ্ট করিতে তিনি খুব মজবুত ছিলেন। কাজেই গিফোর্ড, বাঙ্গলার ফ্যাক্টারীতে আসিয়া নানা বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশের বাণিজ্যাগার গুলিকে একটা বিশৃঙ্খলতার মধ্যে ফেলিয়া তিনি মান্দ্রাজে চলিয়া যান।

অগত্যা বেয়ার্ড বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যাগার সমূহের কর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হই-লেন, কিন্তু তিনি বড়ই দুর্ব্বলচিত্ত এজন্য কাজকর্ম্মের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা আনিতে পারিলেন না। দেশীয় শাসনকর্ত্তাদের সহিত—নানাবিষয়ে গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। শেষ সকল দিক সামলাইতে গিয়া, অতিরিক্ত চিন্তা ও পরিশ্রমের ফলে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে—মৃত্যু তাঁহার সকল যন্ত্রণা শেষ করিল। হুগলীতে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হইল।

হেজেসের রোজনামচায়, সেই সময়ের ইতিবৃত্ত অতি বিস্তৃতভাবে লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। এইজন্যই আমরা হেজেস্ সম্বন্ধে এতকথা বলিলাম। অপরন্তু প্রকারান্তরে, তিনি এদেশে ইংরাজ জাতির শক্তিপ্রতিষ্ঠার বীজ অঙ্কুরিত করিয়া গিয়াছেন। কেন তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে যাঁহারা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যাগার সমূহ পরি-চালনার জন্য "এজেণ্ট" বা কর্ত্তা হইয়া আসিতেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর প্রতিনিধি-সওদাগর বা মালামাল আমদানী-রপ্তানীর বড়কর্ত্তা। হেজেস্ও তাই ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে আসিয়া বুঝিলেন, ইংরাজ কোম্পানী বা অন্য কোন ইউরোপীয় কোম্পানী, যাহারা বাণিজ্যার্থে এদেশে আসিয়াছে, তাহারা ধরিতে গেলে মোগল-বাদসাহের প্রজা। ভারতের নানা উপকূলে, বন্দরে বা মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে, বাণিজ্য করিবার স্বত্ব-এই মোগল রাজকর্ম্মচারীদের নিকটই লইতে হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় মোগল রাজকর্ম্মচারীরা উৎকোচপরায়ণ বলিয়াই হউক, বা পদমর্য্যাদাজনিত আত্ম-গরিমাবশেই হউক, অনেক সময়ে বাদসাহী ছাড়ের স্বত্বগুলি আমলে আনি-তেন না বা অপরকে আনিতে দিতেন না। এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া, ইংরাজ কোম্পানীকে মোগলের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তাদের নিকট অনেক দরবার করিতে হইয়াছে, অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে, অনেক উৎকোচ প্রদান করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত বিদেশীয় বণিক্ সম্প্রদায়, যদি মোগলের অতটা মুখাপেক্ষী না হইয়া, বাহুবল দ্বারা আত্মশক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হয়—তাহা হইলে বোধ হয় সুফল ফলিতে পারে—মোগল-শাসন-কর্ত্তারাও ভয় পাইতে পারেন—এই কল্পনা হেজেসের মনেই প্রথম উদিত হয়। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, তিনি সাগরদ্বীপে একটী কেল্লা করিবার মতলব করেন। কিন্তু বিলাতের কর্ত্তারা বহু ব্যয় সাধ্য ব্যাপার বলিয়া, হেজেসের কথায় ততটা মনোযোগ প্রদান করেন নাই। হেজেসের এই কল্পনাই, ভবিষ্যতে কলিকাতায় পুরাতন ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্য।

মোটের উপর কথা হইতেছে এই—বিলাতের কর্ত্তাদের প্রধান লক্ষ্য এদেশে বাণিজ্য—ও তদ্বারা অর্থলাভ। মোগল তখন দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করিয়া, জলে বাস যেরূপ অসম্ভব—সেইরূপ মোগলের সহিত শত্রুতা করিয়া—এদেশে বাণিজ্য করাও অসম্ভব। কিন্তু হেজেসের এ আত্মরক্ষার প্রস্তাব একবারে উপেক্ষিত হয় নাই। কথাটা বিলাতের কর্ত্তাদের অনেকটা মনে লাগিয়াছিল। কিন্তু মোগলশক্তির সহিত কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই, ইংরাজের প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ী দিনেমারেরা মোগলের সাহায্য করিবে। কেবলমাত্র বোম্বাই হইতে মোগলের সহিত শত্রুতা করা চলিতে পারে। বাঙ্গালার এরূপ একটা কোন কিছু করিতে হইলে, চট্টগ্রামের মত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানই আশ্রয়কেন্দ্র করা উচিত। কিন্তু তাহার পথেও বহু বাধা বিঘ্ন।

যাহা হউক—পরিশেষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়ায়, বিলাতের কর্ত্তারা মোগলের সহিত শত্রুতা করিতে মনস্থ করিলেন। বাণিজ্য-প্রতিভার সহিত বাহুর শক্তিকে মিলিত করিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল।

ব্যাপারটা এই সময়ে খুব অগ্রসর হইল। বিলাতের কর্ত্তারা এজন্য সম্রাট দ্বিতীয় জেম্‌সের সহায়তা ও অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর জেমস্ ইহাতে আপত্তি করিলেন না। তাঁহার আদেশে—মোগলরাজ্য আক্রমণ জন্য, নৌ-বাহিনী সংগৃহীত হইল। সুরাটের কর্ত্তাদের উপর তখনিই আদেশ হইল, "তোমরা সুরাট ছাড়িয়া বোম্বেতে একত্রিত হও। মোগলের অন্তর্গামী ও বহির্গামী জাহাজসমূহ আক্রমণ ও লুণ্ঠন কর।" এইরূপ শত্রুতা করিবার জন্য অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজও বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল। হুকুম হইল—যে জাহাজগুলি প্রথমে উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বরে পৌছিবে। তথা হইতে হুগলী কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানের কর্ম্মচারীদের সেই জাহাজে তুলিয়া লইয়া সরাসর চট্টগ্রাম যাত্রা করিবে। হুকুমটা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল—যে, যে সকল দুর্গ, নগর বা কেল্লা এ যুদ্ধফলে ইংরাজেরা বাহুবলে দখল করিবেন—জবচার্ণক তাহার গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন।

---

* Hedges Diary. 11. 51 to 58.

দশম অধ্যায়।

কোম্পানী বাহাদুরের দুর্গ-নির্ম্মাণ সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা—বাহুবলই শ্রেষ্ঠবল—হুগলীতে দুর্গ-নির্ম্মাণের অসুবিধা—চট্টগ্রামে দুর্গ-নির্ম্মাণ সঙ্কল্প—জব চার্ণকের উপর এ মহা সমস্যার মীমাংসাভার—কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের পূর্ব্ব কথা—কাশিমবাজারে তাঁহার প্রথম নিয়োগ—পাটনায় কুঠীর অধ্যক্ষতালাভ—চার্ণকের হিন্দুপত্নী সম্বন্ধীয় প্রবাদ—চার্ণকের হিন্দুপত্নী গর্ভজাত সন্তান সন্ততি—মৃতপত্নীর সমাধির উপর মোরগবলির কিম্বদন্তী—এ দেশবাসীর প্রতি চার্ণকের সহানুভূতি—বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা—নবাব সায়েস্তা-খাঁর আমল—ইংরাজ কোম্পানীর উপর তাঁহার অত্যাচার—মোগল কর্ম্মচারীদের নিকট জব চার্ণকের বিরুদ্ধে অভিযোগ—চার্ণকের হুগলীতে পলায়ন—হুগলীর কুঠীর এজেণ্ট পদে নিয়োগ—ইংরাজদের সেনাবৃদ্ধির সংবাদে মোগল শাসন-কর্ত্তাদের আতঙ্ক—হুগলীতে হুলস্থূল ব্যাপার—মোগল-সেনা কর্ত্তৃক হুগলী অবরোধ—ইংরাজের সহিত মোগল-সৈন্যের সংঘর্ষ—ইংরাজদের রক্ষার জন্য চার্ণকের বিবিধ বন্দোবস্ত—চার্ণকের আদেশে রিচার্ডসন কর্ত্তৃক মোগলের তোপখানা আক্রমণ—ইংরাজ হস্তে হুগলীর মোগল-ফৌজদারের পরাজয় ও পলায়ন—চার্ণকের আদেশে হুগলীর উপর গোলাবর্ষণ—মোগলের সহিত সন্ধির চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া চার্ণকের হুগলী হইতে পলায়ন—সুতালুটীতে আশ্রয় গ্রহণ—সেই সময়ে সুতালুটীর অবস্থা—নবাব সায়েস্তা-খাঁ কর্ত্তৃক হুগলীর রক্ষা বন্দোবস্ত—নবাবের নিকট চার্ণকের সন্ধি প্রার্থনা—সন্ধির স্বত্ব গুলির মীমাংসার জন্য জরমলের সুতালুটীতে আগমন—সন্ধি পত্র সম্বন্ধে নবাব সায়েস্তাখাঁর প্রতারণা—ইংরাজ বণিকদিগের বিরুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক যুদ্ধায়োজন—চার্ণকের সুতালুটী হইতে পলায়ন—মেটিয়াবুরুজের থানাদুর্গ অধিকার—হিজলীতে আগমন—নিকলসান্ কর্ত্তৃক হিজলী অধিকার—হিজলীর শাসন-কর্ত্তা মালেক কাশেমের পলায়ন—চার্ণক কর্ত্তৃক হিজলী-রক্ষার বন্দোবস্ত—চার্ণক কর্ত্তৃক বালেশ্বর লুণ্ঠন—বালেশ্বরে মোগলের পরাজয়—নবাব সায়েস্তা-খাঁ কর্ত্তৃক হিজলীতে সেনা প্রেরণ—হিজলীর যুদ্ধ—মোগলে ও ইংরাজে সন্ধি—হিজলী যুদ্ধে চার্ণকের অসমসাহসিকতা—সন্ধির পর সদলবলে চার্ণকের সুতালুটীতে পুনঃ প্রত্যাগমন চেষ্টা—মোগলপক্ষের প্রতারণা—চার্ণকের হিজলী ত্যাগ করিয়া উলুবেড়িয়ায় আশ্রয় গ্রহণ—উলুবেড়িয়া হইতে পুনরায় সুতালুটীতে প্রত্যাবর্ত্তন—বিলাত হইতে যুদ্ধ জাহাজ সমূহের সুতালুটীতে আগমন—কাপ্তেন হিথের কাণ্ড—কাপ্তেন হিথ্ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম আক্রমণ সঙ্কল্প—এ সঙ্কল্পের পরিণাম—চার্ণক ও হিথের মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন—সার জন চাইল্ডের চেষ্টায়—সম্রাটের সহিত ইংরাজ পক্ষের নূতন—বন্দোবস্ত—বঙ্গেশ্বর নবাব ইব্রাহিম খাঁর ইংরাজের উপর সহানুভূতি—ইংরাজদিগকে মান্দ্রাজ হইতে পুনরায় কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নবাবের অনুমতি—চার্ণকের তৃতীয় বার সুতালুটীতে আগমন—চার্ণক কর্ত্তৃক বর্ত্তমান কলিকাতা নগরীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

ইংরাজের হুগলী লুণ্ঠন ও সুতানুটীতে আগমন।

এইবার আমরা ইংরাজ বাণিজ্যের একটী আবশ্যকীয় স্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সময়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা, এদেশে যে সমস্ত অঘটন ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন, তাহাই এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে ব্রিটিশ সৌভাগ্য লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করে। সেইজন্যই আজ আমরা ইংরাজের সৌভাগ্যের অংশ ভাগী হইয়া সুখে ও নিরাপদে ইংরাজ রাজত্বে বাস করিতেছি।

কোম্পানী বাহাদুরের বিলাতের কর্ত্তারা, অনেক বিবেচনার পর, সারকথা বুঝিলেন—মোগলেরা যেরূপভাবে ইংরাজ বণিক্-সম্প্রদায়ের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতেছেন, তাহার প্রতিকার বাহুবলের সাহায্যেই করিতে হইবে। মুখ বুজিয়া অত্যাচার সহ্য করিয়া—তাঁহাদের কৃপাভিখারী হইয়া চলিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে প্রতিদিনই অসংখ্য অন্তরায় উপস্থিত হইবে। বাণিজ্য করিতে ইংরাজ-বণিক এদেশে আসিয়াছে বটে, এ পর্য্যন্ত মোগল শাসনকর্ত্তাদের খামখেয়ালির জন্য তাহারা পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রয়োজন বুঝিলে বাণিজ্যের সহিত, বাহুর শক্তি সম্মিলিত করিবার ক্ষমতা যে তাহাদের নাই—এরূপ নহে। এরূপ প্রয়োজন স্থলে, এবার হইতে কৃপাভিক্ষা না করিয়া, বাহুর শক্তির প্রভাবে দাবিদাওয়া আদায়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কোর্ট অব ডিরেক্টারেরা, বাঙ্গলায় একটী সুরক্ষিত দুর্গনির্ম্মাণের জন্য বড়ই সমুৎসুক হইলেন। কিন্তু সে দুর্গ কোথায় প্রতিষ্ঠা করা যায়, ইহাই তখন এক মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। বাণিজ্যের হিসাবে ধরিতে গেলে, হুগলীই প্রশস্ত ক্ষেত্র। কিন্তু হুগলীতে দুর্গনির্ম্মাণে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। মোগলশক্তির প্রভাব হইতে বহুদূরে থাকিয়া, এ আশ্রয়কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। চট্টগ্রাম হস্তগত না করিতে পারিলে পূর্ণরূপে, আশাসিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কিন্তু চট্টগ্রাম হস্তগত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। চট্টগ্রাম তখন পর্টুগীজদিগের দানবশক্তি বিমুক্ত হইলেও, মোগলশাসন তথায় দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই মহাসমস্যার মীমাংসার ভার, জব চার্ণকের উপর পড়িল। এই জব চার্ণকই কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা, এই জব চার্ণকই ধরিতে গেলে—ভারতে ইংরাজ রাজলক্ষ্মীর প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এ হেন প্রতিভাবান লোককে ইতিহাস, উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই—ইঁহার অমানুষিক প্রতিভার

প্রতি সুবিচার হয় নাই। এমন কি ইংরাজগণও, জব চার্ণকের প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। *

জব চার্ণকের আভিজাত্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণই সে কালের ইতিহাসে নাই। সেকালের পুরাতন কাগজপত্রে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ১৬৫৫ কি ১৬৫৬ অব্দে, অর্থাৎ পলাসী যুদ্ধের একশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। কাশিমবাজারে জুনিয়ার মেম্বররূপে আমরা তাঁহার নাম প্রথম দেখিতে পাই। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দের কোম্পানীর সেরেস্তায় দেখা যায়—"জব চার্ণক—চতুর্থ সদস্য—বেতন কুড়ি পাউণ্ড"। কাশিমবাজার হইতে তিনি পাটনায় প্রেরিত হয়েন।

চার্ণক প্রথমে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে এদেশে, কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসেন। কিন্তু ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী—তিনি বিলাতের কর্ত্তাদের নিকট যে প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন—তাহা হইতে প্রমাণিত হয়, মেয়াদী সময়ের অতিরেকেও তিনি কোম্পানীর চাকরী করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহার করার এই, যে তিনি পাটনা ফ্যাক্টারীর অধ্যক্ষরূপে নিয়োজিত হইতে চান এবং সেই সঙ্গে তাঁহার বেতন বৃদ্ধিও প্রয়োজন। বলা বাহুল্য তাঁহার এ প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পাটনায় থাকেন। †

* এতাবৎকাল পর্য্যন্ত, সেণ্ট জন গির্জ্জা মধ্যস্থ সমাধিস্তম্ভ ব্যতীত, চার্ণকের স্মৃতি-রক্ষার আর কোন চিহ্নই স্থাপিত নাই। কিন্তু আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট, ভারতীয় ইতিহাস-ভক্ত লর্ড কর্জ্জন পোষ্টাফিসের নিকটবর্ত্তী স্থানটীকে Charnock Place আখ্যা দিয়া—কলিকাতা প্রতিষ্ঠার স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন।

† ব্রিটিশ মিউজিয়মে—বিলাতে চার্ণক সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক কাগজ পত্র আছে বটে, কিন্তু তাহার বাল্যজীবনের কোন কথাই আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। প্রবাদ এই, এক হিন্দুরমণীকে জব চার্ণক, সতীদাহের অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করেন। এই রমণীর প্রভাবে চার্ণকের মনে অনেকটা হিন্দুভাব জাগিয়া উঠে। বর্ত্তমান কালের হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে, সেণ্ট জন গির্জ্জার মধ্যে, চার্ণকের নশ্বর দেহ সমাহিত হয়। তখন এস্থানে গির্জ্জা নির্ম্মিত হয় নাই। ইহা পতিত সমাধি-ভূমি মাত্র ছিল। এই গির্জ্জা সম্ভবতঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে নির্ম্মিত হয়। জমীটা মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সম্পত্তি। এই গির্জ্জার পার্শ্বেই গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বাটী ছিল। সেই বাটী এক্ষণে Burn কোংর কার্য্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের সমাধিস্থানের উপর একটী মন্দির (Mausoleum) নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনশত বৎসর পুরাতন এই মন্দিরটি আজও ঝড়ঝটিকা সহ্য করিয়া অক্ষতভাবে দণ্ডায়মান আছে। এই সমাধি মন্দির চার্ণকের জামাতা, চার্লস আয়ার কর্ত্তৃক ১৬৯৭ খৃঃঅব্দে নির্ম্মিত হয়, চার্ণকের সহিত এই হিন্দুরমণীর (ব্রাহ্মণ-কন্যার) পরিণয় সম্ভবতঃ ১৬৭৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বা পরে হইয়াছিল। ইহা হইতে বোধ হয়—এই হিন্দু স্ত্রী লইয়া চার্ণক কুড়ি বৎসরকাল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। জনরব এই, উক্ত সমাধিস্তম্ভ নিম্নে, চার্ণক ও তাঁহার হিন্দু পত্নী উভয়েরই সমাধি আছে। এই হিন্দু রমণীর গর্ভে চার্ণকের মেরী বলিয়া এক কন্যা জন্মে। আয়ার, এই মেরী

পাটনায় অবস্থান কালে, এদেশের লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মে। এদেশের লোকের রীতি, প্রবৃত্তি, শক্তি, প্রতিভা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করেন। এই অভিজ্ঞতা বলেই, তিনি ভবিষ্যতে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, সহমরণের চিতা হইতে চার্ণক যে ব্রাহ্মণকন্যাকে উদ্ধার করিয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও যাহার গর্ভে, তাঁহার কয়েকটী কন্যা হয়, তাহারই শক্তিতে তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মে শিথিলতা প্রদর্শন করেন। এইজন্যই তিনি আধা-হিন্দু—আধা-খৃষ্টান গোছের হইয়াছিলেন। এই জনপ্রবাদের একটী কারণ আছে। পত্নীর মৃত্যুর পর, প্রতিবৎসর তাঁহার মৃত্যু-তিথিতে, চার্ণক তাহার গোরের উপর একটী মোরগ-বলি দিতেন। গোর ও তদুপরি মোরগবলির কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে হিন্দুপ্রথা নহে—তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। চার্ণক বহুদিন বেহার প্রদেশে ছিলেন। বেহার প্রদেশের লোকেরা "পাঁচ-পীরের" উদ্দেশে এরূপ মোরগবলি দেয়। হয়ত চার্ণক সেই প্রথারই অনুকরণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে অখৃষ্টিয়ান ইত্যাদি বলিয়া গিয়াছেন। চার্ণকের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে—এই অভিমত কখনও সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। চার্ণক তাঁহার কন্যাদের খ্রীষ্টানী নাম প্রদান করেন। তাঁহার এক জামাতা আয়ার (পরে স্যার চার্লস আয়ার) কোম্পানী বাহাদুরের কুঠীর গবর্ণরী-পদ লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় জামাতা জোসাথান হোয়াইট, বাঙ্গালার ফ্যাক্টারী-কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। যাহাই হউক না কেন—চার্ণকের ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক বিতর্ক করিবার কোন প্রয়োজনই নাই, তিনি কি করিয়া তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—তাহাই এখন আলোচনা করিব।

কেই পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে মেরীর মৃত্যু হয়। মেরী-ব্যতীত চার্ণকের ক্যাথারিণ ও এলিজাবেথ বলিয়া আর ও দুইটা কন্যা ছিল। জোসাথান হোয়াইটের সহিত ক্যাথারিণের বিবাহ হয়। ১৭০১ খৃঃ অব্দে ক্যাথারিণের মৃত্যু ঘটে। ক্যাথারিণ ও মেরী উভয়েই পিতার সহিত একক্ষেত্রে সমাধিস্থ হন। চার্ণকের তৃতীয় কন্যা এলিজাবেথ ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের তিনবৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। উইলিয়মস বৌরিজ নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহাই কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের বংশবৃত্তান্ত (Wilson's Early Annals.--Proceedings of the Asiatic Society of Bengal March 1893—Indian Church Quarterly Review. 1892).

চার্ণক বহুদিন এদেশে বাস করিয়াছিলেন। দেশের লোকের আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র তিনি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ ও তাহার অধিবাসীদের সম্বন্ধে, তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। মোগল সম্রাট তখন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা। সম্রাট দিল্লী ও আগরায় থাকেন, তাহার অধীনস্থ রাজপ্রতিনিধি সুবেদার,ফৌজদার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণই সুদূর রাষ্ট্র-বিভাগ সমূহের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। এই শাসক-সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, শাসন-কৌশল—চার্ণক বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

বিলাতের কর্ত্তারাও, তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস করিতেন। * চার্ণকের আশা ছিল, যে বঙ্গের বাণিজ্য কুঠীগুলি ভবিষ্যতে আবার মান্দ্রাজের অধীনতা বিমুক্ত হইবে, তিনিই বঙ্গের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। কিন্তু তাঁহার এ আশা অনেক বিলম্বে পূর্ণ হইয়াছিল।

চার্ণক প্রথমে কাশিমবাজার কুঠীর কর্ত্তা হন। হুগলীর কুঠীই তখন প্রধান কুঠী। কিন্তু বিলাতের প্রভুদের মিষ্টবাক্যে মোহিত হইয়া, আশায় বুক বাঁধিয়া, তিনি কাশিমবাজারেই থাকেন। হুগলী হইতে নদীপথে কাশিম বাজার দুই দিনের পথ। কশিমবাজারের সান্নিধ্যেই বর্ত্তমান মুরশীদাবাদ। তখন মুরশীদাবাদেই মোগল শাসনকর্ত্তা থাকিতেন।

নবাব সায়েস্তাখাঁর নাম ভারত ইতিহাসে, বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সায়েস্তাখাঁ, পঁচিশ বৎসর কাল বঙ্গদেশে মোগল-সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপে, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের উপর তাঁহার কোনরূপ মায়া-মমতা ছিল না। তিনি সুযোগ পাইলেই, তাহাদের নানা অছিলায় পীড়ন করিতেন। নবাব সায়েস্তাখাঁ—দিল্লীর সম্রাট-বংশের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। সম্রাট ঔরঙ্গজেব, তাঁহাকে অসীম ক্ষমতা দিয়া, বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন ও নিজে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রশক্তির সহিত যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হন। কাজেই এই অমিত প্রতাপশালী নবাব যাহা করিতেন, তাহাতে কথা কহিবার আর কেহই ছিল না। †

* কোর্ট অব ডিরেক্টারদের অনেক বিলাতী চিঠিপত্রে, তাঁহারা চার্ণককে "Our old and good servant Mr. Job Charnock" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

* নবাব সায়েস্তা খাঁ দুইবার বঙ্গদেশে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে শাসন কর্তৃত্ব পদ লাভ করেন। ইত্‌মাদ উদ্দৌলা গিয়াসবগে,' সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের পিতা। আসফ খাঁ নুরজাহানের সহোদর। সায়েস্তা খাঁ—আসফখাঁর পুত্র ও সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভ্রাতুঃ-

সায়েস্তাখাঁর সহিত নানাকারণে ইংরাজ-পক্ষের মনোমালিন্য ঘটিল। পূর্ব্বে আমরা সম্রাট ঔরঙ্গজেব প্রদত্ত যে ফারমানের কথা বলিয়াছি, সায়েস্তাখাঁ তাহা আমলেই আনিতে চাহিলেন না। ইংরাজেরা এপর্য্যন্ত নানাদিকে নানাবিষয়ে, স্থানীয় শাসন-কর্ত্তাদের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া আসিতেছেন। মোগল রাজকর্ম্মচারীরা নবাবের মনোভাব বুঝিয়া, ইংরাজদের নিকট জোর জবরদস্তি করিয়া নানা বাবের অছিলায়, টাকা আদায় করিতে লাগিল। মান্দ্রাজ কৌন্সিলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নবাব সায়েস্তাখাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"যদি আপনি ইংরাজ-বণিকদিগের প্রতি সুবিচার না করেন, অত্যাচারের প্রতিবিধান না করেন, তাহা হইলে কোম্পানী-বাহাদুর বাঙ্গলায় বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবেন। বাঙ্গলায় ইংরাজ-বাণিজ্য লোপ হইলে, সরকারের যথেষ্ট রাজস্ব-নাশ হইবে।" কিন্তু এবম্বিধ ভয় প্রদর্শনেও কোন ফল হইল না।

নবাবের এইরূপ হৃদয়হীন ব্যবহার, ইংরাজেরা বহুদিন ধরিয়া নির্ব্বাকভাবে সহ্য করিলেন। শেষ বিলাত হইতে, ইংলণ্ডেশ্বর জেম্‌সের আদেশে ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের অনুরোধে—কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ ভারতবর্ষের দিকে প্রেরিত হইল। মোগল-রাজশক্তির সহিত, প্রকাশ্যভাবে প্রতিযোগিতা করাই এ নৌ-সেনাবল প্রেরণের উদ্দেশ্য।

অবশেষে ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে—দুইখানি জাহাজ ৩০৮ জন নৌসেনা লইয়া সুদূর ইংলণ্ড হইতে হুগলী নদীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কাজটা বড়ই ভ্রমাত্মক হইয়াছিল। কারণ বঙ্গদেশে—নবাব সায়েস্তাখাঁর

পুত্র। আসফ খাঁ—জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান, উভয় বাদসাহের আমলেই রাজ্যের প্রধান উজীর ছিলেন। সায়েস্তা খাঁ—তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর, সাহজাহানের "আমির-উল-উমরা" বা প্রধান সচিব পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার ভগ্নী মমতাজমহল সাহজাহানের প্রধানারাজ্ঞী ছিলেন। ইঁহার সমাধির উপরই জগত-বিশ্রুত তাজমহল নির্ম্মিত হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার এক ভ্রাতষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন। অপর এক ভ্রাতষ্পুত্রীর সহিত—সাহজাহানের অন্যতম পুত্র—সাহজাদা মুরাদবক্সের পরিণয় হয়। দিল্লীর রাজসংসারের সহিত, এরূপ বাঁধাবাঁধি সম্পর্ক থাকার জন্যই, সায়েস্তা খাঁ—অতিশয় প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য, বেরার, গুজরাট প্রভৃতি দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সম্রাটের আমলে, রাজ প্রতিনিধির কার্য্য করিয়া, শেষ তিনি বঙ্গদেশে আসেন। ইংরাজদিগের মতে তিনি সুশাসক ও প্রজাপালক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার আমলে বঙ্গদেশে টাকায় আটমণ চাল বিক্রীত হইত। এখন এটা প্রবাদবাক্যে দাঁড়াইয়াছে। ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে—৮৬ বৎসর বয়সে, নবাব সায়েস্তা খাঁর মৃত্যু হয়।

চার্ণক, নবাবের নিকট যে সকল দাবি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান। (১) নবাব তাঁহার অধিকৃত ভূভাগের মধ্যে একটী সুবিধা-কর স্থানে ইংরাজদিগকে দুর্গ-নির্ম্মাণ করিতে সম্মতি দিবেন। (২) ইংরাজদের বাণিজ্য-শুল্ক দিতে হইবে না ও তাঁহারা নিজেদের টাঁকশালে টাকা তৈয়ারি করিবেন। (৩) মালদহের ফ্যাক্টারী লুঠ করিয়া, নবাব ইংরাজদের যে টাকাকড়ি লইয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন ও ফ্যাক্টারী-গৃহ পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। (৪) ইংরাজেরা বাণিজ্যসূত্রে নবাবের প্রজাদের নিকট যে সমস্ত টাকা পান, তাহা তাঁহারা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

ভরমল—এই সমস্ত ব্যাপারের মীমাংসার জন্য, নবাব সায়েস্তার্থা কর্ত্তৃক সুতালুটীতে প্রেরিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, ভরমল ইংরাজদিগের প্রার্থনামত কয়েকটী স্বত্বে—নবাবপক্ষ হইতে, ইংরাজদের সহিত সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন। প্রথামত, এই সন্ধিপত্র নবাব সায়েস্তার্থার নিকট স্বাক্ষরার্থে ঢাকায় প্রেরিত হইল। চার্ণক বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন—ইহা যেন সম্রাটেরও স্বাক্ষর সংযুক্ত হইয়া আসে। ১১ই জানুয়ারী—এই সন্ধিপত্র নবাবের নিকট ঢাকায় প্রেরিত হয়। ২৮শে তারিখে, নবাবের নিকট হইতে সংবাদ আসে—যে তিনি সেই সন্ধিপত্র মঞ্জুর করিয়া, বাদসাহের সহী-মোহরের জন্য যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু চার্ণক, আগাগোড়াই একটা মহাভ্রমে পড়িয়াছিলেন। এদেশে এতদিন বাস করিয়াও, তিনি নবাব সায়েস্তার্থার মত জবরদস্ত, কূটবুদ্ধি, রাজকর্ম্মচারীকে চিনিতে পারেন নাই। শীঘ্রই তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। প্রকৃতপক্ষে নবাব হুগলীর ব্যাপারে তিলমাত্র ভীত হন নাই। তিনি কেবল উপযুক্ত অবসর লাভের জন্য, এইরূপ চতুরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, তিনি ভরমল-প্রণোদিত উল্লিখিত সন্ধিপত্র, চার্ণকের নিকট অস্বাক্ষরিত অবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন। বঙ্গের সর্ব্বস্থানের শাসনকর্ত্তাদের সেনা সমবেত করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহাদের উপর হুকুম হইল, এই সমবেত-সেনা সহায়তায়, তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ দিগকে জন্মের মত উচ্ছেদ করিবেন। ভরমল ইতিপূর্ব্বেই—স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। *

* চার্ণক ঘটিত ব্যাপারে যেখানে আমরা "নবাব" শব্দ ব্যবহার করিব—পাঠক সেটিকে নবাব সায়েস্তার্থা।—বলিয়াই যেন বুঝেন।

চার্ণক এই সংবাদ অবগত হইয়া, মহা বিপদে পড়িলেন। যুদ্ধ বিনা আর কোন উপায়ই নাই। তিনি অগত্যা সুতালুটী ত্যাগ করিয়া, মালপত্র ও জাহাজাদি সমেত মেটিয়াবুরুজে উপস্থিত হইলেন। এইখানে, বাদসাহী নিমকমহল ছিল। * "থানা" বলিয়া একটি দুর্গও ছিল। চার্ণক, বাদসাহী নিমকমহলের ঘরগুলি পোড়াইয়া দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে থানা দুর্গটীও দখল করিয়া লইলেন। মোগলের সহিত ইংরাজের প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা আরম্ভ হইল।

চার্ণক যে সময়ে "থানা" দুর্গের ধ্বংশসাধনে নিযুক্ত, সেই সময়ে তাঁহারই আদেশে, কাপ্তেন নিকলসন, অর্দ্ধেক সৈন্য ও জাহাজ লইয়া, হিজলী অধিকারের জন্য প্রেরিত হইলেন। পাঠক এই সমস্ত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিতেছেন, কলিকাতা প্রতিষ্ঠাকারী জব চার্ণক, কিরূপ দুঃসাহসিক লোক ছিলেন।

ইংরাজ কর্ত্তৃক সুতালুটী ত্যাগ হিজলী অধিকার এবং উলুবেড়িয়া ও সুতালুটীতে পুনঃ প্রত্যাগমন।

(১৬৮৭—১৬৮৮)

কলিকাতার পার্শ্ববাহিনী ভাগিরথী, এখন যে অবস্থায় উপনীত, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ঠিক সেরূপ ছিল না। যে হিজলীতে, চার্ণক আশ্রয় লইয়াছিলেন সে হিজলীও এখানকার মত সুগম ছিল না। চারিদিকে অসংখ্য নদী, বালিয়াড়ির স্তূপ, উত্তাল তরঙ্গময়ী জাহ্নবী জলরাশির তাণ্ডবনৃত্য, ইত্যাদি কারণে হিজলীর সে সময়ের অবস্থা, অতি ভয়ানক ছিল। সহজে কেহ তথায় যাইতে চাহিত না। আর অন্য স্থান হইতে কোন লোক হিজলীতে পৌছিলে তাহার জীবন লইয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব হইত। কারণ একটা প্রবাদবাক্য আছে—

"একবার খেলে হিজ্‌লী-পাণি
যমে-মানুষে—টানাটানি।"

ইহার কারণ আর কিছুই নহে, দুই শতাব্দী পূর্ব্বে হিজ্‌লী, জ্বর ম্যালেরিয়া ও উদরাময়ের আবাসকেন্দ্র ছিল।

চার্ণক হুগলী হইতে পলাইয়া সুতালুটিতে আসিলেন বটে, কিন্তু তথায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। মোগলেরা কখন যে পঙ্গপালের মত

* আজও মেটিয়াবুরুজের অদূরবর্ত্তী একটী স্থান নিমকমহল বলিয়া পরিচিত। এখনও নিমকমহলের রাস্তাটী "নিমকমহল ঘাট রোড" বলিয়া সাধারণে পরিচিত আছে।

তাঁহার দলবলকে সহসা আক্রমণ করিবে, বিধ্বস্ত করিবে, সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিবে, এই ভাবনাতেই তিনি অস্থির হইয়া, যমের অগম্যস্থান এই হিজলীতে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। হিজলী, মোগলের অধিকারভুক্ত স্থান হইলেও হুগলী বা ঢাকা হইতে সেনা পাঠাইয়া মোগলেরা তাঁহাকে ততটা ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিবেন না, ইহাই তাঁহার প্রধান আশা। অপরন্তু হিজলী সমুদ্রের নিকটে। সমুদ্রপথে—ইংরাজ চিরদিন নির্ভয় চিত্ত। প্রয়োজনমতে সমুদ্রপথ হইতে ইংরাজ-জাহাজের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সঙ্গে যে কয়েকখানি জাহাজ আছে, বেশী গোলযোগ সম্ভাবনা দেখিলে, সেই জাহাজে উঠিয়া সমুদ্রপথে পলায়নেরও কোন অন্তরায় উপস্থিত হইবে না। এই সব ভাবিয়া চার্ণক হিজলী যাওয়াই স্থির করিলেন।

কোন ইউরোপীয় বণিকেরাই, এ পর্য্যন্ত মোগল-বাদসাহের সৈন্যের সহিত, প্রকাশ্য সংঘর্ষ উপস্থিত করিতে সাহসী হন নাই। দিনেমার, ওলন্দাজ যাহা করিতে সাহসী হন নাই—ইংরাজপক্ষ হইতে জবচার্ণক তাহাই করিলেন। তিনি হুগলীতে যে হুলস্থুল ব্যাপার ঘটাইয়া আসিয়াছেন, মোগলপক্ষ তাহাতে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বিশেষতঃ অন্য কোন শাসনকর্ত্তা হইলে না হয়, ততটা ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না—কিন্তু অমিতপ্রতাপ, কূটবুদ্ধি সায়েস্তাখাঁ বর্ত্তমান থাকিতে, ইংরাজগণ কোন ক্রমেই নিরাপদ নহেন। *

---

* হুগলীর হাঙ্গামা ব্যাপারে, এদেশীয়দের চক্ষে চার্ণক প্রকৃতই একজন সাহসী বীর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন আখ্যান প্রচলিত আছে। সে আখ্যানটী, চার্ণকের হুগলী পরিত্যাগ ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। এ দেশীয়েরা চার্ণককে ও তাঁহার কৃতকার্য্যগুলিকে, কিরূপভাবে দেখিয়াছিল—তাহা এই অতিরঞ্জিত গল্প হইতেই প্রমাণিত হয়। গল্পটি এই—চার্ণক যে সময়ে হুগলীর কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন—সেই সময়ে একদিন বাণের তোড়ে কোম্পানীর বাণিজ্যাগার ও ইংরাজদের আবাসভবন ভাঙ্গিয়া যায় ও সমস্ত গৃহাদি নষ্ট হয়। ইহার পর চার্ণক—ইংরাজদের বাসের জন্য একটী দুইতালা বাড়ী গাঁথিতে আরম্ভ করেন। তখন অনেক পদস্থ মোগল-কর্ম্মচারী ও আমীর-ওমরাহ হুগলীতে বাস করিতেন। তাঁহারা হুগলীর মোগল-শাসনকর্ত্তার নিকট এই বলিয়া নালিশ করেন—"ইংরাজ কোম্পানী যেরূপভাবে—ঘর প্রস্তুত করিতেছে, সে গুলি সেইভাবে উচ্চ হইলে, তাহাদের অন্দর-মহলের সমস্ত ব্যাপারই ইংরাজেরা ছাদে উঠিলেই, দেখিতে পাইবে। তাহাতে জেনানার মর্য্যাদাহানি হইতে পারে"। মোগল-সুবাদার এই অভিযোগ শুনিয়া, এদেশীয় মিস্ত্রি ও রাজমজুরদিগকে—ইংরাজের কাজ করিতে নিষেধ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া চার্ণক, হুগলী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। হুগলীতে তখন অগণিত মোগলসেনা ছিল, কিন্তু চার্ণকের লোকবল তাহার তুলনায় অতি কম। মোগলের সহিত প্রতিযোগীতায় অক্ষম হইয়া, চার্ণক হুগলী ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু গমন সময়ে স্ফারশ্মি ও আফ্‌তাব্ (আতসী) কাচের সাহায্যে, গঙ্গাতটবর্ত্তী সমস্ত গৃহগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া যান। হুগলী হইতে চন্দননগর পর্য্যন্ত এই অগ্নিরাশি ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। মোগল-শাসনকর্ত্তারা, চার্ণকের পলায়ন

মস্‌নদ আলিখাঁ নামক একব্যক্তি হিজলীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও মস্‌নদ আলির মস্‌জেদ, তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। মস্‌নদ আলি, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমমার্দ্ধভাগে হিজলীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। দীর্ঘকাল রাজত্বের পর মনসদ আলি শুনিতে পাইলেন—মোগল-সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে অসংখ্য সেনা প্রেরণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া, পুত্রকে মোগলের সহিত সন্ধি করিবার উপদেশ দিয়া, তিনি জীবন্ত অবস্থায় সমাধিমধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবলীলার অবসান করেন। তাঁহার পুত্র, আজীবন মোগল বাদসাহের অধীনে সামন্তরাজরূপে হিজলী শাসন করেন। তৎপরে ইহা মোগলের দখলে আসে।

সে সময়ে হিজলীতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। লবণও যথেষ্ট উৎপন্ন হইত। লবণের ব্যবসায়, মোগলের একচেটিয়া ছিল—এ প্রদেশের ক্ষারময় মৃত্তিকা ও লোণাজল হইতে, প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত এবং এই লবণকর মোগলের—বাঙ্গলার এক লাভকর রাজস্ব। এতদ্ব্যতীত ইহা চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়া, মোগল এ স্থানটীকে তাঁহাদের "ঘাটী" বা দুর্গরূপে পরিণত করিয়াছিলেন।

নিকলসন, চার্ণকের আদেশমত, সর্ব্বাগ্রে হিজলী অভিমুখে যাত্রা করেন। মালেক-কাশেম বলিয়া, একজন মোগল সেনাপতি তখন হিজলীর রক্ষা

পথ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে, গঙ্গার এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত, দুইগাছি সুবৃহৎ লোহার শিকল লাগাইয়া দেন। কিন্তু চার্ণক তরবারি দিয়া সেই লোহার শিকল কাটিয়া ফেলেন ও দাক্ষিণাত্যে বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে বাদসা দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। চার্ণককে বাদসার নিকট উপস্থিত করা হইল। চার্ণক জোড়হস্তে বাদসাহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে, একজন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া বাদসাহকে চুপে চুপে বলিল—"মোগল-সেনার রসদ ফুরাইয়াছে। সকলকে অনাহারে মরিতে হইবে।" চার্ণক এই কথা শুনিতে পাইয়া, তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে গোপনে বলিয়া দেন, আমাদের আহার্য্য—যাহা কিছু আছে, মোগল-শিবিরে পৌঁছাইয়া দাও। তখনই তাঁহার এ আদেশ প্রতিপালিত হইল। বাদসা ঔরঙ্গজেব, চার্ণকের এই হৃদয়ের মহত্ত্বে মোহিত হইয়া বলিলেন—"তুমি যাহা চাহিবে তাহাই তোমাকে দিব"। চার্ণক বলিলেন—"জাঁহাপনা! আগে আমায় অনুমতি দিন—যে আমি আপনার শত্রুদের পরাজিত করি।" বাদসাহ অনুমতি দিলে, চার্ণক বাদসাহের শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া আবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। বাদসাহ চার্ণকের উপর মহাসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"এখন তোমার প্রার্থনা কি?" চার্ণক বলিলেন—"কলিকাতা নামক গণ্ডগ্রাম খানি ইংরাজদের দান করুন।" বাদসাহ চার্ণকের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বাদসাহ—দিল্লী চলিয়া গেলেন। চার্ণকও সুতানটিতে আসিয়া ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গ-প্রতিষ্ঠা করিলেন।" আমরা পরলোকগত, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উইলসন সাহেবের পুস্তক হইতে, এই কিম্বদন্তীটি উদ্ধার করিয়া পাঠককে উপহার দিলাম।

(Wilson's Early Annals) P, 102. (রিয়াজ-সালাতিন)।

কর্ত্তা। নিকলসনকে সহসা কতকগুলি জাহাজ সমেত উপস্থিত হইতে দেখিয়া, কাশেম সাহেব হিজলী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। মোগলের কামান, রসদ ও হিজলী সহর, নিকলসনের দখলে আসিল।

ফেব্রুয়ারি মাসে, চার্ণক হিজলীতে উপস্থিত হন। হিজলী তখনকার হিসাবে, একটী ছোটখাট, জনপূর্ণ সহর। অপর্য্যাপ্ত শস্য, প্রচুর গৃহপালিত পশু পক্ষী—এখানে না আছে কি? চার্ণক, তাঁহার সমস্ত সৈন্যবল সহরে একত্রিত করিয়া বেশ জাঁকাইয়া বসিলেন। ধরিতে গেলে—তিনিই তখন সমগ্র হিজলী সহরের মালিক।

হিজলী অধিকার করিয়া—চার্ণক বুঝিলেন, এই সহর অতি সহজেই তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে বটে, কিন্তু রক্ষার সুবন্দোবস্ত না করিলে ইহা অতি সহজেই হস্ত বহির্ভূত হইতে পারে।

একদিকে কাউখালি নদী, অন্যদিকে রসুলপুর নদী—তাহার উপর ভাগিরথীর মোহানা ত আছেই। ধরিতে গেলে, হিজলী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। বিপদ উপস্থিত হইলে বা প্রয়োজন ঘটিলে, যাহাতে এই সমস্ত নদীমুখ হইতে বাহির হইতে পারা যায়, তজ্জন্য নদীমুখে অসংখ্য ছোটবড় নৌকা রাখা হইল। নগরের অধিবাসীরা যাহাতে হিজলী হইতে বাহির হইয়া পর পারে না যাইতে পারে, তজ্জন্য নদীর চারিদিকে দিবারাত্রব্যাপী পাহারা রহিল।

হিজলী—রক্ষার সুবন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গেই, চার্ণক, চেষ্টা করিয়া বালেশ্বর দখল করিলেন। বালেশ্বরেও তখন ইংরাজ-ফ্যাক্টারী ছিল। মোগলের দুর্গ ও তোপখানা ছিল। অতি সহজেই এই দুর্গ ও তোপখানা ইংরাজের দখলে আসিল। দুইদিন ধরিয়া বালেশ্বর লুঠ হইল। এই সময়ে দুইখানি মোগল-জাহাজে সাহাজাদা ও নবাব সায়েস্তাখাঁর জন্য, চারিটী হস্তী আসিতেছিল। ইংরাজেরা মোগলের এই জাহাজখানি লুঠ করিয়া, হাতীগুলি দখল করিলেন। এই সব কাণ্ড করিয়া ইংরাজেরা, যখন বুঝিলেন—বালেশ্বরের অধিবাসীদের, ইংরাজের শৌর্য্যবীর্য্য ও প্রভাব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করান হইয়াছে, তখন তাঁহারা বালেশ্বর ত্যাগের বন্দোবস্ত করিলেন।

একে একে, চার্ণক অনেকগুলি অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলেন।

* Hunter's Statistical Account of Bengal. III. 193.
Hedge's Diary, 1, 68. 172. 175.

হুগলী লুণ্ঠন, বালেশ্বর ধ্বংস, থানা দুর্গ অধিকার, হিজলী অধিকার—ইত্যাদি ব্যাপার বড় সহজ কাজ নহে। চার্ণক বুঝিলেন, এইবার সাংঘাতিক সময় আসিতেছে। মোগল যে সহজে এ সব ব্যাপার ভুলিয়া যাইবে, তাহা কথনই সম্ভবপর নহে।

কিন্তু যে মোগলের ভয়ে, চার্ণক এত ব্যতিব্যস্ত, তাহারা এত ঘটনার পরও সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। সম্রাট ঔরঙ্গজেব, তখন দাক্ষিণাত্যের আরঙ্গাবাদে যুদ্ধকার্য্যে ব্যস্ত। মার্চ্চমাসে তাঁহার নিকট এ সব সংবাদ পৌছিল। তিনি ইহাতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। কোথায় হিজলীর ন্যায় একটী ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম, কোথায় সুদূর বঙ্গদেশে—ক্ষুদ্র নগর হুগলী, এ সব সংবাদ তিনি কিছুই রাখিতেন না। কিন্তু যখন সরকারে এত্তেলা পৌছিয়াছে আর হুগলীর শাসনকর্ত্তা যখন ইংরাজদের বিরুদ্ধে এত্তেলা করিয়াছে, তখন এই ব্যাপার তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তিনি মীরমুন্সীকে ডাকাইয়া, বঙ্গদেশের ম্যাপ আনাইলেন। নক্সাখানি একবার দেখিয়া ভ্রুকুঞ্চিত, করিলেন। কিন্তু তখন তিনি দাক্ষিণাত্যের মহাযুদ্ধে ব্যস্ত, কাজেই এ ক্ষুদ্র ব্যাপার, তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিল না—তত্রাচ ইংরাজদের বিরুদ্ধে সুবেদারের আরজীর উপর একটা হুকুম হইয়া গেল। *

আর এ দিকে নবাব সায়েস্তাখাঁ—তিনিও হুগলীর ব্যাপারটীকে ততটা হানি-জনক বলিয়া বিবেচনা করিলেন না বটে, কিন্তু ইংরাজদিগকে হিজলী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য, প্রচুর পরিমাণে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা, প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, মোগল বাহিনী হিজলীতে উপস্থিত হইয়াই, ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে সমুদ্রের দিকে তাড়াইয়া দিবে।

মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে, হিজলীতে ইংরাজের আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল। এই গ্রীষ্মকালে, হিজলীবন্দরে ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ বড়ই বৃদ্ধি হয়। ইংরাজপক্ষের মধ্যে, এই সমস্ত রোগ দেখা দিল। জাহাজে যে সমস্ত গোরা ছিল বা হিজলী সহরে যে সমস্ত ইংরাজ ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়িল। পীড়ার প্রাবল্যে মড়ক দেখা দিল। প্রায় ১৮০ জন সেনা, শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিয়া কাজ কর্ম্মের বাহির হইয়া পড়িল। খাদ্য দ্রব্যও অতি দুর্লভ হইল। সুলভের মধ্যে

* Hedge's Diary. 11. 65. 96.

গোমাংস ও লোণা গাঙ্গের ধৃত দুষ্পাচ্য মৎস্য। এই ভীষণ গ্রীষ্মে, তাহাও অখাদ্যরূপে পরিণত হইল। ইংরাজেরা তাঁহাদের কাজকর্ম্মের জন্য যে সমস্ত কুলী-মজুর বা মিস্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা হিজলী—সহর ছাড়িয়া নদী পার হইয়া, অপর পারে পলাইতে লাগিল। আর এই ভীষণ বিপত্তির সময়ে—সায়েস্তাখাঁর প্রেরিত, মোগল-সেনারাও হিজলীর সন্নিহিত হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—হিজলীর সেনাপতি মালেক-মাশেম, হিজলী দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান। তিনি পুনরায় সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া, হিজলীর অপর পারে রসুলপুরে, গোলন্দাজ-সেনা স্থাপন করিলেন। চার্ণক—বুঝিলেন, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে এবারে রক্ষার আর কোন উপায়ই নাই। যে উপায়েই হউক, মোগলের তোপখানা দখল করিতেই হইবে।

দুঃসাহসিক চার্ণক, অনর্থক সময়ক্ষেপ না করিয়া মালেক-কাশেমের মোগল সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। প্রথমতঃ তিনি শত্রুর পনর হাজার মণ চাউল লুঠ করিয়া গৃহজাত করিলেন। দ্বিতীয়বার আক্রমণে, মোগলের তোপখানার একাংশ বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। বড় বড় কামানগুলি শক্তিহীন হইল—ইংরাজপক্ষ মোগলের কয়েকটী ছোট কামান দখল করিলেন। প্রচুর গুলি ও বারুদ তাঁহাদের হস্তগত হইল। এইরূপ প্রতিযোগিতার অবসরে ইংরাজপক্ষ কিছু সময় লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সে সুযোগ দীর্ঘকাল উপভোগ করিতে পারিলেন না। মোগলপক্ষ পুনরায় সেনাবল সংগ্রহ করিয়া, নূতন তোপখানা তৈয়ারী করিল। ইংরাজের যে সমস্ত জাহাজ হিজলীর কাছে নঙ্গর করিয়াছিল, সেগুলিকে সমুদ্রে তাড়াইয়া দিয়া, হিজলী দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। চার্ণকের অধীনস্থ ইংরাজ-সৈন্যের বেশীর ভাগ এই হিজলীদুর্গ মধ্যেই ছিল।

নবাব সায়েস্তাখাঁর প্রেরিত, মোগল-সেনাধ্যক্ষ আবদুল সামেদও ঘটনাক্রমে এই সময়ে অসংখ্য বাহিনী লইয়া হিজলী পৌছিলেন। বার হাজার ফৌজ তাঁহার সঙ্গে। নবাব তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিলাম। যে উপায়ে পার, ইংরাজদের বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিতে চাও।" আবদুল সামেদ ইংরাজদের উচ্ছেদ করিবার জন্য—এই নদী-উপনদী-বহুল স্থানের চারিদিকে ব্যাটারি বা তোপখানা স্থাপন করিলেন। ইংরাজদের জাহাজগুলির উপর, চারিদিক হইতে গোলাবর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল।

ইংরাজেরা এইবার মহাবিপদে পড়িলেন। দুর্গমধ্যস্থ সেনাদল—সম্পূর্ণ রূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। দলের অর্দ্ধেক সেনা, পীড়িত ও রোগেতে অতি দুর্ব্বল। ২৮এ মের সন্ধ্যাকালে, সাতশত মোগল অশ্বারোহী ও দুইশত গোলন্দাজ, হিজলী সহর হইতে মহোৎসাহে রসুলপুরের মোহানা পার হইল। হিজলী নগর হইতে এই স্থান দেড় ক্রোশ। ইংরাজেরা হিজলী দুর্গমধ্যে। এ নূতন বিপত্তি-সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, আবদুল সামেদের সেনাগণ, নগর লুঠপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। স্থানে স্থানে আগুন ধরাইয়া দিল। এই সময়ে মোগলদের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিক উত্তেজনা অবর্ণনীয়। উন্মত্ত মোগল সেনাগণ, একজন পীড়িত ইংরাজ সেনাপতিকে শায়িতাবস্থাতেই শতখণ্ডে তরবারি দ্বারা বিভক্ত করিল। তাহার পত্নী ও পুত্রকে বন্দী করিল। যে আস্তাবলে ইংরাজদের অশ্ব ছিল, তাহা মোগলপক্ষের হস্তগত হইল। চার্ণক যে চারিটী হস্তী ইতিপূর্ব্বে মোগল জাহাজ লুণ্ঠন দ্বারা হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা আবার মোগলের হাতে পড়িল। সন্ধ্যা অবধি এইভাবে যুদ্ধ চলিল বটে, কিন্তু মোগল-সেনা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

চার্ণকের অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। প্রায় দুইশত লোক, জ্বরে ও ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাঁহার অধীনস্থ একশত সেনা রোগে জর্জ্জরিত ও শীর্ণকায়। এ ক্ষেত্রে একমাত্র উপায়, বহির্দ্দেশ হইতে কোনরূপ সাহায্যলাভ। যদি কোন ইংরাজ-জাহাজ সহসা সমুদ্র হইতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেই রক্ষা। কিন্তু এরূপ সাহায্য, ভগবানের কৃপা ভিন্ন হইতে পারে না। চার্ণক একটা বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন—যে নদীর মোহানার যে অংশ সমুদ্রের দিকে গিয়াছে—সেই স্থানে একটী বাড়ী দখল করিয়া, তিনি তথায় দুইটী তোপ রাখিয়াছিলেন। মোগল সৈন্য এই তোপের জন্যই এদিকে আসিতে পারে নাই। এই পথটী সুরক্ষিত দেখিয়া চার্ণক, কোম্পানীর মূল্যবান জিনিষপত্রগুলি জাহাজে তুলিয়া দিতে সক্ষম হইলেন।

কিন্তু ভগবান ইংরাজের সহায়। এই সময়ে কাপ্তেন ডেনহামের অধীনে একখানি নূতন জাহাজ বিলাত হইতে সমুদ্র-মুখে উপস্থিত হইল। এই জাহাজে সত্তর জন লোক ছিল। চার্ণক তাঁহাদের দুর্গ মধ্যে আনিলেন।

সমরস্রোত সহসা অন্যদিকে ফিরিল। এই সাহায্য উপস্থিত হওয়ায়,

চার্ণক সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। পরদিন—ডেনহাম এই সৈন্য সমেত দুর্গ হইতে বাহির হইলেন। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর, শত্রুকে গোলাবর্ষণে একটু উত্যক্ত করিয়া তিনি পুনর্ব্বার দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন।

মোগলপক্ষকে প্রতারিত করিবার জন্য, চার্ণক এই সময়ে একটী নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। পূর্ব্বদিনে যে সমস্ত সেনা, জাহাজ হইতে দুর্গমধ্যে আসিয়াছিল, তাহাদের আগমন ব্যাপার মোগলেরা যে লক্ষ্য করে নাই, তাহা নহে। চার্ণক গুপ্তভাবে সেই সেনাগুলিকে দুই চারি জন করিয়া পুনরায় ডেনহামের জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তৎপর দিন দলবদ্ধ ভাবে, ঢক্কানিনাদ করিয়া, নিশান হাতে লইয়া, জয়োল্লাস করিতে করিতে, হিজলীর দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। মাত্র সত্তরজন সেনা লইয়া চার্ণক এই খেলা খেলাইতে লাগিলেন। মোগল পক্ষ ইহাতে ভাবিল, জাহাজ হইতে আরও নূতন ইংরাজ সেনা নামিতেছে। ইহাতে তাহারা একটু দমিয়া গেল। ইংরাজ পক্ষ এই উপযুক্ত অবসরে সন্ধির প্রস্তাব করিল। মোগলেরা ইংরাজের প্রচুর সেনা আসিয়াছে ভাবিয়া, এ সন্ধি প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিল না। ইংরাজেরা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে স্থতালুটীতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন ও নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রার্থিত দ্বাদশটী স্বত্ব যাহাতে মঞ্জুর হয়, ইংরাজপক্ষ সেই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ট্রেঞ্চফিল্ড ও তাঁহার দুইজন সহযোগী—এই সন্ধিপত্রের জন্য—আবদুল সামেদের শিবিরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইল। ইংরাজেরা তাঁহাদের গোলা, বারুদ, কামান ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যাহা কিছু ছিল, তাহা জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া, পুনরায় স্থতা-লুটীর দিকে যাত্রা করিলেন। হিজলী পুনরায় মোগলের অধিকারে আসিল।

আবদুল সামেদ এই ব্যাপারে ইংরাজদের সহিত একটু চাল চালিয়া-ছিলেন। তিনি ইংরাজ প্রতিনিধিদের বলিলেন—"প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রের খসড়া করিয়া নবাব সায়েস্তা-খাঁর মঞ্জুরীর জন্য ঢাকায় পাঠাইলাম। ইংরাজেরা ইতিমধ্যে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত যাইতে পারেন।" ইংরাজদিগকে মোগলের থানা দুর্গ পর্য্যন্ত নিরাপদে যাইবার জন্য ছাড় দিতেও তিনি স্বীকৃত হন।

কিন্তু কোথায় বা সেই ছাড়, কোথায় বা সায়েস্তা খাঁর অনুমোদন পত্র! তিন মাসের মধ্যে কোন জবাবই আসিল না দেখিয়া অগত্যা জব চার্ণক স্থতালুটী পর্য্যন্ত অগ্রসর না হইয়া উলুবেড়িয়াতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

জুন মাসে চার্ণক হিজলী ত্যাগ করেন। জুলাই আগষ্ট পর্য্যন্ত, তাঁহাকে নবাবের আদেশ অপেক্ষায়, উলুবেড়িয়ায় থাকিতে হয়। ১৬ই আগষ্ট তারিখে নবাবের নিকট হইতে শেষ আদেশ আসে। এ অনুমতি পত্রে নবাব ইংরাজদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বলেন—"তোমরা উলুবেড়িয়াতেই থাক, হুগলী ও উলুবেড়িয়ায় বাণিজ্য ব্যবসায় চালাও, টাকশালা নির্ম্মাণ ও ক্ষতিপূরণ বাবৎ তোমরা যাহা চাহিয়াছ, তৎসম্বন্ধে এখন কিছুই নির্দ্ধারিত বলিতে পারি না। সম্রাটের নিকট এ সম্বন্ধে আরজী গিয়াছে। তাহার জবাব আসিলে—যাহা হয় হইবে।* এই হুকুমপত্র পাইয়াই চার্ণক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহা নবাব সাহেবের নিকট ফেরত পাঠাইলেন। সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় এক নূতন আদেশপত্র আসিল।

এই আদেশ পত্রানুযায়ী কাজ করা, চার্ণক যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করিলেন না। উলুবেড়িয়ায় থাকিলে, ইংরাজের বঙ্গের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি, আর হুগলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আবার সিংহের গহ্বরে পুনঃ প্রবেশ করিতে হইবে। চার্ণক মহা সমস্যায় পড়িয়া, গত্যংগচ্ছভাবে—পুনরায় স্থতানুটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঠক! এই প্রাসাদময়ী ইংরাজ রাজধানী কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী জব চার্ণকের ভাগ্য বিড়ম্বনা একবার ভাবিয়া দেখুন। বিলাতের কর্ত্তাদের নিকট যখন হিজলীর ঘটনা পৌঁছিল—তখন তাঁহারা চার্ণককে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা লিখিলেন—"তুমি যাহা কিছু করিয়াছ, তাহাতে তোমার অসহিষ্ণুতা ও নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। হুগলীতে মোগল-পক্ষের সহিত বিবাদ বাধাইয়া হিজলীতে না আসিয়া, যদি

* নবাব সায়েস্তা খাঁর এই ২১শে জুলায়ের (১৬৮৭) পরোয়ানা, হেজেস্ ডাইরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা সেই সময়ের ইংরাজীর নমুনা সমেত পত্রখানির একাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

Consider yourselfe what manner of Evill has been enacted by you, and those rash fights made with the King's forces and with myself, and fired 300 Cannon Shott and plundered and took prizes the shippes of Moors and afflicted God's people, If the matter should fully in every particular be made known to the King (Aurangzeb) the Offense in noe wise would be forgiven—but an aged and merciful Viceroy will not exact punishment. (Hedges Diary. II. 70. 71. Sir William Hunters British India Vol I.) পাঠক এই তিরস্কার পূর্ণভাষা দেখিয়া বুঝিবেন, সেকালে মোগল সুবাদারেরা এই ভাবেই ইংরাজশক্তিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন। আর আজ ভাগ্য পরিবর্ত্তনে সেই মোগলশক্তি শতধা বিচূর্ণিত ও ইংরাজ এই বিশাল ভারতের রাজরাজ্যেশ্বর।

সরাসর আমাদের প্রেরিত সেনাসমেত চট্টগ্রামে যাইতে, আমাদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে, তাহা হইলে আমাদের এত ক্ষতি হইত না। চট্টগ্রাম দখল হইলেই, মোগল-শাসনকর্ত্তারা ভয় পাইয়া, আমাদের প্রার্থিত স্বত্বগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে দান করিতেন। অতএব এজন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা তোমার দোষে হইল। যে বিধাতা ইংরাজদের প্রত্যেক বিপদ হইতেই রক্ষা করিতেছেন, তিনিই এযাত্রা আমাদের রক্ষা করিয়াছেন।*

সুতালুটীর জঙ্গলময় অস্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া, চার্ণক কোন সুবিধাই বুঝিতে পারিলেন না। সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর কাল তিনি কোম্পানীর অধীনে চাকরী করিয়াছেন। তখনকার চাকরী, এখনকার মত সুখের ছিল না। তখন বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল থাকিলেই ইংরাজদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইত। এরূপ অবস্থা স্বত্বেও সুতালুটীতে আসিয়া কয়েকখানি চালাঘর তুলিয়া, তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের জন্ত একটু আশ্রয় স্থান করিলেন। নবাব সায়েস্তা-খাঁর সহিত পুনরায় লেখালেখি আরম্ভ হইল।"

চার্ণক সুতালুটীতে আসিয়া অসংখ্য অসুবিধার মধ্যেও, যেন একটু সুবিধা বোধ করিলেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সদুদ্দেশ্যে—প্রভু-দিগের স্বার্থ রক্ষার্থেই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যফল এরূপ, যে তিনি একদিকে নবাব সায়েস্তা-খাঁর ও অন্যদিকে তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা প্রভু-দিগের অর্থাৎ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টারদেরও বিরাগভাজন হইলেন। কিন্তু আমরা অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী। অদৃষ্ট কর্ম্ম-চালিত। কর্ম্মের ফল কর্ম্মদোষে সু ও কু হইয়া থাকে। ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মী, তখন নারিকেলে জল-সঞ্চারের ন্যায় অতি অদৃশ্যভাবেই হইতেছিল! কাজেই ভবিষ্যৎ ইংরাজদিগের পরম সৌভাগ্যের এই উপলক্ষ্য স্বরূপ জব চার্ণক, উপরোক্ত ভাবেই কাজ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহা না করিলে ভারতে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত হইত।

---

* বিলাতের কর্ত্তারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার দুই চারি পংক্তি এই—"It was not your wit or contrivance but God Almighty's good Providence which hath always graciously superintended the affairs of this Company. * * If you had immediately according to the King our Sovereign's orders and our own, proceeded directly for Chittagong while our forces were strong and vigorous, the Mogull would have consented to our holding and keeping that place in amity with him (Letter of the Court of Directors dated 27th August 1687)."

যদি সম্রাট ঔরঙ্গজেব, সেই সময়ে দিল্লী হইতে সুদূর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ-ব্যপদেশে ব্যাপৃত না থাকিতেন, যদি নবাব সায়েস্তা-খাঁ অশীতিপর বার্দ্ধক্যে অভিভূত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত ইংরাজ পক্ষের মহা বিপত্তি উপস্থিত হইত। ইংরাজের সৌভাগ্য যে এই সব যুদ্ধ বিগ্রহের কথা সম্রাটের গোচরে আসিলেও, তিনি এ ব্যাপারটীকে আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলেন না। সায়েস্তা-খাঁর বয়স এই সময়ে পঁচাশী বৎসর। তিনি রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ। মোল্লা, মৌলানা, মৌলভীগণ লইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার আশায়, কোরাণ-শরীফ পাঠে একান্ত নিবিষ্টচিত্ত।* কাজেই ইংরাজদিগের এই যুদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন। এরূপ না হইলে ইংরাজেরা সেই সময়ে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত হইতেন।

চার্ণক এইসব ব্যাপারে এক বৎসর সময় পাইলেন। উলুবেড়িয়া হুগলী, হিজলী, সকল স্থানেই তিনি ইংরাজের বাণিজ্যাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া নির্ব্বিবাদে জীবন যাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিনটী স্থানই তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল। হুগলীতে মোগলের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ, উলুবেড়িয়ায় অন্তর্বাণিজ্যের কোন সুবিধাই নাই, আর হিজলীতে ম্যালেরিয়া—কাজেই এই তিনটী স্থানই তিনি বর্জ্জনীয়রূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। সুতালুটীর উপরই তাঁহার বেশী টান। কারণ এস্থানে কুঠীস্থাপন করিতে পারিলেই, মোগলশক্তির নিকট হইতে দূরে থাকা যাইবে, অথচ, সমুদ্রপথ হইতে বিপদকালে সাহায্যলাভের পথও রুদ্ধ হইবে না। কিন্তু সুতালুটীও বিপদশূন্য নহে। ইহার চারিদিকে গভীর বনজঙ্গল—বাদা—ও বিল। স্থানটীও কাজে কাজেই অতি অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ইহা অনেকটা নিরাপদ।

* As a matter of fact it was due to accidental causes that the English were not swept off the face of Bengal. The Emperor (Aurangzeb) engrossed by his wars in Southern India, scarcely deigned to notice the petty triumph on the Hugly except by calling for of a map of that scarcely known region. The Viceroy of Bengal (Sayesta Khan) then in his luner year had taken himself to the round of devotions amid which a pious Mussulman prepares for his death and thought he had sufficiently punished the traders by driving them out of their miserable refuge at Hijli, নবাব সায়েস্তা-খাঁ—১৬৮৯ খৃঃঅব্দে বঙ্গের শাসনকর্তৃত্ব ত্যাগ করেন ও ১৬৯৪ চান্দ্র বৎসরে ৯৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। (Letter from the Patna Factor to Sir John Child 25—6—1697).

এই ভাবিয়া চার্ণক ১৬৮৮ খৃঃঅব্দে সুতালুটীতে, চালাঘরের ব্যারাক তৈয়ারি করিয়া তাঁহার ম্যালেরিয়া পীড়িত সেনাদের আশ্রয়স্থান করিয়া দিলেন।* কোম্পানীর বাণিজ্য কার্য্যেরও যাহাতে সুবিধা হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কাপ্তেন হিথ্ বিলাত হইতে এক জাহাজ লইয়া সুতালুটীতে পৌছিলেন। হিথের আগমনে ঘটনাস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হিথ্ চার্ণককে বিলাতের কর্ত্তাদের একখানি পত্র দিলেন। হাঃ অদৃষ্ট! ইহাতেও সেই তিরস্কার। চার্ণকের বিলাতের প্রভুরা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া লিখিয়াছেন—"আপনার অধীনে যে সমস্ত ইংরাজ-সৈন্য এখনও রুগ্ন ও জীর্ণাবস্থায় জীবিত, তাহাদের কাপ্তেন হিথের জাহাজে উঠাইয়া দিয়া, আপনি সুতালুটী ত্যাগ করিয়া সরাসর চট্টগ্রামে চলিয়া যাইবেন। চট্টগ্রাম দখল করাই আমাদের অভিপ্রায়।"

বিলাতের কর্ত্তারা, কাপ্তেন হিথ্‌কে চট্টগ্রামে যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। হিথ্ বড়ই একরোখা লোক। যে ভগবদত্ত প্রতিভার সহায়তায়, চার্ণক ও ভবিষ্যতে লর্ড ক্লাইভ, এই কলিকাতাতেই ইংরাজের ভাবী সৌভাগ্যের বীজরোপিত হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, হিথের সে প্রতিভা ছিল না। চার্ণক সুতালুটীতে ইংরাজের বাণিজ্যাগার রক্ষাই বিশেষ সুবিধাকর, বলিয়া হিথকে অনেক বুঝাইলেন, তাঁহাদের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক তর্কাতর্কি চলিল। কিন্তু হিথ্ কিছুতেই নিজের জেদ্ ছাড়িলেন না। তিনি, অন্তর্ব্বাণিজ্যে লিপ্ত কয়েকজন ইংরাজকে সুতালুটীতে রাখিয়া, অবশিষ্ট লোক সমেত চট্টগ্রাম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। চার্ণক তাহাতে কোন বাধাই দিতে পারিলেন না।

হিথের সঙ্গে কয়েকখানি ছোট বড় জাহাজ ছিল। সেই জাহাজে কোম্পানির লোকজন এবং মালপত্র উঠিল। হিথ্, বালেশ্বরে পৌছিয়া পুনরায় সহর লুণ্ঠন করিলেন। সেখানে কয়েকজন ইংরাজ—মোগলের হস্তে বন্দী হইল। তাহাদের সেখানে বিপদের মুখে ফেলিয়া, হিথ্ তাঁহার ক্ষুদ্র বহর লইয়া, চট্টগ্রামের দিকে চলিলেন। চার্ণক তাঁহার হস্তে তখন ক্রীড়া পুত্তলী মাত্র!

* পাঠক! সেকালের বন জঙ্গলময় সুতালুটীর সহিত বর্ত্তমান বড়বাজার প্রভৃতির তুলনা করুন। সেকালের এই পর্ণকুটীরময় ইংরাজ সেনা নিবাসের সহিত বর্ত্তমান কলিকাতার ফোর্ট-উইলিয়মের বৈদ্যুতিক আলোকময় ত্রিতল চতুস্তল বারিকগুলির তুলনা করিয়া দেখুন।

হিথের অধীনে মাত্র তিনশত সেনা ছিল। তাহাদের মধ্যে আবার অর্দ্ধেক পর্টুগীজ-ফিরিঙ্গি। চট্টগ্রাম কোথায়, তাহার অবস্থা কিরূপ, হিথ তাহার কিছুই জানিতেন না। চট্টগ্রামে পৌছিয়া দেখিলেন—"সেস্থান দ্বাদশ সহস্র মোগল-সেনা দ্বারা সুরক্ষিত।" অবস্থা দেখিয়া, হিথ্ স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না। আরাকানের রাজার সহিতও তাঁহাদের গুপ্ত-পরামর্শ চলিল, তাহাতেও সুফল ফলিল না। তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে "স্কর্ভি" রোগ দেখা দিল। বিপত্তি দেখিয়া, হিথ্ তাঁহার সমগ্র বহরকে মান্দ্রাজ অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন।*

চার্ণক, মান্দ্রাজে, আসিয়া দারুণ মর্ম্মবেদনায়, অনুশোচনায়, পনর মাস কাটাইলেন। সম্রাটের ও বঙ্গের সুবাদারের নিকট হইতে কোন সংবাদই আসিল না। কাপ্তেন হিথ্, চট্টগ্রাম দখলের খেয়ালে ও জেদে পড়িয়া প্রকারান্তরে বঙ্গে ইংরাজের বাণিজ্য উচ্ছেদ করিয়া দিলেন। কিন্তু এই সময়ে বিধাতার কৃপায়, ইংরাজদের পুনরায় সৌভাগ্যোদয় হইল। সে ঘটনাটি কি, তাহা পাঠকের শোনা উচিত।

এই সময়ে সার জন চাইল্ড, সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষ। চাইল্ড একজন তেজস্বী কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখনও দাক্ষিণাত্যে। বঙ্গে ইংরাজের বাণিজ্য সমূলে উচ্ছেদ হইয়াছে—এ কথা শুনিয়া, চাইল্ড বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইলেন। ইংরাজেরা এই সুরাটে, বাণিজ্য দ্বারা সম্রাটের রাজকোষের আয়বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। সে আয় বড় সহজ নয়। শিবাজীর সহিত যুদ্ধেও, ইংরাজেরা সম্রাটের তরফে বন্দরাদি রক্ষা করিয়া ঔরঙ্গজেবের উপকার সাধন করিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া চাইল্ডের সহিত, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অনেক লেখাপড়া চলিল। কিন্তু সম্রাটের উদাসীন ভাব দেখিয়া, সার জন চাইল্ড শেষ বলিয়া পাঠাইলেন—"যদি সম্রাট আমাদের প্রার্থনায় মনোযোগ না দেন, তাহা হইলে আমরা সুরাট হইতে বাণিজ্য উঠাইয়া লইব ও মক্কা-যাত্রীদিগের সমুদ্রগামী জাহাজগুলি লুঠ করিব।"

ঔরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান সম্রাট। ইংরাজদিগকে তিনি তাঁহার নিজের রাজ্য মধ্যে দমনে রাখিতে পারেন, কিন্তু সমুদ্রপথে তাঁহার কোন

* Captain W. Heath's short account to the President and Council at Fort St. George.

ক্ষমতাই নাই। বঙ্গদেশে জব চার্ণক কর্ত্তৃক, হিজলী অধিকার, সুতানুটীতে আগমন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই তখন তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজদিগকে এদেশের সর্ব্বস্থান হইতে তাড়াইয়া দিবারও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, ইংরাজদের ন্যায় সমৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করিলে, তাঁহার রাজকোষের সমূহ ক্ষতি হইবে, তখন অগত্যা চাইল্ডের প্রস্তাবিত বিষয়টী সম্বন্ধে, একটু বেশী মনোযোগ দিলেন। স্থিরভাবে সকল দিক বিবেচনার পর, সম্রাট ইংরাজদের কৃতাপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। ১৬৯০ খৃঃ অব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারি, তিনি ইংরাজদিগকে আবার একটী নূতন ফারমান প্রদান করিলেন।

এই ফারমানে লিখিত ছিল—"ইংরাজের ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত গর্হিত কার্য্য আমার সাম্রাজ্য মধ্যে করিয়াছেন, তাহা মার্জ্জনার জন্য বিনীত ভাবে আবেদন করায়, আমি তাহাদের মার্জ্জনা করিলাম। এ ব্যাপারে মোগল সম্রাটের দখলীভূত লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মূল্য স্বরূপ, ইংরাজেরা দেড় লক্ষ টাকা দণ্ড স্বরূপ দিবেন। এই করারে আমি তাহাদের নূতন স্বত্বে বাণিজ্য কার্য্যে অনুমতি দিলাম। আর আমার আদেশ এই চাইল্ড সাহেব আর এদেশে থাকিতে পারিবেন না। থাকিলে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।"*

উল্লিখিত সাধারণ আদেশের একখণ্ড, বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট প্রেরিত হইল। সায়েস্তা-খাঁর পর, বাহাদুর খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। বাহাদুর খাঁর পর, ইব্রাহিম খাঁ পুনরায় বঙ্গদেশে আসেন। এই ইব্রাহিম খাঁ অতি শান্তিপ্রিয়, সরল-হৃদয়, শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সম্রাটের আদেশপত্র পাইয়া, চার্ণককে মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গে আগমন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

চার্ণক ইব্রাহিম খাঁকে ভালরূপই জানিতেন। খাঁ সাহেব, কাশ্মীর, লাহোর, বিহার প্রভৃতি দেশ শাসন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি একান্ত শান্তিপ্রিয়, ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ সেরূপ নহে। ইব্রাহিম খাঁর আহ্বান-পত্রের উত্তরে, চার্ণক এইভাবে উত্তর দিলেন—"আপনার মহৎ চরিত্রের উপর আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। কিন্তু সম্রাটের যে আদেশ-পত্র বাহির

* সম্রাটের এ আদেশ সুরাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চাইল্ড সাহেব বোম্বায়ে দেহত্যাগ করেন। Stewart's Bengal (App. vii) Bruce's Annals. II. 639-640.

হইয়াছে, তাহা ভারতের সর্ব্বস্থানের বাণিজ্য-কুঠীর সম্বন্ধে। বাঙ্গালার বাণিজ্য-কুঠী সম্বন্ধে আমাদের সাবেক বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রা, শুল্ক প্রদানের ও পূর্ব্বের অন্যান্য স্বত্বগুলি যদি আপনি বজায় রাখেন, এবং আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার ও জবর দস্তি হইতে আমাদের রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন—তাহা হইলে আমরা বাঙ্গালায় যাইতে পারি।

ইব্রাহিম খাঁ—চার্ণককে অভয় দিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রথম বৎসরটী স্মরণীয় করিবার জন্য, তিনি ইংরাজ বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিলেন। পূর্ব্বকথিত কাপ্তেন হিথের হঠকারিতার জন্যই এই সকল ইংরাজ মোগলের বন্দী হন। তিনি চার্ণককে বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনার প্রার্থনা আমি বাদসাহের মঞ্জুরীর জন্য পাঠাইলাম। সে মঞ্জুরী না পৌঁছানর পূর্ব্বেও আমি আপনাকে অভয় দিতেছি—যে বিনা আশঙ্কায় আপনারা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে পারেন।"*

আগষ্টমাসে (১৬৯০ খৃঃ অব্দে) ভরা বর্ষায়, চার্ণক বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারী ও ত্রিশজন শরীররক্ষী সেই জাহাজে উঠিল। ২৪এ আগষ্ট রবিবার মধ্যাহ্নের পরবর্ত্তী সময়ে তাহারা ভাগিরথী-বক্ষে তরণী সমেত প্রবেশ করিল। এইবার লইয়া চার্ণক তৃতীয়বার সুতানুটীতে আসিলেন।

বর্ষাবাদলের তখন বড়ই প্রাবল্য। শ্রাবণের প্রবলধারা, ভাগিরথীর উত্তাল-তরঙ্গময় রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি। বহুবাধা বিঘ্ন সহ্য করিয়া জবচার্ণক—সুতানুটীতে নঙ্গর করিলেন।

ভাগিরথী প্রবেশ পথে, ইংরাজগণ কোন বাধাই প্রাপ্ত হন নাই। ইব্রাহিম খাঁর আদেশে সমস্ত ঘাটীর মোগল-কর্ত্তারা তাঁহার সহিত শিষ্ট

* বাদসাহ বাঙ্গলার নবাব ইব্রাহিম খাঁকে, ইংরাজদের সম্বন্ধে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশ স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—You must understand that it has been the good fortune of the English to repent them of their irregular past proceedings and by not being in their former greatness, have by their attorneys petitioned for their lives and a pardon of their faults, which out of my extraordinary favour towards them have accordingly granted. Therefore upon receipt hereof my order, you must not create them any further trouble but let them trade in your government as formerly and this order I expect you to see strictly observed. (Stewart's Bengal Appendix p. IV.)

ব্যবহারই করিয়াছিল। মেটিয়া-বুরুজের সন্নিকটবর্ত্তী "থানা" দুর্গের মোগল-সেনাপতি, তাঁহাকে তোপধ্বনি করিয়া সম্মান দেখাইলেন।

ভবিতব্যবশে, বিধাতার ইচ্ছায়, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য, বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সুখ-সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য, চার্ণক জঙ্গলময় সুতালুটীতে নঙ্গর করিলেন। এই শুভমুহূর্ত্তে, বর্ত্তমান প্রাসাদময়ী রাজধানী কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল। এই সার্দ্ধ দুইশত বৎসরে—নানা ঘটনার অধীন হইয়া যেন যাদুবলে সেই জঙ্গলময় কলিকাতা, প্রাসাদময়ী রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। ধন্য ইংরাজ! ধন্য তোমার কষ্ট সহিষ্ণুতা। ধন্য তোমার বাণিজ্য প্রতিভা। আর ধন্য তুমি জব চার্ণক—এই ঐশ্বর্য্যময়ী কলিকাতার জন্মদাতা।

জব চার্ণক, বহুদিন এদেশে ছিলেন। পাটনা, হুগলী, হিজলী, উলুবেড়িয়া, বালেশ্বর, সকল স্থানের অভিজ্ঞতাই তাঁহার ছিল। কিন্তু এ সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া কেন তিনি এই জঙ্গলময়, বাদাভূমি ও বনজঙ্গল বেষ্টিত সুতালুটীতে ইংরাজের বাণিজ্য কুঠীস্থাপন করিলেন, তাহা তাঁহার সমকালীন ইংরাজেরা বুঝিতে পারেন নাই। চার্ণক যদি এই সুতালুটীতে ইংরাজের ভাগ্য প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে হয়তঃ পলাশীর রণাভিনয়ে, লর্ড ক্লাইভ যশোসঞ্চয় করিতে পারিতেন না, বা ভবিষ্যদ্বংশীয় ইংরাজ জাতি এই ভারতের একাধিশ্বরত্বও লাভ করিতেন না।

চার্ণক যে সমস্ত গূঢ় কারণ পরিচালিত হইয়া, সুতালুটীতে ইংরাজবণিকদের কুঠী স্থাপনের মনস্থ করেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান। (১) হুগলীতে থাকিলে অনেক বিপদ। হুগলীতেই মোগল-ফৌজদারের বাস। ইংরাজ কুঠীর সান্নিধ্যেই তিনি থাকেন। একবার যেমন কোম্পানীর গোরা ও মোগলের সেনার মধ্যে বিবাদ বাধিয়া তাঁহাকে হিজলী পলাইতে হইয়াছিল, পুনরায় সেরূপ কোন ব্যাপার ঘটা, অসম্ভব নহে। (২) সুতালুটী বনজঙ্গলময়। ইহার উপকণ্ঠে বাদাভূমি ও খাল বিল। পার্শ্বে—নৈসর্গিক পরিখারূপে প্রচণ্ড বেগময়ী ভাগিরথী বিরাজমানা। এই স্থানে, কুঠীস্থাপন করিলে মোগলই হউক, আর মারহাট্টাই হউক, ভাগিরথী পার না হইয়া কেহই ইংরাজ কুঠীর উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তথনকার সেই ভীম তরঙ্গ সংকুল গঙ্গানদী সসৈন্যে উত্তীর্ণ হওয়াও অসম্ভব। (৩) সেই সময়ে শেঠ ও বসুকেরা সুতালুটীতে হাটস্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজের রপ্তানির উপযুক্ত

মালও এখানে সহজ প্রাপ্য। তাঁহার সৈনিকদিগের জীবনযাত্রার উপযোগী শস্যাদিও এখানে যথেষ্ট। (৪) বিশেষতঃ এই স্থতালুটীর চারিধার—এক ব্রাহ্মণ জমীদারের জমীদারী। তাঁহাদের নিকট ইচ্ছা বা প্রয়োজন হইলেই সুবিধামত দরে জমা বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। সে সময়ে সুতালুটীতে একটী কোঠাবাড়ীও ছিল। এই কোঠাবাড়ীতে প্রয়োজন মত ফ্যাক্টর-গণকে রাখিয়া কাজকর্ম্ম চলিতে পারে। (৫) সুতালুটী হইতে সমুদ্র সঙ্গম ও হুগলীর ফ্যাক্টরী বেশীদূরে অবস্থিত নহে। এখানে থাকিয়া হুগলীর সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে, বা বিপত্তি বুঝিলে জাহাজে চড়িয়া সাগর সঙ্গমে সমুদ্র মধ্যে উপস্থিত হওয়ার খুব সুবিধা। স্থলে—ইংরাজ মোগলকে ভয় করিতেন বটে, কিন্তু জল পথে—তাঁহারা অদ্বিতীয়। (৬) সুতালুটীর পার্শ্ববাহিনী গঙ্গা, তখন বর্ত্তমান অবস্থায় ছিল না। সুতা-লুটীর বাঁধা ঘাটের নীচে—গঙ্গা অতি গভীর। এস্থানে সমুদ্রের দিক হইতে বড় বড় জাহাজ আসিয়া নঙ্গর করিতে এবং মাল নামাইতে উঠাইতে সক্ষম হইবে। মোগল-শাসনকর্ত্তারা সহসা কোন গোলযোগ উপস্থিত করিলে—সাবধান হইবার ও আত্মরক্ষার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে। (৭) কেবলমাত্র মাটীর প্রাচীরের বেষ্টনী-বেষ্টিত ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠী নিরাপদ নহে। ইংরাজ ফ্যাক্টারী ও কোম্পানী বাহাদুরের মালামাল নিরাপদে রাখিতে হইলে, একটা ছোট খাট দুর্গ নিতান্ত প্রয়োজন। এতগুলি কথা মনে মনে ভাবিয়া, জব চার্ণক সাহেব সুতালুটীতে আশ্রয় লইয়া বর্ত্তমান কলিকাতা রাজধানীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন।
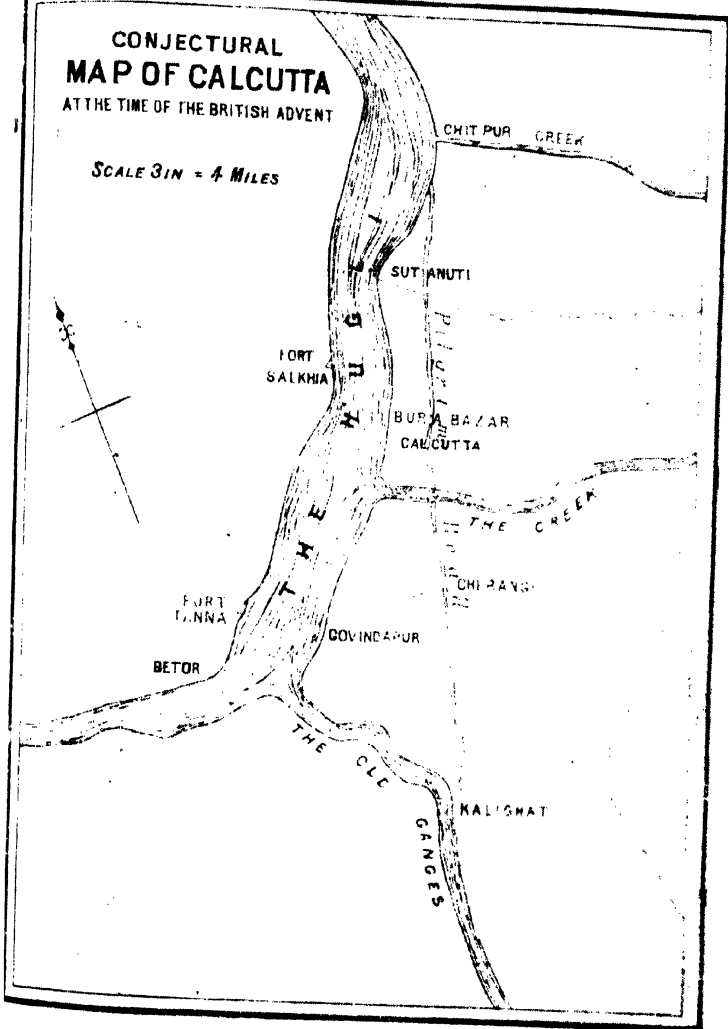
জব চার্ণকের আমলের ও তৎপরবর্ত্তীকালের কলিকাতা
(ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম অভ্যুদয় সময়)
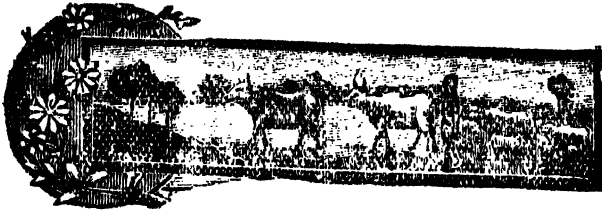
একাদশ অধ্যায়।

সুতালুটী প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলময় অবস্থা—চারিদিকে বাদাভূমি—বাঘ ও ডাকাতের ভয়—সালিখা ও বেতোড় প্রভৃতি গ্রামের কথা—বেতাইচণ্ডী—মনসার ভাসান গ্রন্থে তৎকালীন স্থান সমূহের নামোল্লেখ—ডি ব্যারোজ ও সিজার ফ্রেড্রিক প্রভৃতি ইউরোপীয়ানগণ কর্তৃক লিখিত—প্রাচীন জনস্থান সমূহের বিবরণ—চাটগাঁ ও সাতগাঁর বন্দর—সপ্তগ্রামের উন্নত অবস্থা—ত্রিবেণী সঙ্গমের মেলা—বেতোড় ও গার্ডেনরিচ্—বেতোড়ের হাট—বেতোড়ের হাটে পর্টুগীজ বাণিজ্য—সালিখা ও চিৎপুরের ক্রমোন্নতি—কুচিনান ও কলিকাতা—সপ্তগ্রামের অধঃপতন—সপ্তগ্রামবাসী শেঠ ও বসুকদের গোবিন্দপুরে আগমন—মুকুন্দরাম শেঠ ও তাঁহার প্রপৌত্র গোপীমোহন শেঠের কথা—শেঠ ও বসুকদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—শেঠদিগের গৃহদেবতা গোবিন্দজী—ধনস্থগ্রাম বা গোবিন্দপুর—কালীঘাটের হালদার বংশ ও কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠীর আদি পুরুষদের গোবিন্দপুরে বাস—পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ—সুতালুটীর প্রাচীনত্ব নির্ণয়—বসাকগণ কর্তৃক সুতার ব্যবসায়—ঢাকাই মস্‌লিন—ঢাকাই মস্‌লিন বস্ত্রসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টাভারনিয়ারের বিবরণ—শেঠ ও বসাকদের বাণিজ্য জন্য সুতালুটীর উন্নতি—শেঠ বসাকদের গৃহ-দেবতা গোবিন্দজী কোম্পানী কর্তৃক গোবিন্দপুর খাস দখলের পর-শেঠদিগের বড়বাজারে গমন বড়বাজারে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীউর মন্দির—বৈষ্ণবচরণ শেঠ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" প্রবাদের উৎপত্তি—বৈষ্ণবচরণের ধর্ম্ম-জ্ঞান—প্রাচীন কলিকাতার অবস্থা—হ্যামিল্টনের উক্তি—শেঠ ও বসাকের বাণিজ্য—বেতোড় হাটের অধঃপতন—সুতালুটী হাটের উন্নতি—পিপ্‌লে বা পীরপল্লী—কাটগঙ্গা—কলিকাতায় পর্টুগীজ কুঠী—আলুগুদাম—আরমানীদের কলিকাতায় আগমন—আরমানীদের কলিকাতায় বসবাস করাইবার জন্য জব চার্ণকের চেষ্টা। কলিকাতায় ডচ্ বণিকদের কুঠী—বাঁকশাল ঘাট—বাঁকশাল শব্দের ব্যুৎপত্তি—কালীঘাটের হালদারদের গোবিন্দপুরে বসবাস—নূতন ও পুরাতন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্মিলনে কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নতি সাইত্রিশ খৃঃ অব্দের ঝড় ও ভূমিকম্প—তাহাতে প্রাচীন কলিকাতার ধ্বংশ সাধন—সেই ভয়ানক ঝড়ের সমসাময়িক বৃত্তান্ত।

ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে ও পরে প্রাচীন কলিকাতার অবস্থা।

আমরা এ পর্য্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক বুঝিয়াছেন, কেবল মাত্র

পলাশীক্ষেত্রে বিজয় লাভ দ্বারা, ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাঁহাদিগকে ইহার পূর্ব্বে শতাধিক বৎসর ধরিয়া স্বার্থ-সংরক্ষণ জন্য, বহুবিধ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদের হস্তে বহুবিধ অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। কারণ মোগল তখন দেশের রাজা ও ইংরাজ-বণিক তাঁহাদের প্রজা মাত্র। তাহার উপর পর্টুগীজ, ডচ্ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা যে কম ছিল তাহা নহে। এই প্রতিযোগিতা সহিয়া অদম্য সাহস ও স্থিরবুদ্ধি বলে পরিণামে ইংরাজই জয়ী হইয়াছিলেন। এ জয়লাভ করিতে তাহাদের যে কত কষ্ট, কত আপদ বিপদ সহিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বের অধ্যায় সমূহে বিবৃত হইয়াছে।

অতীত ইতিহাস হইতে প্রমাণ হয়, মোগল-সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলেই ইংরাজদের কিছু বেশী কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারা সমান ভাবেই মুসলমান হস্তে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের প্রতিনিধিরূপে নবাব সায়েস্তাখাঁই ইংরাজ-বণিকগণকে নানাবিধ কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এখন এই আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাটের শাসনাধীন ও তাঁহারই রাষ্ট্র সম্পত্তি। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্য, বণিকরূপী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের প্রতিভাবলে অর্জ্জিত। পলাশী যুদ্ধের পরে দেশের লোকে ইংরাজের শক্তি সামর্থ্য ও প্রভাবের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল বটে। কিন্তু তাহারা ইহার আগে জানিতে পারে নাই, যে ইংরাজ জাতি শক্তি ও সাহসে, বুদ্ধি ও প্রতিভায় অতুলনীয়। পলাশী আমলের পূর্ব্বে অনেক কর্ম্মবীর স্বদেশ-ভক্ত ইংরাজ ভারতে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঠক! আজকালকার এই গ্যাসালোক উজ্জ্বলিত, বড়বাজার, হাটখোলা প্রভৃতির চিত্র, চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলুন। কল্পনার সহায়তায় দেখুন, এই সকল স্থানাধিকৃত সেকালের সুতালুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের চারিদিকে ভীষণ জঙ্গল সমাচ্ছন্ন। একদিকে শিয়ালদহ, অপরদিকে হাওড়া ও দক্ষিণে চৌরঙ্গী, কালীঘাট ও ভবানীপুর, এই বিস্তৃতভূভাগ কেবলমাত্র খাত ও পঙ্কিল বাদা ও ভূমিপূর্ণ। আর এই সমস্ত বাদায় কুম্ভীর, জঙ্গলে বাঘ এবং ডাঙ্গায় নরহন্তা লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল।

সরকারী কাগজপত্রের সহায়তা ব্যতীত, সেকালের লিখিত দুষ্প্রাপ্য ও বহুযত্নে সংগৃহীত প্রাচীন পুস্তকাদি ও তদুল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে সেই দুইশত বৎসর পূর্ব্বের অন্ধতমসাবৃত যুগের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

কালীঘাটের উৎপত্তি ও এতৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা, ইতিপূর্ব্বে কালীঘাট প্রসঙ্গে বলিয়াছি। ধরিতে গেলে প্রাচীন কলিকাতা, সুতালুটী গোবিন্দপুর, চিৎপুর, প্রভৃতি লইয়াই বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সালিখাও একটী অতি প্রাচীন স্থান। দুইশত বৎসরের পুরাতন পুঁথি প্রভৃতিতে ইহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, বেতোড় (বর্ত্তমান বাঁটারা) গ্রামও সেকালের একটী বিখ্যাত স্থান। বেতোড়ের "বেতাইচণ্ডী" বহুকালের দেবতা। প্রাচীন কলিকাতার সহিত, সেকালের এই সমস্ত গ্রামগুলির স্মৃতি পূর্ণরূপে বিজড়িত আছে।

কালীঘাট ও কলিকাতা এই নামকরণ লইয়া, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক লেখালেখি হইয়া গিয়াছে। স্বনাম-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক, গৌরদাসবাবু কলিকাতা—রিভিউএর পৃষ্ঠায়, এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছে। সে সমস্ত এস্থলে পুনরাবৃত্তি করায় বিশেষ প্রয়োজন কিছুই নাই। মোটের উপর কথা হইতেছে, এই কালীঘাট বহুদিন হইতেই লোকসমাজে পরিচিত ছিল।*

১৪৯৫ খৃঃ অব্দে, বঙ্গেশ্বর হোসেন সাহের আমলে—বিপ্রদাসের "মনসার-ভাসান" রচিত হয়। এই মনসার ভাসান হইতে আমরা কলিকাতা, বেতোড় ও কালীঘাট সম্বন্ধে কতক কথা জানিতে পারি। বিপ্রদাসের গ্রন্থের প্রধান নায়ক চাঁদ-সওদাগর, ভাগলপুর হইতে যাত্রা করিয়া বাণিজ্যার্থে সমুদ্রগামী হইয়াছিলেন। কবি এই প্রসঙ্গে, তাঁহার গন্তব্যপথের প্রধান প্রধান স্থানগুলির পরিচয় বা নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রাজঘাট, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, আম্বুয়া, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম কুমারহাটী, হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকনাড়া, মুলাযোড়, পাটুলিয়া, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, ইচ্ছাপুর, বাঁকিবাজার, নিমাইঘাট, চানক, রামসাল, আকনা, মাহেশ, খড়দহ, ঋষড়া, সুখচর, কোন্নগর, কোতরং, কামারহাটী, এড়িয়াদহ, ঘুষুড়ী, চিৎপুর, কলিকাতা, বেতোড়, কালীঘাট, চৌরাঘাট (চোরঘাট)

---

* Babu Gour Das Bysack's **Kalighat** and Calcutta (Cal. Rev. April 1891. p. 306)

জয়ঢালী, ধনস্থান, বারুইপুর, হুলিয়া, ছত্রভোগ, হাতিয়াগড় প্রভৃতি স্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাই।

এই সকল স্থানগুলি সেই সময়ে সাধারণে পরিচিত না থাকিলে, কবি বিপ্রদাস তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ইহার নামোল্লেখ করিতেন না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপ্রদাস এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন—তাহা, এবং সেই সময়ের লিখিত অন্যান্য কাহিনীও উল্লিখিত জনস্থান সমূহের মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে। 'সেই সকল কাহিনী, পর্টুগীজ ও ইংরাজ-লেখকদিগের পুরাতন কাগজ-পত্র হইতেও আমরা জানিতে পারি, ইহাদের মধ্যে অনেক গ্রামের নাম ও যশ সেকালে বিশেষ ভাবে প্রচারিত ছিল। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এই সময়ের একখানি ম্যাপ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।*

কবির কিম্বদন্তী ছাড়িয়া, এখন আমরা একবার ইতিহাসের দিক হইতে এই সকল স্থানের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিব। সমসাময়িক ইউরোপীয়গণ, পূর্ব্বোক্ত জনস্থানসমূহের যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—তাহার একটু আলোচনা করা যাউক।

ইউরোপীয় জাতিদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই, সুতালুটী অঞ্চলের নাম জাহির হইয়াছে। প্রাচীন কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ সাধারণের পরিচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পর্টুগীজ, পরে ইংরাজ—এই দুই জাতির কার্য্যক্ষেত্র-রূপে পরিণত হইয়া, এই সমস্ত স্থানের পরিচয় পুরাতন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ডি ব্যারোজ্ ও সিজার ফ্রেডরিক্ প্রভৃতি—তৎকালীন লেখকগণ, কতকগুলি প্রাচীন স্থান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত বঙ্গীয় কবিগণের বর্ণিত কাহিনী অনেক মিলিয়া যায়।†

পর্টুগীজেরা যখন বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থে প্রবেশ করে, সেই সময়ে—পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে সপ্তগ্রাম এই দুইটীই প্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। ইহাই সেকেলে চাটগাঁ ও সাতগাঁর বন্দর বলিয়া বিখ্যাত। তুলনায় চট্টগ্রাম বন্দর, সপ্তগ্রামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। সকল আয়তনের জাহাজই চট্টগ্রামে নঙ্গর করিতে পারিত। কিন্তু পর্টুগীজ বোম্বেটিয়াদের

* বিপ্রদাসের এই বর্ণনা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কলিকাতা, চিৎপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নামোল্লেখ থাকিলেও ইহার মধ্যে সুতালুটী ও গোবিন্দপুরের নামোল্লেখ নাই! ইহা হইতে প্রমাণ হয়, এই গ্রামগুলি সে সময়ে জঙ্গলাবৃত স্থান ছিল।

† Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 1892. p. 189. (Article on Bipradas by Mohamohopadhay Haraprasad Sastri.

উৎপাতে এ স্থানের বাণিজ্য-প্রাধান্য কমিয়া আসে। চট্টগ্রামের নিম্নে, বাঙ্গলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল—সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের নিকটেই ত্রিবেণী সঙ্গমে, তখন অনেক লোকে শুভ-পর্ব্বদিনে ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে আসিত। সপ্তগ্রামের হাট-বাজার চত্বর ও গঞ্জ প্রভৃতিতে, ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইতে, দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে আসিত। তখন বেতোড় পর্টুগীজদের একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। পর্টুগীজ জাহাজগুলি—এই স্থানের অদূরে, বর্ত্তমান গার্ডেনরিচে নঙ্গর করিত। বড় বড় জাহাজ, নদীর শাখা সমূহে প্রবেশ করিতে পারিত না। বোট, বজরা ও ভড় প্রভৃতি, এই বেতো[illegible] হইতে মালপত্র লইয়া সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইয়া বরানগর [illegible], আগরপাড়া, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাইত। বেতোড়ে কোন নির্দ্দিষ্ট হাট ছিল না। পর্টুগীজেরা প্রতিবৎসর যখন এইস্থানে আসিত, সেই সময়ে হাটের জন্য তাহারাই এ দেশের জনমজুর দিয়া, কতকগুলি হাটচালা প্রস্তুত করাইয়া লইত। সাময়িক ক্রয়—বিক্রয়ের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে—বড় বড় জাহাজে তাহাদের ক্রীত মালপত্রগুলি তুলিয়া লইয়া, সমুদ্র-পথ দিয়া তৎকালের পর্টুগীজদের প্রধান বাণিজ্যস্থান গোয়ায় পৌঁছিত। পর্টুগীজেরা এই সময়ে তাহাদের হাট-বাজারের চালাগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। সেই জনসংকুল হাট, পরিণামে কেবল দগ্ধবাঁশ হোগলা ও খড়ের ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া তাহাদের আগমন-চিহ্ন প্রকাশ করিত। আলাউদ্দিনের বাটীর মত, বৎসরের মধ্যে দুই একবার সহসা এই স্থান, ক্ষুদ্র নগরের আকার ধারণ করিত, আবার পর্টুগীজদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে, তাহা জনশূন্য ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইত। *

যাহা হউক—বেতোড়ের এই বাণিজ্য জন্য, চিৎপুর সালকিয়া প্রভৃতি জঙ্গলময় স্থানসমূহ, ধীরে ধীরে জনপূর্ণ হইতেছিল। কুচিনান ও কলিকাতায় গঙ্গার তীরে নৌকাদি বাঁধিবার জন্য কয়েকটী ঘাট ছিল, একথাও শুনিতে পাওয়া যায়।

নিয়তির শক্তি অতিক্রম করিতে কেহই পারে না। কালের স্রোত রুদ্ধ করিতে কেহই সক্ষম নহে। লক্ষ্মীশ্রীপূর্ণ, জনসংকুল সপ্তগ্রাম, স্বরস্বতী মজিয়া যাওয়ায়, এই নিয়তি শক্তিবশে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

* Cesar Fredrick in Hakluyt, Edition of 1598. I,230

১৫৬৫ খৃঃ অব্দেও সপ্তগ্রাম, খুব জাঁকাল অবস্থায় ছিল। কিন্তু তাহার পরেই ইহার পতন আরম্ভ হয়। সপ্তগ্রামের পতন দেখিয়া, তথাকার শেঠ ও বসুকেরা বেতোড়ের বাণিজ্যে লাভবান হইতে প্রয়াসী হন। কলত্রীশ গোত্রীয়, যাদবেন্দ্র বসাক মহাশয় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া, কলিকাতায় সন্নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুরে বাস করিতে আসেন। এই সময়ে শেঠবংশীয় মুকুন্দরাম শেঠও, গোবিন্দপুর গ্রামবাসী হন।* ইহাঁর প্রপৌত্র গোপীমোহন ১৭৫৩ খৃঃ অব্দ অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্বে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "দাদ্নীবণিক" ছিলেন।

যে শেঠ ও বসুকদিগের সহিত, জঙ্গলময় বাদা-ভূমিপূর্ণ, কলিকাতার বিশেষ সংস্রব, তাহাদের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা বহুকষ্টে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

বসাক বা বসুকদিগের † আদিবাসস্থান সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের একটী পুষ্করিণী তাঁহাদের নামানুসারে "বসকা-দীঘি" বলিয়া বিখ্যাত। সপ্তগ্রামে বাসকালে, বসাকদিগের "বসক" উপাধি ছিল। কলিকাতায় আসিবার পর তাহা "বসাকে" পরিবর্ত্তিত হয়।

এই বসাকদিগের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠী বা শেঠ বলিয়া এক সম্প্রদায় আছেন। শেঠেরাও এই সময়ে সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস আরম্ভ করেন।

সেকালের কলিকাতা—দুইখানি গ্রামে বিভক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে—

"ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়।

* একটী জনপ্রবাদ এই যে শেঠদিগের প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের কুলদেবতা গোবিন্দজীর নাম হইতে "গোবিন্দপুর" গ্রামের নামকরণ হয়। এই গোবিন্দপুরের জঙ্গল কাটাইয়া তদধিকৃত স্থানাংশ বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ বা গড়ের মাঠে কেল্লা নির্ম্মিত হইয়াছে।

† "বসুক" গ্রন্থ-প্রণেতা মদনমোহন হালদার মহাশয় বলেন—"বসুক" শব্দই বসাকদের প্রকৃত উপাধি এবং বসুকেরা বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। একখানি সারগর্ভ গ্রন্থ লিখিয়া তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বসুক হইতে বসক শব্দে দাঁড়াইয়াছে। বসক শব্দের অর্থ ধনসম্পত্তি—ভাবার্থ—কর ও রাজস্ব। উহা বৈশ্যের বর্ণগত উপাধি। আমরা এই গ্রন্থে চিরপ্রচলিত বসাক শব্দই ব্যবহার করিব। তাহা না হইলে পাঠকেরা গোলে পড়িতে পারেন।

কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা
বেতোড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা।*
বেতাই-চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে
ধনন্তগ্রাম খানা সাধু এড়াইল বামে।
ডাইনে এড়াইয়া যায় হিজিলির পথ
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত।
কালীঘাট এড়াইল বেনিয়ার বালা
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা।
মহাকালীর চরণ পূজেন সওদাগর
তাহার মেলান বেয়ে যায় মাই নগর।

শ্রীমন্ত সওদাগর কলিকাতা, উত্তীর্ণ হইয়া ধনন্তগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কবির বর্ণনানুসারে, এই ধনন্তগ্রাম সেকালের গোবিন্দপুর বলিয়া বোধ হয়। শ্রীমন্ত, পরপারস্থ বেতাই-চণ্ডিকার পূজা করিয়া আদ্যগঙ্গায় প্রবেশ কালে, ধনন্তগ্রাম খানি বামদিকে দেখিয়াছিলেন। "ধনন্ত" শব্দ "ধনস্থের" অপভ্রংশ। ধনস্থ শব্দের সঙ্গত অর্থ—যে গ্রামে ধন আছে বা ধনীগণ বাস করেন। বসাকেরা চণ্ডীকাব্য রচনার পূর্ব্বে, সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন। তাঁহারা যে এই গ্রামের আদিম অধিবাসী তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পরই, কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণের পূর্ব্বপুরুষগণ ও কলিকাতা ঠাকুরগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ, বহু পরে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। কাপ্তেন আলেক্‌জাণ্ডার হ্যামিল্টন ১৭০৬ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা স্থাপনের ষোল বৎসর

* বেতড়া বা বেতোড় আধুনিক বাঁটরা। উহা হাবড়া ষ্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে। বেতড়ার খালকে বেতাকীর খাল বলে। উহার মোহানা আদিগঙ্গার মোহানার ঠিক সম্মুখে। পূর্ব্বে পর্টুগীজ বণিকেরা ঐ খাল দিয়া সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিতেন। বেতাই-চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে, সেই স্থানে অতীতকালে এক মহামেলার অনুষ্ঠান হইত। ফ্রেডরিক সিজার নামক পূর্ব্বোক্ত সম সাময়িক ভ্রমণকারী ১৫৭০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলায় আসেন। তিনি বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে মুকুন্দরামের সময়ে ঐ খাল একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। বেতাকীর খাল বন্ধ হইলে, ইংরাজ ও পর্টুগীজ বণিকেরা, হুগলী যাতায়াতকালে ভাগিরথী দিয়া যাইতেন। তখন সপ্তগ্রাম হইতে আসিবার সময় গরিফা, গোন্দলপাড়া, ইছাপুর, মাহেশ, খড়দা, কোন্নগর, চিৎপুর, শালিখা প্রভৃতি গ্রামগুলি অতিক্রম করিয়া কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সম্মুখ দিয়া আদিগঙ্গায় প্রবেশ করিতে হইত। ফ্রেডরিক লিখিয়াছেন—"Buttor a good tides rowing before you come to Satgaw from thence upwards the ships do not go because the river is very shallow. The small ships go to Satgow and there they lade.

পরে গোবিন্দপুরে আসেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে প্রকাশ, যে গোবিন্দ-পুর ফোর্ট উইলিয়াম-দুর্গের দক্ষিণে * এবং গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমা হইতে ঐ দুর্গ তিন মাইল উত্তরে। ১৬৯৬ খৃঃ এই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মাণ সূচনা হয়।

হ্যামিল্টন বর্ণিত কোম্পানীর কুঠী ও দুর্গ সুতালুটীর অন্তর্গত ছিল। খৃঃ ১৮২০ অব্দে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দের ২৭এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত, যে সমস্ত পত্রাদি এদেশ হইতে কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মচারীরা বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সুতালুটী হইতে প্রেরিত বলিয়া ব্যক্ত আছে। ইহার পরের সমস্ত চিঠি পত্র যথাক্রমে কলিকাতা ও ফোর্ট উইলিয়াম হইতে প্রেরিত।†

এই প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম-দুর্গের কিছু দক্ষিণে, একটী নদী বা খাল ছিল। ঐ খাল বর্ত্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া, চাঁদপাল ঘাটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃঃঅব্দে অপজনের ম্যাপেও ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।‡ এই খাল গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এবং সুতালুটী গ্রামের অন্তবর্ত্তী সীমা ছিল। যখন গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমার খাল—"গোবিন্দপুরের খাত" বলিয়া উল্লিখিত হইত, তখন উত্তরের এই খালটীর সম্ভবতঃ এরূপ কোন একটা নাম থাকিতে পারে। কিন্তু সে নাম যে কি ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না।

সুতালুটী, সম্ভবতঃ শেঠ ও বসাকদের আগমনের পর হইতে, খ্যাতিলাভ

* হ্যামিল্টন, কলিকাতার পুরাতন কেল্লা, (অর্থাৎ বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্টাফিস, কষ্টম হাউসও ই, আই, রেলওয়ে এজেণ্ট আফিসের অধিকৃত স্থানে যে কেল্লা ছিল, যাহার অবস্থান চিহ্ন লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর—পিত্তলের লাইন দিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন, যাহা নবাব সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করেন) তাহার কথাই বলিয়াছেন। পুরাতন দুর্গের অস্তিত্বমাত্র এখন নাই। পাঠক যেন এই পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামকে গড়ের মাঠের বর্ত্তমান কেল্লা বলিয়া না ভাবেন।

† Yule's Glossery. (See Chutanutty).

‡ এইখালের বা Creek (ক্রীকের) কোন চিহ্ন না থাকিলেও, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পার্শ্ববর্ত্তী—"ক্রিক-রো" ইহার নাম রক্ষা করিতেছে। "ডিঙ্গাভাঙ্গা" নামের সহিত এই খালের কোন সম্বন্ধ আছে কি না পাঠক তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। হলওয়েল সাহেব—গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমার খালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—On my joining the Fleet at Fulta I did hear he was sent into Gobindapur Creek to burn and destroy the great boats there, that they might not be employed by the enemy in the attack or pursuit of the ships. Holwell's Indian Tracts 1764 P. 238.

করিয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কলিকাতা গ্রামের একটা নাম ঘোষণা হইয়াছিল। চণ্ডীকাব্য হইতে পাঠক দেখিলেন, অগ্রে ধনস্তগ্রাম পরে কলিকাতা, এই ভাবেই নির্দ্দেশ আছে। কলিকাতার অধস্তনকালের আখ্যা সুতালুটী চণ্ডীকাব্যে নাই।

চণ্ডীকাব্য রচনার পর হইতে সুতালুটীর ঐরূপ আখ্যা হইয়াছে। গ্লাড-উইনের "আইন-আকবরীতে" "ওয়াশীল তুমারজমার" মধ্যস্থ তালিকায়, এই কলিকাতাই উল্লিখিত আছে। ১৫৮২ অব্দে রাজা টোডরমল্ল সমস্ত বঙ্গদেশ জরীপ করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করেন। আইন-আকবরী ১৫৯৬ অব্দে শেষ হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, সুতালুটী নাম কলিকাতার পরে হইয়াছে।*

বসুকদিগের সুতালুটী-হাট পত্তনের ন্যূনাধিক শত বৎসর পরে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে, ভানডেন ব্রুক (Vanden Broeck) নামক জনৈক ওলন্দাজ, তৎসাময়িক একখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে (Soclanotti) বলিয়া একটী গ্রামের নামোল্লেখ আছে।† সেই সময়ে কলিকাতার মধ্যে সুতার ও সেই সঙ্গে সুতার-লুটীর বাণিজ্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

সেকালে বাঙ্গলার সূক্ষ্ম-সূত্র-শিল্প, এক অপূর্ব্ব জিনিষ ছিল। "ঢাকাই মসলিন্" বঙ্গের অতীত গৌরবের সামগ্রী। ইউরোপের অনেক সাম্রাজ্ঞী, ভারতের মোগল বাদসাহদিগের পাটরাণীগণ, বেগমগণ, এই ঢাকাই-মসলিন্ নির্ম্মিত পোষাক পরিবার জন্য, উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। ঢাকার দশবার ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে, ডুমরাও নামক একটী স্থান, অতীতকালে এইরূপ সূক্ষ্ম-সূত্র-শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও সেখানে অনেক তন্তুবায়ের

* Gladwin's Ain-Akbari. Vol II P. 206.

† অনেকে অনুমান করেন, বসাকেরাই তন্তুবায়ের কাজ করিতেন, বস্ত্র ও সূতা প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু "বসুক" নামক জাতিতত্ব-বিচার গ্রন্থপ্রণেতা মদনমোহন বাবু বলেন— "বসুকেরা তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রবয়ন করাইয়া লইতেন। এই নিম্নশ্রেণীস্থ বয়ন-জীবিগণ, বসুকদের নিকট কার্পাস গ্রহণ করিত এবং চরকায় সুতা কাটিবার জন্য তুলার পাঁজ প্রস্তুত করিত। এই সমস্ত তুলা বসুক বা বসাকদের নিকট গৃহীত হইত এবং চরকায় সুতা কাটিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। পরে আবার সূত্রে বা বস্ত্রাকারে তাহাদিগকেই প্রদত্ত হইত। এই আদান ক্রিয়ার অবান্তর সম্বন্ধ বশতঃ ঐ সকল তুলার পাঁজ "বসুক বা বোসকে" নামে আখ্যাত। যে সকল স্ত্রীলোক কাটনা কাটিতেন, তাহাদিগকে "কর্ত্তনী" বলিত। "কাটনা" শব্দ কর্ত্তনীর অপভ্রংশ। এখনও পর্য্যন্ত কাটনা শব্দ বঙ্গদেশ হইতে লোপ পায় নাই—এবং অনেক সুদূর মফঃস্বলে কাটনা-কাটার প্রথা—বৃদ্ধা বিধবাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে একটী প্রবাদই আছে—"কাটনা কাটনা ধন।"

বাস আছে। এখনও একটী প্রবাদ আছে—যে এই স্থানের সুপ্রসিদ্ধ কর্ত্তনীরা একরতি ওজনের তুলায় একশত পঁচাত্তর হাত-সূতা কাটিয়া দেন।

পাঠক! বঙ্গের এই প্রাচীন গৌরবের অস্তমিত অবস্থায়, হয়ত একথা বিশ্বাস না করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাসের জন্য, আমরা প্রসিদ্ধ ফরাসীবণিক—টাভারনিয়ারের উক্তি, নিম্নস্থ পাদ-টীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। টাভারনিয়ার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন * তাহার সারমর্ম্ম এই—"বাপ্‌তাগুলি পৌনে দুই হাত চওড়া ছিল। একটী থানে কুড়ি হাত কাপড় থাকিত। এই কাপড়গুলি. ৫ হইতে ১২ মামুদীতে সাধারণতঃ বিক্রয় হইত। যদি কেহ ফরমাইস করিতেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহারা আরও চওড়া ও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত। তাহার দাম ৫০০ মামুদী পর্য্যন্ত হইত। আমাদের সময়ে আমি দেখিয়াছি, এক হাজার মামুদীতে দুই খণ্ড কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। ইংরাজ সওদাগরগণ এই বহুমূল্য কাপড়ের এক প্রস্থ কেনেন, ও দিনেমার সওদাগরগণ অপরটী লয়েন। এ কাপড়গুলি লম্বে ২৮ হাত। মহম্মদ আলিবেগ ভারতবর্ষ হইতে পারস্যে ফিরিয়া যাইবার সময়, অষ্ট্রীচ্ ডিম্বাকার, এক ক্ষুদ্র রত্নখচিত নারিকেল খোলের মধ্যে, এক খণ্ড মস্‌লিন লইয়া যান। পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় সাহ সুফীকে, এই অপূর্ব্ব জিনিষ উপহার দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই রত্নখচিত নারিকেলের খোলের মুখ খুলিবামাত্রই, তন্মধ্য হইতে ৬০ হাত লম্বা এক মস্‌লিনের

* The broad BAFTAS are 1¾ cubit wide and the piece is 20 cubits long. They are commonly sold a from 5 to 12 MAHAMUDIS, but the merchant on the spot is able to have them made much wider and finer and up to the value of 500 MAHAMUDIS the piece. In my time, I have seen 2 pieces of them sold for each of which 1000 MAHMUDIS were paid. The English bought one and the Dutch the other and they were each 28 cubit. Mahamed All Beg while returning to Persia from his embassy to India presented CHASUFI (II) with a Cocoanut of the size of an ostrich's egg, enriched with precious stones and when it was opened a turban was drawn from it 60 cubits in length and of a MUSLIN so fine, that you would scarcely know what it was that you had in your hand. The Queen Dowager with many of the Ladies of the Court was surprised at seeing a thread so delicate which almost escaped the view—Travels of Tavernier (1679) Vol II P. 7-8.

পাগড়ী বাহির হইল। এই মস্‌লিন এত সূক্ষ্ম সূত্রে প্রস্তুত, যে আদৌ তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারা যায় না। যত লম্বা মস্‌লিন হউক না কেন—তাহার ভার অতি কম। ভরি ও রতি ইহার মাপ পরিমাণ। আমরা গল্প শুনিয়াছি, যে ঢাকাই মস্‌লিনের একখণ্ড যদি রাত্রিকালে কোন তৃণক্ষেত্রে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত রাত্রি শিশিরে ভিজিয়া, তাহার এরূপ অবস্থা হয়, যে পরদিন প্রভাতে—সূর্য্য উঠিলেও তাহার অস্তিত্ব বোধ হয় না। বোধ হয়, যেন ঘাসের উপর একখানি মাকড়সার সুদীর্ঘ জাল বিছান আছে।

বঙ্গের সেকালের সূক্ষ্ম-কার্পাসসূত্র—বাঙ্গালীর ভাগ্যলক্ষ্মী ছিল। অনেক টাকার সূক্ষ্মসূত্র, কার্পাসবস্ত্র ও মস্‌লিন এ দেশ হইতে ইউরোপের হাটে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত। কাট্‌না-কাটা এদেশে তখনকার একটা সাধারণ প্রথা। মোগলদিগের আমলে—এই কাট্‌না-কাটা প্রথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কবিকঙ্কণের নিম্নলিখিত শ্লোকটীই তাহার প্রমাণ—

প্রভুর দোসর নাই, উপায় কে করে
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে।
"দাদনি" দেয় এবে মহাজন সবে
টুটিল সূতার কড়ি উপায় কি হবে?
দুপণ কড়ির সূতা একপণ বলে
এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী কপালে!

তখন স্ত্রীলোকেরা দাদ্‌নী লইয়া কাট্‌না কাটিতেন। শেঠ-বসাকেরা পরবর্ত্তী কালে দাদন দিয়া কাজ করাইতেন, পরে ইংরাজ-বণিকেরাও "দাদ্‌নী" প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভাগিরথীর একদিকে সুতালুটীর সূতার ব্যবসা ও অপরদিকে বেতোড়ের হাট। এই দুইটী হাটের বাণিজ্যের জন্যই, ভবিষ্যৎ কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল। ধরিতে গেলে, শেঠ-বসাকদিগের আগমনে বন জঙ্গলপূর্ণ গোবিন্দপুর—একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বল্লভাচার্য্যই রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির উপাসনা, ভারতে প্রচার করেন, এরূপ একটা জনপ্রবাদ আছে। বলিতে পারি না, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির বহুল প্রচার ইহার পূর্ব্বে হইয়াছিল কি না? বসাকেরা গোবিন্দ-পুরে আসিবার পর, রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ ইহা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ কাল। শেঠ-বসাকদিগের গোবিন্দজী ঠাকুর,

শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই যুগল মূর্ত্তি। * ক্রমশঃ গোষ্ঠি-বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতির সহিত, এই শেঠ ও বসাকবংশীয়দের অনেকের গৃহে শ্যামরায়, মদনমোহন ইত্যাদি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়।

* এই মূর্ত্তি স্থাপনার প্রধান উদ্যোগী মুকুন্দরাম বসাক। মুকুন্দরামের উপাধি "শেঠ" ও তিনি মৌদ্গল্য-গোত্রীয়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের আমলে, কোম্পানীবাহাদুর গোবিন্দপুর হইতে লোকের বসবাস উঠাইয়া দিলে তদ্বংশজাত বৈষ্ণবচরণ তথা হইতে গোবিন্দজীকে উঠাইয়া আনিয়া, বড়বাজারে নিজ বসতবাটীর উত্তরে স্থাপিত করেন। তদবধি গোবিন্দজী এখনও তথায় বর্ত্তমান আছেন। টাঁকশালের দক্ষিণ পূর্ব্বে, বড়বাজারে যাইবার পূর্ব্বধারে, তাঁহার মন্দির আজও অবস্থিত। (বসুক-১২০৬) মুকুন্দরামের বংশধর বৈষ্ণবচরণ শেঠ, পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার মত ধর্ম্মভীরু লোক সেকালে বড় কম ছিল। তেলিঙ্গানা প্রদেশের—রামরাজার পূজার জন্য, গঙ্গাজল তিনি কলিকাতা হইতে শীলমোহর করিয়া পাঠাইতেন। বৈষ্ণবচরণের ধর্ম্মভীরুতার সম্বন্ধে একটী গল্প শুনিয়াছি। পাঠক বোধ হয় শুনিয়াছেন—এদেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে "লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।" এই গৌরীসেন ব্যবসায় সূত্রে বৈষ্ণবচরণের অংশীদার ছিলেন বৈষ্ণবশেঠ এক সময়ে কতকগুলি দস্তা খরিদ করেন। কিন্তু পরীক্ষায় জানা যায়—এই দস্তার মধ্যে রূপার অংশ কিছু বেশী। বৈষ্ণবচরণ ভাবিলেন, গৌরীসেনের নামে—দস্তা কেনায় তাহা "রাঙ্গের বদলে রূপায়" দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ বৈষ্ণবচরণ, ইহার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকাই গৌরীসেনকে প্রদান করেন। এই ব্যাপারে গৌরীসেন মহা ধনী হইয়া উঠেন। গৌরীসেন তাঁহার অর্জ্জিত বিপুল সম্পত্তি দান-খয়রাতে ব্যয় করিতেন। কন্যাদায়, মাতৃদায়, পিতৃদায়, দেনার দায়ে কয়েদী অধমর্ণ কিম্বা যাহারা ন্যায়পথে থাকিয়া সৎকার্য্যের জন্য ফৌজদারীতে জড়িত ও জরিমানার আসামী, তাহাদের জন্যই অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। ইহা হইতেই, "লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন" এই প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি। এক্ষণে এই বৈষ্ণবচরণ শেঠ সম্বন্ধে দুই একটী কিম্বদন্তী বলিব। বৈষ্ণবচরণ এক সময়ে বর্দ্ধমানের কোন মহাজনের নিকট দশহাজার টাকার চিনি কিনিবার সংকল্প করেন। এই লোকটীর নাম গোবর্দ্ধন রক্ষিত—জাত্যংশে তাম্বুলী। সমস্ত মাল যখন, বড়বাজার কদমতলা ঘাটে পৌঁছিল, সেই সময়ে বৈষ্ণবচরণের কর্ম্মচারীরা মাল নামাইতে যান। তাঁহারা গোবর্দ্ধনের নিকট কিছু উপরি পাওনার লাভে হতাশ হইয়া, মনিব বৈষ্ণবচরণকে মিথ্যা করিয়া জানান, যে মাল তত সুবিধার নয়—ইহা কিনিলে লোকসান হইবে। বৈষ্ণবচরণ রক্ষিত মহাশয়কে অন্যলোক দ্বারা সেই কথা জানাইয়া বলেন—"আপনার মাল শুনিতেছি তত ভাল নয়, এজন্য দাম কমাইতে হইবে।" সেকালের লোক ধর্ম্মকে বড় ভয় করিতেন। কাজেই রক্ষিত মহাশয়, যখন এই মিথ্যাপবাদ শুনিলেন—তখন তিনি ব্যবসায়ে বদনামের ভয়ে, তাঁহার চাকরদের আদেশ করিলেন—"চিনির নৌকা গঙ্গায় ডুবাইয়া দে। বদনাম কিনিয়া চিনি বেচিতে চাহিনা।" তাঁহার চাকরেরা এই হুকুম পাইয়া যখন তাহা কতকটা কার্য্যে পরিণত করিয়াছে, তখন এসমস্ত কথা ধার্ম্মিকপ্রবর বৈষ্ণবচরণের কাণে পৌছিল। তিনি তখনই আসিয়া মহাজন রক্ষিত মহাশয়কে বলিলেন—"আমার কর্ম্মচারীদের মুখে মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া আমি আপনাকে সন্দেহ করিয়াছি। গঙ্গায় যে মাল ফেলিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিব না। এখন যে মাল মজুত আছে, তাহার দাম পূর্ব্ব স্বত্ব মতেই দিব।" কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞানে গোবর্দ্ধনও বৈষ্ণবচরণের অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন ছিলেন না। তিনি—কোনমতেই পুরা দামে মাল বেচিতে চাহিলেন না। যে মাল নষ্ট হইয়াছিল—তাহা বাদে তিনি বৈষ্ণবচরণের নিকট মালের দাম চুকাইয়া লইলেন। হায় বাঙ্গলা! হায় বঙ্গবাসী! তোমরা দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ মহত্ত্বে ভূষিত ছিলে, আর কি সে দিন ফিরিয়া আসিবে!

ধরিতে গেলে এই শেঠ ও বসাকগণ কলিকাতার "জঙ্গল-কাটা" বাসিন্দা। তাঁহারা যদি ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম হইতে—সুতালুটীতে আসিয়া বাস না করিতেন, তাহা হইলে এই কলিকাতাকে আজ আমরা প্রাসাদময়ী নগরী রূপে দেখিতে পাইতাম না।

প্রাচীন কলিকাতায় যে হাট পত্তন হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীকাব্যের বর্ণনা হইতে জানা যায়—

ধালিপাড়া, মহাস্থান, কলিকাতা, কুচিনান,
দুই কূলে বসাইয়া বাট
পাষাণে রচিত ঘাট, দুকূলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায় নানা হাট।

প্রাচীন কলিকাতায় বসুকেরাই প্রথমে একটী হাট স্থাপনা করেন। চণ্ডী-কাব্যের বর্ণনা হইতে দেখা যায়, কলিকাতার তখনকার হাটসমূহ হইতে হয়ত ভবিষ্যতে "সুতানুটী হাটখোলা" বা "সুতানুটী হাটতলা" দাঁড়াইয়াছে। তখনকার হাট সমূহ পাকা-পোক্তা ধরণের ছিল না। হয়ত উন্মুক্ত স্থানেই অনেক হাট বসিত। এই জন্য হয়ত "খোলা-হাট" এই আখ্যা হইতে ক্রমশঃ তাহা "হাটখোলায়" দাঁড়াইয়াছে।

বেতাকীর খালের দুর্দ্দশার সহিত, বেতোড়ের হাট ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতে থাকে। পর্টুগীজ বণিকেরাও তথায় যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেন। বেতড়ার হাটের ধ্বংস হইলে কলিকাতার হাটের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। জব চার্ণক যে সময়ে সুতানুটীতে তৃতীয়বার পদার্পণ করিয়া কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন—সে সময়ে সুতানুটীর হাট বেশ জোরে চলিতেছিল। কারণ জব চার্ণক নিজেই লিখিয়াছেন—"চারিদল শেঠ ও বসাকেরা সপ্তগ্রামের অধঃপতনের সূচনা দেখিয়া গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। তাঁহারা প্রথমে বেতোড়ের বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। বেতোড়ের অধঃপতনের পর সুতানুটীর হাট প্রতিষ্ঠিত হয়।"*

জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা প্রতিষ্ঠার প্রায় সাতাশ বৎসর পরে, এই

* The foreign market attracted native traders and merchants to the spot and in particular from families of Bysacks and one of Setts leaving the then rapidly declining city of Satgong came and founded the Settlement of Govindpur and established Suttnutai market on the north side of Calcutta (Wilson, 128.)

প্রাচীন কলিকাতার যে সামান্য উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সমসাময়িক হ্যামিল্‌-টান্‌ সাহেবের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়।

বস্থক নামক গ্রন্থ রচয়িতা বলেন, "সম্ভবতঃ খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বসাকেরা কলিকাতায় আসিয়া প্রথম বসবাস করেন। বসাকেরা পর্টুগীজ ও ইংরাজ উভয় জাতীয় বণিকদের সহিত ব্যবসায়সূত্রে লিপ্ত ছিলেন। বেতোড়ের হাটের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, এপারে সুতা-নুটীর হাট জাঁকিয়া উঠে। বস্থকেরা ধরিতে গেলে কলিকাতার "জঙ্গল কাটানো" অধিবাসী। ১৭১৭ খৃঃ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে—বংশবৃদ্ধির সহিত তাঁহারা প্রাচীন কলিকাতায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন।" এ সম্বন্ধে সমসাময়িক হ্যামিলটন সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই—"১৭১৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতার অবস্থা অন্যরূপ ছিল। বর্ত্তমান নগরী সেই সময়ে নদীয়া জেলার অন্তঃর্ভূক্ত কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। দশ বারখানি ঘর লইয়া, এক একটী ক্ষুদ্রগ্রাম। গ্রামের অধিবাসীরা অনেকেই কৃষকশ্রেণীভুক্ত। চাম্পাল ঘাটের (চাঁদপাল) দক্ষিণে এক বনভূমি। ক্রমে এই বন পরিস্কৃত হয়। খিদিরপুর ও এই বনভূমির মধ্যে দুইখানি গ্রাম ছিল। এই সময়ে শেঠ ও বসাকেরা এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী। তাহাদের যত্নেই এসব গ্রামে লোকের বসবাস হয় ও ইহা একটী ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হয়। বর্ত্তমান ফোর্ট উই-লিয়াম (গড়ের মাঠের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান) ও এস্‌প্লানেড্‌ (ধর্ম্মতলার নিকট-বর্ত্তী স্থান) অধিকৃত ভূভাগেই উল্লিখিত বনভূমি ও দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্যে দুই একখানা গ্রামের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই সকল ক্ষুদ্র গ্রামের চারিদিকে নালা নর্দ্দমা ও খাল। ধরিতে গেলে, এই সময়ে চিৎপুর হইতেই কলিকাতার সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু চিৎপুর ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে বর্গীর হাঙ্গামার জন্য কলিকাতার একদিক ব্যাপিয়া খাল খনন করান হয়। ইহা "মারহাট্টা-ডিচ্‌" বা "বর্গীর-খাত" বলিয়া বিখ্যাত। সেরাজউদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে সহরের মধ্যে ইংরাজদের ৭০ খানি বাড়ী ছিল। এখন যাহা এসপ্লানেড, চৌরঙ্গী ও ফোর্ট উইলিয়াম বলিয়া পরিচিত, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দেও তাহা জঙ্গলময় ছিল। এই জঙ্গল সমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রগ্রাম ও মধ্যে মধ্যে গোচারণ ভূমি।"*

* A forest to the south of (Champal Ghat) which was afterwards removed by degrees between Kidderpur and the forest were 2 villages

যাইত, পিপ্‌লে সহরেও তাহা পাওয়া যাইত। এজন্য দিনেমার পর্টুগীজ ও ইংরাজ-বণিকগণ এখানে বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া, এ বন্দরের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন।

ইংরাজদিগের মত, ওলন্দাজ, ফরাসী ও দিনেমারেরাও শেঠ ও বসাক দিগের সহিত বাণিজ্যকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। * ওলন্দাজ বা ডচ্‌দিগের আগমনে পর্টুগীজদের বাণিজ্য অনেকটা কম জোর হইয়া পড়ে। ওলন্দাজেরা খিদির-পুর হইতে শাঁকরালের খাল পর্য্যন্ত, ভাগিরথীর অংশকে গভীর করিয়া দেন। ঐ জন্য ঐ অংশকে "কাটি-গঙ্গা" বলে।

জব চার্ণক কর্ত্তৃক স্নতালুটীতে কুঠী স্থাপিত হইবার পর, পর্টুগীজ ও আর্ম্মানীরা আসিয়া স্নতালুটীতে ব্যবসা আরম্ভ করেন। যে স্থান এখন "আলুগুদাম" বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই স্থানেই পর্টুগীজদের বাণিজ্যাগার ছিল। আলুগুদাম, (Algodam) "অলগোডাম" নামক শব্দের অপভ্রংশমাত্র। পর্টুগীজ ভাষায় "অল্‌গোডাম" শব্দের অর্থ তুলা। স্নতালুটীতে তখন কাপাস-বাণিজ্যের বড়ই প্রাদুর্ভাব, এইজন্য বোধ হয়, পর্টুগীজেরা তাহা-দের কলিকাতার বাণিজ্য-কুঠীর অধিকৃত স্থানকে "অল্‌গোডাম" বলিত, ক্রমে তাহা "আলুগুদামে" দাঁড়াইয়াছে।

আর্ম্মানীগণের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা এস্থলে প্রয়োজন। কারণ আর্ম্মানীগণ বহুদিন হইতেই এদেশে বাণিজ্য করিত। ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিদের বঙ্গদেশে প্রবেশের বহুপূর্ব্বে, তাহারা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। আর্ম্মিনিয়ানেরা—ইউরোপীয় জাতিদিগের ন্যায়, জলপথে ভারতে আসে নাই। বহুকাল পূর্ব্বে পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থ স্থানসমূহ হইতে, তাহারা খোরাসানে বাণিজ্য করিতে আসিত। তৎপরে কান্দাহার ও কাবুলের পথ ধরিয়া, তাহারা ক্রমে ক্রমে দিল্লী, বেনারস, পাটনা ও বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে তাহারা কাশিমবাজারের

পুনরায় সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হয়—এবং সম্রাট তাহাদিগকে ব্যাণ্ডেল ও তৎসন্নিহিত স্থানে বসবাস জন্য জমী প্রদান করেন। ব্যাণ্ডেল গির্জ্জায় একটি প্রস্তরফলকে ১৫৯৯ খৃঃ অব্দ খোদিত আছে। হুগলীর প্রাচীন নাম "গোলিন" বা "উগোলিন" ও তাহা হইতে হুগলী শব্দের উৎপত্তি। গোলিন পর্টুগীজ শব্দ—ইহার অর্থ গোলাবাড়ী।

* আমরা ইতিপূর্ব্বে দুই একস্থলে বসাকের পরিবর্ত্তে "বসুক" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। বসুক-গ্রন্থ প্রণেতার মতে "বসুক"ই ঠিক শব্দ। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেকর্ডে বসুক শব্দ Bysack বলিয়া লিখিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহা হইতেই "বসাকে" দাঁড়াইয়াছে। বসাক শব্দটী সাধারণ প্রচলিত শব্দ বলিয়া, আমরা ইহাই অতঃপর ব্যবহার করিব।

সান্নিধ্যে, সৈদাবাদে একটী বাণিজ্যাগার স্থাপন করে। ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে দিনেমারেরা চুঁচুড়ায় আসে।* জব চার্ণকের আমলের বহুপূর্ব্ব হইতেই,কলিকাতায় ও চুঁচুড়ায় আর্ম্মাণীদের বসবাস হইয়াছিল। কারণ বর্ত্তমান আর্ম্মাণী গির্জ্জার মধ্যে যে ক্ষুদ্র সমাধি ক্ষেত্রটী আছে, তাহার একটী সমাধির উপর

"১৬৩০—১১ই জুলাই"

এই কয়েকটী শব্দ খোদিত আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, জব চার্ণকের আগমনের বহু পূর্ব্বে, কলিকাতায় আর্ম্মানীদের বাস বিস্তার হইয়াছিল।

পরবর্ত্তীকালে আর্ম্মানীদিগকে কলিকাতায় আনাইবার প্রধান উদ্যোগী জব চার্ণক্। তাহার পূর্ব্বে এখানে আর্ম্মানী সংখ্যা অতি কম ছিল। জব চার্ণকের অনুরোধে,অনেক আর্ম্মানী,চুঁচুড়া হইতে বাস উঠাইয়া, কলিকাতায় আসেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের পুরাতন কাগজ-পত্র হইতে জানা যায়—যে ইংরাজ কোম্পানী, আর্ম্মানীদের ব্যবহারের জন্য একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই ঘটনা হইতে প্রমাণ হয়, জব চার্ণকই আর্ম্মানীদিগকে নানাবিধ সুবিধাকর বন্দোবস্তে কলিকাতায় আনয়ন করেন। আর্ম্মানীদিগের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দের ৩২ জুন তারিখে যে সন্ধিপত্র হয়, তাহা হইতে প্রমাণ হয়—যে ইংরাজ কোম্পানী আর্ম্মানীদিগকে বিনামূল্যে গির্জ্জা-নির্ম্মাণের জমী পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন।† ইহার কারণ আর কিছুই নহে—নানা কারণে ইংরাজেরা

* আর্ম্মাণীগণ সেই সময়ে দেশের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৬৫২ খৃঃ অব্দে আকবরের রাজত্ব সময়ে, তাঁহারা আগরায় এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। আগরায় এই গির্জ্জার একটী প্রস্তরফলক হইতে জানা যায়, বাদসাহী আমলে ইহাদের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। কলিকাতার আর্ম্মানী-গির্জ্জায় যে প্রস্তরফলকের কথা উপরে বলিয়াছি, তাহা আর্ম্মানী ভাষায় লিখিত। তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই—"Rezabeebeh the wife of the late charitable Sookeas departed this world to life eternal on the 21st Day of Nakha in the year 15 of the new era of Julpha which corresponds with the 11 of July 1630 A. D. এই রেজা বিবি ও তাঁহার স্বামী সুকিয়া, সেকালের কলিকাতায় দয়ালু ও দানশীল বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই সুকীয়ার নাম হইতেই বর্ত্তমান "সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট"নামকরণ হইয়াছে।

† Whenever 40 or more of the Armenian nation, shall become inhabitants of any garrison, cities or towns, belonging to the Company in the East Indies the said Armenians shall not only enjoy the free use and exercise of their religion, but there shall be allotted to them a parcel of ground to erect a church thereon for worship and service of God in their own way. And that we also will on our own charge cause a convenient church to be built of timber which afterwards the said

আর্ম্মানীদিগের উপর অনুরক্ত ছিলেন। আর্ম্মানীরা বহুদিন ধরিয়া এ দেশে বাস করিয়া আসিতেছেন। এ দেশের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বেশী। অনেক আর্ম্মানী অতি উত্তমরূপে উর্দ্দূ ও পার্শী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য ইংরাজের দ্বিভাষীরূপে অনেক সময়ে, আর্ম্মানীয়ানদের প্রয়োজন হইয়াছিল। কারণ ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে আমরা দেখিতে পাই, খোজা সরহদ বলিয়া একজন আর্ম্মানী, দ্বিভাষী রূপে, ইংরাজপক্ষের সহিত সম্রাট ফেরোক-শিয়ারের দরবারে গমন করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর পরে, নবাব সেরাজ-উদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন—তৎকালে খোজা পিট্রস্ আরাটুন নামক একজন আর্ম্মানীয়ান, ইংরাজ গবর্ণর ড্রেকের দ্বিভাষীরূপে নবাবের প্রতিনিধি উমির্চাদের সহিত, সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন।

আজও কলিকাতায় "ব্যাঙ্কশাল" বা বাঁকশাল বলিয়া একটী রাস্তার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই "বাঁকশালে" ওলন্দাজ বা ডচ্-বণিকদের কলিকাতার কুঠি ছিল। এখন যে স্থানকে "বাঁকশাল-ঘাট" বলে, অনেকে অনুমান করেন, সেই স্থানেই তাহাদের বাণিজ্য কুঠীর অবস্থান স্থান। বাঙ্কশাল শব্দ ওলন্দাজী "বঙ্কশাল" শব্দের অপভ্রংশ। "বঙ্ক"শব্দের অর্থ নদীর তীরবর্ত্তী কুঠি। "শল" অর্থে কর বা টেক্স।* ওলন্দাজ ভাষার অর্থমত—নদীতীরে যে

Armenians may alter and build with stone or other solid materials to their own liking. And the said Governor and Company will allow fifty pounds per annum during the space of seven years, for the maintenance of such priest and minister as they will choose to officiate therein (Given under the Company's Larger Seal June 22nd 1688) Bengal and Agra Gazetteer (1841 vol. 1. Cal.)

* মার্শম্যান সাহেবের মতে ইহা একটী পর্টুগীজ শব্দ। রেভারেণ্ড লং সাহেব বলেন—(Bank Hall—a hall on the bank of the river.) রেইনী সাহেব ইহার অন্যবিধ অর্থ করেন। তিনি বলেন—ইহা একটী মিশ্রশব্দ। ইহা ইংরাজী Bank (নদীতীর) ও সংস্কৃত "শালা' বা গৃহ, এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। অথবা—এই স্থানে নদীর বাঁক ছিল বলিয়া ইহা "বাঁক" এই বাঙ্গলা শব্দ ও "শালা" এই সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। যিনি যে ভাবে এই বাঁকশাল শব্দের অর্থ করুন না কেন—ইহা যে ডচ্ ভাষাভুক্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ১৭০০ খৃষ্টাব্দের কাগজ পত্রে দেখা যায়—বিলাতের কর্ত্তারা (Kedigree) বা কেজিরিতে একটী "Bank's-hall" বা (Marine Yard) স্থাপনের আদেশ করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ টলবয়েজ হুইলার সাহেব বলেন—"The term " Banksoll" has always been a puzzle to the English in India It is borrowed from the Dutch or Danish "Zoll", the English " Toll ". The " Bankshall " was thus the place on the "bank" where all tolls or duties were levied on landing goods (Early Records of British India. (Wheeler). Page 196, F. N,

স্থানে মাশুল আদায় হয়, তাহাকে "ব্যাঙ্কশাল" বলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ওলন্দাজেরা মোগল সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, ভাগিরথীর কিয়দংশ কাটাইয়া প্রশস্ত করিয়া দেন। যে সকল নৌকা জাহাজ বা ভড় এই "কাটী-গঙ্গার" উপর দিয়া যাইত, - এই "ব্যাঙ্কশালে", বা নদীতীরবর্ত্তী কুতঘাটায়, তাহাদের নিকট হইতে মাশুল আদায় করা হইত। এই বাঁকশাল বা কুতঘাটার মালিক ছিলেন—হলাণ্ডার্স বা ওলন্দাজগণ। তাঁহারা ভাগিরথী নদীর উভয় দিকে থাকিয়া, অন্য জাতীয় বণিকদের নিকট কর আদায় করিতেন। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হইতেছে, নিশ্চয়ই তৎকালীন মোগল-শাসনকর্ত্তার অনুমতি মতে, বা তাঁহাদের প্রদত্ত কোন সনন্দের সহায়তায়, তাঁহারা এরূপ নদী-কর আদায় করিতেন—অথবা এই কর আদায়ের চুক্তি অনুসারেই, তাঁহারা "কাটী-গঙ্গা" কাটাইয়া দেন।

শেঠবসাক, দিনেমার, আর্ম্মানী, ইংরাজ, পর্টুগীজ ও ডচ্ ব্যতীত - এই সময়ে কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতালুটীর জঙ্গল কাটাইয়া, আরও অনেকে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের মধ্যে কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতে, ভবানীদাস, কালীর সেবায়েত ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। যাদবেন্দ্র, ভবানীদাসের প্রথম পক্ষের সন্তান। ভুবনেশ্বরের কন্যার গর্ভে রাঘবেন্দ্র বলিয়া আর এক সন্তান জন্মে। রাঘবেন্দ্র ভুবনেশ্বরের মৃত্যুর পর, কালীর সেবায়েত নিযুক্ত হন। তাঁহার বংশধরদের অনেকে গোবিন্দপুরে উঠিয়া আসেন। ভবিষ্যতে—যখন এই গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য, অধিবাসীদের উঠাইয়া দেওয়া হয়—সেই সময়ে যাদবেন্দ্রের অধস্তন পুরুষেরা কালীঘাটে চলিয়া যান।

ইহার পর, যখন পুরাতন ও নূতন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীদ্বয় একত্রে মিলিত হইয়া যায় (১৭০৬ খৃঃ) সেই সময়ে নূতন কোম্পানীর দল, হুগলী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। উভয় কোম্পানীর সমীকরণের পর, কলিকাতার উন্নতি ক্রমশঃ হইতে থাকে। এই সময়ে অনেক লোক কলিকাতায় আসিয়া পাকা বসত-বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে, দশ বার হাজার লোকের বসবাস ছিল।* এতজ্জন্য কোম্পানী বাহাদুরের কিছু আয় বৃদ্ধি হয়।

* It may contain in all about 10 to 12 000 souls and the Company's revenue are pretty good and well paid. They risé from ground rent and

একাদশ অধ্যায়।

১৭৩৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, কলিকাতার নানাবিষয়ে ক্রমোন্নতি হইতেছিল। নানাস্থানে বাড়ী, ঘর, দীর্ঘিকা, বাগান প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই জঙ্গলময় সুতালুটীকে গঙ্গাতীর হইতে দেখিলে, যেন একটী ক্ষুদ্র জনস্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কিন্তু ১৭৩৭ সালের বিখ্যাত ঝড়ে, এই নবপ্রতিষ্ঠিত, উন্নতিমুখ-প্রধাবিত, ক্ষুদ্র নগরীর ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল। এরূপ ভয়ানক ঝড়, বঙ্গদেশে আর কখনও হইয়াছিল কিনা, বোধ হয় না। একশত ছিয়াত্তর বৎসর পূর্ব্বে, প্রাচীন কলিকাতায় যে মহাঝড় হয়, তাহার একটী বিবরণ আমরা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

এই সময়ে স্যর ফ্রান্সিস্ রসেল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠির মন্ত্রণাসভার সদস্য ছিলেন। রসেলের বর্ণিত কাহিনীই, আমরা এ স্থানে অনুদিত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিতেছেন—"এমন ভয়ানক ঝড় ও সেই মহাঝটিকার রাত্রের ভয়ানক দৃশ্য, আমি জীবনেও ভুলিতে পারিব না। মুষলধারে বৃষ্টি, মুহুর্মুহু বজ্রনাদ, ঝড়ের বিষম ঝাপ্‌টা ও সন্ সন্ শব্দ দেখিয়া, আমি উপরতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম। আমার বিশ্বাস, যে বাড়ীতে আমি বাস করিতাম, তাহা অন্যান্য সকল বাড়ী অপেক্ষা মজবুত। কিন্তু ঝড়-ঝাপটা, ও বাতাসের দম্‌কা ইত্যাদি দেখিয়া আমার প্রতিমূহুর্ত্তে ভয় হইতে লাগিল, যে বুঝি বাড়ী চাপা পড়িয়া, আমাদের জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ হইতে হইবে। মিসেস্ ওয়াসটেল নামধেয় এক ইংরাজরমণী, আমাদের বাড়ীতে পুত্রকন্যাদিসহ আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রাণের ভয়ে, আমি তাঁহাকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। তিনি উপরে যে ঘরে ছিলেন—তাহার দরজা জানালা ও গৃহভিত্তি মহাশব্দে পড়িয়া গেল। এইভাবে ভয়, উদ্বেগ, অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা লইয়া সমস্ত রাত্রিটা আমরা বসিয়া কাটাইলাম।"

"পরদিন প্রভাতে কি ভয়ানক দৃশ্যই দেখিলাম! পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় ছোট বড় উনত্রিশ খানি জাহাজ, গঙ্গার উপর ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই জাহাজের মধ্যে ডিউক অব ডর্সেট নামক (Duke of Dorsett) একখানি মাত্র জাহাজ, নদীবক্ষে আছে। তাহারও অবস্থা অতি শোচনীয়। পাইল ও মাস্তুল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই খানি ছাড়া, অন্য জাহাজগুলির

consulage on all goods imported and exported by British subjects but all the nations besides are free from taxes. (Hamilton's East India Gazzetteer Vol. II. P. 18)

কয়েকখানি নদীনে ডুবিয়া গিয়াছে, দুই চারিখানি তীরভূমিতে আড় হইয়া পড়িয়া আছে—অপরগুলি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক দৃশ্য! ইংরাজের ও দেশীয়দের আবাস বাটীর মধ্যে, দশবার খানি একাধারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। সেণ্ট এন্ গির্জ্জার, চূড়া ভাঙ্গিয়া, গির্জ্জাটা মাটিতে সমভূমি হইয়াছে। তখনকার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল—যেন কোন প্রবল শত্রু আসিয়া, তাহা সমভূমি করিয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের দ্বারা এত ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল, যে লেখনীমুখে তাহার স্বরূপ বর্ণনা অসম্ভব। রাস্তার দুই ধারে যে সমস্ত বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, তাহা রাস্তা জুড়িয়া পড়িয়া আছে।”

রসেলের লিখিত কাহিনী হইতেই প্রকাশ—এই ঝড় ১০ এ সেপ্টেম্বর আরম্ভ হয়। বঙ্গোপসাগর হইতেই ঝড়টা উঠিতে আরম্ভ করে। যেমন ঝড়ের বেগ, তেমনই মুষলধারে বৃষ্টি। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে নদীর জল—১৫ ইঞ্চি বাড়িয়া উঠে। ঝড়টা সমুদ্র হইতে উঠিয়া ৬০ লিগ্ পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী স্থানে প্রধাবিত হয়। ইহার সঙ্গে, আবার ভূমিকম্পও ছিল। প্রায় বিশহাজার জাহাজ, বোট, জেলেডিঙ্গী, নৌকা, ভড়, বজরা ইত্যাদি নষ্ট হইয়াছিল, এবং ভাঙ্গিয়া বা ডুবিয়া গিয়াছিল। গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদি অনেক গৃহপালিত পশু, এই বন্যার মধ্যে ডুবিয়া যায়। এমন কি—কলিকাতার জঙ্গলমধ্যবাসী কয়েকটী বাঘ ও গণ্ডারকে পর দিন নদী স্রোতে মৃতাবস্থায় ভাসিতে দেখা যায়। পক্ষীকুলের দুর্দ্দশায় ইয়ত্তা ছিল না। বহুসংখ্যক পক্ষীর মৃতদেহ, নদী জলে ও পথিমধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ৫০০ টন মাল বহিতে পারে, এমন অনেক জাহাজ দুইশত হাত দূরবর্ত্তী গ্রামের মধ্যে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ডেকার, ডিভনশায়ার, নিউকাসেল প্রভৃতি তিন খানি বড় বড় জাহাজ, নদীর তটভূমিতে ঝটিকা বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পেলহাম নামক জাহাজ খানির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। ফরাসীদের একখানা জাহাজ পূর্ব্বদিন রাত্রে বন্দরে আসিয়া লাগে—তাহাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ঝড় থামিবার পর, নদীগর্ভে নিমজ্জিত অনেক মালপত্র পুনরুদ্ধার করা হয়। একখানি জাহাজের অধিকাংশই জল মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছিল। তাহার মালগুলি উদ্ধারের জন্য, একজন লোককে নীচের ডেকে নামাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু, সে আর ডেক্ হইতে বাহির হইয়া উপরে আসিল না। কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া, আর একজন লোক সেই ডেকের মধ্যে নামিয়া গেল। তাহারও সেই অবস্থা। তখন মশাল লইয়া, জনকয়েক

লোক তাহাদের সন্ধানে নীচে নামিয়া গেল। তাহারা সেই মশালের আলোকে যে দৃশ্য দেখিল, তাহা অতি ভয়ানক। তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল—যে একটা প্রকাণ্ডকায় কুম্ভীর, সেই ডেকের জলে ভাসিয়া আছে। পূর্ব্বগামী লোক তিন জনের যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। কুম্ভীরটা জাহাজের গায়ে একটা গর্ত্তের মধ্য দিয়া, ডেকের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া কুম্ভীরটাকে বধ করা হইলে দেখা গেল—তাহার উদরের মধ্যে সেই তিনজন লোক রহিয়াছে। *

পাঠক! সাঁইত্রিশ খৃঃ অব্দের (১৭৩৭) এই ভীষণ ঝটিকার ইতিবৃত্ত হইতেই বুঝিতে পারিবেন—এ ঝড় কিরূপ ভয়ানক! ইহাতে সেকালের নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। সমসাময়িক ইতিবৃত্ত হইতেই—এই ঝড়ের কাহিনী আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। হইতে পারে, ইহার মধ্যে অতিরঞ্জিত কথাও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও, ইহা যে সেই সময়ে একটা মহা হুলস্থুল উপস্থিত করিয়াছিল ও কলিকাতার

* It is computed that 20000 ships, barks, sloops, boats, canoes etc. have been washed away. A probigious quantity of cattle of all sorts, a great many tigers and rhinoceroses were drowned and innumerable quantity of birds were sent down into the river by the storm. Two English ships of 500 tons were thrown into a village, about 200 fathoms from the bed of the river Ganges, broke to pieces and all the people drowned pellmell. * * After the wind and water abated, they opened the hatches and took out several bales of merchandise &c. but the man who was in the hole to sling the bales, suddenly ceased working nor by calling him could they get any reply on which they sent down another, but heard nothing of him which very much added to their fear so that for sometime no one would venture down. At length one more hardy than the rest went down and became silent and inactive as the two former to the astonishment of all. They then agreed to look down into the hold by light which had a great quantity of water in it and to their great surprise they saw a huge alligator staring, as expecting more prey. It had come in through a hole in the shipside and it was with difficulty they killed it, when they found the three men in the aligators belly. অন্য একমতে—of nine English ships then in the Ganges eight were lost and most of the crews drowned. Barks of sixty tons were blown two leagues up into land over the tops of high trees. * * * 300000 souls are said to have perished. The water rose 40 feet higher than usal in the Ganges:—Gentlemen's Magazine 1738, Historical and Ecclesiastical Sketches of Bengal, 1828 (pp. 182—183) Cotton's—Calcutta.

অনেক নবনির্ম্মিত বাড়ী ঘর ও চালা প্রভৃতি ভূমিসাৎ করিয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা স্থাপনের ৪৭ বৎসর পরে এই ঝড় হয়। এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া, যে সমস্ত বাড়ী ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই এই ঝড়ে ভাঙ্গিয়া যায়।

জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পুর্ব্বের ইতিহাস কিছুই নাই বলিলে হয়। প্রাচীন পুরাণ কাব্যাদিতে, কলিকাতা, কালিঘাট প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত সামান্য বর্ণনা আছে, তাহা হইতেই যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। জব চার্ণকের পর হইতেই কলিকাতার নদীতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ অর্থাৎ স্থতালুটী, হাটখোলা ও তন্নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর প্রভৃতির গভীর জঙ্গল ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হয় ও তথায় লোকের বসবাস হইতে থাকে। অদ্ভুত প্রতিভাবলে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি পরিচালিত হইয়া, জব চার্ণক ভবিষ্যৎবংশীয় ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে, এই স্থতালুটীতেই প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমান আসমুদ্রব্যাপী বৃটীশাধিকৃত ভারতবর্ষ তাঁহার এই দূরদর্শিতার ফল।
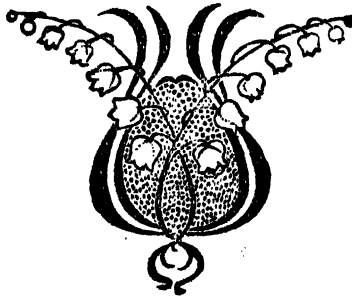
দ্বাদশ অধ্যায়।

কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক—তাঁহার সমাধিক্ষেত্র ও স্মৃতি-চিহ্ন—পাটনা, বালেশ্বর ও কাশিম বাজারে চাকুরী—পাটনায় অবস্থান কালে—সহমরণোদ্যতা এক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে উদ্ধার—তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ—তাঁহার সন্তান-সন্ততি, পত্নীর সমাধির উপর মোরগ-বলির জনপ্রবাদ—বাহুবল সহায়তায় আত্মরক্ষার ও মোগল-সম্রাটের নিকট দাবী-দাওয়া আদায়ের সংকল্প—নবাবের সহিত ইংরাজের ও তৎপক্ষে চার্ণকের বিবাদ সুচনা—এতজ্জন্য বিলাত হইতে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ—বহরের অধ্যক্ষ নিকলসনের প্রতি কোম্পানীর আদেশ—চট্টগ্রাম ও ঢাকা আক্রমণ সংকল্প—নিকলসনের সসৈন্যে হুগলীতে আগমন—নবাবের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষের প্রারম্ভ—হুগলী রক্ষার জন্য নবাবের সেনা-প্রেরণ—হুগলীর ফৌজদারের সহিত চার্ণকের বিবাদ—চার্ণকের জয় লাভ—ফৌজদার আবদুল গণির হুগলী ত্যাগ করিয়া পলায়ন—মোগলপক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব—চার্ণকের নূতন চাল হুগলী ত্যাগ—হিজলীর কাণ্ড—নবাব ইব্রাহিম খাঁর আমল—চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও সুতালুটীতে বাণিজ্যাগার স্থাপন—সেকালের সুতালুটী ও তদধিকৃত স্থানে বর্ত্তমান কলিকাতা—কোম্পানীর কুঠীর জন্য মাটির ঘর নির্ম্মাণের ব্যবস্থা—লালদিঘী—মজুমদারদের কাছারী বাটী—শ্যামরায় বিগ্রহ—লালদিঘী নামোৎপত্তির কারণ—চার্ণক কর্ত্তৃক কোম্পানীর সেরেস্তা-রাখিবার জন্য উক্ত কাছারী বাটী গ্রহণ—চিত্রেশ্বরী কালী—চিৎপুর রোড নাম হইবার কারণ—জঙ্গল মধ্যবর্ত্তী কালীক্ষেত্রের পথই চিৎপুর রোড—সাবর্ণগণের জন্যই কলিকাতার প্রতিপত্তি—শ্যামরায়ের দোল পর্ব্বে হাটবাজার ও মেলাদির অনুষ্ঠান—রাধাবাজার লালবাজার ইত্যাদি নামের কারণ—হাটখোলা বড়-বাজার ইত্যাদি নাম সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী—তৎকর্ত্তৃক কালী-মাতার মুখ-প্রস্তর আবিষ্কার সম্বন্ধে জনপ্রবাদ—চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত চারিটি শিব লিঙ্গমূর্ত্তি—জঙ্গলেশ্বর, চৌরঙ্গীশ্বর, নকুলেশ্বর ও নঙ্গরেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যকথা—গোবিন্দপুরে ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের বাস—মহারাজ নবকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ রুক্মিণীকান্ত দেব, শ্রীহরি ঘোষ ও গোবিন্দরাম মিত্রের পূর্ব্বপুরুষগণের গোবিন্দপুরে বাস—হালদার বংশের কালীঘাট, ভবানীপুর ও গোবিন্দপুরে আবাসস্থান পরিবর্ত্তন—হাটখোলা দত্তদিগের আদিপুরুষ গোবিন্দশরণ দত্ত ও ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদিপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুরের গোবিন্দপুরে বাস—চার্ণকের সহিত মজুমদারদের আমমোক্তার এণ্টনি সাহেবের বিবাদ—এই এণ্টনির পৌত্রই কবিওয়ালা—আণ্টুনি সাহেব।

জব চার্ণক সম্বন্ধে নানাকথা।

যে সকল প্রতিভাবান, শক্তিমান ইংরাজ, ভারতে ব্রিটীশাধিকার স্থাপনের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জব চার্ণকই অন্যতম।

জব চার্ণকের অনেক ত্রুটী, অনেক দোষ থাকিতে পারে, আর ত্রুটী ও দোষ-হীন মানুষও জগতে খুব কম। কিন্তু দোষভাগের সহিত তুলনায়, জব চার্ণকের গুণাংশই অধিক ছিল। আজ যে আমরা গগণস্পর্শী সৌধমালা সমন্বিত, এই কলিকাতা মহানগরী দেখিতে পাইতেছি, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে, বহুবিধ অসুবিধা, কষ্ট, ত্যাগস্বীকার ও মর্ম্মবেদনা সহ্য করিয়া, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ জব চার্ণক তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতাতেই ইংরাজের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে –গভীর জঙ্গল সমাবৃত,হিংস্র শ্বাপদ সমাকীর্ণ, বাদাভূমিপূর্ণ, কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী সুতালুটী গ্রামে—যদি তিনি ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে আজ হয় ত আমরা ইংরাজ সম্রাটের রাজভক্ত প্রজারূপে, ইংরাজরাজত্বের এই অতুলনীয় সুখ-সম্পদের অধিকারী হইতাম না।

ইংরাজ জাতি বহুকাল পরে, জব চার্ণকের অমানুষিক প্রতিভা ও গুণ-রাশির মূল্য উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি, লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের চেষ্টাতেই, জব চার্ণকের নাম রক্ষা সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা হয়। তিনিই চেষ্টা করিয়া, বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্ট-আপিসের সম্মুখবর্ত্তী পথটীকে—"চার্ণক-প্লেস" নামে অভিহিত করিয়া, চার্ণকের নাম তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নগরীর সহিত সম্মিলিত করিয়া রাখিয়াছেন।

জব চার্ণকের সমাধিস্তম্ভ, আজও কলিকাতায় বর্ত্তমান। এই সমাধির মধ্যে, তাঁহার ও তাঁহার হিন্দু-পত্নীর দেহ সমাহিত হইয়াছিল বলিয়া,উল্লিখিত। এই সমাধির একখানি চিত্র আমরা যথাস্থানে প্রদান করিলাম। এই সমাধি সৌধ, তাঁহার জামাতা স্যার চার্লস আয়ার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সেণ্ট-জন গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ করিলে, এই সমাধি স্তম্ভ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। লর্ড কর্জ্জনের চেষ্টাতেই এই সমাধি নূতন ভাবে সংস্কৃত ও সুরক্ষিত হইয়াছে।

জব চার্ণকের মৃত্যুর ঠিক দুইশত বৎসর পরে—অর্থাৎ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই স্মৃতিস্তম্ভ, বঙ্গের পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট দ্বারা মেরামত করান হয়। চার্ণকের গোরের মধ্যে Vault বা খিলান আছে কিনা—এবং তাহার মধ্যে চার্ণক ও তাঁহার হিন্দুপত্নী দুই জনের সমাধিস্থান থাকা সম্ভব কিনা, ইহা দেখিবার একটা কৌতুহল কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মনে উদিত হয়। এই কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য—গোরটী খনন করা পর্য্যন্ত হয়। এই সময়ে রেভাঃ এচ, বি, হাইড সাহেব, এই সেণ্টজন গির্জ্জার পাদরি ছিলেন। এই

খনন ব্যাপার সম্বন্ধে, হাইড সাহেব লিখিয়াছেন—"পরদিন আমি চার্ণকের সমাধি-মন্দির দেখিতে গেলাম। (২২ এ নবেম্বর ১৮৯২) দেখিলাম—ছয় ফিট্ পর্যন্ত গোরটী খনন করা হইয়াছে। খননকারীরা এই পর্য্যন্ত খনন করিবার পর কার্য্য বন্ধ করে। কারণ—এই স্থানেই তাহারা অস্থি-খণ্ড ও নরকঙ্কালচূর্ণ দেখিতে পায়। আজকাল সাধারণ সমাধিগর্ভ গুলি, যেরূপ ভাবে গভীর—ইহা সেরূপ ছিল না। এই ছয় ফিট খননের পর, একটী সমতল স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের পশ্চিম অংশটী, আরও কিয়দ্দূর খননের পর, তাহারা একখানি অস্থি দেখিতে পায়। এই অস্থিখানি যে অবস্থায় যেখানে ছিল, তদ্রূপই রাখা হয় এবং ইহার পরই খনন কার্য্য বন্ধ করা হয়। এই অস্থিখানির গঠন প্রণালী দেখিয়াই বুঝা গেল, ইহা সমাহিত ব্যক্তির বামবাহুর সম্মুখের অস্থি। গোরে শোয়াইবার সময়, প্রথমত হাত দুইখানি মৃত দেহের বুকের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। এ অস্থির অবস্থান সমাবেশ দেখিয়া অনুমিত হইল—ইহা সমাহিত বামহস্তের অস্থি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার পর খনকেরা, আর একটী ক্ষুদ্র জিনিস দেখিতে পায়। সেটিকে প্রথমে আমি শবাধারে ব্যবহৃত, একটী পেরেক বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু পরীক্ষায় বুঝিলাম, তাহা বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলীর বৃহৎ অস্থি-খণ্ড। সেই অস্থিখণ্ড, আমি যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল—আর একটু খনন করিলেই, হয়ত সমস্ত নরকঙ্কালের অর্দ্ধবিনষ্ট অস্থিগুলি পরিদৃশ্যমান হইত। খুব সম্ভবতঃ—এই দুই শত বৎসর পরেও, আমরা তাহা যথাযথ ভাবে দেখিতে পাইতাম।"

"সমাধিগর্ভে-নিহিত—কলিকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী জব চার্ণকের নশ্বর দেহের এখনও পরিদৃশ্যমান অংশগুলি দেখিয়া বোধ হইল—দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই স্থানেই সমাহিত হইয়াছিলেন। * * এই পর্য্যন্ত দেখিবার পরই আমি সমাধি-খনন কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলাম। *

চার্ণক ও তাঁহার হিন্দুপত্নী—উভয়েই এক সমাধির মধ্যে সমাহিত হইয়াছেন কি না—তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই নাই। উক্ত গোরটী আরও গভীরভাবে খনিত হইলে, বোধ হয় তাহার তথ্য নির্ণয় হইতে পারিত। কিন্তু তাহা নানা কারণে অসম্ভব।"

যেস্থানে চার্ণক, হ্যামিল্টন প্রভৃতি মৃত মহাত্মাদের সমাধিচিহ্ন আজও

* A note read at a meeting of the Asiatic Society by Rev. H. B. Hyde. Blechinden's. Calcutta, Past and Present.

বর্ত্তমান—তাহা বহুপূর্ব্বে একটী গোরস্থান ছিল। বোধ হয়, এই গোরস্থানটী চার্ণকের আগমনের সময় হইতে বা তৎপূর্ব্বেও সমাধিক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। হুগলী ও বালেশ্বরে গমনাগমনের পথে, যে সমস্ত ইংরাজেরা জাহাজে মরিতেন—তাঁহাদিগকে এই বনভূমিপূর্ণ নির্জ্জনস্থানে সমাহিত করা হইত।

এই সমাধি-ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে—ইহার বহুকাল পরে বর্ত্তমান সেণ্টজন গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ইহা জন সাধারণে "পাথুরিয়া-গির্জ্জা" নামে অভিহিত। বর্ত্তমান হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটের যে বাটীটিতে এখন বরুণ কোম্পানীর কার্য্যালয় হইয়াছে—সেই বাটীটিই, ভবিষ্যতে গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের কলিকাতার আবাস-স্থান ছিল। পুরাতন কাগজ পত্র হইতে জানিতে পারা যায়—"হেষ্টিংস ও অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীরা, পদব্রজে গির্জ্জাঘরে যাইতেন।" এই সেণ্টজন-চর্চ্চই, সেই গির্জ্জাঘর। পাঠক! এই সেণ্টজন-চর্চ্চের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলেই—আজও পুরাতন গোরস্থান ও চার্ণকের সমাধি-মন্দির দেখিতে পাইবেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট—লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর, যে বাটীতে গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সাহেব বাস করিতেন, তাহার গায়ে একখানি স্মৃতি-ফলক লাগাইয়া দিয়াছেন। পাঠক! ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে চার্ণকের সমাধি-মন্দির দেখিয়া আসিতে পারেন।

জব চার্ণকের বাল্যজীবনের কোন ইতিহাসই নাই। ইংলণ্ডের কোন্ প্রদেশে বা কোন্ গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন—তাহার কোন সন্ধানই নাই। কোম্পানীর পুরাতন সেরেস্তা হইতে এইটুকু কেবল জানা যায় - ১৬৫৫ বা ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে, তিনি এদেশে আগমন করেন। মাসিক তিনশত টাকা বা কুড়ি পাউণ্ড বেতনে, তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে, পাঁচ বৎসরের করারে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি পাটনার কুঠীতে নিযুক্ত হন—তৎপরে কাশিমবাজারে আসেন। পাটনার কুঠীতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, তিনি বালেশ্বর ও রাজমহলের কুঠীতে কাজ করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কাশিমবাজার কুঠীর প্রতিষ্ঠা বন্দোবস্ত পাকা হয় নাই। এইজন্য চার্ণক বালেশ্বর ও রাজমহল হইয়া, পরে পাটনায় পৌছেন।

১৬৬০ খৃঃ অব্দে লিখিত চার্ণকের এক পত্র হইতে প্রকাশ, যে তিনি পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হইবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত।

এই সময়ে তিনি বিলাতের ডিরেক্টারদের একখানি পত্র লেখেন। সে পত্রের মর্ম্মার্থ এই—"যদি আপনারা আমাকে স্থায়ীভাবে পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত না করেন, তাহা হইলে আমি পদত্যাগ করিব।" বলা বাহুল্য, তাঁহার প্রভু ডিরেক্টারেরা তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে সম্মতিদান করেন।

চার্ণকের চাকুরী জীবনের, প্রথম পাঁচ বৎসর পাটনাতেই কাটে। পাটনা তখন মুসলমান-প্রধান স্থান, মোগলের শাসন-কেন্দ্র। পাটনায় থাকিয়া, চার্ণক এ দেশীয় শাসনকর্ত্তাদের কার্য্য-প্রণালী বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা, এদেশের শাসননীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পাটনার আশপাশ হইতে, সোরা কিনিয়া তিনি মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিতেন। মান্দ্রাজ হইতে এই সোরা বিলাতে চালান হইত। আগে মসলীপত্তন হইতেই সোরা প্রেরিত হইত। কিন্তু পাটনাই-সোরা, মসলিপত্তনের সোরা অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা চার্ণকের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হন। সোরা তখন কোম্পানীর একটী লাভকর বাণিজ্য-দ্রব্য। এজন্য চার্ণকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহারা তাঁহার বেতন মাসিক ছয়শত টাকা করিয়া দেন। (১৬৭১) ইহার পর ১৬৭৫ সালে ডিরেক্টারেরা চার্ণকের নির্দ্দিষ্ট বেতনের উপর তিনশত টাকা পুরস্কার ব্যবস্থাও করেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদের এই অসীম অনুগ্রহ হইতে, চার্ণকের কার্য্যশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৬৭৬ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে, চার্ণক—বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃক দিল্লী যাইতে আদিষ্ট হন। কিন্তু তিনি এদেশের শাসন-কর্ত্তাদের সহিত হাতে-কলমে কাজ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, দিল্লীশ্বরের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাই সর্ব্বপ্রধান। কোথায় দিল্লী—আগরা, আর কোথায় বঙ্গদেশ। দিল্লীর সম্রাট—ইংরাজদিগের বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থে, যে সমস্ত ফারমান ছাড় ও আদেশ-পত্র দিতেন, উৎকোচ গ্রহণে সিদ্ধহস্ত, রাজকর্ম্মচারীগণ—সে সব স্বত্ব আমলেই আনিত না। তাহাদের চিরদিনই এক কথা—"টাকা চাই,—সেলামী চাই,—নজরানা চাই। বাদসার ভরসা বড় করিও না, এই দূরদেশে আমরাই বাদসাহ।" চার্ণক এদেশীয় শাসনকর্ত্তাদের হাল জানিতেন বলিয়াই—দিল্লী যাইতে স্বীকৃত হন নাই। 'সাহজাহানের আমলে—তাঁহার হুকুম-পত্র রদ

করিতে, কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাই সাহস করিতেন না। আর ঔরঙ্গজেব ত অতবড় জবরদস্ত বাদসাহ ছিলেন—কিন্তু তাঁহার আমলে, বাদসাহী হুকুম সমূহ অতি সহজেই উল্লঙ্ঘিত হইত। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। বঙ্গদেশে কোথায় কি হইতেছে, তাহার কোন সংবাদই তিনি রাখিতেন না। ইহার প্রমাণস্বরূপ, হুগলীর ব্যাপারকে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হুগলী, হিজলী প্রভৃতি স্থানে চার্ণক যে সব বিপ্লব ও বিগ্রহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ যখন ঔরঙ্গজেবের নিকট পৌঁছিল—তিনি হুগলীসহর কোথায়, ইহাই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে বঙ্গদেশের নক্সা তলব করিয়া, তিনি হুগলীর অবস্থান-স্থান নির্ণয় করিলেন। চার্ণক হাতে-কলমে, ঠেকিয়া শিখিয়া, বাদসাহ ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে কি পার্থক্য— তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন। সম্রাট দরবারের উপর তাঁহার তেমন একটা আস্থা ছিল না।* অপর কারণ এই—নবাব সায়েস্তা খাঁ চার্ণকী-আমলের অধিকাংশ সময়ই বাঙ্গালার রাজ-প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁ, অতি জবরদস্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাহার উপর, তিনি সম্রাটের একান্ত বিশ্বাস-ভাজন ও অতি নিকট আত্মীয়। কাজেই তিনি যাহা কিছু সম্রাট দরবারে এতেলা করিতেন, তাহার সত্যতার সম্বন্ধে সম্রাটের মনে কখনও কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।

পাটনা হইতে জব চার্ণক, কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষরূপে নিয়োজিত হন। কৌন্সিলের দ্বিতীয় পদপ্রাপ্তিও এই সময়ে ঘটে। কিন্তু বলা যায় না—কি অব্যক্ত কারণে চার্ণক পাটনা ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই ব্যাপার লইয়া, তাঁহার উপরিতম কর্ম্মচারী ষ্ট্রেন্সাম মাষ্টারের সহিত তাঁহার মনোভঙ্গ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ষ্ট্রেন্সাম, এই ব্যাপারে

---

* জব চার্ণক—১৬৭৮ খৃঃ অব্দের ৬ই জুলাই যে পত্র লেখেন, তাহার একাংশ এই—The King's Hookum is of small value as an ordinary governor. * In our opinion sum of money demanded is very large, considering all circumstances. Had it been another king as Shajahan whose Pharmand and Husbul Hookums were of such great force and finding that none dare to offer to make the least exeption against any af them, it might have seemed somewhat reasonable, but this with king (Aurangzeb) it is the contrary * * (Hedge's Diary Vol II.)

ক্রুদ্ধ-হইয়া, চার্ণককে কাশিমবাজারের কুঠীর-অধ্যক্ষ পদ হইতে অপসারিত করেন এবং হুগলীর কুঠীর দ্বিতীয় সহকারী পদে নিয়োগাদেশ দেন। কিন্তু ষ্ট্রেন্‌সাম মাষ্টারের এই ব্যবহারে, বিলাতের কর্ত্তারা পর্য্যন্ত, তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। ষ্ট্রেন্‌সাম মাষ্টার, শেষ নিজেই পদচ্যুত হন ও বিলাতের কর্ত্তারা চার্ণককে কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন।

পাটনায় অবস্থানকালে, চার্ণকের জীবনে একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কথাটা উপন্যাসের মত অনেকদিন হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছে। কথাটা এই যে, চার্ণক এক হিন্দু-রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘটনাটা কি আমরা সংক্ষেপে বলিব। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে চার্ণক পাটনায় ছিলেন। একদিন তিনি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক সতীদাহের দৃশ্য দেখিতে পান। সতীদাহ-প্রথা, বহুদিন হইতে ভারতের সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর, পত্নী স্বামীবিয়োগ-শোক অসহ্য জ্ঞানে, তাঁহার সহিত জ্বলন্ত চিতায় স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন। আমাদের বঙ্গদেশেও পুরাকালে এ প্রথার বড়ই বাহুল্য ছিল।* যাহারা স্বেচ্ছায় স্বামীর অনুগমন করিতে অস্বীকৃত হইত, তাহাদিগকে জোর করিয়া জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ করা হইত।

চার্ণক, নদীতীরে ভ্রমণকালে দেখিলেন—জ্বলন্ত অনলে আত্মসমর্পণে উদ্যতা, সেই হিন্দুরমণী পরমা সুন্দরী! পূর্ণ যুবতী। চার্ণক তাঁহার প্রহরীগণের সাহায্যে, এই সহগমনোন্মুখ সতীকে উদ্ধার করিয়া, স্বগৃহে লইয়া আসেন ও তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এই রমণীর গর্ভে, চার্ণকের কয়েকটী কন্যা সন্তান হয়। হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত হইলেও, তাহাদের খ্রীষ্টানী ধরণে নামকরণ হয়। চার্ণকের এই তিন কন্যার নাম—মেরী, ক্যাথারিন, এলিজাবেথ। তৎকালের তিনজন পদস্থ ইংরাজের সহিত এই তিন কন্যার বিবাহ হয়। চার্ণকের জামাতা ও কন্যাগণের নাম আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

চার্ণক এই হিন্দু পত্নীর সহিত বহুদিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। চার্ণক অতিশয় পত্নীবৎসল ছিলেন এবং চার্ণকের শত্রুপক্ষীয়েরা বলেন, স্ত্রীকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা দূরে থাকুক, তাঁহার শক্তির অধীনে তিনিই অর্দ্ধ-পৌত্তলিক হইয়া পড়েন। এই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, চার্ণক তাঁহার দেহ, সুতা-

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক এই সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয়।

লুটীতেই সমাধিস্থ করেন। প্রতি বৎসরে তাঁহার মৃত্যুদিনে, পত্নীর সমাধির উপর, চার্ণক একটী করিয়া মোরগ-বলি দিতেন। এ মোরগ-বলি অবশ্য হিন্দুপ্রথা নহে। বেহার অঞ্চলে পাঁচপীরের দরগায়, এরূপ মোরগবলির প্রথা প্রচলিত আছে। * এ কথাও আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি।

ইহাই হইতেছে চার্ণকের হিন্দু-পত্নীর আখ্যান। কিন্তু এ ঘটনা সম্বন্ধে অনেকে অবিশ্বাস করেন, কেহ কেহ আবার সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন। চার্ণকের সমকালীন কয়েকজন লেখক, এই হিন্দুপত্নী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গভর্ণর হেজেস্ই প্রধান। গবর্ণর হেজেস্ তাঁহার ডায়ারীর একস্থানে লিখিয়াছেন "অদ্য প্রাতে একজন এ দেশীয় লোক আমার কাছে অভিযোগ করিতে আসে যে, চার্ণক উনিশ বৎসর কাল ধরিয়া এক হিন্দু-স্ত্রীলোককে নিজের সঙ্গে রাখিয়াছেন এবং এই স্ত্রীলোকের স্বামী অদ্যাপিও জীবিত আছে। হুগলীও কাশিমবাজারের শাসনকর্ত্তা বুলচাঁদ, এই লোককে আমার কাছে পাঠাইয়া দেন। * * * এই হিন্দু ও অন্যান্য দেশীয় লোকের নিকট, তিনিও অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছেন, যে চার্ণক যখন পাটনায় থাকিতেন, তখন একজন হিন্দু স্ত্রীলোক স্বামীর অর্থ ও অলঙ্কারাদিসহ তাহার আবাস ত্যাগ করিয়া চার্ণকের আশ্রয় গ্রহণ করে।" †

চার্ণকের হিন্দুপত্নীগ্রহণ সম্বন্ধে গবর্ণর হেজেস ও তাহার পরবর্ত্তী আলেকজান্দার হ্যামিলটন নামক একজন সমসাময়িক ইতিবৃত্তলেখক যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। হেজেসের কথা আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। হ্যামিলটন এ সম্বন্ধে বলেন,—"মোগলদের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে, চার্ণক এক সতীদাহ দেখিতে গমন করেন। তিনি সেই মরণোন্মুখ যুবতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া এতদূর মোহিত হন, যে তাঁহার সিপাহীদের সহায়তায়, বলপূর্ব্বক সেই রমণীকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজাবাসে আনিয়া, বহুদিন ধরিয়া তাঁহারা পতি-পত্নীরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিয়াছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার কয়েকটী সন্তান সন্ততিও হইয়াছিল।"

* সেণ্টজন চার্চ্চ ইয়ার্ডের পার্শ্বে যে গোরস্থান আছে, সেইস্থানেই চার্ণকের মৃতপত্নীর দেহ সমাধিস্থ হয়। এই গির্জ্জা এখন "পাথুরীয়া-গির্জ্জা" নামে খ্যাত। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ইহা অবস্থিত। আজও দুইশত বৎসরের ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া চার্ণকের এই সমাধিস্তম্ভ অটলভাবে সেই স্থানে বর্ত্তমান। ইহাই কলিকাতার প্রাচীনতম ইষ্টকনির্ম্মিত শিল্প।

† Hedges Diary. ঐতিহাসিক চিত্র—যোগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ (৬৩০)

চার্ণকের হিন্দু-পত্নী গ্রহণ ব্যাপার, কেহ কেহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, আবার কেহ বা ইহা ভিত্তিহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেজেস ও হ্যামিল্টন উভয়ের বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পরবর্ত্তীকালের প্রত্নতত্ত্ববিৎ, মিঃ রেণী, রেভারেণ্ড কেরি, কটন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ একথায় আস্থাস্থাপন করিয়াছেন—কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উইলসন সাহেব ও ফার্মিঙ্গার সাহেব একথা বিশ্বাস করেন নাই।* হেজেস ও হ্যামিল্টন উভয়েই চার্ণকের শত্রু ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা এ উক্তির উপর আস্থাস্থাপনে অনিচ্ছুক। হেজেসের সহিত চার্ণকের মনান্তর কাহিনী আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে, ইংরাজ বণিকগণ নানাদিক হইতে মোগল রাজকর্ম্মচারীগণ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছিলেন। হেজেস্ নানা উপায়ে এ অত্যাচারের প্রতিকার চেষ্টা করিয়াও যখন সফল মনোরথ হইলেন না—তখন তাঁহার মনে একটা ধারণা জন্মিল—"মোগল রাজকর্ম্মচারীদিগকে ক্রমাগতঃ ভয় করিয়া চলিলে—ইংরাজের বণিকবৃত্তির ও ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটিবে। ক্রমাগতঃ উৎকোচ প্রদানে ও তোষামোদে তাঁহাদের বাধ্য রাখাও অসম্ভব। কারণ—এপর্য্যন্ত এইভাবে চেষ্টা করিয়াও ইংরাজপক্ষ সিদ্ধ মনোরথ হন নাই। বাহুর শক্তিতে আত্মরক্ষা করা ভিন্ন, ইংরাজের আর গত্যন্তর নাই। এই বাহুর শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে, সেনাবল সৃষ্টি ও দুর্গ-নির্ম্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন।" এই সকল বিবেচনা করিয়াই, হেজেস্ তাঁহার পদত্যাগের পূর্ব্বে বিলাতের কর্ত্তাদের লিখিয়াছিলেন—"মোগলের সহিত যুদ্ধ ঘোষণাই সমীচিন, এবং স্থানে স্থানে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ-নির্ম্মাণও একান্ত আবশ্যক।" বলা বাহুল্য—এ ব্যাপার সম্বন্ধে জব চার্ণক, হেজেসের সহিত একমত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতের কর্ত্তারা ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রথমে একটু ভয় পাইয়াছিলেন। অপরন্তু হিথ্ ও নিকল্সানের পরবর্ত্তী অভিযান প্রমাণ করিতেছে—যে ভবিষ্যতে তাঁহারা এ সম্বন্ধে চার্ণক ও হেজেসেরই মতাবলম্বী হইয়া কার্য্য করেন।

* Historical and Topographical sketch of Calcutta by H. Rainey—Carey's Good old days of John Company—Cotton's Calcutta—Wilson's Early Annals.

এই সময়ে, মোগল-শাসনকর্ত্তারা ইংরাজদের সহিত নানা বিষয়ে প্রতিকূলতা আরম্ভ করেন। তাঁহারা মনে মনে বুঝিতেন, যে কোন অছিলায় ইংরাজদের পীড়ন করিতে পারিলেই, দুই পয়সা আদায় হইবে। তাঁহারা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যে ইংরাজ-বণিক প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের কৃপাভিখারি, তাঁহাদের অনুকম্পা-প্রার্থী, তাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইবেন। ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁ, নানা বিষয়ে ইংরাজ-বণিকগণকে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন। তাহার একটী প্রমাণ, চার্ণকের সহিত দেশীয় বণিকদের দেনা পাওনা লইয়া বিবাদ ও নবাব সায়েস্তা-খাঁর মীমাংসা। এই ব্যাপারে নবাব, চার্ণক ও তাঁহার সহকারীদের ৪৩ হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। চার্ণক ইচ্ছা করিয়া এ জরিমানার টাকা না দেওয়ার ফল এই হইল, যে তিনি নবাবের আদেশে কাশিমবাজারে নজর বন্দীরূপে রহিলেন। পাছে তিনি কাশিমবাজার হইতে গুপ্তভাবে পলায়ন করেন—তজ্জন্য মোগলের ফৌজ পাহারা দিতে লাগিল।

সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। অত্যাচারের একটা গণ্ডী আছে। মোগল শাসক-সম্প্রদায় সে গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিলেন। এদিকে বিলাতের কর্ত্তারাও তাঁহাদের সংকল্প পরিবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও নবাব সায়েস্তা খাঁকে কিছু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদের অন্ততঃ একথাটাও বুঝিতে দেওয়া উচিত, যে প্রয়োজন হইলে ইংরাজেরা আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন। বিলাতের কর্ত্তারা তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, তৎকালীন ইংলণ্ডাধিপতি দ্বিতীয় জেমসের অনুমতি গ্রহণ করেন। ইহার ফলে, নিকলসনের অধীনে কামান সজ্জিত ছয়শত সেনাপূর্ণ নয়খানি যুদ্ধ-জাহাজ ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল।

বিলাতের কর্ত্তারা নিকলসনকে আদেশ দিলেন—"মান্দ্রাজে পৌছিয়া তথা হইতে আরও চারিশত সেনা লইয়া বালেশ্বরে যাইবে। তৎপরে চট্টগ্রাম বন্দর দখল করিবে। আরাকানের রাজা মোগলের শক্র। তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া চট্টগ্রাম দখল করিবে। চট্টগ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর, ইংরাজগণ নবাবের আবাসস্থান, মোগলের রাজধানী ঢাকা অধিকার করিবেন। ঢাকা অধিকার করিলেই, মোগল বাধ্য হইয়া—সন্ধি করিবে।"

বিলাতের কর্ত্তারা, ভাবী সন্ধিপত্রের একটী খসড়া পর্য্যন্ত করিয়া দেন। তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের প্রদত্ত ফারমানগুলি যাহাতে বলবৎ হয়, তাঁহারা বিনা বাধায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিতে পারেন, তাঁহাদের নিজের টাঁকশালে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে পারেন, এ সব প্রস্তাবও ছিল।

এদিকে জব চার্ণক ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে কাশিমবাজার হইতে—পলায়ন করিয়া হুগলীতে আসিলেন। হুগলীতে আসিবার পরই, তিনি সংবাদ পাইলেন, নিকলসন ছয়শত সেনা সমেত ভারতে আসিতেছেন। চার্ণক এতদিন মুখ বুঝিয়া অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার প্রভু ডিরেক্টারেরা—তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া, মোগলের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সেনা-প্রেরণ করিতেছেন—এ সংবাদে তাঁহার প্রাণে অনেকটা সাহস আসিল। ঐ বৎসরে, চারিশত নূতন ইংরাজ-সৈন্য হুগলীতে পৌঁছিল।

নবাব সায়েস্তা খাঁও শুনিলেন—ইংরাজেরা চারিশত সেনা আনিয়া হুগলীতে জড় করিয়াছে। যাহাতে তাঁহারা কিছু করিতে না পারেন, এইজন্য তিনি তিন সহস্র পদাতিক ও তিনশত অশ্বারোহী মোগল-সেনা হুগলীতে পাঠান। তখন আবদুল গণি—হুগলীর ফৌজদার। লোকটা বড়ই অব্যবস্থিত চিত্ত। আবদুল গণি—প্রকারান্তরে গায়ে পড়িয়া ইংরাজদের সহিত ঝগড়া বাধাইলেন। সে বিবাদের কারণ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হুগলীর বাজারে প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি কিনিতে গিয়াই, মোগল সৈন্যের সহিত ইংরাজ-সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। জব চার্ণক, নিকলসন ও লেস্‌লীকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষই জয়ী হন। ফৌজদার, হুগলী ছাড়িয়া পলায়ন করেন। ইংরাজপক্ষে একজন লোক হত হয়—মোগলপক্ষে ষাট জন লোক মরে।

ফৌজদার ভয় পাইয়া, চার্ণকের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। চার্ণক তখন কোম্পানীর জাহাজ সমূহে সোরা বোঝাই করিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন—হুগলীতে মালামাল রাখা নিরাপদ নহে। সোরাগুলি অনেক টাকার মাল। এ গুলি মান্দ্রাজে জাহাজ ভরিয়া পাঠাইতে পারিলে—সকল দিকে মঙ্গল। এজন্য তাঁহার সময়ের বড়ই প্রয়োজন। কাজেই তিনি সন্ধির—প্রস্তাবে কোনরূপ অমত করিলেন না।

চার্ণক হুগলীতে দুইমাস থাকিয়া, সোরা বোঝাই শেষ করিয়া হুগলী ত্যাগ করিলেন।

হুগলী ত্যাগের পর, হিজলী অবরোধ ব্যাপার,—চার্ণকের জীবনে একটী উজ্জ্বলতম ঘটনা। হিজলীর ব্যাপারে তিনি যেরূপ অত্যধিক সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধিকৌশল দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। যে মোগল-সুবাদার ইচ্ছা করিলে, অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ দ্বারা, তাঁহার ধ্বংসসাধন করিতে পারিতেন—তিনিও তাঁহার কূটবুদ্ধি কৌশলে পরাজিত হইলেন। ইংরাজের সমরশক্তি, বঙ্গদেশে প্রথম জ্যোতির্ম্ময় স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ করিল। মোগল-রাজশক্তির—নিকট বাহুবলের শক্তি দেখাইয়া, চার্ণক সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও নবাব সায়েস্তা খাঁকে স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—"ইংরাজশক্তি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। প্রয়োজন হইলে, তাহারা আত্ম-স্বার্থ রক্ষার জন্য, অস্ত্র পর্য্যন্ত ধরিতে পারে।"

সায়েস্তাখাঁর পর,—নবাব ইব্রাহিম খাঁ বঙ্গদেশের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা হইয়া আসেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কাশ্মীর, লাহোর, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁ—অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। চার্ণক সুতালুটীতে আশ্রয় লইবার এক বৎসর পরে, তিনি তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত সম্রাট-স্বাক্ষরিত ফারমান আনাইয়া দেন। এই ফারমানের বলে, চার্ণক সুতালুটীতে ইংরাজের বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত করিয়া, অসংখ্য সৌধমালাবেষ্টিত, ইন্দ্রপুরী তুল্য বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পাঠক! একবার কল্পনার সাহায্যে সেই ১৬৯০ সালের আগষ্ট মাসের সুদূরবর্ত্তী স্মৃতিকে একটু পরিস্ফুট করিয়া তুলুন। গভীর বর্ষার প্রখর তেজে, জাহ্নবী উন্মাদিনীর মত সাগরসঙ্গমে ধাবমানা—আশে পাশে গ্রাম নগর কিছুই নাই। চারিদিকে হিংস্র শ্বাপদপূর্ণ ভীষণ জঙ্গল ও নক্র কুম্ভীর সর্পাদিপূর্ণ বাদা ও বিলভূমি! রাত্রে হিংস্রপশুর ভীম-ভৈরব গর্জ্জন। আর পার্শ্ববাহিনী ভাগিরথীর তরঙ্গরাজির তাণ্ডব নৃত্য। সেই বর্ষাধারা-প্লাবিত অপরাহ্নে, চার্ণক ধীরে ধীরে জাহাজ হইতে নামিলেন। তীরে আসিলেন। দেখিলেন,—তাঁহাদের পূর্ব্ব নির্ম্মিত হাটচালা গুলির চিহ্নমাত্র নাই! বিষণ্ণমনে—এক নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া, চিন্তান্বিত চিত্তে নিরাশাপূর্ণ হৃদয়ে—তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের অবস্থা চিন্তায় বিভোর হইয়া, তিনি পাইপের ধূমপানে আত্মহারা।

আরও ভাবুন—এই সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পরে, সেই জঙ্গলময় সুতানুটীর বর্ত্তমান গৌরবময় অবস্থা। পুরাকালের সে সুতানুটী নাম নাই—সে ভীষণ জঙ্গল নাই—সে শ্মশান ভীতিদায়ক, হৃদয়স্তম্ভনকারী, বনভূমির দৃশ্য নাই। এখন সেই স্থানের চারি পাশে, কঙ্কর ও প্রস্তরমণ্ডিত প্রশস্ত রাজপথ। রাজপথের দুই ধারে উজ্জ্বল গ্যাসের আলো। গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোকে উজ্জ্বলিত, প্রাসাদতুল্য সৌধরাজি। বিশাল সর্ব্বত্রই কর্ম্ম-জগতের মহামন্ত্র প্রণোদিত, উৎসাহ উদ্যম ও বাস্তভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি। প্রত্যেক সমুচ্চ অট্টালিকাশীর্ষে, ইংরাজ জাতির বিজয়-নিশান। যেন মায়াবলে, এই দুইশত তেইশ বৎসরের মধ্যে, সেই প্রাচীন সুতানুটী, গোবিন্দপুর, কলিকাতার স্মৃতি লোপ করিয়া,এক বৈজয়ন্তী শোভাসম্পদপূর্ণ আদর্শ রাজধানী নির্ম্মিত হইয়াছে। এ জনসংঘময়ী সৌধ-শোভাসম্পন্ন কলিকাতা রাজধানী, যদি ইংরাজ-জাতির গৌরব, ইংরাজ সম্রাটের গৌরব এবং কীর্ত্তির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে জব চার্ণক যে গৌরবের অংশ পাইতে সম্যক অধিকারী। *

চার্ণকের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া,বর্ত্তমান কলিকাতায় বিশেষ কোন কিছুই নাই। আছে কেবল—গির্জ্জার কোমল মৃত্তিকা বক্ষে তাহার সমাধিস্তম্ভ, আর সে কালের লাল-দীঘি। কিন্তু এই কলিকাতার অস্তিত্ব যতদিন থাকিবে, ততদিন চার্ণকের স্মৃতি লোপ হইবে না।

এখন যেখানে সেণ্ট-জন চর্চ্চ বর্ত্তমান আছে, তাহা সেই অতীতকালে একটী নদীতীরবর্ত্তী গোরস্থান ছিল। আজকাল যাহা ষ্ট্রাণ্ড-রোড বলিয়া পরিচিত, পূর্ব্বে তাহা ভাগিরথী-গর্ভে ছিল। যে সকল জাহাজ ভাগিরথী-পথে—সে কালের কলিকাতা সুতানুটী প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া, সমুদ্রে যাতায়াত করিত, তাহাতে কোন লোকজন মরিলে, এই নির্জ্জন স্থানে গোর

* চার্ণক সম্বন্ধে, প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক পরলোকগত উইলসন সাহেব, আমাদের সমাদ্দার মহাশয়কে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা ঐতিহাসিক চিত্র হইতে সেইটুকু প্রয়োজনীয় বোধে এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম। "For my part, I am prepared to forget the minor blemishes and remember only his resolute determination, his clear-sighted wisdom, his honest self—devotion and so leave him to sleep in the heart of the city, which he founded looking for a blessed resurrection and the coming of him by whom, he ought to be judged. সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব বলেন—"He was a man who had a great and hard task to do and who did it—did it with small thought of self and with a courage which no danger could daunt nor any difficulties turn aside. It was his lot to found unthanked a capital. (Sir William Hunter's History of British India Vol 11.).

দেওয়া হইত। সুতালুটীতে আসিবার পর, খুব সম্ভবতঃ ইংরাজেরা এই স্থানটী সীমা বেষ্টিত করিয়া লয়েন। এই সেণ্টজন গির্জ্জা, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে নির্ম্মিত।

চার্ণক যখন সুতালুটীতে দ্বিতীয়বার আসেন, সেই সময়ে তিনি অস্থায়ী ভাবে কয়েকখানি মাটির দেওয়াল দেওয়া, আশ্রয়স্থান করিয়া যান। কিন্তু সে সব মাটীর ঘর, রক্ষকশূন্য অবস্থায় বহুদিন পড়িয়া থাকায়, তাহার কিছুই ছিল না। চার্ণক, উলুবেড়িয়া হইতে নবাব ইব্রাহিম খাঁর আহ্বানে, যখন পুনরায় সুতালুটীতে আসেন, তখন সেই গৃহগুলির শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরও, চার্ণককে ঘর-দ্বারের জন্য বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কারণ সুতালুটীর কৌন্সিলের প্রথম অধিবেশনে যে মন্তব্য তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তখনকার অবস্থা বিশেষ রূপে প্রতীয়মান হয়। এই সভায় জব চার্ণক, মিঃ ফ্রান্সিস্ ইলিস, মিঃ জেরিমিয়া পিচি প্রভৃতি সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মন্তব্যের একাংশ এই—"আগে যে সমস্ত ঘরবাড়ী ছিল, সেগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, পুনরায় কতকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। একটী মালগুদাম, একটী রান্নার ও খাইবার ঘর, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের থাকিবার স্থান, প্রহরীদের বাসস্থান ও এলিস সাহেবের আবাসস্থান নির্ম্মাণ করা অতি শীঘ্রই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এজেণ্ট ও মিঃ পিচির পূর্ব্বকার আবাসস্থানের কতকটা এখনও আছে—এটা মেরামত করিয়া লইলেই চলিবে। চারিদিকে মাটীর দেয়াল ও চালাঘর করিয়া এখন চালাইতে হইবে। যতদিন আমরা স্থায়ীভাবে ফ্যাক্টরী-গৃহ স্থাপনের স্থান না পাই, ততদিন এই ভাবেই চালাইতে হইবে।" *

* The right Worshipful Agent Charnock, Mr. Francis Ellis and Mr. Jeremiah Peachie duly resolved—"in consideration that all the former buildings here are destroyed to build as cheap as possible a warehouse a dining-room, a cook-room, an apartment for Company's servants and a Guard room, also a house for Mr. Ellis. The Agent and Mr. Peachie's houses which were part standing to be repaired as also the secretary's office—these to be done with mud walls and thatched till we can get a ground whereon to build a factory (Calcutta Past and Present by Kathleen Blechynden P. 9.).
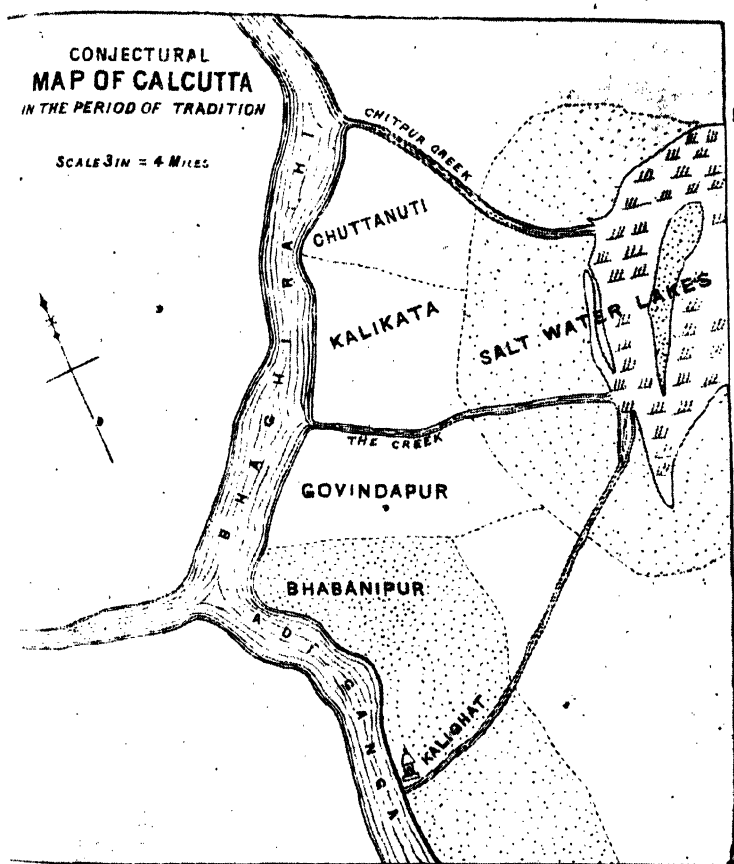
অতি প্রাচীনকালের কলিকাতা, কালীঘাট ও আদি গঙ্গা।

(তিন শত বৎসর পূর্ব্বের)

এই কয়েকখানি চালাঘরের কল্পনাতেই, অগণিত গগণস্পর্শী সৌধরাজি মণ্ডিত, বিদ্যুতালোকিত, অমরাপুরীর ন্যায় বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত, বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। চার্ণকের নির্ম্মিত এই কয়খানি চালাঘরই, ভারতে ইংরাজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী। বর্ত্তমান মহানগরী কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী।

পূর্ব্বে কালীঘাট প্রসঙ্গে, আমরা লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের কথা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। এই লক্ষ্মীকান্তই বেহালা-বড়িসার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারদের আদি পুরুষ। কালিঘাটের কালিকাদেবী, এই লক্ষ্মীকান্তের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। লক্ষ্মীকান্ত যশোরেশ্বর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের অধীনে কাজ করিতেন। লক্ষ্মীকান্ত, কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় (ব্রহ্মচারীর) সন্তান। আর এই কামদেব ব্রহ্মচারী মহারাজ মানসিংহের গুরু। যে তিনজন ব্যক্তি বঙ্গ-বিজয়ে প্রধান সহায় ছিলেন, মহারাজ মানসিংহ তাঁহাদের প্রত্যেককেই প্রচুর পুরস্কার ও বাদসাহ সরকারে চাকরী দেন। জয়ানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত ও ভবানন্দ এই তিনজনই মহারাজ মানসিংহের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। মানসিংহ ইহাদের তিনজনকেই "মজুমদার" পদবী প্রদান করিয়া, বঙ্গের কর-সংগ্রাহক জমিদার করিয়া দেন। ভবানন্দ, অতি ভীষণ বিপদে, খাদ্যদানে মানসিংহের সেনাগণের প্রাণরক্ষা করেন। এই ভবানন্দ মজুমদারই, কৃষ্ণনগর রাজ-বংশের আদিপুরুষ। জয়ানন্দ—মানসিংহের আদেশে, তাঁহার গুরুপুত্র লক্ষ্মী-কান্তকে খুঁজিয়া বাহির করেন বলিয়া, মজুমদার উপাধি পান। আর লক্ষ্মী-কান্ত গুরুপুত্র বলিয়া জমিদারী লাভ করিয়া মজুমদার হয়েন। এই লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামের জমিদার ছিলেন। মাগুরা, খাসপুর কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর হাভেলিসহর, হাতিয়াগড় প্রভৃতি পরগণা তাঁহার দখলে ছিল। কালিকাদেবীর সেবায়েৎ বলিয়া, তিনি কলিকাতা পরগণা খাসে রাখিয়াছিলেন। *

এই লক্ষ্মীকান্তের জমিদারী কাছারী কলিকাতার মধ্যে ছিল। বর্ত্তমান লালদীঘি ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগই, লক্ষ্মীকান্তের জমীদারীর কাছারি-বাটীর সীমানা ও পুখুর। এই পুখুরের অনতিদূরে, শ্যামরায়-বিগ্রহের মন্দির ছিল। এই বাগানের অতি সান্নিধ্যে, লক্ষ্মীকান্তের ইষ্টক নির্ম্মিত

* The bulk of Parganas, Magura, Khaspur, Calcutta, Paikan, Anwarpur Habelishahar and Hatiagar which were given to Lakhmikanta, remained in his family at the Permanent Settlement. (Proceedings of Lord Cornwallis dated 24th July 1788 quoted by Mr. A. K. Roy.

কাছারীবাড়ী। এই কাছরি বাড়ীটিই কেবলমাত্র—ইটের গাঁথুনী, আর বাকী সব চালাঘর। জব চার্ণক, চেষ্টা করিয়া, এই পাকা কাছারি বাড়িটী জমীদারদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, তন্মধ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ও বহুমূল্য দ্রব্যজাত রক্ষা করেন। কারণ তখনও তাঁহার প্রস্তাবিত গৃহগুলি নির্ম্মিত হয় নাই।

সেকালে মহাসমারোহে মজুমদার জমীদারদের, শ্যামরায়ের দোলোৎসব হইত। শ্যামরায়—লক্ষ্মীকান্তের বংশধরদিগের গৃহ-দেবতা। এখন এই শ্যামরায় কালীঘাটে আছেন। শ্যামরায়ের দোলের সময়—এত আবির কঙ্কুমের ছড়াছড়ি হইত, যে পূর্ব্বোক্ত দীঘির জল লাল হইয়া উঠিত। এই জন্য ইহার "লালদীঘি" নামকরণ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, ইংরাজেরা লালরঙ্গের পাকাইটের দ্বারা পুরাতন "ফোর্ট উইলিয়াম" দুর্গের পোস্তা ও দেয়াল তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সেই লাল-ইটের প্রাচীরের রং, দীঘির জলে প্রতিফলিত হইয়া একটা গাঢ় লোহিত বর্ণের প্রতিবিম্ব-সৃষ্টি করিত বলিয়া, লালদীঘি নাম হইয়াছে। *

উত্তরে দক্ষিণেশ্বর—আর দক্ষিণে বেহালা. এই ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকৃতি বৃহৎমণ্ডলই সাবর্ণদের জমীদারী ছিল। সাবর্ণদিগের পুরাতন কাগজপত্র ও পারিবারিক আখ্যানাদি হইতে জানা যায়, যে চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী কালীও তাঁহাদের সম্পত্তি। হইতে পারে, বহুপূর্ব্বে চিতে-ডাকাত, জঙ্গলের মধ্যে এই কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—কিন্তু পরে ইহা সাবর্ণদেরই হস্তগত হয়। জমীদারের লাঠির জোরে, ডাকাতেরা হয়তঃ ইহার স্বত্বত্যাগ করিয়াছিল। সেই পুরাকালে, চিত্রেশ্বরীর মন্দির হইতে, একটী রাস্তা—গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া, যাত্রী-পথরূপে বরাবর কালীঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই পথটীকে সেকালের ইংরাজেরা Pilgrim's Track বলিতেন। ইহাই বর্ত্তমান কালের, ট্রামঘণ্টা-নিনাদিত, চিৎপুর-রোড। এই রাস্তাটী অতি ক্ষুদ্র ও ভীষণ জঙ্গলের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সেকালের এই ক্ষুদ্র যাত্রী-পথটী—আজকালকার চিৎপুর রোড, বেণ্টিঙ্কষ্ট্রীট হইয়া একটী খালের নিকট গিয়া শেষ হয়। ইহাই গোবিন্দপুর-ক্রীক বা খাল বলিয়া পরিচিত। আবার এই পথ, খালের অপর পার হইতে আরম্ভ

* আবার অন্যমতে শেঠদিগের গোবিন্দজী ঠাকুর এই স্থানে ছিলেন। তাঁহারই দোলোৎসবে মহাসমারোহে হইত। তাঁহাদের দোলোৎসবের আবির ছড়াছড়ির জন্য পুকুরের জল, লাল হইয়া যাইত। ইহা হইতে লালদীঘি নামের উৎপত্তি শেঠেরা অবশ্য এই কথাই বলিয়া থাকেন।

হইয়া সরাসর চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়া, ভবানীপুর ভেদ করিয়া কালীঘাটে গিয়াছিল। *

সাবর্ণগণের পারিবারিক কাহিনী হইতে আমরা জানিতে পারি, যে এই শ্যামরায় ঠাকুর, সেই পুরাকালের জঙ্গল-বেষ্টিত প্রাচীন কলিকাতার মধ্যে খুব নামজাদা বিগ্রহ ছিলেন। সাবর্ণ মহাশয়েরা, তখন খুব দানধ্যান করিতেন। এক চন্দ্রাতপের (অপরার্থে ছত্র বা ছায়া-প্রদানকারী আবরণ) নিম্নে—তাঁহাদের ঠাকুরের ভোগ বিতরিত হইত। এই প্রসাদ লইবার জন্য, দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে অনেক লোক আসিত। "ছত্র" বা "চন্দ্রাতপের" নিম্নে এই "লুট" বা "প্রসাদ" বিতরণ করা হইত বলিয়া, এইস্থান "ছত্রলুট" আখ্যা ধারণ করে। † এই ছত্রলুটের ক্রমশঃ অপভ্রংশ হইয়া, ইহা সুতালুটীতে দাঁড়াইয়াছে। ইহাই সুতালুটী নাম হইবার সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ। আবার অন্য কিম্বদন্তী হইতে আমরা জানিতে পারি, যে অধস্তনকালে শেঠ-বাসকদের হাট, এই স্থানেই স্থাপিত হয় এবং তথায় "সুতার-লুটী" বিক্রয় হইত বলিয়া, ইহা "সুতালুটী" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা শেঠ-বসাকদের উক্তি। ইংরাজদের পুরাতন সেরেস্তায় "ছত্র-লুট" নাম কোথাও নাই—"সুতালুটী" আছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেরেস্তায় একখানি পুরাতন Letter Book বা বিলাতী-চিঠির বহি ছিল। এখান হইতে যে সব চিঠিপত্র বিলাতে যাইত, তাহার নকল ইহাতে থাকিত। এখানি এখন বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে অতি জীর্ণাবস্থায় রক্ষিত। ইহাতে ১৭০০ খৃঃ অব্দের চিঠিপত্রের নকল আছে। সেই সমস্ত চিঠিপত্র "সুতালুটী" হইতে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত আছে। জব চার্ণকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পর এবং এই ১৭০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে—আর একখানি পুরাতন

* A. K. Roy's—History of Calcutta.

† "ছত্র" "দানছত্র" "হরিহরছত্র" "জলছত্র" প্রভৃতি তুলনা করিয়া দেখুন। এবং হরিরলুটের অপভ্রংশ মেয়েলী কথা—"হরিরলুট" কথাটিও তুলনার সমালোচনা ভাবুন। ছত্র আবার অনেক স্থলে "সত্র" এই ভাবেও উচ্চারিত হয়। এই সমস্ত নামের গোলমাল সেকালের ইংরাজেরাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এদেশের ভাষা বুঝিতেন না—কাণে যে শব্দটা আসিত তাহাই ইংরাজী অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিতেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—সেকালের কাগজ পত্রে তাঁহারা সায়েস্তা খাঁকে—Cha-esta-cawn, সাজাহানকে—Chazahn, মিজ্জা মমিনকে—Mersy Momien আবার কোন সময়ে Shosta Khan ইহাও করিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে পাঠকই বিচার করিয়া লইবেন—"ছত্রলুট" হইতে সুতালুটী কিম্বা সুতার-লুটি হইতে সুতালুটি হওয়ায় কোনটি বিশেষ সম্ভবপর।

চিঠির-বহি ব্যবহৃত হইত। সে বহিখানি ঘটনাচক্রে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জব চার্ণকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পূর্ব্বে ও পরে "সুতানুটী ডায়ারি" (১৬৮৮) ও "সুতানুটী কন্সলটেসনস্" বা মন্ত্রণাসভার বহি (১৬৯০) এখনও বিলাতে সুরক্ষিত। উল্লিখিত কারণ সমূহের মধ্যে যে কোন কারণেই হউক না কেন—সেই সময়ে—কলিকাতা প্রভৃতি গ্রাম, সুতানুটী বলিয়াই সাধারণ সংজ্ঞায় পরিচিত ছিল। *

যাহাই হউক না কেন—সাবর্ণ মহাশয়েরা, সেই পুরাকালে কলিকাতার জন-সংখ্যা বৃদ্ধি ও আংশিক উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্যামরায়জীউর উৎসব উপলক্ষে, সাময়িক অনেক হাট-বাজার ও মেলার অনুষ্ঠান হইত। তাঁহাদের শ্যামরায় বিগ্রহের দোল-যাত্রা উপলক্ষে, তৎকালের উপযোগী, একটা জাঁকালো মেলা লালদীঘিতে বসিত। এই শ্যামরায়ের দোলের উৎসবক্ষেত্র ছিল বলিয়াই বোধ হয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির লালদীঘি, রাধাবাজার, লালবাজার ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছিল। হাটতলা ও তদপভ্রংশ হাটখোলা, বড়বাজার (বুড়াবাজার- বুড়ো শিবের বাজার) ইত্যাদি আখ্যাও এই ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাচীনকালের যখন কোন ধারাবাহিক ইতিকথা নাই, তখন চলিত কিম্বদন্তী সমূহের উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। †

জব চার্ণক—মজুমদারদের এই পাকা কাছাড়ি-বাড়ীটি, কোম্পানীর

---

* Burnell and Yule's Glossary of Anglo Indian Terms—Bengal and Agra Gazzetteer Vol. II. p. **11.** p. 329. Wilson's Early **Annals.**

† They (the Savarnas) mention, that it was from the annual holi festival of this very Sham Roy and his spouse **Radha**, during which a vast quantity of red-powder (Kunkum) **used** to be sold and scattered in and around their Cutcherry Tank, the temporary bazars erected for the occassion that Laidighi, Lalbazar and Radhabazar derive their names * * The old Zeminders of Calcutta further claim, that it was the Hat and Bazar round their idols and their pucca Zamindary Cutcherry west of the tank, that gave Calcutta its original importance and gave rise to the names of Hattola, latterly currupted into Hatkhola and Burrabazar (Bura being familiar name of Siva) and it was the doles near Kali's temple that attracted a large population and contributed to the reclamation and cultivation of marsh and jungle and that their culverts, landing-ghat and roads with a shady avenue of trees on both sides formed the only adornment of Rural Calcutta in its Early days. (**Mr. Roy's Calcutta** Census Report.)

সরেস্তা রাখিবার জন্য ভাড়া করিয়া লয়েন। এই কাছারি বাড়ীই কলিকাতার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আফিস-গৃহ। কলিকাতার পুরাতন "ফোর্ট উইলিয়ম" দুর্গ নির্ম্মিত হইলে ১৭০৬ খৃঃ অব্দে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।*

সেকালের চৌরঙ্গীর কথা এস্থলে একটু বলা প্রয়োজন। অনেকের মতে, জঙ্গল-গিরি চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী হইতেই, এই চৌরঙ্গী নাম হইয়াছে। জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গীর প্রবাদ, কেহ বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন—কেহ বা তাহাতে অনাস্থা প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন---জঙ্গল-গিরি বর্ত্তমান কালীমূর্ত্তির মুখের প্রস্তরখানি কুড়াইয়া পান। পোস্তা হইতে কালী-মূর্ত্তির অংশভুক্ত যে প্রস্তরখণ্ড কাপালিকগণ কর্ত্তৃক গভীর জঙ্গল মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল—একটী প্রবাদ মতে চৌরঙ্গী সন্ন্যাসীর আবিষ্কৃত মুখ প্রস্তর খানি তাহা বই আর কিছুই নহে। হঠ-প্রদীপ গ্রন্থে চৌরঙ্গীগিরির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উইলসন্ সাহেবও তাঁহার "হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন---"আদিনাথ গোরক্ষের পর চৌরঙ্গী, ষষ্ঠ বংশীয় শিষ্য ও ভক্ত কবীরের সমকালবর্ত্তী। এই কবীর সুলতান ইব্রাহিম লোদির দ্বারা সম্যকরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুলতান লোদির রাজত্বকাল।" ১৫২০ হইতে ১৫৩০ খৃঃ অব্দে সম্ভবতঃ শেঠ-বসাকেরা গোবিন্দপুরে আগমন করেন। বাবু গৌরদাস বসাকের মতে—দশনামী শৈবসন্ন্যাসী চৌরঙ্গীগিরি, সশিষ্য গঙ্গাসাগর যাইতেছিলেন। গঙ্গাতীরে কালীর প্রস্তর-খোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া, উক্তস্থানে কুটীর বাঁধিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করেন। কিয়ৎকাল পরে জঙ্গলগিরি নামক তাঁহার এক শিষ্যের হস্তে, কালীপূজার ভার দিয়া তিনি গঙ্গাসাগরে চলিয়া যান। প্রস্তর-ফলক প্রাপ্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই, যে চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী একদিন দেখিতে পাইলেন, যে গভীর বনমধ্যে একটী নির্জ্জন স্থানে এক পয়স্বিনী গাভী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার বাঁট হইতে অজস্র দুগ্ধধারা নিম্নস্থ একটী স্থানের উপর পড়িতেছে। ইহাতে সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া, সন্ন্যাসী সেই স্থান খনন করিতে করিতে কালীর প্রস্তরময় মুখ প্রাপ্ত হন।

* The year 1706 had already witnessed the destruction of the Cutcherry which had sheltered the Company's Records since the days of Charnock and the erection of a more imposing factory building. (The Old Fort and the Blackhole—Cotton 431.)

চৌরঙ্গী ও তাঁহার শিষ্যগণ ঘোর শাক্ত ছিলেন। আগমবাগীশের পরই সমগ্র বঙ্গে শিব ও শক্তি পূজার এবং তন্ত্রাচারানুমোদিত ক্রিয়াদির বড়ই প্রাদুর্ভাব হয়। আমরা একজন অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি—যে সেই সময়ে চৌরঙ্গীর জঙ্গল * ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সীমার মধ্যে, চারিটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসীরাই ইহার পূজা করিতেন। এই কয়টী শিবলিঙ্গের মধ্যে দুইটীর অস্তিত্ব এখনও আছে। (১) নকুলেশ্বর—তিনি এখন সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ হইয়া কালীঘাটে বিরাজ করিতেছেন। আগে ইনি পর্ণকুটীরের মধ্যে রক্ষিত ছিলেন—তৎপরে তারাচাঁদ শিথ, ইহাঁর বর্ত্তমান মন্দির করিয়া দেন। (২) জঙ্গলেশ্বর মহাদেব—হরিণবাড়ীর নিকটস্থ জঙ্গলে এই শিব ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি—এই জঙ্গলেশ্বর, ভবানীপুর কাঁশারী পাড়ার কোন স্থানে আছেন। সম্ভবতঃ এই লিঙ্গমূর্ত্তি চৌরঙ্গী গিরির শিষ্য জঙ্গলগিরির প্রতিষ্ঠিত। (৩) "চৌরঙ্গীশ্বর" মহাদেব। একটী চলিত প্রবাদ এই, বর্ত্তমান এসিয়াটিক সোসাইটী-গৃহ যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানেই "চৌরঙ্গীশ্বর" শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান ছিলেন। সোসাইটীর বাটী নির্ম্মাণের পর, দরোয়ানেরা একটী ক্ষুদ্র মণ্ডপ, নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পরে উক্ত সোসাইটীর একজন সভাপতির আদেশে তাহা স্থানান্তরিত হয়। (৪) নঙ্গরেশ্বর—ইহার অপভ্রংশ নাম "লাঙ্গলেশ্বর"। এই নঙ্গরেশ্বর মহাদেব এখনও বর্ত্তমান। বড়বাজার লোহাপটীর নিকট বাসন-পটীর মোড়ে, পান-পোস্তার কাছে ইহার মন্দির এখনও রহিয়াছে। কয়েকজন উড়িয়া-পাণ্ডা এখন ইহাঁর পূজক। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শঙ্খ ঘণ্টা নাদে এখনও ইহাঁর আরতি হয়। তখনকার কালের ভাগিরথী, বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ড রোড পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিলেন। নদীর ধারেই নঙ্গরেশ্বরের মন্দির। অবশ্য

* কলিকাতার বর্ত্তমান লালদিঘীর দক্ষিণ হইতে সুদূরে দক্ষিণপ্রান্তব্যাপী এক জঙ্গল বহুকাল হইতে বর্ত্তমান ছিল। চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক কালীমূর্ত্তি আবিষ্কার অথবা জঙ্গলেশ্বর প্রভৃতি শিবপ্রতিষ্ঠার পরই ইহা "চৌরঙ্গী-জঙ্গল" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। হলওয়েলের সময়ে চৌরঙ্গী-জঙ্গল,মধ্যে একটি রাস্তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পলাশীযুদ্ধের পাঁচ বৎসর আগে লিখিত হলওয়েলের বৃত্তান্ত হইতে প্রকাশ—"The road leading to Collygot (Kalighat) and Dee Calcutta" এই জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতে দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে মীরজাফরের পুত্র মীরণ, কোম্পানীকে যে কলিকাতার নূতন সনন্দ দেন, তাহাতে চৌরঙ্গীর জঙ্গল কতকাংশ, কলিকাতার মধ্যে, আর কতকাংশ পাইকান পরগণার মধ্যে বলিয়া উল্লিখিত ছিল। এই চৌরঙ্গীজঙ্গলে বড় ডাকাতের ভয় ছিল—পালকীওয়ালারা রাত্রে এ জঙ্গল পথের মধ্য দিয়া সওয়ারী লইত না—বা সওয়ারী লইলে ডবল ভাড়া চাহিত। রাত্রিকালে দলবদ্ধ না হইয়া কেহই এ পথে আসিত না।

সে সময়ে সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। সুতানুটী হাটের নিকটেই চালা ঘরের মধ্যে এই মন্দির ছিল। যে সকল হাটুরিয়া ও ব্যবসায়ীরা সুতানুটীর ঘাটে নৌকা লাগাইত বা সেই স্থানে নঙ্গর করিত, তাহারা এই নঙ্গরেশ্বরের পূজা দিত।

মোটের উপর এই টুকু বুঝিতে পারা যায়, যে সাবর্ণ-চৌধুরী জমীদারদের দ্বারা সেই জঙ্গলময় কলিকাতার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। কালীঘাটের হালদার-বংশের আদি পুরুষগণ অর্থাৎ রামগোবিন্দ, রামশরণ ও যাদবেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ দ্বারা, গোবিন্দপুর গ্রামে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসবাস হয়। চিত্রপুর (চিৎপুর) ছত্রনুট (সুতানুটী) গোবিন্দপুর চেরাঙ্গী (চৌরঙ্গী) ভবানীপুর ও কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থদের বসবাসের পরিচয়ও এই পুরাকালে পাওয়া যায়। সাবর্ণেরা ও শেঠ-বসাকেরা, অনেক বন-জঙ্গল কাটাইয়া ফেলেন। শেঠ-বসাকেরা তাহাদের ব্যবসার খাতিরে, আর সাবর্ণেরা তাহাদের কলিকাতা জমীদারীর জন্যই, ইহার উন্নতিকল্পে বেশী মনোযোগী হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, পর্টুগীজ, দিনেমার, আরমানি ব্যবসায়ীদের দ্বারাও সেই প্রাচীন কলিকাতার জন সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রপিতামহ, রুক্মিণীকান্ত দেব মহাশয়, নাবালক সাবর্ণ-চৌধুরী জমীদার কেশবরায়ের সম্পত্তির ম্যানেজার ছিলেন। ইনিও এই সময়ে কলিকাতায় বাস করেন। ইহা ছাড়া কলিকাতা এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে মনোহর ঘোষ বলিয়া একজন কায়স্থ বাস করিতেন। ইনি চিৎপুরবাসী দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের পূর্ব্বপুরুষ। হলওয়েলের আমলে * "ব্লাক-জমীদার"

---

* Amongst the Hindu residents of the time in Calcutta and its neighbouring villages we find mention in the traditions of Calcutta, of Manohar Ghosh, an ancestor of Dewan Srihari Ghosh at Sibpur, of a predecessor of Gobindram Mitter who acted as the "Black Zaminder" under Holwell at Chuttanutti of Govinda Saran Dutt and Punchanan Tagore ancestors of the Dutts and the Tagores of Hatkhola and Pathuriaghata respectively settled at Chuttanutty and Govindpur শেঠেরা যেমন বলিয়া থাকেন, তাহাদের গৃহ দেবতা "গোবিন্দজীউ" হইতে গোবিন্দপুর নামোৎপত্তি আবার দত্তবংশীয়েরা ও সেইরূপ বলেন, যে গোবিন্দশরণের নাম হইতে গোবিন্দপুর হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্তদিগের কথা প্রামাণিক নহে। শেঠেরা দত্তদের বহুকাল পূর্ব্বে গোবিন্দপুরে বাস করেন। * * The family of Rukmini Kanto Dey (great-grand-father of Maharaja Nabakissen whose services in tho Savarna family greatly benefitted Keshab Roy one of the minor proprie-

গোবিন্দরাম মিত্রের পূর্ব্ব-পুরুষেরাও গোবিন্দপুরের আদিম অধিবাসী। হাটখোলার দত্ত বংশীয় জমীদারদিগের আদিপুরুষ গোবিন্দ শরণ দত্ত সুতানুটীতে বাস করিতেন। কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদিপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর মহাশয়ও কলিকাতার আদিম অধিবাসী। জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পরে ও সুতানুটী প্রভৃতি গ্রামের বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত এবং পরবর্ত্তী কালে কলিকাতার পুরাতন দুর্গ-নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন কলিকাতায়, গোবিন্দপুরে ও সুতানুটী অঞ্চলে দুই দশ ঘর করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস আরম্ভ হয়। বসাক-বংশ ও শেঠ-গণও এই সময়ে প্রাচীন কলিকাতায়—বহু বিস্তৃত হইয়া পড়েন। কারণ আমরা পরবর্ত্তী কালে দেখিতে পাই, বসাকদের মধ্যে শোভারাম বসাক বৃন্দাবন বসাক, গোরাচাঁদ বসাক, বৈষ্ণবচরণ শেঠও সেকালের শেঠ-বসাকদের মধ্যে প্রধান ও যশস্বী হইয়া প্রাচীন কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত খিদিরপুর ভূকৈলাস রাজ-বংশের আদি-পুরুষ, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালও এ স্থলের একজন প্রাচীন বাসিন্দা। বর্ত্তমান ভূকৈলাস রাজ-বংশ তাঁহার জ্ঞাতি জয়নারায়ণের বংশধর। গোকুল ঘোষালের বংশ নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কলিকাতায় শোভারাম বসাকের সুতার হাটই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও কলিকাতায় কয়েকটী রাজ পথ * পূরাকালের বসাক মহাশয়ের নাম সাধারণের স্মৃতিপথে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

আমরা সাধ্য মতে নানাবিধ প্রবাদ, কিম্বদন্তী, জনশ্রুতি ও ঐতি-হাসিক তথ্যের সহায়তায়, জব চার্ণকের আসিবার পূর্ব্বে ও পরে প্রাচীন কলিকাতায় সামাজিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, এগুলি পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিবে। এক্ষণে জব চার্ণক সম্বন্ধে গুটি-কয়েক কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের শেষ করিব।

জব চার্ণক সুতানুটীতে কুঠী স্থাপনের পরও উপযুক্ত আশ্রয়স্থানের অভাবে বড়ই কষ্ট পান একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতানুটী মন্ত্রণা-সভার

tors of Calcutta was out of several, who made Govindpur their abode. Willson's Early Annals, Mr. A.K. Roy's Repoft, Memoires of Nabakissen by N. Ghosh.

* বর্ত্তমান শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট, বৃন্দাবন বসাকস্ লেন ইত্যাদি রাজপথগুলির কথা পাঠক স্মৃতিপথে আনুন।

প্রথম অধিবেশনের যে মন্তব্য ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে কোম্পানীর তৎকালীন আবাস-স্থানের কষ্টের কথা জানিতে পারা যায়। মান্দ্রাজ কৌন্সিলের কর্ত্তা, এই সময়ে কলিকাতার কুঠীর শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদের যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই—"সুতালুটীর ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অতি শোচনীয় অবস্থায় কাল-যাপন করিতেছেন। ইংরাজের আবাসস্থান ও গুদাম প্রভৃতি সুরক্ষিত নহে। বাটীগুলির অধিকাংশই মাটির ঘর। কুঠীর অধিকাংশ কর্ম্মচারী তাঁবু খাটাইয়া বাস করে, অথবা নদীতে বোটের উপর থাকে। আর কোম্পানীর অত মাল-পত্র, সম্পত্তি ও জাহাজ প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য একশত গোরা সৈন্য মাত্রই সম্বল।"*

চার্ণক মৃত্যুর পূর্ব্বে লালদিঘির ধারে দুইটী মাত্র বাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তখন সুতালুটীতে অনেক পর্টুগীজ থাকিত। ইহাদের একটী "Mass-House" বা প্রার্থনা-গৃহ ছিল। দ্বিতীয় পাকা-বাড়ী- লালদিঘির সান্নিধ্যে মজুমদারদের পূর্ব্বকথিত কাছারিবাড়ী। চার্ণক মজুমদার-বংশীয় বিদ্যাধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট, তাঁহার কাছারী বাড়িটী জমা করিয়া লয়েন। রায়চৌধুরী মহাশয়ের জায়গীরের মধ্যেই সুতালুটী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়। এই বিদ্যাধর রায়-চৌধুরীর, একজন ফিরিঙ্গি আম মোক্তার বা নায়েব ছিল—তাহার নাম এণ্টনি সাহেব। একদিন ঘটনাবশে, এই এণ্টনির সহিত জব চার্ণকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ সংঘর্ষের কারণ আমরা বলিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত লালদীঘি তখন এত বড় ছিল না। ইহা একটী মাঝারি ধরণের পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীটি মজুমদারদের কাছারি বাড়ীর সীমার মধ্যেই ছিল। শ্যামরায় কালীঘাটে স্থানান্তরিত হইলেও, দোলের সময় এখানে আসিতেন। শ্যামরায়ের দোলক্ষেত্র, এই কাছারী বাড়ীর সীমার মধ্যে। বহুদিনের প্রচলিত প্রথামতঃ দোলটা পূর্ব্ববৎই চলিয়া আসিতেছিল। বিবাদের কারণ এই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কতকগুলি ফ্যাক্টার, দোলবাটীর মধ্যে উৎসব দেখিবার জন্য প্রবেশের চেষ্টা করে। চৌধুরীদের আমমোক্তার এণ্টনি সাহেব, তাহা-দের প্রবেশ করিতে দেন নাই। চার্ণকের নিকট এ সংবাদ পৌছিবামাত্র,

* Letter Dated Fort ST. George 25 th May 1691.

তিনি স্বপক্ষীয়দিগের সাহায্যার্থে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁহার হাতে ঘোড়ার চাবুক ছিল—সেই চাবুক দিয়া এণ্টনিকে প্রহার করেন।*

চার্ণক হস্তে প্রহরিত এণ্টনি সাহেব, এ অপমান ভুলিতে না পারিয়া তাঁহার প্রভু মজুমদারদের অধিকৃত জমিদারির মধ্যে, কাঁচড়াপাড়ার নিকট এক গ্রামে গিয়া বাস করেন।†

এই এণ্টনি সাহেবের পৌত্রই, কবিওয়ালা আণ্টুনি (এণ্টনি) সাহেব। সেকালের কবির সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, যদি আমরা দাশুরায়, রামবসু, হরুঠাকুর, ভোলাময়রা, ঠাকুর-সিং প্রভৃতির নাম বিস্মৃত না হই, তাহা হইলে এণ্টনির নামও বিস্মৃত হইব না। এণ্টনি খৃষ্টান হইয়াও হিন্দু-ভাবাপন্ন ছিলেন। তাহার কারণ, তিনি এক ব্রাহ্মণ-রমণীর প্রেমে পতিত হন। তিনি হিন্দুর পাল-পার্ব্বণ, দোল দুর্গোৎসবে—সাগ্রহে যোগ দিতেন, অবশেষে কবিরদল বাঁধিয়া আসরে নামিয়াছিলেন। কবির দলের লড়াই বড় সহজ ব্যাপার নহে। উপস্থিত বুদ্ধিতে, অর্থপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া, ছড়া-কাটান ও প্রতিপক্ষদলকে কঠোর জবাবে নিরস্ত করা বড় সহজ কাজ নহে। এণ্টনির কবিত্ব ও বাঙ্গলা ভাষায় দখলও বড় কম ছিল না। দুই একটী উদাহরণ দিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এক জায়গায় কবির আসর বসিয়াছে। তখনকার কালে কবির বড় ধুম। আসর লোকে পরিপূর্ণ। এই সময়ে এণ্টনি সাহেব মাথার টুপি ও গায়ের কুর্ত্তি ছাড়িয়া আসরে অবতীর্ণ। প্রতিপক্ষ কবিওয়ালা ঠাকুর সিংহ, এণ্টনি সাহেবকে আক্রমণ করিয়া বলিলেন—

---

* Portuguese Antony, Agent of the proprietor of Calcutta has been horse-whipped out of the enclosure by Charnock for attempling to prevent some English Factors from entering it during the Holi festival of the Hindu God Sham Roy (Gobinda) which was still being celebrated here as of old, inspite of the removal of the idol to Kalighat (Roy's C. R.)

† চার্ণকের সমকালবর্ত্তী, মজুমদারদের কর্ম্মচারী, চার্ণক-প্রহৃত এণ্টনির বাগানবাটীর ভিটা এখনও বর্ত্তমান। এণ্টনির হাটের নাম এখনও অনেকের মনে আছে। কলিকাতার এণ্টনি-বাগান লেন এই এণ্টনির নামেই হইয়াছে। ইঁহার পৌত্র কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেব ফরাসী অধিকারভুক্ত গরিটিতে থাকিতেন। তাঁহার বাগানবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও পরিদৃষ্ট হয়। কবিওয়ালা এণ্টনির ভ্রাতা কেলি সাহেব একজন ক্ষমতাপন্ন ও অর্থশালী লোক ছিলেন। (Census of India Vol. VII.—দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।)

"বলহে এণ্টনি আমি একটী কথা জান্‌তে চাই,
এসে এদেশে, এবেশে, তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই।"

এণ্টনি ইহার যে জবাব দিলেন, তাহাতে ঠাকুর সিংহকে হঠিতে হইল। বর্ত্তমানকালে এ জবাব সুরুচি সঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু তখনকার কালে এরূপ জবাবে শ্রোতারা বড় আনন্দ উপভোগ করিতেন। এণ্টনি, ঠাকুর-সিংহকে "শ্যালক" সম্বোধন করিয়া, তাহার আক্রমণের প্রতিশোধ লইলেন। তিনি বলিলেন—

"এই বাঙ্গলায়, বাঙ্গালীর দেশে, আনন্দে আছি,
হয়ে ঠাকুরে-সিংহের বাপের জামাই, কুর্ত্তি টুপি ছেড়েছি।"

একবার প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রামবসু আসরে দাঁড়াইয়া, সাহেবকে গালি দিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিলেন—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরী সাহেব, শুন্‌তে পেলে, দেবে চূণ কালী।"

সাহেব উত্তর দিলেন—

খৃষ্টে আর কৃষ্ণে, কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই।
আমার যীশু যে, হিন্দুর হরি সে,
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে—
আমার মানব জনম সফল হবে, যদি রাঙ্গা চরণ পাই।

এণ্টনি সাহেব ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উদার পন্থাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার মতে কৃষ্ণ, খৃষ্ট, খোদা, হরি সবই এক। এই জন্যই তিনি প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন—

"আমি ভজন সাধন জানিনে মা—জেতে অধম ফিরিঙ্গি,
আমায় দয়া করে কৃপাকর—ওমা শিবে মাতঙ্গী।"

যাহা হউক, বহু চেষ্টায় ও অনুসন্ধানে আমরা নানাস্থান হইতে জব চার্ণক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি এস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। সেকালের পুরাতন-দপ্তরের অনেক ভাল ভাল রেকর্ড নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই পুরাতন রেকর্ডগুলি যত্নে রাখিবার জন্যই, জব চার্ণক মজুমদারদের কাছারী বাড়িটী লইতে বাধ্য হন। ১৭১৩ সালের মহাঝড়ে অনেক কাগজ-পত্র নষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে নবাব সিরাজদ্দৌলার আক্রমণ সময়েও অনেক দরকারী কাগজ-পত্র অগ্নিদগ্ধ হয়।

জব্ চার্ণক কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গভীর জঙ্গল ও শ্বাপদ, কুম্ভীর, সর্প-সংকুল বনভূমিতে, বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি শতাব্দী পূর্ব্বে লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, এই প্রাসাদময়ী কলিকাতা নগরী তাঁহার ও তাঁহার জাতির ও সেই জাতির অধিপতি, রাজ-রাজেশ্বর সম্রাটের ও সম্রাজ্ঞীর উজ্জ্বল-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

জব চার্ণকের সহস্র দোষ থাকিতে পারে। মানুষ মাত্রেই দোষ হীন নহে। কিন্তু সেই দোষের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই—চার্ণক একান্ত-চিত্তে প্রভুভক্ত। কোম্পানীর তিনি যে নিমক খাইয়াছিলেন—তাহার পরিবর্ত্তে, তিনি ভবিষ্যৎবংশীয় ইংরাজদের অতুল বিত্তসম্পত্তি দান করিবার উপলক্ষ্য হইয়াছেন। তখনকার কালে মুষ্টিমেয় ইংরাজ, যে এক মহাশক্তি বলে, অসীম পরাক্রান্ত মোগল-বাদসাহের প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন, তাঁহার মূলে এই জব চার্ণক। চার্ণকের সাহস কিরূপ অদম্য ও স্বজাতি-প্রীতি কিরূপ প্রবল ছিল—তাহা চার্ণকের জীবনের ঘটনাবলী হইতেই প্রমাণিত হইবে।
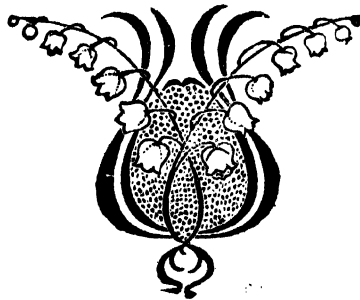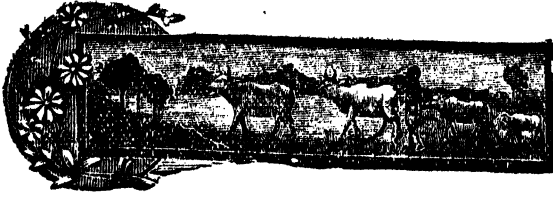
ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চার্ণকের মৃত্যুর পর কোম্পানীর বাণিজ্যাগারের অবস্থা—স্যারজন গোল্ডস্‌বরার সুতানুটীতে আগমন—দুর্গ নির্ম্মাণের প্রথম কল্পনা ও সূচনা—স্যার চার্লস আয়ারের আমল—চেতোয়া ও বর্দ্দার তালুকদার শোভাসিংহের বিদ্রোহ—রহিমসার উড়িষ্যা হইতে আগমন ও শোভাসিংহের দলে যোগদান—শোভাসিংহ কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান আক্রমণ—বর্দ্ধমানাধিপ রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের পরাভব—শোভাসিংহ কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান রাজপুরী অধিকার—কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরামের ছদ্মবেশে কৃষ্ণনগরে পলায়ন—কৃষ্ণনগর হইতে ইব্রাহিমখাঁর নিকট জাহাঙ্গীর-নগরে (ঢাকায়) গমন—প্রজারক্ষার সম্বন্ধে নবাব ইব্রাহিম খাঁর ঔদাসীন্য—যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর প্রতি পরিশেষে বিদ্রোহ দমনের আদেশ প্রদান—নূরউল্লার যশোর হইতে হুগলীতে আগমন ও হুগলীদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ—পরাভূত হইয়া ছদ্মবেশে পলায়ন—নবাবের নিকট ইউরোপীয় বণিকগণের দুর্গ-নির্ম্মাণের আবেদন—নবাবের সম্মতি ও কলিকাতায় ইংরাজদের দুর্গ-নির্ম্মাণ কার্য্যের সূচনা—পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা—ওলন্দাজদের হস্তে বিদ্রোহীদের পরাভব, শোভাসিংহের হুগলীতে, সপ্তগ্রামে ও তৎপরে বর্দ্ধমানে পলায়ন—রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সুন্দরী কন্যার উপর শোভাসিংহের অত্যাচার চেষ্টা—রাজকন্যার হস্তে শোভাসিংহের শোচনীয় মৃত্যু ও রাজকুমারীর আত্মহত্যা—শোভাসিংহের মৃত্যুর পর হিম্মতসিংহের নায়কত্ব গ্রহণ—রহিমসার মুকসুদাবাদে প্রবেশ—জায়গীরদার নেয়ামতখাঁর বীরত্ব—জবরদস্তখাঁর সেনাপতি পদে নিয়োগ—তাঁহার হস্তে বিদ্রোহীদের পরাজয়—নবাব ইব্রাহিমসার পদত্যাগ—বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যে সাহজাদা আজিম উশ্বানের নিয়োগ—জবরদস্ত খাঁর পদত্যাগ—আজিম-উশ্বানের সমরনীতি—বিদ্রোহী রহিম সার নিকট দূত প্রেরণ—আনওয়ার খাঁর হত্যাকাণ্ড—মোগল পাঠানের সংঘর্ষ—যুদ্ধক্ষেত্রে আজিমউশ্বানের বিপন্ন অবস্থা—হামিদখাঁ কর্ত্তৃক তাঁহার জীবন রক্ষা—সুতানুটীর দুর্গ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নানা অসুবিধা—এ অসুবিধার প্রতিকারার্থে আজিমের দরবারে ওয়ালশের গমন—নূতন ফারমান বলে ইংরাজ বণিকের সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয়—এতৎসম্বন্ধীয় বয়নামার প্রতিলিপি—প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথা।

পুরাতন "ফোর্ট-উইলিয়ম" দুর্গ।

নবাবী আমলে, ইংরাজেরা কলিকাতায় যে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নবাব সিরাজুদ্দোলা সে দুর্গ আক্রমণ করেন, সে দুর্গের অস্তিত্বমাত্র এখন নাই, তবে এখনও তাহার অধিকৃত স্থানটী বর্ত্তমান আছে। অধুনাতনকালে গবর্ণমেণ্ট সেখানে কয়েকটী সহকারী আফিস স্থাপন

করিয়াছেন। দুর্গটী কোথায়, কি ভাবে, কোন্‌দিকে ছিল, তাহার স্মৃতিও ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের অনুগ্রহে, আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর, এদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারকল্পে, অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অতীত ইতিহাসের এই লুপ্তপ্রায় স্মৃতিচিহ্নের উদ্ধার-সংকল্পের জন্য, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তাঁহার নিকট চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকিবেন। প্রাচীন ও লুপ্তচিহ্ন পুরাতন ফোর্ট-উইলিয়ামের স্মৃতি, তিনি অতি পরিস্ফুটভাবেই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

আজকালকার লালদীঘির সান্নিধ্যে—বর্ত্তমান কষ্টম্‌-হাউস, জেনারেল পোষ্টাফিস বা বড় ডাকঘর, ইনৃকম্‌-ট্যাক্স আফিস ও কেয়ালি-প্লেসের ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেল-কোম্পানীর প্রাসাদতুল্য কার্য্যালয়, এই কয়েকটী স্থানের অধিকৃত ভূভাগে নবাবী আমলের "ফোর্ট-উইলিয়াম" দুর্গ অবস্থিত ছিল। পলাশী যুদ্ধের পর, বর্ত্তমান গড়েরমাঠের নূতন কেল্লা নির্ম্মিত হয়। নূতন কেল্লার বিবরণ আমরা যথাস্থানে দিব। এখন নবাবী আমলের পুরাতন কেল্লার কথাই বলিতেছি।

কলিকাতাবাসীদের মধ্যে অনেকে হয় ত জানেন না—এই পুরাতন ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের অবস্থান' স্থান কোথায়? এই পুরাতন কেল্লাই নবাব সিরাজদ্দৌলা আক্রমণ করেন। নবাব কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পরে রাজা মাণিকচাঁদ এই কেল্লারই ভারপ্রাপ্ত হন, এই কেল্লার মধ্যেই হলওয়েল সাহেব মহাসাহসে আত্মরক্ষা করেন। এই কেল্লা হইতেই ড্রেক সাহেব পলায়ন করেন। অন্ধকূপ-হত্যা ইহার মধ্যেই সংঘটিত হয়। যেস্থানে অন্ধকূপ-হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল, লর্ড কর্জ্জন সেই স্থানটী কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর-প্রস্তরে বাঁধাইয়া দিয়াছেন ও এই বাঁধান স্থানের উপরে যে প্রস্তর-ফলক গ্রথিত আছে, তাহাতেই এই ভীষণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেথানে "অন্ধকূপ-হত্যার" নরদেহসমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতিস্তম্ভও লর্ড কর্জ্জন কর্ত্তৃক নূতনভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে।

কলিকাতার পুরাতন কেল্লা অবশ্য একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই, অথবা ইহা দুই এক বৎসরের অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের ফলও নহে। সেকালের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যাগার সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীরা, অনেক সময়ে মোগল রাজকর্ম্মচারীদের হস্তে অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতেন। অনেক সময়ে, সামান্য বিবাদ বিসম্বাদের ফলে, তাঁহাদের মালপত্র লুণ্ঠিত হইত। এ সব কাহিনী আমরা ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়াছি। এই সমস্ত উৎপাতের

প্রতিকার জন্য, বহুদিন হইতেই ইংরাজেরা ভাগীরথী তীরে একটী প্রাচীর বেষ্টিত আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণের সংকল্প, হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। এই সংকল্পের জনক—পূর্ব্বোল্লিখিত গবর্ণর হেজেস্। হেজেস ১৬৮২ হইতে ১৬৮৪ পর্য্যন্ত কোম্পানীর ফ্যাক্টরী সমূহের গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার মনেই দুর্গ-নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষায় কল্পনা প্রথম উদিত হয়। জব চার্ণকও হেজেসের এই সংকল্পের পরিপোষণ করেন।

হেজেস্ বাহুবলে আত্মরক্ষা করিবার যে প্রস্তাব করিয়া যান, জব চার্ণক তাহা সর্ব্বপ্রথমে কার্য্যে পরিণত করেন। তিনি যখন সুতানুটিতে আশ্রয় লইলেন, সেই সময়ে তিনি নদীতীরে একটী উন্নত স্থান দেখিয়া তথায় কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর স্থান নির্দ্দেশ করেন। এই ফ্যাক্টরী নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। ভবিষ্যতে এই স্থানেই পুরাতন ফোর্ট-উইলিয়াম নির্ম্মিত হইয়াছিল।*

হেজেস্ চলিয়া যাইবার দুই বৎসর পরে, নবাবের লোকের সহিত, জব চার্ণকের বিবাদ বাধিল। এ বিবাদের প্রারম্ভ ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে সমস্ত কথাই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই বিবাদের ফলে অন্য যাহা ঘটুক না কেন, বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরী ও পুরাতন ফোর্ট-উইলিয়াম-দুর্গের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছিল।

জব চার্ণক ১৬৯০ খৃঃ অব্দের ২৪এ আগষ্ট তারিখে, সুতানুটীতে শেষ আশ্রয় লয়েন। ইহার পর তিনি প্রায় তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে, তিনি কলিকাতায় ইংরাজদের আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণের জন্য স্থায়ীভাবে কোন কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই।

১৬৯৩ খ্রীঃ অব্দে, সারজন গোল্ডস্‌বরা কোম্পানীর কুঠী-সমূহের সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়া, সুতানুটীতে উপস্থিত হন। গোল্ডস্‌বরা দেখিলেন, সুতানুটীতে ইংরাজের আশ্রয়স্থানের কোন সুবন্দোবস্তই নাই। নবাবপক্ষ হইতে সুতানুটীতে স্থায়ী আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণের কোন সনন্দও তখনও পৌছে নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি সুতানুটীর কুঠীর চারিদিকে মৃত্তিকা প্রাচীর তুলিয়া দেন ও ইংরাজদের ফ্যাক্টরী বা বাণিজ্যাগার ইহারই মধ্যে রক্ষিত হয়। কোম্পানীর দরকারী সেরেস্তা ও কাগজপত্র রাখিবার জন্য একটী পাকা কোঠাও এই সময়ে ক্রয় করা হয়।

* আবার অন্যমতে, সারজন গোল্ডস্‌বরা কর্ত্তৃক ভবিষ্যতে, দুর্গ-নির্ম্মাণ জন্য এই স্থান নির্ব্বাচিত হয়।

এই ভাবে আরও তিন বৎসর কাটিল। ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে সার চার্লস আয়ার (ইনি চার্ণকের জামাতা) কলিকাতা কুঠীর এজেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। আয়ারের আমলে—সম্রাট পৌত্র আজিম উশ্বানের নিকট হইতে, সম্রাটের সনন্দ বা নিশান কলিকাতায় উপস্থিত হয়। * ইংরাজের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন, যে এই সময়ে বঙ্গদেশে শোভাসিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের প্রথম সূচনাতেই, ইংরাজেরা কলিকাতার দুর্গ-নির্ম্মাণের উপযুক্ত সুযোগ লাভ করেন।

তখন কলিকাতা-ফ্যাক্টারীর কার্য্য ততটা লাভজনক হয় নাই। ফ্যাক্টারী রক্ষার জন্য যে সৈন্যবলের প্রয়োজন, তাহাদের খরচ কোথা হইতে আসে, ইহা একটা ভাবনার বিষয় হইল। এইজন্য ইংরাজেরা নিকটস্থ কয়েকখানি গ্রাম খাজনা করিয়া লইবার সঙ্কল্প করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ নির্ম্মাণ ব্যাপার, অতি ধীরে ধীরে ও সামান্যরূপে চলিতে লাগিল। পাছে বড় করিয়া, এবং পাকাপোক্তভাবে ইমারত ও প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিলে, স্থানীয় মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয় বা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহারা তাহাতে বাধাপ্রদান করেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান আশঙ্কা দাঁড়াইল। বিলাতের কর্ত্তাদের আদেশ ছিল—"আত্মরক্ষার জন্য কলিকাতার দুর্গটী যাহাতে সর্ব্ব বিষয়ে উপযুক্ত হয় সেই ভাবেই তাহা নির্ম্মাণ করিবে। দুর্গটী পঞ্চভূজাকারে হইলেই ভাল হয়।" কিন্তু কলিকাতা-কৌন্সিল দেখিলেন, পঞ্চভূজাকারে না হইয়া আয়তাকারে দুর্গ-নির্ম্মাণই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাকর। বিশেষতঃ এই সময়ে এমন একজন সুদক্ষ লোক মিলিল না, যাঁহার হস্তে এই দুর্গ-নির্ম্মাণের ভার দেওয়া যাইতে পারে।

বিধাতা ইংরাজদের উপর প্রসন্ন হইলেন। এই সময়ে এমন একটী ঘটনা ঘটিল—যদ্দ্বারা ইংরাজদের দুর্গনির্ম্মাণ কার্য্যে কোন বাধা ঘটিল না। সে ঘটনাটী শোভাসিংহের বিদ্রোহ। এ সাংঘাতিক বিদ্রোহের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়।†

* NISHAN, literally a sign in the form of a sealed document of flag or other emblem from the local authority of a district or province (Hunter's British India vol II. (H)

† এই শোভাসিংহ কোন কোন লেখক কর্ত্তৃক "সুভাসিংহ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যাহা হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না।

তখন নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা। ইব্রাহিম খাঁ অতি শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে এবং জব চার্ণকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে, চেতোয়া ও বর্দ্দার জমীদার শোভাসিংহ মোগলসরকারের বিরুদ্ধে উত্থিত হন। চেতোয়া ও বর্দ্দা বর্দ্ধমান প্রদেশভুক্ত। এই সময়ে রাজা কৃষ্ণরাম রায়, বর্দ্ধমানের অধিপতি।* তাহার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার, সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে আর কেহই ছিলেন না। নানাকারণে শোভাসিংহের সহিত, রাজা কৃষ্ণরামের দারুণ মনোমালিন্য ঘটে। কিন্তু রাজার ক্ষমতার বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইতে সাহসী না হইয়া, শোভাসিংহ—উড়িষ্যার আফগান দলপতি, "নাককাটা" রহিম খাঁকে তাঁহার সাহাষ্যার্থে আহ্বান করেন † ওসমানের পতনের পর হইতে—পাঠানদিগের দর্প একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। এই সময়ে রহিম খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন পাঠান সর্দ্দার, তখনও বঙ্গদেশের মধ্যে আফগান জাতিকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা এই সমস্ত সর্দ্দারদের অধীন হইয়া

---

* কৃষ্ণরাম রায়, বাবুরায় হইতে তিনপুরুষ অধস্তন। এই বাবুরায়ই বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রথম স্থাপয়িতা। কেহ কেহ ইহাঁকে "আবুরায়" বলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র জগতরাম। ইনিই শোভাসিংহের ভয়ে ঢাকায় পলায়ন করেন। ১৭০২খৃঃ জগতরাম শত্রুহস্তে নিহত হন। তাহার পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্রের আমলেই ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গল" রচিত হয়। কৃষ্ণরাম ও জগতরাম রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের জমীদারি ছয় সাতটী পরগণার বেশী ছিল না। (See Fifth Report of the Select Committee p. 402).

চেতোয়ার জমিদার শোভাসিংহ একজন ক্ষুদ্র তালুকদার ছিলেন। চেতোয়া বর্ত্তমানে মেদিনীপুর বিভাগে অবস্থিত। আবুলফজল, আইন-আকবরীতে বলিয়াছেন—(Chitwa is a Mahal lying intermediate between Bengal and Orissa.) অর্থাৎ চেতোয়া মহল বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যে অবস্থিত। ষ্টুয়ার্ট—চেতোয়াকে "জেতোয়া" (Jetwa) বলিয়া বানান করিয়া গিয়াছেন। মার্শমান সাহেব আবার তাহাকে "চিতুয়ান" (Chituyan) বলিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। যাহাই হউক, এই চেতোয়ার মালিক শোভাসিংহ। চেতোয়ার সন্নিকটেই "বর্দ্দা"। শোভাসিংহের প্রপিতামহ রঘুনাথ সিংহই সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গদেশে আসেন। রঘুনাথের পুত্র কানাইসিংহ চেতোয়া খরিদ করেন। কিন্তু বর্দ্দার জমীদার ফতেসিংহের নিকট ঋণের দায়ে চেতোয়া বিক্রয় হইয়া যায়। শোভাসিংহের পিতা দুর্জ্জয় (দুর্ল্লভ ?) সিংহ, ফতেসিংহের পুত্র—কীর্ত্তি সিংহের নিকট হইতে চেতোয়া উদ্ধার করেন। শোভাসিংহের আমলে বর্দ্দা তালুকখানি তাঁহার হস্তগত হয়। শোভাসিংহ ক্রমে বর্দ্ধিত প্রতাপ হইয়া, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কৃষ্ণরাম রায় ইতিপূর্ব্বে—তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ কামনায় শোভাসিংহ জঙ্গল মধ্যবর্ত্তী এক গুপ্তপথ দিয়া—সহসা দামোদর তীরে উপস্থিত হন। কৃষ্ণরাম এ অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই তিনি পরাভূত হন। Vide Blochman's Notes—Hunter's Statistical Acoount of Bengal Vol 1. Hoogly Past & Present. 26.

† কোন যুদ্ধে রহিম খাঁর নাসিকার কিয়দংশ কাটিয়া যাওয়ায় তিনি "নাককাটা রহিম খাঁ" নামে পরিচিত ছিলেন।

সময়ে সময়ে বঙ্গের শান্তিময় প্রদেশ সমূহে, দলবদ্ধ ভাবে প্রবেশ করিয়া, ডাকাতের মত—মোগল বাদসাহের প্রজাবর্গের ধনসম্পত্তি লুটপাট করিত। রহিম খাঁ এই দলপতিদের অন্যতম।

শোভাসিংহের আহ্বানে, লুণ্ঠন প্রয়াসী রহিম খাঁ তাঁহার সহিত সানন্দে যোগদান করিল। ইহাতে শোভাসিংহের দল পুষ্টি হওয়ায়, সে রহিম খাঁর সহিত একযোগে বৰ্দ্ধমান আক্রমণ করে। রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত তাহাদের একটী সামান্য যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, বৰ্দ্ধমান-রাজ এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েন। বিদ্রোহীরা বৰ্দ্ধমান দখল করিয়া, রাজা কৃষ্ণরামের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া, তাঁহার পরিজনবর্গকেও বন্দী করিল। প্রবাদ এই, রাজা কৃষ্ণরামের পুত্র কুমার জগতরাম কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া প্রথমে কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা রামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, পরে তথা হইতে জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা অভিমুখে, নবাব ইব্রাহিমখাঁর নিকট পলায়ন করেন।*

জগতরামের অতি দুর্ভাগ্য—যে শান্তিপ্রিয় মোগল রাজপ্রতিনিধি, নবাব ইব্রাহিম খাঁ প্রথম প্রথম এ ব্যাপারটা আদৌ সাংঘাতিক বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। নবাব সাহেব, তাঁহার চিরপ্রিয় গোলেস্তাদি পুস্তকপাঠেই বেশী মনোযোগী। তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিগণ অসদুপায়ে অর্থলাভের চিন্তাতেই বিভোর। কাজেই এ বিদ্রোহ ব্যাপারটা নবাবের মনোযোগ আকর্ষণ করিল না। এদিকে বিদ্রোহীদলও নবাবের এ উদাসীনতায়, ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয়

* ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতে—লিখিত আছে, যে কৃষ্ণরাম রায় স্বীয় পুত্র জগতরামকে স্ত্রীলোকের বেশ পরাইয়া, স্ত্রীলোকদিগের আরোহণোপযোগী যানে—কৃষ্ণনগরাধিপের নিকট পাঠাইয়া দেন। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশই তাহার প্রমাণ—

"তদানীমেব কৃষ্ণরামরায়েন পরবলমাৱাতীতি বিজ্ঞাতং স্বপরিবারস্য পলায়নাবসর কালো-নাস্তি যুদ্ধসামগ্রীচ পূর্ব্বং ন কৃতা, ন উপায়া, স্বপরিবারস্য নাশো উপস্থিত ইতি চিন্তয়ন্ স্বপুত্রং জগদ্রামনামাণং স্ত্রীবেশধারিণাং কৃত্বা স্ত্রীণামারোহণযোগ্য যানেন পরবলৈরনুপলক্ষিতং রাম কৃষ্ণরায়স্য সন্নিধৌ কৃষ্ণনগরে প্রেরয়ামাস।" কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা রামকৃষ্ণ রায়, জগতরামকে তাঁহাদের মাটিয়ারির বাটীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে জগতরাম ঢাকায় বা জাহাঙ্গীর-নগরে গমন করেন। (নিখিল বাবুর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—পাদটীকা—২৯১)।

রিয়াজ-উস্-সালাতিনে উক্ত আছে—"রাজা কৃষ্ণরামের জগতরায় নামক পুত্র একাকী পলায়ন করিয়া (বাঙ্গলার) রাজধানী জাহাঙ্গীর-নগরে গমন করিলেন। (রামপ্রাণ বাবুর রিয়াজের বঙ্গানুবাদ—২১২)।

প্রসিদ্ধ উইলসন সাহেব বলেন—"His (Krishna Ram) son Jagat Rai alone escaped to Dacca where he laid his complaints before the Nawab (Ibrahim Khan). Wilson's Early Annals P. 147.

করিতে লাগিল। বিদ্রোহের কথা নবাবের কাণে তুলিলেই—তিনি বলিতেন, "এই অন্তর্বিপ্লব ব্যাপারটা অতি ঘৃণার বিষয়। এটা গ্রাহ্য না করিলেই—বিদ্রোহীরা আপনা আপনিই থামিয়া যাইবে। অকারণ খোদার সৃষ্ট জীবের রক্তপাত করিয়া, তাহাদিগকে হত্যা করার ফয়দা কি ?"*

নবাবের এইরূপ মতিগতি দেখিয়া, ইউরোপীয়ান বণিকগণ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের উপায় বিধানে মনস্থ করিলেন। ইউরোপীয়-বণিকগণ, আত্মরক্ষার্থে দেশীয়-সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ, ডচ্ ও ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকগণ স্ব স্ব আশ্রয় স্থান সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। এদিকে বিদ্রোহিগণও হুগলীর সন্নিহিত হইল।

দেশময় একটা মহা হুলস্থুল উপস্থিত হইল। বিদ্রোহ-নায়ক রহিম-সা ও শোভাসিংহের অত্যাচারে, নিরীহ শান্তিপ্রিয় প্রজাকুল, বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। চারিদিকে অত্যাচার, লুণ্ঠন, নরহত্যা, আর্ত্তের চীৎকার ও শোণিতপাতের ভীষণদৃশ্য প্রকটিত হইল। এতদিনের পর, নবাব ইব্রাহিম খাঁর কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি বিদ্রোহী সামন্তদের দমনের জন্য যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন—"ব্যাপারটা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। যে উপায়ে পার, বিদ্রোহীদের দমন কর।"†

---

* But his Highness was engaged with his books and His Highness's Commenders intent upon making money considered the matter of little importance, while they hesitated and delayed, the rebel force increased in members, marched upon Hugly and took it. Still His Highness remained inactive. He could only repeat that civil war was a dreadful evil and that the rebels, if let alone would soon disperse. What is the use then of fighting? Why should he wantonly destroy the lives of God's creatures? Why could he not be left to read Gulistan in peace. (Wilson's Early Annals—the Rebellion of Cubhasing p. 147.)

† রিয়াজে উল্লিখিত আছে, এই নূরউল্লা যশোহর, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর, চাকলার ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার অধীনে তিন হাজার সৈন্য ছিল। ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেবের যশোর বিবরণীতে প্রকাশ—"১৭৯৮ খৃঃঅব্দে নূরউল্লার প্রপৌত্র হিদায়ৎউল্লা ও রহমতউল্লা নামক দুইজন অশীতিবয় বয়স্ক দেশীয় বৃদ্ধ, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেন্সনের দাবী করিয়াছিলেন। কথিত আবেদন পত্রে, নূরউল্লা সম্রাট্ ওরঙ্গজেবের "দুধভাই" বলিয়া উল্লিখিত। সম্ভবতঃ নূরউল্লার মাতা, ঔরঙ্গজেবের শিশুকালের ধাত্রী ছিলেন। এই সম্বন্ধের জোরেই নূরউল্লার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যে কেবল ফৌজদারীর কর্ত্তা ছিলেন তাহা নহে—বাণিজ্য-ব্যবসার দ্বারাও প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কপোতাক্ষ নদীর-তীরে তিনি মির্জ্জানগরে অবস্থিতি করিতেন। এখনও তথায় তাঁহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

বহুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে লিপ্ত না থাকায় ও শান্তির ক্রোড়ে বিলাস সুখমগ্ন হইয়া কেবলমাত্র ধনবৃদ্ধির চিন্তায় ও চেষ্টায় জীবনযাপন করাতে, নূরউল্লা খাঁ লড়াইয়ের ব্যাপার একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। নবাবের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র, অগত্যা তিনি তিন সহস্র অশ্বারোহী লইয়া যশোহর হইতে যাত্রা করিলেন।

নূরউল্লা হুগলীতে পৌছিয়া দেখিলেন—বিদ্রোহীগণ মহাবেগে হুগলী অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। নূরউল্লা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায় হুগলী-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চুঁচুড়ার, ওলন্দাজ বণিকগণের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বিদ্রোহী-সেনারা তাহাতে দমিল না। তাহারা হুগলী-দুর্গ বেষ্টন করিল। এই আক্রমণের পরিণাম চিন্তায় ভীত হইয়া, ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ গোপনে যথাসর্ব্বস্ব সেই দুর্গমধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া, ছদ্মবেশে কেল্লার গুপ্তদ্বার দিয়া নদীপথে পলায়ন করিলেন।* বিদ্রোহী সৈন্য, মোগলের হুগলী-দুর্গ দখল করিয়া লুণ্ঠন করিল। ইহাতে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নগরবাসিগণ ও ব্যবসায়িগণ তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব নাশের ভয়ে চুঁচুড়ায় আসিয়া ওলন্দাজদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ওলন্দাজ বণিকদিগের অধ্যক্ষগণ এই সময়ে কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য, দুইখানি জাহাজ ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দুর্গের নিম্নে উপস্থিত হইলেন।

হুগলী অতি সহজে বিদ্রোহীদের হস্তগত হইল দেখিয়া, ইংরাজ, দিনেমার ও ওলন্দাজ বণিকগণ চিন্তিত হইয়া, এদেশীয় সেপাহী সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব সেনাদল বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল, তাহা লোপ হইল। ইউরোপীয় বণিকগণ নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট আবেদন করিলেন—"মোগল সরকারের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া বিদ্রোহিগণ তাঁহাদেরও শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। সুযোগ পাইলেই তাহারা

বর্ত্তমান। এখনও লোকে, তাহাকে "নবাব-বাটী" বলিয়া থাকে। তাঁহার নাম হইতে নূরনগর পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত নূরনগরে অদ্যাপি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য, রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। নূরউল্লার সময়ে মির্জ্জানগর, যশোহর ফৌজদারীর প্রধান স্থান ছিল, এখন ইহা একটা সামান্য গ্রাম মাত্র। (রিয়াজ উস্-সালাতিন,—২৯২, রামপ্রাণ বাবুর অনুবাদ)।

* রিয়াজে উল্লিখিত আছে—"নূরউল্লা ধনরত্ন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, কেবল প্রাণরক্ষা করিতে পারাই সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এবং তজ্জন্য একমাত্র ল্যাঙ্গট্ পরিধান করিয়া রাত্রিযোগে কতিপয় সহচরের সহিত বহুকষ্টে নদীপার হইয়া কেবল নাক-কাণ লইয়া পলায়ন করেন।"

তাঁহাদের বাণিজ্যাগার লুণ্ঠন করিবে। এরূপ অবস্থায়, নবাব যদি তাহাদের দুর্গ-নির্ম্মাণের অনুমতি না দেন—আত্মরক্ষার উপায় করিতে না দেন, তাহা হইলে তাহাদের অতিশয় বিপন্ন হইতে হইবে।”

বলা বাহুল্য—নবাব ইব্রাহিম খাঁ,তাঁহাদের এ আবেদন অগ্রাহ্য না করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণের সম্মতি দিলেন। ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণ আপনাদের কুঠীর চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া, চারিকোণে বুরুজ ও মিনারাদি তুলিলেন। চুঁচুড়া, চন্দননগর, সুতালুটীতে এইরূপে দুর্গ-নির্ম্মাণের সূত্রপাত হইল।

বিলাতের কর্ত্তারা এতদিন যে সঙ্কল্পের পরিপোষকতা করিতেছিলেন, কলিকাতার ইংরাজ-কুঠীর অধ্যক্ষগণ বহুদিন পোষিত যে বাসনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া জব চার্ণক, সমাধিগর্ভ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা এই উপযুক্ত অবসরে কার্য্যে পরিণত হইল। ভারতে ইংরাজের রাজশক্তির প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সমস্ত ইউরোপীয়গণই সেই ভীষণ সময়ে, এদেশীয় বিপন্ন লোকদিগের প্রধান সহায় ও বিপদে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত হইল। ইংরাজদের কুঠী সুরক্ষিত হইতেছে দেখিয়া, একজন এদেশীয় রাজা তাঁহাদের কুঠীতে ৪৮ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখেন। ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে সুতালুটী দুর্গ-নির্ম্মাণের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হয়।

এখন বিদ্রোহ কাহিনীই বিবৃত করিব। নবাব ইব্রাহিম খাঁ—“কিছুই না” বলিয়া যতই নিশ্চিন্ত হউক না কেন—ইহার ফলে দেশব্যাপী হাহাকার উঠিল। বিদ্রোহীগণ হুগলী দখল করিয়া, সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিল। হুগলী সহর ও সহরতলীর আমীর ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী [illegible] প্রভৃতি অতি স্থানের বণিকগণ [illegible] প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা রহিম-সার সহিত যোগদান করিয়া, অনেক স্থানে লুটপাট ও উপদ্রব আরম্ভ করে। রহিম-সা মুকসুদাবাদের দিকে অগ্রসর হইয়া, তথাকার জায়গীরদার নেয়ামত খাঁকে তাহার সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন।†

* “The country in possession of rebels were estimated at Sixty lacs of Rupees per annum, and that their force consisted or 12000 cavalry and 30000 infantry.—Governor. Sir Charles Eyer's letter dated Decr, 1696 (East India Records. Vol XIX, P. 263).

† “ঘনশ্যামসুতা জ্যেষ্ঠশ্চত্বারো গুরুসাহসাঃ
জগৎ কালুশ্চ বেণীশ্চ কৃষ্ণরামশ্চ বিশ্রুতঃ।

উপস্থিত হয়। এই স্থান হইতে রহিম খাঁকে নদীয়া ও মুখস্সুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) লুণ্ঠনের জন্য পাঠাইয়া দেয় এবং নিজে পুনরায় বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শোভাসিংহ বর্দ্ধমানাধিপ রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের পরিবার ভুক্ত বালক বালিকা ও রাণীকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল।* বর্দ্ধমান রাজকুমারী পরমা সুন্দরী ছিলেন। পিশাচ শোভাসিংহ, তাঁহার কমনীয় রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হয়। বহুবিধ চেষ্টার পর, রাজকুমারীকে করায়ত্ত করিতে অক্ষম হওয়ায়, পাপিষ্ঠ একদিন গভীর নিশীথে, গুপ্তভাবে রাজকুমারীর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে। রাজকুমারী, এই অতর্কিত বিপদ দৃষ্টে ভয়ব্যাকুলা হইয়া উঠেন। তবে তিনি আত্মরক্ষায় জন্য, পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় ভাবিয়া, একখানি তীক্ষ্ণধার-ছুরিকা, তিনি তাঁহার বক্ষবস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত রাখিতেন। শোভাসিংহ কামমোহিত চিত্তে, যেমন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যাইবে, অমনি রাজকুমারী তাঁহার বসনমধ্যে লুক্কায়িত ছুরিকাখানি বাহির করিয়া, দুর্ব্বৃত্তের নাভিমূলে বসাইয়া দিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করেন। দুরাচার বিদ্রোহী এই আঘাতে ভূপতিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু ঘটে। রাজকুমারীও নিজের পরিণাম চিন্তায় অধীরা হইয়া, সেই ছুরিকা বক্ষ মধ্যে প্রোথিত করিয়া আত্মহত্যা করেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁ—যে রাজ-বিদ্রোহীর কিছুই করিতে পারেন নাই, নূরউল্লা খাঁ—যাহার ভয়ে হুগলী হইতে পলায়ন করেন, সেই দুরাত্মার নিপাত সাধন এক বঙ্গীয়া রমণীর হস্তেই হইল।

শোভাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হিম্মত সিংহ, বিদ্রোহীদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। রহিম খাঁ, এই সময়ে রহিম-সা উপাধি ধারণ করিয়া ভাব ছিল, তাহা [illegible] বদমায়েস ও নীচাশয় লোকের নিকট আবেদন করিলেন—"মোগল সরকারের প্রতি অনুরক্ত [illegible] ভভাগ বিদ্রোহিগণ তাঁহাদেরও শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। সুযোগ পাইলেই তাহারা

বর্ত্তমান। এখনও লোকে, তাহাকে "নবাব-বাটী" বলিয়া থাকে। তাঁহার নাম হইতে নূরনগর পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত নূরনগরে অদ্যাপি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য, রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। নূরউল্লার সময়ে মির্জ্জানগর, যশোহর ফৌজদারীর প্রধান স্থান ছিল, এখন ইহা একটী সামান্য গ্রাম মাত্র। (রিয়াজ উস্-সালাতিন,—২৯২, রামপ্রাণ বাবুর অনুবাদ)।

* রিয়াজে উল্লিখিত আছে—"নূরউল্লা ধনরত্ন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, কেবল প্রাণরক্ষা করিতে পারাই সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এবং তজ্জন্য একমাত্র ল্যাঙ্গট্ পরিধান করিয়া রাত্রিযোগে কতিপয় সহচরের সহিত বহুকষ্টে নদীপার হইয়া কেবল নাক-কাণ লইয়া পলায়ন করেন।"

করায়ত্ত করিল। ইহার ফলে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গব্যাপী একটা দারুণ হাহাকার উঠিল। প্রজাগণ বিদ্রোহীদের অত্যাচারে ও লুণ্ঠনের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া নানাদিকে পলাইতে লাগিল।

রহিম-সার যথেষ্ট আয় এবং পরাক্রমও বেশী। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানা যায়, যে তাহার বার্ষিক আয় ষাট লক্ষ টাকা এবং পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা বার হাজার ও অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছিল। রিয়াজের বৃত্তান্তানুসারে, রহিম-সা বর্দ্ধমান হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেবের মতে, রহিম-সা মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত স্থানগুলি অধিকার করেন উল্লিখিত আছে।*

দেশের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক যিনি, প্রজার রক্ষা করিবার ভার যাঁহার হস্তে ন্যস্ত, যিনি এই বিশাল বঙ্গবিহার উড়িষ্যায় মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি—সেই নবাব ইব্রাহিম খাঁ—তখনও নিশ্চেষ্ট। জেলার পর জেলা, নগরের পর নগর, পরগণার পর পরগণা, যে বিদ্রোহীদের হস্তগত হইতেছে—আর্ত্তের আর্ত্তনাদে দেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার রক্ষাধীনে ন্যস্ত, প্রজাকুলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইতেছে, চারিদিকে দারুণ হাহাকার—তবু তিনি সুখ নিদ্রায় নিমগ্ন। তাঁহার পুত্র জবরদস্ত খাঁ ও অমাত্যবর্গ এই সময়ে তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। রহিম-সা হুগলী হইতে মুকসুদাবাদে উপস্থিত হইল। মুকসুদাবাদ প্রদেশের কয়েকজন জমীদার এই বিদ্রোহীগণের পক্ষাবলম্বন করিলেন। এতন্মধ্যে ফতেসিংহের জমিদারগণই প্রধান। ফতেসিংহের তদনীন্তন জমিদার, সবিতারায়ের বংশোদ্ভব ঘনশ্যামের পুত্র জগৎ, কালু প্রভৃতি অতি দুর্দ্দান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা রহিম-সার সহিত যোগদান করিয়া, অনেক স্থানে লুটপাট ও উপদ্রব আরম্ভ করে। রহিম-সা মুকসুদাবাদের দিকে অগ্রসর হইয়া, তথাকার জায়গীরদার নেয়ামত খাঁকে তাহার সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন।†

---

* "The country in possession of rebels were estimated at Sixty lacs of Rupees per annum, and that their force consisted or 12000 cavalry and 30000 infantry.—Governor, Sir Charles Eyer's letter dated Decr, 1696 (East India Records. Vol XIX, P. 263).

† "ঘনশ্যামসুতা জ্ঞেয়শ্চত্বারো গুরুসাহসাঃ
জগৎ কালুশ্চ বেণীশ্চ কৃষ্ণরামশ্চ বিশ্রুতঃ।

নেয়ামত খাঁ মোগল রাজকর্ম্মচারী। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—"সম্রাটের প্রজা আমি। তুমি রাজবিদ্রোহী। আমি তোমার কোন সহায়তা করিব না।" রহিম-সা, নেয়ামত খাঁর শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিল। নেয়ামত খাঁ মৃত্যু অবধারিত জানিয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। তদীয় ভ্রাতঃপুত্র তাহওয়ার (তাহওয়ার অর্থে—বীরপুরুষ) অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক, বিপুল বিক্রমে বিদ্রোহী সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধে বীরপ্রবর তাহওয়ার মৃত্যু-মুখে পতিত হন। নেয়ামত খাঁ, এই ভীষণ সংবাদ শুনিয়া, মহাক্রোধে উত্তেজিত ভাবে, শত্রুব্যূহ মধ্যে বিনা যুদ্ধসজ্জায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শাণিত অসির ভীষণ আঘাতে অনেক পাঠান ইহলোক ত্যাগ করিল। অবশেষে নেয়ামত খাঁ রহিম-সাকে আক্রমণ করেন। তিনি রহিমের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, তরবারির আঘাত করিলেন বটে, কিন্তু তাহার লৌহময় শিরস্ত্রাণের উপর পড়িয়া তাঁহার তরবারি ভাঙ্গিয়া গেল। নেয়ামত খাঁ, নৈরাশ্যজনিত ভীষণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, বলপ্রয়োগে রহিমের কটিদেশ হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া, তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বাহুবলে উত্তোলনপূর্ব্বক, ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে অশ্ব হইতে ক্ষিপ্রতার সহিত লম্ফ দিয়া, তাঁহার প্রশস্ত বক্ষোপরি উপবেশন পূর্ব্বক কটিদেশ হইতে "যমধর" নামক অস্ত্র খুলিয়া * লইয়া তাহার গলদেশে ভীষণ আঘাত করিলেন। এবারও "যমধর" বর্ম্মের সঙ্গে জড়াইয়া যাওয়াতে, রহিমসাহের কণ্ঠ ছিন্ন হইল না। এই অবসরে, রহিমসার সেনারা তথায় উপস্থিত হইয়া, নেয়ামত খাঁকে তরবারি ও বর্শার আঘাতে আহত করিল। তিনি অকর্ম্মণ্য হওয়ায়—শত্রু-সৈন্য তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর তাহারা তাহাদের দলপতিকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া, তাহাকে পুনর্জ্জীবন দান করিল এবং আহত নেয়ামত-খাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় শিবিরে লইয়া গেল। তখনও বীরপ্রবর নেয়ামতের প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। তিনি পিপাসিত হইয়া জলের জন্য চক্ষু

সভাসিংহ গণো ভূত্বা জগদাদিজ শৎপতিম।
বিশ্বেশ্বরং বিরুদ্ধৈব প্রায়ো রাজ্যচ্যুতোঽভবৎ।"
পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তি পঞ্জিকা।

ঘনশ্যামের চারিপুত্র—জগৎ, কান্নু, বেণী ও কৃষ্ণরাম অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিল। জগৎ প্রভৃতি শোভাসিংহের বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়া, জগৎপতি সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করায়, প্রায় রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল। তাঁহাদের জমীদারী বাজেয়াপ্ত হইলে, অনেক দরবারের পর, তদ্বংশীয়েরা উক্ত জমীদারী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (নিখিল বাবুর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ২৯৮।)

* মৎস্যাকৃতি একপ্রকার তীক্ষ্ণধার অস্ত্রবিশেষ। Stewart's Bengal. রিয়াজ-উস্-সালাতিন, ও মুরশীদাবাদের ইতিহাস।

উন্মীলন করিলেন। জনৈক শত্রু-সৈন্য, তাঁহার নিকট জলপূর্ণ পাত্র আনয়ন করিল। কিন্তু তিনি শত্রুহস্তে জলপান করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, পিপাসিত অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই যুদ্ধে বীরপ্রবর নেয়ামত খাঁর পক্ষে অনেক সৈন্য নিহত হয়। রহিম-সার সেনাগণ, তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে। তৎপরে বিদ্রোহী-সৈন্য, মহা দম্ভভরে মুখসুদাবাদে উপনীত হয়। মুখসুদাবাদে উপস্থিত হইয়া তাহারা পাঁচ হাজার বাদসাহী-সেনাকে পরাজিত করে। নগর লুণ্ঠন ও পাশবিক অত্যাচার দ্বারা একটা মহা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া, বিজয়ী বিদ্রোহীদল কাশিমবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। কাশিমবাজারের দেশীয় ব্যবসায়িগণ ভীত হইয়া—বিদ্রোহী সেনানায়কের নিকট কৃপা ভিক্ষা করায়, তাহারা কাশিমবাজার লুণ্ঠন সঙ্কল্প ত্যাগ করে। বিদ্রোহীদের নিকট এইরূপ হীনতা স্বীকার করার জন্য, কাশিমবাজারের প্রধান সওদাগর গোলাচাঁদকে পরে অনেক টাকা বাদসাহ সরকারে জরিমানা দিতে হয়।

এই সময় একদল বিদ্রোহী-সৈন্য, সুতালুটীর দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা মধ্যপথে কয়েকখানি গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিল। পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের জমীদারগণ একযোগে মিলিত হইয়া, বিদ্রোহীদের মধ্যে ৯০ জনকে নিহত করেন। আর একদল বিদ্রোহী, মোগলের পূর্ব্বকথিত "থানা" দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। হুগলীর ফৌজদারের অনুরোধক্রমে—এই সময়ে সুতালুটীর ইংরাজ কৌন্সিল, থানা-দুর্গের রক্ষার্থে দুইখানি জাহাজ প্রেরণ করায়, বিদ্রোহিগণ ভয় পাইয়া সেস্থান হইতে সরিয়া পড়িল।

এই সময়ে ইউরোপীয় বণিকগণ, মহোৎসাহে ও বিশেষ তৎপরতার সহিত তাঁহাদের দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্যে অগ্রসর করিয়া দেন। চুঁচুড়া, চন্দননগর ও সুতালুটী, তিন স্থানেই সমানভাবে রাত্রিদিন ব্যাপিয়া কাজ চলিতে লাগিল। ইংরাজেরা তাঁহাদের কলিকাতার দুর্গের একদিকের প্রাচীর পরিখা ও বুরুজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন।*

বিদ্রোহিগণ ১৬৯৭ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসের মধ্যে, রাজমহল হইতে মালদহ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূভাগ করায়ত্ত করিয়া বসিল। মালদহে ইংরাজ

* In the meantime the Europeans worked day and night in fortifying their factories at Chinsura, Chandernagore and Chnttanutty, at the latter place, the English constructed regular bastions, capable of bearing cannon, but to avoid giving offence, the embrasures were filled up on the outside, with a wall of single brick. Stewart's Bengal. (1813 Edition P. 334.)

ও ডচ্‌দিগের কুঠী ছিল। এই দুইটী কুঠী লুণ্ঠন করিয়া তাহারা যথেষ্ট লাভবান হয়।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব, এই বিদ্রোহ ঘটনার কথা, সরকারী "সওয়ানে নেগার" পত্রে প্রথমে জানিতে পারেন।* তিনি বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁর এই নিশ্চেষ্ট ব্যবহারে তাঁহার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া—তাঁহার পৌত্র আজিমওশ্বানকে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন। নবাব ইব্রাহিমখাঁর উপর আদেশ হইল—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সাহজাদা আজিমওশ্বান, বঙ্গের রাজধানীতে উপস্থিত হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি স্বকার্য্যেই থাকিবেন। তাঁহার পুত্র জবরদস্ত খাঁ—মোগল বাহিনীর অধিনায়করূপে, বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবেন। এতদ্ভিন্ন এই বিদ্রোহ দমন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য, অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও বেহার প্রদেশের শাসন-কর্ত্তাদের উপর আদেশ প্রচারিত হইল।

জবরদস্ত খাঁ, বহুদিন হইতেই তাঁহার পিতার এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে সম্রাটের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র, তিনি অসংখ্য অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সেনা লইয়া, রহিম-সার দমনের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এই প্রকাণ্ড বহরের সঙ্গে, জল পথে কতকগুলি রণতরীও চলিল।

এই সময়ে রহিম-সার হস্তে প্রচুর অর্থ আসিয়া পড়ায়, সে বলদর্পিত হইয়া সেনাদল বৃদ্ধি করিতে থাকে। এক রাজা বা রাজপুত্রের যেরূপ ঐশ্বর্য্যময় অবস্থায় থাকা উচিত—সে সেইরূপ চালই আরম্ভ করে। রহিম-সা যখন শুনিল সম্রাট-সেনা তাহার বিরুদ্ধে ঢাকা হইতে অগ্রসর হইতেছে, তখন সে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভগবানগোলায় ছাউনী স্থাপন করিল।

জবরদস্ত খাঁ একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি অতি ধীরভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একদল গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সেনাকে তিনি বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্রস্থল রাজমহল-ও মালদহে পাঠাইলেন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। রাজমহলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পাঠানসর্দ্দার ঘিরেট খাঁ নিহত হন। মোগলপক্ষ রহিম-সা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত অনেক সম্পত্তির

* সেকালের বাদসাহদিগের একশ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদের "সওয়ানে নেগার" বলিত। ইহারা সরকারী সংবাদপত্র লেখক। প্রত্যেক প্রধান শাসনকেন্দ্রেই এইরূপ "সওয়ানে নেগার" থাকিতেন। তাঁহারা দেশের কোথায় কি হইতেছে, তাহার সংবাদ সরাসর বাদসা সরকারে প্রেরণ করিতেন।

পুনরুদ্ধার করেন। এই সম্পত্তির মধ্যে, দিনেমার ও ইংরাজদের কুঠীর জিনিসপত্রও ছিল। ইংরাজগণ জবরদস্ত খাঁর নিকট সেগুলি ফিরাইয়া চাহিলেন। কিন্তু জবরদস্ত খাঁ বলিলেন—"নবাবের হুকুম ব্যতীত আমি এগুলি আপনাদের প্রত্যার্পণ করিতে পারিব না।" কাজে কাজেই ইউরোপীয় বণিকগণ নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

এইবার জবরদস্ত খাঁ, শত্রু শিবিরের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র যুদ্ধ জাহাজগুলি—শত্রুসৈন্যকে বাধা দিবার জন্য নদীবক্ষেই রহিল। তিনি কেবলমাত্র, গোলন্দাজ ও পদাতিক সেনা লইয়া, রহিম-সার দলকে আক্রমণ করিলেন। প্রথম দিনটা গোলাবর্ষণেই কাটিয়া গেল। অনেক পর্টুগীজ গোলন্দাজ, এই সময়ে মোগল সম্রাটের তোপখানায় চাকরী করিত। তাহারা ক্রমাগত গোলাবর্ষণ দ্বারা, শত্রুপক্ষের কয়েকটী কামান দখল করিল। পরদিন প্রভাতে, উভয় পক্ষীয় সেনাই প্রকাশ্য স্থলে যুদ্ধার্থে সমবেত হয়। মোগল পক্ষই প্রথম আক্রমণ করেন। কয়েক ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের পর, বিদ্রোহিগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। মোগলেরা, পুনরায় রহিম-সার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়।

জবরদস্ত খাঁ সেই রাত্রি—যুদ্ধক্ষেত্রেই অতিবাহিত করিলেন। উভয় পক্ষের আহত বন্দীদিগকে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করেন। যাহারা যুদ্ধে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের সমাধিকার্য্যও এই রাত্রে শেষ হইয়া যায়।

পরদিন প্রভাতে, জবরদস্ত খাঁ তাঁহার যুদ্ধ শিবির হইতে বঙ্গ বিহারের জমীদার ও জায়গীরদারদের নিকট এক পরোয়ানা পাঠাইয়া দেন। তাহাতে এই আদেশ ছিল—"সম্রাট-সৈন্য বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছে। সমস্ত জায়গীরদার ও জমীদারদের আদেশ করা যাইতেছে—যেন তাঁহারা বিদ্রোহী পাঠানদিগকে কোনরূপ রসদাদি দানে সাহায্য না করেন।"

এই আদেশপত্রের শুভফল দেখা দিল। বাদসাহী-সেনার বিজয় সংবাদ পাইয়া, সন্নিকটস্থ বড় বড় জায়গীরদারগণ জবরদস্ত খাঁর দলে, সেনাসমেত যোগদান করিলেন।

জবরদস্ত খাঁ—এইবার মুকসদাবাদের পথ ধরিলেন। বিদ্রোহীরা তখন এই স্থানেই সমবেত হইয়াছে। জবরদস্ত খাঁ—নগরের পূর্ব্বদিকের প্রশস্ত ময়দানে সেনা সমাবেশ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, পরদিন প্রভাতে রহিম-সাকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা সহিল না।

রহিম-সা সেই রাত্রিতেই গঙ্গা পার হইয়া, বর্দ্ধমানের দিকে পলায়ন করিল। সম্রাটসৈন্য বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাহাদের বর্দ্ধমান হইতে তাড়াইয়া দিল এবং পুনরায় সেই ছত্রভঙ্গ পাঠান-সেনার অনুসরণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে ঘটনাস্রোত সহসা অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত হইল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব, তাঁহার পৌত্র সাহজাদা আলীগহর আজিমওশ্বানকে মুক্তা-খচিত তরবারিসহ, বিশেষ খেলাত, উন্নত মনসব, ও মাহিখেতাব দিয়া বাঙ্গলা ও বিহারের সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম খাঁ এই নিয়োগে সুবাদারীপদ হইতে বরতরফ হইলেন। আজিমওশ্বান, স্বীয় পুত্র করিমউদ্দিন ও মহম্মদ ফরকৃসিয়রকে সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করেন। বাদসাহ পৌত্র, এলাহাবাদ ও আউধের (অযোধ্যা) পথ অবলম্বন করিয়া, অবিলম্বে বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন।* তাঁহার সহিত দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা ছিল।

এলাহাবাদে পৌছিয়াই, সাহাজাদা অযোধ্যা ও বেনারস বিভাগের শাসন-কর্ত্তাদের আদেশ করিয়া পাঠান—"আমি বঙ্গদেশে বিদ্রোহদমনে যাইতেছি, আপনারা আদেশ প্রাপ্তিমাত্র আমার সহিত সসৈন্যে যোগদান করিবেন।" বেনারস ও বেহার প্রদেশের জমীদার ও জায়গীরদারদের উপরও এইরূপ আদেশ জারী হইল।

পাটনায় পৌছিবার পর, সাহাজাদা আজিমওশ্বান, জবরদস্ত খাঁর বিজয়-কাহিনী অবগত হইলেন। দুরাকাঙ্ক্ষ রাজকুমার দেখিলেন—তিনি নিজে যে জয়মাল্য সুশোভিত হইয়া গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন, পিতামহ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট যশোভাজন হইতে পারিতেন, তাহা জবরদস্ত খাঁর ভোগ্য হইতেছে। সাহাজাদা আত্মস্বার্থ ও সম্ভ্রমরক্ষার্থে—জবরদস্ত খাঁকে নিষেধ করিয়া পাঠান—"আমি বর্দ্ধমানে না পৌছান পর্য্যন্ত, আপনি যুদ্ধাদি ব্যাপারে ক্ষান্ত থাকিবেন।"

জবরদস্ত খাঁ একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি সম্রাট-পৌত্রের এ আদেশের অর্থ বুঝিয়া, বিদ্রোহদমন ব্যাপারে নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করিলেন। সাহাজাদা মুঙ্গের হইতে রাজমহল ও রাজমহল হইতে বর্দ্ধমানের দিকে যাত্রা করিলেন। সম্রাট-পৌত্র বর্দ্ধমানের সন্নিকটস্থ হইলে, জবরদস্ত খাঁ

* রিয়াজ-উস্-সালাতিন—২১৯ (রামপ্রাণ বাবুর অনুবাদ)

সসৈন্যে বহুদূর প্রত্যুদগমন করিয়া, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য অগ্রসর হন। রাজশিবিরে উপস্থিত হইয়া, পদোচিত মর্য্যাদায় সহিত সম্মানিত না হওয়ায়, তিনি পদত্যাগ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, সুলতান আজিমওশ্বান তাঁহার এ প্রার্থনা পূরণে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। তাঁহার মনের উদ্দেশ্যই এই, যে কোন উপায়ে জবরদস্ত খাঁকে বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত করিতে পারিলেই, এই বিদ্রোহ দমনের সমস্ত যশোলাভ তাঁহারই হইবে। পিতার সহিত জবরদস্ত খাঁ, দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের নিকট চলিয়া গেলেন। ইহাতে আজিমওশ্বানেরই ক্ষতি হইল। কারণ জবরদস্ত খাঁর অধীনে যে আট হাজার সেনা ছিল—বাঙ্গলা ত্যাগ করিবার সময় তিনি তাহাদের সঙ্গে লইয়া গেলেন।

জবরদস্ত খাঁর ভয়ে, রহিম-সা আত্মগোপন করিয়া এখানে সেখানে পলাইয়া বেড়াইতেছিল। জবরদস্ত খাঁ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া, সে আবার তাহার আশ্রয়স্থান হইতে বাহির হইয়া হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি প্রদেশে পুনরায় উৎপাত আরম্ভ করিল ও সেই সকল স্থান, তাহার লুণ্ঠন-অত্যাচার দ্বারা—জনশূন্য হওয়ায়, সর্প, পশু, পেচকের নির্জ্জন আবাস স্থানরূপে পরিণত হইল।*

জবরদস্ত খাঁকে বিদায় করিয়া, সুলতান আজিমওশ্বান স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। জমীদার ও সেনাপতিদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য ও তাহাদের আশ্বস্ত করিবার জন্য—তিনি সম্রাটের আদেশপত্র ও রাজপতাকা জাহাঙ্গীর-নগর বা ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং আকবর-নগর হইতে যাত্রা করিয়া, সৈন্যবৃন্দের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের সেনাপতি ও রাজপুরুষগণ, নানাস্থান হইতে উপযুক্ত অর্থ ও উপঢৌকন সহকারে সাহজাদার নিকট উপনীত হইয়া, তাঁহার সহগামী হইলেন। মন্দভাগ্য রহিম-সাহ, সাহজাদার আগমন সংবাদ বিশ্বাস না করিয়া, শত্রুর গতিরোধ জন্য সতর্ক হইল না, কিন্তু তৎপরে রাজসৈন্যকে সহসা সমাগত দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে আফগান-সেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। শত্রুসৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া, সাহজাদা ভীত না হইয়া রসদ ও মালপত্র সঙ্গে না লইয়া, তিনি বর্দ্ধমান প্রান্তে উপনীত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন।

* রিয়াজ-উস্-সালাতিন—(২২০) Stewart's Bengal (1813 original Edition.)

সাহজাদা, রহিম-সাকে বলিয়া পাঠান—"যদি তুমি সহজে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমায় মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে তুমি সম্রাটের অনুগ্রহ ও পুরস্কার লাভ করিবে। কিন্তু যদি ইহার অন্যথা কর, তাহা হইলে তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।" ইংরাজ গবর্ণর আয়ার সাহেব লিখিয়াছেন—"যে সাহজাদা তাঁহার এই পত্র ও আদেশের সহিত—কয়েদীদের বেড়ী ও একখানা তরবারী পাঠাইয়া দেন।"*

র'হিম-সা—অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। সে সাহজাদার সহিত চাতুরী খেলিল। বেড়ী ফিরাইয়া দিয়া, সে তরবারি গ্রহণ করিল এবং বলিয়া পাঠাইল—"আমি বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। অপরন্তু আপনার পক্ষেও আফগানদিগকে হাতে রাখা বুদ্ধির কার্য্য। আপনার পিতামহ ঔরঙ্গজেব বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, সাম্রাজ্য লইয়া একটা মহা হুলুস্থুল উপস্থিত হইবে। এ সময়ে আফ্গান-সৈন্য যদি আপনার হাতে থাকে—তাহা হইলে বাঙ্গলার ন্যায় একটী বিস্তৃত বিভাগ, আপনার আয়ত্তাধীনে থাকিবে, আর আফ্গানেরাও আপনাকে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিবে। তবে আপনার নিকট সরাসরভাবে গিয়া আত্মসমর্পণ করিতে আমার সাহস হয় না। আপনি যদি আপনার প্রধান মন্ত্রী খাজা আন্ওয়ারকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে সকল ব্যাপারের সুচারু মীমাংসা হইয়া যায়।"

আজিমওশ্বান—পাঠানসর্দ্দার রহিম-সার কথায় বিশ্বাস করিয়া, খাজা আন্ওয়ারকে কতিপয় সঙ্গীর সহিত তাহার শিবিরে পাঠাইয়া দেন।

আন্ওয়ার খাঁ—সাহজাদার আদেশ পালনার্থ, অসতর্কাবস্থায় কতিপয় আত্মীয় অন্তরঙ্গসহ, অশ্বারোহণে আফগান শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দূতদ্বারা আপন আগমনবার্ত্তা রহিম-সাকে প্রেরণ করেন এবং তাহার

* It was reported that the Prince (Azim Ooshan) sent the rebel chief a pair of shackles and a sword desiring him to take his choice, that the rebel took the sword but sent a polite message to the Prince pointing out to him the great age of the Emperer, the contentions that must ensue upon his death and the favorable opportunity that was now presented to His Highness of securing for himself the rich province of Bengal by taking into his favor and service the Afgans whose friendship he would find out less servicable than their enmity would prove formidable—Sir Charles Eyer's Letter dated 6th January 1608—Stewart's Bengal. P. 352.

সাক্ষাৎলাভ জন্য, শিবিরের বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতে থাকেন। রহিম-সা মোগল-সেনাপতিকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য, আফ্‌গান-সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত ভাবে শিবির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। রহিম-সা নানারূপ ছলনা ও কৌশল অবলম্বন করিয়া, খাজা আন্‌ওয়ারকে শিবিরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করায়—আন্‌ওয়ার আপত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"ধূম হইতেও অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে।" তিনি রহিম-সাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আপনি স্বচ্ছন্দে বাহিরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। আপনার কোন আশঙ্কাই নাই।"

রহিম-সাহ, আন্‌ওয়ারের এ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া, সুসজ্জিত সৈন্য সমভিব্যারে, বৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, অপ্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে, নবাব আন্‌ওয়ার খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাক্য বর্ষণের পর, অস্ত্রবর্ষণ আরম্ভ হইল। মোগল-সেনাপতি, এ নীচ জনোচিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ও তাহার আন্তরিক দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় আগমনোদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত রহিম-সাহ, অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিল এবং তিনিও বাধ্য হইয়া বীরপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ক্ষুদ্র বিবাদের পরিণামে, আন্‌ওয়ার খাঁ কতিপয় সহচরসহ—জীবন বিসর্জ্জন করেন। ইহার পর রহিম-সা, রাজ-শিবির আক্রমণ করে। এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, রহিম-সা অতি সুকৌশলে বৃহ-রচনা করিয়াছিল। সম্রাট শিবিরের একদিক আক্রমিত হইবার পর, রহিম-সাহ মহাবিক্রমে কতিপয় বর্শাধারী, লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত, আফ্‌গান-যোদ্ধাসহ, রাজ-সৈন্যের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া, চীৎকার পূর্ব্বক আজিমওশ্বানকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিল।

মোগল-অশ্বারোহী ও পদাতিকগণ, সহসা এইভাবে আক্রান্ত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহারা আফ্‌গানদিগের প্রচণ্ড অস্ত্রবর্ষণের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া, সাহজাদাকে শত্রুর সম্মুখে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। রহিম-সা—মহাবিক্রমে, সুরচিত মোগল-বৃহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিল ও তৎপরে আজিমওশ্বান যে হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল।

আজিমের জীবন মহা বিপন্ন অবস্থায় উপনীত দেখিয়া, তাঁহার একজন বিশ্বস্ত অনুচর, কোরেশ-বংশীয় হামিদ খাঁ, প্রচণ্ডবেগে অশ্বচালনা করিয়া

রহিম-সার সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"দুরাত্মা! আমিই আজিমওশ্বান। আমার সহিত যুদ্ধ কর্।" এই কথা বলিয়া, হামিদ ক্ষিপ্রগতিতে ধনুকে তীরযোজনা করিয়া—রহিম-সার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিল। তীর অব্যর্থ হইল না। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আজিমের হস্তনিক্ষিপ্ত আর একটী তীর রহিম-সার গ্রীবা বিদ্ধ করায়, রহিম-সা ভূতলে পতিত হইল। হামিদ খাঁ ক্ষিপ্রগতিতে অবতরণ পূর্ব্বক—তাহার বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া, শিরশ্ছেদন করিলেন। তৎপরে রহিম-সার ছিন্নমুণ্ড তরবারির অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া উর্দ্ধে ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিলেন। আফ্গান-সৈন্য, এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া, ভয়াকুলচিত্তে রণস্থল পরিত্যাগ করিল। আজিমওশ্বান যুদ্ধজয়ী হইলেন। রণবাদ্য—মোগলের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিল।

মোগলের অশ্বারোহী-সেনা, পলাতক আফ্গান-সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাহাদের শিবির পর্য্যন্ত অনুসরণ করিল। যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাদেরই বধ করিল। আফগানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। অসংখ্য বন্দী ও বিপুল ধনভাণ্ডার মোগলের হস্তগত হইল। বিজয়-লক্ষ্মীর বরপুত্র সাহজাদা—জয়মাল্য সুশোভিত হইয়া, বর্দ্ধমান-নগরে উপনীত হইলেন। এবং সমগ্র বাঙ্গলা বিহারের প্রজা, তাঁহাকে এই ভীষণ অত্যাচারময় বিদ্রোহ-দমনের জন্য, দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। মহাপুরুষ হজরৎ-সাহ ইব্রাহিম ছাক্কার সমাধি-মন্দির দর্শনান্তে, সাহজাদা—বর্দ্ধমান দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই বিদ্রোহ-ব্যাপারের শেষাংশ বিবৃত করিবার জন্য, আমরা আবার রিয়াজের কাহিনী অনুসরণ করিতেছি। সাহজাদা আজিমওশ্বান বর্দ্ধমান হইতে পত্র প্রেরণ করিয়া, স্বীয় বিজয়-বার্ত্তা সম্রাটকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। রহিম-সার পক্ষাবলম্বন করিয়া যাহারা সম্রাট-শক্তির বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিল, তাহাদের শাসনের জন্য এইবার মনোযোগী হইলেন। মোগল-সৈন্যগণ যে স্থানে আফ্গানদের সন্ধান পাইল, সেই স্থানেই তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ বা বন্দী করিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই হুগলী, বর্দ্ধমান ও যশোর জেলা আফগান-শূন্য হইল। আফগানদের অত্যাচারে, যে সকল স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, বিদ্রোহ ও অত্যাচার শান্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাহা আবার জনপূর্ণ হইতে লাগিল। বাঙ্গলার যে সকল গৃহস্থ, শোভাসিংহ ও রহিম-সার অত্যাচারে, হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান ত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলাইয়াছিল, তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়া গৃহকক্ষে দীপ জ্বালিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নিহত রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র, জগতরাম রায়, পৈত্রিক জমিদারী উত্তরাধিকার সূত্রে পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। নূতন বন্দোবস্ত অন্তে, খালসা ও জাইগীর-মহল সমূহের কর আদায় হইতে লাগিল। তয়ুল, আয়মা, আল্‌তমগা প্রভৃতি বিভিন্ন-শ্রেণীর জায়গীরদারগণ * আপন আপন মহলের ভার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার পৌত্রের জীবন-রক্ষাকারী হামিদ খাঁকে, সমসের খাঁ—উপাধি ও উচ্চ-মন্সব দিয়া, শ্রীহট্ট ও বান্দাশালের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিলেন। যে সকল খাস-কর্ম্মচারী যুদ্ধকালে কার্য্য পটুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহারাও আপন আপন পদ-মর্য্যাদা ও পারদর্শিতানুসারে, যথাযোগ্যরূপে সম্মানিত হইয়া মন্সব প্রাপ্ত হইলেন।

সাহজাদা আজিমওশ্বান বর্দ্ধমানের দুর্গমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন, এবং তথায় অট্টালিকার ভিত্তি-পত্তন করিলেন। তাঁহার বর্দ্ধমান-বাসের স্মৃতিরক্ষার জন্য, তিনি বর্দ্ধমানে একটী জুমা-মসজেদ ও হুগলীতে সাহগঞ্জ বলিয়া একটী গঞ্জ বা বাজার প্রতিষ্ঠা করিলেন। লোকে এই বাজারকে সাহগঞ্জ না বলিয়া, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে "আজিমগঞ্জ" বলিয়া উল্লেখ করিত।

রাজস্ব সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন বন্দোবস্ত করেন। সে সব কথা বিশদ আলোচনার স্থান আমাদের নাই। সাহজাদা রাজকার্য্যেই অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিতেন। অবসর সময়ে, সম্ভ্রান্ত আমির ওমরাহগণের সহিত মিলিত হইয়া, হদিস্ মস্নবি ও মৌলানারুমের কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করিতেন। বিদ্বান, সদ্বংশজ ও কীর্ত্তিমান ব্যক্তিগণের উপর, তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। ধার্ম্মিক ও সংসারবিরাগী সাধুগণকে তিনি অতি সম্মান করিতেন ও তাহাদের উপদেশ লইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইতেন।

বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে, তিনি বায়েজিদ্ নামক জনৈক সুফী সাধু-ফকিরের যশের কথা শুনিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাতার্থে ব্যগ্র হন, এবং তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আনিবার জন্য তাঁহার পুত্রদ্বয়, সাহজাদা করিমউদ্দিন ও ফরুক্শিয়ারকে তাঁহার আস্তানায় প্রেরণ করেন। রাজকুমারদ্বয়, সুফীর বাসভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে "সেলাম-আলেকম্" বলিয়া অভিবাদন

---

* রাজকার্য্য জন্য বেতনের পরিবর্ত্তে—সেকালে নিষ্কর-ভূমি দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই ভূমির নাম তয়ুল। এতদ্ভিন্ন কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ অনেকে নিষ্কর-ভূমি পাইতেন। ইহাকেও তয়ুল বলিত। বিদ্বান, ধার্ম্মিক, দরিদ্র, সদ্বংশজ দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে নিষ্কর ভূমিদানের নিয়ম ছিল। এই ভূমির নাম আয়মা ও আল্‌তমগা। আল্‌তমগা-ভূমি সম্বন্ধে উত্তরাধিকার ও দান-বিক্রয়েরও নিয়ম ছিল। (রিয়াজ-উস্-সালাতিন—২২৪ পৃঃ)

করেন। সাহজাদা করিমউদ্দিন, স্বভাবতঃই একটু গর্ব্বিত। রাজোচিত পদ-পদমর্য্যাদার লাঘব হইবে বলিয়া, সুফীকে প্রত্যভিবাদন করেন নাই। কিন্তু রাজকুমার ফরকশিয়ার, নগ্নপদে তাঁহার নিকট সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। তৎপরে পিতৃ অভিলাষ ব্যক্ত করেন। ফকির ফরকশিয়ারের বিনয় নম্র ব্যবহারে প্রীত হইয়া, তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলেন—"আসুন! আসন গ্রহণ করুন, আপনি হিন্দুস্থানের সম্রাট!" তৎপরে তিনি ঈশ্বর সমীপে তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা বিধাতার নিকট মঞ্জুর হইয়াছিল—কারণ এই ফরকশিয়ারই ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অতঃপর ফকির, রাজ-প্রাসাদে গমন করিলে, আজিমওশ্বান যথোচিত নম্রতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় মনোভিলাষ পূরণ জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন।* ফকির প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"রাজকুমার! আপনার কাম্যবস্তু ইতিপূর্ব্বেই ফরকশিয়ারকে দেওয়া হইয়াছে। করধৃত তীর একবার নিক্ষেপ করিলে তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না।" ইহার পর ফকির, সাহজাদা আজিমওশ্বানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন।

আজিমওশ্বানের বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে, চুঁচুড়ার দিনেমার বণিকগণের কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহার নিকট একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এই দূত সাহজাদার নিকট আবেদন করিলেন—'ইংরাজেরা তাঁহাদের দ্রব্যাদির শুল্ক, বাৎসরিক তিন হাজার করিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু দিনেমারদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে শুল্ক দিতে হয়। অতএব দিনেমারদিগের প্রার্থনা, যেন ইংরাজদের মত তাহাদের শুল্কের হার নির্দ্দিষ্ট হয়।"

আজিমওশ্বান কর্ম্মক্ষম হইলেও, সকল কাজেই তিনি দীর্ঘসূত্রী ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, উৎকোচ, নজরানা প্রভৃতি হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা। তিনি বঙ্গদেশ হইতে যত অর্থ লইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ আর কোন শাসনকর্ত্তাই পারেন নাই। কাজেই দিনেমারেরা তাঁহাদের আবেদনের আর কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না।

এদিকে ইংরাজ বণিকগণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যাহাতে দিনেমারেরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ চক্রান্ত না করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা মিঃ ওয়ালশকে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন। ওয়াল্‌শ একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী। ওয়াল্‌শকে বর্দ্ধমান প্রেরণের দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমটী এই, তিনি

*. Stewart's Bengal. (P. 349). রিয়াজ-উস্-সালাতিন ২৪৬ পৃঃ।

বর্দ্ধমানে রাজ-প্রতিনিধির দরবারে সদলবলে উপস্থিত থাকিয়া, দিনেমারদের গুপ্ত-চক্রান্তে বাধা দিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ—কলিকাতা, সুতালুটী, গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করা তখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধেও বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। তৃতীয়—সাহজাদার নিকট নূতন নিশান বা অনুমতিপত্র প্রার্থনা করা—যাহার বলে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র, তাঁহারা বিনাশুল্কে অবাধে বাণিজ্য করিতে পারিবেন। চতুর্থ শোভাসিংহের বিদ্রোহব্যাপারে, মালদহের ইংরাজ-কুঠীর যে মালামাল লুণ্ঠিত হইয়াছিল, যাহা তাহারা জবরদস্ত খাঁর নিকট চাহিয়ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করেন নাই, সে গুলিরও উপায় হইবে।

শোভাসিংহের বিদ্রোহই, ইংরাজদের সৌভাগ্যলক্ষীর নিয়ামক। এ বিদ্রোহ উপস্থিত,না হইলে, তাঁহারা "ফোর্ট-উইলিয়াম" দুর্গের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। নবাব ইউরোপীয় বণিকদিগকে আত্মরক্ষার সম্মতি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অর্থ এরূপ নহে—সে তাঁহারা পাকা-পোক্ত-ভাবে কলিকাতায় দুর্গ-নির্ম্মাণ করিবেন। এ সম্বন্ধে বাদসাহ ইতিপূর্ব্বেই এক প্রতিকূল আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।* তবে নবাব যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহার অর্থ এই—কোম্পানী', তাঁহাদের বাণিজ্যাগার রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবেন। অথচ বাণিজ্যাগারটীকে সুদৃঢ় প্রাচীরাদিতে বেষ্টিত না করিলে, আত্মরক্ষার আর কোনরূপ উপায়ই নাই। কাজেই তাঁহারা দুর্গের ভিত্তিপত্তন করিয়া তাহার দেওয়াল গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন।

দুর্গ-নির্ম্মাণ কার্য্য অতি দ্রুতভাবে চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু একটী ব্যাপারের জন্য কোম্পানী বড়ই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ধরিতে গেলে, যে স্থানের উপর তাঁহারা কুঠী ও দুর্গ-নির্ম্মাণ করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা জায়গীরদারের সম্পত্তি। জায়গীরদার মোগল-সরকারে রাজস্ব দেন ও জমীর দখলী-স্বত্ব তাঁহার। জমীর উপর ইংরাজদের কোন কায়েমী-স্বত্বই নাই। তাঁহাদের স্থানত্যাগ করিতে বলিলেই, তখনিই উঠিয়া যাইতে হইবে। হুগলীর ঘটনাটী, তাঁহারা যে ভুলিয়াছিলেন তাহা নহে। এইজন্যই ইংরাজেরা সুতালুটী, কলিকাতা, গোবিন্দপুর গ্রাম কয়খানি জায়গীরদারদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। তখন বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমী-দারগণ এই গ্রাম তিনখানির মালিক। কিন্তু বঙ্গের শাসন-কর্ত্তার অনুমতি না পাইলে, তাঁহারা গ্রাম বিক্রয় করিতে সাহসী হইলেন না। এজন্য

* Wilson's Early Annals. P. 147. Stewart's Bengal. (342)

ইংরাজগণ বাধ্য হইয়া সুলতান আজিমওশ্বানের দরবারে ওয়ালশ্‌ সাহেবকে প্রেরণ করেন।

ওয়ালশ্‌ সাহেব—১৬৯৮ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে, বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন। কিন্তু এই কার্য্যগুলি নিষ্পত্তির জন্য, তাঁহাকে সাত মাসকাল বর্দ্ধমানে থাকিতে হয়। সুলতান আজিমওশ্বান তখন বিদ্রোহ-ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত—সুতরাং এ বিষয়ে কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই।

যোলটী হাজার মুদ্রা ব্যয় করিয়া, কোম্পানী বাহাদুর এই গ্রামত্রয় ক্রয় করিবার অনুমতি পত্র পাইয়া, সুতালুটীতে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু জমীদার সাবর্ণ মহাশয়েরা, এই আদেশপত্রে দেওয়ানের সহী না দেখিয়া বিক্রয়ে অসম্মতি প্রকাশ করায়, এই সহী-ব্যাপার মীমাংসার জন্য, আরও কিছু সময় কাটিল। মোটের উপর, এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার শেষ হইতে প্রায় বৎসরাধিককাল লাগিল। ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজ কোম্পানী, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারের নিকট হইতে পুনরায় স্বাধীনভাবে বঙ্গের সর্ব্বত্র অবাধ বাণিজ্যের স্বত্বলাভ করিলেন।

কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনখানি কিনিবার অনুমতি পাইয়া, ইংরাজ কোম্পানী সাবর্ণ-জমীদার রামচাঁদ রায়, মনোহর রায় প্রভৃতির সহিত—জমী ক্রয় সম্বন্ধে লেখাপড়া শেষ করিয়া ফেলিলেন।*

যে বয়নামা বলে ইংরাজগণ কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়ের জমীদারী ক্রয় করেন, তাহার অবিকল ইংরাজী প্রতিলিপি পরে প্রদত্ত

* এই সময়ে বিলাতে আর একটী নূতন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। এ কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন। নূতন কোম্পানীর কর্ত্তারাও, বঙ্গে বাণিজ্য স্বত্বলাভের জন্য নানা চেষ্টা করেন। এই লইয়া নূতন ও পুরাতন উভয় ইংরাজ কোম্পানীর মধ্যে ভয়ানক বিবাদ বাধে, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট বলেন—"It was during this period that the great contest between two English companies took place in Bengal. The Prince (Azim-Oshan) did not understand the subject, but took bribes from both parties. From the Old company he got 16000 Rs and from the new 14000.

এই গ্রামত্রয় ক্রয় ব্যাপারে হুগলীর ভূতপূর্ব্ব ফৌজদার, জৈনউদ্দিন খাঁ ইংরাজ কোম্পানীকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তিনি রাজকুমার ফরকশিয়ারকে—রাজী করিয়া ১৬ হাজার টাকার নজরানা প্রদানে এই অনুমতিপত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। খোজা সারহাদ বলিয়া একজন আর্ম্মাণিও এই ব্যাপারে ইংরাজদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই গ্রামত্রয়ই ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মী ও প্রথম জমীদারী। এই জমীদারীর ভাগ্যবলেই বর্ত্তমান বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য অর্জ্জিত হইয়াছে। A. K. Roy's History of Cal Chap IV.

হইল। এ দলিলখানি অতি বহুমূল্য ও প্রাচীন ও এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।*

DEED OF PURCHASE OR "BAINAMA" OF THE THREE TOWNS KALIKATA, SUTANUTTY AND GOVINDPUR.

(BRITISH MUSEUM ADDITIONAL. MSS. NO. 24039. NO. 39.)

Copy of the Deed of Purchase of the Villages, Dihi Kalikata &c. bearing the seal of Quaji and the signature of the Zaminders. The details are as follows—

We submissive to Islam, declaring our names (1) bearing our names and descent viz. Manohar Dat (2) son of Bas Deo, the son of Roghu and Ramchand the son of Bidyadhur, son of Jagadis (3) and Ram Bhadar the son of Ram Das, son of Kesu (4) and Pran the son of Kalisar the son of Gouri and Manohar Sing son of Gandarb the son of. * * * * (5) being in a state of legal capacity and in enjoyment of all the rights given by the law, avow and declare, upon this wise ; that we conjointly have sold and made a true and

* স্বনাম-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উইলসান সাহেব, বহু চেষ্টায় এই পুরাতন দলিলের একটী প্রতিলিপি বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে সংগ্রহ করেন। কলিকাতার সেন্সস্ অফিসার মিঃ এ, কে, রায় মহাশয়কে তিনি সেই দলিলখানি ব্যবহার করিতে দেন। History of Old Fort-William গ্রন্থেও ইহার একটী প্রতিলিপি আছে। রায় মহাশয়ও ইহার একখানি লিপি দিয়াছেন। আমরা উভয়ের সহায়তা গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত পাঠটী উদ্ধৃত করিলাম।

(1) The names which follow, are the names of decendants of Lakshmikanta Mozumder.

(2) Manohar Dat is probably a mistake for Monohur Deo. In the pedigree, Mahadeva is the son ef Basudeva who is the son of. Raghudeva who was the son of Jagadis who was the son ef Ram Rai, who was son of Lakshmikanta.

(3) Jagadis the grandson of Lakshmikanta as above.

(4) Kulesvara the son of Kesav Rama, son of Srimanta son of Gouri Rai son of Lakshmikanta.

(5) The blank probably stands for. "ditto" Gandharba being the son of Gouri Rai the son of Lakshmi Kanto as above.

legal Conveyance of the Villages Dihi Kalkatah and Sutaluti within the jurisdiction of Parganah Amirabad and Village Gobindpur under the jurisdiction of Parganas Paikan and Kalikata to the English Company with rents and uncultivated lands and ponds and groves and rights over fishing and wood lands and dues from resident artisans, together with the lands appertaining thereto, bounded by the accustomed notorious and usual Boundaries, the same being owned and and possessed by us (up to this time the thing sold being in fact and in law, free from adverse rights or litigation forming a prohibition to a valid sale and transfer) in, exchange for the sum of one thousand and three hundred Rupees current coin of this time including all rights and appurtenances thereof, internal or external, and the said purchase money transferred to our possession from the possession of the said purchaser and we have made over the aforesaid purchased thing to him and have excluded from this agreement all false claims, and we have become absolute guarrantors that if by chance any person entitled to the aforesaid boundaries should come forward and defence thereof is incumbeut upon us, and henceforth niether we, nor our representatives absolutly or entirely in no manner whatsoever, shall lay claim to the aforesaid boundaries nor shall the charge of litigation fall upon the English Company. For these reasons we have caused to be written and have delivered there few sentences that when need arises they may be evidence. Written on the 15th of the month Jamadi I in Hijri Year 1110. equivalent to the 44th. year of the reign full of glory and prosperlity. *

The date is eqivalent to November 9. 1698.

কোম্পানী, জায়গীরদার সাবর্ণ মহাশয়দিগকে, এই তিনখানি গ্রামের জন্য জাইগীরদারের প্রাপ্য যে খাজনা দিয়াছিলেন—তাহা কোম্পানীর পুরাতন সেরেস্তায় এখনও বর্ত্তমান। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা মাত্র একটী বৎসরের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। স্থানাভাবে অন্যগুলি পরিত্যক্ত হইল।

বৎসর	খাজনা গৃহীতার নাম	কন্‌সল্‌টেসান বহির তারিখ।	মোট টাকা	
১৭১৮ খৃঃঅব্দঃ	সুখদেব	১০—৪—১৭১৮	৩২৫	
	রত্নেশ্বর	২৪—৪—১৭১৮	৩৩	
	মহাদেব	১২—৫— "	৭০	
	সুখদেব	১১—৮—১৭২৮	৩২০	॥০
	বিনোদরাম	১৮—৮—১৭১৮	৩৭	।৵
	মহাদেব	৯—১০— "	৭১	
	সুখদেব	৮—১২— "	৩২৫	
	বিনোদরাম	৬—১—১৭১৯	৩০	
	"	"	৭০	
			১২৮১	৸৵০

পলাশীযুদ্ধের তিনবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের হিসাব, এ, কে, রায় মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ, আমরা কেবল একটী বৎসরের বিবরণ, পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য প্রদান করিলাম।

এক্ষণে আমরা পূর্ব্ব কাহিনীর অনুসরণ করিতেছি। চার্ণকের মৃত্যুর পর স্যর জন গোল্ডসবরা, কোম্পানীর বাণিজ্যাগার সমূহের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া কলিকাতায় আসেন। ধরিতে গেলে, তিনি দুর্গের প্রথম ভিত্তিস্থাপন করিয়া যান। গোল্ডস্‌বরা যে স্থানটীকে দুর্গ-নির্ম্মাণের উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, তাহা "ডিহি কলিকাতার" মধ্যে অবস্থিত। (Dhee Coliecotta) ভাগিরথীতীরে ইহাই সর্ব্বোচ্চস্থান। চার্ণক যে কয়খানি বাটি কোম্পানীর কুঠীর জন্য বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন, তাহা এই স্থানের মধ্যেই অবস্থিত। ইহার দক্ষিণেই পূর্ব্বোক্ত গোরস্থান।* নিকটেই বড়-বাজার। এই বড়বাজার তখন বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ সেটেল-

* সেণ্টজন গির্জ্জা সংলগ্ন পূর্ব্বোক্ত গোরস্থান। চার্ণকের ন্যায় গোল্ডস্‌বরাও এখানে সমাহিত হন।

মেণ্টের বা উপনিবেশের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা বড়বাজার হইতেই পাওয়া যাইত।

তাহার পর শোভাসিংহের বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ-ব্যাপারে দুর্গ-নির্ম্মাণ কার্য্য সম্বন্ধে আরও সুবিধা হইল। নবাব, ইংরাজ ফরাসী ও দিনেমার বণিকগণকে তাঁহাদের বাণিজ্যাগার রক্ষার আদেশ দিলেন। এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই, ভবিষ্যৎদর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইংরাজ-বণিকসম্প্রদায়, মহোৎসাহের সহিত দুর্গ-নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের বাণিজ্য-কুঠী "গড়বন্দী" হইয়া অনেকটা নিরাপদ হইল।

দুর্গের প্রথম বুরুজ ও দেয়াল নির্ম্মাণের কার্য্য, অতি দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বড়ই ভয়, যে পাছে নবাব জানিতে পারিয়া দুর্গের-নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে দুর্গ-নির্ম্মাণ কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইল, যে কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মান্দ্রাজ হইতে দশটী কামান আনিয়া, বুরুজের উপর স্থাপন করিলেন। উক্ত বৎসর মে মাসে, তাঁহারা মাটীর গুদাম-ঘরগুলিকে পাকা-কোঠায় পরিণত করিলেন। ১৭০২ খৃঃ অব্দের রিপোর্ট হইতে প্রকাশ—"আমাদের কলিকাতার দুর্গ এরূপভাবে সুদৃঢ় হইয়াছে, যাহার সহায়তায় আমরা নবাবের বা ফৌজদারের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি।" দুর্গের চারি-দিকের প্রাচীরগুলি পাকা ইটে ও উৎকৃষ্ট মসলায় তৈয়ারী হইয়াছিল।

১৭০৭ খৃঃ অব্দের পুরাতন কাগজ পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, এই পুরাতন ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের * উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বের বুরুজ ছাড়া আর বুরুজ ছিল। কিন্তু ঐ বৎসরে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া মহা বিবাদ উপস্থিত হয়, ও দেশব্যাপী একটা মহা বিশৃঙ্খলা জাগিয়া উঠে। এই সময়ে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, ইংরাজেরা নদীতীরের দিকের অসমাপ্ত বুরুজ দুইটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন।

পাঠক—বর্ত্তমান সময়ে একবার লালদিঘীর নিকট কোন স্থানে দাঁড়াইয়া এই পুরাতন ফোর্ট-উইলিয়ামএর আনুমানিক চিত্র, মনোমধ্যে অঙ্কিত করুন। আমরা এই দুর্গের একখানি চিত্র এই পুস্তকের যথাস্থানে সংযোজিত করিলাম। ইহাই প্রাচীন ফোর্ট-উইলিয়াম। কিন্তু এই পুরাতন চিত্র হইতে

---

* ইংলণ্ডের তদানীন্তন সম্রাট উইলিয়ামের নামানুসারে ১৭০০ খৃঃঅব্দ হইতেই, পুরাতন দুর্গের এই নামকরণ হইয়াছিল। এখনও নূতন দুর্গ এ নামেই পরিচিত।

একেবারে বিলুপ্ত, সেই প্রাচীন দুর্গের প্রকৃত অবস্থান স্থান নির্ণয় করা অতি দুরূহ। বর্ত্তমানে এইরূপ অসুবিধার আর কোন কারণ নাই। কারণ আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রত্নতত্ত্বপ্রিয়,বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুর, পিত্তল-নির্ম্মিত রেখা দ্বারা এই দুর্গাধিকৃত স্থানটী বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান ফেয়ার্লি-প্লেস হইতে এই চিহ্নের আরম্ভ ও কয়লাঘাট রাস্তায় ইহার শেষ।

আজকালকার বড় ডাকঘর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট আফিস সমূহের অধিকৃত স্থান, কষ্টম হাউস ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল-কোম্পানীর সুবৃহৎ আফিস-বাটীর অধিকৃত ভূভাগোপরি, প্রাচীন "ফোর্ট-উইলিয়ম" দুর্গ-নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গের দক্ষিণদিকে যে সমস্ত মালগুদাম বা Warehouse নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলি বর্ত্তমান কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের সান্নিধ্যে ছিল। বর্ত্তমান ফেয়ার্লি-প্লেস্ই, এই দুর্গের উত্তরদিক। পশ্চিমদিকে ভাগীরথী, পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ডালহাউসী স্কোয়ার ও লালদীঘি অবস্থিত। এই লালদীঘিই সেকালের কাগজপত্রে "Park" পার্ক বলিয়া উল্লিখিত।

দুর্গের বাহিরে, পূর্ব্বদিকের দুর্গ-প্রাচীরের অতি সান্নিধ্যেই, সেণ্ট এ্যান্ নামক এক গির্জ্জা ছিল। ১৭০৯ খৃঃ অব্দে এই গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। আজকাল যেস্থানে, ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরদের কাউন্সিল-চেম্বার বা মন্ত্রণা-সভাগৃহ বর্ত্তমান, সেইস্থান অধিকার করিয়াই, এই "সেণ্ট এ্যান্ গির্জ্জা" অবস্থিত ছিল। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই গির্জ্জায়—ইংরাজ উপনিবেশের কর্ম্মচারিগণ ও কলিকাতার খ্রীষ্টান্ অধিবাসিগণ ভজনাদি করিতেন।

১৭০৯ খৃঃ অব্দে দুর্গের সম্মুখস্থ লালদীঘি পুকুরটীর পঙ্কোদ্ধার করান হয়। এই লালদীঘির অবস্থা তখন এরূপ উন্নত ছিল না। পুকুরটী যত্নের অভাবে পঙ্ক-শৈবালাচ্ছাদিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন কলিকাতার মধ্যে উৎকৃষ্ট পানীয়জলের বড়ই অভাব ছিল। এইজন্যই লালদীঘির সংস্কার করান হয়। ইহার চারিদিকে—কঙ্করমণ্ডিত ক্ষুদ্র পথ ও নানাবিধ বৃক্ষাদি রোপণ করান হয়। অন্যান্য গাছের মধ্যে, কয়েকটী কমলালেবুর গাছও এই বাগানে ছিল। লালদীঘির জল অতি পরিষ্কার ছিল বলিয়া, ইংরাজ অধিবাসিগণ ইহার জল পান করিতেন। এতদ্ব্যতীত এই বাগানের একাংশে শব্‌জীবাগানও ছিল। নানাপ্রকার তরী-তরকারী এই বাগানে উৎপন্ন হইত। কোম্পানীর গবর্ণর ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ, এই বাগানের তরী-তরকারী ব্যবহার করিতেন। নানাবিধ ফলের গাছও এই লালদীঘিতে রোপিত হয়। এই লালদীঘির জল, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল ও শাক-শব্‌জীই, তখন কলিকাতা সেটেল-

মেন্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রধান উপভোগ্য ছিল। তখন ইহার নাম ছিল—"Green before the Fort" কোম্পানীর ফ্যাক্টারেরা চন্দ্রালোকিত রাত্রে, এইস্থানে প্রকৃতির নৈশশোভা সন্দর্শনে ও বিমল বায়ুসেবনে, তৃপ্ত হইতেন। কখন বা তাঁহারা পক্ষী ইত্যাদি শিকার করিয়া, আনন্দ উপভোগ করিতেন। সেকালের কাগজ-পত্র হইতে আমরা দেখিতে পাই, বাগানটী পরিস্কৃতভাবে রাখিবার জন্য, কোম্পানী মাসিক দশ টাকা করিয়া খরচ করিতেন। পুরাতন জমা খরচের খাতায় দেখিতে পাওয়া যায়—"বাগানের শোভাবর্দ্ধন জন্য ৩৪৲ টাকা খরচ মঞ্জুর করা হইল। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও শৈবালাদি পরিষ্কারের জন্য ২০৲ টাকা মঞ্জুর হইল।"*

কলিকাতার পুরাতন দুর্গের অবস্থাও এই সময়ে যথেষ্ট উন্নত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—দুর্গের উত্তর দিকের পরিসর ৩৪০ ফিট্, দক্ষিণদিক ৪৮৫, পূর্ব্ব পশ্চিমদিক ৭১০ ফিট ছিল। চারিকোণে চারিটি বুরুজ করা হয়। প্রত্যেক বুরুজের উপর দশটী করিয়া কামান সাজান ছিল। পূর্ব্বদিকের প্রধান দ্বারপার্শ্বে পাঁচটী কামান ছিল।

দুর্গপ্রাচীর চারি ফিট্ পুরু এবং ১৮ ফিট্ উর্দ্ধ ছিল। নদীর দিকটী আরও পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়। পাঠক মনে রাখিবেন, আজকাল যে স্থান "ষ্ট্রাণ্ড রোড" বলিয়া পরিচিত ও যাহার উপর দিয়া এখন ট্রামগাড়ী চলিতেছে, তাহা তখন নদীগর্ভে ছিল। বর্ত্তমান ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল-আফিসের উঠানের মধ্যে প্রবেশ করিলেই, এই দুর্গ পার্শ্ববাহিনী নদীর অবস্থান স্থান, অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নদীতীরের যে স্থান দিয়া সিরাজের সেনারা প্রবেশ করে—সেস্থানটী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। লর্ডকর্জ্জন বাহাদুর নদীতীরবর্ত্তী এই ঘাটের স্থানটী নির্দ্দেশ করিয়া, তথায় একটী প্রস্তর-ফলক মারিয়া দিয়াছেন। দুর্গের মধ্যে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ আকারের গৃহনির্ম্মিত হয়। এ ঘরগুলি ততটা উচ্চ ছিল না। এগুলি সেকালে Long Row বলিয়া পরিচিত ছিল। কোম্পানীর যুবক কর্ম্মচারিরা, এই সকল গৃহে বাস করিতেন। দুর্গের উত্তরদিকে অস্ত্রাগার ও বারুদখানা। এই অস্ত্রাগারের নিকট মালগুদাম, চিকিৎসালয় ও কারখানা ছিল। দুর্গের দক্ষিণদিকে দুইটী ফটক ছিল। এই ফটক হইতে একটী রাস্তা, বরাবর নদীতীরের দিকে গিয়াছিল। অপর রাস্তাটী পূর্ব্বদিকে লালদীঘি (বর্ত্তমান ডালহাউসি

* Calcutta Review Vol. XVI II. Consultation Book Vol. 1. Captain Hamilton's Accounts.
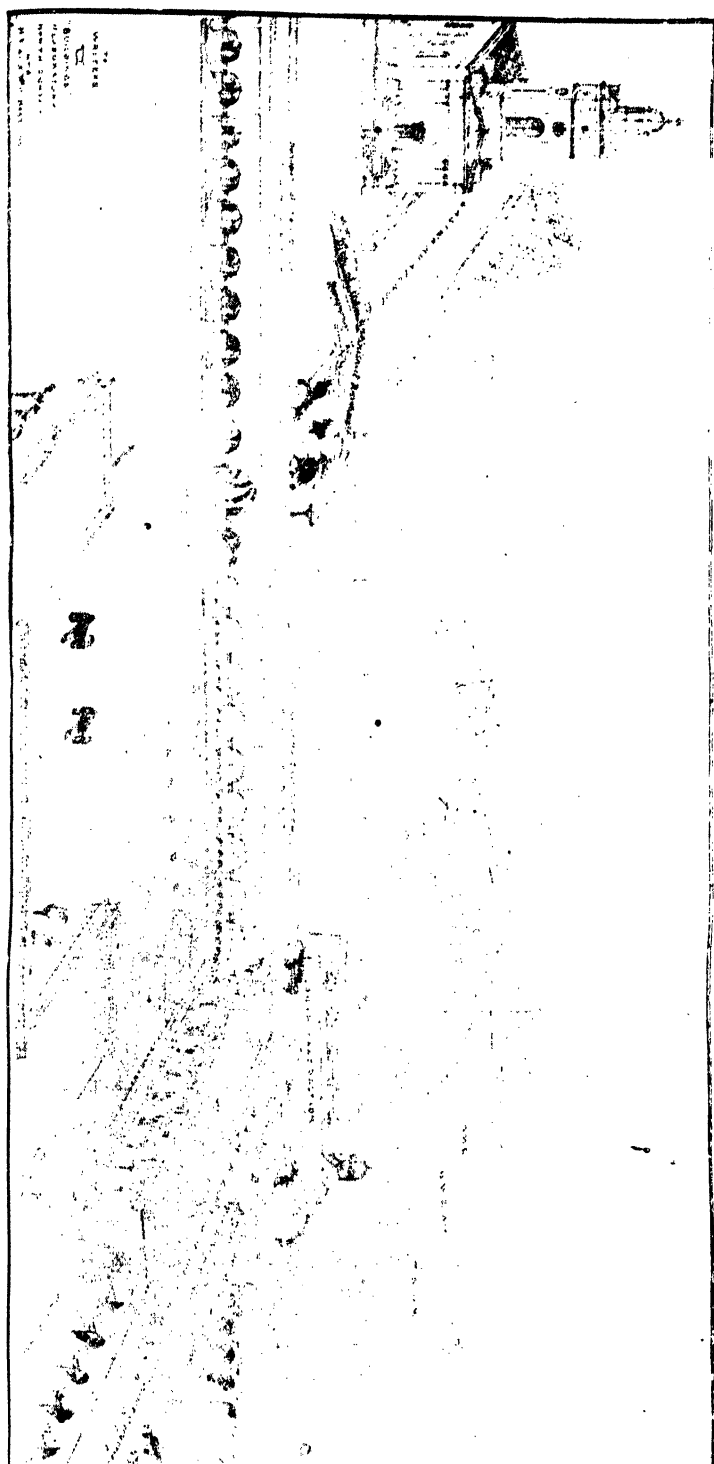
স্কোয়ার নর্থ) লালবাজার ও বউবাজারের দিকে অগ্রসর হইয়া—শিয়ালদহের বৈঠকখানা বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দুর্গের দক্ষিণদিকে যে সমস্ত গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তাহাতে কোম্পানীর মালামাল থাকিত। বর্ত্তমান কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের পার্শ্বে, এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট ওয়্যার-হাউস বা মাল-গুদাম ছিল।

দুর্গের দক্ষিণ দিকস্থ প্রাঙ্গণ মধ্যে, গবর্ণরের আবাসগৃহ ছিল। দুর্গের মধ্যে এই গৃহটীই সর্ব্বাপেক্ষা শোভনীয় ছিল। হ্যামিলটান, মুক্তকণ্ঠে ইহার স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

এখন এই দুর্গের প্রাচীন চিহ্নের বিশেষ কিছু নিদর্শন নাই। তবে ইহার ঘর বাড়ীগুলি কিরূপ ধরণের ছিল—পাঠক যদি তাহার নমুনা দেখিতে চান, তাহা হইলে কয়লাঘাট ষ্ট্রীট হইতে, জেনারেল পোষ্টাফিস বা বড় ডাক-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করুন। সম্মুখেই কতকগুলি ছোট খিলানওয়ালা গৃহ আপনার নেত্র পথে পতিত হইবে। এখন ইহার উপরে পোষ্টাফিসের বাবুদের তামাক খাইবার ঘর হইয়াছে। নীচে পোষ্টাফিসের ডাকগাড়ি ও ঘোড়া ইত্যাদি থাকে। এই অংশটুকুই সেই পুরাতন দুর্গের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ আজও বর্ত্তমান। পুরাতন দুর্গের সকল অংশই ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল—কেবল পুরাতনের স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই টুকুই বজায় রাখা হইয়াছে।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রত্নতত্ত্বানুরাগী বড়লাট লর্ডকর্জ্জন বাহাদুরের চেষ্টায়, এই পুরাতন দুর্গের চারিদিকের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দুর্গের কোন স্থানে কি ছিল—তাহা তিনি স্পষ্টভাবে, প্রস্তর ফলক দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান চার্ণক-প্লেসের নিকট,পোষ্টাফিস ও কালেক্টারি অফিসের দ্বারের মধ্যে "ব্ল্যাকহোল" বা অন্ধকূপ-হত্যাগৃহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আজকালকার রাইটার্স-বিল্ডিংসএর সম্মুখে, যেস্থানে অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে—সেই স্থানটী সেই সময়ে দুর্গ পার্শ্ববর্ত্তী একটী গভীর নালা ছিল। অন্ধকূপ-হত্যায় যে সমস্ত ইংরাজ, শোচনীয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, পরদিন প্রভাতে নবাবের আদেশে তাহাদের মৃতদেহ এই খাতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই স্থানটী স্মরণীয় করিবার জন্য, হলওয়েল সাহেব সেই পুরাকালে এইস্থানে একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইংরাজরাজত্বের মধ্যযুগে সেটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। আমরা এই স্মৃতিচিহ্নের একখানি চিত্র প্রদান করিলাম।*

---

* যাঁহারা এই প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের (অর্থাৎ যে দুর্গ নবাব সেরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করেন) অবস্থান স্থান সম্বন্ধে বিশদরূপে জানিতে চাহেন—তাঁহারা Victoria

শোভাসিংহের বিদ্রোহের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া, এই "প্রাচীন ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ" ধীরে ধীরে কিরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল—তাহার বিবরণ আমরা যথাসাধ্য প্রদান করিলাম। এই দুর্গ-নির্ম্মাণের পর হইতেই প্রাচীন সুতালুটী ও কলিকাতার উন্নতি আরম্ভ হইল।

শোভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটায়, ইংরাজদের প্রভূত উপকার সাধিত হইল। এ বিদ্রোহ উপস্থিত না হইলে কলিকাতার দুর্গ-নির্ম্মাণ ব্যাপারটা এত শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিত না। বিদ্রোহীরা, ইংরাজদের ভয়েই গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতার দিকে আসিতে পারে নাই। এই বিদ্রোহের সময়, ইরাজেরা দুইখানি জাহাজ কামান দ্বারা সজ্জিত করিয়া, ভাগীরথীবক্ষ চৌকী দেন। মোগলের থানা-দুর্গের ফৌজদার, ইংরাজদের এই বন্দোবস্তের জন্যই, বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। হুগলীতে, ওলন্দাজ দিনেমার ও ফরাসীগণ, আর কলিকাতার ইংরাজগণ, এই সময়ে যুদ্ধ জাহাজ ও নৌসেনা দানে সাহায্য না করিলে এবং ভাগীরথীবক্ষকে শত্রুমুক্ত না রাখিলে, ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নগর ও গ্রামগুলি ছারে-খারে যাইত। এই নিরাপদতার জন্য, কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অনেক ব্যবসায়ী, কলিকাতায় আসিলেন। ইউরোপীয়ানদের-শক্তির উপর তাঁহাদের একটা বিশ্বাস জন্মিল। যখন তাঁহারা বুঝিলেন, এই ইউরোপীয়ানগণ চেষ্টা করিলে, দেশের লোকের মান মর্য্যাদা ও ধনসম্পত্তিরক্ষা করিতে সক্ষম, তাহাদের অনলবর্ষী কামানের ভয়ে, বিদ্রোহীরাও এপারে আসিতে অক্ষম—তখন তাঁহারা ইংরাজ-শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাসস্থাপন করিলেন। ইহার ফলে, কলিকাতার ও সুতালুটীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইল। বাণিজ্যাদি ব্যাপারে, ইংরাজেরা দেশীয়দের সহিত অতি সদ্ব্যবহার করিতেন। শেঠ-বসাকেরা ইংরাজদের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া কলিকাতাতেই রহিলেন। সুতালুটীর সে জঙ্গলময় অবস্থা, ক্রমশঃ বিদূরিত হইয়া নানাস্থানে ক্ষুদ্র অট্টালিকা, হাট-বাজার ও বস্তি হইতে লাগিল। তখন লোকে ভাবিত, বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে—ইংরাজের সুতালুটীর কেল্লার মধ্যে অতি সহজেই আশ্রয় পাওয়া যাইবে।

সুতালুটীর অবস্থার উন্নতি ঘটিলেও নানাকারণে ইংরাজ-কোম্পানীকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। এই সময়ে সমগ্র বঙ্গের সুবাদার

Memorial Hall Collection এর মধ্যে সংগৃহীত, দুর্গের একটী অবিকল নমুনা—বর্ত্তমান মিউজিয়াম গৃহে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন। এই নমুনাটী পরলোকগত ঐতিহাসিক ডাক্তার উইলসনের চেষ্টায় ও লর্ড কর্জ্জনের সহায়তায় প্রস্তুত হইয়াছিল।

আজিমওশ্বান। বাঙ্গলাসুবার দেওয়ান—নবাব মুর্শীদকুলি খাঁ। মুর্শীদকুলীর আমলেই, ইংরাজ-বণিকেরা কলিকাতা সুতালুটী এবং গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রামত্রয় ক্রয় করেন। এই আমলেই তাঁহারা কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জমীদারী লাভ করেন। কি করিয়া এই জমীদারী অর্জ্জিত হইল, তাহা পরের অধ্যায়ে বলিতেছি।
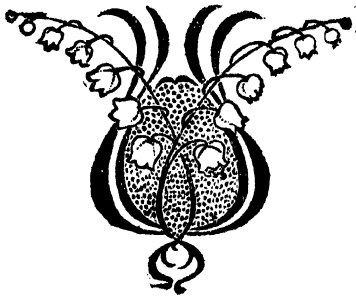
চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিলাতে নূতন কোম্পানীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—পুরাতন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিপত্তি বাণিজ্যস্বত্ব লাভের জন্য নূতন কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে সার উইলিয়াম নরিসের সম্রাটদরবারে আগমন—নরিসের আশাভঙ্গ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন—নূতন কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী লিটলটনের হুগলীতে আগমন—পুরাতন কোম্পানীর অধ্যক্ষ জন বেয়ার্ডের সহিত লিটলটনের সংঘর্ষ—জলদস্যুদ্বারা মোগল যাত্রীজাহাজ লুণ্ঠন—সম্রাটের ঔরঙ্গজেবের ক্রোধ—ইউরোপীয় বণিকদের উচ্ছেদ করিবার আদেশ প্রদান—বঙ্গবিহার উড়িষ্যার সুবেদার সুলতান আজিমওশ্বান—বঙ্গের নবনিযুক্ত দেওয়ান নবাব মুরশীদকুলী খাঁ—মুরশীদকুলীর পূর্ব্ব-পরিচয়—হায়দ্রাবাদের দেওয়ান—সম্রাট কর্ত্তৃক বঙ্গে নিয়োগ—মুরশীদকুলীর রাজস্ব বন্দোবস্ত—আজিমওশ্বানের সহিত মনোমালিন্য—আজিমওশ্বান কর্ত্তৃক নবাব মুরশীদকুলীকে হত্যা করিবার চেষ্টা—এ মনোমালিন্যের পরিণামে সম্রাটের আদেশে আজিমের ঢাকা হইতে পাটনায় গমন—মুরশীদকুলী খাঁ কর্ত্তৃক মুরশীদাবাদ প্রতিষ্ঠা—যুক্ত-কোম্পানী ও রোটেশন গবর্ণমেণ্ট—নবাব মুরশীদকুলী খাঁর সহিত ইংরাজ-কোম্পানীর মনোমালিন্য—হুগলীর ফৌজদারের অত্যাচার—কোম্পানী কর্ত্তৃক রামচন্দ্রকে হুগলীতে প্রেরণ—উকীল রাজারামের নবাব দরবারে গমন—হুগলীর ফৌজদারকে বাধা করিবার জন্য ইংরাজদের উপহার দ্রব্য প্রেরণ—উপহার দ্রব্যের তালিকা—নবাব মুরশীদকুলী খাঁর অসম্ভব দাবি—কাশিমবাজার কুঠী খুলিবার বন্দোবস্ত—ইংরাজের ভাগ্য পরিবর্ত্তন—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু—এ মৃত্যু সংবাদে—মহা গোলযোগের সূচনা—ঔরঙ্গজেবের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ—মৃত্যুর পূর্ব্বে সম্রাটের শেষ পত্র—সম্রাট পুত্রগণের আত্মবিগ্রহ ও সাহআলমের জয় লাভ—বঙ্গদেশ হইতে পিতার সাহায্যার্থে সুলতান আজিমওশ্বানের গমন—সাহজাদা কামবক্স ও আজামের শোচনীয় পরিণাম—এই গোলযোগে ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের পরিসমাপ্তি—ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুতে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে ইংরাজদের সুবিধা।

(নবাবী আমলের প্রাচীন কলিকাতা।)

ইংরাজ কোম্পানীর অনেক শত্রু ছিল। ঘরের শত্রু ছিল তাঁহাদের স্বজাতীয়গণ। পাঠক, ইতিপূর্ব্বে "ইণ্টার-লোপার"দের কথা শুনিয়াছেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা সম্বন্ধে, ইহারা স্বতঃপরতঃ অনিষ্ট চেষ্টা করিত। এই সময়ে বিলাতে আবার একটী নূতন ব্যবসায়ী-কোম্পানীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারা ইংলণ্ডের তৎকালিক অধিপতি, তৃতীয় উইলিয়াম ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট প্রার্থনা দ্বারা, ভারতে বাণিজ্য-সম্বন্ধে নূতন সনন্দ লাভ

করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে, স্যর উইলিয়াম নরিসকে সম্রাট ঔরঙ্গ-জেবের দরবারে দূতরূপে প্রেরণ করেন।

এইবার পুরাতন কোম্পানী, মহাপ্রমাদ গণিলেন। নূতন কোম্পানীর নাম হইয়াছিল—"ইংলিশ কোম্পানী ট্রেডিং টু দি ইষ্ট-ইণ্ডিস্" (English Company Trading to the East Indies.) পুরাতন কোম্পানী, অগত্যা "লণ্ডন-কোম্পানী" এই আখ্যা ধারণ করিলেন।

১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে নূতন কোম্পানীর প্রতিনিধি নরিস সাহেব, ভারতে উপস্থিত হন। মসলিপট্টনে প্রায় এক বৎসরকাল সময় ক্ষেপণ করিয়া, তিনি ১৭০০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরে সুরাটে উপস্থিত হন। কিন্তু সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধকার্য্যে ব্যস্ত। নরিস, স্থানীয় উজীর ও মোগল-কর্ম্মচারী-দের উৎকোচ দানে বশীভুত করিয়া, মহাসমারোহে সম্রাটের সহিত সাক্ষা-তার্থে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলেন। নরিস, খুব জাঁকজমক করিয়াই সম্রাট সকাশে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৬০জন ইংরাজ ও তিনশত এদেশীয় শরীর-রক্ষী ছিল। সম্রাটকে উপহার দিবার জন্য, তিনি নানাপ্রকারের বনাত, বিলাতী-আলু, কাচের জিনিষ প্রচুর পরিমাণে আনিয়াছিলেন। একজন রাজদূতের যতটা পদোচিত সম্ভ্রম ও জাঁকজমকের সহিত, সম্রাট দরবারে যাওয়া সম্ভব, নরিস তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই।

ঔরঙ্গজেব, নরিসকে সাদর ভাবে গ্রহণ করিলেন। নরিসের অভিপ্রায় মত, নূতন কোম্পানীর জন্য সনন্দ ও ছাড়পত্রাদিও প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই সময়ে উজীর ও অন্যান্য উৎকোচ-লোলুপ রাজ-কর্ম্মচারিগণ, নানাবিধ ওজর আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। পুরাতন কোম্পানীর প্রতিনিধিরাও নরিসের সংকল্প বিফল করিবার জন্য, উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। উৎকোচ দিতে দিতে নরিসের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া আসিল। তিনি ভগ্নহৃদয়ে, সুরাটে ফিরিলেন। মোগলের প্রধান উজীর, দিনকয়েকের জন্য তাঁহাকে নজর-বন্দী করিয়া রাখিল। উজীরের কবল হইতে উৎকোচ দানে উদ্ধার পাইয়া, নরিস শূন্যহস্তে, নিরাশচিত্তে, ইংলণ্ডে যাইবার জন্য জাহাজে উঠিলেন। সে যাত্রা আর তাঁহাকে দেশে পৌঁছিতে হয় নাই। আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া, তিনি সেণ্ট হেলেনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।*

নরিসের সঙ্গে সঙ্গে সার এডওয়ার্ড লিটলটন নামক একজন ইংরাজ, নূতন কোম্পানীর বঙ্গীয় বাণিজ্যের অধিনায়ক বা বড়কর্ত্তারূপে প্রেরিত হন।

* Bruce's Annals III. (4th) Wilson 154 Hedge's Diary II. 205.

লিটলটন, পূর্ব্বে পুরাতন ইংরাজ কোম্পানীর ফ্যাক্টাররূপে ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, তিনি ১৬৮২ সালে পুরাতন কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের আদেশে পদচ্যুত হন। এই লিটলটন নবপদবী লাভে, নূতন কোম্পানীর কর্ম্মচারীরূপে, এই সময়ে বালেশ্বর বন্দরে উপস্থিত হইলেন। বালেশ্বর হইতে তিনি পুরাতন কোম্পানীর এজেণ্ট বেয়ার্ড সাহেবকে ভয় ও মৈত্রী সম্বলিত একখানি পত্র, সুতালুটিতে প্রেরণ করেন। বেয়ার্ড এ পত্র পাইয়াও তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনিও তদনুরূপ উত্তর দিয়া পাঠাইলেন।

লিটলটন হুগলীতে আসিলেন। দুই বৎসরকাল ধরিয়া, তিনি সকল বিষয়ই পুরাতন কোম্পানীর-প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন, এবং প্রতি কাজেই নিরাশ হইলেন। হুগলীতে তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার অধীনস্থগণই তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন্ত্রণা-সভার দুইজন সদস্য—বাঙ্গালার জ্বরে ভুগিয়া দেহত্যাগ করিলেন। নূতন কোম্পানীর সম্পত্তি রক্ষার জন্য, তিনি যে সমস্ত প্রহরী-সৈনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন—তাহাদের অনেকে দল ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কতক বা মৃত্যু মুখে পতিত হইল। অসংখ্য মুদ্রা উৎকোচদানে, তিনি মোগল রাজ-কর্ম্মচারীদের নিকট, বাণিজ্যের ছাড় পাইলেন বটে, কিন্তু এ ছাড় অতি অল্পদিনের জন্য। এই ছাড়ের মেঁয়াদী সময় অতীত হইয়া গেলে, আবার প্রচুর মুদ্রা নজরানা দিয়া, তাঁহাকে নূতন ছাড় লইতে হইল। লিটলটন—হুগলীতে থাকিয়া এত প্রতিযোগিতা করিয়াও, পুরাতন কোম্পানীর কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। পরিশেষে দুই বৎসর পরে, উপায়ান্তর বিহীন, হইয়া নূতন কোম্পানী, পুরাতনের সহিত মিশিয়া গেল। উভয়পক্ষের এই বিবাদের ফলে, ইংরাজ-বাণিজ্য অনেকটা হীনশক্তি হইয়া পড়িল।

লিটলটন যে সময়ে নূতন কোম্পানীর অধ্যক্ষরূপে হুগলীতে আসেন, সেই সময়ে জন বেয়ার্ড, সুতালুটি বা কলিকাতার কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। বেয়ার্ড ১৬৮১ খৃঃ অব্দে এদেশে প্রথম আসেন। জব চার্ণকের আমলে মোগলের সহিত ইংরাজের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সে সময়ে বেয়ার্ডকেও অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পর, তিনি কৌন্সিলের দ্বিতীয় সদস্য পদে নিযুক্ত হন। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ডে চলিয়া যান। বেয়ার্ড তৎপরে কলিকাতা এজেন্সির প্রধান বা "চিফ্" পদে উন্নীত হন।

বেয়ার্ড, কলিকাতা ফ্যাক্টরির চিফ্ বা প্রধানপদে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন, এ উচ্চপদ সুখের নহে। প্রথমতঃ—লিটলটনের সহিত তাঁহার একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়া তিনি—লিটলটনের ব্যাপারটা একরূপ মীমাংসা করিলেন বটে, কিন্তু এই সময়ে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত—ইংরাজদের নূতন সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হওয়ায়, বেয়ার্ড বড়ই ভীত হইলেন। এ সংঘর্ষের কারণ এই—সেই সময়ে সুরাট হইতে মক্কাগামী যাত্রী জাহাজগুলি, প্রায়ই লুণ্ঠিত হইত। ঔরঙ্গজেবের মনে একটা দৃঢ় সন্দেহ, যে ইংরাজ-জাহাজ কর্ত্তৃক এই কার্য্য হইতেছে। নূতন ও পুরাতন উভয় কোম্পানীকেই, ঔরঙ্গজেব এই ব্যাপারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিলেন। নূতন কোম্পানী, পুরাতনের স্কন্ধে দোষ চাপাইলেন। পুরাতন বলিলেন—"আমরা জাঁহাপনার রাজ্যে এতদিন বাস করিতেছি, এ কাজ আমাদের দ্বারা হয় নাই।"

ঔরঙ্গজেব, ইংরাজদের উপর মহা বিরক্ত হইয়া, ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ-ভাগে, এই হুকুমনামা প্রচার করেন—"ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ আমাদের সহিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছেন, যে আমার প্রজাগণকে তাঁহারা সমুদ্র-পথে, জল দস্যুদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া, তাঁহারা—মুসলমান জাহাজ সমূহ লুঠ করিতেছেন, সেগুলি আটক করিতেছেন। এইজন্য সর্ব্বস্থানের দেওয়ান ও নাজিমগণের উপর এই আদেশ প্রদান করা গেল—এই সকল ইউরোপীয় জাতি অতঃপর আমার রাজ্য মধ্যে কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবে না। তাহাদের দ্রব্যজাত সমূহ বাজেয়াপ্ত হইবে। এই সমস্ত দ্রব্যজাত আটক করিয়া, প্রত্যেক শাসনকর্ত্তা, আটকী-দ্রব্যের একটী ফর্দ্দ আমার কাছে পাঠাইবেন। এত-দ্ব্যতীত আরও হুকুম করা যাইতেছে—ইউরোপীয় বণিক-কর্ম্মচারিগণকে দেখিলেই অবরুদ্ধ করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিবে।"*

* At the end of the year 1701 a proclamation was issued ordering the arrest of all Europeans in India. "In as much as the English and other Europeans" it ran "notwithstanding that they have entered into a contract to defend our subjects from piracies, have seized and plundered Mussulman ships, therefore we have written to all Governors and Dewans that all manner of trade be interdicted with these nations throughout our dominions and that you seize on their effects where-ever they can be

এই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্রই একটা মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। দায়ুদ খাঁ তখন মান্দ্রাজ বিভাগের শাসনকর্ত্তা। তিনি ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে মে মাস পর্য্যন্ত, মান্দ্রাজ অবরোধ করিয়া রহিলেন। উক্ত বৎসর, বঙ্গদেশের পাটনা, রাজমহল ও কাশিমবাজারের কুঠীগুলি আটক করা হইল। সমস্ত ইউরোপীয়ান ফ্যাক্টরি গুলির অবস্থা অতি বিপন্ন হইয়া পড়িল। নূতন কোম্পানী অর্থাৎ লিটলটনের দলের মহা বিপত্তি উপস্থিত হইল। বেয়ার্ড বহুদিন এদেশে আছেন—তিনি সকলদিকে আট-ঘাট বাঁধিয়া কাজ করিতেছিলেন। লিটলটন, এ দেশের কিছুই জানিতেন না, কাজেই তিনিই অধিকতর বিপদগ্রস্ত হইলেন। এই ব্যাপারে নূতন ইংরাজ-কোম্পানীর ৬২ হাজার টাকা ক্ষতি হওয়ায় তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য একাবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

এই সময়ে বঙ্গদেশের মধ্যে দুই জন ব্যক্তি প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব লইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। একদিকে বঙ্গের সুবাদার সুলতান আজিম-উশ্বান, অন্যদিকে নবাব মুরশীদকুলি খাঁ।

ধরিতে গেলে, মুরশীদকুলি খাঁ হইতেই বাঙ্গালার নবাবী-আমলের প্রারম্ভ। তাঁহার ন্যায় দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ নবাব বাঙ্গলায় আর কেহ হন নাই। তিনি প্রতি পদে, ইংরাজ-বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ-বাণিজ্য উচ্ছেদের জন্য, প্রথমে তিনি নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়া পরে বিফল মনোরথ হয়েন। এত বড় জবরদস্ত নবাব মুরশীদকুলী খাঁর একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

নবাব জাফর মুরশীদকুলি খাঁ—দাক্ষিণাত্যবাসী এক গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান। বাল্যকালে ইঁহার পিতার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ইস্পাহান-বাসী, হাজি সফী নামক একজন বণিক, ইঁহাকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যান। সেখানে এই ক্রীতদাস, মহম্মদ হাজী নামে পরিচিত ছিল। বালকটীকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান দেখিয়া তাঁহার প্রভু তাঁহাকে নীচ কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, পুত্রের মত লালনপালন করেন। তৎকালোচিত শিক্ষালাভও তাঁহার যথেষ্ট হইয়াছিল।

found, take them carefully on your possessions, sending an inventory thereof to us. And it is likewise further ordered that you confine their persons, but not to close imprisonment.—Wheeler's Madras in the Olden Time. p. 213. Wilson. 160.

বণিকের মৃত্যু হইলে, মহম্মদ হাজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। বহু চেষ্টার পর, বেরার প্রদেশের তৎকালীন দেওয়ান হাজী আবদুল্লা খোরাসানীর অধীনে, তিনি একটী সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। দেওয়ান তাঁহার কার্য্য-কুশলতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া, তাঁহার প্রতি বড়ই প্রসন্ন হইয়া বাদসাহের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। ঔরঙ্গজেবও তাঁহার কার্য্য-কুশলতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে কারতলব খাঁ উপাধি এবং মনসব প্রদান করেন।

সেই সময় হইতেই মুরশীদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। এই সময়ে হায়দ্রাবাদের দেওয়ানী পদ খালি হওয়ায়, সম্রাট কারতলব খাঁ বা ভবিষ্যৎ মুরশীদকুলীকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যেও বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করায়, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বাঙ্গলার দেওয়ান রূপে নিযুক্ত করেন। বঙ্গদেশের দেওয়ানী লাভ করিবার পর, তিনি মুরশীদকুলী খাঁ উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং এই নামেই তিনি ইতিহাসে সুপরিচিত। আমরা এইজন্য মুরশীদকুলী খাঁ নামই ব্যবহার করিব।

আকবর বাদসাহের আমলে, মহারাজ টোডরমল্ল, বঙ্গের রাজস্ব সম্বন্ধে একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। এই সময় হইতে প্রত্যেক সুবায় বা শাসন-বিভাগে, একজন সুবাদার বা নাজিম এবং একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন। নাজিমের হস্তে সেনাবিভাগ ও দেশের শাসনভার অর্পিত ছিল আর দেওয়ান রাজস্ব-বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিতেন

কুটবুদ্ধি ঔরঙ্গজেব, বাঙ্গলার রাজস্ব হ্রাস হইতেছে দেখিয়া ও বঙ্গের রাজস্ব-বিভাগকে, সম্পূর্ণরূপে সুবাদারের কর্ত্তৃত্ব বিমুক্ত করিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে নাজিম ও দেওয়ানের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সৈন্য-পরিচালনা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা ও বিচার-বিভাগ, নাজিমের হাতেই রহিল। দেওয়ান স্বতন্ত্রভাবে রাজস্ব-আদায়, রাজস্ব-বন্দোবস্ত, সরকারের আয় ব্যয় পরিদর্শন প্রভৃতি কার্য্যের ভার পাইলেন।

বঙ্গের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া, নবাব মুরশীদকুলী খাঁ দাক্ষিণাত্য হইতে ঢাকায় উপস্থিত হন। তখন সুলতান আজিমওশ্বান বঙ্গের সুবাদার। মুরশীদকুলি খাঁ অবশ্য বঙ্গের সুবাদারের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। কিন্তু সুবাদার প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানের উপর কোনরূপ আদেশ চালাইতে

পারিতেন না। বাদসাহের প্রচারিত "দস্তুর-উল্-আলম" বা অনুশাসন পত্রানুসারে উভয়কেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত।

বঙ্গদেশে শস্যের অভাব কোন কালেই ছিল না। স্বর্ণপ্রসূ-বঙ্গের প্রত্যেক বিঘাই প্রচুর শস্যোৎপাদনে সক্ষম। শস্য হইতেই প্রজার আয়। প্রজার আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশই রাজার রাজস্ব। বেবন্দোবস্তের গুণে, অপব্যয়ের প্রভাবে, বাঙ্গলার রাজস্ব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। মোগল-বাদসাহের স্থানীয় কর্ম্মচারীরা, নিজেদের উদর পূরণেই বেশী মনোযোগী ছিলেন। তাহার উপর—বিদ্রোহ, বিপ্লব প্রভৃতি কারণে, মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশের রাজস্ব-বিভাগে মহা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইত।

নব নিযুক্ত দেওয়ান মুরশীদকুলী খাঁ, বাঙ্গলায় আসিয়া রাজস্ব বিভাগের সংস্কার কার্য্যে মনোযোগী হইলেন। সরকারী কাগজ-পত্র অনুসন্ধানে, তিনি স্পষ্টই দেখিলেন—বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে এক কোটী টাকা রাজস্বরূপে সংগৃহীত হইতে পারে। এইজন্য তিনি শীঘ্রই রাজস্ব-বিভাগের আমূল সংস্কার করিলেন। উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণের হস্তে রাজস্ব-বিভাগের কার্য্যসমূহ ন্যস্ত হইল। বাঙ্গলার মধ্যে, যে সমস্ত জায়গীরদারগণ এতদিন জায়গীরের স্বত্ব উপভোগ করিতেছিলেন, প্রজার রক্তশোষণ করিয়া স্থূলকায় হইতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই জায়গীর, উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত হইল। কেবল নিজামতের, দেওয়ানের এবং বাদসাহী প্রধান সেনাপতি প্রভৃতির জায়গীর বঙ্গদেশেই রহিল। ইহার ফল এই হইল, প্রজাগণ জায়গীরদারদের অযথা অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিল এবং জমীর উন্নতি হওয়ায় তাহার উর্ব্বরতা-শক্তিবৃদ্ধির সহিত রাজস্ব-বৃদ্ধি পাইল।

মুরশীদকুলী খাঁ—সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া, বঙ্গীয় রাজস্বের বিশদ বিবরণ, বাদসাহের দরবারে পেশ করিলেন। তিনি বাদসাহের স্বনির্ব্বাচিত কর্ম্মচারী। ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধকার্য্যে ব্যস্ত—টাকার তাঁহার বড়ই প্রয়োজন। কাজেই বাঙ্গলার এই নূতন দেওয়ানের কার্য্যকুশলতায় তিনি যথেষ্ট প্রীত হইলেন।

এই ব্যাপার লইয়া বাঙ্গলার সুবেদার—আজিমওশ্বানের সহিত, নবাব মুরশীদকুলীর মনোমালিন্য ঘটে। তিনি বাদসাহের ভয়ে, তাঁহার প্রিয় দেওয়ানকে কিছু বলিতে পারিতেন না বটে—কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদাই তাঁহার অনিষ্ট-কামনা পোষণ করিতেন। এইজন্য, এক সময়ে তিনি নবাবকে বিনাশ করিবার জন্য এক ভীষণ চক্রান্তের সৃষ্টি করিলেন।

সেই সময় একদল নগদী-সেনা, আবদুল ওয়াহেদ নামক একজন রেসালা-দারের অধীন ছিল। নগদীরা—রাজকোষ হইতে নগদ বেতন পাইত। তাহাদের জন্য, কোনরূপ জায়গীর বন্দোবস্ত ছিল না। এই সময়ে, তাহাদের প্রাপ্য বেতন কিছু বাকী পড়ে। সুলতান আজিমওশ্বান—এই সংবাদ অবগত হইয়া, তাহাদের সর্দ্দার ওয়াহেদকে হস্তগত করিলেন। তিনি ওয়াহেদকে গোপনে উপদেশ দিলেন—"যে সময়ে নবাব রাজ-সভায় আসিবেন, সেই সময়ে বেতন প্রার্থনার অছিলায়, তোমরা পথিমধ্যে গোলযোগ বাধাইয়া, কোন সুযোগে তাঁহাকে হত্যা করিবে। মুরশীদকুলি খাঁ, সম্রাট-পৌত্র অজিমওশ্বানকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তিনি জানিতেন না যে তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ এক ঘৃণিত চক্রান্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

নবাব মুরশীদকুলী খাঁ যেখানেই যাইতেন, তাঁহার পরিচ্ছদের মধ্যে একটী বর্ম্ম পরিধান করিতেন। যুবরাজের উপর তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ছিল না। আজিমওশ্বান যে তাঁহার উপর সন্তুষ্ট নহেন, তাহাও তিনি জানিতেন। একদিন মুরশীদকুলী খাঁ দরবারে অসিবার জন্য, স্বদলবলে অশ্বারোহণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে ওয়াহেদ তাহার সঙ্গীদের লইয়া বেতনের দাবি করিয়া নবাবের সহিত বিবাদ উপস্থিত করে। মুরশীদকুলী খাঁ, ইহাতে কোনরূপ ভয় না পাইয়া, সরাসর দরবারে উপস্থিত হন। আজিমওশ্বান যে এই ষড়যন্ত্রের মূলে আছেন, ইহাই তাঁহার ধারণা। নবাব, দরবারে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্ব প্রথামতঃ আজিমওশ্বানকে কোনরূপ সম্বর্দ্ধনা না করিয়া, তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া রুষ্টভাবে বলিলেন—"সাহজাদা! যদি আপনি আমায় গুপ্তভাবে হত্যা করিতে স্থিরসংকল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জানিয়া রাখুন, আমিও প্রতিহিংসা লইতে বিরত থাকিব না। আর এ কথাও স্থির জানিবেন—আমায় হত্যা করিলে, বাদশাহও তাহার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেন না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আবদুল ওয়াহেদকে এরূপভাবে উত্তেজিত করিবার মূলই আপনি।"

আজিমওশ্বান, দেওয়ানের ক্রোধ দেখিয়া বড়ই ভীত হইলেন। পিতামহ ঔরঙ্গজেবকে তিনি চিনিতেন। যে দেওয়ান, বাঙ্গলায় সম্রাটের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ, তাঁহার বঙ্গ-সাম্রাজ্যের রাজকোষের আয়বৃদ্ধির জন্য, যাহাকে তিনি নিজে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইয়াছেন—তাহার প্রতি এরূপ অমানুষিক অত্যাচারের কথা—বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার পরিণাম শুভফল-জনক নহে। এইজন্য তিনি বিবিধ উপায়ে, নবাবের ক্রোধ-শান্তির চেষ্টা

করিলেন। তাঁহাকে বুঝাইলেন—"ওয়াহেদের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। এবং তিনি নবাবের একান্ত বন্ধু ও হিতচিকীর্ষু!" ওয়াহেদ তাঁহাকে পথিমধ্যে এরূপভাবে অপমান করার জন্য শাস্তিভোগ করিবে ইত্যাদি স্তোকবাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিয়া বিদায় করিলেন।

কিন্তু মুরশীদকুলি খাঁ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি নিজধামে প্রত্যাগমন করিয়া, "সওয়ানে-নেগার" নামক কাগজে এই ব্যাপারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেন। তৎপরে সওয়ার দ্বারা তাহা দাক্ষিণাত্যে বাদসাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। ওয়াহেদ, তাহার এ ধৃষ্টতার জন্য ভবিষ্যতে পদচ্যুত ও দেশ হইতে বিতাড়িত হইল।

এই ব্যাপারে মুরশীদকুলী খাঁ রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করা ততটা নিরাপদ বলিয়া ভাবিলেন না। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত পরামর্শমতে স্থির করিলেন, মুখসুদাবাদেই রাজধানী স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য।*

সুবাদার আজিমওশ্বানের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই, মুরশীদকুলী খাঁ তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গসহ খালসা দস্তর বা রাজস্ব-বিভাগ মুখসুদাবাদে উঠাইয়া আনিলেন। কুড়ুলিয়া নামক পতিত মৌজায়, মহলসরা (প্রাসাদ) দেওয়ান-খানা ও অন্যান্য গৃহাদিনির্ম্মাণ করিয়া নগরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব, তাহার পৌত্রের সহিত, তাঁহার প্রিয় দেওয়ানের মনোমালিন্যের কথা শুনিয়া, অতিশয় রুষ্ট হইয়া আজিমওশ্বানকে বাঙ্গলা হইতে বিহারে অবস্থান করিতে আদেশ দেন। আজিমওশ্বান—তাঁহার পুত্র সাহাজাদা ফরফ্-শেরকে ঢাকায় প্রতিনিধি বা নায়েব-সুবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পরিবার-

* অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে মুখসুদাবাদ যে একটী ক্ষুদ্র নগর ছিল—তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন সময় হইতে মুখসুসাবাদ বা মুখসুদাবাদের প্রতিষ্ঠা বা নামকরণ হয়, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। মুরশীদাবাদ প্রদেশে একটী সাধারণ প্রবাদ এই—যে বাদসাহ হোসেন সাহের সময়ে, মুখসুদন দাস নামে কোন নানক-পন্থী সন্ন্যাসী তাঁহার পীড়া শান্তি করিয়া এইস্থান লাখরাজরূপে প্রাপ্ত হন এবং সেই সন্ন্যাসীর নামানুসারে উক্তস্থানের নাম "মুখসুদাবাদ" হয়। রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতে মুখসুদ খাঁ নামক কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হইতে ইহার মুখসুদাবাদ নাম হয়। আবার টিফেনথেলার ১৭৭০ খৃঃ অব্দে লিখিয়াছেন মুরশীদাবাদ নগর আকবর-বাদসাহের সময়ে নির্ম্মিত।

আইন-আকবরীতে মুরশীদাবাদের নাম নাই। আকবর-নামায় বঙ্গের এক সময়ের শাসন-কর্ত্তা সায়দ খাঁর ভ্রাতা মুখসুদ খাঁর নাম পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গ-বিহারের নানাস্থানে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যাহাই হউক না কেন—মুরশীদকুলি খাঁর সময়েই ইহার নাম মুরশীদাবাদে দাঁড়ায়। (কালীপ্রসন্ন বাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস—৩৮, নিখিলবাবুর মুরশীদাবাদের ইতিহাস পাদ-টীকা ৩৩৭।)

বর্গ ও অর্দ্ধেক সৈন্যসহ মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাহসুজার মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রাসাদ তখন ভগ্নপ্রায় দেখিয়া, রাজকুমার আজিমওশ্বান—পরিশেষে পাটনা নগরীতেই দুর্গ-নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার নামানুসারে পাটনা সেই সময়ে আজিমাবাদ বলিয়া কথিত হইত।

মুরশীদাবাদে রাজধানী স্থাপনের এক বৎসর পরে, রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলার মধ্যে আগমন করিয়া—নিকাশী কাগজপত্র সমেত নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, দাক্ষিণাত্যে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বাঙ্গলার রাজস্ব নানা উপায়ে প্রচুররূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মুরশীদকুলী বাদসাহকে রাজস্বের সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিলে, তিনি তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। একা বঙ্গদেশ হইতে যে এ পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ হইতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণায় আসিল না। দাক্ষিণাত্যের দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধে, তখন রাজকোষে বড়ই অর্থাভাব—কাজেই তিনি দেওয়ানের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "মুর্শীদকুলী খাঁ" উপাধি, উৎকৃষ্ট খেলাত, বাঁদসাহী ঝাণ্ডানকুড়া ও মনসবী (সেনানায়কত্ব) প্রদান করিয়া, সম্মানিত করেন।*

সম্রাটের নিকট হইতে সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া, মুরশীদকুলী খাঁ, মুখসুদাবাদকে "মুরশীদাবাদ" নাম দিলেন। মুরশীদাবাদে একটী সরকারী টাঁকশাল স্থাপিত হইল। ভূপতি রায় ও কিশোর রায় নামক দুইজন হিন্দুকে তিনি এলাহাবাদ হইতে সঙ্গে লইয়া আসেন। ভূপতি রায়কে নিজের সহকারী ও কিশোরকে তিনি মুন্সীর পদে নিযুক্ত করেন। বহু পরিমাণে বিশ্বাসী হিন্দু আমিলগণ, তাঁহার আমলে রাজকর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইলেন। দেওয়ান কুলী খাঁও, নিজে হাতেকলমে সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুলতান আজিমওশ্বান ও ফররুখশের, কুলী খাঁর প্রতাপ ও আধিপত্যে আচ্ছন্ন হইয়া, অতিশয় হীনশক্তি হইয়া পড়িলেন।

১৭০৪ হইতে ১৭০৭ খৃঃ মধ্যে—অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত ইংরাজ বাণিজ্য বহুবিধ অসুবিধা ও বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়িয়া, বড়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। কোম্পানী কি করিয়া এ সমস্ত বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি পাঠে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

* কালীপ্রসন্ন বাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস (৩৮)।

এই সময়ে কোম্পানীর বাণিজ্য "রোটেশন" বা পর্য্যায়ক্রমিক শাসন ব্যবস্থার অধীন। নূতন ও পুরাতন কোম্পানীর মিশ্রণের সহিত, ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাও নূতন ভাবে সংগঠিত হয়। দুই দলই এক হইয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে উদ্যত হন।

উভয় কোম্পানীর আত্মবিবাদের ব্যাপার—তাহাদের উভয়ের পক্ষে অশুভ ফলপ্রদ হইলেও, স্থানীয় মোগল কর্ম্মচারিগণ তাহাতে প্রচুর ফললাভ করিলেন। তাঁহারা নানা উপায়ে, নানা অছিলায়, নানা বাবে, নানা দাবিতে, কোম্পানীর নিকট হইতে টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। টাকা না পাইলেই—বিবাদ. অত্যাচার, ও উৎপীড়ন। এই সমস্ত অত্যাচারের জ্বালায় ইংরাজেরা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন।*

এই কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী হইতেই প্রমাণ হয়—যে মোগল-শাসনকর্ত্তাগণ ইংরাজদিগকে নানা ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইংরাজ-বণিকের নৌকা সোরা বোঝাই হইয়া আসিতেছে—সহসা একজন, নবাবী পরমিট্ কর্ম্মচারী বা ক্ষুদ্র জমিদার তাহা আটক করিতে আদেশ দিলেন, আবার কোথাও বা কোন স্থানীয় ফৌজদার তাঁহাদের মালপত্র ও লোকজন আটক করিয়া ফেলিলেন। এসব বিবাদে, ইংরাজগণ অনেক স্থলে এই সব স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদের উৎকোচ দানেই মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন।

বাঙ্গালার মোগল শাসনকর্ত্তারা স্ব স্ব প্রধান ছিলেন। যিনি যখন সুবিধা পাইতেন—তিনিই ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের পীড়ন করিয়া কিছু উপরি আদায়ের চেষ্টা করিতেন। বিশেষতঃ এই সময়ে একদিকে অর্থলোলুপ সুলতান আজিমওশ্বান ও অন্যদিকে অসীম ক্ষমতাশালী নবাব মুরশীদকুলী খাঁ। রাজস্ব-সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত ও তাহা বৃদ্ধি করাই নবাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

* মাদ্রাজের গভর্ণর পিট্ সাহেব, এই সময়ে বিলাতের কর্ত্তাদের যে পত্র লিখিয়াছিলেন—তাহার একাংশ এই—You will see that they (Mogul) have a great mind to quarrel with us again and it is certain, that Moors will never let your trade run on quietly as formerly till they are well-beaten. অর্থাৎ মোগলপক্ষ পুনরায় আমাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সমুৎসুক। এই মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের ইচ্ছা নহে, যে আমরা নির্ব্বিবাদে ও বিনা বাধায় এদেশে বাণিজ্য করিব। পূর্ব্বকার মত শক্তি প্রয়োগে ইহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কলিকাতার প্রেসিডেণ্ট বেয়ার্ড বলিয়াছিলেন" Force and a strong fortification were better than an ambassader. (Bruce's Annals of the E. I. Company. II. 697. Hedges' Diary III. 82

নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, ইংরাজ-বণিকদের নিকট হইতে তাঁহাদের পুরাতন সনন্দগুলি তলব করেন। কিন্তু ইংরাজেরা সাহসুজার প্রদত্ত ফারমান খানি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা একটু ব্যাতব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দেওয়ানের কর্ম্মচারিবর্গকে উৎকোচ দানে বশীভূত করা ভিন্ন, তাঁহাদের আর কোন উপায়ই রহিল না। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে, এই যুক্ত ইংরেজ কোম্পানী (United Company) নবাব মুরশীদকুলী খাঁর নিকট প্রার্থনা করিলেন—"যাহাতে আমাদের পূর্ব্বকার সনন্দ ও তদন্তর্ভুক্ত বাণিজ্য স্বত্বাদি বলবৎ থাকে, তাহার আদেশ প্রদান করুন।" কিন্তু মুরশীদকুলী খাঁ যখন দেখিলেন—দুইটী বিভিন্ন কোম্পানী একযোগে এই দরখাস্ত করিতেছে, তখন তিনি ইহাদের পৃথক কোম্পানী বলিয়াই ধরিয়া লইলেন। তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না, যে—এই দুইটী কোম্পানী একই। কাজেই পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে, প্রত্যেক কোম্পানীকেই স্বতন্ত্র-ভাবে তিন সহস্র মুদ্রা দিতে হইল। কোম্পানীরা—নবাবের বুঝিবার দোষে তিন সহস্র মুদ্রা বেশী দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ১৭০৪ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে * এই যুক্ত-কোম্পানী প্রকাশ্যভাবে কার্য্য চালাইবার জন্য এক মোহরে দস্তক-জারি আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে মোগলের স্থানীয় কর্ম্মচারীদের উৎপাত আরও বৃদ্ধি হইল। তাহারা যখন দেখিল—দেওয়ান স্বয়ং যুক্ত ইংরেজ কোম্পানীকে একই কোম্পানী বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক—তখন তাহারা নানা উপায়ে ইংরাজদের উৎপীড়ন করিতে লাগিল। হুগলীর ফৌজদার, এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এইবার তিনিও অত্যাচারের সূচনা করিলেন।

ইংরাজগণ নিরুপায় হইয়া ২৭এ মার্চ্চ তারিখে তাঁহাদের মোক্তার, রাম চন্দ্রকে হুগলীর ফৌজদারের নিকট পাঠান। ১৪ই জুন তারিখে, রাজারাম নামক একজন প্রবীণ ও অবস্থাভিজ্ঞ উকীলকে দেওয়ানের নিকট পাঠান হয়। এই সময়ে নবাব মুরশীদকুলী খাঁ উড়িষ্যা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। রাজারামকে কোম্পানীর-কর্ত্তারা বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন—"দেওয়ানকে বলিও—দুইটী বিভিন্ন ইংরেজ কোম্পানী এখন মিলিত হইয়া, এক কোম্পা-

* ১৭০৪ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে, এই দুইটী ইংরাজ কোম্পানী এক হইয়া যায়। নূতন কোম্পানীর কর্ত্তা, স্যার চার্লস লিটলটন হুগলী হইতে সমস্ত মালপত্র লইয়া কলিকাতায় আনিয়া পৌছিলেন। এই যুক্ত-কোম্পানীর দলের বাছা বাছা লোক লইয়া, একটী মন্ত্রণা-সভা গঠিত হইল। ইহাদের আমলই Rotation Government বলিয়া বিখ্যাত—Summaries of Consultations 48. 57.

নীতে দাঁড়াইয়াছে। আমাদের কার্য্যালয় একই স্থানে অবস্থিত। শীঘ্রই আমাদের একজন অধ্যক্ষও নিয়োজিত হইবেন। এরূপ স্থলে, আমাদের পূর্ব্ব কড়ার মত, তিন হাজার টাকাই দিব। দেওয়ান আমাদের অবাধ-বাণিজ্য ক্ষমতা দিবার জন্য, যে আরও পনর হাজার টাকা চাহিয়াছেন, তাহা আমরা দিতে প্রস্তুত নহি।*

সেকালের মোগল কর্ম্মচারীরা কোন একটা ব্যাপারের মীমাংসা করিতে, বড়ই দীর্ঘ সময় লইতেন। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—কাজটা সহজে মিটাইয়া দিলে, পাওনা তত বেশী হয় না। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারের মীমাংসার জন্য, নবাব অযথা বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে হুগলীর শাসনকর্ত্তা, কলিকাতার কুঠীর অধ্যক্ষদিগকে বলিয়া পাঠান—"একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে আপনারা আমার কাছে পাঠাইয়া দিন। আমার সহিত যে কাজের সম্পর্ক, তাহা আমি মিটাইয়া দিতেছি। অবশ্য আমার নিজের জন্য ও কর্ম্মচারীদের জন্য, উপঢৌকনাদি যেন ঐ সঙ্গে পাঠান হয়।"†

---

* "Tell Murshid Kuli" they said "that the Companies have amalgamated and we expect that a new head will soon be appointed. We are now one Company with one factory, and we shall therefore, according to the arrangement, make but a single payment of Rs 3000. As for Rs 15000 which he demands for the release of our trade, we refuse to pay it at all. Our trade should never have been hindered. (Summaries of Consultations—Wilson. 170)

† হুগলীর ফৌজদার সাহেবকে কিরূপ উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল—তাহার একটী তালিকা, পাঠকবর্গের কৌতুহল তৃপ্তির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

বেগুনী রঙের বনাত (১৬ গজ)	মূল্য—১১৪৲
সবুজ ঐ ঐ (২৪ গজ)	„ ৮০৲
লাল রঙের বনাত (২৩॥০ গজ)	„ ১২০৲
চলতি রকমের বনাত	„ ৮০৲
তরবারির ফলক	„ ৫৲
পিস্তল এক জোড়া	„ ২২৲
শিকারী বন্দুক (পাখী মারিবার জন্য)	„ ২২৲
বড় আয়না (৩০ ইঞ্চি)	„ ৩৮৲
ফ্লিণ্ট ওয়্যার (Flintware)	„ ৬০৲
মোট——	৫৪১৲

এতদ্ব্যতীত ফৌজদারের আখবরনবিশ ও কোয়াশিদ্দার এর জন্য, ঐ ভাবে ৫২৪ টাকার জিনিস পাঠান হয়। বক্স বন্দরের দারোগা ও খোজা মহম্মদ বখ্শীও ২৮৪ ও ৩০০ শত টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লাভ করেন। উকিল রামচন্দ্র—হুগলীতে এই সমস্ত উপঢৌকন সহ প্রেরিত হইয়াছিলেন। একা হুগলীর ফৌজদার তাহার কর্ম্মচারীরা এইরূপে তিন হাজার টাকা উপঢৌকন লাভ করেন। (Summary of Consultations No 117. (1704),

কলিকাতা কৌন্সিল, অবশ্য এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। হুগলীর শাসন-কর্ত্তা আবার বেশী মুদ্রার দাবী করিলেন। এই সময় হুগলীর ফৌজদার, নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। মুরশীদকুলী খাঁ সেই সময়ে উড়িষ্যা পরিদর্শন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন। ইংরাজপক্ষ হুগলীর ফৌজদারকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, "আপনি আমাদের জন্য দেওয়ান মুরশীদকুলী খাঁকে বিশেষ ভাবে অনু-রোধ করিবেন। নিম্নশ্রেণীর মোগল-কর্ম্মচারীরা আমাদের বড়ই উত্যক্ত করিতেছে।"

মুরশীদকুলী খাঁ, ইতিপূর্ব্বে ডচ্‌-বণিকদের নিকট ৩০ হাজার টাকা আদায় করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাদের উকীল রাজারামকে বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন দেওয়ানকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিও—"যে দুইটী কোম্পানী এখন এক হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই একজন, এই দুই কোম্পানীর কর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। যদিও ইতিপূর্ব্বে এই দুই কোম্পানী পৃথকভাবে সরকারে ছয় হাজার টাকা দিয়াছে, কিন্তু তাহাদের একীকরণের সহিত ছয় হাজার টাকা দিতে তাহারা বাধ্য নহে। সাবেক দস্তুর মত, তিন হাজার টাকাই দিবে। ইংরাজের অবাধ-বাণিজ্য সম্বন্ধে, নবাব যে আরও ১৫০০০ টাকা চাহিয়াছেন, তাহা দিতেও তাঁহারা বাধ্য নহেন। কারণ পূর্ব্বের সনন্দ অনুসারে, ইংরাজের বাণিজ্য কখনই বন্ধ হইতে পারে না। তবে যে কিছু উৎপাত ঘটিতেছে, তাহা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের দোষে। এই জন্যই ইংরাজের বাণিজ্যের আয় কমিয়া আসিয়াছে এবং তাঁহাদের আয়ের বর্ত্তমান অবনতির অবস্থায়, তাঁহারা বেশী দিতে-সক্ষম নহেন।" রাজারাম চারি শত টাকা পাথেয় ও দেওয়ানের খাস কর্ম্মচারীদের জন্য কতকগুলি উপঢৌকন সমেত যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন।*

* এই উপঢৌকনগুলি কি তাহাও পাঠকের জানিয়া রাখা উচিত।
(১) বনাত—১০ গজ (উৎকৃষ্ট শ্রেণীর)।
(২) অরোরা—১০ গজ (অন্য শ্রেণীর বনাত)।
(৩) সাধারণ বনাত—১০ গজ।
(৪) একজোড়া পিস্তল।
(৫) একটী জাপানদেশ নির্ম্মিত ঢাল।
(৬) আয়না (চারি প্রকারের)।
(৭) ছুরী ও কাঁচি।
Vide-Summary of Consultations. (Fort William July 1704.)

নবাব দেখিলেন,—ইংরাজদের অপেক্ষা দিনেমারেরা সরকারে বেশী টাকা দিয়াছে, কাজেই তিনি তিন হাজার টাকার কথা উড়াইয়া দিয়া ইংরাজদের নিকট একেবারে নগদ বিশ হাজার টাকার দাবী করিলেন। ইংরাজেরা অগত্য বিশ হাজারে উঠিলেন, কিন্তু তাহাতেও নবাব স্বীকৃত নহেন। শেষ এই দাবী পঁচিশ হাজারে দাঁড়াইল। ইংরাজেরা সেই সময়ে কাশিমবাজারের কুঠীটি, জাকাইয়া তুলিবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহাদের দুইজন কর্ম্মচারিও কুঠী খুলিবার উপযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া, কাশিমবাজারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজেরা অগত্যা বাধ্য হইয়া, নবাবের এই অস্বাভাবিক দাবি পঁচিশ হাজার টাকা দিতেই স্বীকৃত হইলেন।

কাজ কর্ম্ম অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে ইংরাজদের ভাগ্য-গুণেও বিধির বিধানে ঘটনাস্রোত সহসা অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত হইল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুসংবাদ বাঙ্গলায় পৌঁছিবামাত্রই, ইংরাজেরা যে দুইজন কর্ম্মচারিকে (বড্‌জেন ও ফিক্) কাশিমবাজারে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করেন। নবাবকে দিবার জন্য যে টাকা ধার্য্য হইয়াছিল, তাহাও দেওয়া হইল না। বিধাতার কৃপায়, ইংরাজ-বণিকগণ সে যাত্রা অনর্থক ক্ষতির হাত হইতে বাঁচিয়া গেলেন।*

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সংবাদ সুতালুটীতে পৌঁছিবামাত্র একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কলিকাতা-কৌন্সিল, তখনই এক বিশেষ অধিবেশন করিয়া মন্তব্য স্থির করিলেন—"নানাস্থান হইতে আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা হইতে সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এরূপ স্থলে সর্ব্বস্থানেই একটা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। অতএব স্থির হইল, আপাততঃ টাকা কড়ি দেওয়া বন্ধ রাখা হউক, মিঃ ডারেল ও স্পেনসার যথাসম্ভব শীঘ্র, কলিকাতায় ইংরাজ কোম্পানীর দলিল-পত্রাদি সমেত ফিরিয়া আসুন। কাশিমবাজারে মিঃ বড্‌জেন ও ফিকের উপরও এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইতেছে।"†

* Consultations. 107. 199.

† The whole town and factory were thrown into confusion by the news, that the Moguil is dead. As these tidings were received from several sources people were found to credit the story and great was the consterna ion at the Fort. A hasty council was summoned and determined to stop as much as possible all paying out of money and as a revolution

এক্ষণে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু-ব্যাপারে, ভারতের সর্ব্বত্রই একটা হুলস্থুল উপস্থিত হইল। আহম্মদনগরেই সম্রাটের জীবলীলার অবসান হয়। আহম্মদনগর হইতেই তিনি শেষ যুদ্ধযাত্রা করেন। রণক্ষেত্রের ভীষণ পরিশ্রম, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, বার্দ্ধক্য প্রভৃতিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিল। এ অবস্থাতেও তিনি দরবারে বসিতেন, সাধারণকে দেখা দিতেন, রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তবুও তিনি বুঝিলেন, যে কাল-ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার হস্ত হইতে তাঁহার পরিত্রাণের আশা নাই। তিনি যে এত চেষ্টা করিয়াও দাক্ষিণাত্য হইতে মহারাষ্ট্র-শক্তির উচ্ছেদ করিতে পারিলেন না—ইহাই তাঁহার মহাদুঃখ।

দিল্লীর "সম্রাটের-মৃত্যু" যে কি, তাহা ঔরঙ্গজেব জানিতেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসনাধিকার লইয়া, যে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে শোণিত-যজ্ঞের সুচনা হইবে, তাহাও তিনি জানিতেন। তিনি তাঁহার পিতা সাহজাহানকে শেষ অবস্থায় কিরূপভাবে নির্য্যাতন করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মনে জাগরুক ছিল। এইজন্য মৃত্যুর সময়টা তিনি শান্তির সহিত অতিবাহিত করিবার বাসনা করিয়া, পুত্রগণকে নিজের সান্নিধ্য হইতে দূরে পাঠাইলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহআলম তখন কাবুলে। কনিষ্ঠ কামবক্সকে সম্রাট একটু বেশী ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহাকে বিজাপুরে পাঠাইলেন। আজম মালব দেশে প্রেরিত হইলেন।* সুদূর দাক্ষিণাত্যে আত্মীয়গণ পরিবর্জ্জিত হইয়া—তখন তিনি একা। চারিদিক হইতে দারুণ নিরাশা আসিয়া প্রলয়ান্ধ-কারের ন্যায় তাঁহার চিত্তকে গ্রাস করিল। তখন অতীতের বিষময় চিন্তা, তাঁহার মৃত্যুচ্ছায়া কলঙ্কিত মনে, অসংখ্য আত্মগ্লানি উপস্থিত করিল। কি করিয়া তিনি বৃদ্ধ পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন, কিরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তিনি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিরূপ কঠোর-ভাবে, নৃশংস পিশাচের মত, তিনি দারা ও মোরাদকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই সব অতীত কথাই তাঁহার মনে পড়িল। সেই কষ্টার্জ্জিত সিংহাসন, সেই সুবিশাল রাজ্য, সেই দ্যুতিময় ময়ুর-সিংহাসন ও অগণ্য মণিমাণিক্যময় রাজ-

expected, order all the men that are near enough such as Messrs Darrell &c to come back with what money and charters they have, belonging to the Company (Consultations 197.)

* Kafi Khan in Elliot's History Col 1877. vol. VII. p. 884.

ভাণ্ডার, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কোহিনূর, সবই ত পড়িয়া রহিল—তাহার একটীও ত তিনি সঙ্গে লইতে পারিলেন না। কোথায় অসংখ্য আলোক-রাশি উজ্জ্বলিত আগ্রার রত্নময় প্রাসাদ—আর সেই সুখ বিলাসপূর্ণ আগরা হইতে, কতদূরে তিনি আত্মীয় বান্ধবহীন হইয়া এই দাক্ষিণাত্যে। তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই যে তাঁহাকে সুদূরদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাইতে হইয়াছে!

মৃত্যুর পূর্ব্বে দারুণ নির্ব্বেদ আসিয়া, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চিত্তাধিকার করিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এত চেষ্টা করিয়া, এতদিন ধরিয়া, যাহা করিয়াছি সবই ভুল! জীবনে যে কঠোর পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত! এই সব চিন্তায়, দারুণ মনোবেদনায় অধীর হইয়া সম্রাট দিন রাত ভীষণ যাতনা ভোগ করিতেন। তাঁহার জীবনের সন্ধ্যায় যে পত্রগুলি তিনি তাঁহার পুত্রদের লিখিয়াছিলেন—তাহাতেই তাঁহার মনের অবস্থার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়।

একখানি পত্রে সম্রাট লিখিতেছেন—"যখন সংসারের প্রথম আলোক দর্শন করিয়াছিলাম, তখন অনেকেই আমার পার্শ্বে ছিল। কিন্তু এখন আমি একাই চলিলাম। আমি কে—কেন পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। রাজ্য, রাজকার্য্য, যুদ্ধ লইয়াই জীবন কাটাইয়াছি। স্বার্থের চিন্তাতে বিভোর হইয়া, জীবনের পথে অন্ধের মত চলিয়া আসিয়াছি। আত্মচিন্তায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, খোদাকে ভুলিয়াছি। এ জীবনে আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। যে দেশ আমার শাসনাধীনে ছিল—যে প্রজা আমার আশ্রয়াধীনে ছিল, তাহাদেরই বা কি করিয়াছি? ঈশ্বর ত আমার প্রাণের মধ্যেই বিরাজিত ছিলেন—কিন্তু আমার অন্ধ চক্ষু তাহা ত দেখে নাই। দেখিবার চেষ্টাও করে নাই। এ জগতে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনি নাই—কিন্তু যাইবার সময় পাপের বিরাট বোঝা লইয়া চলিলাম। যদিও আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণায় একান্ত বিশ্বাস করি, তাহা হইলেও যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, তাহা ভাবিতে ভয় হয়। আমার কোন আশাই নাই। যাহাই ঘটুক না কেন, আমি জীবনতরী মহাসমুদ্রে ভাসাইলাম। বিদায়—বিদায়—বিদায়।"*

৪ ঠা মার্চ্চ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের প্রভাতে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনান্তে—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রাণবায়ু দেহমুক্ত হইল। ঔরঙ্গজেব প্রায়ই বলিতেন—"খোদা

* Scott's Deccan Vol II. p. IV, (1794.)

কি এমন করিবেন না—যে শুক্রবারে আমার মৃত্যু ঘটে?" তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল।* যাহাতে বিনা জাঁকজমকে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধি ব্যাপার সম্পন্ন হয়, এ আদেশ তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বেই দিয়া রাখিয়াছিলেন। অত বড় আলমগীর বাদসা—যাঁহার নাম শুনিলে লোকে কাঁপিয়া উঠিত, এইরূপে পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায়—তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

রাজকুমার আজম, এই সময়ে রাজধানী হইতে বিশক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়াই, তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যদি তিনি একটু বুঝিয়া চলিতেন, হয়তঃ সিংহাসন তাঁহারই হইত। কিন্তু তিনি হঠকারিতা ও আত্মম্ভরিতা দোষে, সমস্ত ক্ষমতাপন্ন আমীর-ওমরাহগণকে শত্রু করিয়া তুলিলেন। বিপৎকালে কেহই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিল না।

ধীর বুদ্ধি—সাহ-আলম, এই সময়ে অতি ধীরতার সহিত কাজ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রধান ভরসা তাঁহার দুই পুত্র—মুইজুদ্দিন ও আজিমওশ্বান। সে সময়ের প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মুনাইম খাঁও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইবার দুইদিন পরে, ১০ই মার্চ্চ তারিখে, তিনি পেশোয়ারে উপস্থিত হন। এপ্রেল মাসে লাহোরে পৌছান। লাহোরে আসিয়া, কয়েকদিন নির্জ্জন অবসরের সুযোগে, সাহ-আলম নিজের সেনাদল ও ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী ঠিক করিয়া লইলেন। তৎপরে দিল্লী ও আগরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজিমওশ্বানও বিশহাজার অশ্বারোহী লইয়া, পথিমধ্যে পিতার সহিত মিলিত হইলেন।

শেষ সাহ-আলমেরই জয় হইল। জ্ঞানে, দক্ষতায়, মতলবে, তিনি আজমের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তবুও তিনি আজমকে প্রথমে এক পত্র লিখিয়া পাঠান—"এস ভাই! হিন্দুস্থানটা আমরা কয়জনে ভাগ করিয়া লই। বৃথা শোণিতপাতে প্রয়োজন কি?" আজম,—সাদীর কবিতার একটী চরণ-উদ্ধার করিয়া জ্যেষ্ঠের এই সঙ্গত প্রস্তাবের উত্তর দিলেন—"একখানি কম্বলে দশজন ফকির শুইতে পারে, কিন্তু এক রাজ্যে দুইজন রাজা থাকিতে পারে না।"†

* Iradat Khan in Scott's Deccan. Vol IV. p. 10. Stanley Lane Poole's Aurangzeb p. 224.

† ভবিষ্যতে কামবক্সকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সাহ-আলম ১৭০৮ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যের আরঙ্গবাদে আসেন। এই সময়ে কামবক্স হায়দারাবাদে ছাউনী করিয়াছিলেন। সাহ-আলম কামবক্সকে বলিয়া পাঠান—"ভাই! পিতা তোমাকে বিজাপুর রাজ্যের অধিকার দিয়া

যাহা হউক—এই ভ্রাতৃ-সমরে, সাহ-আলমই সর্ব্বতোভাবে বিজয়শ্রী লাভ করিলেন। সিংহাসন তাঁহারই হইল।
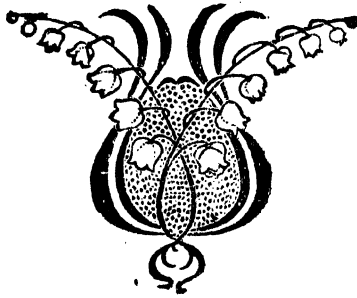
গিয়াছেন। আমি তোমাকে তাহার উপর হায়দারাবাদ দিতেছি। আমি তোমায় নিজের সন্তানের মত স্নেহ করি। অযথা মুসলমানের রক্তপাতের প্রয়োজন কি? কিন্তু এ নায্য প্রস্তাবেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। কামবক্স কিছুতেই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। পরাজিত হইয়া আহত অবস্থায় তিনি সাহ-আলমের শিবির মধ্যে আনীত হন। এই সময়ে সাহ-আলম তাঁহাকে দেখিতে যান। সাহ-আলম কনিষ্ঠের সেই রক্তাপ্লুত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"ভাই! তোমাকে যে এ অবস্থায় দেখিতে হইবে, এ ইচ্ছা আমার ছিল না।" কামবক্স বলিলেন—"তৈমুর-বংশে জন্মিয়া যে প্রাণভয়ে ভীত কয়েদীর মত শৃঙ্খলিত হইয়া, তোমার কাছে আসি নাই—ইহাই আমার সৌভাগ্য।" সাহ-আলম এ উত্তরে কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া, ভ্রাতার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সেই সময়ে দুইজন ইউরোপীয়ান ডাক্তার সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। সাহ-আলম, আহত ভ্রাতার জীবনরক্ষার জন্য তাঁহাদেরও নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু কামবক্স—ঘৃণায়, মনের দুঃখে, ভ্রাতার নিকট কোন সাহায্য লয়েন নাই। Iradat Khan 55. Khafi Khan. 406.

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর—রাষ্ট্র বিপ্লব—সুলতান আজিমওশ্বানের পিতার সাহায্য জন্য সেনা সংগ্রহ—ইউরোপীয় বণিকদিগকে অর্থের জন্য পীড়ন—ইংরাজ বণিকদের আতঙ্ক—এই বিপ্লব-সুযোগে ফোর্ট উইলিয়ম নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপন—পাটনার এজেণ্টদের উপর সুবাদারের অত্যাচার—কলিকাতা কৌন্সিল কর্ত্তৃক এ অত্যাচার প্রতিকার চেষ্টা—সাহ আলমের সিংহাসন প্রাপ্তিতে যুদ্ধ বিগ্রহের শান্তি—আজিমওশ্বানের সুবাদারী পদে নিয়োগ ও দিল্লীতে অবস্থান—সাহাজাদা ফরকশিয়ারের সুবাদারী লাভ—মুরশীদ কুলী খাঁর পুনরায় দেওয়ানী প্রাপ্তি—হুগলীর নূতন ফৌজদার—ইংরাজ বণিকদের সহিত ফৌজদারের সংঘর্ষ—কলিকাতা আক্রমণের ভয় প্রদর্শন—ইংরাজদের কলিকাতা রক্ষার চেষ্টা—মীর মহম্মদের মধ্যস্থতায় বিবাদের নিষ্পত্তি—নূতন বাদসাহ দরবারে সনন্দপ্রাপ্তির চেষ্টা—ইংরাজদের উকীল শিবচরণের নিস্ফল প্রয়াস—দেওয়ান মুরশীদ কুলী খাঁ ও সুবেদার ফরকশিয়ারের অসম্ভব দাবীদাওয়া—উকীল শিবচরণের কার্য্যে ইংরাজ কৌন্সিলের অবিশ্বাস—তাহাকে নজরবন্দী করিয়া পাঠাইবার জন্য ফজল মহম্মদকে রাজমহলে প্রেরণ—নবাব ও সুবেদারের ইংরাজ বণিকদের নিকট দেড়লক্ষ টাকা উৎকোচ দাবী—হুগলীর ফৌজদারের চাতুরী—কামবক্সের দাক্ষিণাত্যে পরাজয় সংবাদে মুরশীদ কুলী ও সাহাজাদার দিল্লী গমন—কলিকাতার ইংরাজ বণিকগণ কর্ত্তৃক মোগল চৌকীর লোকদিগকে ধৃত করণ—শেরবলন্দ খাঁর দেওয়ানী লাভ—ইংরাজ বণিকদের প্রতি শেরবলন্দ খাঁর মৌখিক সহানুভূতি—ও তাঁহাকে ৪৫ হাজার টাকা উৎকোচ দানে বাণিজ্যস্বত্ব লাভ—সাহআলমের রাজমুকুট ধারণ—মুরশীদ কুলীর বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন—হুগলীর নূতন ফৌজদার জেয়াউদ্দিন খাঁ—জনার্দ্দন শেঠের ইংরাজদের উকীলরূপে হুগলীতে ফৌজদারের নিকট গমন—ইংরাজদের সহিত জেয়াউদ্দিনের সদ্ব্যবহার—কলিকাতা কৌন্সিলের নূতন কর্ত্তা ওয়েল্ডন—নবাব মুরশীদ কুলীর নূতন দাবি—দাবির জ্বালায় অস্থির হইয়া ইংরাজদের বাদসাহ দরবারে দূত প্রেরণ—সাহ আলমের মৃত্যু—পুনরায় নূতন রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা—আজিমওশ্বানের মৃত্যু—নূতন বাদসাহ জাহান্দার সাহ—সাহাজাদা ফরকশিয়ারের দিল্লী সিংহাসন দখলের উদ্যোগ—মুরশীদ কুলীর নিকট অর্থসাহায্য ও সেনা প্রার্থনা—মুরশীদ কুলীর এ সাহায্য কার্য্যে অস্বীকার—পাটনা ও ঢাকা হইতে সেনা সংগ্রহ—ফরকশিয়ার কর্ত্তৃক বিহার দখল—রাঢ়ের সুবাদার আবদুল্লা খাঁ ও হোসেন আলীর সাহায্য লাভ করিয়া ফরকসিয়ার কর্ত্তৃক বাঙ্গলার খালসা রাজস্ব লুণ্ঠন—ফরকশিয়ার কর্ত্তৃক রসিদ্ খাঁকে মুরশীদ কুলীর দমনের জন্য প্রেরণ—নবাব মুরশীদ কুলীর সৈন্যের সহিত সাহাজাদার সৈন্যের সংঘর্ষ—সকরীগলী ও তিলিয়াগড়ীর যুদ্ধ—ফরকশিয়ারের পরাজয়—জাহান্দার সাহের সহিত ফরকশিয়ারের সংঘর্ষ—নূতন সম্রাট জাহান্দার সার শোচনীয় মৃত্যু—

ফরকসিয়ারের সম্রাট উপাধি ধারণ—মুরশীদ কুলীর পুনরায় নবাব-নাজিমী পদ প্রাপ্তি—ফরকশিয়ারের নিকট উপহার প্রেরণ—মুরশীদ কুলীর সহিত পুনরায় ইংরাজের সংঘর্ষ—ইংরাজদের সম্রাট ফরকশিয়ারের দরবারে দূত প্রেরণ—সর্ম্মান ও ডাক্তার হ্যামিল্টানের উপহার ও নজরানাসহ সম্রাট দরবারে গমন—সম্রাটের পীড়া—হ্যামিল্টান কর্ত্তৃক সম্রাটের পীড়া শান্তি—ইংরাজ পক্ষের প্রচুর সম্মান ও পুরস্কার লাভ—ফরকশিয়ারের নূতন সনন্দ—কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি—এতৎ সম্বন্ধে মুরশীদ কুলীর প্রতিযোগিতা—এই গ্রামগুলির বর্ত্তমান ও অতীত পরিচয় তালিকা। নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর মৃত্যু—তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথা। নবাবী আমলে দেশের অবস্থা।

নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর আমল।

এ অধ্যায়ে, আমরা পুরাতন ফোর্ট-উইলিয়ম সম্বন্ধে নানা কথা, মুরশীদ কুলী খাঁর ইংরাজদের সহিত ব্যবহার—"রোটেশান" বা পর্য্যায়ক্রমিক গবর্ণমেণ্টের আমলে,ইংরাজ-বাণিজ্যের অবস্থা ও দেশীয় শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য, প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা বলিব। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পৌত্র বাঙ্গালার সুবেদার সুলতান আজিম-ওশ্বান, পিতার সাহায্যার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সরকারী রাজকোষ তিনি ইতিমধ্যেই হস্তগত করিয়াছিলেন! কিন্তু এ যুদ্ধোদ্যমে, আরও টাকা চাই। এ টাকা আসেই বা কোথা হইতে? শেষ তিনি ইউরোপীয় বণিকদের উপর পড়িলেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে, তাহাদের নিকট একলক্ষ মুদ্রা চাহিয়া বসিলেন।

ইংরাজেরা এ সংবাদ শুনিয়া ভয় পাইলেন। বঙ্গের সুবাদারের এ দাবির কতকাংশ দিতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদের ক্ষমতায় কুলাইবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে,প্রথম উত্তেজনার কাল উত্তীর্ণ হইলে,ইংরাজেরা বুঝিলেন—ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুতে তাঁহাদের একরূপ সুবিধাই হইয়াছে। পদস্থ রাজকর্ম্মচারিরা এখন সকলেই যুদ্ধের হাঙ্গামায় ব্যস্ত। এই অবসরে, অসম্পূর্ণ দুর্গের বাকী কাজগুলি শেষ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাজেই এই উপযুক্ত অবসরে, তাঁহারা নদীতীরের দুইটী বুরুজ নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেন। পাটনা হইতে এই সময়ে সংবাদ আসিল—সুবাদার যুদ্ধকার্য্যের প্রয়োজনীয় টাকা আদায় করিবার জন্য, জবরদস্তি আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরাজদের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে তিনি ফাটকে দিয়াছেন। এই সংবাদে বিচলিত হইয়া, কলিকাতা-কৌন্সিল, রাজ-দরবারে একখানি পত্র পাঠাইলেন—তাহার স্থূলমর্ম্ম এই, "আপনারা যদি আমাদের উপর অন্যায় জবরদস্তি করেন, তাহার ফল

শুভ হইবে না। পাটনায় যদি ইংরাজ-কোম্পানীর কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে আমরা হুগলী বা অন্যস্থানে তাহার প্রতিশোধ লইব।"*

ইংরাজগণ এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিলে, ব্যাপারটা তখন একটু চাপা পড়িল। আজিমওশ্বান পিতার সাহায্যকল্পে সবিশেষ ব্যস্ত। কামবক্স তখনও প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর। সুলতান পিতার সাহায্যার্থে, বঙ্গদেশ হইতে ৮ কোটী টাকা ব্যয়ে, ত্রিশহাজার অশ্বারোহী-সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সেনা-সাহায্য, বাহাদুর-সাহের বিজয়লাভের যথেষ্ট সহায়তা করিল।

বাদসাহ, পুত্রের এইরূপ কার্য্য-কুশলতা, দেখিয়া তাঁহাকে পুনরায় বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার সুবাদারী দান করিলেন। কিন্তু উপস্থিত মত আজিমওশ্বান পিতার নিকটেই রহিয়া গেলেন। মুরশীদকুলী খাঁ পূর্ব্ববৎ বাঙ্গলার দেওয়ান হইলেন। আজিমওশ্বানের অনুপস্থিতি কালে—শেরবলন্দ খাঁর তত্ত্বাবধারণাধীনে, রাজকুমার ফরকশিয়ার বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার সুবাদারের কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নাম মাত্র সুবাদার। মুরশীদকুলী খাঁই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলার নায়েব-নাজিম ও দেওয়ান হইয়া রাজ্য-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারই চেষ্টাতেই সৈয়দ একরাম খাঁ, বঙ্গদেশের নায়েব-নাজিম হন এবং তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন উড়িষ্যার নায়েব-দেওয়ানী পদলাভ করেন।

মুরশীদকুলী খাঁ, এই সময়ে ইংরাজদিগের সহিত বাণিজ্য-বন্দোবস্ত করিবার জন্য, তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। ইংরাজেরা এ আহ্বানের মর্ম্ম বুঝিয়া, একটু সন্দিগ্ধ ভাবে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। কামবক্স তখনও স্বাধীন। তখনও সমরক্ষেত্রে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় হয় নাই। নূতন সম্রাট, ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে গিয়াছেন। সিংহাসন যে কাহার হয়—তাহার স্থিরতা নাই। এ সময়ে, মুরশীদকুলীর সহিত টাকা দিয়া বন্দোবস্ত করিলে, বিশেষ কোন ফল হইবে কি না, ইহা

* The Sultan and his son demanded a lac of rupees as a contribution towards raising forces. Mr. Llyod and Cowthorp refused the money, so the Prince had the English Vakil seized and also the other native servants who belonged to the Company. * * A letter was sent to the Company's Vakil at Patna, telling him, that if the Company's people there are plundered, we will take satisfaction at Hugly or anywhere, we find it convenient to do so. (Consultation No 203. Wilson).

ভাবিয়া, ইংরাজেরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অথচ অন্যপক্ষে তাঁহাদের বাণিজ্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে—সোরার নৌকাগুলি পূর্ব্ববৎ আটক হইয়া রহিয়াছে। পাটনার কুঠীর কার্য্যেও বড়ই বিশৃঙ্খলা। এজন্য তাঁহারা পাটনার কুঠী তুলিয়া দিবার মতলব স্থির করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে একজন নবনিযুক্ত ফৌজদার আসিলেন। ইনি প্রথম প্রথম ইংরাজদের সহিত বেশ সদ্ব্যবহারই করিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন—যে কামধেনুরূপ ইংরাজ-বণিকদের পীড়ন করিলেই কিছু দুগ্ধ পাওয়া যাইবে, তখন তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের ডাকাইয়া বলিলেন,—"তোমরা ইংরাজ-বণিকদের সহিত মালপত্রের লেন-দেন করিও না।" ইহার উপর তিনি ইংরাজ-কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধিগণের উপর অযথা পীড়ন আরম্ভ করিলেন। কলিকাতার ইংরাজদের ভয় দেখাইলেন—"আমি শীঘ্রই কলিকাতা আক্রমণ করিব।"*

ইংরাজগণ ইহাতে ভয় পাইয়া, সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। কলিকাতা-বাসী যত খ্রীষ্টান ছিল, তাহাদের নবনির্ম্মিত দুর্গমধ্যে আনিয়া, কুচকাওয়াজ শিখাইতে লাগিলেন। পর্টুগীজগণও এই সময়ে ইংরাজ-কোম্পানীর সেনা-দলে গৃহীত হইল। তখন কলিকাতায়, ভাগীরথীবক্ষে দুইখানি মাত্র জাহাজ নজর করিয়াছিল। তাহাদের মাজি মাল্লাগণকেও সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। ইংরাজেরা এরূপভাবে আয়োজন করিতে লাগিলেন, যাহাতে তাঁহারা অনায়াসে ফৌজদারের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারেন।

যাহা হউক এইরূপ ব্যবস্থার দুইদিন পরেই, কলিকাতায় ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ, যুবরাজ ফরকৃশিয়ারের কোয়াসিদ্‌দার, মীর মহম্মদের নিকট হইতে এক অনুকূল পত্র পাইলেন। সে পত্রে লেখা ছিল—"আমি আপনাদের জন্য হুগলীর ফৌজদারের নিকট অনেক অনুযোগ করিয়াছি। তাঁহাকে

* In July the "hot-headed phousder" began to resort to violence. He prohibited the local merchants from dealing with the English, abused the English representatives, imprisioned the English servants. An attack on Fort Willam seemed iminent. * * * On the 10th July "we summoned all the Europeans and Christian inhabitants and the Master of ships acquainting them that we expect some trouble from Hugly." Prof. Wilson. p. 129. Vol. 1.

বলিয়াছি, ইংরাজদের সহিত এরূপভাবে ব্যবহার করা উচিত হয় নাই। আপনি ইংরাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া, ভাল কাজ করেন নাই। কিন্তু ফৌজদার আমাকে বলিলেন,—নবাব মুরশীদকুলীর আদেশেই এ কাজ হইয়াছে, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। আর ইংরাজদের মালপত্র ও লোকজন যাহা আটক করা রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। আপনারা দুই চারিদিন অপেক্ষা করুন, আমি এ ব্যাপারের সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা মিটমাট করিয়া দিব।" ইংরাজেরা এই পত্রের উত্তরে বলিয়া পাঠান—"আপনাদের যে সমস্ত কর্ম্মচারীদের দোষে, আমাদের গোমস্তা ও কর্ম্মচারিগণ আটক হইয়াছেন, আপনি তাঁহাদের কর্ম্মচ্যুত করিলে, আমরা বড়ই সুখী হইব।"*

কেবলমাত্র সাহজাদার উপর নির্ভর করিয়া বা তাঁহার নিকট উকীল প্রেরণ করিয়া, কলিকাতার ইংরাজেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ বা মান্দ্রাজের বড়-কর্ত্তাও নূতন বাদসাহ সাহ-আলমের নিকট হইতে অতিরিক্ত কিছু সনন্দ-লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। এইজন্য কলিকাতা কৌন্সিল, তাঁহাদের উকীলকে পুনঃ পুনঃ লিখিতে লাগিলেন—"সাহজাদাকে বলিও, শীঘ্রই আমরা নূতন বাদসাহের সনন্দ পাইব—পাইলেই তাহা দেওয়ান ও সাহজাদার নিকট পাঠাইব।"

ইংরাজদের যে সকল পুরাতন ফার্ম্মানের প্রতিলিপি, উকীল শিবচরণ রাজমহলে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষ কোন ফললাভ হইল না। দেওয়ান ও ইংরাজপক্ষের মধ্যে দরদস্তুর আরম্ভ হইল। কলিকাতা-কৌন্সিল বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনার স্বাক্ষরিত বাণিজ্য ছাড়ের জন্য, আমরা পনর হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত।" নবাব ও সাহজাদা ইহাতে সম্মত হইলেন না। উকীল পুনরায় লিখিয়া পাঠাইলেন—"আরও পনর হাজার টাকা চাই এবং তিনখানি আয়না চাই। একখানি আয়না, সাহজাদা ফররুখশিয়ারের জন্য, ও অপর দুইখানি দেওয়ান মুরশীদকুলী খাঁর জন্য।" ইহাতেও ফল হইল না। উকীল আবার লিখিয়া পাঠাইলেন—"সাহজাদা ও দেওয়ান, ৩৫ হাজার টাকার কমে কোনরূপেই রাজি হইতেছেন না। ডচ্ বণিকগণ, ইতিপূর্ব্বেই এই টাকা দিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজেরাও ইহা দিতে বাধ্য।" ইংরাজেরা তাঁহাদের উকীলকে বলিয়া পাঠাইলেন—"২৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত

* Summaries of Consultations, 247. 249.

আমরা দিতে পারি, ইহাতে যদি সুবেদার ও নবাব স্বীকৃত হন ত ভাল্‌ই নচেৎ তুমি সরাসর কলিকাতায় চলিয়া আসিবে।"* কিন্তু শিবচরণ কোম্পানীর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, নবাবকে ছত্রিশ হাজার টাকার এক হুণ্ডী দিয়া, সেই সংবাদ কলিকাতায় পাঠাইলেন। কলিকাতার কর্ত্তারা, এই সংবাদ পাইয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সঙ্কল্প হইল, শিবচরণ প্রদত্ত এ হুণ্ডী অমান্য করা হইবে। কিন্তু ততটা অগ্রসর হইতে তাঁহাদের সাহস হইল না। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের উকীলের উপর বড়ই চটিয়া গেলেন, ও ফজল মহম্মদ নামক, তাঁহাদের এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে রাজমহলে প্রেরণ করিলেন। ফজল মহম্মদের উপর আদেশ রহিল, যে তিনি যেন শিবচরণকে আটক করেন ও প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন।

ফজল মহম্মদ ফিরিয়া আসিয়া যে সংবাদ দিলেন, তাহাতে কলিকাতার কর্ত্তাদের চক্ষুস্থির হইল। ফজল মহম্মদ জানাইলেন—যে যদিও ৩৬ হাজার টাকা পাইয়া দেওয়ান ও সাহজাদা সনন্দ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তত্রাপি তাঁহারা কার্য্যতঃ কিছুই করিতেছেন না। তাঁহাদের অভিলাষ এই যে তাঁহাদের দুইজনকে নজরানারূপে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং সম্রাটের রাজকোষে একটী লক্ষ টাকা উপহার দিতে হইবে।†

ইংরাজেরা এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া হুগলীর ফৌজদারের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। ফৌজদার সাহেব তখন অনেকটা ঠাণ্ডা মূর্ত্তিধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনাদের ভাবিবার কোন

* They received notice from their Vakil at Rajmahal that the Prince and Dewan have now increased their demands to 35000 Rs, for their Sanad. The Dutch had already given the sum, so the Prince and Dewan force the English to do the same. The Council decide they can not give such a sum. They write to their Vakil telling him to offer 25000. If the Dewan refuses to accept it, the Vakil is to come away—Suttanuty Consultations, 254.

† The Akhundi returned from Dewan's camp and told the Council that after having promised their Sanad the Prince and Dewan now refuse to give it, for less than fifty thousand Rupees as a present for the Dewan and Prince and a hundred thousand rupees to be paid into the Emperor's treasury at Surat. The Akhundi had tried every means he could to lesson their demands but had not succeeded. The Dewan and the Prince, he said, were determined to have a large sum from the English (Consultation No. 293.)

কারণ নাই। আপনারা আমাকে ৩ হাজার টাকা নজরানা দিবেন। আমি দেওয়ান ও সুবাদারকে অনুরোধ করিয়া যাহাতে ৩৫ হাজার টাকা দিলে, এ ব্যাপারটা মিটিয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিব।" কিন্তু ফৌজদার সাহেব মুখে যতটা আস্ফালন করিলেন, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। ১৭০৮ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরাজেরা সংবাদ পাইলেন, কাউথর্প সাহেব, যিনি রাজমহলে ইংরাজের প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি, এবং কোম্পানীর মালের নৌকাগুলি আটক হইয়াছে। ঘটনাটা অবশ্য যুবরাজের আদেশেই হইয়াছে। আর চৌদ্দ হাজার টাকা না পাইলে যুবরাজ এগুলি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। এই সময়ে কলিকাতায় সংবাদ আসে—যে নূতন সম্রাট সাহ-আলম কামবক্সকে পরাভূত করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, দেওয়ান মুরশীদকুলী ও যুবরাজ ফরকশিয়ার দিল্লী যাত্রা করিলেন। এই সময়ে জোসিয়া চিটি নামক কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী কলিকাতা কৌন্সিলকে জানান—"যে খিদিরপুরের চৌকীর, মোগল-জমাদারেরা অনর্থক নৌকা আটক করিয়া, তাঁহাদের ক্রমাগতঃ কষ্ট দিতেছে।" প্রকৃতই এই চৌকীদারগুলা, প্রায়ই কোম্পানীর নৌকা আটক করিয়া কিছু উপরি আদায়ের চেষ্টা করিত। ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কলিকাতার কুঠী হইতে ৬০ জন বরকন্দাজ ২০জন বন্দুকধারী সেনা এই মোগল চৌকীদারদের ধরিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। ইংরাজের লোক যথাস্থানে পৌছিলে, উভয়পক্ষে বেশ একটা হাতাহাতি হইয়া গেল। ইহাতে ইংরাজপক্ষে ও মোগলপক্ষে কয়েকজন লোক জখম হয়। ইংরাজেরা কয়েকজন মোগল চৌকীদারকে কলিকাতার কুঠীতে ধরিয়া আনেন এবং তাহাদের থামে বাঁধিয়া, চাবুকের দ্বারা আঘাত করিতে আদেশ প্রদান করেন।*

মুরশীদকুলী খাঁ ও সুবাদার দিল্লীতে চলিয়া গেলে, শেরবলন্দ খাঁ, বঙ্গবিহার উড়িষ্যায় সুবাদার পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ইংরাজেরা এই সংবাদ পাইয়া, নবনিযুক্ত সুবাদারকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এজন্য তাঁহারা জন আয়ার ও প্যাটেল সাহেবকে, তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে শেরবলন্দ

* We have considered it and believe it will be for the Company's interest to have them severely punished to deter the other troublesome Chaukis from committing the like. Agreed—that each of them be tied to the post and have 21 strokes with a split ratten and be kept for a further punishment. (Consultation No 309.)

খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। শেরবলন্দ খাঁও প্রথম প্রথম ইংরাজদের উপর সদয় ভাবই প্রকাশ করিলেন। তিনি আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—"আপনাদের বাণিজ্য যেমন চলিতেছে তেমনিই চলুক, পরে সনন্দ আনাইলেই চলিবে।" কিন্তু সেকালের মোগল-কর্ম্মচারীদের মতিগতি বোঝা ভার। ভবিষ্যতে এই শেরবলন্দ খাঁই আবার খেয়ালের বশে ইংরাজদের মালের নৌকা আটক করেন। কোম্পানী আবার ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করিলেন। এই পূজার প্রথম অংশ অর্থাৎ দুইটী হাজার টাকা তখনই তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য পাঠান হইল। কিন্তু শেরবলন্দ খাঁ ৪৫ হাজার টাকা দাবী করিয়া বসিলেন। তিনি ইংরাজপক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন—"এই টাকাটা আমায় দিলে আমি আপনাদের সনন্দ আনাইবার সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিব। আমি বঙ্গের দেওয়ানীপদে পাকা হইয়া যাই ত কথাই নাই। অন্যথায় আমার পর যিনি আসিবেন—তাঁহাকেও এরূপভাবে অনুরোধ করিয়া যাইব, যাহাতে আপনাদের সনন্দ প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা না ঘটে। কিন্তু এই টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিলে, আপনাদের বাঙ্গলার বাণিজ্য আমি একেবারে বন্ধ করিয়া দিব।"

মোগলরাজ্যের নিয়মানুসারে, প্রত্যেক নূতন সম্রাটের সময়েই নূতন-ভাবে সনন্দ আনাইতে হয়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সহিত, পুরাতন সনন্দের স্বত্ব লোপ পাইয়াছিল। সাহ-আলম তখন দিল্লীর তক্তে বসিয়াছেন, কাজেই তাঁহার নিকট হইতে নূতন সনন্দ না আসা পর্য্যন্ত, ইংরাজেরা নিরাপদ নহেন। অগত্যা তাঁহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, তাঁহাদের এজেন্ট প্যাটেল সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন।"*

প্যাটেল সাহেব দেখিলেন—পাটনায় কোম্পানীর মালের নৌকা এই ভাবে আবদ্ধ থাকিলে, মালামাল নষ্ট হইয়া যাইবে ও সেই সঙ্গে ব্যবসায়েরও সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবে। ইহার উপর মুর্শীদাবাদের-মাশুলের জন্যও অনেক টাকা দাবি হইতেছে। প্যাটেল সাহেব, অগত্যা শেরবলন্দ খাঁর হস্তে ৪৫ হাজার টাকা তুলিয়া দিলেন। এই ব্যাপারে সরকারী খাজনা-খানার অধ্যক্ষ ওয়ালীবেগ, প্যাটেল সাহেবকে বিশেষরূপে সাহায্য করেন। ইংরাজেরা শেরবলন্দ খাঁর নিকট হইতে বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার অবাধ বাণিজ্যের

* Summaries of Consultations. No. 325.

সনন্দ লাভ করিলেন এবং ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, রাজমহল প্রভৃতি স্থানের জন্যও তাঁহারা বিশেষ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।*

অগ্রেই বলিয়াছি—মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্ট পিট সাহেব, নূতন সম্রাটের দরবারে, ভারতে ইংরাজের অবাধ-বাণিজ্য স্বত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। পিট্, কলিকাতার কৌন্সিলকে বলিয়া পাঠান—"আপনারাও এই সময়ে আমাদের সহিত যোগদান করুন।" কিন্তু সেই সময়ে কলিকাতার কর্ত্তারা মুর্শিদাবাদ ও রাজমহলে তাঁহাদের পথ পরিষ্কারের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, পিটের সহায়তা করিতে পারেন নাই। ১৭০৯খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে শেরবলন্দ খাঁ শাসনকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যুবরাজ ফরুকশিয়ার, আজিমওশ্বানের স্থলে বাঙ্গলার সুবাদার ও নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, দেওয়ানরূপে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু মুরশীদকুলী খাঁর আগমনের পূর্ব্বে যিনি, অস্থায়ীভাবে দেওয়ানের কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি কোম্পানীর মালপত্র আটক করিয়া বলিয়া বসিলেন—"হাজার টাকা দাও, তাহা না হইলে আমি মালপত্র ছাড়িব না।" ইংরাজেরা মহা গোলযোগে পড়িলেন। শেরবলন্দ খাঁর উদর পূর্ণ করিবার জন্য অত গুলি টাকা মিছামিছি জলে গেল। তাহার উপর আবার এই বিপত্তি। ইংরাজেরা ইহাতে সম্পূর্ণরূপে আপত্তি করেন। কিন্তু তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে, এই দেওয়ান, নগদী-সেনাদের হস্তে নিহত হইলেন। নগদীরা প্রাপ্য বেতনের জন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিল। ইহার ফলে ইংরাজেরা ১৭১০ খৃঃ অব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে বঙ্গের বাণিজ্য কার্য্য চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আজিমওশ্বান, প্রথম হইতেই মুরশীদকুলীর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহার উদাহরণও পাঠক পূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছেন। তখন তিনি বাদসাহ পুত্র। তাঁহার পিতা সাহ-আলম, বাহাদুর সাহ উপাধি ধারণ করিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনি ভাবিলেন, মুরশীদকুলীর মত একজন সুদক্ষ

---

* ইংরাজের এই শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্র, খাজনা-খানার দারোগা ওয়ালীবেগ, সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় আগমন করেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে মহাসমারোহে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সহস্রমুদ্রা মূল্যের দ্রব্যাদি উপহার দেন।

"Waly-Beg the Superintendent of the King's Treasury who had been most useful to Mr. Pattle in helping to get the order, was graciously pleased to visit Calcutta at the end of September, where he was received very civilly and had a present of one thousand rupees value made him. Vide.—Summary of Consultations—338.

কর্ম্মচারীকে ত্যাগ করিলে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি, অথচ তাঁহার অবাধ ক্ষমতা সংযত করাও আবশ্যক।

মুরশীদকুলী খাঁ মার্চ্চ মাসে পাটনায় উপস্থিত হন। এদিকে বাদসাহ জেয়াউদ্দিন খাঁ নামক এক সুদক্ষ ব্যক্তিকে এপ্রিল মাসে হুগলীর ফৌজদার ও করমণ্ডল উপকূলের ও বঙ্গোপসাগরের নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।* মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ পিট সাহেবের সহিত জেয়া-উদ্দিনের খুব সদ্ভাব ছিল। পিটের সহিত তাঁহার যে পত্র ব্যবহার হইয়া-ছিল, তাহা হইতেই প্রমাণ হয়, তিনি ইংরাজদের পরম হিতচিকীর্ষু বন্ধু ছিলেন।† জেয়াউদ্দিন খাঁ, মে মাসে হুগলীতে উপস্থিত হন। এই সময়ে জনার্দ্দন শেঠ কোম্পানীর প্রধান দালাল ছিলেন। ইংরাজপক্ষ নূতন ফৌজ-দারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, জনার্দ্দনকে হুগলীতে পাঠাইলেন। জনার্দ্দন ফিরিয়া আসিয়া কৌন্সিলকে জানাইলেন—"ফৌজদার সাহেব অতি অমায়িক ও ভদ্রলোক। আমার সহিত তিনি অতি ভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় আসিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নবাবী প্রথামত, আপনাদের পক্ষ হইতে দুইজন লোক তাঁহার দরবারে হাজির হওয়া প্রয়োজন।" জনার্দ্দনের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া, কলিকাতা-কৌন্সিল মিঃ চিটি ও মিঃ ব্লণ্ট নামক দুইজন সাহেবকে নূতন ফৌজদারের নিকট পাঠাইয়া দেন।

এদিকে "রোটেশন—গভর্ণমেণ্ট" বা পর্য্যায়ক্রমিক শাসন-প্রথার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। ১৮ই জুলাই তারিখে, মিঃ এণ্টনি ওয়েলডেনের নিকট হইতে কলিকাতা-কৌন্সিল এক পত্র পান। এই পত্র বালেশ্বর হইতে লিখিত। ওয়েলডেন্ লিখিয়াছেন—"আমি কোম্পানী কর্ত্তৃক বঙ্গীয় বাণিজ্যা-গারের প্রধানরূপে নিযুক্ত হইয়া বালেশ্বরে পৌছিয়াছি।" এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা পূর্ব্বোক্ত ব্লণ্ট সাহেবকে, নবনিযুক্ত গবর্ণরকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য বালেশ্বরে পাঠাইয়া দেন। ২০শে জুলাই সন্ধ্যাকালে ওয়েলডেন কলিকাতায় পৌছান। তিনি দুর্গ সমীপে উপস্থিত হইলে, কৌন্সিলের সভা জন রসেল ও আডামস্ নামক দুইজন গননীয় ব্যক্তি, তাঁহাকে জাহাজ

* কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন—"ইহার পূর্ণ নাম জেয়াউদ্দিন খাঁ। উচ্চারণে ইহা "জেয়াদীনে' দাঁড়ায়। ইংরাজ দপ্তরের কাগজে ইনি জুডী খাঁ (Zoody Khan) নামেই পরিচিত। ইনি সম্ভ্রান্তবংশীয় ও নানাস্থানে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। বাদসাহ দরবারে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল।

† (Wheeler's Old Madras.—289.)

হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া দুর্গে আনয়ন করেন। এই সময়ে সেই নবগঠিত কলিকাতা সহরের পথে অতিশয় জনতা হইয়াছিল। দেশীয় ও ইংরাজ অধিবাসীদের ভিড় এত বেশী হইয়াছিল, যে গবর্ণরকে অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া, কলিকাতা দুর্গমধ্যে আসিতে হয়।*

সেপ্টেম্বর মাসে হুগলীর নবনিযুক্ত ও ইংরাজ-বন্ধু ফৌজদার, জেয়াউদ্দিন খাঁ কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্যও যথেষ্ট আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রচুর উপহার ও রাজোচিত সম্মানলাভে, তিনি ইংরাজদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হন। অক্টোবর মাসের শেষে, জেয়াউদ্দিন হুগলী হইতে কলিকাতার ইংরাজ প্রেসিডেণ্টকে জানান—"সম্রাট-পৌত্র ফরকশিয়ার আপনাদের কৌন্সিলের প্রধানকে সম্মান-সূচক পরিচ্ছদ এবং একটী সুন্দর তুরঙ্গম ও একখানি সৌহার্দ্দ্য-সূচক পত্র পাঠাইয়াছেন।" ১৭১০ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে, প্রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার কৌন্সিলের সদস্যগণকে লইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইলে জেয়াউদ্দিন তাঁহাকে উল্লিখিত উপহার দ্রব্যগুলি প্রদান করেন। সম্রাটের প্রিয়তম পৌত্রের নিকট হইতে, এরূপ সম্মান-সূচক উপহার পাইয়া, কলিকাতা-কৌন্সিল বড়ই প্রহৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে আমরা নবাব মুরশীদকুলী খাঁর সহিত, ইংরাজ কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালীর আলোচনা করিব। ১৭১০ খৃঃ অব্দে নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, সুবাদার বাঙ্গালার নায়েব-নাজিম ও দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে উপস্থিত হন। এই সময়ে ইংরাজের কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন, উইলিয়ম হেজেস সাহেব। পাঠক যেন পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর হেজেসের সহিত ইহাকে এক বলিয়া না ভাবেন। নবাব মুরশীদকুলী খাঁ মুরশীদাবাদে উপস্থিত হইলে, কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ হেজেস সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য গমন করেন। নবাব মিষ্ট কথায় ও সদ্ব্যবহারে ভুলিবার লোক ছিলেন না। ইংরাজপক্ষের নিকট হইতে তিনি পুনরায় টাকা চাহিয়া বসিলেন। এই সময়ে খাঁ জাহান বাহাদুর, উড়িষ্যা ও

* নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা যায়, যে সেই সময়ের প্রাচীন কলিকাতা কতদূর জনপূর্ণ হইয়াছিল। He (Weltden) was met at his landing, by most of the Europeans in the town and the natives in such crowds, that it was difficult to pass to the Fort, where he was conducted by the Worshipful John Russell and Abraham Adams Esqr. and the Council.—Summaries of Cousultations. 383.

বেহারের নায়েব, সুবাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইংরাজদের আটকী সোরার নৌকা ছাড়িয়া দিয়া, তাহাদের অবাধ বাণিজ্যের জন্য আদেশ প্রদান করিলেও, মুরশীদকুলী খাঁ তাহা আমলেই আনিলেন না। ইংরাজদের মালপত্র বাঙ্গলায় অন্যান্যস্থানেও আটক হইতে লাগিল। আজিমওশ্বান প্রথমে ইংরাজদিগকে সনন্দ দানে প্রতিশ্রুত থাকিলেও, শেষ তিনি ইংরাজদিগকে সনন্দের পরিবর্ত্তে "নিশান" দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নবাব ইংরাজের প্রধান শত্রু। ইংরাজপক্ষ বহুচিন্তায় ও নানাবিধ পরামর্শের পর বুঝিলেন, তাঁহাদের ভাগ্য-রন্ধ্রস্থিত শনি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে, তাঁহাদের আর নিস্তার নাই। শেষ মীমাংসা হইল, যে ত্রিশ হাজার টাকা পাইলে, নবাব নিজে ছাড় লিখিয়া দিবেন ও সনন্দ আনাইয়া দিলে তাঁহাকে আরও সাড়ে বাইশ হাজার টাকা উপহার দিতে হইবে। কেবলমাত্র নবাবের করুণার উপর নির্ভর না করিয়া, ইংরাজপক্ষ স্বাধীনভাবে দিল্লীতে বাদসাহ-দরবারে দূত পাঠাইবার কল্পনা করিতেছিলেন। তাহার যোগাড় যন্ত্রও চলিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, সম্রাট বাহাদুর-সাহ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে আবার চারিদিকে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।*

প্রায় পঞ্চবর্ষ কাল রাজত্ব করিয়া, সম্রাট বাহাদুর সাহ ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মোগল রাজসংসারের চিরন্তন প্রথানুসারে, সিংহাসন লইয়া পুনরায় বাদসাহ-পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। আজিমওশ্বান মৃত বাদসাহের কিছু বেশী প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাহাদুর সাহ আজিম-ওশ্বানকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন ও তাহার পরামর্শানুসারেই অনেক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। লাহোরে বাদসাহের মৃত্যু হয়। সুলতান আজিমওশ্বান রাজকোষ ও গোলন্দাজ সৈন্য আয়ত্বাধীন করিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠ সাহজাদা ময়জুদ্দিন, অভিমান বশে পিতার মৃত্যু সময়ে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে আসেন নাই। প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহগণ— আজিমওশ্বানের পক্ষ-ভুক্ত ছিলেন। সৈন্যবলও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। আজিমওশ্বান যদি এই সময়ে ধীরভাবে কাজ করিতেন, তাহা হইলে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাকেই জয়মাল্য প্রদান করিতেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে, বাদসাহের প্রধান উজীর আসাদ-উদ্দৌলার পুত্র,—

* Snmmary of Consultation, 383.

বাদসাহী সৈন্যের একজন প্রধান সেনাপতি জুলফিকার খাঁ, তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তিনি সুবিধামত বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, আজিমওশ্বান নিহত হন এবং এইরূপে সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া মৈজুদ্দিন, জাহান্দার সাহ নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।*

জাহান্দার সাহ সম্রাট হইয়া, চলিত প্রথানুসারে, দিল্লী-দরবার হইতে নবাব মুরশীদকুলী খাঁকে দেওয়ানী সনন্দাদি পাঠাইয়া দেন। কুলী খাঁও এই নূতন সম্রাটের উপযুক্ত সওগাদাদি পাঠাইয়া, তাঁহার প্রতি আনুরক্তি জ্ঞাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে নবাব মুরশীদকুলী খাঁই এই সময়ে বাঙ্গলার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। এদিকে আজিমওশ্বানের পুত্র সুলতান ফরক্শেরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পাটনায় সম্রাট বলিয়া আত্ম-ঘোষণা প্রচার করিয়া, মুরশীদকুলী খাঁকে তাঁহার সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন, এবং বঙ্গদেশের রাজস্ব চাহিয়া পাঠান। মুরশীদকুলী খাঁ বলিয়া পাঠান, "আমি দিল্লীশ্বরের আজ্ঞাধীন। তৈমুর-বংশীয় যে কেহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মস্তকে মুকুট ধারণ করিবেন—দিল্লীর সিংহাসনে বসিবেন—আমি তাঁহারই আদেশ প্রতিপালন করিব। তদ্ব্যতীত আর কাহারও আজ্ঞাধীন হওয়া কৃতঘ্নতার লক্ষণ। সুতরাং বাঙ্গলার রাজস্ব আমি আপনাকে প্রদান করিতে পারি না।"† ফরক্-

* মোগলের সিংহাসন চিরদিনই অভিশপ্ত। শোণিতধারা দ্বারা ধৌত না হইলে, নূতন সম্রাট ইহাতে আরোহণ করিতে পারেন না। সাহজাহান নিষ্ঠুরভাবে খসরুকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর পাপে তাঁহাকে জীবনের শেষ ভাগে সামান্য কয়েদীর মত থাকিতে হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ, দারাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করেন। দারার রুধিরাক্ত ছিন্নমুণ্ড স্বহস্তে ধৌত করিয়া তবে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে ইহা দারার মস্তকই বটে। গোয়ালিয়র দুর্গে হতভাগা মুরাদের জীবনলীলার অবসান হয়। সুজার মৃত্যুর উপলক্ষ্যও তিনি। সাহ-আলম তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা না করিলেও, তাহাদের শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। জাহান্দার সাহ এ প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করিবেন কেন? তিনিও সাহজাদা আজিমউশ্বানকে নিহত করেন। প্রধান মন্ত্রী আসাদ খাঁ ও আমীর উল উমরা জুলফিকার খাঁর সাহায্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে ইহসংসার হইতে অপসৃত করেন। বাহাদুর সাহের পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা ৩০ জনের অধিক ছিল। জাহান্দার সাহ ইহাদের সকলকেই হত্যা করেন। অন্য যাহারা জীবিত রহিল, তাহাদেরও তিনি কারারুদ্ধ করেন। কেবল ফরকশিয়ার বঙ্গদেশে ছিলেন বলিয়া বাঁচিয়া যান। কিন্তু জাহান্দার সাহ—ফরকশিয়ারকে বন্দী করিয়া পাঠাইবার জন্য বাঙ্গালার নবাবকে আদেশ করেন। ফরকশিয়ার ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াই, আত্মরক্ষার জন্য বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া, জাহান্দার সাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

† One of his (Jahander Shah's) first cares was to despatch an order

শিয়ার বাঙ্গলার রাজস্ব ও সৈন্য সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, মনে মনে বলিলেন—"খোদাই আমার সহায়।" নিতান্ত বাধ্য কয়েকজন আত্মীয় অন্তরঙ্গদের সহায়তাকে, তিনি তাঁহার প্রধান অবলম্বন ভাবিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ঢাকা হইতে রাজসৈন্য ও কামান আনয়ন করিয়া সাজিহানাবাদ বা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাটনায় উপস্থিত হইয়া তিনি বহুসংখ্যক সেনা সংগ্রহ করেন। বিহারের ও বারাণসীর জমীদারদের নিকটও অনেক টাকা আদায় হইল। ইংরাজ ও ওলন্দাজ-বণিকদের নিকটও তিনি প্রচুর মুদ্রার দাবি করেন। পাটনার শাসনকর্ত্তা, নবাব সৈয়দ হোসেন আলিকে তিনি বাঙ্গলার দেওয়ানের সমস্ত সম্পত্তি এবং তদভাবে তাঁহার মস্তক আনিতে আদেশ করেন।

তিনি বিহারের বণিকদিগের নিকট হইতে, করস্বরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিহার প্রদেশ স্বীয় অধীনে আনয়ন করেন। অনন্তর ফরক্শিয়ার রাজকীয় আসবাব প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া, তথায় সিংহাসনে উপবেশন ও মস্তকে রাজ-ছত্র ধারণ করিলেন। তৎপরে সুলতান পাটনা পরিত্যাগ করিয়া মহোল্লাস সহকারে বারাণসীতে উপনীত হইলেন। বারাণসীর প্রধান ধনিগণ ও শেঠ-দিগের নিকট—"রাজ্য প্রাপ্তি হইলে তোমাদের ঋণ শোধ করিব।" এই করারে এক কোটী টাকা ঋণরূপে সংগ্রহ করেন। অর্থের অভাব বিদূরিত হওয়ায়, তিনি সেনা-সংগ্রহে মনোযোগী হন। রাঢ় নিবাসী সৈয়দ বংশোদ্ভব আবদুল্লা খাঁ ও হোসেন আলী, সুবা অযোধ্যা ও সুবা এলাহাবাদের সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সে সময়ে বীরপুরুষ ও মহাযোদ্ধা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। জাহান্দার সাহ ইহাঁদিগকে পদচ্যুত করায়, তাঁহারা নূতন সম্রাটের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। কাজেই সুলতান ফরক্শিয়ার তাঁহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইবামাত্রই—তাঁহারা

to Jafar Khan (Murshwd Kuli) Viceroy of Bengal for Sending the prince Ferock Siyur prisoner to court. The order embarrassed the Khan, who sent him a trusty person who advised him to provide for his safety by flying the country in time or perhaps the Prince himself having got some advice of the orders recieved by the Khan; thought it unsafe for him to remain longer in the country. Seir--Mutakherin. Vol. I. মুরশীদকুলী গোপনে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়ার জন্যই হোক বা অন্য কোন সূত্রে তিনি জাহান্দার সার উদ্দেশ্য জানিতে পারার জন্যই হউক—ফরকশিয়ার সময় থাকিতে আত্মরক্ষার উপায় বিধান করেন।

তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাঁহার সহায়তার জন্য জীবন সমর্পণে প্রতিশ্রুত হইলেন।*

এই সময়ে সুলতান এলাহাবাদে উপস্থিত হন। এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন, যে তথাকার শান্তিরক্ষক সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ, তিন শত অশ্বারোহী সেনার সাহায্যে, তথাকার রাজকীয় উদ্যানে বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত রাজস্ব রক্ষা করিতেছেন। এ সংবাদে ফরক্‌শিয়ার বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি বলপূর্ব্বক সেই রাজস্ব লুণ্ঠন করিয়া, নিজ সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব বিদূরিত হইল। পিতৃমিত্র হোসেন আলীকে তিনি মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন এবং নিজের নামে শিক্কা ও খোত্‌বা প্রচলিত করিলেন।

ফরকশিয়ার, মুরশীদকুলীর ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহার অনুচর মির্জ্জা আফ্‌সিরি বা আফ্‌রাসিয়ার খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রসিদ খাঁকে, বাঙ্গলার নাজিমের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান।†

* কিন্তু "সয়ের মুতাক্ষরীনের" মতে এই সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল সেই সময়ে স্ব স্ব পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখনও তাঁহারা কর্ম্মচ্যুত হন নাই। এই ভ্রাতৃদ্বয়, ইতি পূর্ব্বে ফরকশিয়ারের পিতা সুলতান আজিমওশ্বানের নিকট যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করেন ও উপকৃত হন। সেই উপকারের কৃতজ্ঞতা ঋণ—পরিশোধের জন্যই, ফরকশিয়ারের মনোভিলাষ জ্ঞাত হইয়াই, তাঁহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। ইঁহারা দুই জনেই রণকুশল ও সাহসী-বীর। তাঁহাদের দুই জনের অধীনেই যথেষ্ট সেনা ছিল। কাজেই ইঁহাদের সাহায্যলাভ করিয়া ফরকশিয়ার যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেন।

† এই মির্জ্জা আফরাশিয়ার খাঁ বঙ্গদেশ কোন প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন ও রাজসংসারে প্রতিপালিত হন। তিনি পরাক্রমে রস্তম ও ইস্‌ফেন্দিয়ারের সমকক্ষ ছিলেন, এবং মত্ত হস্তীকেও ভূতলশায়ী করিতে পারিতেন। কথিত আছে, যে সুলতান ফরকশিয়ার যখন আকবর নগর হইতে আজিমাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন "মালেক-ময়দান" নামক একটী বৃহৎ কামান, শকরীসলির নিকটবর্ত্তী এক কর্দ্দমাক্ত নিম্ন ভূমিতে বাঁধিয়া গিয়াছিল। এই তোপ পূর্ণ করিতে এক মন গোলা লাগিত এবং ৫০টী গরু ও ২টী হস্তীতে উহা টানিয়া লইয়া যাইত। এই তোপ এক সময়ে কর্দ্দমে বসিয়া যায়। হস্তী ও গরুগুলি প্রাণপণ চেষ্টায় উহা মাটীতে তুলিতে পারিল না। ফরকশিয়ার স্বয়ং তোপের নিকট উপস্থিত হইয়া ফিরিঙ্গি গোলন্দাজদের দ্বারা বহু কৌশল অবলম্বন করাইয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন আফরাসিয়ার মির্জ্জা সসম্মানে ফরকশিয়ারকে বলিলেন—"যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে এ দাসও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।" সুলতান অনুমতি করিলে আফ্‌সিরি মিরজা, পরিধেয় বস্ত্র যথোপযুক্তরূপে বিন্যস্ত করিয়া, কামানের চাকার নিম্নে দুইহস্ত দ্বারা ধরিয়া, উহা স্বীয় বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত উত্তোলিত করেন। তৎপরে তিনি সাহজাদাকে বলিলেন—"এখন যেখানে অনুমতি করিবেন, সেই খানেই তোপ রাখিয়া দিই।" তিনি সুলতানের ইঙ্গিত ক্রমে, পার্শ্বস্থ উচ্চ ভূমিতে তোপ রাখিয়া দিলেন। এজন্য তিনি এতদূর বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ফরকশিয়ার তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। সমবেত সৈন্যগণ, তাঁহার এই অদ্ভুত বীরত্বের জন্য জয়নাদ করিয়া উঠিল। এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তিনহাজারী সেনার অধ্যক্ষ পদে

রসিদ খাঁ—বিপুল বাহিনীসহ, বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া, তিলিয়া গড়ি ও শকৃরীগলির গিরিপথে প্রবেশ করিলেন। নবাব মুরশীদকুলী খাঁ—তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া, সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রসিদ খাঁ, মুরশীদাবাদ হইতে তিন ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। মুরশীদকুলী খাঁ—মীর বাঙ্গালী ও সৈয়দ আনোয়ার খাঁ নামক দুই জন যোদ্ধাকে, তাঁহার সেনাপতি পদে বরণ করেন। এই দুইজন যোদ্ধার সহিত দুইসহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা প্রেরিত হইল।

রিয়াজের লেখকের মতে—"মুরশীদকুলী খাঁ তখনও অবিচলিত। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার যেন কোন ভাবনাই নাই। তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে কোরাণের এক একটী অংশ লিখিয়া রাখিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিয়া, তিনি কোরাণ লিখিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই যুদ্ধে আন্ওয়ার খাঁ শত্রুহস্তে নিহত হন। মীরবাঙ্গালী, অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রসিদ খাঁর সৈন্য, তাঁহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিল। নবাবের নিকট যখন এ সংবাদ পৌছিল, তখনও তিনি অবিচলিত।" একমনে কোরাণ লিখিতে নিবিষ্ট। মীরবাঙ্গালী যুদ্ধে অক্ষম হইয়া, পশ্চাৎপদ হইলেন। নবাব এই সংবাদ অবগত হইয়া, মুরশীদাবাদের ফৌজদারী সেনা নায়ক এবং নিজের বিশ্বস্ত অনুচর, মোহম্মদ খাঁকে, মীরবাঙ্গালীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর, তিনি নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। মীর বাঙ্গালী প্রভুকে আসিতে দেখিয়া, পুনরায় সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করেন এবং রাজধানীর বহির্ভাগে খরিসাবাদের ময়দানে, রসিদ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মুসলমান লেখকগণ বলেন—"নবাব হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়া যুদ্ধকালে "সয়ফি" মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই মন্ত্র বলেই, তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন।" রসিদ খাঁ, মীরবাঙ্গালীর হস্তনিক্ষিপ্ত তীরে ধরাশায়ী হন, পরিশেষে মহাযুদ্ধের পর, নবাব মুরশীদকুলী খাঁ জয়লাভ করেন। নবাবের সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে, নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। এরূপ প্রবাদ আছে—যে লোকের মনে ভয়সঞ্চার করিবার জন্য, নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, নিহত সৈন্যের মস্তক দ্বারা প্রকাশ্য রাজপথে একটী বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করেন। এই স্তম্ভের প্রত্যেক কোণে, রসিদ খাঁ ও তাহার অনুচরবর্গের ছিন্নমস্তক রক্ষিত হইয়াছিল।"

নিযুক্ত হইয়া, আফ্রুসিয়ার খাঁ উপাধিতে বিভূষিত হইলেন। (রিয়াজ উস্—সালাতিন—অনুবাদ ২৫৫)

নবাবের জয়লাভ ও রসিদ খাঁর মৃত্যু সংবাদে, সাহাজাদা ফরকশিয়ার অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন। এই সময়ে সংবাদ আসে, যে খাঁজাহান শকরীগলির প্রবেশপথ অবরোধ করিয়া, দখলে আনিয়াছেন। কিন্তু এই সময়ে সম্রাট-পুত্র এয়াজুদ্দিন সসৈন্যে আগরায় উপস্থিত হইয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া, ফরকশিয়ার তাঁহার গতিরোধার্থে—আগরার পথ ধরিলেন। গমনকালে, তিনি ওলন্দাজদের নিকট হইতে দুইলক্ষ ও ইংরাজদের নিকট বাইশ হাজার টাকা জবরদস্তিতে আদায় করিলেন।

কাজোয়া নামক স্থানে বাদসাহী সৈন্যের সহিত, ফরকশিয়ারের একটী যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এয়াজউদ্দিন সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন। ফরকশিয়ার দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাহান্দার সার এতক্ষণে চেতনা সঞ্চার হইল। বিপদ হইতে প্রতিকারের আর অন্য উপায় নাই দেখিয়া, এক দিবস ব্যাপী একটা বিশৃঙ্খল যুদ্ধাভিনয়ের,পর এই অপদার্থ সম্রাট, লালকুয়র নামক এক বারবণিতাকে সঙ্গে লইয়া, শ্মশ্রু মুড়াইয়া হিন্দু সাজিয়া, নিশাযোগে দিল্লী হইতে পলায়ন করিলেন। পরে দিল্লীর সহর কোতোয়াল আসাদউল্লার বাটীতে ধরা পড়িয়া, নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন এবং ফরকশিয়ার আরও দুই একটী সামান্য যুদ্ধের পর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।*

দিল্লীর তক্ত অধিকার করিয়া ফরকশিয়ার বাদসাহ হইলেন। বর্দ্ধমান

---

* The pusillanimous Emperor (Jahander Shah) at length taken the field contending armies met in the vicinity of Agra and after a confused battle, which lasted nearly the whole day the Imperial army was completely routed, and the Emperor accompanied by his Mistress Lall Coar fled upon his elephant to Agra. Where having changed his dress and shaved his head and beard in the manner of Hindus, he, in the middle of the night, continued his flight to Delhi and upon his arrival in that city instead of going to the fort he stept, at the house of the Vizer Asaduddowlah. ফরকশিয়ার দিল্লী প্রবেশ করিয়াই আসাদউল্লার গৃহে, সম্রাটের অবস্থান ব্যাপার জানিতে পারেন। তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে আসাদুল্লা ও তাঁহার পুত্র জুলফিকার খাঁ, ফরকশিয়ারের নিকট উপস্থিত হন। নূতন সম্রাট তাঁহাদের উভয়কেই পদোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। আসাদউল্লাকে বিনা শাস্তিতে মুক্তি দেওয়া হয়। জুলফিকার খাঁই জাহান্দারসার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে এক নির্জ্জন তাঁবুতে লইয়া গিয়া, কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়। তদুত্তরে তাঁহার দোষ প্রমাণিত হওয়ায়, সম্রাট তাঁহাকে ফাঁসি দিয়া হত্যা করেন। ইতি পূর্ব্বে জাহান্দার সাকে কারাগার মধ্যে হত্যা করা হইয়াছিল। পরে এই দুই মৃত দেহ হস্তীতে তুলিয়া, ফরকশিয়ার সদল বলে দিল্লী প্রবেশ করেন।

Stewart's Bengal p. 391, Scott's History of Deccan Vol. I. I.

বাসী, সাহ স্থফী ফকিরের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল। বাঙ্গলাদেশ, মোগল সাম্রাজ্যের মুকট মণি। ফরকশিয়ারের এই সাফল্যের প্রধান ভরসা, এই বাঙ্গালার রাজস্ব। বহুদিন বঙ্গদেশে বাস করিয়া, রত্নপ্রসূ বাঙ্গালার কুবের ভাণ্ডারের দৃশ্য যে তাঁহার চক্ষে পতিত হয় নাই, এমন নহে। এক সময়ে স্বার্থরক্ষার জন্য, মুরশীদকুলী খাঁর সহিত তাঁহাকে বিবাদ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মুরশীদকুলী খাঁ, কিরূপ সুচতুর ও কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী, বাঙ্গালায় রাজস্ব-বিভাগের তিনি কি অসম্ভব উন্নতিসাধন করিয়া ছিলেন, তাহাও তিনি বহুদিন ধরিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই সিংহাসনে অধিরোহণের পর, তিনি মুরশীদকুলী খাঁকেই বাঙ্গালার দেওয়ান পদে বাহাল করিলেন। মুরশীদকুলী খাঁও বাদসাহী সনন্দ পাইয়া প্রথামত (পেস্কস) উপহার প্রেরণ করিলেন। বাদসাহও সরকার হইতে তাঁহাকে পদোপযুক্ত শিরোপা ও পরোয়ানা পাঠাইয়া দিলেন।

বাদসাহী-ফার্ম্মান ও নিশানের বলে, ইংরাজেরা এপর্য্যন্ত তিন সহস্র টাকা বাণিজ্য শুল্করূপে সরকারে দিয়া আসিতেছিলেন। ইহাতে অন্যান্য ইউরোপীয়-বণিকদের যথেষ্ট ক্ষতি হইত। দেশীয় বণিকেরাও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। মুরশীদকুলী খাঁ, ইংরাজদের উপর ততটা সদয় ছিলেন না। কাজেই তিনি বাণিজ্য-সম্বন্ধে সাম্যনীতি অবলম্বন সঙ্কল্প করিলেন। অন্যান্য বণিকগণের নিকট যেরূপ বর্দ্ধিত হারে বাণিজ্যকর আদায় করা স্থির হইল, নবাব ইংরাজ-বণিকদেরও তদনুযায়ী শুল্ক দিতে বাধ্য করিলেন। পুরাতন বাদসাহী নিশান ও ছাড়-সমূহের স্বত্বমত, ইংরাজগণ এপর্য্যন্ত সরকারী প্রাপ্য একটী নির্দ্দিষ্ট হারে দিয়া আসিতেছিলেন। তাহা রদ করিয়া দিয়া তিনি অন্যান্য ইউরোপীয়-বণিকদের মত ইংরাজপক্ষের উপর অতিরিক্ত দাবী করিলেন।

ইংরাজ-বণিকগণ দেখিলেন, দুইটী উপায়ের সহায়তায়, তাঁহারা এই উপস্থিত বিপদের প্রতিকার করিতে পারেন। -মুরশীদকুলী যে ভাবে দাবী দাওয়া করিতেছেন, তাহা দিতে পারিলে ত কোন কথাই নাই। কিন্তু সেইভাবে শুল্ক দিয়া, এ বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে গেলে, তাঁহারা অন্যান্য বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। দ্বিতীয় উপায়—নূতন, বাদসাহ ফরকশিয়ারের দরবারে দিল্লীতে দূত প্রেরণ। পরিশেষে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ পরামর্শ করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন "দিল্লীতে সম্রাট্ দরবারে দূত প্রেরণ করাই উচিত।"

হেজেস্ সাহেব, তখন কলিকাতার বাণিজ্যাগারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহার উপর দূত নির্ব্বাচনের ভার পড়িল। জন সর্ম্মান ও এড্ওয়ার্ড নিকল্সন নামক দুইজন প্রবীণ ফ্যাক্টার, দূতরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। কলিকাতা দুর্গের ডাক্তার হামিলটান, এই দৌত্যাভিযানের চিকিৎসকরূপে নির্ব্বাচিত হয়েন।*

এই সময়ে, খোজা সরহাদ বলিয়া একজন ধনী আর্ম্মাণী-সওদাগর কলিকাতার মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। তিনিও এই দৌত্যাভিযানের সঙ্গে দ্বিভাষীরূপে চলিলেন। খোজাসাহেবের বিশেষ স্বার্থ এই, তিনি বিনা ব্যয়ে, বিনা শুল্কে, কোম্পানীর এই অভিযানের সহিত কতক মালপত্র দিল্লীতে ব্যবসার জন্য লইয়া গিয়া, উচ্চমূল্যে বেচিতে পারিবেন।

সম্রাটের ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের জন্য সার্দ্ধ তিনলক্ষ টাকার উপঢৌকন নির্ব্বাচিত হইল। এই উপঢৌকন দ্রব্যের মধ্যে কাচের বাসন, বহুমূল্য ঘড়ি, কিঙ্খাপ, উৎকৃষ্ট রেশমী ও পশমী বস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য ছিল। খোজা সরহদ, ইতিমধ্যে দিল্লীতে একখানি পত্র পাঠাইয়া বাজার সরগরম করিয়া তুলিলেন। সে পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সম্রাটের জন্য ইংরাজ-বণিকগণ দশলক্ষ টাকার উপহার দ্রব্য লইয়া যাইতেছেন।" কথাটা সম্রাটের কাণে পৌছিল। তিনি ইংরাজদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। ইংরাজেরা যে সকল স্থান অতিক্রম করিবেন, তথাকার প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদের উপর সম্রাট আদেশ প্রদান করিলেন—"তোমরা যথাসাধ্য এই ইংরাজ-দলকে দিল্লী পৌছিবার সহায়তা ও সুব্যবস্থা করিবে। পথিমধ্যে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিবে।" ইংরাজগণ নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে পাটনা পর্য্যন্ত অতিক্রম করিলেন। পাটনা হইতে হাঁটা পথ ধরিলেন। তিনমাস এইভাবে যাত্রা করিয়া, তাঁহারা ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে, দিল্লী পৌছিলেন।† দিল্লীতে পৌছিবামাত্র নূতন সম্রাট তাঁহাদের মহা সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

এই অভিযান সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের দৌত্যাভিযানের একটী বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে দিল্লীতে যাহা কিছু ঘটিয়া

---

* "সর্ম্মানের বাগান" (Surman's Garden) সেকালের কলিকাতায় একটী গণনীয় শোভনোদ্যান ছিল। আজকাল খিদিরপুরের কুলীবাজারের যে স্থানে মিলিটারী ব্যারাকসমূহ স্থাপিত জনপ্রবাদ এই তাহার সান্নিধ্যেই সর্ম্মানের বাগানবাটী ছিল।

† Stewart's Bengal. p. 396. (Edition 1813)

ছিল, সবিস্তারে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ডেস্‌প্যাচের মত কলিকাতায় পাঠান হইত। আমরা সেই প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমরা প্রথমবারে প্রয়োজনীয় উপহারগুলি লইয়া, সম্রাট সাক্ষাতে গেলাম। এই উপহারের মধ্যে ১০০১ মোহর, টেবিলে রাখিবার উপযুক্ত মণিমুক্তা খচিত একটী বহুমূল্য ঘড়ী, সমগ্র ভূখণ্ডের একখানি মানচিত্র ও আরও অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি ছিল। এরূপ ধরণের জিনিসপত্র আমরা লইলাম, যাহা দেখিলেই বাদসাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা এই সমস্ত নির্ব্বাচিত উপহার দ্রব্যের এক একটী হাতে করিয়া, সম্রাট দরবারে উপস্থিত হইলাম। উপহারদ্রব্য দৃষ্টে মহা সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট সর্ম্মান সাহেবকে "একপ্রস্থ বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও মণি-খচিত একটী কলগা উপহার দিলেন।" খোজা সরহাদের অদৃষ্টেও এইরূপ উপহার লাভ ঘটিল। সম্রাট আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। দরবারান্তে আমরা ডেরায় ফিরিয়া আসিলাম। সে দিন উজীর সলাবৎ খাঁর বাটীতেই—আমাদের সকলের ভোজের নিমন্ত্রণ হইল।"

সম্রাট—ইংরাজ অভিযানভুক্ত প্রতিনিধিগণকে সমাদরে গ্রহণ করিলেও, কাজের কথা কিছুই হইল না। এই সময়ে যোধপুরের রাজা অজিতসিংহের রূপসী কন্যার সহিত, বাদসাহের বিবাহের আয়োজন হইতেছিল। বিবাহের অছিলায়, বাদসাহ ক্রমাগত কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। ইংরাজপক্ষও নিত্য নূতন উপহারদানে বাদসাহের চিত্তরঞ্জন করিতেন। ইংরাজদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দুইদল আমীর ওমরাহ দাঁড়াইলেন। বিপক্ষদের মুখবন্ধ করিবার জন্য ও স্বপক্ষদের বশে আনিবার জন্য, ইংরাজদলকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইল। ইংরাজেরা পরিশেষে আশা সিদ্ধির উপায় সুদূরপরাহত দেখিয়া, নিরাশাপূর্ণচিত্তে কলিকাতায় ফিরিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময়ে বাদসাহ পীড়িত হইলেন। এই পীড়াই ইংরাজদের আশা চরিতার্থের প্রধান উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।

সার্জ্জন হামিলটনের নিকট ইংরাজগণ আজীবন ঋণী। জব চার্ণক যদি কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী বলিয়া গৌরবলাভের যোগ্য হন, তাহা হই এই মহাপ্রাণ ডাক্তার হামিলটনও, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ডাক্তার বৌটনের ন্যায়, আত্মস্বার্থ ত্যাগী স্বদেশভক্ত-মহাপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া, ইংরাজ-জাতির তা লাভের দাবী করিতে পারেন।

হ্যামিলটন, যদি সে যাত্রা এই ইংরাজ অভিযানের সঙ্গে না থাকিতেন, তাহাহইলে এত কষ্ট স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াও ইংরাজ-বণিকদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইত কি না, তৎপক্ষে বিশেষ সন্দেহ আছে।

বাদসাহের খাস হাকিমগণ বহু চেষ্টা করিয়া, তাঁহার রোগ আরাম করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিবাহ-ব্যাপার সম্বন্ধে একটী মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। পাত্রীপক্ষ দিল্লীতে উপস্থিত, বিবাহের সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত, এমন সময়ে এই বিভ্রাট! হ্যামিলটন সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"সকলেই ত আপনার চিকিৎসা করিলেন,—এখন একবার আমায় চেষ্টা করিতে দিন।" সম্রাট ইহাতে কোনরূপ আপত্তি না করায়, হ্যামিলটন তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চিকিৎসায়, সম্রাট শীঘ্রই রোগ মুক্ত হইয়া আরোগ্যস্নান করিলেন। সহরময় এই সুদক্ষ ইংরাজ-চিকিৎসকের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের কথা, শতমুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

রোগান্তে, সম্রাট ফরকশিয়ার প্রকাশ্য দরবারে, ইংরাজ চিকিৎসক হ্যামিলটনকে সম্মানিত করিলেন। তিনি তাঁহাকে এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা-খচিত একটী কল্‌গা, দুইটী বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়, একটী হস্তী, একটী অশ্ব ও নগদ পাঁচহাজার টাকা উপহার দিলেন। যে অস্ত্র সহায়ে তিনি সম্রাটের স্ফোটকের উপর অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন,—সম্রাট সেই অস্ত্র গুলি সোণা দিয়া বাঁধাইয়া দিতে আদেশ দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার কামিজে পরিবার জন্য একসেট্ স্বর্ণনির্ম্মিত, মণিখচিত বোতাম পর্য্যন্ত উপহার দেন। ডাক্তার সাহেবের চুল আঁচড়াইবার ব্যবস্থা করিতেও তিনি ভুলেন নাই। কারণ এই সঙ্গে হ্যামিলটন সোণাদিয়া বাঁধান মণিখচিত একটী বুরুশ পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন।

জুলাই মাসে ইংরাজ-দূতগণ দিল্লীতে উপস্থিত হন। সম্রাট যখন রোগ মুক্ত হইলেন, তখন নবেম্বরের শেষভাগ। বর্ষা, শরত, হেমন্ত কাটিয়া গিয়া "এই ছয় মাস পরে শীতঋতুর আবির্ভাব হইল। এই ছয়মাস কাল ইংরাজেরা কিছুই করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের উপহার-দ্রব্যের মধ্যে যেগুলি অবশিষ্ট ছিল, সেইগুলি এইবার দেওয়া হইল। ডিসেম্বর মাসে মহা সমারোহে সম্রাটের উদ্বাহকার্য্য শেষ হইয়া গেল। তাহার পর আরও কয় মাস কাটিল। ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে, ইংরাজেরা তাঁহাদের প্রার্থিত বাদশাহী-ফারমান প্রাপ্ত হইলেন। কেবল ফারমান নহে, এই

সঙ্গে ইংরাজেরা কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী ৩৮ খানি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনিবার অনুমতিও পাইলেন।

সম্রাট, রোগ মুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত হ্যামিলটনকে একদিনের জন্য ভুলেন নাই। তিনি তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে প্রায়ই দরবারে উপস্থিত হইতে হইত। হ্যামিলটনের উপর বাদসাহ এতদূর সন্তুষ্ট হন,—যে তিনি তাঁহাকে দিল্লীতে রাজ-পরিবারের চিকিৎসকরূপে নিয়োগ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ডাক্তারসাহেব কিন্তু দিল্লীতে থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আবার হ্যামিলটনকে ছাড়িয়া না দিলেও, দৌত্যাভিযানের কর্ত্তারা কলিকাতায় ফিরিতে পারেন না। হ্যামিলটন পরিশেষে অন্যন্যোপায় হইয়া সম্রাটকে বলিলেন,—"আমি বহুদিন দেশত্যাগী। আপনার অনুমতি পাইলে, আমার স্ত্রী পুত্রগণকে একবার দেখিয়া আসি। এখানে যে সমস্ত ঔষধ পাওয়া যায় না, বিলাতে গেলে সে সমস্ত অদ্ভুত ফলপ্রদ ঔষধগুলিও আপনার জন্য আনিতে পারিব। আর দেশ হইতে একবার ঘুরিয়া আসিয়াই আমি সাহান্‌সাহের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিব।"

সম্রাট ইহাতে আর কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিলেন না। হ্যামিলটন দলবল সহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। দিল্লী হইতে ফিরিবার পরই তিনি সাংঘাতিক রোগে পীড়িত হইয়া, এই কলিকাতাতেই ইহলীলা শেষ করেন। যে সমাধি-ক্ষেত্রে চার্ণকের সমাধি হইয়াছিল, সেই সেণ্ট জন গির্জ্জার নির্জ্জন গোরস্থানেই, এই স্বার্থত্যাগী মহাপ্রাণ ইংরাজের দেহ সমাহিত হয়।* আজও এ সমাধিস্থান বর্ত্তমান। পাঠক, ইচ্ছা করিলে দেখিয়া আসিতে পারেন।

* হ্যামিলটনের স্মৃতিও ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতিগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর ষাট বৎসর পরে, গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব কর্ত্তৃক তাঁহার স্মৃতিফলক নূতনভাবে নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে সেণ্টজন গির্জ্জার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। হ্যামিলটন ইংরাজ জাতির জন্য যে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—তাহা প্রকৃতই গৌরবজনক ও অসাধারণ ভাবিয়া হেষ্টিংস সাহেব—সরকারী ব্যয়ে তাঁহার স্মৃতি-ফলকটী স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া দেন। এই স্মৃতি-ফলকটীর একাংশ ইংরাজী ও অপরাংশ পারসীতে লিখিত। ইংরাজী অংশটুকু এই—
"Under this stone lyes interred the body of William Hamilton who departed this life, the 4th December 1717. His memory ought to be dear to his nation for the credit he gained the English, in curing Farrukseer the present King of Indoston, of a malignant distemper, by which he made his own name famous at the court of that great Monarch and with-

হ্যামিলটনের চেষ্টায়, ইংরাজপক্ষ নূতন কতকগুলি স্বত্ব লাভ করিলেন। ইংরাজদের প্রার্থিত বিষয়-সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত স্বত্বগুলিই প্রধান। (১) কলিকাতার প্রেসিডেণ্ট সাহেব, যে সব মালের জন্য "দস্তক" বা ছাড়-পত্র সহী করিয়া দিবেন, তাহা বঙ্গীয় শাসন-কেন্দ্রের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। এই দস্তকের সহায়তায় কোম্পানীর মালামাল সর্ব্বত্রই বিনা বাধায় যাইতে পারিবে। (২) মুরশীদাবাদের সরকারী টাঁকশালে, প্রয়োজন মত, ইংরাজেরা সপ্তাহে তিন দিনের জন্য তাঁহাদের প্রয়োজনীয় মুদ্রাগুলি প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারিবেন। (৩) ইউ-রোপীয়ই হউক, আর এ দেশীয় লোকই হউক না কেন, যে কেহ ইংরাজ-কোম্পানীর নিকট দেনদার হইবে, স্থানীয় কর্ত্তাদের নিকট আবেদন করিবা-মাত্র তাঁহারা তাহাদের কলিকাতা-কৌন্সিলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট পাঠা-ইয়া দিবেন। (৪) ইতিপূর্ব্বে ইংরাজেরা কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুরের গ্রামের জমিদারীস্বত্ব যেরূপ ভাবে লাভ করিয়াছিলেন—সেইরূপে কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী আরও ৩৮ খানি গ্রামের খরিদা স্বত্ব পাইবেন।

সম্রাট, ইংরাজদিগের প্রার্থিত স্বত্বগুলির মর্ম্ম বিচারার্থে, প্রধান উজীরের উপর ভার দিলেন। উজীর ও অন্যান্য প্রধান সভাসদ্‌গণ, সেগুলি নানাদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন। সামান্য প্রার্থনাগুলি পূরণ করিতে, তাঁহা-দের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু যেগুলিতে ইংরাজদের বিশেষ প্রয়োজন, সেগুলি লইয়াই তাঁহারা গণ্ডগোল উপস্থিত করিলেন। কতকগুলি ব্যাপারের

out doubt will perpetuate his memory as well as Great Briton as all other nations in Europe. (Copy of the Inscription in St. John's Churchyard Calcutta). সম্রাট-দরবারে ফিরিয়া না যাওয়ায়, ও হ্যামিলটনের মৃত্যুসংবাদে অবিশ্বাস করিয়া, সম্রাট ফরকশিয়ার তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীকে হ্যামিলটন সত্যসত্যই গতাসু হইয়াছেন কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কর্ম্মচারী-দের নিকট হইতে এই সংবাদের যথার্থতা অবগত হইয়া বড়ই দুঃখিত হন। হুইলার সাহেব অনুমান করেন, হ্যামিলটনের গোরের উপর যে পারসী অংশটুকু আছে, তাহা সম্রাটের প্রেরিত কর্ম্মচারিদেরই রচনা। উক্ত পারসাংশের ইংরাজী অনুবাদ এই—William Hamilton Physician, in the service of the English Company, who had accompanied the English Ambassador to the enlightened presence, and having made his name famous in the four quarters of the earth, by the cure of the Emperor, the Asylum of the World, Mohumud Farruk Siyar the victorious, and with a thousand difficulties having obtained permission from the Court, which is the refuge of the universe to return to his country. By the Divine decree on the 4th December 1717, died in Calcutta and is buried here.

মীমাংসার ভার সাক্ষাৎসম্বন্ধে নবাব মুরশীদকুলী খাঁর উপর অর্পণ করা হইল। ইংরাজগণের তখন মুদ্রা-বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ে যে টাকা তাঁহারা প্রস্তুত করাইতেন, তাহার মূল্য কম। শিক্কা বা প্রচলিত টাকার সহিত তুলনায়, ইহার মূল্য অনেক কম দাঁড়াইত। ইহাতে বাট্টার জন্য লেনদেন ও কারবারাদি কার্য্যে ইংরাজদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছিল। এই মুদ্রা-বিভ্রাট সর্ব্বাগ্রে বিদূরিত করাই, তাঁহারা প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু মুরশীদাবাদের সরকারী টাঁকশাল ভিন্ন, এ মুদ্রা প্রস্তুতের আর কোন উপায়ই নাই। অথচ এই বাদসাহী টাঁকশাল বাঙ্গলার দেওয়ান ও নায়েব-নাজিম মুরশীদকুলী খাঁর অধীনে। ১৭১৬ সালে কাশিমবাজারের অধ্যক্ষ জানাইলেন, নবাবকে পনর হাজার ও দেওয়ান একরাম খাঁ এবং রঘুনন্দন প্রভৃতি কর্ম্মচারিবর্গকে পাঁচ হাজার করিয়া দশ হাজার টাকা দিলে, বাণিজ্য কার্য্য ও মুরশীদাবাদের মুদ্রা প্রস্তুতাদি ব্যাপারেরও সুবিধা হইবে। ইংরাজপক্ষ অগত্যা বাধ্য হইয়া, এই টাকাটা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইংরাজেরা অঙ্গীকার করিয়াও যথা সময়ে প্রতিশ্রুত মুদ্রা না দেওয়ায়, সায়ের বিভাগের ইজারাদার রঘুনন্দন, ইংরাজদের মালের নৌকা আবদ্ধ রাখিলেন ও কাশিমবাজারে লোক পাঠাইয়া ইংরাজদের উৎপীড়িত করেন। এই রঘুনন্দনকে কেহ কেহ নাটোর রাজবংশের স্থাপয়িতা বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। বাদসাহ-দরবারে যাহাতে ইংরাজেরা তাঁহাদের প্রার্থিত বিষয়গুলি না পান, মুরশীদকুলী খাঁ, সেজন্য বাঙ্গালা হইতে অনেক চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ইংরাজপক্ষ বাদসাহের এক খোজাকে ঘুস দিয়া, পরিশেষে কৌশলক্রমে তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসেন।*

* ইংরাজ-বণিকগণ বাদসাহ ফরুকশিয়ারের নিকট যে ৩৮ খানি গ্রাম-ক্রয়ের ফার্ম্মান পান, তাহার প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।—That the rentings of Calcutta, Chuttanutty and Govindpur on the Pergana of Amirabad &c. in Bengal, were formerly granted them and bought by consent from the Zaminders of them and are now in Company's possessions, for which they yearly pay the sum of Rs 1195-6 Ans. The 38 Towns more amounting to Rs 8121-8, adjoining to the aforesaid towns, which they hope the renting of, may be granted and added to those they are already in possession of that, they will pay annually the same amount of them. COMMANDED that the copy under the seal of chief Cauzi be regarded and that old towns formerly bought by them remain in their

ইংরাজেরা বাদসাহী ফার্ম্মান লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু নবাবের প্রতিযোগিতা জন্য তাঁহারা বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে কেবল আমরা ফারমানের একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। যে অংশে ইংরাজেরা কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার স্বত্ব পান, তাহাই দেখান হইয়াছে। কিন্তু ফারমানে ইহা ছাড়া আরও অনেক স্বত্বদানের কথা ছিল। এই ফার্ম্মানের প্রতিলিপি, দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট প্রভৃতি স্থানেও প্রেরিত হয়, কারণ মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের বাণিজ্য-সম্বন্ধেও ইহাতে অনেক কথা ছিল। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ও গুজরাটের নবাব, বাদসাহী হুকুম পাইবামাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করেন। কিন্তু বাঙ্গলায় সেরূপভাবে কাজ আরম্ভ হইল না। নবাব মুরশীদ কুলীখাঁ অসমসাহসিক লোক ছিলেন, তিনি দিল্লী সরকারের দুর্ব্বলতাও বুঝিতেন। ইংরাজদের উপর আবার তাঁহার সুনজর ছিল না। কাজেই এই গ্রামগুলি ক্রয়ের স্বত্ব পাইয়াও, ইংরাজেরা কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারিলেন না। নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, প্রকাশ্যভাবে বাদসাহের হুকুম অমান্য করিতে সাহসী না হইলেও, গোপনে গোপনে জমীদারদের টিপিয়া দিলেন—যেন তাঁহারা ইংরাজদিগকে এ গ্রামগুলি বিক্রয় না করেন।

এই গ্রামগুলি পাইলে ইংরাজদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে, কলিকাতার দক্ষিণে ও উত্তরে ভাগীরথীর উভয় কুলবর্ত্তী স্থানসমূহ, তাঁহাদের দখলে আসিলে, সমুদ্রপথ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটী তাঁহাদের ক্ষমতার অধীনে আসিবে, অনেক মোগল-প্রজা ইংরাজের প্রজা হইবে। এই সব নানা কথা ভাবিয়া, নবাব মুরশীদকুলী, বাদসাহী ফারমানের নানারূপ কূটার্থ করিয়া এই সমস্ত গ্রাম বিক্রয় না করিতে অতি জমিদারদের গোপনে নিষেধ করিয়া দেন।*

---

hand as heretofore, and that they have the renting of the adjacent towns petitioned for, for which they are to buy from the respective owners of them and Duan and Subah give permission.

Extract from Emperor Farruk-Shere's Phermand—East India Records No 593 A. D. 1717. A. H. 1129

* বেহালা বড়িসার সাবর্ণ চৌধুরীগণ বাদসাহ জাহাঙ্গীরের আমল হইতে এই সমস্ত জমীদারি লাভ করিয়াছিলেন। জমী সরকারের, তাঁহারা কেবল জমীদার মাত্র। জনরব এই সুতালুটী কলিকাতা গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রাম বিক্রয়ের জন্য, সাবর্ণ জমীদার বিদ্যাধর রায়, নবাব কর্ত্তৃক নানা অছিলায় কারানিক্ষিপ্ত হন। পরিশেষে বাদসাহ পুত্রের সনন্দ আসিয়া পৌঁছিলে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

সম্রাট ফরক্‌শিয়ার প্রদত্ত ফারমানে উল্লিখিত, কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী সেকালের ৩৮ খানি গ্রামের তালিকা।

(ইংরাজেরা তাঁহাদের পুরাতন সেরেস্তায় এই সমস্ত গ্রামের নাম অতি বিকৃতভাবে বানান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের স্থায়িত্ব নির্দ্দেশে কোন কষ্ট হয় না।

(১) হাবড়ার দিকে।

আধুনিক নাম	ইংরাজদের সেরেস্তায় লিখিত নাম।	পরগণা	রাজস্বের পরিমাণ
১ সালকিয়া	Salica	বোরো ও পাইকান	২৭৭
২ হাবড়া (Howrah)	Harirah	ঐ	৩৮২
৩ কাসুন্দিয়া	Cassundeah	ঐ	১৩০
৪ রামকৃষ্ণপুর	Ramkissnopoor	ঐ	১৭০
৫ ব্যাটরা	Batter	ঐ	৫৮১

(২) কলিকাতার দিকে।

আধুনিক নাম	ইংরাজদের সেরেস্তায় লিখিত নাম।	পরগণা	রাজস্বের পরিমাণ
৬ দক্ষিণ পাইকপাড়া	Dackney Pack-pairah	আমিরাবাদ	১৪৫
৭ বেলগেছিয়া	Belgashia	কলিকাতা ও পাইকান	৩০৫
৮ দক্ষিণদ্বারী*	Dackney Dand	কলিকাতা পাইকান আমিরাবাদ	৪২৫
৯ হোগলকুড়িয়া	Hogulchundey	পাইকান	১৩৭
১০ উল্টাডিঙ্গি	Ultadang	কলিকাতা ও পাইকান	৩১৫
১১ সিমলে	Similiah	মানপুর	৮২
১২ মাকন্দা	Macond	ঐ	১১৮
১৩ কামারপাড়া	Comorparrah	কলিকাতা	৬৩
১৪ কাঁকুড়গাছি	Cancergasoiah	পাইকান ও নদীয়া	২০৮
১৫ বাঘমারি	Bagmarrey	কলিকাতা	৪৯
১৬ আকুলী	Arcooly	মানপুর	২২
১৭ মির্জ্জাপুর	Mirsapur	পাইকান ও কলিকাতা	১৭৩

(২) কলিকাতার দিকে।

আধুনিক নাম	ইংরাজদের সেরেস্তায় লিখিত নাম	পরগণা	রাজস্বের পরিমাণ*
১৮ শিয়ালদহ	Sealda	কলিকাতা	১১৮
১৯ কুলিয়া*	Cooliah	কলিকাতা ও পাইকান	৫৭২
২০ ট্যাংরা	Tangarah	ঐ	২২৮
২১ শুঁড়া	Sundah	ঐ	৬৪৮
২২ বাহির শুঁড়া	Bad Sundah	কলিকাতা	৪০
২৩ শেখপাড়া	Shekpara	ঐ	৪১
২৪ ধলন্দা	Doland	কলিকাতা ও পাইকান	৩০৬
২৫ বির্জ্জি	Bergey	কলিকাতা, পাইকান, নদীয়া, আমিরাবাদ	২৮৩
২৬ তিলজলা	Tiltola	কলিকাতা ও পাইকান	২০৭
২৭ তোপ্‌সিয়া	Topsiah	কলিকাতা ও পাইকান	২৯০
২৮ সাপগাছি*	Sapgassey	কলিকাতা	২১১
২৯ চৌবাঘা*	Chobogah	ঐ	৬৭
৩০ চৌরঙ্গী	Cherangi	কলিকাতা ও পাইকান	৮৮
৩১ কলিঙ্গা	Colimba	ঐ	৩৮৩
৩২ গোবরা	Gobrah	পাইকান	১০০
৩৩ বাহির দক্ষিণদ্বারী*	Badokney dand	ঐ	১২৫
৩৪ শ্রীরামপুর (ইটিলি)	Sicampur	কলিকাতা পাইকান আমিরাবাদ	১২৭
৩৫ জলা কলিঙ্গা	Jola Colimba	কলিকাতা	১১৪
৩৬ গৌদলপাড়া	Gendalpara	কলিকাতা ও পাইকান	১০৩
৩৭ ইটিলি	Hintaley	ঐ	২২৯
৩৮ চিৎপুর	Chittpoor	আমিরাবাদ	২৫২

* মুদ্রাঙ্কনের সৌকার্যার্থে আমরা কেবল মাত্র জমার মোট টাকাগুলি দিয়াছি। ঐ সমস্ত স্থান হইতে সেই অতীত পুরাকালে এইরূপ হারেই রাজস্ব আদায় হইত। ইংরাজেরা সম্রাট ফরকশিয়ারের সনন্দ বলে, গ্রামাধিকারীদের নিকট ওই গ্রামগুলি কিনিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হন। পাঠক এই বহু কষ্টে সংগৃহিত তালিকা হইতেই দেখিতে পাইবেন—এই সমস্ত

"সাহস ও সহিষ্ণুতা" এই দুইটী শব্দ শক্তিমান ইংরাজ জাতির মূলমন্ত্র। অসংখ্য কষ্ট, অত্যাচার ও উৎপাত সহ্য করিয়া, সেকালের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ, তাঁহাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন। দেশীয় মোগল-শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে ভাল মন্দ দুই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইংরাজগণ ধনী ব্যবসায়ী—এবং তাহাদের পীড়ন করিলেই, কিছু টাকা পাওয়া যাইবে, এইজন্য মোগল-রাজকর্ম্মচারীরা, নানা উপায়ে তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ-শোষণের চেষ্টা করিতেন। তাহার অধিকাংশ ঘটনাই পাঠকগণ পূর্ব্ব অধ্যায়সমূহে জানিতে পারিয়াছেন।

কলিকাতার ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গপ্রতিষ্ঠা হওয়ায়, এদেশবাসীর যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। বনজঙ্গল কাটাইয়া—কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, পার্শ্ববর্ত্তী জনপদগুলিরও ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছিল। ইংরাজের কামান বন্দুকের ভয়ে, শোভাসিংহের বিদ্রোহের সময়, অনেক হিন্দু মুসলমান প্রজা, কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আর ইংরাজের এই কামানের ভয়ে বিদ্রোহিরা কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে "বর্গীর-হাঙ্গামার" ভয়ানক অত্যাচারের সময়, অনেক লোক ইংরাজের আশ্রয়ে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে দেশের লোকে বুঝিল, এই ইংরাজ-জাতি শক্তিমান, আর্ত্তের আশ্রয়-দাতা, বিপন্নের উদ্ধার কর্ত্তা। কাজেই দিনামার, ফরাসী ইত্যাদি অন্যান্য সমধর্ম্মী বণিকগণ থাকিতেও তাঁহারা ইংরাজদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। অনেক বাঙ্গালী, ইংরাজের কুঠীর দালালী করিত। অনেক বাঙ্গালী, ইংরাজের উকিল রূপে নবাব দরবারে প্রতিষ্ঠিত হইত।

নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, নানাপ্রকারে ইংরাজদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সাহসু, কর্ম্মবীর ইংরাজ জাতি, তাহা আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই। তাঁহারা মুখ বুজিয়া সবই সহ্য করিতেছিলেন। আনুগত্যময় ব্যবহারে, নবাব মুরশীদকুলীকে নানা উপায়ে সন্তুষ্ট করিবার

গ্রামগুলি লইয়াই বর্ত্তমান মহানগরী কলিকাতার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। * চিহ্নিত স্থানগুলি আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। শ্রীরামপুর, ডিহি শ্রীরামপুর—ইটালির সন্নিকট। কুলিয়া বোধ হয়—আধুনিক কুলীবাজার। তপসের নাম এখনও লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণদ্বারী সম্ভবতঃ দক্ষিণেশ্বর কি ? সাপগাছি, চৌবাঁধা ইত্যাদি নাম হইতে প্রাচীন কলিকাতায় জঙ্গলময় অবস্থায় অভিব্যক্তি। মাকন্দা মানপুর পরগণায়। বোধ হয় ইহা বর্ত্তমান সিমলের কাছাকাছি কোন স্থান। Fort William Consultations. No. 851 1174. also Mr. Roy's Report.

চেষ্টা করিয়া, তাঁহারা কলিকাতার বাণিজ্যের, দুর্গের ও নগরের উন্নতি-সাধন করিতেছিলেন। এই ভাবে তাঁহারা মুরশীদকুলীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুখে দুঃখে অতিবাহিত করেন। মুরশীদকুলীর পরবর্ত্তী নবাবদ্বয়ের আমলে ইংরাজদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। এইরূপে নানাবিধ সুখ দুঃখ কষ্টের ও মধ্য দিয়া, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের বাণিজ্য-জীবন অতিবাহিত করেন। এজন্য ইহার পর আমরা নবাব আলিবর্দ্দি ও সিরাজের আমলের কথাই বলিব।

নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, অতিশয় জবরদস্ত নবাব ছিলেন। বর্ত্তমান মুরশীদাবাদ নগরী আজও তাঁহার কীর্ত্তি-ঘোষণা করিতেছে। ধরিতে গেলে, তিনিই মুরশীদাবাদ নবাব-বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। মুরশীদকুলীর মৃত্যুর পর, নানাবিধ বিপ্লবের মধ্য দিয়া, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্ত হইতে রাজশক্তি ও শাসনশক্তি আলিবর্দ্দী-খাঁর হাতে আসিয়া পড়ে। সে সব বাঙ্গলার ইতিহাসের কথা। আমরা কলিকাতার ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি, সুতরাং বাঙ্গলার অতীত ইতিহাসের কথা আলোচনা করিয়া পুস্তকের অযথা কলেবর-বৃদ্ধি করিতে চাহি না। বর্ত্তমানে নবাব মুরশীদকুলী খাঁর সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া, আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

"রিয়াজে" উল্লিখিত আছে—"নবাব জাফর খাঁর (মুরশীদকুলী) শাসন-কালে, বঙ্গদেশে চোর ডাকাতের ভয় একেবারে নিবারিত হইয়াছিল। কি সহর কি মফঃস্বল, সর্ব্বস্থানের অধিবাসীরা নিরাপদভাবে এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। বর্দ্ধমান রাজপথের পার্শ্বে, কাটোয়া মুরশীদগঞ্জে পথিকগণকে নিরাপদ করিবার জন্য, তিনি প্রধান একটী থানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় খাস-ভৃত্য, মোহম্মদ-জানকে এই সদর থানার তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত করেন। নদীয়া ও হুগলীর পথ-পার্শ্বস্থ ফেনাচোর নামক স্থানের কলা-বাগানে দিবাভাগেই ডাকাতি হইত। এজন্য মোহম্মদ-জান ইহার নিকটেই এক থানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কাটোয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দস্যু ও চোরদিগকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পথি-পার্শ্বে গাছের ডালে লট্‌কাইয়া রাখিতেন। এরূপ ভীষণ দণ্ড বিধান দেখিয়া, চোর ও ডাকাতেরদল ভয় পাইয়া অপকার্য্য হইতে বিরত থাকিত। মোহম্মদ-জানের নাম শুনিলে দস্যু-তস্করেরা ভয়ে কাঁপিত। সর্ব্বদাই

তাঁহার পাল্কীর অগ্রভাগে, ঘাতকগণ "কুড়ালী" হস্তে গমন করিত। এইজন্য লোকে তাঁহাকে "কুলড়া" বা কুড়ুলিয়া এই আখ্যা প্রদান করে।

নবাব, স্বধর্ম্ম প্রচারে ও মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠিত আচার ব্যবহারাদি সম্পাদনে, গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। নবাব সায়েস্তা-খাঁর পর, এরূপ স্বধর্ম্মানুরাগী নবাব আর বাঙ্গলাদেশে কেহ আসে নাই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মানরক্ষা, সুবিচার ও প্রজার প্রতি অত্যাচার নিবারণে, তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন বা অঙ্গীকার করিতেন, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইত না। তাঁহার ন্যায়পরতা এতই প্রখর ছিল, যে দাক্ষিণ্যাতে সুবাদারী করিবার সময়, তিনি বিচারাসনে বসিয়া, তাঁহার এক-মাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অন্য এক বিবাহিতা ব্যক্তির পত্নীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছিল। কিন্তু নবাব মুরশীদকুলী, পুত্র বলিয়া তাহাকে মার্জ্জনা করেন নাই। বিচার-ব্যাপারে বিচার করিয়া এবং আদেশ দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। তাঁহার আজ্ঞা যথাযথ প্রতিপালিত হইত কি না, তাহাও তিনি দেখিতেন। জমিদারেরা যাহাতে প্রজাবর্গের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তখন নবাব-দরবারে, সকল জমিদারেরই এক একজন প্রতিনিধি বা উকীল থাকিতেন। পাছে তাহাদের প্রভুদের নামে কোন প্রজা, নবাবের নিকট কোনরূপ অভিযোগ আনয়ন করে, এই ভয়ে উকীলেরা নবাবের "চেহেলসতুন" দরবারের বহির্দ্দেশে বেড়াইতেন, নবাবের নিকট কোন অভিযোগকারী আসিয়াছে কি না, খুঁজিয়া দেখিতেন। যদি কেহ থাকিত, তাহা হইলে নানা উপায়ে তাহাকে হস্তগত করিয়া অভিযোগ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করাইতেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন, নবাবের নিকট অপরাধ প্রমাণ হইলে, তাঁহাদের প্রভু জমিদারদের ভয়ানক শাস্তি হইবে।

নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি প্রত্যহ পাঁচবার নমাজ পড়িতেন, তিনমাস কাল রোজা রাখিতেন এবং প্রতিদিন সম্পূর্ণ কোরাণ পাঠ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি "আয়মবাজ" অর্থাৎ অমাবস্যা পূর্ণিমার উপবাস করিতেন, জুম্মা-রোজা রাখিতেন। বৃহস্পতিবার সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উপাসনা করিতেন।

দিবা একপ্রহর অতীত হইলে, তিনি কোরাণ নকল করিতে আরম্ভ করিতেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এই নকলের কার্য্য চলিত। তাঁহার প্রেরিত বিচিত্র উপহার সমূহ, সুদূর তুরুষ্কে, সুলতানের নিকটেও পৌঁছিত।

ভারতের ও বিদেশের যে যে স্থানে মুসলমান তীর্থ আছে, সে সকল স্থানেও তাঁহার উপহার পৌঁছিত। এখনও সাদুল্লাপুরে, সিরাজ-উদ্দিন সাহেবের পবিত্র সমাধি-গৃহে, নবাব মুরশীদকুলীর জাফর-খাঁর প্রেরিত একখানি ছিন্ন কোরাণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ কোরাণ, নবাব মুরশীদকুলীর স্বহস্ত লিখিত। "রিয়াজের" বর্ণনানুসারে জানা যায়, "তাঁহার সভায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র উৎকৃষ্ট ও নিয়মিত কোরাণ-পাঠক নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁরা প্রত্যহ সমগ্র কোরাণ পাঠ ও তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত, কোরাণ সংশোধন করিতেন। এই সমস্ত কোরাণ-পাঠকেরা, নবাবের রন্ধনশালা হইতে নিত্য আহার্য্য প্রাপ্ত হইতেন। নবাব শাস্ত্রবেত্তা মৌলবী, মৌলানা ও সদ্বংশ জাত ব্যক্তিগণের সাহচর্য্য শ্রেয়স্কর বোধ করিতেন।

নবাব, রবিঅল্ আউল মাসের ১লা হইতে হজরত পয়গম্বরের (মহম্মদ) তিরোভাব দিন অর্থাৎ ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত ধার্ম্মিক, শাস্ত্রবেত্তা ও দরিদ্রদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন। তাহাদের আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। এই সময়ে প্রত্যহ মাহিনগর হইতে লালবাগ পর্য্যন্ত নদীর তট, অতি সুন্দর দীপমালায় সুশোভিত হইত। তারার ন্যায় সমুজ্জল আলোক-মালায় মসজেদের খিলান, বেদী, বৃক্ষলতা, কোরাণের শ্লোক ইত্যাদি প্রদর্শিত হইত। নাজির আহম্মদ নামক একজন কর্ম্মচারি, এই কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইতেন। কথিত আছে, এজন্য তিনি আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ মজুর নিযুক্ত করিতেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে, একটী তোপধ্বনি হইবামাত্র, সমস্ত প্রদীপ একবারে জ্বলিয়া উঠিত। আর সমস্ত আলোক একবারে জ্বলিয়া উঠায়, অপূর্ব্ব নেত্র-মোহকর সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিত। মুরশীদকুলীর সময়ে, বেরা-নামক আলোক-দান পর্ব্বও এইরূপ মহোৎসবে নির্ব্বাহিত হইত। এই সময়ে নানাবর্ণে রঞ্জিত কাগজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী, দীপমালায় সুশোভিত করিয়া, নদীবক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হইত।*

* খাজা-খিজির নামক, এক পবিত্রাত্মা মহাত্মার স্মরণার্থে এই আলোকদান পর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। খাজা-খিজির খৃষ্টানদের ইলিয়স। ঢাকার নবাব একরাম খাঁর আমলেও বাঙ্গালার মুসলমানগণের এই পর্ব্বানুষ্ঠানের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদে এই পর্ব্ব, পূর্ব্বে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইত। অদ্যাপি ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে, এই পর্ব্ব উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিক হইতে কদলীবৃক্ষ ও বংশ সংগৃহীত হইয়া প্রকাণ্ড এক আলোকযান প্রস্তুত হয়। তাহার উপর

অতিথি-সৎকারে মুরশীদকুলী খাঁ কখনই কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। অতিথি, অনাহুত, রবাহুত লোক, ও সাধু ফকীরগণ তাঁহার নিকট প্রত্যহই আহার্য্যাদি পাইত। এরূপ শুনা গিয়াছে, যে তাঁহার দানের সীমা কেবল মনুষ্য-জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। বনের পশু পক্ষীদের জন্য, স্থানে স্থানে প্রচুর খাদ্য রক্ষা করা হইত। এমন কি, তাঁহার নিয়োজিত ভৃত্য-গণ মাঠের মধ্যে গিয়া, যে সকল বৃষ হলাকর্ষণে নিযুক্ত, তাহাদেরও নিয়মিত খাদ্য দিয়া আসিত।

তাঁহার আহার পারিপাট্য ও বিলাসব্যসন কিছুই ছিল না। মৃগয়া দ্বারা প্রাণিবধে তাঁহার কোন সখই ছিল না। তিনি কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। কেবলমাত্র বরফ-জলই তাঁহার তৃষ্ণা শান্তি করিত। অতিরিক্ত মসলা দেওয়া খাদ্যাদি ব্যবহার তাঁহার নিয়ম-বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারী, নাজির আহম্মদের সহকারী, খিজির খাঁ—শীত-চারি মাস আকবরনগরের (রাজমহল) পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে, সংবৎসরের উপ-যোগী বরফ আবদ্ধ রাখিবার জন্য ব্যাপৃত থাকিতেন। এইরূপে বার মাসের বরফ সঞ্চিত হইয়া থাকিত।

বঙ্গদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল আম্র, তাঁহার উপভোগের অতি প্রিয় জিনিস ছিল। মালদহের আমই সেকালে খুব বিখ্যাত ছিল। নবাব এই সমস্ত গ্রামের আম্র-রক্ষার জন্য দারোগা নিযুক্ত করিয়া, মালদহ কোতোয়ালি ও হোসেনপুরের খাস আম্রবৃক্ষগুলি রক্ষা করিতেন। ফলের সময়, তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা আম্র পাড়াইয়া, প্রহরী-যোগে রাজধানীতে প্রেরণ করিত। এই সমস্ত লোকজনের ব্যয়ভার জমীদারদের দিতে হইত। জমীদারগণ, খাস আম্র-বৃক্ষসমূহ কর্ত্তন করিতে পারিতেন না। পরবর্ত্তীকালে নবাব মীরজাফরের সময় পর্য্যন্ত, এইরূপে আম্র চৌকী দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

গীতবাদ্যাদিতে নবাবের কোন আসক্তি ছিল না। নৃত্যকলা-

নানাবর্ণে রঞ্জিত এবং কাগজে ও অভ্রে—মণ্ডিত, তরণীগৃহ ও মসজিদ প্রভৃতির প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা আলোকমালা সুশোভিত করিয়া স্রোতোমুখে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। সেকালে তিনশত হস্ত বিস্তৃত আলোকযান প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরও "বেরা" থাকিত। এই সময়ে নদীবক্ষে এক অপূর্ব্ব নয়নমোহন দৃশ্য আবির্ভূত হইত। বর্ত্তমান সময়ে বেরার আয়তন ও সৌন্দর্য্য লাঘব হইয়াছে। এই অঞ্চলের মুসলমানগণ ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের প্রদোষে নৈবেদ্যসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেরা, ভাগীরথী বক্ষে ভাসাইয়া দেয়। (কালীপ্রসন্ন-বাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস ৫৬ পৃঃ ফুটনোট।)

কোশলময়ী, নর্ত্তকীগণ কখনও তাঁহার তৃপ্তিসাধন করে নাই। খোজা-দিগকে তিনি অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন না। যে সকল স্ত্রীলোকের নবাব-পরিবারের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহারাও অন্তঃপুরে থাকিতে পাইত না। আজীবন তিনি একমাত্র বিবাহিতা পত্নীতে অনু-রক্ত ছিলেন। কখনও পরকীয়ার সহবাস করেন নাই। কোন দাসী অন্তঃপুর হইতে একবার বাহিরে আসিলে, আর ভিতরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইত না। নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, অঙ্ক-শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন: এই জন্য রাজস্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত হিসাব-পত্র, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ছিল। তিনি সরকারী সমস্ত কাগজ-পত্র লালকালীতে সহী করিতেন। মাসের শেষ দিবসে, সমস্ত সেরেস্তার কাগজ-পত্র নিজে পরীক্ষা করিয়া, তাহাতে স্বাক্ষর করিতেন। এইরূপ স্বাধীনভাবে ও হাতে-কলমে কাজ করিয়া, তিনি রাজস্ব-বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন করেন।

বিচার-সম্বন্ধে তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়েরই প্রতি সমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। অর্থী-প্রত্যর্থী তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের নিকট, কোন রূপ সুবিচার না পাইয়া, যদি কোন্ উপায়ে তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিত—তাহা হইলে তাহার আশা পূর্ণ হইত। সাধারণের বিচার কার্য্যে নবাব, কাজী মোহম্মদ সরেফ্ বলিয়া একজন শাস্ত্রবিৎ কাজীর পরামর্শ লই-তেন। এই কাজী-সাহেব, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র। সম্রাটই ইঁহাকে বঙ্গদেশে বিচারকার্য্যের সহায়তার জন্য পাঠাইয়া দেন। নবাব, এই কাজী সাহেবের ব্যাখ্যামত, কোরাণের ব্যবস্থা অনুযায়ী, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই কাজী মহম্মদ সরেফের দুই একটী বিচার-প্রণালীর কথা আমরা এস্থলে উল্লেখ করিব।

মুরশীদকুলী খাঁর আমলে, চুণাখালিতে বৃন্দাবন বলিয়া একজন হিন্দু তালুকদার ছিলেন। একদিন একজন ফকীর, তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে যায়। বৃন্দাবন তাহাকে ভিক্ষা না দিয়া বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন। ফকীর, বৃন্দাবনকে জব্দ করিবার জন্য, পথ হইতে কতকগুলি ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া রাখে। এই ইষ্টকগুলি সজ্জিত করিয়া, সে একটি ক্ষুদ্র প্রাচীর প্রস্তুত করে এবং তাহা মসজিদ নামে অভিহিত করিয়া, নিত্য উচ্চৈঃস্বরে আজান দিতে আরম্ভ করে। বৃন্দাবন যখন এই মসজিদের পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতেন—তখন ফকীরের আজানের চীৎকারটা কিছু বৃদ্ধি

পাইত। বৃন্দাবন, ফকীরের এই দুষ্ট ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, সেই প্রাচীরের কতকগুলি ইষ্টক ফেলিয়া দেন এবং ফকীরকে গালি দিয়া বহিস্কৃত করেন।

ফকীর, নবাবের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলে, কাজী মোহম্মদ সরেফ্ মুসলমান-শাস্ত্রের বিধানানুসারে তালুকদারের প্রাণদণ্ডের বিধান দেন। মুরশীদকুলী খাঁ বৃন্দাবনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে অসম্মত হইয়া, ইসলাম শাস্ত্রে তাঁহাকে মুক্তি দিবার কোনরূপ ব্যবস্থা আছে কি না, তৎসম্বন্ধে কাজীকে প্রশ্ন করেন। তাহাতে কাজীসাহেব বলেন—"শাস্ত্রে এরূপ অপরাধীকে মার্জ্জনা করিবার কোন বিধানই নাই। তবে অপরাধীর সহকারীকে বধ করিতে যে সময় টুকু আবশ্যক, তাহার জন্য প্রধান অপরাধীকে বাঁচিবার সময় দেওয়া যাইতে পারে। তৎপরে তাহাকে নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে।" সাহজাদা আজিমওশ্বান এই হিন্দু-তালুকদারের জীবন-রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেও, তাহাতে কোনরূপ ফল হয় নাই। কাজিসাহেব, স্বহস্তে তীর-নিক্ষেপ করিয়া, বৃন্দাবনের জীবননাশ করেন। আজিমওশ্বান এই ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া, সম্রাটকে জানান—"আপনার প্রেরিত কাজী মোহম্মদ সরেফ্ উন্মাদ হইয়াছেন। কারণ তিনি অনর্থক হিন্দু-তালুকদার বৃন্দাবনকে বধ করিয়াছেন।" কিন্তু গোঁড়া মুসলমান সম্রাট ঔরঙ্গজেব, সেই পত্রপৃষ্ঠে স্বহস্তে লিখিয়া দেন—"কাজী সরফ্ খোদাকা তরফ্" অর্থাৎ কাজিসাহেব ঈশ্বরানুমোদিত কার্য্যই করিয়াছেন।" এই বিচার-ব্যাপার হইতে বুঝা যায়, মুরশীদকুলী খাঁ বৃন্দাবনের জীবন-রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হন।

তাঁহার আর একটী বিচার-প্রণালীর কথা বলিব। হুগলীর ফৌজদার আসাদউল্লা খাঁ, নবাবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সময়ে হুগলী বন্দরের কোতোয়াল—এনাম উদ্দিন, এক সম্ভ্রান্ত মোগল-কন্যাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়। আসাদউল্লার নিকট, কন্যার পিতা ইমাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিলে, তিনি তাঁহাকে বলেন,—"ভবিষ্যতে ইমাম উদ্দিন আর কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিবে না।" কিন্তু সেই অপহৃতা কন্যার পিতা, ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, নবাব মুরশীদকুলী খাঁর নিকট এক আরজী উপস্থিত করেন। আবেদনকারীর অভিযোগ সত্য, এ কথা প্রমাণ হইলে নবাব আদেশ প্রচার করেন, কোরাণের নির্দ্দেশানুসারে প্রস্তর-নিক্ষেপে এই ব্যভিচারীকে হত্যা করা হইবে। হুগলীর ফৌজদার সাহেব এ বিষয়ে নবাবকে অনুরোধ করিলেও তিনি তাহা রক্ষা করেন নাই।

তাঁহার আমলে বঙ্গদেশে কখনও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। দেশের শস্য-রক্ষা সম্বন্ধে, তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর সহিত, এ বিষয়ে তাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার রাজস্ব বন্দোবস্তের গুণে, জমিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। অনেক পতিত-জমির আবাদ হওয়ায় প্রচুর শস্য উৎপাদিত হইত। জমিদারগণ প্রজার উপর অত্যাচার করিতে পারিতেন না। শস্যাদির মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির দিকে, তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কর্ম্মচারিগণ, মহাজনগণের নিকট হইতে কিম্বা বাজার বা গঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে, শস্যাদির মূল্য-তালিকা সংগ্রহ করিয়া, নবাব-দরবারে পেশ করিতেন। কখনও বা শস্যাদির একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত। কোন ব্যবসায়ী যদি শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করিত, বা ভবিষ্যৎ লাভের আশায়, তাহা বিক্রয় না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিত, আর নবাব সে কথা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেই ব্যবসায়ীকে গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া, নগর পরিভ্রমণ করান হইত। নবাব মুরশীদকুলী খাঁর আমলে টাকায় পাঁচ ছয় মণ চাউল পাওয়া যাইত।

বাকী-খাজনার জন্য, জমীদারদিগকে অনেক সময়ে কারাবদ্ধ করা হইত—বা নজরবন্দী করিয়া মুরশীদাবাদে রাখা হইত। প্রথম নবাবী আমলের এই ব্যবস্থা, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আমল পর্য্যন্তও প্রচলিত ছিল। বড়িশার জমীদার সন্তোষরায়, নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও খাজনার দায়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অবরোধকালে যে জমীদারদের উপর ভীষণ অত্যাচার করা হইত, তাহার কোন মূলভিত্তি নাই। এ বিষয়ে সমসাময়িক মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকেরাই মুরশীদকুলীর চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা বলেন—"নবাবী আমলে জমীদারেরা কেবল সোজা বাঁশ দেওয়া চৌপালা ব্যবহার করিতে পাইতেন। হিন্দু-জমীদার ও কর্ম্মচারীবর্গ, নবাবের সমক্ষে আসনে উপবেশন করিতে পারিতেন না। ক্ষুদ্র জমীদারদের, নবাব-দরবারে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। নবাবের সমক্ষে পরস্পরকে কেহ অভিবাদন করিতে পারিতেন না। তাহার পর, বহুদিন হইতে একটা কথা প্রচলিত আছে—অক্ষম হিন্দু জমীদারদের নিকট জবরদস্তিতে খাজনা আদায়ের জন্য, নবাব "বৈকুণ্ঠের" সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ বৈকুণ্ঠ যে কি ব্যাপার, তাহা একটু পরে বলিতেছি।

জমীদারদের উপর অত্যাচার ব্যাপার সম্বন্ধে সমসাময়িক ইংরাজ ইতিহাস

লেখকদের ইতিবৃত্ত হইতে খুব কম বিবরণই পাওয়া যায়। দেশীয় ইতিবৃত্ত লেখকেরাই, এ ব্যাপারটী অধিক পরিমাণে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রাজস্ব প্রদানে অপারক হইলেই, এই সমস্ত উৎপীড়ন আরম্ভ হইত। যে সমস্ত জমীদার বা আমিল, রাজস্বপ্রদানে ত্রুটি করিতেন—তাঁহারাই কারাগারে আবদ্ধ হইয়া নানাবিধ যন্ত্রণাভোগ করিতেন। পীড়ন দ্বারা টাকা আদায় করাই অবরোধের প্রধান উদ্দেশ্য—কাজেই পীড়নের মাত্রা কিছু বেশী পরিমাণেই হইত। কিন্তু যখন আমরা ভাবি, বাঙ্গলার অতীত-যুগের জমীদারগণ দরিদ্র প্রজাগণকে পীড়নের জন্য "চূণের-ঘর" "ঠাণ্ডাগারদ" ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে পারেন—আর সামান্য বিশ পঁচিশ টাকা পাওনা আদায়ের জন্য, এখনও কঠোরভাবে প্রজা-পীড়ন হয়, তখন মুরশীদ-কুলী খাঁর মত জবরদস্ত নবাব—যিনি তিন চার মুলুকের মালিক, তাঁহার আমলে যে এরূপ একটা কঠোর প্রথা বা অত্যাচার হয় নাই—তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অনেকে এই সব জমীদার-পীড়নের কলঙ্ক, নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁর উপর অর্পণ করিয়া থাকেন। নাজির আহম্মদ প্রথমে এক-জন সামান্য কর্ম্মচারী ছিল। পরিশেষে নবাবের অনুগ্রহ বলে, সে দুই হাজার অশ্বারোহী ও চারি হাজার পদাতিক সেনার অধিনায়ক হয়। কাজেই দর্পে ও পদগৌরবে, সে জগৎকে "তৃণবৎমন্যতে" গোছ করিয়া তুলিল। যে সকল জমীদার, খাজনা বাকী ফেলিতেন—বা নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজস্ব প্রদান করিতে অপারক হইতেন, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার ভার নাজিরের উপর পড়িত। নাজির তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কখনও বা তেকাটায় পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত, কখনও বা কোড়া-প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিত। তদ্ভিন্ন গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখা ও শীতকালে খোলা-গায়ে ঠাণ্ডাজল ঢালিয়া দেওয়া ইত্যাদি কষ্টদায়ক ব্যবস্থাও ছিল। তাহার পর ঐ সমস্ত জমীদার কারাগারে প্রেরিত হইতেন। নবাবের কারাগারে আহার্য্যাদির ব্যবস্থা অতি শোচনীয়! কেবল জীবনরক্ষার জন্য তাঁহারা যৎসামান্য খাদ্যাদি পাইতেন। আবার তাহার সঙ্গে হিন্দুর অভক্ষ্য দ্রব্যও মিশ্রিত থাকিত।

এইবার রেজা খাঁর ব্যবহারের কথা বলি। তিনি একটী খাদ খনন করাইয়া, তাহা নানাবিধ দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুদিগের মর্ম্মে আঘাত করিবার জন্য, সেই খনিত খাদটীকে "বৈকুণ্ঠ" আখ্যা প্রদান করেন। যে সমস্ত জমীদার কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়াও রাজস্ব

প্রদান করিতে পারিতেন না, এই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রেজা খাঁর আদেশে তাঁহারা কারাগারে আবদ্ধ হইয়া এই "বৈকুণ্ঠে" নিক্ষিপ্ত হইতেন! কখনও বা তাঁহাদের ঢিলা-ইজারের মধ্যে মার্জ্জার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত।" বঙ্গীয় জমীদারদের উপর যে এই সমস্ত অত্যাচার করা হইত—ইহার বর্ণনা মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের লিখিত বৃত্তান্ত হইতেই কিছু বেশী পাওয়া যায়। নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁর অত্যাচারের কথা, তারিখ-বাঙ্গলা, রিয়াজিস্-সালাতিনে উল্লিখিত আছে। পরবর্ত্তী কালে গ্রাণ্ট ও ষ্টুয়ার্ট ইহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আবার মুরশীদ-কুলী খাঁ যেরূপ ধার্ম্মিক চরিত্রের নবাব ছিলেন—তাঁহার আমলে যে এরূপ ধর্ম্ম-নীতি ও সদাচার-বিগর্হিত অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইত, তাহা বিশ্বাস করিতেও পারা যায় না। অথচ তাঁহার আমলের "বৈকুণ্ঠ" ঘটিত কথাটা যে একেবারে মিথ্যা, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়। একটা কোন কিছু ভিত্তি না থাকিলে, যে এ সম্বন্ধে একটা যোল-আনা আজগুবী জনরব উঠিল, আর মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হিন্দুদের ছোট করিবার জন্যই হউক বা মুরশীদকুলীর দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দেখাইবার জন্যই হউক, এরূপ একটা অসম্ভব প্রবাদের সৃষ্টি করিলেন, তাহাও ঠিক কথা নয়। মুরশীদকুলী খাঁ এই সব ব্যাপারে বেশী অত্যাচারী না হইলেও, তাঁহার কর্ম্মচারীদ্বয় নাজির আহম্মদ ও রেজা খাঁ যে জমীদার-পীড়নের জন্য এরূপ একটা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও অসম্ভব নহে। ঐতিহাসিক নিখিল বাবু বলেন—"রেজা খাঁ কর্ত্তৃক জমীদারদের ভয় প্রদর্শনের জন্যও বৈকুণ্ঠের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু জমীদারগণ বাস্তবিকই যে বৈকুণ্ঠ-বাস করিতে বাধ্য হইতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। রেজা খাঁ ১৭১৭ খৃঃ অব্দের পর, বাঙ্গলার নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত অব্দে এক্রাম খাঁকে কার্য্য করিতে দেখা যায়। তাহার অল্পকাল পরেই রেজা খাঁর মৃত্যু হইলে, আসাদউল্লা সরফরাজ খাঁ নায়েব-দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। সুতরাং এই বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব যে বহুদিন ছিল না, ইহাও ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের জমীদার-পীড়নের বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও জমীদারী বন্দোবস্তে মুরশীদকুলী খাঁ যে কঠোরতা প্রকাশ করিতেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে এখনও একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মুরশীদাবাদ নগরে তাহার স্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়া থাকেন।" উক্ত

গ্রন্থকার বলেন, এই স্থান-নির্দ্দেশ যে কতটা সত্য—তাহা ঠিক বলা যায় না।

নবাব মুরশীদকুলী খাঁর আমলে, তুইজন প্রবল-প্রতাপ জমীদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। রাজস্ব-আদায়ের জন্য, মুরশীদকুলী যে কঠোর ব্যবস্থা প্রচলন করেন, তাহার ফলেই এই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ভূষণার জমীদার, রাজা সীতারাম রায় ও রাজসাহীর জমীদার রাজা উদয়নারায়ণ, নবাবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন।

যে সময়ে বঙ্গদেশে দ্বাদশ-ভৌমিকের আধিপত্য প্রবল, সেই সময়ে ভূষণা, মুকুন্দরাম রায়ের দখলে। মকুন্দরামের রাজ্যাবসানের পর, ভূষণায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত হন। এই ভূষণা ফৌজদারীর মধ্য দিয়া, মধুমতী নদী প্রবাহিতা। মধুমতী তীরে হরিহর-নগর নামক এক ক্ষুদ্রপল্লীতে, উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ, বিশ্বাস-বংশে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারামের পিতার নাম উদয়নারায়ণ রায়। বিশ্বাস উপাধি, জাতিগত হইলেও উদয়নারায়ণ নবাব সরকার হইতে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই রায়গণের অধীনে কতকগুলি ক্ষুদ্র মৌজা ও তালুক ছিল। ইহাই সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি। চেষ্টা করিয়া সীতারাম, পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। ক্রমশঃ সীতারামের মনে, নিজের জমীদারী বৃদ্ধি করা ও সেই সঙ্গে একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সংকল্প সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

এ সঙ্কল্প সিদ্ধির কতকগুলি অনুকূল কারণও উপস্থিত হইল। এই সময়ে বঙ্গদেশে শোভাসিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত। তখন তুর্ব্বলচিত্ত নবাব ইব্রাহিম খাঁ, বাঙ্গালার সুবেদার। নুরউল্লা খাঁ—যশোরের ফৌজদার। এই নুরউল্লা ও ইব্রাহিম খাঁর শাসন-শিথিলতার অবসরে, তীক্ষ্নবুদ্ধি বীরপ্রবর সীতারাম প্রভূত বলসঞ্চয় করেন। কেহই তাঁহার ক্ষমতায় বাধা-প্রদান করিতে সাহসী হন নাই বা মনোযোগ প্রদান করেন নাই। প্রকৃতি দেবী, সীতারামের সহায় হইলেন। চাকলা ভূষণা নদীবহুল স্থান। চারিদিকে পদ্মার ক্ষুদ্র বৃহৎ শাখা-প্রশাখা এইস্থানকে অতি তুর্গম করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার দক্ষিণে সুন্দরবনের দূর্ভেদ্য জঙ্গল। কাজেই সীতারাম স্বাধীনতা লাভের জন্য, দীর্ঘকাল অবসর পাইয়াছিলেন। সেকালে দেশের লোক তলোয়ার, ঢাল, তীর ও লাঠি ব্যবহার করিতে সুদক্ষ ছিল। সীতারাম এইরূপে লোক-সংগ্রহ করিয়া একটী সেনাদল গঠন করিলেন। বাদসাহ ও নবাবের সম্মতিক্রমে তিনি

নিকটস্থ অনেক ভূভাগ নিজের জমীদারী ভুক্ত করিয়া লয়েন। এই সমস্ত জমীদারী, তাঁহার করায়ত্ত হইলে, এবং অর্থবল এবং লোকবল বৃদ্ধি হইলে, সীতারাম নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

হরিহর-নগরের পরপারে মধুমতী তীরে, সীতারামের রাজধানী স্থাপিত হয়। এখানে তাঁহার কিছু পৈত্রিক-সম্পত্তিও ছিল। জনপ্রবাদ এই, তাঁহার গৃহ-দেবতা, লক্ষ্মীনারায়ণ হইতেই সীতারামের সৌভাগ্যোদয় হয়। নিখিল বাবুর মুরশীদাবাদের ইতিহাসে, সীতারামের লক্ষ্মীনারায়ণ প্রাপ্তির একটী জন-প্রবাদের উল্লেখ আছে। সীতারাম একদিন অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে, একস্থানে তাঁহার অশ্বের খুর প্রোথিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারেন। অশ্ব স্থিরগতি হইল দেখিয়া, সীতারাম ইহার কারণানুসন্ধানের জন্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হন। কি কারণে সেইস্থানে অশ্বখুর প্রোথিত হইল, তাহার তথ্যানুসন্ধান জন্য সেই স্থান খনন করাইতে করাইতে, প্রথমে একটি ত্রিশূল, পরে মন্দিরের চূড়া ও পরিশেষে মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দির-মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়া সীতারামের উন্নতির পথ প্রসারিত হয়।

সীতারাম যে স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন—তথায় একজন মুসলমান সাধুর আবাসস্থান ছিল। ফকির সেই স্থানত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায়, সীতারাম তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। এই ফকিরের নামানুসারেই তিনি স্বীয় রাজধানীর নাম "মহম্মদপুর" রাখেন।

সীতারামের দুর্গ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। ইহার চারিদিকের বেষ্টন এক ক্রোশ। এই দুর্গের চারিদিকে গভীর পরিখা ছিল। এই পরিখা হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকা সহায়তায়, দুর্গ-প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। দুর্গ-প্রাচীরের উপর সজ্জিত কামানশ্রেণী। দুর্গ মধ্যে ও পার্শ্বে—রামসাগর, সুখসাগর প্রভৃতি প্রকাণ্ড জলাশয়। দুর্গের প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই রামসাগর। এই রামসাগর উত্তর দক্ষিণে পনর শত ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ছয় শত হাত বিস্তৃত। এখনও এই রামসাগর ও দুর্গ-পরিখার জঙ্গলময় পরিণাম, অতীতের স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

এই রামসাগর খনন সম্বন্ধেও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে এইস্থানে এক দরিদ্র বৃদ্ধা বাস করিত। তাহার পুত্রের নামও সীতারাম ছিল। একদিন বৃদ্ধা তাহার পুত্রকে আহ্বান করায়, রাজা সীতারাম রায় তথায় উপস্থিত হন। বৃদ্ধা সহসা রাজাকে সম্মুখীন দেখিয়া, ভয়ে বিহ্বলা

ভূতা হয়। কিন্তু রাজার উপযুক্ত উপহার দিবার মত বৃদ্ধার ত কিছুই ছিল না। সীতারাম বৃদ্ধার এই অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করিয়া, তাহার নিকট হইতে প্রাঙ্গণ-স্থিত একটি লাউগাছ প্রার্থনা করেন। রাজা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার উপহার ত লইলাম। এখন তোমার কি প্রার্থনা তাহা ব্যক্ত কর।" বৃদ্ধা একটী কূপ-খননের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রাজা সেই লাউগাছের মূলে কূপখননের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু লাউগাছের মূল দেশ খনন কালে, প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়। সীতারাম সেই অর্থ নিজে না লইয়া, রামসাগর দীঘি খনন করান।

দুর্গ-নির্ম্মাণ ও রাজপ্রাসাদের কার্য্য শেষ হইলে, তিনি নানাস্থান হইতে শিল্পী ও শ্রমজীবি আনাইয়া প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করাইলেন। দুর্গ মধ্যেও আর একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনিত হইল। ইহা সীতারামের গুপ্ত কোষাগার স্বরূপ ছিল। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে,ধনরত্নাদি ইহাতে অনায়াসে নিক্ষেপ করা যাইবে, এই জন্য এই পুষ্করিণী খনন করা হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ব্যতীত, সীতারাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও দশভুজা প্রভৃতি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

সীতারামের সেনাবলও এই সময়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ঢালী, সড়কি, তীরন্দাজ, পাইক তাঁহার দলে বিস্তর জুটিল। সীতারাম, তাহাদিগকে সেকালের সমর-বিদ্যায় দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। সীতারামের বিশ্বস্ত সেনাপতিদের মধ্যে মেনাহাতীই সর্ব্বপ্রধান। তন্নিম্নে বক্তার খাঁ, মুচরা সিংহ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে মুরশীদকুলী খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান ও নাজিম। বিচার ও শাসন-বিভাগ দুইই তাঁহার হস্তে। রাজস্ব আদায়ের জন্য, এই সময়ে তিনি জমীদারদের উপরে উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সীতারাম ইতিপূর্ব্বেই বিবাদের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বাহুবল বৃদ্ধির সহিত তিনি সরকারের খাজনা বন্ধ করিয়া দিয়া, প্রকাশ্য ভাবে নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এই সময়ে আবুতোরাপ নামক এক ব্যক্তি, ভুষণার ফৌজদার ছিলেন। আবুতোরাপ বাদসাহ-বংশের অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি। সীতারামের অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া, আবুতোরাপ তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু চারিদিক নদী ও অরণ্য-প্রধান স্থান বলিয়া, আবুতোরাপ সহজে একটা‌কে আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই। অগত্যা তিনি নবাবের নিকট

সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সে সাহায্য আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বে, আবু-তোরাপ পীর খাঁ নামক একজন জমাদারকে তুইশত অশ্বারোহীর সহিত সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

আবুতোরাপ, পীর খাঁকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া নিজে শিকারে গমন করেন। সীতারাম, লুক্কায়িতভাবে পীর খাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য যেস্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন, আবুতোরাপ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে, সহসা সেইস্থানে উপস্থিত হন। সীতারামের সেনাগণ পীর খাঁ বোধে, আবুতোরাপকে হত্যা করে। ফৌজদারকে হত্যা করিবার ইচ্ছা সীতারামের ছিল না, এজন্য তিনি তুঃখিত চিত্তে, ফৌজদারের মৃতদেহ ভূষণায় লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করেন। এইবার তিনি বুঝিলেন, নবাবের সহিত তাঁহার প্রকাশ্য শক্রতা আরম্ভ হইবে। আবুতোরাপ বাদসাহের অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি। মুরশীদকুলি খাঁ নিশ্চয়ই এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেন না।

নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, এই সংবাদে বিচলিত হইয়া, সীতারামের দমনের জন্য তাঁহার নিকট আত্মীয় বক্স আলি খাঁকে, ভূষণার ফৌজদার রূপে প্রেরণ করেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য, দীঘাপতিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ দয়ারামও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। সংগ্রাম সিংহ নামক আর একজন সেনাপতি বক্স আলীর অধীনে, সুবেদারী-সেনার পরিচালক রূপে ভূষণায় আসেন*।

বক্স আলি, সংগ্রাম সিংহ নামক এক সেনাপতিকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সংগ্রাম সিংহের সহিত, দয়ারাম রায়ও ছিলেন। এই দয়ারামের পরামর্শেই সংগ্রাম সিংহ, সীতারামকে জখম করিতে পারিয়াছিলেন।

সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী, প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রচ্ছন্ন-ভাবে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া, বিপক্ষপক্ষের সংবাদ লইত। মহম্মদপুরে এক-দিন ভয়ানক কোয়াশা হয়। মেনাহাতী পূর্ব্ব প্রথামত যেমন নগর-প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছে—অমনি দয়ারামের পরামর্শে, সুবাদারী ফৌজ তাহাকে আক্রমণ করিয়া শূলবিদ্ধ করে। মেনাহাতীর ছিন্ন-মুণ্ড, নবাব মুর-শীদকুলীর নিকট প্রেরিত হয়। নবাব এই বীর-প্রবরের ছিন্ন-মুণ্ড দেখিয়া না কি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার ন্যায় বীরকে আমি জীবিতা-বস্থায় দেখিতে পাইলে বড়ই সুখী হইতাম।"

মেনাহাতীর নিধন সংবাদে, সীতারাম অতিশয় ভগ্নহৃদয় হইয়া

পড়িলেন, এবং নিরুপায় হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। সুবাদারী সৈন্যগণ, দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলে—ও ফৌজদার সাহেব শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। মুর্শিদাবাদে গমনকালে সীতারাম কিছুদিন নাটোরে বন্দীভাবে ছিলেন, এ কথাও শুনা যায়।

সীতারামের মৃত্যু সম্বন্ধে দুই প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা বলেন—মুরশীদকুলী খাঁ সীতারামকে শূলে চড়াইয়া দেন। কিন্তু অন্য জনপ্রবাদ অনুসারে, তিনি পথিমধ্যে কিম্বা কারাগারে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।*

সীতারামের পরিবারবর্গ যে নবাবের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য, কলিকাতায় তাঁহাদের আত্মীয় রামনাথের নিকট পলায়ন করেন, এতৎসম্বন্ধে অনেক কথা সেকালের কলিকাতা-কৌন্সিলের মন্তব্য হইতে জানা যায়। নবাবের আদেশে, হুগলীর ফৌজদার মীর নাসির, কলিকাতায় ইংরাজ-কোম্পানীর পাটোয়ার রামনাথের আশ্রয়ে লুক্কায়িত, সীতারামের পরিবারবর্গের সন্ধানের জন্য পুরস্কার পর্য্যন্ত ঘোষণা করেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে এই মন্তব্যটীর প্রয়োজনীয়াংশ উদ্ধৃত করিলাম।† এই মন্তব্য হইতে প্রমাণিত হয়, নবাব মুরশীদকুলী খাঁ কোন বিশ্বস্ত

* সীতারামের মৃত্যুব্যাপার লইয়া অনেক মত বিভিন্নতা আছে। তারিখ বাঙ্গালার মতে—"বক্স আলি সীতারামকে সপরিবারে কারারুদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। নবাবের আদেশে, তাঁহার মুখ চর্ম্মাবৃত করিয়া মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বপার্শ্বে, ঢাকা ও মহম্মদপুর যাইবার রাস্তায়, তাঁহাকে শূলে আরোপিত করা হইল। অন্যান্য জমীদারদের ভয়প্রদর্শন জন্য ঐ মৃতদেহ নিকটস্থ বৃক্ষে লটকান হইল—এবং অপরাধীর রক্ত যাহাতে মাটীতে না পড়ে, এজন্য একটী পাত্র নীচে স্থাপিত হইল—সীতারামের পরিবারবর্গকে যাবজ্জীবন মহম্মদাবাদে কারারুদ্ধ করা হইল। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন—Bux Ally Khan seized Sitaram, his woman, children and accomplices and sent them in irons to Murshidabad, where Sitaram and the robbers impaled alive and woman and children sold as slaves (Stewart's Bengal. p. ৩৮৩). ষ্টুয়ার্ট সীতারামের সঙ্গীগণকে "দস্যু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ষ্টুয়ার্টের সংগৃহীত বিবরণের অধিকাংশই মুসলমান লেখকদিগের বৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত। এই ..মস্ত মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ সীতারামের মত বীরকেও দস্যু বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই।

† Letters and messengers from Mir Nassir Governor of Hugly, acquaint us, that Duan Jaffurcaun has received information and believes that the family of Seettaram late Jemeendaree of Boosna ly concealed in Our Town (Calcutta) and pretends to suppose that they have Thirty Laeck of Rupees with them which he will demand of us for the Kings

সূত্রে জানিতে পারেন, যে সীতারামের পরিবারবর্গ, ত্রিশলক্ষ টাকা লইয়া কলিকাতায় লুকাইয়া আছেন। ইংরাজ কোম্পানীর তৎকালীন পুরাতন সেরেস্তা হইতে প্রমাণিত হয়, যে নবাবের আজ্ঞায় সীতারামের ইতিপূর্ব্বেই প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। নবাব হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরের মারফৎ যখন এইরূপ আদেশ পত্র পাঠাইলেন, তখন ইংরাজেরা একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যদি সীতারামের পরিবারবর্গ সত্যসত্যই কলিকাতায় আসিয়া থাকে, তাহা হইলে নবাব ইংরাজদিগকে উৎপীড়িত করিবার জন্য নূতন ছল খুঁজিয়া পাইবেন। কাজেই কলিকাতার কর্তৃপক্ষগণ, তাঁহাদের অধীনস্থ পাটোয়ার, শীকদার, কোতোয়ালগণকে আহ্বান করিয়া মীর নাসিরের প্রেরিত কর্ম্মচারীদের সম্মুখেই এই বিষয়ে জেরা করিতে লাগিলেন। এই জেরার মুখে প্রকাশ পায়, একদিন ঊষাকালে কয়েকজন বিদেশী স্ত্রী-পুরুষ গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। তাহাদেরের সীতারাম পরিবার-ভুক্ত মনে করিয়া ধরিয়া আনা হয়। কিন্তু আবার তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা এখন যে কোথায়, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ইংরাজেরা মীর নাসিরের কর্ম্মচারীদের বলিয়া দিলেন, সীতারামের পরিবারবর্গের সন্ধান পাইলেই তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইবে। এজন্য একশত টাকা পুরস্কার পর্য্যন্ত ঘোষণা করা হইল। এই পুরস্কার ঘোষণার পরই, তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। * .

---

use. If we conceal and protect them, Mir Nassir therefore perswades us as s friend to make diligent search and deliver them up with all that belongs to them if they are found, for Seetaram being executed by the Duan's order for Murder and Rebellion, all his effects belong to the king. * *

Consultation No 837 (Subject Seettaram—a fugitive land-holder concealed in Calcutta) 1713—14.

* The encouragement of hundred rupees reward promised, prevailed with two needy persons to discover that Seettrams family were concealed by Ramnaut our Puttwaree at Govindpur (the very person who said the Duans servants carry'd them away) the men in his House and the Women at another place, the President therefore sent two trusty servants and ten Peons along wijh the informers, who found and brought away two sons and a Daughter, all small Children of Seetarams also six Women of his family and four men servants they also brought away. Ramnaut our Pattwaree who by concealing and harbouring them endangered vast prejudice to our affairs in Bengal for the Duan Jaffarcaun seeks all occassions

সীতারাম রাজ বিদ্রোহী। বিশেষতঃ তিনি আবুতোরাপকে হত্যা করিয়াছেন। তাঁহার সঞ্চিত অগাধ অর্থ লইয়া তাঁহার পরিবারবর্গ কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছেন। নবাব সীতারামের পরিবারবর্গকে ধরিবার জন্য যতটা না হৌক, তাঁহাদের আনীত অর্থের জন্য তাহাদের আয়ত্ত করিতে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই জন্যই হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরের উপর জোর পরোয়ানা ও কলিকাতার গৃহে গৃহে এই খানাতল্লাসী। ইংরাজেরা জানিতেন, জাফর খাঁ (মুরশীদকুলী) কেবল শনির মত ইউরোপীয় বণিকদিগকে পীড়নের ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কাজেই কলিকাতার প্রেসিডেণ্ট সাহেব এই ব্যাপার লইয়া একটা মহা হুলস্থূল উপস্থিত করেন। রামনাথের বাটীতেই তাঁহাদের পাওয়া গেল। ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট, মীর নাসিরকে সংবাদ দিলেন, "সীতারামের পরিবারবর্গকে পাওয়া গিয়াছে। আপনি আপনার কর্ম্মচারীদের পাঠাইয়া তাহাদের লইয়া যাইবেন।" এই সংবাদ পাইয়া মীর নাসির সাহেবরাম নামক একজন কর্ম্মচারীকে কয়েকজন বরকন্দাজসহ কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। সীতারামের পরিবারবর্গ যে কলিকাতা হইতে হুগলীতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি গুলিতেই পাওয়া যায়। *

possible to imbroyle all the European Traders and had lately found means to squeeze the French and Dutch tho' we have hitherto baffled his endeavours against us.

Consultation No 838 Fort-William.1713-14.

* Meir Nassir Governour of Hugly sent Sabroy one of his head officers and a Guard to carry away Seeterams Family and what Effects should be found here belonging to them and after the necessary precaution such as getting receipts for them and attestations sealed by the Cazee that nothing remained here belonging to them wee dispatch't them sending a guard of ten soldiers commanded by an officer to see them safe convayed and deliver'd up to Meir Nassir. ৫ই মার্চ্চ তারিখে—সীতারামের পরিবারবর্গকে প্রহরী রক্ষিত করিয়া হুগলীতে প্রেরণ করা হয়। ৭ই তারিখে প্রহরীরা হুগলী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। ইংরাজের উকিল, হুগলী হইতে কলিকাতার প্রেসিডেণ্টকে লিখিয়া পাঠান—যে মীর সাহেব ইংরাজদের এই ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। The Vacquell writes that Meir Nassir exprest the utmost satisfaction with his having received them. (Cousultation dated Fort-William 1713-14. No. 840.)

পূর্ব্বোক্ত টীকাগুলির ইংরাজী অংশ—সেকালের ইংরাজী বানানের নমুনা স্বরূপ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, নবাবী আমলের ইংরাজী-বানানের সহিত এখন কত পার্থক্য হইয়াছে।

রাজা সীতারাম রায়ের স্বাক্ষর।

আবার কোন কোন মতে, নবাব সীতারামের পরিবারবর্গকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূষণায় প্রত্যাগমন করিয়া, হরিহরনগরেই বাস করেন ও ভবিষ্যতে অতি কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

সীতারামের বংশ নাই। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার বংশধরেরা এখনও হরিহর নগরে বাস করিতেছেন। সীতারাম বংশীয়েরা কিছুদিন নলডাঙ্গার রাজাদের নিকট হইতে বৃত্তিভোগ করিয়াছিলেন।

সীতারামের ধ্বংসসাধনের জন্য নাটোরের রঘুনন্দনই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। রিয়াজে আছে—"নাটোর রাজবংশের প্রতিভাশালী নবীন কর্ম্মচারী দয়ারাম, নাটোরের জমিদারী ফৌজ লইয়া পশ্চিম দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি মেনাহাতিকে বিনাশ করিয়া সীতারামের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করেন। ভবিষ্যতে রঘুনন্দন ইহার জন্য নবাব সরকার হইতে যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করেন। রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবন ভূষণার জমিদারী লাভ করেন। ভূষণার বাদশাহী সনন্দে "বিমর্জ্জিম তপ্‌শীল বেশী জমা ও পেস্কস্ প্রদান স্বীকারে ভূষণার 'খারিজা' জমিদারী রামজীবনকে প্রদত্ত হইল" এই পংক্তিটী আছে।*

---

* কাশীপ্রসন্ন বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস, নিখিল বাবুর মুরশীদাবাদের ইতিহাস, ষ্টুয়ার্টের বেঙ্গল, আর উইলসন হইতে সীতারাম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় অথচ সংক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠকদের উপহার দিলাম। সীতারামের নাম বিস্মৃতিগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছিল—মহম্মদপুরের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গীয় ঐতিহাসিকদের চেষ্টায় এই মহাবীরের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সীতারামের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ও রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। শুনিয়াছি, সীতারামের সময়ের অন্যান্য প্রস্তর ফলকাদির অনুসন্ধান সম্বন্ধেও বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ এখনও চেষ্টা করিতেছেন। সীতারামের দশভূজা মন্দিরের প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে—

মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌণী-শাকে দশভুজালয়ং।
অকারি শ্রীসীতারাম রায়েন * * মন্দিরম্।

এই নির্দ্দেশ হইতে—১৬২১ শক বা ১৬৯৯—১৭০০ খৃঃ অব্দ হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে—

"লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেন মন্দিরম্।

১৬২৫ শক হইতে ১৬২৬ শক এবং দুর্গবহিঃস্থ কানাইনগরের কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের শিলালিপি হইতে দৃষ্ট হয়—

বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী
শ্রীমদ্বিশ্বাসভাষোদ্ভবকুলকমলে ভাসকো ভানুতুলাঃ।
অজস্রং সৌধযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং।
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ।

মহী—১, ভুজ—২, রস—৬, ক্ষৌণী = পৃথিবী—১ "অঙ্কস্য বামাগতি" বলিয়া ইহাতে ১৬২১

সেকালের জমিদারী সনন্দ কিরূপ ছিল—অর্থাৎ তাহাতে কিরূপ ভাবে জমিদারদের আদেশ প্রদত্ত হইত, তাহার একখানির নিদর্শন আমরা পাঠকবর্গের গোচরার্থে প্রকাশ করিলাম। সীতারামের অধঃপতনের পর রামজীবনের উপর ভূষণা জমিদারীর স্বত্ব অর্পিত হয়। আমরা প্রথিতনামা ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে এই সনন্দখানি উদ্ধৃত করিলাম। ভবিষ্যতে যথাস্থানে এই রামজীবন সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলা যাইবে।

জমিদারী সনন্দ—(ভূষণা—রামজীবন)

মোহর ফরকশিয়ার ১১২৫ হিঃ প্রদত্ত হিঃ ১১২৯।

উপস্থিত সম্পূর্ণ ফলদায়ক শুভকালে, সর্ব্বজন মাননীয় এই ফারমানে প্রচারিত হইল, যে সুবা বাঙ্গালার অন্তঃর্গত ভূষণা জমিদারী বিমজ্জিম তপশীল বেশী জমা ও পেস্কস প্রদান স্বীকারে, রামজীবনকে প্রদত্ত হইতেছে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দীগণের কর্ত্তব্য, যে তাঁহারা এই রামজীবনকে উক্ত ভূষণার জমিদার জানিয়া তাঁহার উপর এতৎসম্বন্ধীয় কার্য্যভার ন্যস্ত আছে এইরূপ বিবেচনা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রতিবর্ষে নূতন সনন্দ তলপ করা না হয়। উক্ত রামজীবনের উচিত যে এই এলাকার প্রজা অধিবাসী ও পথিকগণের হিত চেষ্টা করিয়া, দরিদ্রগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া, তাহাদিগকে বজায় রাখিয়া, সচ্চরিত্রতার সহিত নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। প্রজাবর্গ যাহাতে উত্তমরূপে চাষাদি দ্বারা স্বচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে এবং যাহাতে রাজকর বর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন ও আদায় ক্ষেত্রে জুলুম না করেন। ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইলে, নির্দ্ধারিত রাজকর অপেক্ষা বেশী জমা পেস্কসরূপে কিস্তি কিস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন।

(এই সনন্দের পৃষ্ঠে ইয়াদ্‌দস্তে অন্যান্য কথার সহিত লিখিত আছে, যে সুবা বাঙ্গালার নাজিম নবাব জাফর খাঁ নসিরির (মুরশীদকুলী খাঁ) রোবকারী অনুসারে দৃষ্ট হয়, নিম্নের তপশীলে লিখিত ভূষণার খারিজা জমিদারী জমা বৃদ্ধি ও নজরানা স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইয়াছে; তাঁহাকে সনন্দ দিবার হুকুম মঞ্জুর করা গেল। ২৩শে জেলহজ্জ—৫ জুলুস)।

শক, এইরূপে তর্ক=দর্শন=৬, অক্ষি=২, রস—৬, ভূ—১, হইতে ১৬২৬ শক এবং বাণ ৫ নয়ন—২, অঙ্গ—৬, চন্দ্র—১ হইতে ১৬২৫ শক দৃষ্ট হয় (Westland's Jessore and Bengal Monuments—কালীপ্রসন্নবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ৭৭ পৃঃ)।

সীতারামের পরিণাম সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহাই সংকলিত করিয়া দেখাইলাম। উদয়নারায়ণের বিদ্রোহের সহিত কলিকাতার কোন সম্বন্ধ নাই, এজন্য তাহা বিবৃত না করিয়া—নবাব মুরশীদকুলী খাঁর স্মৃতিচিহ্ন ও রাজস্ব-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়া, বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কাঠরার মসজেদ মুরশীদকুলী খাঁর প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। এখনও এ মসজেদ ভগ্নাবস্থায় মুরশীদাবাদে বর্ত্তমান। মসজেদ সংলগ্ন প্রস্তর-ফলক হইতে প্রমাণ হয়, ১১০৭ হিজরী বা ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইরূপ জনপ্রবাদ, যে ইহা মুসলমানের পবিত্র তীর্থ মক্কাধামের মসজেদের অনুকরণে নির্ম্মিত। এই মসজেদের পূর্ব্ব পার্শ্বে, প্রবেশ দ্বারের সিঁড়ির নীচে মুরশীদকুলী খাঁর দেহ সমাহিত। এই মসজেদ সমচতুরস্র আকারে নির্ম্মিত। এক সময়ে প্রকাণ্ড সিংহদ্বার ও তদুপরিস্থ দ্বিতল গৃহ, নহবৎখানা, ও প্রহরী-গণের বাসস্থান প্রভৃতি শোভিত হইয়া, ইহা এক দর্শনীয় পদার্থরূপে মুরশীদাবাদের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। এখন ইহা কাল-হস্তে ধীরে ধীরে বিচূর্ণীত হইয়া, ধ্বংশ পথে অগ্রসর হইতেছে। নবাব মুরশীদকুলী খাঁর এই কাঠরা-মসজিদের অনুকরণে, নবাব সরফরাজ খাঁও একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

মুরশীদকুলী খাঁর "চেহেলসতুন" দরবার, একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাসৌধ। চল্লিশটী স্তম্ভশোভিত ছিল বলিয়াই, ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। মুরশীদাবাদ চকবাজারের পশ্চিমে, যেখানে মণিবেগমের বিখ্যাত মসজেদটী আছে—সেই স্থানেই দরবার-গৃহ ছিল। এই দরবারে প্রবেশ করিতে, বাঙ্গালার অনেক ভূস্বামীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, যে সময়ে বঙ্গের দেওয়ানী গ্রহণ করেন—সেই সময়ে ইহার অবস্থা বোধ হয়, অনেকটা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ এই দরবারেই বার্ষিক শুভ-পুণ্যাহের অনুষ্ঠান হইত। কিন্তু ঐ সময়ে চেহেল-সতুন—দরবার, পুণ্যাহের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, মতিঝিলেই পুণ্যাহ-অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই চেহেল-সতুন দরবার-গৃহেই বাঙ্গালার ইতিহাস বিশ্রুত মসনদ বা প্রস্তর-সিংহাসন স্থাপিত হয়। নবাব মুরশীদকুলী, ঢাকা হইতে ইহা মুরশীদাবাদে আনেন। এই ইতিহাস-বিশ্রুত মসনদ, সম্রাট, সাহজাহানের পুত্র সাহসুজার আমলে নির্ম্মিত হয়। ঢাকা, রাজমহল, মুরশীদাবাদ প্রভৃতি তিনটী রাজধানীতে থাকিয়া এবং তাহাদের ধ্বংস সাধন দেখিয়া, এখনও

এই সিংহাসন মুরশীদাবাদে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত। এই কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত আর একটী মসনদ আগরা-দুর্গে মোগল-সম্রাটদের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হয়। এখন আগরা ও বাঙ্গালার বাদসাহী ও নবাবী, প্রস্তর-মসনদের একইরূপ শোচনীয় অবস্থা।*

মুরশীদকুলীর দ্বিতীয় স্মৃতিচিহ্ন সুবিখ্যাত "জাহান-কোষা" তোপ। "জাহান-কোষা" শব্দের অর্থ "জগজ্জয়ী"। এখনও এই সুবৃহৎ তোপ দুইটী অশ্বত্থ-তরুর কাণ্ডদেশে স্থায়ীভাবে সংলগ্ন হইয়া, এক অদ্ভুত দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে। এই কামানটী দৈর্ঘ্যে বার হাত ও প্রস্থে সাড়ে তিন হাত। এই তোপে সাতখানি পিত্তল-ফলক মারা ছিল। এই সমস্ত পিত্তল-ফলকে, সম্রাট শাহজাহান ও তাঁহার সময়ের বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁ এবং এই তোপেরও যশকীর্ত্তন লিখিত আছে। একখানি ফলক হইতে প্রমাণিত হয়—এই "জাহান-কোষা" তোপ জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) দারোগা সের মহম্মদের ও পরিদর্শক হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে, প্রধান কর্ম্মকার জনার্দ্দন দ্বারা ১০৪৭ হিজরা (১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইল। ইহার ওজন ২১২ মণ ও অগ্নি সংযোগ করিতে ২৮ সের বারুদের প্রয়োজন হয়।" ইহা ভিন্ন "বাদসা-ওয়ালী" বলিয়া আর একটী সুবৃহৎ তোপও মুরশীদাবাদ কেল্লায় দেখা যায়। ইহার মুখের ব্যাস প্রায় দুই হাত।

এই দুইটী তোপ ও মুরশীদাবাদের শেলেখানায় রক্ষিত সেকালের পুরাণো অস্ত্রশস্ত্রাদি হইতে প্রমাণিত হয়, বাঙ্গালী কারিকরের দ্বারা এই বাঙ্গালা দেশেই এইরূপ প্রকাণ্ড তোপ ও অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত।

পূর্ব্বে আমরা নবাবের আমলের একখানি সনন্দ উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহা হইতে প্রমাণ হয়, জমিদারগণ এই সমস্ত বাদসাহী সনন্দদ্বারা নানারূপ স্বত্বে আবদ্ধ থাকিতেন। এইরূপ বাদসাহী সনন্দদান-প্রথা, জাহাঙ্গীর বাদসাহের আমল হইতেই প্রচলিত হয়। কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদি পুরুষ ভবানন্দ, রাজা মানসিংহের নিকট এইরূপ সনন্দ লাভ করেন। এই সমস্ত জমিদারী-সনন্দ হইতে জানা যায়, জমিদারেরা প্রজা পালন করিতে বাধ্য ও অযথা প্রজা-পীড়ন করিতে পারিতেন না। ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি

* এই প্রস্তরখণ্ডে লোহের ভাগ বিদ্যমান থাকায়, কয়েকটী লাল দাগ পড়িয়াছে—এবং ইহা শীতল হইলে—বাষ্প জমিয়া এত অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, যে পার্শ্বদেশে গড়াইয়া পড়ে। সাধারণ জনপ্রবাদ, যে বঙ্গীয় নবাবগণের দুঃখে, প্রস্তর সিংহাসনের বুক ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইয়াছে। এবং সেই শোকে এখনও ইহা সময়ে সময়ে নীরবে দরদরিত ধারায় বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। লর্ড কর্জ্জনের চেষ্টায় এই 'মসনদ' ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। (কালীপ্রসন্ন বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস—৫১৯ পৃঃ)।

সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সরকারের প্রাপ্য রাজকর যথাসময়ে দাখিল করিতে হইবে। এই সমস্ত সনন্দে যাহাতে প্রজাদের উপর অপরে কোনরূপ অত্যাচার না করে, প্রত্যেক জমিদারের দখলী জমিদারীর মধ্যে পথঘাটের উন্নতি হয়, এরূপ ব্যবস্থাও থাকিত। জমিদারেরা এই সনন্দ-প্রাপ্তির সময়ে সরকারের নিকট এই সমস্ত স্বত্ব পালন করিবার জন্য মুচ্‌লেখা লিখিয়া দিতেন। রাজার হস্তে জমিদারীর স্বত্ব উৎখাত করিবার ক্ষমতা থাকিলেও, অনেক স্থলে উত্তরাধিকার সূত্রের ব্যতিক্রম করা হইত না। জমিদার যদি বিদ্রোহী হইতেন বা রাজস্বদানে অপারক হইতেন, তাহা হইলেই তাঁহার জমিদারী কাড়িয়া লইয়া অপরকে দেওয়া হইত। সেকালে জমিদারেরা জমিদারী-দান ও বিক্রয়ের স্বত্বের অধিকারী ছিলেন। তবে এরূপ বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার সময়, সুবেদারের সম্মতি লইতে হইত।

নবাবী-আমলে প্রজার জমির উপর কিরূপ স্বত্ব ছিল, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। নবাবী-আমলে, খোদকস্ত ও পাইকস্ত বলিয়া দুইটী প্রধান শ্রেণীর রাইয়ৎ ছিল। খোদকস্তগণ স্থায়ী রাইয়ৎ। ইহারা পুরুষানুক্রমে পৈতৃক-ভিটায় বাস করিত ও জমা লওয়া জমীতে পুরুষানুক্রমে চাষ করিত। পাইকস্তেরা ভিন্ন গ্রামবাসী রাইয়ৎ। ইহাদের জমীর উপর কায়েমী-স্বত্ব ছিল না। তবে তাহারা জমী জমা করিয়া লইয়া চাষ-আবাদ করিত। ইহাদের অধীন থাকিয়া যাহারা চাষ ও আবাদ করিত তাহারা কোরফা প্রজা বলিয়া উল্লিখিত হইত।

প্রজারা যাহাতে তাহাদের জমা-জমীর চাষ আবাদ কার্য্যে মনোযোগী হয়, তৎসম্বন্ধে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের খুব কড়া হুকুম ছিল। ঔরঙ্গজেব প্রদত্ত ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দের এক পরোয়ানা হইতে দেখা যায়, বাদসাহ রাজস্ব আদায়কারী তহশীলদারদিগকে আদেশ করিতেছেন—"তাহারা বৎসরের প্রারম্ভে কৃষকগণের অবস্থা যথাসাধ্য জ্ঞাত হইবে। প্রজারা রীতিমত চাষ আবাদ করিতেছে কি অবহেলা করিতেছে, তৎপ্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। পরিশ্রমী কৃষকদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। কিন্তু যাহারা উপায় স্বত্বেও আবাদে অবহেলা করিতেছে, তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে, ভয় দেখাইবে বল প্রয়োগ করিবে ও বেত মারিবে। "ডাক্তার হণ্টার বলেন—জমীদার ও আমিলগণ এবং ইজারাদারগণ স্থায়ী প্রজাকে বাধ্য করিয়া জমী আবাদ করাইতে সক্ষম ছিলেন। প্রজাগণকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা, বন্দীভাবে

মাথা, বিদ্রোহভাবযুক্ত গ্রামসমূহে ফৌজ নিযুক্ত করা ও পলাতক প্রজাদের বাকী-খাজনা, অবশিষ্ট স্থায়ী প্রজাগণের নিকট আদায় করা প্রভৃতি প্রথা সেকালে প্রচলিত ছিল।

প্রজাগণ জমা ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও জমীদারের নিকট জমী লাভ করিত। হিন্দু জমীদারেরা ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিতেন, দেবতা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবোত্তর করিয়া দিতেন। মুসলমানগণকেও তাঁহারা জমী দান করিতেন। আবার মুসলমানেরাও হিন্দুদের জমী দান করিতেন। এই সমস্ত কারণে, বঙ্গদেশে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি জমীর সংখ্যা বেশী হইয়া উঠে।

মোগলরাজত্বে সোণার বঙ্গদেশ "জিন্নেৎ-উল-বেলাৎ" বা স্বর্গভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইত। প্রসিদ্ধ ফরাসি-পর্য্যটক বার্ণিয়ার সাহেব সাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলে এদেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"মিশর দেশই চিরকাল অতি উর্ব্বর ও শস্যশালিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ—কিন্তু আমি দুইবার বাঙ্গালায় গিয়া যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বঙ্গদেশই উর্ব্বরতা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ দেশ। এখানে তণ্ডুল এত উৎপন্ন হয়, যে নিকটবর্ত্তী প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়াও অনেক দূরবর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসিগণ বাঙ্গালার অন্নে প্রতিপালিত হয়। সমস্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে এমন কি, আরব, মিসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশেও বাঙ্গালার শস্য প্রেরিত হয়। নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ও মিষ্টান্নের জন্য, বাঙ্গালা দেশ চিরপ্রসিদ্ধ। এখানকার লোকে অন্নভোজী বলিয়া, গমের চাষ খুব কম হয়। চাউল, ঘৃত ও নানা প্রকার তরকারী এখানে অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। টাকায় কুড়িটার উপর উৎকৃষ্ট পক্ষী পাওয়া যায়। ছাগ ও মেষ এদেশে প্রচুর। শূকর এতই প্রচুর, যে পর্ত্তুগীজেরা এই মাংস খাইয়া প্রাণ-ধারণ করে। এখানে নানা শ্রেণীর মৎস্য অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। এক কথায় লোকের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যে বঙ্গদেশ-পরিপূর্ণ। এই জন্যই পর্ত্তুগীজেরা এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছে।"

বার্ণিয়ারের এই বর্ণনার পর, আমরা ঔরঙ্গজেবের আমলেও বঙ্গের উন্নত অবস্থার কথা জানিতে পারি। সায়েস্তা খাঁর "ধানের-গোলা" প্রবাদ কথা নহে। তাঁহার আমলে টাকায় আট মণ চাউল বিকাইত। সায়েস্তা খাঁ ঢাকায় এই গোলা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তোরণের শিরোদেশে লিখিয়া দেন—"যে শাসনকর্ত্তার শাসনকালে এইরূপ সুলভ মূল্যে চাউল পাওয়া না

যাইবে—তিনি যেন আমার গোলার দরজা না খুলেন।" * নবাব সায়েস্তা খাঁর বহু পরে, নবাব মুরশীদকুলী খাঁর আমলেও, টাকায় পাঁচ ছয় মণ চাউল বিকাইত। চাউল সস্তা থাকিলেই অন্যান্য দ্রব্য সুলভ হইবে। এই জন্যই রিয়াজের গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন—"নবাবের আমলে মাসে এক টাকা আয় হইলে একজন লোক দুবেলা উদরপূর্ণ করিয়া পোলাও-কালিয়া খাইতে পারিত। দরিদ্র ফকিরগণ এই সস্তা গণ্ডার দিনে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইত।"

নবাব মুরশীদকুলী যাহাতে দেশের শস্য-রক্ষা হয়, প্রজাগণ কষ্ট না পায়, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হয়—তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার আমলে কোন আড়তদার ও ব্যবসায়ী, শস্যাদি একচেটিয়া করিতে পারিত না। তাঁহার নিযুক্ত গোয়েন্দাগণ নানাস্থানের হাটে-বাজারে ঘুরিয়া, শস্যের দর সংগ্রহ করিত। যখন তিনি ব্যবসায়ীদের পক্ষে কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার দেখিতেন, তখনই তাহাদের যথেষ্ট শাস্তি দিতেন। যদি সহরে বা নগরে, শস্যের আমদানী কম হইয়া পড়িত, তাহাহইলে তিনি সুদূর মফঃস্বলে যে সকল স্থানে অন্যায়রূপে শস্য আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই সকল স্থানে সিপাহী ও রাজকর্ম্মচারী পাঠাইয়া, জবরদস্তিতে সেই সমস্ত ব্যবসায়ীকে বাজার দর অনুসারে শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেন। এই সময়ে মুরশীদাবাদে টাকায় চারি মণ চাউল বিক্রয় হইত। সুতরাং অন্যান্য জিনিসের দামও এই হিসাবে অনেক কম ছিল। চাউল যাহাতে অন্যায়রূপে রপ্তানী না হয়, সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।†

নবাবগণের শাসনকালে রাজতন্ত্র ও রাজস্ব-বিভাগ কিরূপ ভাবে পরি-

* মুরশীদকুলী খাঁর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁর আমলে ঢাকায় যশোবন্ত রায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে ধান চাল খুব সস্তা হইয়াছিল। এ সময়েও প্রতি টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইত। এই জন্য তিনি নবাব সায়েস্তা খাঁর ধানের গোলার দ্বার খুলিয়াছিলেন।

† He always provided against the famine; and severely prohibited all monopolies of grain. He constantly made private enquires concerning the market price of grain, and whence he discovered any imposition the offenders suffered the most exemplary punishment. If the importation of grain to the city and towns fell short of what had been usual, he sent officers into the country, who broke open the hoards of individuals and compelled them to carry their grains to the public market. Rice was then commonly sold at Murshidabad at four maunds for a rupee, and the prices of other provisions were in proportion.

(Vide Stwart's Bengal. P. 407. (1813).

চালিত হইত—তাহা জানিবার জন্য, পাঠকের একটা কৌতুহল হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে—"নবাবী আমলের কার্য্যবিভাগ" প্রসঙ্গে, একটী অনুসন্ধিৎসাময় বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। যাঁহারা এ সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে পারেন। আমরা নিম্নে কেবল ইহার একটী সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিতেছি।

মন্ত্রীবর্গ।

(১) দেওয়ান-ই-আলা (প্রধান মন্ত্রী) (Prime Minister).

(২) দেওয়ান-খাল্‌সা-শরিফা (Finance Minister).

(৩) দেওয়ান-ই-তন্ (তন্‌খা-দেওয়ান) (Pay Master General)

(৪) দেওয়ান-ই-বেয়ুতাৎ (Minister of Domestic affairs or Home Secretary).

(৫) দেওয়ান-খান্ খানান্ (Lord High Steward).

বিচার বিভাগ।

(১) কাজি-উল্-কোজাৎ (প্রধান কাজী) (Chief Justice).

(২) মুফ্‌তী (মহম্মদীয় আইনের ব্যাখ্যাকারক) হিন্দুশাস্ত্র ঘটিত ব্যাপারের জন্য প্রধান প্রধান বিচারালয়ে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন।

(৩) দারোগা-ই-আদালৎ (Registrar).

(৪) মোহতসীব (মদ্যপায়ী প্রভৃতি কুপথগামীর বিচারক। এবং ওজন প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক)। (Town Magistrate).

সামরিক বিভাগ।

(১) মীর বক্সী কুল বা সেপাসালার আজম্ (Commander in Chief).

(২) বক্সী, ডুয়েম্, সুয়েম্, চাহারাম প্রভৃতি।

(৩) বক্সী আহাদিয়ান (Commander Royal Guards).

(৪) বক্সী সাগের্দ্দ পেসী (চোপদার—প্রভৃতির অধিনায়ক)।

(৫) বক্সী সুবাজাত (প্রাদেশিক নায়েবসুবার অধীন সেনাপতি)।

(৬) জমাদার—পদাতিক সেনানায়ক।

(৭) হাজারী—পঞ্চশত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত সেনানায়ক।

সেরেস্তার কর্ম্মচারী।

(১) মুস্তৌফী (দেওয়ানী সেরেস্তাদার)
(২) মুস্রেফ্ (সেরেস্তার ইনস্পেক্টার)
(৩) খাস-নবীস (নিজামৎ প্রাইভেট সেক্রেটারী)
(৪) হুজুর নবীস (সনন্দ ফর্ম্মান প্রভৃতির অধ্যক্ষ)
(৫) দারোগা কাছারি (দেওয়ানখানার অধ্যক্ষ)
(৬) দারোগা কারখানাজাৎ ও দারোগা সহরৎ-ই-আম্ (Building Inspector and Inspector of Public Works)
(৭) আমিন্ কাছারি ও আমীন্ সুবাজাৎ।
(৮) করোরিয়ান খাল্সা (রাজস্ববিভাগের প্রধান আদায়কারিগণ)।
(৯) পরগণা-কানুনগো, পেস্কার প্রভৃতি।
(১০) মুন্সী ও মোহরের (নানাপ্রকারের)।

খাজনা খানা।

(১) খাজাঞ্চী খাজনা-জমা ও খাজনা খরচ (দুইজন)।
(২) ফোতাদার (পোদ্দার) মুদ্রা-পরীক্ষক ও তদধীন কর্ম্মচারিগণ।
(৩) তহবিলদার (মণিমাণিক্যাদি বহুমূল্য দ্রব্যের)।

দৌত্য ও সংবাদ-বিভাগ।

(১) এল্চিয়ান (Ambassadors) ও উকীল।
(২) ওয়াকে নবীস (দরবারের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত লেখক)।
(৩) সওয়ানে নেগার্ (সংবাদপত্র লেখক—সরকারী)।

ফৌজদারী ও শান্তিরক্ষা বিভাগ।

(১) ফৌজদার (Magistrate).
(২) থানাদার (কোন কোন নগরে স্থাপিত সহকারী ফৌজদার)।
(৩) কোতোয়াল (বৃহৎ নগরের পুলিসাধ্যক্ষ)।
(৪) দারোগা-ই-দাগ (অপরাধীর সন্ধান ইত্যাদি কার্য্য জন্য) এতদ্ভিন্ন কোতোয়াল প্রভৃতির নিম্নে নিম্নশ্রেণীর অনেক পুলিস কর্ম্মচারী ছিল।

অন্যান্য বিভাগ।

(১) মীর তোজক্ (দরবার, জৌলুস্ প্রভৃতির তত্ত্বাবধারক)।
(২) মীর এমারৎ (এমারৎ বিভাগের অধ্যক্ষ)।

(৩) দারোগা সায়ের (শুল্ক-বিভাগের অধ্যক্ষ)।

সম্রাটের হইয়া প্রদেশ শাসন করিতেন—সুবাদার ও দেওয়ান। সুবাদার প্রায় রাজবংশীয়গণই হইতেন। দেওয়ান, রাজস্ব-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা। সুবাদারকে কিন্তু দেওয়ানের নিকট হইতেই বেতন গ্রহণ করিতে হইত। দেওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারীবর্গ, সম্পূর্ণরূপে এই বাদসাহী-দেওয়ানের অধীন ছিলেন। মুরশীদকুলী খাঁর আমলে, দেওয়ান ও সুবেদার-পদের সমীকরণ হয়। মুরশীদকুলী খাঁ সুবেদার হওয়ায়, দেওয়ানের পদ লোপ পায়, কিন্তু মুরশীদকুলী "খালসা-দেওয়ান" বা রাজস্ব-সচিব বলিয়া একটি নূতন পদ সৃষ্টি করেন। খালসা দেওয়ান, সমগ্র রাজ্যের আয়ব্যয় নির্ব্বাহ ও রাজস্ব-বন্দোবস্ত করিতেন। এতদ্ভিন্ন দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারকের কার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইত। জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি স্বয়ং বা তাঁহার প্রতিনিধি তাহার বিচার করিতেন।

রাজকীয় গুরুতর কার্য্য ব্যতীত, নায়েব-নাজিম অন্যান্য কার্য্য স্বাধীন ভাবেই করিতেন। উড়িষ্যা, ঢাকা ও পাটনা এই তিন স্থানেই নায়েব-নাজিম নিযুক্ত হইত। ঢাকায় নায়েব-নাজিমের ততটা প্রয়োজন ছিল না। যিনি তাঁহার সহকারীরূপে ঢাকায় থাকিতেন, তিনিই সরকারে রাজস্ব পাঠাইয়া দিতেন। নায়েব নাজিমগণ জায়গীর পাইতেন। মুরশীদ-কুলী খাঁ, এই নায়েব-নাজিমের অধীনেই ফৌজদারী-বিভাগ স্থাপিত করিয়া দেন।

ফৌজদারগণ দেশের ম্যাজিষ্ট্রেট্। নবাবী-আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ দশটী ফৌজদারীতে বিভক্ত ছিল। (১) চট্টগ্রাম (ইসলামাবাদ) (২) শ্রীহট্ট (৩) রঙ্গপুর (৪) রাঙ্গামাটী (৫) পুর্ণিয়া (জেলালগড়) (৬) রাজমহল (আকবর নগর) (৭) রাজসাহী (৮) বর্দ্ধমান (৯) মেদিনীপুর (১০) হুগলী (বন্দর বন্দর) এই সকল ফৌজদারীতে একজন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত হইতেন। খাস মুরশীদাবাদ সহরে, একজন অতিরিক্ত ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। এই ভাবে বিহার-প্রদেশেও আটটী ফৌজদারী ছিল। ফৌজদারেরা তাঁহাদের অধীনস্থ প্রদেশসমূহের শান্তিরক্ষা করিতেন। বিদ্রোহী-জমিদার বা প্রজাশাসন, বিভাগের সীমানা-রক্ষা ও আভ্যন্তরিণ শাসন-শৃঙ্খলার ভার ইহাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। এই সমস্ত বিভাগীয় ফৌজদারগণ, মোগল-রাজত্বের উজ্জল দিনে বাদসাহ সরকার হইতেই

নিযুক্ত হইতেন। সম্রাটগণের শক্তি ক্ষীণ হইবার পর, মুরশীদাবাদের নবাবই, ফৌজদার নিয়োগ করিতেন। বাদশাহ-দরবারে, বিভাগীয় ফৌজদারগণের যথেষ্ট সম্মান ছিল। অনেক ফৌজদার, কার্য্য-কুশলতা দেখাইয়া সুবাদারীপদ লাভ করিতেন। ইহাঁদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এক হাজারী হইতে, চারি-হাজারী পর্য্যন্ত মন্সবদার হইতেন। পদমর্য্যাদা অনুসারে তাঁহাদের অধীনে পাঁচশত হইতে এক সহস্র পর্য্যন্ত সৈন্য থাকিত। ইহাই "ফৌজদারী-ফৌজ" নামে বিখ্যাত। ফৌজদারগণ রাজসম্মানের সহিত সাধারণে বাহির হইতেন। পথিমধ্যে গমনকালে—ছত্র, আড়ানী প্রভৃতি সম্মান-সূচক রাজ চিহ্ন, তাঁহারা উপভোগ করিতে পাইতেন। রণবাদ্যও তাঁহাদের শোভা-যাত্রার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত।

যাহাতে দেশের মধ্যে কোনরূপ অশান্তি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপস্থিত না হয়, ফৌজদার তাহার উপায় বিধান করিতেন। তাঁহার এলাকার মধ্যে, যাহাতে কোন জমিদার কোনরূপ দুর্গ-নির্ম্মাণ করিতে না পারেন, অথবা সেনা-সংগ্রহ ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে না পারেন, ফৌজদার সর্ব্বদাই সেদিকে দৃষ্টি রাখিতেন। অবাধ্য ও বিদ্রোহী জমিদারকে বাদসাহী-ফৌজ সহায়ে ধৃত করিয়া, সুবাদারের নিকট পাঠাইতেন। যখন কোন কারণে তাঁহার অতিরিক্ত সেনার প্রয়োজন হইত, সেই সময়ে ফৌজদারীর মধ্যে নিয়োজিত সেনানী ও মন্সবদারগণ তাঁহাদের অধীনস্থ সেনা লইয়া ফৌজদারের সহিত মিলিত হইতেন। আবার সুবেদারের প্রয়োজন সময়েও ফৌজদার তাঁহাকে সেনা-সাহায্য করিতেন। চোর ডাকাত দমনকরা, ফৌজদারের একটা বিশিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল। অনেক সময়ে দলবদ্ধ ডাকাতদের পশ্চাতে সসৈন্যে ধাবমান হইয়া, তিনি তাহাদের ধৃত করিয়া সমূলে উৎপাটন করিতেন। ধরিতে গেলে, ফৌজদারগণই প্রকৃতপক্ষে দেশের শান্তিরক্ষক ছিলেন। যে ফৌজদার কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতেন ও কঠোর নীতি অবলম্বনে দেশ-শাসন করিতেন—তাঁহার আমলে প্রজাগণ অতি নিঃশঙ্কভাবে জীবন যাপন করিত।*

পুলিস-বিভাগও এই ফৌজদারের হাতে ছিল। তাঁহার অধীনে নানাস্থানে শান্তিরক্ষার জন্য "থানা" স্থাপিত হইত। থানাদার ও পুলিস-প্রহরীগণ দেশের অভ্যন্তরিণ শান্তিরক্ষা করিত। প্রধান প্রধান নগর-সমূহে—

* Seir Mutakharin.—PP. 567. to 563.

কোতোয়াল বলিয়া একজন পদস্থ কর্ম্মচারী থাকিতেন। কোতোয়ালের অধীনে, অসংখ্য চৌকীদার থাকিত। এই কোতোয়াল ও চৌকীদারগণ গ্রামের মণ্ডল ও অন্য চৌকীদারগণের সহায়তায়, দেশের শান্তিরক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে—দূরবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে, ফৌজদারের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভারও ন্যস্ত ছিল।

"সদরস্-সদুর" বিচার-বিভাগের আর একটি উচ্চপদ। প্রত্যেক সুবায়, ইহাঁরা বাদসাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইতেন। সদরস্-সদুর, কাজিগণের উপর আধিপত্য করিতেন। কাজিগণের কার্য্যে দৃষ্টি রাখা, মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অপরাধ-সমূহের বিচার করা, পীরোত্তর-সমূহের অধিকারীগণ অধর্ম্মাচারী হইলে, তাহাদিগের নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া, অন্য ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দান করা, মুর্খ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকে কাজীর পদ পাইয়া যাহাতে তাহার অপব্যবহার না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, ইহাঁর কর্ত্তব্য-ভুক্ত ছিল। মোটের উপর, ইনি কাজিদিগের উপর সর্ব্বময়-কর্ত্তা ছিলেন।

"মোহত্সীব" বলিয়া আর এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী, নবাব সরকার হইতে নিযুক্ত হইতেন। ধরিতে গেলে—তাঁহার কার্য্যগুলি, অনেকটা আজ কালকার দিনের মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজের মত ছিল। ইনি বাজারের ব্যবসায়ীদের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। যাহাতে তাহারা দ্রব্যাদির মূল্য অন্যায়রূপে বৃদ্ধি করিতে না পারে, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেন। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিবাদের মীমাংসা এবং মদ্যপায়ী ও দুষ্ট লম্পটগণ যাহাতে প্রকাশ্য স্থানে কোনরূপ অন্যায়াচরণ করিতে না পারে, ইহার প্রতিকারেও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত।

"সওয়ানে-নেগার" বলিয়া আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাঁরা সরকারী সংবাদ-লেখক। সে সময়ে ইহাঁদের লিখিত সংবাদই, সংবাদ-পত্রের কাজ করিত। ইহাঁরা সরকারের বেতনভোগী কর্ম্মচারী। সর্ব্ব বিষয়ে সুবেদার ও দেওয়ানের অধীন। দেশের কোথায় কি হইতেছে, সমস্ত সংবাদই, প্রতিনিধি মুখে সংগৃহীত হইত। ইহাঁরা সেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, নবাব ও বাদসাহের নিকট প্রেরণ করিতেন। ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন—তখন এই "সওয়ানে-নেগারের" সহায়তায়, তিনি সুদূর বঙ্গদেশের ঘটনাসমূহ জানিতে পারিতেন। ইহাঁদের সংগৃহীত সংবাদ সমূহ অশ্বর ডাকে, সওয়ারের মারফৎ প্রেরিত হইত। কোথায় কোন

জমীদার বিদ্রোহী হইল, কোথায় কোন ডাকাতের দল প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, এ সকল সংবাদ তাঁহারা নবাবকে লিখিয়া পাঠাইতেন। নবাব তাহা বাদসাহের নিকট পাঠাইতেন। বেকায়া-নবীস্ বলিয়া আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা কেবল দরবারের ও স্থানীয় ঘটনা-সমূহ লিপিবদ্ধ করিতেন। প্রধান প্রধান সহরের ও নগরের সওয়ানে-নেগারগণের সহিত ইহাঁদের সংবাদ আদান-প্রদান চলিত।

"কানুনগো" পদ, পুরাকালের নবাবী-আমল হইতে, এই ইংরাজ রাজত্বের স্বর্ণময় যুগে আজও বর্ত্তমান। তবে সেকালের কানুনগোর শক্তি-সামর্থ্য ও পদগৌরবের তুলনায়, আধুনিক কানুনগো কিছুই নহেন। আকবর বাদসাহের আমলে, রাজা টোডরমল্ল যখন বঙ্গের রাজস্ব-ব্যবস্থা করেন, তখন কানুনগো-পদের প্রথম সৃষ্টি হয়। টোডরমল, সমগ্র বঙ্গে দশজন কানুনগো নিযুক্ত করেন। কানুনগোগণ জমীর উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, রাজস্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত কাগজ-পত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বাঙ্গালার রাজস্ব-বন্দোবস্ত হয়। একজন প্রধান কানুনগোর উপর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব অর্পিত হয়। ইনিই সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্ব-সংগ্রহ বিভাগের একমাত্র মালিক। সুবাদার ও নবাবগণ এই বিষয়ে কানুনগোর মুখাপেক্ষী ছিলেন। প্রধান কানুনগো, দেশাধিকারী বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। সমগ্র বঙ্গের রাজস্বের জমাবন্দী, তাঁহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইত। প্রধান কানুনগো, সদর রাজস্বের উপর শতকরা আট আনা রুসুম পাইতেন। ঔরঙ্গজেবের কূটনীতি কৌশলে, কানুনগোর এই অসীম ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস হয়। কারণ তাঁহার আমলে—দ্বিতীয় কানুনগো পদের সৃষ্টি হয়। নবাব মুরশীদকুলী খাঁর আমলে—দর্পনারায়ণ প্রধান কানুনগো ছিলেন। জয়নারায়ণ দ্বিতীয় কানুনগোর পদে নিযুক্ত হন। কানুনগোর শক্তি ও ক্ষমতা কিরূপ ছিল, তাহার একটী উদাহরণ দিই। মুরশীদাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর, বর্ষশেষে সরকারী হিসাবপত্র প্রস্তুত হইল। এই হিসাব, সম্রাট সকাশে দাখিল করিতে হইবে। নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, বাঙ্গালার রাজস্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন—তাহা এই সমস্ত কাগজ-পত্র দৃষ্টে জানিতে পারিলে, বাদসাহ তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু প্রথামত কাগজপত্র দরবারে পেশ করিবার পূর্ব্বে, তাহাতে নবাবের নিজের সহী ও প্রধান কানুনগো ও তাঁহার সহকারীর সহী থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে, এই রাজস্ব-কাগজাত সরকারে অগ্রাহ্য হইবে। তখন দর্পনারায়ণ

প্রধান কানুনগো। ঠিক সময়ে দর্পনারায়ণ বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন।* তিনি জানিতেন, তাঁহার সহী না হইলে এই কাগজ-পত্র বাদসাহ-সরকারে গ্রাহ্য হইবে না, একজন্য তিনি তাঁহার ন্যায্য রুসুম বাদে, অতিরিক্ত তিনলক্ষ টাকা নবাবের নিকট দাবী করিয়া বসিলেন। তখন মুরশীদকুলীর অবস্থা এমন ছিল না, যে তিনি তাঁহার অধীনস্থ কানুনগোর এ আবদারটী রক্ষা করিতে পারেন। বাদসাহ-দরবার হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি একলক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করেন—কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। কাজেই নবাব উপায়ান্তর না দেখিয়া, দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণের সহী লইয়াই দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। পাঠক এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবেন, সেকালের প্রধান-কানুনগো কিরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন। কিন্তু মুরশীদকুলী খাঁ, দর্পনারায়ণের কৃত এ অপমান ভুলিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে তিনি তহবিল তছরূপ প্রভৃতি দাবীতে দর্পনারায়ণকে কারারুদ্ধ করেন। কথিত আছে, কারাগারে আহারাভাবে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

নবাব মুরশীদকুলী খাঁর আমলে, হিন্দুগণ রাজ্যের প্রধান পদসমূহ লাভ করিয়াছিলেন। ভূপতি রায়, কিশোর রায়, দর্পনারায়ণ প্রভৃতি তাঁহার আমলে, উচ্চ রাজপদে রাজস্ব-বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন। নাটোরের আদিপুরুষ রঘুনন্দনই তাঁহার আমলে প্রথম খালসা-দেওয়ান ও রায়-রায়ান হন। এতদ্ভিন্ন দিঘাপতিয়া রাজবংশের সুপরিচিত দয়ারাম ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের রঘুরাম, তাঁহার আমলে রাষ্ট্র-বিভাগের কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

মুরশীদকুলী খাঁর আমলে, সাবেক নবাবী আমলের বিচার প্রণালীর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়। অর্থী-প্রত্যর্থীদের বিবাদ মীমাংসার জন্য এবং রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য, তিনি মুরশীদাবাদে চারিটী বিচার-বিভাগ ও এতদাধীন

---

* Murshid Cooly Khan having fixed has residence at Mukksoodabad assembled there all the public officers of his deparment, and at the end of the year having made up his accounts in which was clearly exhibited the great increase he had made to the revenue of the provinces, prepared to set out for the Court in order personally to lay them before the Emperor. On presenting the papers however to the two Canoungoes whose counter-signature was reguisite for their being andited in the imperial exchequer one of them named Dherp Narain refused his signature unless bribed by a present of three lacs of rupees.

Stewart's History of Bengal. (Edition 1813.)

বিচারালয়-সমূহ স্থাপন করেন। নিজামত-আদালত, মহকুমা দেওয়ানী-আদালত, মহকুমে-কাজী (কাজীর আদালত) ও আদালত ফৌজদারী এই চারিটী বিচার-কেন্দ্রেই সাধারণের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমার বিচার হইত।

নবাবী-আমলের যে সমস্ত কথা, পাঠকের চিত্তরঞ্জক হইতে পারে, আমরা তাহা নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া, এস্থলে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। এইবার আমরা পুনরায় প্রাচীন কলিকাতার কথা আরম্ভ করিব।
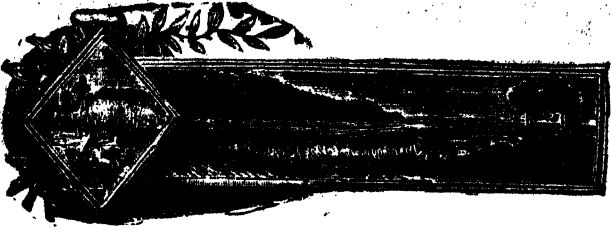
ষোড়শ অধ্যায়।

কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ—ইংরাজদের দেশীয় প্রজার প্রতি সদ্ব্যবহার —কোম্পানী বাহাদুরের প্রথম জমীদারী, সুতালুটী প্রভৃতি গ্রামত্রয়—জমীদারীর উন্নতির সহিত কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি—কালেক্টার পদের প্রথম সৃষ্টি—প্রথম কালেক্টার রালফ্ শেলডন্—কালেক্টারের কর্ত্তব্য—মুরশীদকুলি খাঁর আমলে বড়বাজার, কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও জমী সমূহের পরিচয়—কলিকাতায় ধানজমী, তুলার চাষ, তামাকের চাষ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য—১৭০৬ সালের প্রথম জরিপ—প্রজাই-পাট্টার প্রথম সৃষ্টি—একখানি পলাশী—আমলের পাট্টার বাঙ্গলা প্রতিলিপি—কোম্পানী বাহাদুরের জমীদারী সেরেস্তা—ব্লাক কালেক্টার বা জমীদার—বাঙ্গালী কালেক্টার নন্দরাম—ব্লাক-জমীদার বা কালেক্টার গোবিন্দরাম মিত্র—পলাশী আমলের কালেক্টার হলওয়েল সাহেব—ইংরাজদের প্রথম আদালত্ মেয়র-কোর্ট—সকালে বিচার কার্য্য-নির্ব্বাহ ব্যবস্থা—নবাব মুরশীদকুলীখাঁর আমলে প্রাচীন কলিকাতা—মিউনিসিপাল ও স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত—যত্র তত্র জঙ্গল কাটাইয়া বাড়ীঘর নির্ম্মাণ—জরিমানার টাকা হইতে রাস্তা ঘাট ও নালা-নর্দ্দমার উন্নতি—প্রাচীন কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—১৭০৬ হইতে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ হইতে কলিকাতার বাড়ী ঘর রাস্তা-গলি ও পুষ্করিণী প্রভৃতির সংখ্যা।

নবাবী আমলের প্রাচীন কলিকাতা।

মুরশীদকুলী খাঁর প্রতিযোগিতা স্বত্ত্বেও, তাঁহার আমলেই কলিকাতার যথেষ্ট উন্নতি হয়। কলিকাতার এ উন্নতির প্রধান কারণ, ফোর্ট-উইলিয়াম। তখন লোকে ব্যবসা ও কৃষিকার্য্যকেই জীবনের উন্নতির প্রধান কারণ-স্বরূপ বিবেচনা করিত। চাকরীর জন্য লোকে-কম লোলুপ হইত। দেশের লোকে যখন বুঝিল—ইংরাজেরা অতি শক্তিমান জাতি, তাঁহারা নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও পিছপাও নহেন, বিপদের সময় বিপন্ন-দিগকে রক্ষা করিতে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত, আর তাঁহাদের সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে যথেষ্ট লাভ, তখন অনেকে কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আশ্রয় লইল। কেবল বাঙ্গালী নহে, আরমানী, দিনেমার, ডচ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি অনেকেই ইংরাজদের কলিকাতায় আশ্রয় লইয়া বসবাস

ও ব্যবসা করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে লাগিল। ইংরাজদের প্রধান গুণ এই, তাঁহারা পাওনাদারদের কখনও ফাঁকি দিতেন না—তাহাদের সহিত সর্ব্বতোভাবে সদ্ব্যবহার করিতেন। নবাব যদি কোন বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার করিতেন, ইংরাজেরা প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন।

এই সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যবসায়েরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ইংরাজ-কোম্পানী—কলিকাতা, সুতালুটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি তিনখানি গ্রামের জমীদারী-স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাহা প্রজা-বিলি করিলেন। এই প্রজা-বিলির হার প্রতি বিঘা তিন টাকা। পরে আমরা কোম্পানীর জমীদারী সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। তাহা হইতেই পাঠক নবাবী আমলে কলিকাতার অবস্থা অনেকটা জানিতে পারিবেন।

ওয়েল্‌ডন যে সময়ে কলিকাতায় আসেন—সেই সময়ে কলিকাতার জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার কলিকাতায় পৌছিবার সময়ে এত জনতা হয়, যে তাঁহাকে সে জনতা ঠেলিয়া অনেক কষ্টে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, কলিকাতা ধীরে ধীরে অধিবাসীপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

কোম্পানী, সাহজাদা আজিমওশ্বানের সনন্দের বলে, যখন ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা সুতালুটী ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়ের জমিদারী লাভ করেন, সেই সময়ে সাধারণের চক্ষে, তাঁহাদের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইল। ইংরাজেরা প্রকৃতপক্ষে এই তিনখানি গ্রামের জমিদার হইলেন। এই জমিদারীর বলে—তাঁহারা তাঁহাদের অধীনস্থ গ্রামত্রয়ের খাজনা আদায়, প্রজা-বিলি, কুত-আদায়, জমীর কর-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি কার্য্যে সক্ষম হইলেন। এই গ্রামত্রয়ের জমীগুলি, তাঁহারা জমীদারের ন্যায় পাট্টা-কবুলতি দ্বারা বিলি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কলিকাতায় একজন কলেক্টার নিযুক্ত হন। কলেক্টার তাঁহার অধীনস্থ স্থানসমূহে প্রজাদের জমী-বিলি করিতেন, তাহার খাজনা আদায় করিতেন, তৎপরে শতকরা দশ টাকা হিসাবে, কমিশন কাটিয়া লইয়া, বাকী টাকা বাদসাহী খাজনার জন্য কোম্পানীর তহবিলে প্রেরণ করিতেন। রাজ-সরকারে কোম্পানীকে প্রতি বৎসরে বারশত টাকা খাজনা দিতে হইত। এই গ্রামত্রয়ের আভ্যন্তরিণ শাসন, জমী-বিলি ও উন্নতি সাধন, সর্ব্ববিধ ভারই তাঁহাদের হস্তে ছিল।

এই সময়ে একজন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার উপর

কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামত্রয়ের খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হইল। রালফ্ শেল্‌ডন নামে একব্যক্তি এই পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনিই কলিকাতার প্রথম কালেক্টার বা জমীদার।* কালেক্টার—তাঁহার অধীনস্থ গ্রামত্রয়ের খাজনা আদায় করিয়া তাহা বাদসাহী খাজনাখানায় পাঠাইয়া দিতেন। ধরিতে গেলে, কোম্পানী এই সময়ে কর-সংগ্রাহক ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না।

কোন্ মহলে কত টাকা খাজনা আদায় হইত, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে জানিতে পারা যাইবে।†

ডিহি কলিকাতা	৪৬৮॥/১৫
সুতালুটী	৫০১৸৶১০
গোবিন্দপুর (পাইকান পরগণার অংশে) ...	১২৩৸৶৫
কলিকাতা	১০০।/১৫
মোট	১১৯৪৸৵৫

কলিকাতার প্রথম কলেক্টার রালফ্ শেল্‌ডন ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে নিযুক্ত হন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত এই দুইশত তের বৎসরকাল ধরিয়া, ধারাবাহিক নিয়মে কলিকাতায়, একজন কলেক্টার নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ১৭০৪ হইতে ১৭১০ অব্দ পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরে আটজন কলেক্টার নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। ১৭১০ খৃঃ অব্দে প্রেসিডেণ্ট ওয়েন্টডন কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সময়ে জন ক্যালভার্ট কলিকাতার কলেক্টার নিযুক্ত হন।

ভাগীরথী-তীর হইতে ধাপা (Salt Lake) একদিকে ও অন্যদিকে গোবিন্দপুর হইতে সুতালুটী পর্য্যন্ত যে স্থানগুলি কোম্পানীর দখলে ছিল তাঁহারা ইহার প্রজা-বিলি করিতেন। এই জমীর পরিমাণ ৫০৭৭ বিঘা। আজ যে জাতি সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তাঁহাদের এই জঙ্গল ও বাদাপূর্ণ পাঁচহাজার বিঘা ভূমি লইয়া জমীদারী পত্তন করিতে হইয়াছিল।

কলেক্টারের প্রথম কাজ—তিনি এই সমগ্র জমী-পরিমাণের মধ্যে, যাহা প্রজা-বিলি হইয়াছিল, তাহার খাজনা আদায় করিতেন। জমীর খাজনাই

* Bruce's Annals. III 172.

† Hamilton's East Indies 1727. As per Izzat Khan Dewan's Perwana dated 2 Shaban. (British Museum Additional Mss quoted by Mr. Roy.)

কোম্পানীর প্রধান আয় ছিল। স্থান বিশেষে, ভূমির অবস্থানুসারে তাঁহারা খাজনা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। কিন্তু তিন টাকার উর্দ্ধে, তাঁহারা জমীর জমা-বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না। জমীর খাজনা ব্যতীত, বাজারের আয়, টোল ও কুতঘাটার আয়, জরিমানা প্রভৃতি দ্বারাও তাঁহাদের জমীদারীর আয় হইত। এই জমীদারীর আয়ব্যয়ের কয়েকটী তালিকা, অতি পুরাতন রেকর্ড হইতে উদ্ধৃত হইয়া, পাঠকবর্গের গোচরার্থে যথাস্থানে প্রকাশিত হইল।

কলেক্টার সাহেব, আদায়ী খাজনা ও অন্যান্য আয়ের হিসাব, প্রতিমাসে কৌন্সিলে দাখিল করিতেন। আজ পর্য্যন্ত কোম্পানীর পুরাতন বহিতে, এ হিসাবগুলি সযত্নে রক্ষিত। এই হিসাবগুলি হইতে জানিতে পারা যায়, কিরূপে ধীরে ধীরে কোম্পানীর জমীদারির আয় বৃদ্ধি হইতেছিল। ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে, জমা ও খরচের জের কাটিয়া, মুনফার ভাগে ৪৮০৲ টাকা মাত্র ছিল। ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ চারি বৎসর পরে, ইহা হাজার টাকার উপর দাঁড়ায়। ১৭০৯ খ্রীঃ অব্দে ইহা তেরশত টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। হলওয়েলের আমলে এবং পরবর্ত্তীকালে ইহা তিন সহস্র মুদ্রায় পরিণত হয়।*

কোম্পানীর জমীদারীর এই আয়-বৃদ্ধি হইতে প্রমাণ হয়, প্রতি বৎসরেই কলিকাতা ধীরে ধীরে জনপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। লোক বসতির পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত, ইহার আয়ও বৃদ্ধি হইতেছিল। এই হিসাব হইতে জানিতে পারা যায়, ১৭০৩ হইতে ১৭০৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, এই পাঁচ বৎসরে কলিকাতার অধিবাসী সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। ইহার পরবর্ত্তী ৪০ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার লোক-সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সুতানুটী অঞ্চলে অর্থাৎ বর্ত্তমান বড়বাজারের দিকে লোক সংখ্যা কিছু বেশী ছিল। দেশীয় অধিবাসীরা, এই সময়ে জাহ্নবী-তীরবর্ত্তী এই সুতানুটীতে জমী জমা করিয়া লয়েন। সুতানুটীর প্রান্তবর্ত্তী ঘাটসমূহে, দেশীয় নৌকাগুলি তাহাদের মাল-পত্র নামাইত। আজকাল বড়বাজারে যে স্থানে নক্করেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত, ইহার নিকটেই দেশীয় ব্যবসায়ীদের মাল-পত্র নামাইবার একটী ঘাট ছিল। মহাজনেরা এই ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া, সর্ব্বপ্রথমে নক্করেশ্বর শিবের পূজা করিতেন। ইংরাজদের প্রথম আমলে এই বড়বাজার, 'গ্রেট্-বাজার' (Great-Bazar) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নবাব মুরশীদকুলী

* Holwel's Tracts (3rd Edition) 1774. P. 241.

খাঁর আমলে ও রোটেসান গবর্ণমেণ্টের সময়ে, বড়বাজারের দিকে দেশীয় অধিবাসীর সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

দুইজন সমসাময়িক লেখক সেই প্রাচীন কলিকাতার জন-সংখ্যা ও অধিবাসী সম্বন্ধে নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের প্রথম হামিলটান—দ্বিতীয় স্বনামখ্যাত হলওয়েল। এই হামিলটান একজন গুপ্ত ব্যবসায়ী। কাজেই কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের উপর তিনি বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। রোটেসান-গবর্ণমেণ্টের আমলে, কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি কলিকাতায় ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে হলওয়েল—কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুর এই গ্রামত্রয়ের এবং পার্শ্ববর্ত্তী ৩৮ খানি গ্রামের জমীদার ছিলেন। কোম্পানীর আমলে, তাঁহাদের অধিকৃত বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার ও সহরের সুবন্দোবস্তের জন্য "জমীদার" বলিয়া একজন কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইতেন। এই সাহেব-জমীদারের একজন আবার এদেশীয় সহকারী ছিল। তিনি "ব্লাক-জমীদার" বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। কুমারটুলীর মিত্র-বংশের গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় কলিকাতার "ব্ল্যাক-জমীদার" ছিলেন। এই গোবিন্দরামের লাঠির ভয়ে, চোর-ডাকাতেরা থরহরি কাঁপিত। "গোবিন্দরামের ছড়ী বা লাঠি", প্রাচীন কলিকাতার একটী নামজাদা জিনিস। পরে আমরা এই গোবিন্দরাম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিব।

হলওয়েল, পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত, কলিকাতার লোক সংখ্যা ও আয়-ব্যয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন। হামিলটানও সমসাময়িক। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, এই সময়ে কলিকাতার জন-সংখ্যা "দশ হইতে বার হাজার পর্য্যন্ত ছিল।" তিনি কোন্ বৎসরের কথা বলিতেছেন, তাহার নির্দ্দেশ না থাকিলেও, সম্ভবতঃ ১৭০৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় যে জরীপ হয়, তিনি তাহার উপর নির্ভর করিয়াই বোধ হয় ঐ কথা বলিয়াছেন। হলওয়েল সাহেব, কলিকাতার একজন খুব নামজাদা কালেক্টার। তিনি কলিকাতার বাহ্যিক উন্নতি সম্বন্ধে, অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন ও কলিকাতার ভিতরের অবস্থারও অনেক খবর রাখিতেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতায় একটী সার্ভে বা জরীপ করান। ইহার উপর নির্ভর করিয়া, তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"১৭৫২ খৃঃ অব্দে কলিকাতার জন-সংখ্যা চারি লক্ষ নয় হাজার ছিল। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে, হামিলটানের সময় হইতে ৪৬ কি ৪৭ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার জন-সংখ্যা এইরূপ অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন কলিকাতার জমিদার জে. জেড. হলওয়েল।

১৭০৬ খ্রীঃ অব্দের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি, খাস কলিকাতা গ্রামে তখন ২৪৮ বিঘা জমীর উপর লোকের বসবাস ছিল। আরও ৩৬৪ বিঘার জঙ্গলাদি কাটাইয়া তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইতেছিল। কলিকাতার উত্তরে বড়বাজারের মোট জমীর পরিমাণ এই সময়ে ৪৮৮ বিঘা ছিল। কিন্তু সরকারী কাগজ-পত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে ৪০০ বিঘা জমী ইতিপূর্ব্বেই লোকের বাস্তভিটা ও বাগানে পরিণত হইয়াছে।

হলওয়েলের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়—"জনুনগর ছাড়া (এই জনুনগর মারহাট্টা খাতের বাহিরে ছিল) কোম্পানীর দখলে এই সময়ে ৫২৪৩ বিঘা জমী ছিল। প্রতি বিঘায় ২০ জন করিয়া গড়-পড়তায় অধিবাসী ধরিয়া লইলেই, ইহা হইতেই একলক্ষের উপর লোক দাঁড়ায়। যাহাই হউক না কেন, রোটেসন গবর্ণমেণ্টের সময় হইতে হলওয়েলের সময় পর্য্যন্ত কলিকাতার লোক-সংখ্যা যে যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তখনকার শাসন-কার্য্যের ও রাজস্ব-বন্দোবস্তের সুবিধার জন্য, কোম্পানী কলিকাতাকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বড়বাজার এই চারি ভাগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, বড়বাজারের লোক-সংখ্যা বড় বেশী ছিল। খাস সহর কলিকাতার জমীর পরিমাণ ১৭১৭ বিঘা দশ কাঠা। ১৭০৬ খ্রীঃ অব্দে খাস কলিকাতার মধ্যে ২৪৮ বিঘা ভূমিতে লোকের বসবাস ছিল। বাকী-জমীতে আবাদ হইত, অথবা তাহা জঙ্গলপূর্ণ ও পতিত অবস্থায় ছিল। কলিকাতার উত্তরাংশে সুতালুটীর ভূমির পরিমাণ ১৬৯২ বিঘা। ইহার মধ্যে ১৩৪ বিঘায় লোকের বসবাস ছিল। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই—১৭০৬ খৃঃ অব্দে সাড়ে আট শত বিঘা ভূমিতেই লোকের বাসস্থানাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১৫২৫ বিঘা জমীতে ধান চাষ হইত ও ৪৮৬ বিঘা জমীতে বাগান-বাগিচা ছিল। ২৫০ বিঘা জমী কলাগাছের বাগানে পূর্ণ ছিল। ১৮৭ বিঘাতে তামাক উৎপন্ন হইত। ৩০৭ বিঘা জমী ব্রহ্মোত্তররূপে ব্রাহ্মণ-দের প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৬৭ বিঘা খামার বা পতিত-জমী ছিল। বাকী জমী রাস্তা-ঘাট নালা-নর্দ্দামা ও পুষ্করিণীতে পরিপূর্ণ ছিল। কোন বিভাগের অধীনে কত জমী ছিল তাহার একটী তালিকা পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

	বিঘা	কাঠা
বাজার	৪৮৮	১০
গোবিন্দপুর (Govenpore)	১১৭৮	৭
টাউন কলিকাতা ...	১৭১৭	১০
সুতালুটী (Sootaloota) ...	১৬৯২	১২
মোট	৫০৭৬	১৯

পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, আমরা এই তিনখানি গ্রামের জমীর পরিমাণ ও তাহার বিভাগ কিরূপ ছিল, তাহার একটী বিবরণ ১৭০৬ খ্রীঃ অব্দের জরীপ অনুসারে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই লিখিত তালিকাগুলি আজও ব্রিটিশ-মিউজিয়ামে সুরক্ষিত, ও কোম্পানীর পুরাতন সেরেস্তার মধ্যে বর্ত্তমান। ইহা হইতে পাঠক, বুঝিতে পারিবেন, দুইশত বৎসর আগে এই বর্ত্তমান প্রাসাদ-সৌধময়ী কলিকাতার অবস্থা কিরূপ ছিল।*

ফোর্ট-উইলিয়াম।

জুন ১৭০৭খৃঃ অব্দ।

Account of Ground in Buzzar and Three Towns, as it was measured.

গোবিন্দপুর (GOVENPORE.)

জায়	কোম্পানীর সেরেস্তার বানান গুলির অবিকল প্রতিলিপি	জমীর পরিমাণ	
		বিঘা	কাঠা
বাড়ী ঘর	Houses.	৫৭	৯
ধান্যক্ষেত্র	Paddie.	৫১০	১১
সবজী ক্ষেত্র	Green Trade.	৩৫	১৪
পানের বোরজ	Beatle.	০	২
তামাকের চাষ	Tobacoo.	১৩৯	১৬
বাগান	Gardens.	৫৯	২

* সহর কলিকাতায় ধানের মাঠ ছিল—ধান চাষ হইত, কলার বাগান ছিল—তামাকের চাষ হইত, ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মোত্তর ছিল—এ সব কথা হয়তঃ পাঠক সহজেই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু আমরা নাচার।

গোবিন্দপুর (GOVENPORE.)

(Contd.)

জায়	কোম্পানী বাহাদুরের সেরে-স্তার বানানের প্রতিলিপি	জমীর পরিমাণ	
		বিঘা	কাঠা
কলাব গান	Plantins.	১২	৩
বাঁশ-বাগান	Bamboo.	৪	১০
তৃণপূর্ণ স্থান	Grass.	১৮	০
কূপাদি	Wells.	১০	৩
পুষ্করিণী	Tancks.	০	৯
নালা-নর্দ্দামা	Ditches.	১	৬
খামার	Commer.	১৭	০
ব্রহ্মোত্তর	Bommons (Brahmins)	৫৭	১৬
জঙ্গল	Jungle.	৮৩	১৪
পতিত-জমী	Waste Ground.	১৬৯	১২

টাউন কলিকাতা (TOWN CALCUTTA.)

জায়	কোম্পানী বাহাদুরের সেরে-স্তার বানানের প্রতিলিপি	বিঘা	কাঠা
বাড়ী ঘর	Houses.	২৪৮	৬
ধান-জমী	Paddie.	৪৮৪	১৭
কলা-বাগান	Plantins.	১৬৯	১৮
সবজী বাগান	Green Trade.	৭৭	১৮
তামাকের চাষ	Tobacco,	৩৮	৭
তুলার চাষ	Cotton.	১৯	১৫
বাগান-জমি	Gardens.	৭০	১
তৃণাচ্ছাদিত মাঠ	Grass.	১৫	৯
বাঁশ-ঝাড়	Bamboos.	১	১৬
ফুলবাগান	Flowers.	৬	২
খানা-ডোবা	Ditches.	০	৯
আউস	Assah (Auc)	১১	৯
খামার জমী	Commer.	৭২	১০
ব্রহ্মোত্তর	Bommons (Brahmins.)	১০৯	১৫
জঙ্গল	Jungull.	৩৬৩	১৫
পতিত জমী	Waste Ground.	২৭	৩

সুতালুটী (SOOTA LOOTA.)

জায়	কোম্পানী বাহাদুরের সেরেস্তার বানানের প্রতিলিপি	জমির পরিমাণ	
		বিঘা	কাঠা
বাড়ী ঘর	House.	১৩৪	৪
আউস	Assah (A'uc)	২	৬
ধান-জমী	Paddie.	৫১৫	৬
সাক-সবজী	Green Trade.	৩২	১৯
কলা-বাগান	Plantins.	৬০	৭
বাগান	Gardens.	১৪৭	৭
তামাকু চাষের জমী	Tobaccoo.	৮	৬
ইক্ষু-জমা	Sugercanes.	০	১১
বাঁশ-ঝাড়	Bamboos.	১	১
তৃণাচ্ছাদিত মাঠ	Grass.	১১	১৬
নালা	Null (Nala.)	০	১৮
তুলার চাষ	Cotton.	১৪	৭
ফুল	Flowers.	৪	১৭
মাদুরের কাঠির চাষ	Reeds for mats.	০	৪
খানা	Ditches.	১০	১৯
খামার	Commar.	৭৬	১৪
পথ ঘাট	Tracks and ways.	৭২	৬
জঙ্গল	Jungull.	৪৮৭	১
ব্রহ্মোত্তর	Brahmans.	১১১	৩

বড়বাজার (BUZZAR.)

বাড়ী ঘর	Houses.	৪০১	১১
কূপ ইত্যাদি	Wells.	১৫	৩
কলা-বাগান	Plantins.	৭	৪
শূন্য জমি বা শূন্য পড়া	Sunaporra শূন্য পড়া ?	৯	৩
খাত	Ditches.	৩	১২
বাগান	Gardens.	১৯	৩
ফুল বাগান	Flowers.	০	৬
কাপাস ক্ষেত	Cotton.	০	৩

বড়বাজার (BUZZAR.) (Contd.)

জায়	কোম্পানী বাহাদুরের সেরেস্তার লিপি	জমির পরিমাণ	
		বিঘা	কাঠা
সবজী-বাগান	Green Trade.	০	১০
তামাকের চাষ	Tobacoo.	০	১১
সরসে জমী	Sursha (Sarshya)	০	১৭
ব্রহ্মোত্তর	Bormottor.	২৬	৮
কূপাদি	Wells.	০	১৩
শূন্য ভূমি	Weste.	১	০
খাত	Ditches.	১	৭
বাগান জমী	Gardens.	০	১৭

১৭০৬ সালে কলিকাতার এক জরীপ হয়। সেই সময়ে যে সমস্ত কাগজ-পত্র তৈয়ারি হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমরা কলিকাতা, সুতালুটি, গোবিন্দপুর ও বড়বাজারের জমীর তালিকা দিলাম। এই তালিকা হইতে প্রমাণ হয়, বড়বাজারের ৪৮৮ বিঘা জমীর মধ্যে ৪০০ বিঘা জমীতে ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন এই তিনখানি গ্রামের কোথাও বা ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা ইক্ষুর চাষ, কোথাও বা তামাকের চাষ, কোথাও বা তুলার চাষ, কোথাও বা সবজী-বাগান, কোথাও বা ফুলের-বাগান প্রভৃতি ছিল। বাকি সমস্ত জমী পতিত—খামার অথবা জঙ্গলাবৃত ছিল। এই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বৈদ্যুতিক আলোকময়ী, প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা পরিপূর্ণ, বৈজয়ন্তী তুল্য কলিকাতার বসিয়া, ১৭০৬ অব্দে ইহার অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, কি ছিল, আর কি হইয়াছে!

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী, এই গ্রামগুলির মালিকানি-স্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র জমীদার ছিলেন। প্রজাবিলি দ্বারা খাজনা আদায় করা নগরের উন্নতি-সাধন করা, সুশাসন বন্দোবস্ত করা, বাণিজ্য দ্রব্যাদির শুল্ক আদায় করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্যভুক্ত ছিল। তাঁহারা পতিত-জমীসমূহ পাট্টা, কবুলতি দ্বারা বিলি করিতেন। কিন্তু বিঘা প্রতি, তিন টাকার উর্দ্ধে খাজনা বাড়াইবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। বন-জঙ্গলাদি কাটাইয়া জমীকে বাসযোগ্য করিয়া তাঁহারা প্রজাবিলি করিতেন। নূতন প্রজা খাজনা দিতে না পারিলে, ঢোল-সহরতে তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক

করিয়া খাজনার টাকা আদায় করিতেন। এজন্য তাঁহাদিগকে পাইক বরকন্দাজ প্রভৃতি রাখিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র জমীদারীর দস্তুর মত একটী সেরেস্তা ছিল। এই সেরেস্তার প্রধান-কর্ত্তা কলেক্টার। কালেক্টার সাহেবের অধীনে কতকগুলি কেরাণী ও গোমস্তা (Rent-gatherer) ছিল। জমীদারীর রাজস্ব বৃদ্ধির সহিত ইহাদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই সমস্ত কালেক্টারির কর্ম্মচারীদের বেতন অতি কম ছিল। ভবিষ্যতে আমরা কালেক্টারির জমা খরচ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কত কম বেতনে তখন এই সব কর্ম্মচারীরা কর্ম্মে নিযুক্ত হইত। কম বেতন পাইত বলিয়া, ইহারা অসদুপায়ে বেনামীতে জমী জমা লইত। ১৭০৬ সালের জরীপের পর এইকথা প্রকাশ হইয়া পড়ায়, কোম্পানী-বাহাদুর তাহাদের বেতন চারি টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন।

কালেক্টার সাহেব কেবল পাট্টা-কবুলতির দ্বারা জমি-বিলি করিতেন। এই পাট্টা-কবুলতিতে জমীর পরিমাণ, খাজনার হার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকিত। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই এই পাট্টা লিখিত হইত। আমরা নিম্নে বহুকালের পুরাতন একখানি পাট্টার প্রতিলিপি দিতেছি। সেরাজের আক্রমণের পর, কলিকাতা ইংরাজের পুনরাধিকৃত হইলে, জমীদারের বা কালেক্টারের কাছারীও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সময়ে নিম্নোদ্ধৃত পাট্টা খানি কোন প্রজাকে দেওয়া হয়। পাট্টার প্রতিলিপি এই—

আসামী	জমি	জমা	নম্বর
সন ১১৬৫ সাল			
ইং ১৭৫৮ সাল			
তারিখ—২রা জানুয়ারি			
২১ এ পৌষ—			
বাজার কলিকাতা			
লক্ষীকান্ত সেটজী			
মহল পাঁচু বশাক	।৬।।০	'	৬৶/১২

প্রত্যেক পাট্টার একখানি ইংরাজী প্রতিলিপি থাকিত। কারণ ইংরাজ কালেক্টার বাঙ্গালা জানিতেন না। উল্লিখিত পাট্টার প্রতিলিপি (ইংরাজী) এই—

A pottah being granted unto Lokicanto Seat for 6 cottahs

and 8 chettaks of ground in Bazar Calcutta. Rent 15 annas 7 pies sicca per annum.

Calcutta Cutcherry.

This 2nd day of January 1758 No. 1.

Sd. M. Collet.

Zaminder.

উল্লিখিত পাট্টাখানি হইতে প্রমাণ হয়, তখন কোম্পানী বাহাদুরের একটী বাঙ্গালা-সেরেস্তাও ছিল। উহা হইতে বুঝা যায় পুরাকালে এই প্রথা অনুসারেই জমি-বিলি করা হইত। ভবিষ্যতে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ পাট্টাই চলিয়া আসিয়াছিল। মিঃ লিঙের প্রস্তাবে ১৮১৯ সালে পুরাতন পাট্টার বয়ান পরিবর্ত্তিত হয়। সে পরিবর্ত্তন টুকু মোটের উপর বড় বেশী নয়।

কলিকাতায় যাঁহারা কোম্পানীর আমল হইতে বংশাবলীক্রমে বাস করিতেছেন—উল্লিখিত প্রাচীন কথাগুলি তাঁহাদের বিশেষ চিত্তরঞ্জক হইবে।

প্রত্যেক কালেক্টারের অধীনে একজন করিয়া এদেশীয় সহকারী থাকিতেন। ইনি "ব্ল্যাক-ডেপুটী" বা "ব্ল্যাক-কলেক্টার" বলিয়া অভিহিত হইতেন। ১৭০৫ সালে নন্দরাম বলিয়া একজন বাঙ্গালী সহকারী কলেক্টার রূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু নন্দরাম উপরি উপায়ের চেষ্টা এবং তহবিল তছরূপাদি করায়, কর্ম্ম হইতে অপসারিত হন। কলিকাতার প্রথম কলেক্টার রালফ্ শেলডন। নন্দরাম, শেলডনের সহকারী ছিলেন।

নন্দরাম কর্ম্ম হইতে অপসারিত হইলে জগৎদাস তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। এই নন্দরাম ও জগৎদাসের বংশ এখনও বর্ত্তমান কি না তাহা, আমরা জানি না। জগৎদাসও নন্দরামের ন্যায় উপরি-পাওনার চেষ্টা করিলেন। তহবিল তছরূপ করায়, কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন এবং নন্দরাম পুনরায় কলিকাতায় "ব্ল্যাক-কলেক্টার" নিযুক্ত হন।

এবারেও নন্দরাম লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এখনও মফঃস্বলের জমীদারদের অনেক নায়েব-গোমস্তা, দশ পনর টাকার চাকরী করিয়া বাড়ী-বাগান করেন। সুতরাং নন্দরাম যে না করিবেন, তাহার কারণ কি? তিনি নানা উপায়ে নিজের উদর পূরণ করিয়া প্রভু-

পক্ষের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। আবার শেষ নিকাশে, অনেক টাকা বাকী পড়িল। কলিকাতা কৌন্সিলের বড় কর্ত্তা, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। বেগতিক দেখিয়া নন্দরাম হুগলীতে পলায়ন করিয়া গা-ঢাকা দিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা, হুগলীর ফৌজদারকে লিখিয়া পড়িয়া, কলিকাতা হইতে সেপাহী পাঠাইয়া, নন্দরামকে ধরিয়া আনিলেন ও কারানিক্ষিপ্ত করিলেন।

ইহার পর আর কোন বাঙ্গালী "ব্ল্যাক-কলেক্টারের" নামোল্লেখ দেখা যায় না। তারপর ইতিহাস প্রসিদ্ধ হলওয়েলের আমলে গোবিন্দরাম মিত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

সেকালের কলিকাতায় তিনটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল, তাহা এই—

গোবিন্দরামের ছড়ি।
বনমালী সরকারের বাড়ী।
উমিচাঁদের দাড়ী।

গোবিন্দরামের "ছড়ী" বা লাঠীর-জোর খুব ছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উমিচাঁদ তাঁহার লম্বা দাড়ীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কুমারটুলির বনমালী সরকারের বাড়ীর মত, অতবড় প্রাসাদতুল্য বাড়ী সেকালের কলিকাতায় আর কাহারও ছিল না। এখনও কুমারটুলীতে সরকার মহাশয়ের এ বাড়ী বর্ত্তমান।

প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত-লেখক উইলসন সাহেব বলেন—"সেকালের ব্ল্যাক-ডেপুটীরা যেরূপ অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন—তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহাদের বেতন বড়ই অল্প ছিল। জমি-বিলি ও তৎসম্বন্ধীয় কাজ কর্ম্ম করিবার সময়, খাজনা ও সেলামী এবং বেনামী-জমি-বিলি দ্বারা অনেক টাকা তাহাদের হাত দিয়া চলাফেরা করিত। কাজেই অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীর পক্ষে এরূপ সুবিধাকরস্থলে লোভ সম্বরণ করা বা বেনামী বাণিজ্য প্রভৃতিতে লিপ্ত না হওয়া, নানাকারণে অসম্ভব।"

সমস্ত ব্ল্যাক-জমীদারদের মধ্যে, পরবর্ত্তীকালে গোবিন্দরাম মিত্রের ক্ষমতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। তিনি যথেষ্ট ধনরত্নাদি সঞ্চয় করেন। এখনও চিৎপুর রোডে কুমারটুলী পল্লীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন বর্ত্তমান। এই নবরত্নের চূড়া না কি অক্টার্লোনী মনুমেন্ট অপেক্ষা উচ্চ ছিল। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার ষ্টারেণ্ডেল সাহেব বলেন—তাহার উচ্চতা ১৬৫ ফিটের উপর। ১৭৩৭ খৃঃ অব্দের মহা ঝড়ে এই চূড়াটী ভাঙ্গিয়া

পড়ে। ১৭২০ হইতে ১৭৫৬ বা পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, গোবিন্দরাম ব্ল্যাক-জমীদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

গোবিন্দরাম মিত্র. প্রাচীন কলিকাতার মধ্যে একজন অতি দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামে—বাঘে-গরুতে একত্রে জল খাইত। হলওয়েল সাহেব কলিকাতার প্রধান কালেক্টার বা জমীদার ছিলেন। গোবিন্দরাম বহুদিন হইতেই "ডেপুটী বা ব্ল্যাক-জমীদার" ছিলেন। সমস্ত কাগজ-পত্র তাঁহার হাতে। এরূপস্থলে হলওয়েল কালেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহার নিকট কোম্পানীর জমীদারী সেরেস্তার কাগজ-পত্র ও প্রয়োজনীয় হিসাবাদি চাহিয়া পাঠান। কিন্তু গোবিন্দরাম মিত্র, না কি দর্পের সহিত বলিয়া পাঠান—"ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমাদের উভয়েরই মনিব। প্রেসিডেন্টের অনুমতি ভিন্ন আমি আপনাকে কাগজ-পত্র দেখাইতে পারিনা।"*

যাহা হউক, হলওয়েল ও গোবিন্দরাম উভয়ে মিলিয়া, কয়েক বৎসর একত্রে কাজকর্ম্ম করিয়াছিলেন। পলাশীযুদ্ধের পাঁচবৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েলের সহিত গোবিন্দরাম মিত্রের বিবাদ উপস্থিত হয়। হলওয়েল সাহেব, তাঁহার বিরুদ্ধে কৌন্সিলের নিকট তহবিল তছরূপের নালিশ উপস্থিত করেন। ইহার উত্তরে গোবিন্দরাম মিত্র বলিয়াছিলেন—"যাঁহারা আমার মত ডেপুটীগিরি করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের সকলেই আমার মত স্বত্বাদি উপভোগ করিয়াছেন। আমার মত পদস্থ কর্ম্মচারীর পদগৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, যেরূপ চাকর-বাকর জাঁক-জমক ও এল্‌বাব পোষাকের প্রয়োজন—আমার সামান্য বেতন হইতে তাহা কখনই চলা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভবপর নহে।"†

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ইংরাজের প্রথম আমলের ইতিবৃত্ত লেখক, উইলসন সাহেবও বলিয়াছেন—'কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা যে এইরূপ অসদুপায়ে

---

* That by reason of many changes in the headship of office, a power in perpetuity devolved on the standing Deputy, who is always styled the Black Zaminder and such was the tyranny of this man and such the dread conceived of him that no one durst complain or give information. (Cotton),

† When in 1752 Holwell accused Govindarama Mittra of dishonesty, the celebrated "black collector" defended himself by pointing out that every deputy of this description was allowed similar privileges and that he could not from his wages keep up the equipage and attendance necessary for an officer of his Station (Holwel's Tracts Pp 199-97.)

অর্থোপার্জ্জন করিত, তজ্জন্য কোম্পানীই দায়ী। তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ছোট বড় সকলেই, অন্যায় উপায় দ্বারা বেনামী ব্যবসা প্রভৃতি চালাইয়া, ছাড় ও দস্তকাদির অপব্যবহারে অর্থোপার্জ্জন করিতেন।*

কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামত্রয়ের ও পার্শ্ববর্ত্তী ৩৮ খানি গ্রামের খাজনা আদায় বিলি-বন্দোবস্ত প্রভৃতির কার্য্যভার, এই কালেক্টার জমিদারের হাতে ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ফৌজদারী বিভাগেরও প্রধান কর্ম্মচারী ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। তাঁহার অধীনে একটী ক্ষুদ্র পুলিসও ছিল। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে এই পুলিসের সংখ্যা একজন প্রধান কর্ম্মচারী বা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পঁয়তাল্লিশজন কনষ্টেবল, দুইজন নকীব ও কুড়িজন চৌকীদার ছিল। কিন্তু সেকালের গোয়ালারা বিশেষ শক্তিমান জাতি ছিল ও উত্তমরূপে লাঠিবাজি করিতে জানিত, এইজন্য তাহাদের চৌকীদার করা হইত।†

১৭০৬ সালে কোম্পানীর অধিকারের মধ্যে চুরি-ডাকাতীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, আরও ৩১ জন পাইক লইবার আদেশ হয়। ইহাই সেকালের প্রথম পুলিস-বন্দোবস্ত। রোটেস্যান বা পূর্ব্বোল্লিখিত "পর্য্যায়ক্রমিক" ব্যবস্থার আমলে, কালেক্টার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের বড়বাজারে বা দেশীয় প্রধান অংশে এক কাছারি ছিল। কিন্তু হলওয়েলের আমলে তাহা কলিকাতায় উঠিয়া আসে।‡

কালেক্টার খাজনা-পত্র সম্বন্ধীয় মামলার নিষ্পত্তি করিতেন এবং ফৌজদারি বিভাগেও তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতে হইত। ম্যাজিষ্ট্রেট

* It was the vicious policy of the company to underpay its servants and it was notorious that these servants, both high and low, derived the greater part of their income from their perquisities and from private trade.
(Wilson—vol I. P. 196.)

† It is ordered that one chief peon, and forty five peons, two chubdars (Chob-dars) and twenty guallis (gowalas) be taken into pay.
(Consultation No. 52 1704)

‡ Several robberies having been commited in the town by country robbers who killed and wounded several of the Company's native servants and others, it is thought necessary to keep greater guard on the towns for the Company's tenant's safety, wherefore the Jemidar (Zeminder) is ordered to entertain 31 pikes or black-peons for the time to prevent like mischiefs in the future. (Vide Consultation No. 188 Decr—27th.)

রূপে তিনি কেবল দেশীয়দের বিচার করিতেন। কিন্তু ১৭০৪ খৃঃ অব্দে কৌন্সিলের সদস্যগণ, তাঁহাদের স্বদলের মধ্যে তিনজনকে নির্ব্বাচিত করিয়া একটী নূতন বিচার-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

তখন এইরূপ স্থির হয়, কৌন্সীলের এই তিনজন সদস্য, প্রতি শনিবার প্রাতঃকালে নয় ঘটিকা হইতে দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা নিয়মিতরূপে চলে নাই। তবে ১৭০৬ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের একটী বিচার মন্তব্য হইতে জানিতে পারা যায়, যে বিচারকেরা কতকগুলি চোর ও হত্যাকারীর গণ্ডদেশে উত্তপ্ত লৌহের ছাঁকা দিয়া গঙ্গা-পার করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে অর্থাৎ নবাব মুরশীদকুলী খাঁর আমলে, সেই প্রাচীন কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল ও স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত কিরূপ ছিল—এখন তাহাই একটু আলোচনা করা যাক্।

জব চার্ণক কলিকাতা প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৬৯০খৃঃ অব্দে এক আদেশ প্রচার করেন,—"কোম্পানীর দখলী যে সমস্ত পতিত-জমী আছে বা জঙ্গল আছে, তাহা কাটাইয়া ও পরিষ্কার করিয়া, যে কোন ব্যক্তি তাহার ইচ্ছা বা প্রয়োজনানুসারে যে কোনস্থানে ঘর-বাড়ী করিতে পারিবে।" ইহার ফলে অনেকে কলিকাতায় ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। পরবর্ত্তীকালে অধিক পরিমাণে বাসিন্দা সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত, নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোনরূপ একটা বিশেষ বন্দোবস্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়ে।

১৭০৪ খৃঃ অব্দে কৌন্সিলের একটী আদেশ প্রচারিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই—"দেশীয় অধিবাসীদের অপরাধের দণ্ড স্বরূপ যে সমস্ত জরিমানা আদায় হইবে, সেই আয় হইতে, সহরের মধ্যের ও আশে-পাশের নর্দ্দামা, খানা ও ডোবা সমূহ ভরাট করা যাইবে।" ইহাই কলিকাতার প্রথম মিউনিসিপ্যাল বন্দোবস্ত। কলিকাতায় পুলিস-সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত প্রথমে প্রচারিত হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

যাহারা সে সময়ে কলিকাতায় নূতন বসবাস করিতে আসিয়াছিল—তাহারা যেখানে সেখানে জমী লইয়া ইচ্ছামত বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ করিত। ১৭০৭ সালের মার্চ্চ মাসে, কৌন্সিলের একটী আদেশ হইতে জানিতে পারা যায়—"এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে আর ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হইবে না। এরূপ দেখা গিয়াছে, যে অনেকে ফোর্ট-উইলিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মতামত না লইয়া, বাড়ীর চারিদিকে পাঁচিল তুলিয়াছে কিম্বা বাস্তুর মধ্যে পুষ্করিণী

কাটাইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ গৃহাদি নির্ম্মিত না হয়, তজ্জন্য দুর্গদ্বারে সাধারণের অবগতির জন্য একটী নোটীস্ দেওয়া হইল।” বলা বাহুল্য এই নোটিসে বিশেষ কিছু ফল হইল না।

১৭০৫ হইতে ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কলিকাতায় ম্যালেরিয়া প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার বারশত ইংরাজ অধিবাসীর ৪৬০ জন লোক জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলিকাতার এইরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়া কৌন্সিলের কর্ত্তারা ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের সংকল্প করেন।

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বক্সীর উপর এক আদেশ প্রচারিত হয়, “ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের মধ্যে ও আশে পাশে অনেক গাছ-পালা ও চালাঘর আছে। পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্তও ভাল নাই। এই সমস্ত গাছ-পালা কাটিয়া ও দুর্গন্ধময় নালা-নর্দ্দামা বুজাইয়া দিয়া, দুর্গের চারিদিকের জল-নিকাশের জন্য নয়ানজুলী কাটিয়া দিতে হইবে। যাহাতে দুর্গের চারি পাশের জল, নিকাশ হইয়া বড় বড় পয়নালায় গিয়া পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

১৭২৭ খৃঃ অব্দে একটী করপোরেসন বা সমিতি গঠিত হয়। এই করপোরেসনের কর্ত্তার পদবী মেয়র (Mayor) ছিল, মেয়রের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য নয়জন সহকারি বা অলডারম্যান নিযুক্ত হন। হলওয়েল সাহেব কলিকাতায় জমিদার রূপে এই সমিতির প্রথম সভাপতি হন।*

জমিদার সাহেব কেবল যে জমীর খাজনা ইত্যাদি আদায়ে ব্যাপৃত থাকিতেন তাহা নয়—রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যও তাহাকে দেখিতে হইত ও তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে হইত।†

কিন্তু সহরের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য যে টাকা বরাদ্দ ছিল, তাহা অতি অল্প। তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ হইত না। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই তথাকথিত ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ অতি ধীরে ধীরে চলিয়া আসিয়াছিল। উক্ত বৎসর সর্ব্বপ্রথম “জষ্টিস্ অফ্ দি পিস্” পদের সৃষ্টি

* জমীদারী সেরেস্তায় নায়েবের নীচেই বক্সীর আসন। কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাদের বিষয় কর্ম্মের জন্য এদেশের জমীদারদিগের নিয়মই অনুসরণ করেন। কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের “বক্সী” একটু বিভিন্ন প্রকারের। একজন ইংরাজ এই বক্সীর কার্য্য করিতেন।
Mr Roy's C. R. Vol. XVIII.

† Mr Beverley's C. R. 1876. (p. 41.)

হয়। ইহার পর ১৮১৭ সালে লটারি-কমিটি (Lottary Committee) স্থাপিত হয়। পরে আমরা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর সম্বন্ধে অনেক পুরাতন জ্ঞাতব্য কথা বলিব।

১৭৪৯ সালে দেখিতে পাই—নালা ও খাত-সমূহ কাটাইবার জন্য সামান্য কয়েকটী টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দের কার্য্য-বিবরণী হইতে জানা যায়—"গঙ্গার স্রোতে, সুতানুটীর বাজারের মালঘাট বা wharf টী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এজন্য স্থানীয় জমীদার মিঃ এডওয়ার্ড আইলের উপর আদেশ হইল—যাহাদের মালপত্র এই ঘাটে উঠে, তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া এই মালঘাট নূতনভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে। মালঘাট-গুদামে যাহার যতটা জমীতে মাল আছে সেই অনুপাতে তাহার উপর অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিতে হইবে।" ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দের এক হুকুম হইতে জানিতে পারা যায়—"কোম্পানীর ব্যবহার্য্য ইটের-পাঁজা পোড়াইবার জন্য, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গল কাটাইয়া কাষ্ঠ-সঞ্চয় করিতে হইবে।" ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের তিন বৎসর পূর্ব্বে, দেখিতে পাওয়া যায়, কোম্পানীর কলিকাতা—কৌন্সিল, বিলাতে পত্র লিখিতেছেন—"চারিদিকের নালা-নর্দ্দামা কাটাইয়া, নগরকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপূর্ণ করিবার জন্য, সম্প্রতি জমীদারকে আদেশ করা হইয়াছে।" ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানীর রেকর্ড হইতে জানা যায়—"লালদীঘিতে লোকে স্নান করে ও অশ্ব প্রভৃতির গাত্র-ধৌত করে এজন্য পুষ্করিণীর জল ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে। এজন্য ইহা বন্ধ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করা হউক।"*

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হয়। ইহাতে কলিকাতার স্বাস্থ্য অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই সময়ের কাগজপত্রে

* Beverley's Report (1876. p 41.) Despatch to Court. (Jany 27. 1750) and (August 10. 1750.) Unpublished Records (Long) Vol. I. Despatch to Court (Jany 13. 1753) Proceedings of the Court (Jany 13. 1753.)

যে সকল ব্যবসায়ী জেটী-ঘাটে মালপত্র আমদানী রপ্তানী করিত, তাহারা এই বর্দ্ধিত-হারে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করায়, কোম্পানী আদেশ দেন—তাহাদের মালের হিসাব খাতে যে টাকা কোম্পানীর নিকট পাওনা আছে, তাহা হইতে প্রত্যেকের অংশমত কাটিয়া লইয়া জেটী মেরামত হইবে।

দেখিতে পাওয়া যায়—মেজর কার্ণাক, লর্ড ক্লাইবের নিকট কলিকাতার এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ইংরাজ-সৈন্যগণকে সে সময়ে কলিকাতায় রাখা যুক্তিযুক্ত নহে।" কাজেই লর্ড ক্লাইব আদেশ করেন—"কলিকাতার বন্দরে জাহাজ হইতে কোন সেনাকেই নামান হইবে না।" উক্ত বৎসরে আমরা দেখিতে পাই, অনেক টাকা হাউস-ট্যাক্সের বাবতে আদায় করিয়া, প্রাচীন কলিকাতার আভ্যন্তরিণ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি অর্থাৎ ঘর দ্বার নির্ম্মাণ ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে।*

নিম্নে ১৭০৬ খৃ: অব্দ হইতে ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দ অর্থাৎ সেরাজ যে বৎসর কলিকাতা আক্রমণ করেন, তাহার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত, কলিকাতার ঘর-বাড়ী রাস্তাঘাট কিরূপ ছিল, তাহার একটী তালিকা এস্থলে প্রদত্ত হইল।

বৎসর	একারের (Acre) মাপে সহরের বিস্তৃতি	ঘর বাড়ী		রাস্তা	গলি	ছোট গলি Byelane	পুষ্করিণী
		পাকা	কাঁচা				
খৃ: অব্দ							
১৭০৬	১৬৯২	৮	৮০০০	২	২	*	১৭
১৭২৬	২৩৫০	৪০	১৩৩০০	৪	৮	*	২৭
১৭৪২	৩২২৯	১২১	১৪৭৪৭	১৬	৪৬	৭৪	২৭
১৭৫৬	৩২২৯	৪৯৮	১৪৪৫০	২৭	৫২	৭৪	১৩

উল্লিখিত তালিকা হইতে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন—১৭০৬ সালে কলিকাতায় মোটে দুইটী চলাচলের রাস্তা ছিল, দুইটী গলি ছিল ও ১৭টী পুষ্করিণী ছিল। ৮টী পাকা বাড়ী ও ৮ হাজার মেটে-বাড়ী ছিল। সম্ভবতঃ এই সমস্ত বাড়ীঘর কলিকাতা, সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহেই ছিল। কিন্তু এই তালিকার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৭৫৬ খৃ: অব্দে অর্থাৎ নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ সময়ে, এই সহরে ৪৯৮টী পাকাবাড়ী, প্রায় সাড়ে চৌদ্দ

* Proceedings of the Court (August 1775.) Beverley's Report p 42.

হাজার মেটে-ঘর, ২৭টি রাস্তা, ৫২টি গলি, ৭৪টি বাইলেন ও ১৩টি পুষ্করিণী ছিল। সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, পুষ্করিণীগুলি ক্রমশঃ বুজাইয়া ফেলা হইতেছিল। এইজন্যই পুষ্করিণীর সংখ্যা কম। পলাশীর-যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কিরূপ উপায়ে ধীরে ধীরে কলিকাতার অধিবাসী ও গৃহসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার আভাস পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণ সমূহ হইতেই পাওয়া যায়। পলাশী-যুদ্ধের পর, সহরের নানাস্থানের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে বলিব।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জমীদারী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে—পুরাতন সেরেস্তা হইতে আমরা আরও কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। ইহার মধ্য হইতে বিশেষ কৌতূহল-জনক ব্যাপারগুলি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিব।
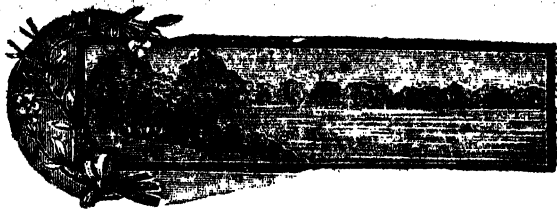
সপ্তদশ অধ্যায়।

কোম্পানীর জমীদারী অর্থাৎ সুতালুটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামত্রয়ের আয়ব্যয়—এমারত ব্যাপারে খরচা—নবাব মুরশীদকুলী খাঁর নিকট প্রেরিত উপহার দ্রব্য—কলিকাতার জমীর পাট্টা—প্রজাবিলির ব্যবস্থা—খুন-জখম—মদের দোকানের লাইসেন্স—এদেশীয় দালালের মজুরী—রাস্তাঘাট মেরামত খরচা—গোবিন্দপুরে প্রথম বাজার—সেকালের কলিকাতায় চুরি ডাকাতি—কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের খানা খাইবার বন্দোবস্ত—মাতাল সেলারের দাঙ্গা—গরীবপ্রজার উপর কোম্পানী বাহাদুরের দয়া—সেকালের চোর-ডাকাতের শাস্তি—কলিকাতা দুর্গের জন্য বড় কামান—ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয়—যত্র তত্র পুকুর কাটানো ও পাঁচিলতোলা—কলিকাতায় বাদসা ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু সংবাদ—দলিল রেজেষ্টারি না করার দণ্ড—কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামত্রয়ের জরিপ ও নূতন প্রজাই পাট্টা—নূতন পাটোয়ারের নিয়োগ—কলিকাতায় প্রথম হাঁসপাতাল—শেটের বাগান—গোবিন্দপুরে প্রজাদের খাজনা হ্রাস—কোম্পানীর জমীদারীর আয়-বৃদ্ধি—পাকা আস্তাবল নির্ম্মাণ—মদের ভাণ্ডার খালি—সাহেব চোরের নির্ব্বাসন—লালদীঘির প্রথম পঙ্কোদ্ধার—ব্লাক-জমীদার নিয়োগ—খোজা সরহদের ঋণ—কলিকাতায় প্রথম গির্জ্জা—ব্লাক-জমীদার নন্দরামের গ্রেপ্তার—ঘোড়া বিক্রয়—চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—কলিকাতা দুর্গের সম্মুখের জমী পরিষ্কার—কোম্পানী বাহাদুরের রন্ধনশালার ব্যবস্থা—ক্রীত দাসী আটকের মামলা—পুরাতন চাউল বিক্রয়—"ঔরঙ্গজেব" জাহাজ—দুর্ভিক্ষ ও বাঙ্গালী প্রজার প্রতি কোম্পানীর দয়া—বাজার কলিকাতা বা বড়বাজারের আয় বৃদ্ধি—প্রাচীন কলিকাতায় হাট-বাজারের সংখ্যা-বৃদ্ধি—সেকালের হাঁসপাতালের আইন—পারসী-লেখাই খরচা—সম্রাট ফরক্‌শিয়ারকে উপহার দিবার জন্য পৃথিবীর মানচিত্র—বাদসাহের জন্য ঘড়ী মেরামত—সহকারী ডাক্তার সাহেবের জন্য পাল্কী ব্যবস্থা—ঘনশ্যাম বেনিয়ানের কর্ম্মচ্যুতি—পুরাতন রৌপ্য বিক্রয়—গোঁসাই ঠাকুরের বিধবা—নবাব দরবারে বিধবার তলব—কোম্পানীর নূতন দালাল হরিনাথ—ডাক্তার হামিল্‌টানের উইল—নবাব মুরশীদকুলী খাঁর আমলে কলিকাতার অবস্থা ও ক্রমোন্নতি—কলিকাতায় তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে পুরাতন সেরেস্তার (১৭০৩—১৭১৮) আবশ্যকীয় অংশের সংক্ষিপ্ত প্রতিলিপি—প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে—নানাবিধ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য কথা—কলিকাতার জমীদারী সম্বন্ধে নানা কথা।

কোম্পানী বাহাদুরের পুরাতন সেরেস্তা।

FORT WILLIAM.

(Consultations 1703 to 1718.)

কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামের জমীদারী সেরেস্তার নকল।

মোট জমা খরচ—অক্টোবর ১৭০৩ খৃঃ অব্দ।

জমা—		খরচ—	
বসত বাটীর জমীর ও বাটীর খাজনা ...	৩২৭৷৵৬	চাকরদিগের বেতন	
		কোতোয়াল ...	৪৲
পাট্টা হিসাবে ...	৩০৷৶৯	৫ জন সেরেস্তার কেরাণী	১৮৷৹
ঋণ আদায় ...	৭৵৹	১৫জন পিয়ন ...	৩১৲
জরিমানা ...	৪৲	১০ জন পাইক ...	৬৫৲
পেয়াদার রসুম ...	৷৵৹	খাজনা আদায়কারী গোমস্তা ৪ জন ...	৬৸৹
বিবাহের ফিঃ ...	১৸৹	ঢোল ও ভেরীবাদক ...	১৸৹
সেলামী	১৷৹	হালালখোর ২ জন (?) ...	৸৹
জ্বালানী কাঠের শুল্ক	৩৷৹	কাগজ ...	৷৵৹
শস্যাদির শুল্ক ...	১৪৬৶৹	কালী ...	৵৹
		খাজানা খানায় জমা ...	৩১৪৷৯

উল্লিখিত জমা-খরচ কেবল কলিকাতার জমীদারী-সেরেস্তার জন্য। সেকালের এক জন সহর কোতোয়াল—মাসিক চারি টাকা বেতন পাইত। চারিজন লেখকের বা কেরাণীর বেতন ১৮৷৹ ছিল। প্রত্যেক পিয়ন বা পুলিস-রক্ষীর বেতন দুই টাকা হারে ছিল। প্রত্যেক গোমস্তা ১৸৵৹ হিঃ বেতন পাইত। হালালখোর (?) কথাটার অর্থ আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। ইংরাজী সেরেস্তায় ইহা "Hollocore" এই-রূপ বানানেই লিখিত আছে। এই সেরেস্তা হইতে দেখা যায়, কোম্পানী বাহাদুরের জমীদারী সেরেস্তার জন্য ছয় আনার কাগজ ও দুই আনার কালী কিনিতে হইয়াছিল। এখনকার "ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেসনারী" বিভাগের বিরাট ব্যবস্থার সহিত তুলনায়, ইহা যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। নিম্নে কলিকাতা সুতালুটী ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামের আয়-ব্যয়ের হিসাব উদ্ধৃত করিতেছি।

ফোর্ট-উইলিয়াম কন্‌সলটেসন্স।

ডিসেম্বর ১৭০৩ খৃঃ অব্দ।

কলিকাতা (CALCUTTA.)

আয়—		ব্যয়—		
জমী ও বাটীর খাজনা	২০৩৸৵৫	ভৃত্যদের বেতন।		
পাট্টা	২০।৵৫	শীক্‌দার	(১ জন)	৪৲
বিবাহের সেলামী	৭৲	মণ্ডল	(১ জন)	২৲
ঋণ আদায়	২।৶০	পাটওয়ারী		২৲
সেলামী	২২৲	পিয়ন	(৫ জন)	১০৲
জরিমানা	২৲	কাছারী ও মেটেঘর সমূহ মেরামত		১॥৵৫
বাট্টা	।৶০			
ফল বিক্রয়	।৫	সেরেস্তা বাঁধিবার খেরো		।০
নূতন বাজারের খাজনা (বড়বাজার ?)	২৲	রাস্তা মেরামত		১॥৶০
মালের কুত	১।৶১৫	মণ্ডলের বেতন		২৲
কয়ালের নিকট প্রাপ্য	১৲			
বাট্টা	।/১০			
ওজনের শুল্ক	২২॥/১৫			

সুতালুটী (SOOTALOOTA.)

(ডিসেম্বর—১৭০৩ খৃঃ অব্দ)

আয়—		ব্যয়—
জমী ও বাটীর খাজনা আদায়	১৩৪৶০	কর্ম্মচারীর বেতন
বাটা	১৩।৵১৫	শীকদার
বাজারের আয়	৬০।৶০	পাটওয়ারি
কয়ালের ডিউটী	৫৲	
ঐ বাটা	॥০	
কুঠী-মাগন্ Kutti-Magan ?	১৪॥১০	
ঐ বাটা	১।৶০	

তাহাকে পুনরায় লাইসেন্স দেওয়া হইল। পূর্ব্ব বারের স্বত্ব মতে—চোলাই করিবার জন্য বাৎসরিক ৮০০৲ শত টাকা ও বিক্রয়ের জন্য বাৎসরিক ২০০৲ টাকা দিতে হইবে। (Con—112.)

আরক এক প্রকার তীব্র মদিরা। তখন এদেশে বিলাত হইতে ভাল মদিরা খুব কমই আসিত। যাহা আসিত, তাহার দামও বেশী। এইজন্য "আরক-হাউস" বলিয়া প্রাচীন কলিকাতায় এক শ্রেণীর মদের দোকান ছিল। এখনও কলুটোলা-ষ্ট্রীটে ফৌজদারি-বালাখানা হইতে কিছুদূরে গেলে, একখানি অতি পুরাতন মদের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার উপর লেখা আছে—১৭৬৭ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

দুইজন দেশীয় দোকানদারকে—লাইসেন্স দেওয়া হইল। একজনের নাম Gossa (ঘোষ?) অপর ব্যক্তি সরফালী সারঙ্গ। ঘোষ, কলিকাতায় একটী গাঁজার দোকান খুলিতে চাহে। ইহার বাৎসরিক লাইসেন্স ১৮০৲ টাকা। সরফালী জাহাজে খালাসী যোগাইবে। তাহার লাইসেন্স ৬৫৲ টাকা ধার্য্য হইল। (Con—171)

মিঙ্গো আস্ ও গোবিন্দ শুঁড়ীকে (রেকর্ডে আছে—Govind Sundee কিন্তু উইলসন সাহেব, ইহাকে Govinda Sunder করিয়াছেন) আরক-হাউস বা মদের-দোকান ও হোটেল করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইল। (Con. 180)

কোম্পানীর দালাল-নিয়োগ।

দীপচাঁদ বেলা (বেরা?) কোম্পানীর দালাল-পদে নিযুক্ত হইল। দেশীয়-ব্যবসায়ীদের নিকট যত টাকার মাল খরিদ হইবে, দীপচাঁদ তাহার প্রতি টাকায় আধপয়সা হিসাবে কমিশন পাইবে। (Con. 86)

দীপচাঁদ বেলা (বেরা) বলিয়া যে ব্যক্তি এতদিন কোম্পানীর দালালী করিয়া আসিতেছিল—সম্প্রতি সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এইজন্য এই ফৌত দীপচাঁদের স্থানে—কোম্পানী জনার্দ্দন শেঠকে তাঁহাদের ক্রয় বিক্রয়ের দালালরূপে নিযুক্ত করিলেন। (Con—183)

রাস্তা মেরামত।

দেশীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে যে সমস্ত জরিমানার টাকা আদায় হইয়াছে, তাহা কলিকাতার ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত ও খানা-নর্দ্দমা বুজাইবার

জন্য ব্যয় করা হইবে। এজন্য জমিদার বৌচার সাহেবকে আদেশ করা হইল, তিনি যেন এ সম্বন্ধে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। Con—94.

গোবিন্দপুর বাজার।

কলিকাতার জমিদার মিঃ বৌচার সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, টাউন গোবিন্দপুরে, একটী বাজার স্থাপন করা বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে এই বাজার খুব লাভকর হইতে পারে। এজন্য অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, যে উক্ত বাজারের নির্ম্মাণকার্য্য যত শীঘ্র সম্ভব আরম্ভ করা হউক। Con—115.

প্রাচীন কলিকাতায় চুরি ডাকাতি।

দেশীয় অধিবাসীদের অংশে, চুরি-ডাকাতির বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এজন্য সহরের শান্তিরক্ষার্থে একজন ইংরাজ কর-পোরাল ও ছয়জন গোরা-সৈন্য, থানার কোতোয়ালের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইল। দরকার হইলেই, তাহারা কোতোয়ালকে সাহায্য করিবে।

Con—138.

দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে গোলমাল।

কোম্পানীর অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারীই অভিযোগ করিতেছেন, তাঁহাদের আহার্য্যাদি অপর্য্যাপ্ত ও খানার সময় তাঁহারা পেট ভরিয়া মনোমত খাইতে পান না। এজন্য আদেশ হইল—প্রত্যেক কর্ম্মচারী প্রতিমাসে কুড়ি টাকা করিয়া খোরাকীর জন্য অতিরিক্ত পাইবেন। জ্বালানির তৈলও তাঁহারা বিনামূল্যে পাইবেন, কিন্তু মোমবাতি দেওয়া হইবে না। (Con—139.)

পাঠক মনে রাখিবেন—আমরা দুইশত বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতার অবস্থা বলিতেছি। তখন সাধারণ লোকে তেলের আলো জ্বালিত ও পদস্থ লোকেরাই বাতির আলো উপভোগ করিত।

সেলারের দাঙ্গা।

কোম্পানীর জাহাজের কতকগুলা সেলার, এদেশীয় জনকয়েক লোককে বিবাদের মুখে আক্রমণ করে। এই জাহাজখানি তখন কলিকাতায় নঙ্গর করিয়াছিল। কোম্পানীর একজন এদেশীয় পিয়ন এই দাঙ্গায় নিহত হয়। কৌন্সিলের কাণে এই কথা উঠায়, তাঁহারা এই নিহত ব্যক্তির আত্মীয়দের

বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি, মান্দ্রাজে ইংরাজ-উপনিবেশেও এইরূপ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গমধ্যস্থ সেনাগণ ও কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মতে, পাঁচহাজার মণ চাউল ও এক হাজার মণ গম সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার জাত করা হউক। এ বিষয়ে আর্থার কিং সাহেবকে আদেশ দেওয়া হইল। যদি মান্দ্রাজের কুঠীতে—শস্যের প্রকৃত প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাহা হইলে—তাহাদেরও সাহায্য পাঠাইতে হইবে।"

"কাশিমবাজারের বগডেন্ ও ফিক্ সাহেবকে আদেশ করা যাইতেছে, তাঁহারা আমাদের পত্রপ্রাপ্তি মাত্র, কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন। কোম্পানীর তহবিলে যে সমস্ত টাকা কড়ি আছে, কিম্বা সনন্দ-লাভের জন্য তাঁহাদের যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাঁহারা যেন কলিকাতায় লইয়া আসেন। যে সমস্ত বনাত ও অন্যান্য কাপড়, বিক্রয়ার্থে কাশিমবাজারে মজুত আছে, তাহা আর বিক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বেনিয়ান হরিকৃষ্ণের জিম্মায় তাঁহারা সেইগুলি হেপাজত করিয়া, কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন।"

"এই রাষ্ট্র-বিপ্লবে, নিকটবর্ত্তী জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে কোম্পানীর উপর উৎপাত করিতে পারেন—কলিকাতা লুঠপাঠ করিতে পারেন। তাহার প্রতিকার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত সম্ভাবিত বিপদের প্রতিকার জন্য আদেশ হইল—যে ৬০ জন অতিরিক্ত দেশীয় সৈন্য কোম্পানীর দলভুক্ত করা হউক। তাহারা কলিকাতা নগরীর চারিদিকে পাহারা দিয়া নগররক্ষা করিবে।"

(Con.—197.)

দলিল-রেজেষ্টারী না করার দণ্ড।

জোসিয়া জনসনের ২৫৲ টাকা অর্থদণ্ড হইল। কারণ সে সহরের মধ্যে একখানি বাটী খরিদ করিয়া চলিত প্রথামত রেজেষ্ট্রী করে নাই।

দলিলাদি রেজেষ্টারী করিবার ভার কালেক্টার বা জমীদারের উপর ছিল।

কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামত্রয় জরীপ ও প্রজাই-পাট্টা।

"দুই বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানী বাহাদুর কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়ের জরিপ করিবার আদেশ দেন। সেই জরিপী-জমাবন্দী নক্সা ও কার্য্যসমূহ এত দিনে শেষ হইয়াছে ও তাহার কাগজাৎ কৌন্সিলে পেশ হইয়াছে। এই সমস্ত কাগজাৎ হইতে প্রমাণ হইতেছে,

অনেক প্রজা কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়া, জমী ভোগ করিতেছে। অনেকে তাহাদের দখলী জমীর পরিমাণের অর্দ্ধেক অংশেরও খাজনা না দিয়া, তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগদখল করিতেছে। এজন্য নিম্নলিখিত এই আদেশ প্রচারিত হইল—

(১) ইহার পর হইতে জমীদার সাহেব, প্রত্যেক প্রজাকে একখানি করিয়া টিকিট দিবেন। এই পাট্টায় বা টিকিটে, প্রজার বাৎসরিক খাজনার হার ও জমীর পরিমাণ লেখা থাকিবে।

(২) প্রতিমাসে খাজনা দাখিলের সময়—প্রজা এই টিকিট বা পাট্টা হাতে করিয়া আনিবে। এই দলিলের স্বত্ব এক বৎসর বলবৎ থাকিবে এবং প্রতি বৎসরের শেষে ইহা নূতন করিয়া দেওয়া হইবে।

(৩) কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা একখানি বহির মধ্যে, এই টিকিট বা পাট্টাগুলি নিয়মিত রূপে রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখিবেন।

(৪) প্রত্যেক গোমস্তা, সহরের মধ্যে লোকজন বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার একটা হিসাব রাখিবেন। (Con.—204.)

ধরিতে গেলে, ইহাই বর্ত্তমান কলিকাতা কালেক্টারীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তখন স্বতন্ত্র রেজেষ্ট্রী-অফিস ছিল না। এই আদেশ প্রচারের পর হইতে স্বতন্ত্র রেজেষ্ট্রী-বিভাগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। সেকালে সেন্সস্ প্রভৃতির ভার, প্রকারান্তরে খাজনা আদায়কারী গোমস্তাদের হাতেই দেওয়া হইয়াছিল। কলিকাতাদি গ্রামত্রয়ের জনসংখ্যা বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাঁহারাই ইহা স্থির করিয়া বলিতেন। আর এই দুই শত বৎসর পরে, কলিকাতা সহরের সেন্‌সসের বা লোক-গণনার দিনে কি না একটা ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়!

নূতন পাটোয়ার নিয়োগ।

কৌন্সিল সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছেন—বাঙ্গালী পাটওয়ারেরা নিজেদের স্বার্থের জন্য, বেনামী করিয়া জমীজমা লইতেছে—এবং হিসাব-পত্রে গোঁজামিল দিতেছে। আদেশ দেওয়া হইল—এই সমস্ত "ব্লাক-পাটোয়ারী" কে জবাব দিয়া তাহাদের স্থানে নূতন লোক লওয়া হউক। যাহারা নূতন নিযুক্ত হইবে, তাহারা যাহাতে এরূপ অশিষ্ট ব্যবহার না করে, তজ্জন্য তাহাদের বেতন মাসিক চারি টাকা হিসাবে দেওয়া যাইবে।

(Con.—206.)

কলিকাতায় প্রথম হাঁসপাতাল।

ইংরাজ-গোরা এবং কোম্পানীর জাহাজের মাঝি ও সাহেব-মাল্লাদের মধ্যে পীড়ার প্রকোপ বড়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র চিকিৎসাগৃহ বা হাঁসপাতাল স্থাপনের প্রার্থনাপত্রও কোম্পানী ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন। কোম্পানীর বেতনভোগী ডাক্তারেরাও এই হাঁসপাতাল স্থাপনের জন্য, পীড়া-পীড়ি করিতেছেন। এজন্য আদেশ করা গেল—"কলিকাতা-দুর্গের নিকট একটী সুবিধাকর উন্মুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, তথায় হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইবে। এজন্য কোম্পানী দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন। যে সমস্ত ইউরোপীয় জাহাজ দেশীয় নৌকা ও ভড় ইত্যাদি, বাণিজ্যার্থ কলিকাতা-বন্দর অতিক্রম করিবে, তাহাদের অধিকারীদের নিকট হইতে এই হাঁসপাতালের জন্য চাঁদা লওয়া হইবে। কলিকাতার অধিবাসীগণও এই হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা দিতে বাধ্য। কোম্পানীর বক্সী আডাম সাহেব—এই সমস্ত চাঁদা আদায় ও বাড়ী-নির্ম্মাণ কার্য্য তদারক করিবেন।" (Con.—218.

ধরিতে গেলে, ইহাই কলিকাতার প্রথম হাঁসপাতাল—বা বর্ত্তমান জেনারেল হাঁসপাতালের প্রথম সূচনা।

শেঠের-বাগান।

জনার্দ্দন শেঠ, গোপাল শেঠ, যদু শেঠ, বারাণসী শেঠ ও জয়কৃষ্ণ শেঠ একরার দিয়াছে—যে তাহারা কলিকাতা দুর্গের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরাংশে দেশীয় মহল্লার অংশ সমূহের মধ্য দিয়া, যে সদর রাস্তা গিয়াছে, তাহা নিজ ব্যয়ে মেরামত করিবে ও পরিষ্কার রাখিবে। এইজন্য তাহারা কোম্পানীর নিকট, বাগান-নির্ম্মাণের জন্য যে জমী জমা লইয়াছে, তাহার খাজনা বিঘা প্রতি আট আনা কম করিয়া দেওয়া হইল। যে পঞ্চান্ন বিঘা জমীতে তাহারা বাগান-নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা আমাদের জমীদারী লাভের অনেক পূর্ব্বে। ইহারাই নগরের পুরাতন অধিবাসী এবং কোম্পানী ইহাদের সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত। এইজন্য এইরূপ খাজনা রেহাই বন্দোবস্ত হইল। (Con.—215.)

গোবিন্দপুরের খাজনা-হ্রাস।

গোবিন্দপুর (বর্ত্তমান কেল্লার-মাঠ, চৌরঙ্গীর একাংশ ও কেল্লার অধিকৃত স্থান,) গ্রামের অধিবাসীরা, কোম্পানীর নিকট আবেদন করি-

য়াছে, যে তাহাদের গ্রামের জমী-সমূহ সম্বন্ধে যে খাজনা ধার্য্য করা হইয়াছে,—তাহা বড় বেশী। এজন্য তাহা নিম্নলিখিত হারে কমাইয়া দেওয়া হউক।

মোট জমীর পরিমাণ।		জমীর বায়নাক্কা।	প্রজারা যে হারে খাজনা দিতে স্বীকৃত।
৫৭ বিঘা	৯ কাঠা	... ভদ্রাসন বাটী ...	প্রতি বিঘা ২৲ কেহবা ২৷৷০
৫১০ "	১১ "	... ধানজমী ...	১৲ করিয়া বিঘা।
৩৫ "	১৪ "	... সবজীক্ষেত্র ...	১৷৷০ " "
২ "	" "	... পানের বোরজ	৩৲ " "
১৩৯ "	১৬ "	... তামাকের চাষ	২৲ " "
৫৯ "	২ "	... বাগান ...	১৷৷০ " "
১২ "	৩ "	... কলা বাগান	২৲ " "
৪ "	১০ "	... বাঁশঝাড় ...	২৲ " "
১৮ "	" "	... তৃণপূর্ণ ভূমি ...	১৲ " "

(Con.—233)

পাঠক উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিবেন—কলিকাতার বর্ত্তমান কেল্লা ও গড়ের মাঠের অধিকৃত স্থান, উল্লিখিত হারেই বিলি হইবার বন্দোবস্ত হয়। তিন টাকার উর্দ্ধে, বিঘা বিলির ক্ষমতা কোম্পানীর সনন্দে ছিল না। কিন্তু সেকালে তিন টাকা বিঘা খাজনা দিতেও লোকে আপত্তি করিত। উল্লিখিত তালিকা হইতে প্রমাণ হয়, ধান-জমীর পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাহার নীচে তামাকের জমী। পানের বোরজের জমী মোটে দুই বিঘা কিন্তু তাহার খাজনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সমস্ত গোবিন্দপুরে তখন মোটে ৫৭ বিঘা ৯ কাঠা ভদ্রাসন ছিল। ইহা হইতে প্রমাণ হয়—সুতানুটী ও কলিকাতা অঞ্চলেই—লোক-সংখ্যা কিছু বেশী ছিল।

জমীদারীর আয়-বৃদ্ধি।

১৭০৭ খৃঃ অব্দের মে হইতে ১,৭০৮ খৃঃ অব্দের এপ্রিল পর্য্যন্ত, জমীদারীর আয়-ব্যয় হইতে জানা যাইতেছে, যে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামের জমীদারীর আয়, এই এক বৎসরে ৫৭৫৬৷/৬ বৃদ্ধি পাইয়াছে। (Con.—250)

এই আয়-বৃদ্ধি হইতেই প্রমাণ হয়—কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী বন-জঙ্গল

কাটান হইয়া, সেই সমস্ত জমী প্রজাবিলি হইতেছিল। এক বৎসরে তিনখানি ক্ষুদ্র গ্রামের পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি, বড় সহজ কথা নহে! (Con.—250.)

পাকা আস্তাবল।

মাটীতে নির্ম্মিত কোম্পানীর যে সমস্ত আস্তাবলগুলি ছিল. তাহা পড়িয়া যাইতেছে—দেখিয়া, কৌন্সিল হুকুম দিলেন, যে বক্সী মিঃ এডাম্‌স, একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত আস্তাবল নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। এরূপভাবে এই আস্তাবল গৃহটী নির্ম্মিত হইবে, যেন তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সুবিধাকর স্থানেই ইহা নির্ম্মিত হওয়া উচিত। (Con.—257)

মদের ভাণ্ডার খালি।

যে জাহাজে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের ব্যবহারের জন্য বিলাত হইতে মদ আসিতেছে, তাহা এখনও কলিকাতা বন্দরে আসিয়া পৌঁছায় নাই, অথচ কোম্পানীর চিহ্নিত (Covenanted) কর্ম্মচারীদের মদিরার ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে। এজন্য কৌন্সিল আদেশ করিতেছেন—পারস্য হইতে যে মদিরা ও ফল আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাই তাঁহাদের মধ্যে বিতরণ করা হউক। (Con.—257.)

সাহেব-চোরের নির্ব্বাসন।

হান্স ফোর্ট, পিটার হ্যারন্সালটন, সাইমন জ্যান্‌সেন্ ও ভান্ এক্ নামক চারিজন সাহেব, কলিকাতার মধ্যে অনেক চুরী করিতেছে, চোরদিগকে আশ্রয় দিয়াছে ও তাহাদের চোরাই-মালের বখ্‌রা লইয়াছে। এজন্য এই চারিজনকে "হ্যারল্যাণ্ড" জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। জাহাজে তাহারা মেহনত করিয়া স্ব স্ব খোরাকী জোগাড় করিবে।

(Con.—286)

লালদীঘির পঙ্কোদ্ধার।

আমরা বিলাত হইতে আদেশ প্াইয়াছি, কলিকাতা সহরের স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার জন্য, ইহার চারিদিকে ড্রেণ করিয়া দিতে হইবে। আমাদের দুর্গের পূর্ব্বদিকে যে পুষ্করিণী আছে, তাহার আয়তন তত বিস্তৃত নহে। মার্চ্চ এপ্রেল মাসে, গঙ্গার জল খারাপ হয় ও তাহা ব্যবহার করা যায় না। এজন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের উৎকৃষ্ট পানীয়-জলের ব্যবস্থার জন্য, এই পুষ্করিণী-

টির আয়তন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কোম্পানী, আমাদিগকে ড্রেণের উন্নতি-কল্লে যে অর্থব্যয় করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেই অর্থের একাংশ এখন এই পুষ্করিণীর উন্নতির জন্য ব্যয়িত হউক। এজন্য বক্সীকে আদেশ করা যাইতেছে, যে তিনি এই পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও আয়তন বৃদ্ধি করিবেন। যে সমস্ত মাটী এই পুষ্করিণী হইতে উঠিবে—তাহা কেল্লার বুরুজ নির্ম্মাণের জন্য যে সমস্ত স্থানে খাত হইয়াছে, তাহাতে ফেলিয়া ভরাট করা হইবে।

(Con.—296.)

ব্ল্যাক-জমীদার নিয়োগ।

ব্ল্যাক-জমীদারের পদ, বহুদিন হইতে খালি পড়িয়া আছে। উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোক পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া, আমরা এ পর্য্যন্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। নন্দরাম ইতিপূর্ব্বে এই কাজ করিয়াছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। কলিকাতা প্রভৃতি তিনখানি গ্রাম ও এতন্মধ্যস্থিত বাজারগুলির পরিদর্শন ও হিসাব-পত্র রাখা এই "ব্ল্যাক-জমীদারের" কাজ। সন্তোষ মল্লিক জামিন হওয়ায়, আমরা রামভদ্রকে এই পদে নিযুক্ত করিলাম। রামভদ্র তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারী-দের ন্যায় বেতন পাইবে।

খোজা সরহদের ঋণ।

খোজা সরহদ—কোম্পানীর অনেক টাকা ধার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা শোধ করিতে পারিতেছেন না। পাছে মালপত্র সরাইয়া দিয়া, তিনি কোম্পানীকে ফাঁকি দেন, এইজন্য দুইজন বরকন্দাজকে তাঁহার বাটী চৌকী দিবার জন্য পাঠান হউক। তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি অনেক। এগুলি ক্রোক্ হইলেও, কোম্পানীর পাওনা টাকা আদায় হইতে পারে। (Con.—312)

এই খোজা সরহদ, একজন নামজাদা আর্ম্মাণী সওদাগর। সম্রাট ফরক্-শিয়ারের দরবারে, ইংরাজেরা যখন দূত প্রেরণ করেন, তখন এই খোজা সরহদই ইংরাজদের দ্বিভাষীরূপে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতায় প্রথম গির্জ্জা।

কোম্পানীর পাদরী মিঃ উইলিয়াম এণ্ডারসন সাহেব, কৌন্সিলকে জানাইয়াছেন, যে তিনি কোম্পানীর নব-নির্ম্মিত গির্জ্জাটী খুলিবার জন্য বিলাতের লর্ড বিশপের অনুমতি-পত্র পাইয়াছেন। গির্জ্জার নির্ম্মাণ কার্য্যও

শেষ হইয়া গিয়াছে। অনুমতি দেওয়া হইল, তিনি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা করিতে সক্ষম রহিলেন। (Con.—318)

এই গির্জ্জাই কলিকাতার সেণ্ট-এ্যান চর্চ্চ। পাঠক, পুরাতন ফোর্ট-উইলিয়াম-দুর্গের পার্শ্বে যে গির্জ্জার ছবি দেখিতেছেন—তাহাই সেণ্ট এ্যান গির্জ্জা। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় এরূপ চূড়াওয়ালা সাধারণ ভজনাগার ছিল না। "সেণ্ট এ্যানের" নামে ইহা উৎসর্গীকৃত হয়। ১৭৩০ সালের ঝড়ে, এই গির্জ্জার সমুন্নত চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। আজকালকার রাইটার্স-বিল্ডিংএর যে অংশে বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরগণের মন্ত্রণাসভা-গৃহ ছিল, সেকালের সেণ্ট এ্যান গির্জ্জা সেই স্থানেই ছিল।

নন্দরামের গ্রেপ্তার।

কোম্পানীর ব্ল্যাক্-জমীদার নন্দরাম, তহবিল ভাঙ্গিয়া হুগলীতে পলাইয়া গিয়াছিল। আমরা হুগলীর ফৌজদারকে লেখায়, তিনি নন্দরামকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া পত্র লিখিয়াছেন—"নন্দরাম যে কোম্পানীর বিচারালয়কে ফাঁকি দিয়া এখানে আসিয়াছিল, আর তিনি এসব কথা না জানিয়া, তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, এজন্য তিনি অতি দুঃখিত।" যতদিন পর্য্যন্ত না নন্দরামের নিকাশী হিসাব-পত্র পরীক্ষা হয়, ততদিন সে কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে। আর কলিকাতার অধিবাসীগণকেও ঢেঁড়া-সরবতে জানান হউক—যে নন্দরামের জিনিস-পত্র, মালামাল ও নগদ টাকা কড়ি, যাহা কিছু তাহাদের নিকট হেপাজত আছে—তাহা যেন এই হিসাব পরিদর্শনের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, নন্দরামকে দেওয়া না হয়। এই হিসাব-পত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে নন্দরাম কোম্পানীর কি পরিমাণে ক্ষতি করিয়াছেন। (Con.—317)

এই নন্দরাম কলিকাতার একজন ব্ল্যাক-জমীদার ছিলেন। তিনি কোম্পানীর তহবিল তছরূপ করিয়া, হুগলীর ফৌজদারের আশ্রয় লয়েন। কলিকাতা-কৌন্সিল ফৌজদারকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া পত্র লেখায়, তিনি নন্দরামকে কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের হস্তে অর্পণ করেন।

খোজা সরহদের দরখাস্ত।

খোজা সরহদ আমাদের লিখিয়াছেন—"কোম্পানীর প্রাপ্য আদায়ের জন্য, তাঁহার বাটীতে কোম্পানীর সিপাহিকে চৌকী দিবার জন্য রাখায়, তাঁহার অপমান ও হীনতা বোধ হইতেছে। তিনি কোম্পানীর প্রাপ্য

টাকা পরিশোধ করিতে প্রস্তুত।" হুকুম হইল—যে তাঁহার বাটী হইতে সিপাহী পাহারা তুলিয়া লওয়া হউক। (Con.—327)

ঘোড়া বিক্রয়।

কোম্পানীর আস্তাবলের তিনটী ঘোড়া—একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য বক্সী সাহেবকে আদেশ দেওয়া গেল—যে তিনি প্রকাশ্য নিলামে ঘোড়া তিনটীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন।

(Con.—312)

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি।

এ বৎসর কলিকাতায় চাউল বড় মহার্ঘ হইয়াছে। মান্দ্রাজ ও বোম্বায়েও চাউল দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে চাউল লইয়া যাইবার জন্য, তিন খানি জাহাজ কলিকাতায় নঙ্গর করিয়া আছে। এরূপ অবস্থায়, কলিকাতার গরীব অধিবাসীদের বিলক্ষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে। এজন্য কোম্পানী-বাহাদুর আদেশ প্রচার করিতেছেন—যে ব্যবসায়ীরা কলিকাতার মধ্যে, চাউলের দর চড়াইতে পারিবে না। উৎকৃষ্ট চাউল টাকায় একমণ বিক্রীত হইবে। কেহ এই নির্দ্দিষ্ট দরের ব্যতিক্রম করিলে, তাহা কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মচারিগণের গোচরে আনা হইবে। কোম্পানীর নিজের গুদামে ৫০০ মণ ভাল চাউল মজুত আছে। বক্সী সাহেবকে আদেশ করা হইল—তিনি উক্ত চাউল এক টাকা মণ হিসাবে, সাধারণকে সুবিধাদরে বিক্রয় করিবেন। যে সকল মহাজন উচ্চ দরে চাউল বেচিবার আশায় আছে—তাহাদের ইহাতে যথেষ্ট শিক্ষা হইবে। গরীব অধিবাসীরা যাহাতে কষ্ট না পায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। (Con.—385)

কোম্পানী বাহাদুর সেকালে তাঁহাদের প্রজাবর্গের অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য কতদূর সচেষ্ট ছিলেন, তাহা উল্লিখিত ব্যবস্থা হইতেই জানিতে পারা যায়। তখন একটাকা করিয়া চাউলের মণ বিক্রীত হইত, তাহাতেই প্রজার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। আর এখন সাড়ে সাত টাকা চাউলের মণ হইয়াছে, তাহাও গা-সহা ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে!

কলিকাতা-দুর্গের সম্মুখের জমী পরিষ্কার।

দুর্গের চারিদিকেই অনেক ছোট ছোট গাছ জন্মিয়াছে। ইহার আশে পাশে অনেকগুলি চালাঘরও নির্ম্মিত হইয়াছে। এগুলি পরিষ্কার করা বিশেষ

বিছানাপত্র ও পোষাক পরিচ্ছদাদি জোগাইবার জন্য ত্রিশ টাকা বেতনে একজন ষ্টিউয়ার্ড নিযুক্ত করা হইল। এই ষ্টিউয়ার্ড, জালানী কাঠ ও তৈলের জন্য স্বতন্ত্র ভাতা পাইবে না। (Con.—777)

পাঠক এই দুইশত বৎসর পরে, প্রাসাদমালা-শোভিত বর্ত্তমান জেনারেল হাঁসপাতালের ব্যবস্থার সহিত, দুইশত বৎসর পূর্ব্বের এই সাধারণ চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থাটী একবার তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখুন।

পারশী-লেখার খরচা।

আমরা বাদসাহ ফরকশিয়ারকে যে পৃথিবীর ম্যাপখানি উপহার দিব সংকল্প করিয়াছি, তাহার মধ্যস্থিত নামগুলি পারসীতে লিখিবার জন্য মির্জ্জা ইব্রাহিমকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সে একমাস পরিশ্রমের পর, তাহার এই কার্য্যটী শেষ করিয়াছে। এজন্য তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ—নগদ এক শত টাকা ও একশত টাকা মূল্যের বনাত দিবার আদেশ করা গেল। (Con.—811.)

পৃথিবীর-ম্যাপ।

বাদসাহ ফরকশিয়ারকে উপহার দিবার জন্য—স্বর্ণরঞ্জিত ও বিবিধবর্ণে চিত্রিত যে ম্যাপখানি—মিঃ জন বরনেল্‌কে চিত্রন করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল—তিনি তাহা অতি সুন্দররূপে শেষ করিয়াছেন। স্থানের নাম গুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যাক্ষরে পারশীতেই লেখা হইয়াছে। লেখা গুলি এত সুন্দর, যে আমরা আশা করি, মোগল বাদসাহ—ম্যাপখানি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। এই ম্যাপ প্রস্তুতের জন্য বরনেল্ সাহেব, যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে—তিনি এই পরিশ্রমের জন্য নগদ দুইশত টাকা পুরস্কার পাইবেন। আর আমরা তাঁহাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিতেছি। "কিং-উইলিয়াম" জাহাজে, তিনি বিনা ব্যয়ে বিলাতে যাইতে পারিবেন। (এই জাহাজের ভাড়া প্রতি ব্যক্তির জন্য ১২ পাউণ্ড বা ১৮০৲ টাকা ছিল।)

ধরিতে গেলে, পৃথিবীর এই ম্যাপখানির জন্য কোম্পানীর চারিশত টাকা খরচা পড়িয়াছিল। ইংরাজী নাম থাকিলে বাদসাহ—বুঝিতে পারিবেন না—এইজন্য স্থানগুলির নাম, পারশীতে লিখিবার জন্য একজন এদেশীয় মুসলমান মির্জ্জা ইব্রাহিমকে নিযুক্ত করা হয়। মির্জ্জা ইব্রাহিম নামগুলি

পারশীতে লিখিয়া দিলে, বরনেল তাহা সোণা ও রূপার জলে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন। এই ম্যাপ খানির চিত্রন-খরচা প্রায় পাঁচশত টাকা পড়িয়াছিল। (Con.– 827.)

বাদসাহী ঘড়ী-মেরামত।

আমরা মোগল-বাদসাহকে যে সমস্ত ঘড়ি উপহার দিব মনস্থ করিয়াছি, কলিকাতা হইতে আগরা যাইবার এই সুদীর্ঘ পথে, সেগুলির কল খারাপ হইয়া যাইতে পারে, বা সেগুলি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এইজন্য এই ঘড়ীগুলির মেরামতী ও হেপাজতী কার্য্যের জন্য, মিঃ গে-উড্‌কে নিযুক্ত করা হইল। গে-উড্ সাহেব, আগরায় উপস্থিত হইয়া ঘড়ীগুলিকে একবার উত্তমরূপে মেরামত করিয়া দিলে—উহা মোগল-বাদসাহকে উপহার দেওয়া হইবে। তিনি এই কার্য্যের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা বেতন পাইবেন। তাঁহার আবশ্যকীয় জিনিস পত্রাদি খরিদ করিবার জন্য, আমরা তাঁহাকে পাঁচ মাসের বেতন অগ্রিম দিলাম। (Con.—834.)

সহকারী ডাক্তার-সাহেবের পাল্কী।

কোম্পানীর সহকারী ডাক্তার-সাহেবকে, পদব্রজে নানাস্থানে রোগী দেখিতে হয়। সম্মুখেই প্রখর গ্রীষ্মকাল। তাহার পরেই বঙ্গদেশের বর্ষা। এইজন্য আদেশ করা যাইতেছে - সহকারী ডাক্তার-সাহেবের ব্যবহারের জন্য একখানি পাল্কী দেওয়া হউক। তিনি ৪ জন গোয়ালার (পাল্কীবাহক) বেতনরূপে, মাসিক আট টাকা সরকার হইতে পাইবেন।

এখনকার সরকারী ডাক্তার সাহেবেরা, মোটর চড়িয়া সহরের নানাস্থানে চিকিৎসা করেন—কিন্তু পুরাকালের এই সরকারী ডাক্তার সাহেব, চারিটী বেহারা ও একখানি পাল্কী পাইয়াই চরিতার্থ হইয়াছিলেন। (Con—835)

ঘনশ্যামের কর্ম্মচ্যুতি।

বক্সী সাহেবের বেনিয়ান, ঘনশ্যাম বিশ্বাস-ঘাতকতা করায়, আমরা তাহাকে পদচ্যুত করিলাম। ঘনশ্যামের স্থানে রামচাঁদ নিযুক্ত হইল। অনন্তরাম এই কলিকাতা সহরের মধ্যে একজন—অবস্থাপন্ন ও সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি এই নবনিযুক্ত রামচাঁদের জামিন রহিলেন। (Con—839.)

পুরাতন রৌপ্য-বিক্রয়।

কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের ব্যবহার্য্য, তিন খানি পুরাতন পাল্কীর

গায়ে যে রূপার পাত বসান ছিল, তাহা খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। এ পাল্কীগুলির পরিবর্ত্তে, নূতন পাল্কী প্রস্তুত করা হইবে। আদেশ করা গেল—রূপার পাতগুলি গলাইয়া ওজন করিয়া তাহা বিক্রয় করা হইবে।

সেকালে কোম্পানীর পদস্থ কর্ম্মচারীরা পাল্কী ব্যবহার করিতেন। প্রত্যেক প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রের কুঠির বড় সাহেবের ব্যবহারের জন্য, এইরূপ রূপার পাত-মোড়া পাল্কী দেওয়া হইত। কাশিম-বাজারের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ফিক্ সাহেবের একখানি রূপার পাত-মোড়া পাল্কী ছিল, তাহার মূল্য পাঁচ শত টাকা। সেকালের পাল্কীর বেহারাদের বেতনও খুব সস্তা ছিল। মাসিক দুই টাকা বেতনে একটী বেহারা মিলিত। (Con—950)

গোঁসাই-ঠাকুরের বিধবা।

গতকল্য আমরা কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ ফিকের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছি। সে পত্রে লেখা আছে—"নবাব মুরশীদ কুলী খাঁ শুনিয়াছেন—যে হরিরাম গোঁসাই * নামক একজন নিঃসন্তান হিন্দু-পুরোহিতের কলিকাতায় মৃত্যু হইয়াছে। তাহার অনেক টাকা কড়ি আছে। নিঃসন্তানের ও উত্তরাধিকারী-বিহীন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি, মোগল-সাম্রাজ্যের আইন অনুসারে, বাদসাহের দখলে আসিবে। এজন্য আপনারা মৃত ব্যক্তির বিধবাকে নবাব সমীপে পাঠাইয়া দিবেন।"

এই বিধবা ব্রাহ্মণী, বারাণসী শেঠের গুরুপত্নী। আমরা বারাণসী শেঠকে ডাকাইয়া তদন্ত করায় জানিতে পারিলাম, যে মৃত পুরোহিতের কোন সম্পত্তি, তাহার স্ত্রীর বা তাহার ভ্রাতৃগণের নিকট নাই। বারাণসী বলিল—"নবাব যদি এজন্য আপনাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করেন—এই হেতু আপনারা নবাবকে লিখুন—যে এই পুরোহিতের বিধবা-পত্নী যাহাতে স্থানান্তরে না পলাইতে পারে, তজ্জন্য আমি দায়ী রহিলাম। নবাবের প্রয়োজন হইলেই আমি এই বিধবাকে নবাব দরবারে হাজির করিব।"

(Con—984)

ইহার পরদিন, কৌন্সিলে, পুনরায় হিন্দু-পুরোহিতের বিধবাকে নবাব সরকারে প্রেরণ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। বারাণসী শেঠ, গোপাল শেঠ, যদু শেঠ, বিষ্ণুদাস শেঠ প্রভৃতিকে এই দিনে তলব করা হয়। মৃত পুরোহিতের

* সেরেস্তায় এই নামের বানান আছে (Herram Gussey.)

জ্ঞাতিগণ—অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ গোঁসাই, রঘুরাম গোঁসাই, নন্দকিশোর গোঁসাই, ঘনশ্যাম গোঁসাই, প্রভৃতিকেও এ ক্ষেত্রে আনান হয়। তাঁহাদের অন্য দুইজন জ্ঞাতি, অভিরাম গোস্বামী ও রঘুনন্দন গোস্বামী, নবাব-দরবারে এই বিধবার সম্পত্তি সম্বন্ধে নালিশবন্দী হওয়াতেই, এই অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা গোঁসাই ঠাকুরদের নানারূপ প্রশ্ন করায়, তাঁহারা বলিলেন—"যত শীঘ্র পারেন, তাঁহারা মুরশীদাবাদে গিয়া অভিরাম ও রঘুনন্দনের সহিত আপোসে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইবেন। যদি এ মীমাংসা শেষ না হয়, তাহা হইলে বারাণসী, যদু, গোপাল ও বিষ্ণুদাস প্রভৃতি শেঠগণ, এই বিধবা ব্রাহ্মণ-রমণীর জামিনস্বরূপ রহিলেন। যাহাতে সে অন্য কোথাও পলাইয়া না যায়, বা নবাবের হুকুম প্রাপ্তিমাত্রেই তাহাকে মুরশীদাবাদে উপস্থিত করা হয়, তজ্জন্য তাঁহারা দায়ী রহিলেন।"

উল্লিখিত ঘটনা হইতে এইটুকু প্রমাণ হয়, যে অভিরাম গোস্বামী প্রভৃতি দায়াদগণ. মৃত গোঁসায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ না পাইয়া, নবাব দরবারে গিয়া জানায়, যে হরিরামের বিধবার প্রচুর ধন সম্পত্তি আছে, অথচ তাহার সন্তানাদি নাই। তাঁহাদের নিকট এই গুপ্তসংবাদ পাইয়াই, নবাব মুরশীদকুলী খাঁ, বিধবাকে তলব করেন। কারণ, সেকালের সন্তানহীনা অবীরার সম্পত্তি, সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত ও বিধবা জীবনাবধি খোরাক পোষাক পাইত। শেঠদিগের এই বিধবার হইয়া লড়িবার কারণ বোধ হয় মৃত গোঁসাই ঠাকুর তাহাদের পুরোহিত বা গুরু ছিলেন। শেঠদিগের গোবিন্দজী ঠাকুর ও দেবালয় তখনকার কলিকাতার বিশেষ গণনীয় ব্যাপার। এই বিধবাকে পরিশেষে নবাব-দরবারে হাজির হইতে হইয়াছিল কি না—তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।

কোম্পানীর নূতন দালাল হরিনাথ।

সেকালে যাঁহারা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দালালী করিতেন, তাঁহারা বিশেষ যোত্রপন্ন বা বড়মানুষ ছিলেন। কোম্পানীর পক্ষ হইতে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করাই তাঁহাদের কার্য্য ছিল। দালালেরা সামান্য বেতন পাইতেন বটে, সেটা কেবল কোম্পানীর চাকর বলিয়া চিহ্নিত হইবার জন্য। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের দালালীতেই তাঁহাদের উদরপূর্ণ হইত। উপযুক্ত লোক ভিন্ন—এই পদ পাইতেন না। কারণ আমরা কোম্পানীর সেরেস্তার কোনও মন্তব্য হইতে জানিতে পারি,—"আমাদের ভূতপুর্ব্ব দালাল রামকৃষ্ণ

থাঁর মৃত্যুর পর হইতে এ পর্য্যন্ত, কাহাকে এ পদ দেওয়া হইবে, তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এখন মালামাল খরিদের ও মূল্য নির্দ্ধারণের সময় অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। এজন্য একজন দালাল নিয়োগ না করিলেই নয়। এইজন্য আমরা সকলে এক মত হইয়া হরিনাথকে কোম্পানীর দালালরূপে নিযুক্ত করিলাম।

(Con—989.)

এই নিয়োগের একটা ছোট খাট Ceremony বা উৎসব ছিল। কারণ উক্ত মন্তব্যে লিখিত আছে—"আমরা কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে ও নবনিযুক্ত দালালকে আহ্বান করিয়া, তাহার প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। প্রথামত নবনিযুক্ত দালালকে একটী শিরোপা ও এক বোতল গোলাপজল ও পান দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হইল। (Con—990)

ডাক্তার হ্যামিল্‌টনের উইল।

সম্রাট ফরকশিয়ারের নিকট ইংরাজেরা যে দৌত্যাভিযান প্রেরণ করেন, তাহার সহিত কোম্পানীর বেতনভোগী চিকিৎসক হামিল্‌টন সাহেবও দিল্লী গিয়াছিলেন। সম্রাটের কঠিন পীড়া আরোগ্য করিয়া, তিনি কিরূপে তাঁহার অনুগ্রহ-ভাজন হন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই, হামিল্‌টনের মৃত্যু হয়। কলিকাতায় সেণ্ট জন গির্জ্জায় তাঁহার সমাধি এখনও বর্ত্তমান। এই হাম্‌মিল্‌টনের উইলের সারমর্ম্ম আমরা পাঠকগণকে জানাইতেছি।

১। আমি আমার প্রিয়বন্ধু জেমস্‌ উইলিয়মসনকে (ইনি পরে কলিকাতা কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হন) পাঁচ হাজার পাউণ্ড দান করিলাম।

২। মিঃ এডওয়ার্ড ষ্টিভেনসনকে—পাঁচ শত টাকা ও একটী হীরক অঙ্গুরীয় দিলাম।

৩। মিঃ বারকারকে—কুড়ি পাউণ্ড ও একটী হীরার আংটী দিলাম।

৪। ফিলিপকে কুড়ি পাউণ্ড ও একটী হীরার আংটী দিলাম।

৫। বঙ্গদেশের গির্জ্জার ফণ্ডে একহাজার টাকা দিলাম।

৬। উল্লিখিত দান সমূহ ব্যতীত, আমার যে সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ টাকা ও ধনরত্নাদি রহিল, তাহা আমি আমার বিলাতবাসী

পিতা জন হামিল্‌টনকে দিলাম। তিনি তাঁহার মৃত্যুকালে, আমার সহোদর ও সহোদরাগণকে তাহা সমাংশে ভাগ করিয়া দিবেন।

৭। আমার খুড়তুতো ভগ্নী আশ হামিল্‌টন- যিনি এখন বিলাতে আছেন, তাঁহাকে পাঁচশত পাউণ্ড দিলাম।

৮। আমি মিঃ জন সরমানকে আমার ট্রষ্টি নিযুক্ত করিলাম। সম্রাট ফরকশিয়ার আমাকে যে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী ও মণিখচিত—কলগাটী দিয়াছিলেন, তাহা আমি এই সরমান সাহেবকে দান করিলাম।

ইহাই আমার শেষ উইল। সূর্য্যগড়ে—নদীবক্ষে বোটের উপর বসিয়া আমি এই উইল লিখিলাম। এখানে ষ্ট্যাম্প কাগজ পাওয়া যাইবে না বলিয়া, সাদা কাগজেই উইল লেখা হইল।

সম্ভবতঃ দিল্লী হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমনের পথে নদীবক্ষে বসিয়া হামিল্‌টন তাঁহার শেষ ইচ্ছাপত্র প্রস্তুত করেন! উল্লিখিত উইল হইতে জানা যায়, তিনি সম্রাটের নিকট হইতে যে সমস্ত বহুমূল্য অঙ্গুরীয়কাদি পাইয়াছিলেন—তাহার সবই বন্ধুবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়া যান।

১৭০৪ হইতে—১৭১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর, পুরাতন-সেরেস্তায় সেকালের কলিকাতা সম্বন্ধে. যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পূর্ব্বের কয়েক পৃষ্ঠায় বলা হইল। যে সকল প্রসঙ্গ পাঠকের চিত্তরুচিকর হইবে, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এগুলি এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অপ্রকাশিত ছিল। এগুলি হইতে পাঠক কোম্পানী বাহাদুরের জমীদারীর আয়-ব্যয়, সেকালের কার্য্যপ্রণালী ও অন্যান্য ব্যাপারের বিবিধ তথ্য অবগত হইবেন। প্রত্যেক বিষয়ের শেষে ইংরাজী অক্ষরে যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে—তাহা কোম্পানীর সেরেস্তার মন্তব্যের সংখ্যা।

ইতিপূর্ব্বে আমরা কোম্পানী-বাহাদুরের পুরাতন সেরেস্তা হইতে বিবিধ প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া নবাব মুরশীদকুলী খাঁর আমলের কলিকাতা সুতালুটী ও গোবিন্দপুরের জমীদারীর কথা, আভ্যন্তরিণ ব্যবস্থার কথা, পুলিস্‌ ও ফৌজদারির কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। এইবার সেকালের কলিকাতা সহরের অবস্থা, সেকালের ইংরাজদের সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এ প্রস্তাব শেষ করিব।

পাঠক! একবার লেখকের সঙ্গে, বর্ত্তমান গ্যাসমালা-শোভিত, প্রস্তর রেলিং বেষ্টিত লালদীঘির মধ্যে প্রবেশ করুন। লালদীঘিকেই মধ্য-কেন্দ্র করিয়া সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর কলিকাতাকে কল্পনার চক্ষে দেখিতে হইবে।

লালদীঘি বহুকালের। চার্ণকের কলিকাতায় আসিবার বহু পূর্ব্বে ইহা বর্ত্তমান ছিল—তবে বর্ত্তমান অবস্থায় নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ইহার পার্শ্বে, মজুমদারদের কাছারী বাড়ী ছিল। এই মজুমদার-জমীদারগণ, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল হইতে, পাইকান, বোরো ও আমিরাবাদ পরগণার জমীদার। বড়িসার বর্ত্তমান সাবর্ণ-চৌধুরীরাই ইহাঁদের বংশধর। সুতানুটী কলিকাতা প্রভৃতি গ্রাম এই মজুমদারেরাই কোম্পানী-বাহাদুরকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। ইহাই কোম্পানী-বাহাদুরের প্রথম ভূসম্পত্তি, ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ও এই বিশাল ব্রিটিশ-ভারত সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্বসূচনা। এই জমীদারী চালাইবার জন্য, হাটবাজার পত্তনের জন্য, প্রজাকে পাট্টা দিবার জন্য, সেই অতীতকালের জঙ্গল-বেষ্টিত ক্ষুদ্র কলিকাতা সহরের আভ্যন্তরিণ শান্তি-রক্ষার জন্য, নগরের পথঘাটের উন্নতি করিবার জন্য, এক-জন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিলেন। ইনিই কলিকাতার জমী-দার। এই সাহেব-জমীদার—কৌন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। আবার অন্যপক্ষে, তিনি কৌন্সিলের অধীনস্থ ভৃত্য। কলিকাতার আয়-ব্যয়, জরীপ, জমাবন্দী, রাস্তাঘাট, দাঙ্গা-হাঙ্গাম, আইন-আদালত, সবই এই জমীদারের হাতে ছিল। জমীদার, আয়-ব্যয়ের মাসিক ও সালতামামি হিসাব কৌন্সিলকে দিতেন।

এই লালদীঘি, এক সময়ে অতীব পঙ্কিল ও শৈবালাচ্ছাদিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। তখন ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের মধ্যে ও ক্ষুদ্র সহর কলিকাতার আশে পাশে, অনেক ইংরাজ বসবাস করিতেন। ছোট ছোট পুকুর ও খাত সহরের আশে পাশে থাকিলেও, বিশুদ্ধ পানীয়-সংগ্রহের বড়ই কষ্ট হইত। গঙ্গার জল সকল সময়ে ব্যবহার করা চলিত না। এইজন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয়জল ব্যবস্থাকল্পে, এই পঙ্কিল লালদীঘির ১৭০৯ খৃঃঅব্দে পঙ্কোদ্ধার করান হয়। ইহার চারি পাশে পথঘাট করিয়া দেওয়া হয়। মধ্যে মধ্যে সবজী-বাগানও করা হয়। এই সবজী-বাগানের অনেক ফলমূল, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের উদরপোষণ করিত। সন্ধ্যার পর, ইহা তাঁহাদের সান্ধ্য বায়ুসেবনের স্থান ছিল। ইহার পরিষ্কার জলে তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবারণ হইত। কোম্পানীর পুরাতন সেরেস্তা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, লালদীঘির এ বাগানে কমলালেবুর গাছ পর্য্যন্ত পোঁতা হইয়াছিল।

এইবার পাঠক—এই লালদীঘির মধ্য হইতে, বর্ত্তমান জেনারেল

পোষ্টাপিস ও কালেক্টারি আপিসের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখুন। বর্ত্তমান কয়লাঘাট ষ্ট্রীট ও ফেয়ারলি প্লেসের মধ্যে, এখন জেনারেল পোষ্টাপিস বা কলিকাতার বড় ডাকঘর, তাহার পাশে কালেক্টারী-আফিস্, তৎপার্শ্বে কষ্টম-হাউস্ ও সর্ব্বশেষে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর প্রাসাদতুল্য কার্য্যালয়। তৎপরেই ফেয়ারলি-প্লেস। বর্ত্তমান কয়লাঘাট ষ্ট্রীট্ ও ফেয়ারলি-প্লেসের অধিকৃত সীমার মধ্যেই, কলিকাতার প্রাচীন ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ স্থাপিত ছিল। ইহাই ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সেরাজ-উদ্দৌলা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়।

এই দুর্গের মধ্যে, কোম্পানীর মালগুদাম, কার্য্যালয়, গবর্ণর সাহেবের বাটী, সেনাদের থাকিবার স্থান ছিল। এই দুর্গের মধ্যে গবর্ণর সাহেবের বাটীটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সুন্দর ছিল। তথাচ যুক্ত-কোম্পানীর অধ্যক্ষ স্যর এডওয়ার্ড লিটলটান, এই সুন্দর বাড়ী পছন্দ না করিয়া, দুর্গের বাহিরে একটী স্বতন্ত্র বাটীতে থাকিবার ব্যবস্থা করেন। দুর্গের আশে পাশে, দূরে অদূরে, অনেক ইংরাজ বাস করিতেন। বর্ত্তমান প্রিন্সেপ-ঘাটের অদূরে, খিদিরপুরের নিকট সার্ম্মান সাহেবের বাটী ছিল। দুর্গের আশে পাশে, বামে দক্ষিণে, গঙ্গার ধারে, লাল-বাজার প্রভৃতি স্থানেও সাহেবেরা কার্য্যোপলক্ষে স্বতন্ত্র কুঠিতে বাস করিতেন।

সহরের দেশীয় অংশে অনেক বাঙ্গালী লম্বা-চওড়া বাস্তুভিটা করিয়া বাস করিতেন। এ সকল বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর ও মধ্যে পুষ্করিণী ও বাগান ইত্যাদি ছিল। অনেকে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত, জমী ঘিরিয়া লইয়া পাচিল দিয়া আবাসবাটী প্রস্তত করিত। কোম্পানী-বাহাদুর যখন দেখি-লেন—যে কলিকাতার মধ্যে দেশীয়দের খনিত পুষ্করিণীর সংখ্যা দিন দিন বেশী হইয়া উঠিতেছে, আর তাহারা বিনা জরীপে ইচ্ছামত জমী লইয়া বাস করিতেছে—তখন তাঁহারা ইহার প্রতিকারার্থে বদ্ধ পরিকর হন। এইজন্য দুই তিনবার সহর কলিকাতা জরীপের বন্দোবস্তও হয়। ঢোল-সরাবতে নোটিস্ প্রচার করিয়া কোম্পানী-বাহাদুর সাধারণকে জানাইয়া দেন—"এরূপ অন্যায় ভাবে জমী দখল করিয়া ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিতে তোমরা আর পারিবে না। তোমাদিগকে জমীদারের নিকট হইতে দস্তর মত পাট্টা লইতে হইবে। তাহাতে জমীর পরিমাণ ও খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। প্রয়োজন হইলেই জমীদার সাহেব, এই পাট্টা তলব ও তজ্‌দীগ করিতে

পারিবেন।" তথনকার পাট্টা কিরূপ ছিল, তাহার বাঙ্গালা ও ইংরাজী নমুনা আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি।

আজকাল যাহা "ষ্ট্রাণ্ডরোড্" বলিয়া পরিচিত, যাহার উপর এখন ট্রাম চলিতেছে—তাহা তখন নদীগর্ভে ছিল। ভাগীরথীর স্রোত আসিয়া, তখন পুরাতন ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ-প্রাকার চুম্বন করিত। নদীর কিনারা কত-দূর বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রমাণ এখনও আছে। নদীকূলের যে ঘাট দিয়া সেরাজের সেনারা দুর্গ-প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার চিহ্নও লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের চেষ্টায় সুরক্ষিত। পাঠক, রেলওয়ে আফিসের মধ্যের উঠানে প্রবেশ করিলেই ইহা দেখিতে পাইবেন।

আজকাল যেখানে বড়বাজারের পানপোস্তা, রাজার চক্ প্রভৃতি বর্ত্তমান —তাহাও নদীগর্ভে ছিল। হিন্দু ব্যবসায়ীরা নৌকায় করিয়া মাল আনিয়া বড়বাজারের নঙ্গরেশ্বর ঘাটে নৌকা ও ডিঙ্গী ভিড়াইত।

বর্ত্তমান কয়লাঘাট ও চাঁদপাল ঘাটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, একটী খাল ছিল। এইখালে বড় বড় নৌকা যাইতে পারিত। আজকাল যাহা হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট্ বলিয়া প্রখ্যাত, যাহার আশে পাশে প্রাসাদতুল্য বাড়ী, সরকারী আপিস, সেই রাস্তা খালের গর্ভে ছিল।

এই খাল, বরাবর মাঠের ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া, ক্রিক্ রো ও ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার পর বেলিয়াঘাটার মধ্য দিয়া আরও কিছুদূর গিয়া, ইহা ধাপা বা Salt Water Lake এর সহিত মিশিয়াছিল। এই খালের দুই দিকেই পঙ্কিল নালা-নর্দ্দামা, দুই ধারে জঙ্গল ও বড় বড় গাছ ছিল। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে যে স্থানে এখন সেণ্ট জন গির্জ্জা বর্ত্তমান, তাহার পার্শ্বেই কলিকাতার পুরাকালের গোরস্থান ছিল। এই সমাধিক্ষেত্রে, এখনও কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক, কলিকাতায় দুর্গ-প্রতিষ্ঠাকারী স্যর জন গোল্ডস্‌বরা, কোম্পানীর চিকিৎসক স্বনামখ্যাত ডাক্তার হামিলটান প্রভৃতি সেকালের অনেক লোকের সমাধি আজও বর্ত্তমান। তখন বর্ত্তমান সেণ্ট জন গির্জ্জা নির্ম্মিত হয় নাই। এই স্থানের এক অংশে সমাধিক্ষেত্র ও অন্য অংশে কোম্পানীর এক হাঁসপাতাল ছিল।

এই খালের আশে পাশে, ঝোপ, বড় বড় গাছ, মধ্যে মধ্যে পঙ্কিল জল-পূর্ণ নালা ও ডোবা ছিল। এই স্থান হইতে একটী অপ্রশস্ত পথ বাহির হইয়া আজকাল যেখানে গড়ের মাঠের কেল্লা আছে ও পূর্ব্বে যে স্থানকে গোবিন্দপুর বলিত, সেই পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। আজকাল যাহা এস্‌প্লানেড,

বা ধর্ম্মতলা বলিয়া কথিত, তাহার অধিকাংশই জঙ্গলপূর্ণ ছিল। তবে এই জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বা গোচারণ-ভূমি, কোথাও বা বিশৃঙ্খলভাবে নির্ম্মিত দুই চারিটী গ্রাম্য-কুটীর।

সেই সময়ে ইংরাজগণ প্রাচীন-দুর্গের ও লালদীঘির আশেপাশের অধিকৃত ভূভাগে বাস করিতেন। প্রাচীন-দুর্গের সন্নিকটে ইংরাজ-পল্লী স্থাপিত হওয়ায়, এ স্থানটীর চারিদিকে ও রাস্তার দুইধারে বৃক্ষাদি রোপিত হইয়াছিল, রাস্তা ঘাটও নির্ম্মিত হইয়াছিল—এবং পার্শ্বস্থ পল্লীভূমিও অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল।*

তখন টানাপাখার রেওয়াজ ছিল না। সেকালের সাহেবদের এই সব বাটীতে শার্সী-খড়খড়ি দুলিত না। বেতের জানালা ও প্যানেল আঁটা দরোজা-গুলি তখন সাহেবদের বাড়ীর-সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন করিত। সে সময়ে কলিকাতায় গাড়ী-ঘোড়ার প্রচলনও হয় নাই। পালকী তখনকার প্রধান যান। গাড়ী চলিবার মত কোন পাকা ও প্রশস্ত রাস্তাই তখন কলিকাতায় ছিল না।†

আজকাল যাহা ক্লাইভ-ষ্ট্রীট বলিয়া সাধারণে পরিচিত, দুইশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, তাহাই প্রাচীন কলিকাতার "সাহেবী-কোয়ার্টার" ছিল। প্রাসাদ-সৌন্দর্য্যময়ী চৌরঙ্গী, তখন জঙ্গলের মধ্যে শার্দ্দুল ও বন্যবরাহের ক্রীড়াভূমি, দস্যু ও চোরের প্রধান আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল। এই ক্লাইভ-ষ্ট্রীটই তখন সরাসর বড়বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছিল ও ইহাই কলিকাতার প্রধান বর্ত্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন ইহার নাম ক্লাইভ ষ্ট্রীট ছিল না—কি ছিল, তাহাও প্রকাশ নাই। তবে ইংরাজেরা এই পথটীকে Road to Great Bazar বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।

তখন (Old Court House Street) ওল্ড কোর্ট-হাউস ষ্ট্রীটের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আজকাল যে রাস্তাটী ওয়েষ্ট-এণ্ড ওয়াচ কোম্পানীর

---

* Round their little Fort and close to it, if not elegant houses, a church, a court-house and the like, laid-out walks, planted trees that made their own district neat clean and convenient—Price's Observations. এই কোর্ট-হাউস হইতেই Old Court House Street নামকরণ হইয়াছে। কাপ্তেন হ্যামিলটান লিখিয়া গিয়াছেন,—ইংরাজ ও দেশীয় অধিবাসীরা তখন স্ব স্ব আবাসস্থানের চারিদিকে বাগান নির্ম্মাণ করিতেন। প্রত্যেক সাহেব অধিবাসীর বাসগৃহ-সংলগ্ন এক এক খানি বাগান ছিল। এই সমস্ত বাড়ী ও বাগান সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কিয়দংশ, রাইটার্স বিল্ডিংএর পশ্চাদ্ভাগ ও চীনাবাজারের কতকাংশ স্থান ব্যাপিয়া ছিল।

† Carriages they had none for there were no carriage-roads in the country then, nor for many years after (Hamilton's Account).

ঘড়ির দোকান হইতে আরম্ভ হইয়া, কারেন্সি আপিসের সম্মুখ দিয়া, বরাবর এস্‌প্লানেডের বা ধর্ম্মতলার দিকে গিয়াছে—তাহার যে অংশ, লালদিঘীর পার্শ্ববর্ত্তী ছিল, তাহা তৃণশষ্পাবৃত ভূমি মাত্র। এই তৃণ-ক্ষেত্র বর্ত্তমান মিশন রো, পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই মিশন রো, সেই সময়ে Rope walk (রোপ্‌ওয়াক্‌) নামে পরিচিত ছিল। আর একটী পথ বর্ত্তমান কারেন্সি আপিসের সম্মুখ হইতে, টেলিগ্রাফ-আপিসের সম্মুখ দিয়া, কয়লাঘাটের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। এই রাস্তার শেষাংশে অর্থাৎ কয়লাঘাট রাস্তার পার্শ্বে দুর্গের সীমানার মধ্যেই কোম্পানীর মালগুদাম ও বারুদের ভাণ্ডার প্রভৃতি ছিল। ইহার অপর পার্শ্বে গোরস্থান ও শূন্যভূমি। এই গোরস্থানই এখন সেণ্ট জন গির্জ্জার অধিকৃত স্থান।

লালদীঘির বা পার্কের উত্তরে অর্থাৎ বর্ত্তমান বেঙ্গল-সেক্রেটারিয়েট অফিসের যে স্থানে লাটদিগের মন্ত্রণা-সভার অনুষ্ঠান হইত, সেই স্থানেই কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম গির্জ্জা সেণ্ট এন্‌ (St. Anne) স্থাপিত ছিল। এখন সে গির্জ্জার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। ১৭০৯ খৃঃ অব্দে এই গির্জ্জার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। রাইটার্স-বিল্ডিংএর ঠিক সম্মুখ দিয়া যে রাস্তা আজকাল লালবাজার, বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে গিয়াছে—তাহা, বর্ত্তমান লালবাজারের মোড়ের নিকট আর একটী ক্ষুদ্র পথের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই পথ, জঙ্গলের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-বাহি হইয়া কালীঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এখন ইহা বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীট, কসাইটোলা প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই ক্ষুদ্র বনপথ, ধরিয়া সেকালের কালীঘাট-তীর্থযাত্রীরা, চৌরঙ্গীর জঙ্গল মধ্যবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র যাত্রী পথে আসিয়া পড়িতেন। লালবাজারের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, অনেক এ দেশীয় নামজাদা বড়লোকের বাগানবাটীরূপে পরিণত হইয়াছিল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অমিচাঁদের বাগান, লালবাজারের অতি নিকটেই ছিল।

কোম্পানীর গবর্ণর সাহেব, পুরাতন কেল্লার মধ্যেই থাকিতেন। তাঁহার আবাসস্থানটী কেল্লার মধ্যে বিশেষ শোভাসম্পদময় ছিল। দুর্গের মধ্যে, অনেক ফ্যাক্‌টার ও রাইটারগণ বাস করিতেন। কোম্পানীর রাইটার ও ফ্যাক্‌টারদিগকে, বড়ই কড়াকড়ি ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত, তাঁহারাই কেবল দুর্গের বাহিরে বাস করিতে পারিতেন। অবিবাহিত কর্ম্মচারিগণকে দুর্গের মধ্যে থাকিতে হইত। কোম্পানীর কলিকাতার দুর্গে, তখন দুইশত হইতে তিনশত বিলাতী ও দেশীয় সেনা থাকিত। ইহারা কোম্পানীর মালামাল চৌকী দেওয়া কার্য্যেই

নিয়োজিত হইত। পাটনা, কাশিম-বাজার প্রভৃতি ফ্যাক্টারী হইতে মালামাল আনয়নকালে বা পৌছিয়া দিবার সময় প্রহরীর কার্য্য করা প্রভৃতি ব্যাপারেই ইহারা প্রধানতঃ নিয়োজিত হইত।

কৌন্সিলের প্রেসিডেন্ট সাহেবই সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ইনিই 'গবর্ণর' নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহার অধীনে, একটী কৌন্সিল বা মন্ত্রণা-সভা ছিল। গবর্ণর সাহেব এই মন্ত্রণা-সভার সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় সদস্যপদ প্রায়ই কাশিম-বাজার, পাটনা প্রভৃতি কুঠীর অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীরা পাইতেন। সভার তৃতীয় সদস্য—হিসাব-রক্ষক বা একাউন্ট্যাণ্টের কার্য্য করিতেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সদস্য—যথাক্রমে আমদানী ও রপ্তানী মাল-গুদামের মালামালের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। সপ্তম সদস্য—বক্সী বা খাতাঞ্জি বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। কোম্পানীর টাকা কড়ি ইহাঁর হাত দিয়াই খরচ হইত। সকৌন্সিল গবর্ণর, যখন যে কাজে অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছা করিতেন—তাহার আদেশ এই বক্‌সী সাহেবকেই দেওয়া হইত। কৌন্সিলের অষ্টম ব্যক্তি—কোম্পানীর অধিকৃত গ্রাম-ত্রয়ের জমীদারীর হিসাব রাখিতেন। ইনিই 'কালেকটার বা জমীদার' নামে অভিহিত হইতেন। জমী প্রজা-বিলি করা, তাহার খাজনা আদায় করা, সহরের উন্নতি করা, প্রজাকে দাখিলা দেওয়া, পাট্টাকবুলতি দেওয়া, বাজার সমূহের নির্দ্ধারিত শুল্ক আদায় করা, নগরের শান্তিরক্ষা করা, জমীদারের নির্দ্ধারিত কার্য্য ছিল। জমীদারের অধীনে যে দেশীয় কর্ম্মচারী থাকিতেন, তিনিই ব্ল্যাক-জমীদার নামে অভিহিত হইতেন।

কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের বেতনের হার কিরূপ ছিল, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। প্রেসিডেন্ট ও পাদরী সাহেব, প্রত্যেকেই বাৎসরিক একশত পাউণ্ড বা ন্যূনাধিক পনরশত মুদ্রা বেতন পাইতেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা, প্রত্যেকে বৎসরে সাড়ে ছয়শত টাকা বা চল্লিশ পাউণ্ড বেতন পাইতেন। পূর্ব্বে আমরা যে ডাক্তার হামিলটনের কথা বলিয়াছি, যিনি সম্রাট ফরকশিয়ারের পীড়া আরোগ্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনি বৎসরে ৩৪ পাউণ্ড বা ন্যূনাধিক পাঁচশত টাকা বেতন পাইতেন। কোম্পানীর যে সমস্ত সাহেব কর্ম্মচারী, কলিকাতা দুর্গের মধ্যে না থাকিয়া সহরে থাকিতেন, তাঁহারা বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বাবত ৩০৲ টাকা করিয়া প্রতিমাসে অতিরিক্ত ভাতা পাইতেন।

যাঁহারা দুর্গমধ্যে থাকিতেন—উঁহারা একত্রেই আহার করিতেন।

আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা হইবামাত্র, সকলেই সুদীর্ঘ খানার টেবিলের পাশে আসিয়া বসিতেন। দুর্গের মধ্যেই রন্ধনশালা ছিল। আজকাল যেমন খানসামাদের চুরী অপবাদ ও জিনিসপত্র নষ্ট করার একটা অখ্যাতি আছে, দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও ঠিক্ সেইরূপ ছিল। সেকালের মশাল্‌চি, খিদমৎগার, প্রভৃতি অতি লুব্ধ প্রকৃতির ছিল। পাচকরূপে অনেক পর্টুগীজ ও এদেশীয় লোক নিযুক্ত হইত। ইহারা জিনিসপত্র চুরি করিত, অতিরিক্ত দস্তুরী আদায় করিত, বাসন ও প্লেটসমূহ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিত—আর এই সব দোষের জন্য শাস্তি পাইত ও বরখাস্ত হইত।

সেকালের সাহেবদের সামাজিক-জীবন বড়ই একঘেয়ে রকমের ছিল। এখনকার কালের মত, এত বল-ডান্স, থিয়েটার, অপেরার অস্তিত্ব ছিল না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা, প্রাতঃকালেই আফিস করিতেন। মধ্যাহ্নে, মধ্যাহ্ন-কৃত্য হইত। অপরাহ্নে, আবার আফিসের কাজ চলিত। সন্ধ্যার প্রারম্ভে কেহবা পদব্রজে, কেহবা পাল্কীতে চড়িয়া, সান্ধ্যবায়ু সেবনে বাহির হইতেন। যাঁহারা দীর্ঘ ছুটি পাইতেন—তাঁহারা বজরা করিয়া ভাগীরথী বক্ষে বেড়াইতেন। কেহবা নদীতে মাছ ধরিতেন কেহবা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পক্ষী-শিকার করিতেন। তখন কলিকাতার আশে পাশে বনজঙ্গলের অভাব ছিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে, অনেকেই বন্ধু বান্ধবদের বাটীতে গিয়া দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। অনেক ফ্যাক্টার, বিবি ডোমিঙ্গ আসের হোটেলখানায় বসিয়া সেকালে প্রচলিত, "আরক" নামধেয় উগ্র-মদিরা পান করিতেন। এই হোটেলখানার জটলার মধ্যে দেশের সকলস্থানের সর্ব্ববিধ সংবাদেরই আদান প্রদান চলিত।

প্রত্যেক সপ্তাহের প্রথমে মন্ত্রণা-সভা বসিত। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে নয় ঘটিকার সময় এই সভার অনুষ্ঠান হইত। মস্‌লিনের কামিজ, পায়জামা সাদাটুপী, ইত্যাদি পরিধান করিয়া কৌন্সিলে বসা চলিত। কৌন্সিল বসিবার সময়, সভার সেক্রেটারি একটী পাত্রে জল ও আর একটী মদিরাধারে প্রচুর পরিমাণে 'আরক' ভরিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিতেন। প্রয়োজনমত ইহা মিশাইয়া "Punch" বা উগ্র-মিশ্র করিয়া লওয়া হইত। সদস্যগণ কার্য্যকালে তাহা মধ্যে মধ্যে পান করিতেন। কখন কখন মদিরার উত্তেজনা ফলে, নানা বিষয়ের বাদানুবাদ দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত চলিত। তখন পুস্তকাদি বড় দুষ্প্রাপ্য ছিল।

সেকালে কলিকাতায় মেমসাহেবদের সংখ্যাও বেশী ছিল না—এবং

দূরাদূরে শিকার করার সখও খুব কম ছিল। সেই সময়ে "নদীয়া" বা নবদ্বীপ, যে একটী স্বাস্থ্যকর-স্থান ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই, যে গবর্ণর-সাহেব হইতে অন্যান্য পদস্থকর্ম্মচারীদের অনেকেই নদীয়াতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেন।

তখন কলিকাতাতে একজন মাত্র বেতনভোগী পাদরী ছিলেন। পাদরী-সাহেব প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনার জন্য দুর্গমধ্যে সমাগত হইয়া, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সহিত প্রার্থনাদি করিতেন। প্রতি রবিবারে কোম্পানীর সমস্ত সাহেব কর্ম্মচারীরা দলবদ্ধ হইয়া, নিকটবর্ত্তী গির্জ্জায় যাইতেন। গবর্ণর সাহেবও পদব্রজে এই দলের অগ্রবর্ত্তী হইতেন। এই গির্জ্জা, কলিকাতার প্রথম গির্জ্জা সেণ্ট এন্। যখন কোন কারণে এই বেতনভোগী পাদরীসাহেব অনুপস্থিত হইতেন, তখন কৌন্সিলের একজন মেম্বরকে পাদরীর হইয়া কাজ করিতে হইত। সেই পুরাকালে কোম্পানীর অধিকারের মধ্যে যে কোন ইংরাজ ইহলোক ত্যাগ করিতেন, তাঁহাদের উইল বা শেষ ইচ্ছাপত্র কৌন্সিলে পেস্ না হইলে পাকা দলিল বলিয়া মঞ্জুর হইত না।

আমরা যে সময়ের কলিকাতার কথা বলিতেছি, সে সময়ে কলিকাতার স্বাস্থ্য আদৌ ভাল ছিল না। ম্যালেরিয়ার জ্বালায়, তখন কলিকাতার অধিবাসীরা বড়ই জ্বালাতন হইতেন। ১৭০৭ খৃঃ অব্দের শরৎকালে, কলিকাতায় প্রথম হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে কোন সাধারণ-চিকিৎসালয় ছিল না। ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে একজনের বেশী সাহেব-ডাক্তার কলিকাতায় ছিল না। ম্যালেরিয়া-জ্বরে সাহেবদেরই বেশী মৃত্যু হইত। কাপ্তেন হামিলটান সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন—"যাঁহারা একবার হাঁসপাতালে প্রবেশ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক রোগীই ফিরিয়া আসিত।"* ইহা হইতে প্রমাণ হয়, হাঁসপাতালের বন্দোবস্ত তখনও তৎ-সাময়িক প্রয়োজন মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই।

১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে, ইংলণ্ডের সম্রাট, প্রথম জর্জ্জের আমলে, রাজকীয় সনন্দানুসারে কলিকাতার প্রথম আদালত স্থাপিত হয়। মেয়ার-আদালতই ইংরাজদের সর্ব্বপ্রথম বিচারালয়। ইহা "কোর্ট অব রেকর্ড" নামেও

---

* The Company has a pretty good hospital at Calcutta where many go in to undergo the greivance of physic, but few came out to give account of its operation.

(Cap. Alexander Hamilton's Account of Calcutta).

পরিচিত ছিল। এই আদালতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য, একজন মেয়র, ও নয়জন সহকারী বিচারক বা Alderman ছিলেন। এই নয়জন মেয়রের মধ্যে সাতজন খাঁটি ইংরাজ নির্ব্বাচিত হইতেন, বাকী দুইজন অন্য দেশীয় প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান হইলেও চলিত। এই আদালতে, প্রধানতঃ ইংরাজদের বিষয়-ঘটিত দেওয়ানী মোকদ্দমার শুনানী হইত। এই আদালতের রায়ই শেষ নহে—ইহার উপর "কোর্ট-অফ্-আপিল" বলিয়া আর একটী আদালত ছিল। এই আদালতে স্বয়ং গবর্ণর ও তাঁহার কৌন্সিলের সদস্যগণ একত্রে বসিয়া বিচার করিতেন। এতদ্ব্যতীত সেকালে Court of Quarter Sessions বলিয়া আর একটী ফৌজদারী আদালত ছিল। গবর্ণর সাহেব এই আদালতে বসিতেন। সহরের যে কিছু বড় বড় ফৌজদারী মামলা, এখানেই নিষ্পত্তি হইত। ইহার আর একটী অবান্তর নাম ছিল "Court of Oyer and Terminar and Goal Delivery." এতদ্ব্যতীত কোর্ট অব রিকোয়েষ্টস্ (Court of Requests) বলিয়া আর একটী আদালত ছিল। কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্য হইতে গবর্ণরসাহেব কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ২৪ জন কমিশনার এই আদালতে বসিতেন। যে সমস্ত মোৎফরেক্কা মোকদ্দমার সরাসরি বিচার হইত, তাহা এই কমিশনারেরা পালা করিয়া বিচারকরূপে বসিয়া নিষ্পত্তি করিতেন। ইহাতে অনেকটা বর্ত্তমান ছোট-আদালতের মত কাজ হইত। সামান্য টাকাকড়ির দেনাপাওনা, এই আদালতেই সরাসরভাবে বিচার হইত। পাঁচ প্যাগেডা অর্থাৎ চল্লিশ শিলিং পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিশ-ত্রিশ টাকার পাওনার দাবী, এ আদালত হইতেই নিষ্পত্তি হইত।

কোম্পানী-বাহাদুর যে সময়ে কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয় বাদসাহী ফারমান অনুসারে লাভ করিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে আসিয়া জমীদারী পত্তন করিলেন। এই জমীদারিই তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই গ্রাম তিন খানির কল্যাণেই, এই বিশাল ব্রিটীশ-ভারতবর্ষ অর্জ্জিত হইয়াছে।

এই জমীদারীর জন্য তাঁহাদিগকে মোগল-সরকারে ১২৮১॥০ খাজনা দিতে হইত। এই খাজনা তুলিবার জন্য, তাঁহারা এই গ্রামত্রয়ের জমী প্রজাবিলি করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত জরিমানা, বাজেয়াপ্ত; কষ্টম ও শুল্ক প্রভৃতি আবওয়াবেও জমীদারীর তহবিলে উপরি আদায় হইত। কিন্তু প্রথম প্রথম, মোগল-সরকারের খাজনা দিতে তাঁহাদের একটু বেগ পাইতে

হইয়াছিল। কারণ কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামে, যে অনুপাতে প্রজাবিলি হইয়াছিল, সেই অনুপাতে খাজনা আদায় হইত না। অনেকে প্রতারণা-পূর্ব্বক স্বেচ্ছামত বেশী জমী দখল করিয়া লইত, কিম্বা দখলী-জমীর পরিমাণের তুলনায়, নির্দ্দিষ্ট হারের অপেক্ষা কম খাজনা দিত। কাজেই প্রথম প্রথম এই গ্রামত্রয়ের খাজনা, উক্ত ১২৮১৲ টাকার কাছেও পৌঁছিত না।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, কোম্পানী-বাহাদুর ১৭০৪ সালে এই গ্রামত্রয়ের জরীপের আদেশ দেন। এই জরীপের ফলে, যে সব অধিবাসী অতিরিক্ত জমী দখল করিয়া কম খাজনা দিত, তাহারা ধরা পড়িল। কোম্পানী বাহাদুর, সেই সব অতিরিক্ত জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া, পুনরায় প্রজাবিলি করিতে লাগিলেন। ইহাতে জমীদারীর আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই রালফ্ শেলডন্ কালেক্টারের বা জমীদারের কাজ করিতেন। এই জরীপ-জমাবন্দীর পর হইতে তাঁহার কাজ বাড়িয়া উঠিল। এই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে একজন জমীদার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার হস্তে খাজনা আদায়, জমীবিলি, জমীর জরীপ, সহরের পথ-ঘাটের উন্নতি, জরিমানা আদায়, ব্যবসায়ীদের নিকট শুল্ক আদায়, বাজারের ব্যবসায়ীদের নিকট দস্তুরী ও তোলা আদায় প্রভৃতি কাজের ভার পড়িল। দেশীয়দের মধ্যে যে সমস্ত ফৌজ-দারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইত, জমীদার সাহেব তাহারও বিচার করিতেন। তাঁহার অধীনেই জমীদারী ও ফৌজদারী-কাছারি ছিল ও পুলিস-বিভাগ ছিল। তখন চুরী ডাকাতি খুন-জখম খুবই হইত। এজন্য মধ্যে মধ্যে পুলিসের শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইত। তখন সংবাদপত্র ও ছাপা-খানা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। এজন্য কোম্পানী-বাহাদুরের কোন আদেশ সাধারণে প্রচারিত হইবার সময়, তাহা ঢেঁড়া দ্বারা সহরময় প্রচার করা হইত, কিম্বা তৎসম্বন্ধে ইংরাজী, বাঙ্গলা, উর্দ্দুতে নোটিশ লিখিয়া ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গদ্বারে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইত। ইউরোপীয়দের বিচার—কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত আদালতেই হইত। সে সকল আদালতের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সমস্ত আদালতে ছোট ছোট মামলার বিচার চলিত। বড় আদালতে, সকৌন্সিল গবর্ণর সাহেব 'ফুলবেঞ্চে' বিচার করিতেন। খুব বড় ও জটিল মোকদ্দমা হইলে, তাহা মান্দ্রাজের কর্ত্তাদের নিকট বিচারার্থে পাঠান হইত।

১৭০৬ খ্রীঃ অব্দের কাগজ পত্র হইতে সেকালের চোর-ডাকাতের শাস্তির কথা কিছু কিছু জানা যায়। উক্ত সালের একটী মন্তব্যে দেখা যায়—

"কতকগুলি চোর ও নরঘাতক ধরা পড়িয়াছে, অতএব আদেশ করা হইল তাহাদের গালে লোহা পোড়াইয়া ছাঁকা দিয়া, তাহাদিগকে কলিকাতা হইতে নদীর অপরপারে তাড়াইয়া দেওয়া হউক।" যে সকল প্রজা জমী জমা করিয়া লইয়া তাহার খাজনা দিতে অপারক হইত, খাজনা উসুল দিতে বাকী ফেলিত বা খাজনা দিবার সময় বদমায়েসী করিত—তাহাদিগকে কালেক্টারের কাছারীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, চাবুক দেওয়া হইত অথবা অন্য উপায়ে শাস্তি দিয়া খাজনা আদায়ের চেষ্টা করা হইত।* এ বিষয়ে জমীদার বা কালেক্টার সাহেবের সর্ব্বাসর ক্ষমতা ছিল। উচ্চ আদালতের সহিত কোন সংস্রব ছিল না।

জমীদার বা কালেক্টার সাহেবের সহকারীরূপে, একজন এদেশীয় বাঙ্গালী নিযুক্ত হইতেন ও তিনিই যে "ব্ল্যাক-জমীদার" নামে পরিচিত ছিলেন, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ব্ল্যাক-জমীদারগণ কালেক্টারের ন্যায় ক্ষমতা পরিচালন করিতেন।†

আমরা ইতঃপূর্ব্বে কোম্পানী-বাহাদুরের "Consultations" বা মন্তব্য-পত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন নামের ও ঘটনার হেডিং দিয়া যে সমস্ত অংশ উদ্ধার করিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠক সেকালের কলিকাতার নানাবিধ ঘটনার কথা জানিতে পারিবেন। সেগুলির সমালোচনা ও পুনরাবৃত্তি করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে, সে সময়ে দেশীয় অধিবাসীর সংখ্যা বেশী হইলেও, তাহাদের মধ্যে নামজাদা লোক খুব কমই ছিলেন। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও কিছুই জানিবার উপায় নাই। কোম্পানীর 'কন্সলটেশনে' যে সকল বাঙ্গালীর নাম পাওয়া যায়—সেইগুলিই আমরা বহু চেষ্টায় খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি।

কোম্পানীর জমিদারী সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার কথা আছে। সে

* In his capacity as revenue officer he held what was known as Collector's Cutcherry, where the farmers and tenants under his Jurisdiction who are backward in their payments are confined, whipped or otherwise punished independently of the other Courts at Calcutta. (Sterndale's Report & Cotton).

† That by reason of the many changes in the headship of the office a power in perpetuity devolved on the standing Deputy, who is always styled the "Black Zaminder" and such was the tyranny of this man and such was the dread conceived of him in the minds of the natives that no one durst complain or give information.

গুলি হইতে, পাঠক প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন।

কালেক্টারীর পুরাতন সেরেস্তার মধ্যে, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার ষ্টারণডেল্ সাহেব, ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দের ১৫৬১ নং এর একখানি পুরাতন পাট্টা দেখিয়াছিলেন। ঐ পাট্টায় মিঃ জ্যাক্‌সন বলিয়া একজন কালেক্টারের সহী আছে।

স্বনামখ্যাত হলওয়েল, প্রাচীন কলিকাতার ইংরাজ-জমীদারগণের মধ্যে একজন বিশেষ নামজাদা কালেক্টার। ষ্টারণডেলের মতে, হলওয়েল ১৭৫২ হইতে ১৭৫৬ অর্থাৎ সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কলিকাতার জমীদার ছিলেন। তাঁহার আমলের পাট্টাবহী আজও বর্ত্তমান।

কোম্পানীর অনেক দরকারী কাগজপত্র ও পুরাতন সেরেস্তাবহী কলিকাতা দুর্গের মধ্যে ছিল। সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণ সময়ে,এই সকল রেকর্ডের অনেক নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য অনেক পাট্টা-কবুলতির সম্বন্ধে রেজেষ্ট্রী-বহীতে নম্বর পাইলেও তাহাদের প্রতিলিপি পাওয়া দুর্ঘট।

ক্লাইব কর্ত্তৃক কলিকাতা পুনরুদ্ধারের পর, কলেট সাহেব হলওয়েলের স্থানে নিযুক্ত হন। ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ইহার পর উইলিয়াম ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব কালেক্টার নিযুক্ত হন। ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবের সময় কালেক্টারের পদবী পরিবর্ত্তিত হইয়া "কালেক্টার জেনারেলে" দাঁড়ায়।

এই ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবই, সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় তাঁহার বিপন্ন সঙ্গীদের পরিত্যাগ করিয়া "ডোডালী" জাহাজে উঠিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু এই প্রকার ভীরুতা প্রকাশের জন্য, তাঁহাকে কোনরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে হয় নাই বা তাঁহার চাকরী যায় নাই। ইংরাজেরা কলিকাতা পুনরায় দখল করিলে, ইনি কালেক্টার পদে নিযুক্ত হন।*

এই ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবের আমলের অনেক পাট্টা-কবুলতির নকল আজকালকার কালেক্টারী আফিসে বর্ত্তমান। পাট্টা বহিগুলির বাঙ্গালা ভাষায় নামকরণ হইয়াছিল। কারণ, এই ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবের আমলের পাট্টা-বহি হইতেই দেখা যায়—"ফিরিস্তি কাগজ পাট্টা-নকল বহি

* Sterndale's Report on Old Calcutta Collectorate. p. 17.

আমল শ্রীযুৎ মিষ্টার উইলিয়াম ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড কালেক্টার সাহেব সন ১১৬৫ সাল ১৭৫৮।” এই পাট্টাগুলির উপর “কলিকাতা কালেক্টারের কাছারি” বলিয়া চিহ্নিত করা আছে। আমরা কালেক্টারির পুরাতন সেরেস্তার মধ্যে, ক্লাইভ কর্ত্তৃক কলিকাতায় পুনরায় ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় হইতে নিম্নলিখিত কালেক্টারদের নাম পাইয়াছি।

কালেক্টারের নাম।	পদবী।	কার্য্যকাল।
মিঃ কলেট	জমীদার	১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর পর্য্যন্ত।
উইলিয়াম ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড	কালেক্টার	১৭৫৯ ডিসেম্বর হইতে ১৭৬০ নবেম্বর
উইলিয়াম সমার	”	১৭৫৯ ” ” ১৭৬০ , *
” এলিস	”	১৭৬০ ” ” ১৭৬১ আগষ্ট†
পিটার আমিয়াট	”	১৭৬১ সেপ্টেম্বর ” ১৭৬৩ মার্চ্চ।
র‍্যাণ্ডল্ফ মেরিয়াট	”	১৭৬৩ মার্চ্চ ” ১৭৬৩ মে।
উইলিয়াম বিলার্স	”	১৭৬৩ ” ” ১৭৬৪ মার্চ্চ।
সামুয়েল মিডলটন	”	১৭৬৪ মার্চ্চ ” ১৭৬৪ সেপ্টে।
সি, এস, প্লেডেল্	”	১৭৬৪ অক্টোবর ” ১৭৬৫ জুলাই।
জর্জ্জ, গ্রে	”	১৭৬৫ ” (লর্ড ক্লাইভের সহিত বিবাদ হওয়ায় ইনি পদত্যাগ করেন) ‡
ডব্লু, বি, সমার	”	১৭৬৫ আগষ্ট হইতে ১৭৬৭ ফেব্রুয়ারি।

* দুইজন ব্যক্তি একই সময়ে কিরূপে কালেক্টারের কাজ করিয়াছিলেন, ইহা গোলমালের বিষয় বটে। কিন্তু সমার সাহেব—১৭৬০ খৃঃ অব্দে বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারদের আদেশে পদচ্যুত হন—একথাও লিখিত আছে।

† এই এলিস্ সাহেব—একজন লড়ায়ে গোরা ছিলেন। সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় ইনি খুব লড়িয়াছিলেন। অতি সাহসের সহিত একটী Outpost (আউট-পোষ্ট) রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে অল্পমাত্র সেনা লইয়া, এই এলিস সাহেব পাটনা আক্রমণ করেন। পরে নবাব মীরকাশেম কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। পাটনার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হত্যাকাণ্ডে ইহার মৃত্যু হয়।

‡ এই বিবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—এই গ্রে সাহেব কালেক্টার রূপে গণিকাদের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন। মহানুভব ক্লাইভ ইহাতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করায়, তিনি পদত্যাগ করেন। Lord Clive's Letter Dt. 8th October 1756 to Collector of Calcutta. (Sterndale's Report.)

কালেক্টারের নাম।	পদবী।	কার্য্যকাল।
ক্লড্ রসেল	কালেক্টার	১৭৬৭ ফেব্রুয়ারি হইতে ১৭৬৭ আগষ্ট (বেনারসে ১৮১৭ ইহার মৃত্যু হয়।)
রিচার্ড, বিচার	„	১৭৬৭ সেপ্টেম্বর হইতে ১৭৬৮ মে।
চার্লস, ফ্লয়ার	„	১৭৬৭ (প্রতিনিধি)।
জেমস্ আলেকজাণ্ডার	„	১৭৬৮ হইতে ১৭৬৯ অক্টোবর।
জন, হোম্	„	১৭৭০ হইতে ১৭৭২।
স্যামুয়েল, লুইস্	„	১৭৭২ খ্রীঃ অব্দ।
টমাস্ লেন্	„	১৭৭২ (খালসা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন)
পি, এম, ডেকার্স *	„	১৭৭৩ ফেব্রুয়ারি হইতে মে পর্য্যন্ত।
রিচার্ড বারওয়েল †	„	১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দ
জে, গ্রেহাম	„	১৭৭৩ „
হেন্‌রি, কাট্রেল	„	১৭৭৪ „
চার্লস, গোরিং	„	১৭৭৬ „
ডি, এণ্ডারসন	„	১৭৭৮ „
ই, গোল্‌ডিং	„	১৭৭৮ „
জন, ইভ্‌লিন্	„	১৭৮০ „
জে, মোর	„	১৭৮২ „
টমাস, ডগলাস্	„	১৭৮২ „
জন, স্কট	„	১৭৮৫ „
স্যর এলেকজাণ্ডার সিটন্	„	১৭৮৬ „
জে, লমস ডেন্	„	১৭৮৭ „
জে, এফ, হ্যারিংটন	„	১৭৮৮ „
ফ্রান্সিস্ গ্লাড্উইন	„	১৭০৮—১৭৮৯

* এই ডেকার্স সাহেব কৌন্সিলের সদস্যের কাজও করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়ান ভলন্টিয়ার শ্রেণীর সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব ইনিই প্রথমে করেন। আজকাল যাহা "ডেকার্স লেন" বলিয়া পরিচিত, অর্থাৎ বর্ত্তমান এস্‌প্লানেডের মাথিউসনের বাড়ীর ধারে যে লেনটীর নাম স্বর্ণাক্ষরে চিহ্নিত আছে—তাহা এই ডেকার্স সাহেবের নামানুসারেই হইয়াছে। এইস্থানে তাঁহার কিছু সম্পত্তি ছিল। প্রবাদ এই—এই সম্পত্তি তিনি পাঁচশত বৎসর মিয়াদে একজন এদেশীয় ব্যক্তিকে ইজারা দেন।

† রিচার্ড বারওয়েলের নাম ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইনি ওয়ারেণ হেষ্টিং-সের আমলে কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন। হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার যথেষ্ট মিত্রতা ছিল। কিন্তু কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যর ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের সহিত আদৌ বনিত না। ফ্রান্সিস ইহাকে

আমরা পলাশী আমল হইতে দশশালা বন্দোবস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ এই ৩২ বৎসর কাল ধরিয়া যাঁহারা কলিকাতার কালেক্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন, উপরে তাঁহাদের তালিকা দিলাম। বর্ত্তমান কলিকাতাবাসী পাঠক ইহা হইতে সেকালের কলিকাতা-কালেক্টারী সম্বন্ধে অনেক পুরাতন কথা জানিতে পারিবেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার কালেক্টারদের যে তালিকা দিয়াছি, তাহার মধ্যে শেষের নামটী (অর্থাৎ ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন্ সাহেব) এখনও এদেশের ইতিহাস-পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। এই গ্ল্যাডউইন্ সাহেব, "আইন-আকবরী" নামক পারস্য গ্রন্থের এক বিশদ অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি "কলিকাতা গেজেট ও ওরিএন্ট্যাল এড্ভারটাইজার" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে কলিকাতায় প্রথম ইংরাজি ছাপাখানা হয়। গ্ল্যাড্উইন্ সাহেব, পারস্য ভাষায় অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। আইন আকবরী ব্যতীত তিনি "উলফাজ্ আদউয়ে" নামক একখানি পারসী গ্রন্থ তর্জ্জমা করেন। সম্রাট সাজাহানের আবহুল হাজী সিরাজী বলিয়া একজন পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। এই "উলফাজ" তাঁহারই রচিত, ও সাজাহানের সময়ের অনেক জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত তিনি সেকালের ইংরাজদিগকে পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য, "পারশীয়ান-মুন্সী" নামক একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। মুসলমানি আইন ও বঙ্গের রাজস্ব-সংক্রান্ত আইন-ঘটিত দুই খানি গ্রন্থ ও এক খানি ইংরাজী-পারস্য অভিধানও তাঁহার রচনা। পরবর্ত্তীকালে এই গ্ল্যাড্উইন সাহেবের অবস্থা যথেষ্ট মন্দ হইয়া পড়ে। কেন না, ১৭৯০ খৃঃ অব্দে দেখা যায়, তিনি "কোর্ট অব রিকোয়েষ্টস" নামক আদালতে কেরাণীগিরি করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

Cunning, cruel, rapcious, tyrannical প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ৮০ লক্ষ টাকার মালিক হইয়া বারওয়েল এ দেশ ত্যাগ করেন। বিলাতে গিয়া তিনি পার্লামেণ্টের মেম্বর হন। সেকালের ইংরাজদের মধ্যে তিনি খুব বিলাসী ছিলেন। আজকাল যাহা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অফিস বলিয়া পরিচিত, পূর্ব্বে সেই স্থান অধিকার করিয়া রাইটার্স-বিল্ডিংস নামক একটী সুদীর্ঘ প্রাসাদতুল্য বাটী ছিল। বারওয়েল এই বাটীর মালিক ছিলেন। কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের বাসের জন্য, বারওয়েলের নিকট হইতে এই বাড়িটী ভাড়া করিয়া লয়েন। যে বাড়ীতে পরে মিলিটারী-অর্ফান-এসাইলম স্থাপিত হয়, অর্থাৎ যে রাজপ্রসাদতুল্য অট্টালিকা আজও খিদিরপুরে সেণ্ট ষ্টিফেন গির্জ্জার পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে দণ্ডায়মান, ইহাই বারওয়েলের, আবাসবাটী ছিল। এই বাটীর মধ্যে একটী অতি সুসজ্জিত বলরুম ছিল। সেকালের পদস্থ সাহেবরা নৃত্যাদি উৎসবে এইস্থানে আসিতেন।

১৭২০ খ্রীঃ অব্দ হইতে এই ১৯১৩ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত, কলিকাতায় কালেক্টারগণ ধারাবাহিক রূপে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছেন। রাষ্ট্রবিভাগের নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, ইহাদের পদবীর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে ১৭২০ খ্রীঃ অব্দের কালেক্টার ও বর্ত্তমান কালেক্টারের কর্ত্তব্যের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে। এখন ষ্ট্যাম্প, একসাইজ, ইন্‌কমট্যাক্স প্রভৃতি নানা বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে।*

প্রাচীন কলিকাতার উপর দিয়া অনেক ঝড়-ঝটিকা চলিয়া গিয়াছে, দেশের চারিদিক নানারূপ বিপ্লবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, এতৎসত্ত্বেও কলিকাতা কালেক্টারির কাজ, সেই পূরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ১৭৩৭ খৃঃ অব্দের মহা ঝড়ে কলিকাতায় মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। অনেক ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়া কলিকাতা প্রায় সমভূমি হয়। তাহার পর, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে নবাব সেরাজউদ্দৌলা কলিকাতা লুণ্ঠন করিয়া ইহাকে ছারে খারে দেন। লোক জন প্রাণভয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে, সিপাহী-বিদ্রোহে কলিকাতা ত্রাস-পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ১৮৬৪ সালের ঝড়ে আবার এই কলিকাতার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কিন্তু এ সমস্ত প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রবিপ্লব স্বত্বেও কলিকাতা কালেক্টারের কাছারী অবিচ্ছিন্ন ভাবে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

আজকাল যাহা কৌন্সিল-হাউস-ষ্ট্রীট বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত, আগে এই স্থানের সান্নিধ্যে একটী "কৌন্সিল-হাউস" ছিল। এই কৌন্সিল-হাউস হইতেই বর্ত্তমান রাস্তার নাম "কৌন্সিল-হাউস-ষ্ট্রীট" হইয়াছে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউসের পশ্চিম দিকে এই কৌন্সিল-হাউস্ অবস্থিত ছিল। কলিকাতার পুরাতন দুর্গে স্থানাভাব হওয়ায় ও নূতন দুর্গ আরম্ভ হওয়ার সময়, এই কৌন্সিল হাউসেই কলিকাতার কালেক্টারের কাছারী স্থানান্তরিত হয়। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় লাট-প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য, এই কৌন্সিল বাটীটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এই সময়ে কালেক্টারি

* পরবর্ত্তীকালে তিনজন বাঙ্গালীকে আমরা প্রথমে কালেক্টারের সহকারীরূপে ও পরে কলিকাতার কালেক্টাররূপে দেখিতে পাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ মিউটিনীর সময়, বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত কালেক্টারের কাজ করিতেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বাবু শিবচন্দ্র দত্ত কালেক্টার হন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে বাবু অভয়চরণ মল্লিক এই পদ লাভ করেন। ইংরাজের উদার শাসন নীতির ফলে ইহার পর অনেক বাঙ্গালীই কলিকাতার কালেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। হলওয়েলের আমলের জমীদার কিরূপে কালেক্টারে পরিবর্ত্তিত হন, তাহার পরিচয় পাঠক উপরেই পাইয়াছেন।

আফিস, লালবাজারে স্থানান্তরিত হয়। লালবাজারে যেখানে পূর্ব্বে Carlisles Nephewএর অফিস-বাটী ছিল, তাহার নিকটেই কালেক্টারের আপিস স্থাপিত হয়। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ইহা ঐখানেই থাকে। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮২০ অব্দ পর্য্যন্ত, ইহা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৮২০ খৃঃ অব্দে এই কালেক্টারী আফিস, চৌরঙ্গী সদর রাস্তার সহিত যেখানে পার্ক ষ্ট্রীটের মিলন হইয়াছে, সেই স্থানে উঠিয়া যায়। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে, ইহা চার্চ্চ লেনে পুরাতন টাঁকশাল আফিসে উঠিয়া আসে। এই পুরাতন টাঁকশাল অফিসের অধিকৃত স্থানেই, আজকালকার ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেশনারি অফিস-ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানেই পঞ্চাশ বৎসর কাল ইহা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎপরে উহা পুনরায় বাঁকশাল ষ্ট্রীটে উঠিয়া যায়। এখন ইহা চার্ণক-প্লেসে—জেনেরাল পোষ্ট অফিসের পার্শ্বের ত্রিতল বাটীতে বর্ত্তমান। ১৭২০ খৃঃ অব্দে ইহা ঠিক এই স্থানেই ছিল। ইহাই কলিকাতা কালেক্টারি অফিসের বৈচিত্র্যময় গতি ও পরিণতি।*

পলাশী-যুদ্ধের পরেও আমরা দেখিতে পাই, সেকালের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক কর্ম্মচারী কলিকাতা, সুতালুটী ও তাহার আশে পাশের অনেক স্থানে জমী জমা লইয়াছিলেন। তাঁহারা অবশ্য কালেক্টারের নিকট হইতে পাট্টা কবুলতির দ্বারা জমি জমা লইতেন। এই জমার হার বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদের অনেকেই স্বনামে বেনামে, অনেক বহুমূল্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।†

সেকালের এইরূপ কতকগুলি পাট্টার সারসংগ্রহ করিয়া আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

(১) পিটার আমিয়াট সাহেব, ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি কালেক্টারের কাজও করিতেন। এই আমিয়াট সাহেবও রায়তী, ঠিকা, পতিত খামার জমীতে প্রায় ২৮৫ বিঘা ৬ কাঠা জমী পাট্টা করিয়া লয়েন। আমিরাবাদ পরগণার চিৎপুর অঞ্চলে, এই সমস্ত জমী ছিল। ইহার

* Report on Old Calcutta Collectorate.—R. Sterndale. p. 47.

† Nearly every servant of the Company owned valuable property in Calcutta held under Pottah from the Collector. (Sterndale's Report.) P. 43.

বাৎসরিক খাজনা ২৫৯৵৹। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে এই আমিয়াট সাহেব কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হন।

(২) ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে ভান্সিটার্ট সাহেব—"কোম্পানীর প্রয়োজন না হওয়া পর্য্যন্ত" এই করারে ৬৩১ বিঘা ১১ কাঠা জমী পাট্টা করিয়া লয়েন। এই সমস্ত জমীর অধিকাংশই বিরজী (বর্ত্তমান বির্জীতলা) ও চক্রবেড়ে অর্থাৎ ভবানীপুর অঞ্চলে ছিল। ইহার বাৎসরিক খাজনা ৭৮৯৲ টাকা ধার্য্য হয়। ভান্সিটার্ট পরে এই সম্পত্তি চার্লস সর্টকে বিক্রয় করেন। সর্ট সাহেব এই জমীর কতকাংশ স্থানে বাজার স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে একটী রাস্তা (সর্ট বাজার ষ্ট্রীট) এখনও সর্ট সাহেবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

(৩) কোম্পানী বাহাদুরের কাছারীতে ডি, অলিভায়েরা বলিয়া একজন পর্টুগীজ চাকরী করিত। পলাশী-যুদ্ধের পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৫৮ খৃঃ অব্দ হইতে দশ বৎসরের জন্য, এ ব্যক্তি অনেকগুলি জমী পাট্টা করিয়া লয়। পাট্টার করার এই—"ধর্ম্মার্থে মলঙ্গাতে তিনি একটা পুষ্করিণী খনন করিয়া দিবেন"। কোম্পানীর ভৃত্য বলিয়া অলিভায়েরা বিনা খাজনায় এই জমী জমা পাইয়াছিলেন।

কলেক্টার সাহেবের বহিতে এ সম্বন্ধে এক মন্তব্যে লিখিত আছে—"কাছারীর কর্ম্মচারী বলিয়া খাজনা মহকুব করা হইল।" (The rent is excused being Cutchary servant.) এই ডি অলিভায়েরা ভবিষ্যতে মির্জ্জাপুর অঞ্চলেও জমী জমা লইয়াছিলেন। মির্জ্জাপুরের জমীর জন্য তাঁহাকে প্রতি বিঘা বাৎসরিক তিন টাকা খাজনা দিতে হইত।

(৪) কোম্পানী বাহাদুরের সামান্য ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত, তাঁহাদের নিকট অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইত না। মামুল্লা সেখ, কালেক্টার সাহেবের সর্দ্দার জমাদার ছিল। এই মামুল্লার নামে প্রদত্ত ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের একখানি পাট্টা হইতে প্রমাণ হয়—"ধর্ম্মার্থে ব্যবহারের জন্য কালেক্টার সাহেবের জমাদার সেখ মামুল্লাকে এই জমীগুলি লাখরাজরূপে মোকররি পাট্টা দেওয়া হইল।" কিন্তু মামুল্লা জমাদার, বেশীদিন এ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে পায় নাই। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হইলে—তাহার বিধবাপত্নী সুতালুটীর মধ্যে তাহার বাড়ী ও জমীসমূহ উনিশ শত আর্কট-মুদ্রায় বিক্রয় করে।

(৫) ১৭৫৮ খৃঃ অব্দের অর্থাৎ পলাশী-যুদ্ধের পরবর্ত্তী বৎসরের একখানি পাট্টা হইতে দেখা যায়—"আরকুলী, সিমলা, নূতন গোবিন্দপুর প্রভৃতি

স্থানে, ধর্মার্থে পুষ্করিণী খনন জন্য শোভারাম বসাককে ৩০ বিঘা জমী লাখ-রাজ স্বরূপে জমা দেওয়া হইল।"

(৬) ১৭৬৬ অর্থাৎ পলাশী-সমরের ৯ বৎসর পরে, আর একখানি পাট্টার মর্ম্ম এই—"রামকৃষ্ণ সেন পোদ্দারের পৌত্র বীরেশ্বর সেন, তাহার সুতানুটীর বাস্তভিটা ভুক্ত ১৮ কাঠা জমী নবকৃষ্ণ মুন্সীকে (মহারাজ নবকৃষ্ণ) নয়শত আর্কট-টাকায় বিক্রয় করিল। (Calcutta Collector's Cutchery 20th day of December 1766).

(৭) উক্ত বৎসরে গোবিন্দচরণ শীল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ, উক্ত মহারাজা নবকৃষ্ণকে, তাঁহাদের সুতানুটী মধ্যস্থ বাগানখানি বিক্রয় করিয়াছিলেন—এ কথার উল্লেখও দেখা যায়। কলিকাতা কালেক্টারীর অন্ধতমসময় গর্ভে, এখনও এই সমস্ত পাট্টার প্রতিলিপি বর্ত্তমান। সমস্তগুলি উদ্ধৃত করিতে গেলে—আমাদের স্থানে কুলাইবে না, কাজেই উপরে দুই চারিটী উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইল। এই পাট্টা ও দলিলগুলি হইতে প্রমাণ হয়, মহারাজ নবকৃষ্ণের তখন অতি সুসময়। আর কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সামান্য বেতনে প্রভুর কার্য্য সমাধা করিলেও, সুবিধাকর বন্দোবস্তে বা একেবারে নিষ্কররূপে জমী জমা লইতে পারিতেন।

স্বনামপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব—কলিকাতা প্রভৃতি সহরের মোট জমী পরিমাণের একটি তালিকা দিয়াছেন, তাহা এই—

	বিঘা।	কাঠা।
ডিহি কলিকাতা	১১০৪	৩
সুতানুটী	১৮৬১	৫
গোবিন্দপুর	১০৪৪	১৪
বাজার কলিকাতা	৫৬০	২
জন্‌নগর	২২৮	২
বাগবাজার	৫৭	১৭
লালবাজার	১০	৯
সন্তোষ বাজার	৫	৮
অতিরিক্ত	৭৩৩	
	৬২০৫	০

প্রতি বিঘা তিন টাকা করিয়া খাজনার গড়-পড়তা একটী হার ধরিলে ইহা ১৮৬১৫ টাকায় দাঁড়ায়। সিক্কা টাকাকে বর্ত্তমানের চলিত টাকায় পরিবর্ত্তিত করিলে ১৯৮৪৫ টাকা হয়। হলওয়েল সাহেবের আমলে (১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ) অর্থাৎ সেরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের চারি বৎসর পূর্ব্বে, এই সহর কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রায় ২০ হাজার টাকা জমীর খাজনা স্বরূপ আদায় হইত।

জমীর খাজনা ব্যতীত Town Duty "টাউন-ডিউটী" বলিয়া কোম্পানী বাহাদুরের আর একটা আয়ের বাব ছিল। কলিকাতার বাজার ও গঞ্জসমূহে যে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় হইত, তাহার উপর ডিউটী বা শুল্ক আদায় করা হইত। হলওয়েলের আমলের পূর্ব্বে, এই সমস্ত ডিউটীর বিশদ বৃত্তান্ত কিছুই নাই বা পাওয়া যায় না। কিন্তু হলওয়েল সাহেব কলিকাতায় জমীদার রূপে এই সমস্ত ডিউটী বা শুল্কের একটী তালিকা দিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, প্রাচীন কলিকাতার গঞ্জ বা বাজারসমূহে, কিরূপ প্রকারের দ্রব্যাদি বিক্রয় হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গোবিন্দপুর, মণ্ডীবাজার, সুতানুটী-বাজার, শোভাবাজার প্রভৃতি বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণতঃ—ধান, চাউল, ছোলা, প্রভৃতি শস্যের উপর ডিউটী আদায় করা হইত। এতদ্ব্যতীত, তামাক, ঘৃত, মাদুর, গৃহপালিত পশু পক্ষী, সুতা, জপের মালা, কাপড়, তৈল, চট্ ও থলে, কার্পাস, নানাবিধ শস্য ও পান প্রভৃতি যাহা কলিকাতা হইতে অন্যত্র চালান যাইত, তাহার উপরও চালানী-ডিউটী আদায় হইত। এক কথায়, ইংরাজীতে যাহাকে "Common food or the common necessaries of life বলে (অর্থাৎ জীবন-যাত্রার উপযোগী খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের) আমদানী-রপ্তানীর উপর, এই পুরাকালে, নির্দ্দিষ্ট হার অনুসারে শুল্ক আদায় করা হইত।

সুতানুটী বাজার ও শোভাবাজার।

সুতানুটী বাজার সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও রবিবার বসিত। এই সমস্ত বাজার যাহার জমা ছিল, সে ব্যক্তি নিম্নলিখিত ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় দ্রব্যগুলির উপর শুল্ক বা তোলা আদায় করিত।

(১) কড়িবিক্রেতা	(৪) সর্ষপাদি তৈলের দোকান
(২) সুতা	(৫) লোহা লক্কড়ের জিনিস
(৩) ঔষধের দোকান	(৬) টায়ার (?)

(৭)	দুগ্ধ	(২২)	জ্বালানী কাষ্ঠের দোকান
(৮)	তালের গুড়	(২৩)	খড়-বিচালী
(৯)	মিঠাই	(২৪)	মাদুর
(১০)	কামার	(২৫)	বাঁশ
(১১)	স্যাকরা (রূপার জিনিস)*	(২৬)	কাংস্যদ্রব্য
(১২)	পান	(২৭)	সুপারি
(১৩)	ফল-মূলাদি	(২৮)	ফলমূল ও শাকসবজী
(১৪)	গাছ-বিক্রেতা	(২৯)	ইক্ষু
(১৫)	তাঁতি	(৩০)	কলা
(১৬)	লবণ	(৩১)	তেঁতুল
(১৭)	চাউল	(৩২)	মৎস্য-বিক্রেতা জেলে
(১৮)	মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস।	(৩৩)	সিদ্ধ চাউল।
(১৯)	ধনে	(৩৪)	কুম্ভকার
(২০)	চূণের দোকান	(৩৫)	কাপড় বিক্রেতা
(২১)	তামাকের দোকান	(৩৬)	বিনামা বিক্রেতা

উল্লিখিত দ্রব্য সমূহের শুল্ক সংগ্রহ সম্বন্ধে, কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম ছিল না। দৈনিক হিসাবে ১ গণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় পণ কড়ি পর্য্যন্ত এই সব দ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হইত। প্রত্যেক বস্তা বা আঁটি, কিম্বা যেরূপভাবে বিক্রেয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ বাজারে আনীত হইত, সেইভাবেই তাহার শুল্ক আদায় হইত। মনে করুন, কেহ ৫০ আটি খড় অথবা ৩০ ছালা ধান আনিয়াছে, এরূপস্থলে প্রত্যেক আঁটি বা ছালার উপর শুল্ক লওয়া হইত। তখন আধলা ও পাই প্রভৃতির প্রচলন ছিল না। সেকালে—কড়িই আধলা, সিকিপয়সা, দামড়ি, ক্রান্তি, ছেদাম্ প্রভৃতির কাজ করিত।

কলিকাতা সহরের মধ্যে বা আশে পাশে যে সমস্ত বাড়ী বিক্রয় করা হইত—তাহার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন আদায় করা হইত। অবশ্য এই টাকাটা বিক্রেতার নিকটেই লওয়া হইত। পূর্ব্বে আমরা কোম্পানীর পুরাতন আমলের যে সমস্ত সেরেস্তার নকল দিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক

* স্যাকরা শব্দের ইংরাজিটী লেখা আছে "Silversmith"। 'গোল্ডস্মিথ' শব্দটী ব্যবহৃত হয় নাই। সেকালে রূপার গহনাই বেশী প্রচলিত ছিল। সাধারণ গৃহস্থেরা তখন রূপার অলঙ্কারেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। খুব বড় লোক যাঁহারা, তাঁহারাই সোণার গহনা ব্যবহার করিতেন।

দেখিতে পাইবেন, এই বাড়ী বিক্রয়ের শুল্ক—সেই সময়ে কোম্পানী বাহাদুরের একটী আয়ের উপায় ছিল। এই বিক্রয়-শুল্ক, ইংরাজ ও এদেশীয় উভয় শ্রেণীকেই দিতে হইত। কিন্তু ইংরাজেরা ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করায় ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে তাহাদিগকে এ দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এদেশীয়গণ কিন্তু ইহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই।* কেবল বাঙ্গালীরা নহে, আর্ম্মানী ও পর্টুগীজগণও বাটী বিক্রয় জন্য শুল্ক দিতে বাধ্য ছিল। কেবল বাড়ী বিক্রয় নহে, জমী বিক্রয় সম্বন্ধেও এরূপ শুল্ক গৃহীত হইত।

বোলটস্ বলেন—"টাউন-ডিউটী বা সহরের নানাবিধ দ্রব্যের শুল্কের সহিত, বিবাহের লাইসেন্সেরও একটা বাব ছিল। তখন প্রাচীন কলিকাতায় যে সমস্ত বিবাহাদি হইত, তাহার জন্য প্রত্যেক দলের নিকট তিন টাকা (সিক্কা) লাইসেন্স স্বরূপ লওয়া হইত।" আমরা ইতিপূর্ব্বে কোম্পানী বাহাদুরের খরচ-পত্রের সেরেস্তার যে নকল দিয়াছি, তাহাতে Marriages বলিয়া একটী বাবের উল্লেখ আছে, পাঠক বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

প্রাচীন কলিকাতার কাগজ-পত্রে, নিম্নলিখিত কয়েকশ্রেণীর বিপণীগুলির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৩৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৪১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই বিপণীগুলির প্রতিষ্ঠার একটী তালিকা পাঠকবর্গের গোচরার্থে প্রকাশিত হইল।

দোকান ও কারখানার নাম।	প্রতিষ্ঠার বৎসর।
গ্লাস তৈয়ারির কারখানা	১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।
সিন্দুক প্রস্তুতের "	১৭৩৮ "
নারিকেল দড়ির "	১৭৩৮ "
তামাকুর দোকান	১৭৪০ "
ভাঙ্গের "	১৭৩৮ — "

* কালেক্টারীর কাগজপত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, একবার মহারাজ নবকৃষ্ণকেও এই ব্যাপারের জন্য লড়িতে হইয়াছিল। নবকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার ইচ্ছাপুরের জমীর পরিবর্ত্তে, ভিতর সিমলা ও বাজার কলিকাতায় কতক জমী এওয়াজীরূপে পান। কোম্পানী বাহাদুরই এই দান করেন। কোম্পানীর বারুদখানা নির্ম্মাণের জন্যই ইচ্ছাপুরে এই জমীর প্রয়োজন হয়। তদানীন্তন কালেক্টার সাহেব—প্রথামত কমিশন দাবী করিলে, নবকৃষ্ণ তাহা দিতে অসম্মত হন। কৌন্সিলের বিচারে নবকৃষ্ণের জেদই বজায় থাকে। অর্থাৎ তাঁহাকে কোনরূপ কমিশন দিতে হয় নাই, কারণ তিনি কোম্পানীর বারুদখানা নির্ম্মাণের জন্যই, এই জমী দিয়াছিলেন।

কারবারের নাম	লাইসেন্স গৃহীতার নাম।	বাৎসরিক হার (সিক্কা টাকা)	মেয়াদ
মেটেসিন্দুর ইত্যাদি	জগন্নাথ হালদার	৮৩০ সিক্কা টাকা	একবৎসর
হীরাকস, ফট্‌কিরি তুঁতে ইত্যাদি	ঐ	৩১৫ "	"
সিদ্ধির দোকান	আনন্দরাম বিশ্বাস	৪৩০০ "	"
আতসবাজী	কালীচরণ সিংহ	৮২৫ "	"

উল্লিখিত লাইসেন্সগুলি ছাড়া, আরও দুইটী অদ্ভুত রকমের লাইসেন্স ব্যাপার, পুরাতন রেকর্ডে দেখিতে পাইয়াছি। শ্রাদ্ধশান্তির সময় ধর্ম্মার্থে ষাঁড় দাগিবার প্রয়োজন হইত। এজন্য কোম্পানী-বাহাদুর—"রামেশ্বর সমরুৎ গোপকে" আদেশ ও অনুমতি দান করিতেছেন—"যে সকল লোক শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মকার্য্যে দাগ দিবার জন্য বৃষ চাহিবে, তুমি তাহা যোগাইবে। এজন্য তোমাকে লাইসেন্স দেওয়া যাইতেছে। ইহার যাহা নির্দ্ধারিত ফি আছে, তাহাই তুমি কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকট হইতে লইতে বাধ্য। কোনরূপ জোর জবরদস্তিতে বা অন্যায় করিয়া অতিরিক্ত মূল্যের দাবী করিতে পারিবে না। যদি এরূপ কর, ও তাহা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তোমার লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হইবে।" অবশ্য ইহা লাইসেন্স বা অনুমতি-পত্র মাত্র। এ ব্যবসায় সম্ভূত আয়ের সহিত কোম্পানী বাহাদুরের কোন স্বার্থ জড়িত ছিল না। যাহাতে কলিকাতাবাসীদের উপর এই শ্রেণীর লোক জোর-জবরদস্তি করিয়া বেশী টাকা আদায় করিতে না পারে, তজ্জন্যই এই ভাবে আদেশ প্রদান করা হয়।*

আর একখানি লাইসেন্সের প্রতিলিপির মর্ম্মানুবাদ হইতে জানিতে পারা যায়, ফকির ও বৈষ্ণব ভিক্ষুকেরা দোকানদারের নিকট প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভিক্ষা পাইত। কোম্পানী বাহাদুর, সে ভিক্ষারও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। একখানি সনন্দের প্রতিলিপিতে আছে—"নিমাই চরণ দাস ব্রজবাসী ফকিরকে আদেশ করা যাইতেছে—যে সে

* "To Ramessor Samroot Gope. Any person or persons that are willing to mark their bulls for the use of their funeral ceremonies you are to receive your customary fees, provided it should not be taken by force and demanding any improper or superfluous fees on pain of punishment and immediate dismissal from the occupation (Date of License—1 April 1765).

কলিকাতা সহর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রত্যেক দোকান হইতে দৈনিক এক কড়া করিয়া কড়ি ভিক্ষারূপে চাহিতে পারিবে।” বোধ হয় সহরের প্রত্যেক ভিক্ষুককে এই ভাবে লাইসেন্স লইতে হইত। ভিক্ষুকেরা যে জোর-জবরদস্তি করিয়া দোকানির নিকট বেশী আদায় করিত, এরূপ ব্যবস্থাই তাহারই প্রমাণ।†

এতদ্ভিন্ন সেই সময়ে Farming-License বলিয়া কোম্পানী-বাহাদুরের আর একটা আয়ের পথ ছিল। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে, অর্থাৎ পলাশী-যুদ্ধের দশ বৎসর পরের একটী “ফারমিং-লাইসেন্সের” নকল আমরা পাইয়াছি। তখন খাস কলিকাতা সহরে ও তাহার আশে পাশে যে অনেকগুলি বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এই তালিকা হইতে প্রমাণ হয়। এই সমস্ত বাজারের দোকান সমূহ হইতে আমদানী-রপ্তানী মালামাল প্রভৃতির শুল্ক বা ডিউটী আদায় করিবার জন্য, এই বাজারগুলি সাধারণকে জমা দেওয়া হইত। এইরূপ জমা দেওয়াকে “তৌবাজারী” বলিত। কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীরাই এই সব বাজার বেশীর ভাগ জমা লইত। তাহারা বাজারের শুল্ক ও তোলা প্রভৃতি আদায় করিত এবং কোম্পানীর প্রাপ্য, কোম্পানীকে চুকাইয়া দিয়া, যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত—তাহা নিজেরা পকেটস্থ করিত। এরূপ বাজার জমা লওয়া সেকালে খুব একটা লাভের ব্যবসায় ছিল। এই তৌবাজারীর তালিকা হইতে জানা যায়—১৭৬৮ সালে, কলিকাতায় অনেকগুলি বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও তাহাদের অধিকাংশ এখনও বর্ত্তমান। অনেক সাহেবসুবোও অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায়, বাজার-জমা বা তৌবাজারীর জন্য লোলুপ হইতেন।

কলিকাতার কালেক্টার সাহেবই জমাপ্রার্থীগণের আবেদন গ্রহণ করিতেন। তাঁহার আদেশই এ ব্যাপারে চরম আদেশ ছিল। কৌন্সিলের সহিত এ সব ব্যাপারের কোন সম্বন্ধই ছিল না। খোদ কালেক্টার সাহেবও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এ ব্যাপার দেখিতেন না। প্রায়ই তাঁহার ব্ল্যাক-ডেপুটীর হাতে এই সমস্ত বাজার জমা দিবার ভার পড়িত। যাহারা জমা লইত, তাহাদের অধিকাংশই ব্ল্যাক-ডেপুটীর আশ্রিত লোক। এজন্য

† To Nemoy Churon Dass Birjobassee Fakeer—
"You are to receive one cowree per diem on each shop within the Town and Districts of Calcutta as an alms for the maintenance of the beggars. (License—Dated Calcutta 31st July 1765).

নানাবিধ অত্যাচার ও লোক-পীড়ন দ্বারা তাহারা নির্দ্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত টাকা, তোলা বা শুল্করূপে আদায় করিত। ব্ল্যাক-ডেপুটীও তাহাদের লাভের বখরা পাইতেন। হলওয়েল বলেন—"এই সব ব্যাপারেই ব্ল্যাক-ডেপুটী গোবিন্দরাম প্রচুর বিত্তশালী হইয়াছিলেন। সেকালে গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ীর দুর্গোৎসব একটা খুব উৎসবময় ব্যাপার ছিল।"

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪নং এর ফাইলভুক্ত "তৌবাজারী" বা কলিকাতার বাজারসমূহ জমার ফিরিস্তির নকল।

বাজারের নাম	কোম্পানীর সেরেস্তায় ইংরাজী নাম	বাৎসরিক জমার পরিমাণ (সিক্কাটাকা)	প্রত্যেক দোকানে তোলার হার	জমা-গৃহীতার নাম
হাটখোলা-বাজার	Hautcollan	৫০	১৩ কড়া	নবকিশোর রায়
সুতালুটী-বাজার	Sootanuttee	৫৭০	ঐ	ঐ
বড়বাজার	Borow Bazar	৮০০	ঐ	রামহরি রায়
রামবাজার	Ram Bazar ?	১০০	ঐ	রামসুন্দর মিত্র
শিমলাবাজার	Simlau Bazar	২৭৫	ঐ	নিমাইচরণ মিত্র
চার্লসবাজার	Charles Bazar	১৪০	ঐ	রামপ্রসাদ বক্সী
বৈঠকখানাবাজার	B ytocannah	৭৫০	ঐ	সপ্তরাম ভুঞা
আরকুলিবাজার	Arcooley	৬	ঐ	রামসুন্দর বসু
শোভাবাজার	Sobau Bazar	২৭৫	ঐ	(জমাগৃহীতার নাম নাই)
জন-বাজার (জানবাজার ?)	John Bazar	৫০১	ঐ	দয়ারাম চ্যাটার্জ্জি
ধর্ম্মতলাবাজার	Dormotollau Bazar	৫০০	ঐ	রামদুলাল দত্ত
কলুটোলাবাজার	Collootollau Bazar	১১৫	ঐ	গোকুল শিরোমণি
মেছুয়াবাজার	Matchooah Bazar	৪৫০	ঐ	ফ্রান্সিস ডি মেলো

* রামবাজার ত নাই। ইহা শ্যামবাজার নয় ত? বোধ হয় লিখিবার ভুল।

বাজারের নাম	কোম্পানীর সেরেস্তায় ইংরাজী নাম	বাৎসরিক জমার পরিমাণ সিক্কাটাকা	প্রত্যেক দোকানে তোলার হার	জমা-গৃহীতার নাম
কলিঙ্গাবাজার	Collinbaw Bazar	২৫০	১৩ কড়া	ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
জননগরবাজার	John Nagor Market	২৬৫	ঐ	ঐ
রাজারনগরবাজার	Razernagor	২৫৫	ঐ	ঐ
লালবাজার	Lall Bazar	২৩১	ঐ	ঐ
বৌবাজার	Bow Bazar	৩৭৫	ঐ	ফ্রান্সিস্ পেরেরা
নৌকা ও বোট প্রভৃতির জন্য লাইসেন্স	....	১৮২৩	ঐ	গোপীচরণ ঠাকুর
ভাঙ্গ সিদ্ধি গাঁজা	....	৫৮৩	ঐ	বাবুরাম ঘোষ
মেটে সিন্দুর	....	৩২৫	ঐ	বিষ্ণুরাম পাল
(১লা মে ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দ)				আর, বিচার, কলেক্টার। কলিকাতা।

পাঠক উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাইবেন—যে কলিকাতায় ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ পলাশী-যুদ্ধের দশ বৎসর পরে, আঠারটি বাজার বাজার ছিল। এই সমস্ত বাজার কোম্পানী বাহাদুরের সম্পত্তি। তাঁহারা বাৎসরিক জমা ধার্য্য করিয়া "ফারমার" বা ইজারাদারগণকে বাৎসরিক মেয়াদে এ গুলি জমাবিলি করিতেন। এই সকল বাজার হইতে প্রতি বৎসর আট নয় হাজার টাকা আয় হইত। বাজারের ইজারা-দারদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। একজন শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহা-শয়ও, সেই প্রাচীন কলিকাতার বাজার জমা লইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য-দ্রব্যের আয়ের অবস্থা বুঝিয়া, এইরূপ ইজারায় বিলি হইত।

১৭৭৪ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখের একখানি পাট্টার নকল হইতে আর একটি অদ্ভুত জিনিসের লাইসেন্স দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাট্টাখানি কলিকাতার তদানীন্তন কালেক্টার ফিলিপ ডেকারের আমলের। এ

পাট্টায় লিখিত আছে—"সেখ নানকুকে এই পাট্টা দেওয়া যাইতেছে। সেখ নানকু, কলিকাতার একজন অধিবাসী। ইংরাজ কোম্পানীর ক্যাক্টার ও অন্যান্য সাহেব কর্ম্মচারীদের ও কলিকাতাবাসী ইংরাজদের পানীয় ও মদিরা শীতল রাখিবার জন্য, প্রচুর পরিমাণে সোরা ব্যবহৃত হয়। এই সকল সোরার-জল নালা বাহিয়া পড়িয়া বৃথা নষ্ট হয়। কিন্তু ইহা আগুনে ফুটাইয়া লইলে, পুনরায় এই জল হইতে নূতনভাবে সোরা প্রস্তুত হইতে পারে। এজন্য নানকুর প্রার্থনা মতে, তাহাকে বাৎসরিক ১০০৲ টাকা হারে এই সোরার জল সংগ্রহ করিবার অধিকার দেওয়া হইল। এই পাট্টার মেয়াদ তিন বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে।"*

উল্লিখিতভাবে কোম্পানী-বাহাদুর তাঁহাদের প্রজাদের নিকট যে টাকা আদায় করিতেন, তাহা "টাউন-ডিউটি" বলিয়া অভিহিত হইত। ১৭৭৫ খৃ: অব্দে অর্থাৎ পরবর্ত্তীকালে, এই টাউন-ডিউটী উঠাইয়া দেওয়া, হয়। কিন্তু ১৮০১ খৃ: অব্দে ইহার পুনঃ প্রচলন দেখা যায়। ১৮১০ খৃঃ অব্দের দশ আইনের বলে ইহা পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৩৬ অব্দের পর আর ইহার প্রচলন দেখা যায় না।

এই সমস্ত ইজারাদারেরা বাজার প্রভৃতি জমা লইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালী ব্যবসাদারের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। কোম্পানী-বাহাদুরকে তাঁহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিলে, অত্যাচারাদি সম্বন্ধে সকল গোলমালই মিটিয়া যাইত। কিন্তু "ফারমার" বা ইজারদারেরা ব্যবসায়ী-দের উপর জুলুম-জবরদস্তি দ্বারা, নির্দ্দিষ্ট হারের উপর বৃত্তি আদায় করিতেন। এই প্রকার উপায়ে তাঁহাদের অনেকেই প্রচুর বিত্তশালী হন। কলিকাতার ব্লাক-জমীদারকে, তাঁহারা হাতে রাখিতেন। কারণ, দেশীয়দের মধ্যে ছোট খাট মামলা মোকদ্দমার সরাসর বিচারের ভার, এই "ব্লাক্-জমীদারের" হাতেই ছিল।† ইহার আর আপীল ছিল না। ব্লাক-জমীদারও অনেক সময়ে

---

* Calcutta Committee of Revenue the 18th March 1774. P. m. Dacres.

† According to Alderman Bolts the Zeminder enquires into complaints of a criminal nature among the black inhabitants in cases where the natives do not apply to the English established Courts of Justice. * He proceeds also in the above summary way to sentence and punishment by fine, imprisonment, condemnation to work in chains upon the roads for any space of time, even for life and by flagellation that in capital cases even to death. ব্লাক-জমীদারের হস্তে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের ক্ষমতা থাকিলেও

বেনামী করিয়া বাজার প্রভৃতি নিজের লোক দ্বারা জমা লইতেন। কাজেই ব্যবসায়ীদের উপর অন্যায় জুলুম হই , তাহারা নালিশ পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। কারণ এ প্রকার স্থলে যিনিই রক্ষক—তিনিই ভক্ষক। এই জন্যই গোবিন্দরাম মিত্রের প্রতাপ এতদূর ব র্দ্ধিত হইয়াছিল। ইজারাদারদের অধীনস্থ খাজনা সংগ্রহকারীগণ দোকানীপসারী ও সর্ব্বশ্রেণীর পণ্য-বিক্রেতার উপর ভয়ানক জুলুম করিত। এমন কি বাজারে চৌকী দিবার জন্য যে সমস্ত সিপাহী থাকিত—তাহারাও জোর জবরদস্তি করিয়া ফলমূল বিক্রেতাদের চাঙ্গারী হইতে কিছু না কিছু, বলপূর্ব্বক উঠাইয়া লইত।†

প্রাচীন কলিকাতার Land Revence (জমীর খাজনা) হইতে কিরূপ আয় হইত, বাজার প্রভৃতির ইজারা হইতে কিরূপ আয় হইত, তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা গুলি পাঠকবর্গের গোচরে অনিয়াছি। এক্ষণে "এক্‌সাইজ" অর্থাৎ আবকারী-বিভাগের কথা বলিব।

আবকারী বিভাগের লাইসেন্স-দানের ক্ষমতাও কালেক্টার বা জমীদার সাহেবের হাতে ছিল। পূর্ব্বে আমরা কোম্পানী বাহাদুরের "কন্‌সলটেসন" বহির [illegible] সারসংগ্রহ দিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক এরূপ লাইসেন্স দানের উদাহরণ [illegible] পাইয়াছেন। সেকালে আরমিনিয়ান-আরক আর জাভা [illegible]টোঙ্গিয়া হইতে আমদানী একপ্রকার স্বল্পদরের মদ্যই কলিকাতায় বেশী প্রচলিত ছিল। তখন এদেশে ভাটী বা চোলাইয়ের কারখানা ছিল কি না তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহা হউক, এই সমস্ত "আরক-হাউস" বা মদের

মুসলমান প্রজাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা ছিল। চরম অপরাধে তাহাদের ফাঁসি দিয়া হত্যা করা হইত না। কারণ—নবাবী আমলের বিধানানুসারে অপরাধী মুসলমানকে, এরূপ ভাবে দণ্ডিত করা মুসলমান কর্ত্তারা অপমানকর বলিয়া বোধ করিতেন। এজন্য ইংরাজী আইনের পরিবর্ত্তে, মুসলমানদের প্রচলিত বিধি অনুসারে হত্যাকারী বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে, চাবুক মারিয়া হত্যা করা হইত। এজন্য সে সময়ে আদালতে "চাবুক সওয়ার" বলিয়া আর এক শ্রেণীর ঘাতক নিযুক্ত ছিল। ইহারা দুই তিন চাবুকেই অপরাধীর দফা শেষ করিয়া দিত। অবশ্য এরূপস্থলে জমীদারকে কৌন্সিলের অভিমত লইতে হইত।

† The collection of many of their dues and taxes gives occassion to great oppression from the farmers and the numberless harpies who are necessrily employed as tax-gatherers and are in general of great prejudice to industry and population anong the lower class of people, who are harrassed on all sides for it is even a common thing to see the sepoys who are stationed as guards at different places take from the poor as they pass something out of every one's basket. (Bolt's Considerations.)

দোকান প্রাচীন কলিকাতায় অ[ষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক] হইতেই বর্ত্তমান ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তখন বি[লাতী মদ] এত সস্তা ছিলনা। এই সমস্ত আরকের দোকানে যে সমস্ত মদ বিক্রয় হইত—তাহার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইত। তবে চিরকালই যেমন হইয়া আসিতেছে, মদের লাইসেন্সগুলি অতি উচ্চদরেই দেওয়া হইত। কোম্পানী বাহাদুরের অধীনস্থ সেলার ও গোরারা, যাহাতে এই সব দোকানে জটলা করিয়া সহরের অশান্তি বৃদ্ধি না করিতে পারে, তাহারও কঠোর ব্যবস্থা ছিল। নবাব মুরশীদ কুলীখাঁর আমলে, বিবি ডমিঙ্গো এ্যাস্, গোবিন্দ শুঁড়ী প্রভৃতির লাইসেন্স গ্রহণের কথা শোনা যায়।

বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত এই সমস্ত মদের দোকান খুলিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল না। পাঠক মনে রাখিবেন—যে সেকালের নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা সহর, তখন একটী বন্দর মাত্র। নানা স্থান হইতে জাহাজ আসিয়া সুতালুটীতে নঙ্গর করিত। অনেক পর্টুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ-সেলার, সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত দোকানে আড্ডা ও জটলা করিত। কোম্পানীর কলিকাতার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী ও গোরাদের অনেকে এই আর[কের] বা পঞ্চ-হাউসের নিয়মিত খরিদ্দার ছিল। এজন্য সহরের [মধ্যে অনেক] স্থলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপস্থিত হইত। অনেক সময় এদেশীয়[দের সহিত তাহাদের] মধ্যে দাঙ্গা ঘটিয়া, খুন-জখম হওয়াতে সহরের মধ্যে নানারূপ [অশান্তি] উপস্থিত হইত।

খাস কলিকাতা সহর ছাড়া, সহরের অন্যান্য অংশে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মদের দোকান খুলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দের তিন নম্বরের লাইসেন্স হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে "অনন্তরাম কুণ্ডু নামক একব্যক্তি ৮৬৭ সিক্কা টাকায় চিৎপুরপল্লীতে মদ্য বিক্রয়ের একচেটিয়া স্বত্ব লাভ করিল। মাত্র তিন বৎসরের জন্য এই স্বত্ব দেওয়া হইল।"*

আরক-বিক্রয়ের এইরূপ একচেটিয়া স্বত্ব লাভ করিয়া, অনেক দোকান "ফেইল" হইয়াছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের এক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, "মিঃ লেভেট নামক এক ব্যক্তি সহরমধ্যে আবকারী বিক্রয়ের স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লাইসেন্সের টাকা ক্রমাগত বাকী ফেলিয়া কোম্পানীর নিকট দশ-হাজার টাকার জন্য দায়ী হইয়া পড়িয়াছেন।"

---

* Millet's Minute—Sterndale's Report on Old Calcutta Collectorate Bolt's Considerations.

কোম্পানী-বাহাদুর ১৭৯ নিজের লো বের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উপর
প্রতিষ্ঠিত শুল্ক, তুলিয়া দেন। গের লাইসেন্স সমভাবেই
থাকে। ১৮০০ খৃঃ অব্দের ৩নং ৫ ইতে জানা যায়—"মদের
দোকান ওয়ালাদের লাইসেন্স ও রাভাবে মদিরা বিক্রয়
প্রথা সম্বন্ধে নিয়মগুলি পরিবর্ত্তিত এই সম্বন্ধে কলিকাতার
"জষ্টিস অব্ দি পিস্‌গণ" সে সমস্ত করিবেন, তাহাই বলবৎ
রাখা হইবে।"

এই সমস্ত মদের দোকানের ফলে কলিকাতার মধ্যে চোর-ডাকাত গুণ্ডা বদমায়েসের উপদ্রব বৃদ্ধি হইত। ১১৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮০০ খৃঃ অব্দের ৩১এ জানুয়ারি তারিখে, "জষ্টিস অব্ দি পিস্‌গণ" কলিকাতার আবকারী দোকান সমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ করিয়া, এক সুবৃহৎ মন্তব্য গবর্ণমেণ্টে দাখিল করেন। সে মন্তব্যের একাংশ এই—"আরকের দোকানগুলি বদমায়েসের আড্ডা ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

এই সময়ে আরকের দোকান ছাড়া, কলিকাতার গাঁজার ও সিদ্ধির দোকানও ছিল। সেকালে তাড়ির দোকানের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। [illegible]গের মন্তব্য হইতে দেখা যায়, নিম্নলিখিত শ্রেণীর চোর ও [illegible]রা এই সকল মদ্যালয়ে আড্ডা করিত।

(১) ডাকাত অর্থাৎ Gangrobbers.
(২) বোম্বেটে (ইহারা নদীদক্ষে ডাকাতি করিত)
(৩) গিরা-কাটা (আজকাল যাহারা গাঁটকাটা নামে পরিচিত)।
(৪) সাধারণ চোর।
(৫) গরু-চোর।
(৬) জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারক।
(৭) প্রতারক ও জুয়াচোর (Cheats and Swindlers.)
(৮) চোরাই-মাল গ্রহণকারীগণ।*

১৮০০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, কলিকাতায় "জষ্টিস্-অব্-দি-পিস্‌গণ"

---

* এই সমস্ত চোরাইমাল গ্রহণ ও বিক্রয়কারীদের মধ্যে—"পোদ্দারগণ (Petty shorffs and poddars) স্যাকরা, পর্ত্তুগীজ, আর্ম্মাণী ও বাঙ্গালী নিলামওয়ালাগণ, এদেশীয় ঘড়ীওয়ালা, কালাপাতিওয়ালা (oakumsellers) পাইকারী দোকানরক্ষকগণ, বিক্রীওয়ালা, ধোপা, রিপুগার, শাল-রিপুওয়ালা পুরাতন কাপড় বিক্রেতাগণ, মজুর খালাসী, মাজি, বেহারা ও অন্যান্য শ্রেণীর চাকর বাকরের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত সুদীর্ঘ পত্রযোগে, তখনকার গবর্ণরজেনারেল সাহেবকে এই সমস্ত দোকানের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া, তাহার লাইসেন্স-মুদ্রা পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এক পত্র লেখেন। তাহার একাংশের ইংরাজী প্রতিলিপি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।†

এই কঠোর ব্যবস্থার ফলে—মদের দোকানের উপদ্রব অত্যাচার অনেক কমিয়া আসে। এই সময়ে প্রত্যেক মদ্য-বিক্রেতাকে প্রতিদিন ১২॥০ গ্যালন মদ্য বিক্রয়ের স্বত্ব দেওয়া হয়। এইজন্য তাহাদের দৈনিক ৫৲ টাকা হারে লাইসেন্স দিতে হইত। ইহার অতিরিক্ত বিক্রয় করিলে, অতিরিক্ত টাকা দিতে হইত। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই সব দোকান খোলা থাকিত। গাঁজা ও তাড়ির দোকান-ওয়ালাদের দৈনিক আট আনা হিসাবে লাইসেন্স দিতে হইত।

সহরে যে সমস্ত সাহেবী মদের দোকান ছিল—তাহাদের দোকানে বা দোকান সংলগ্ন হোটেলে, কোন শ্রেণীর লোকজন জমায়েত হইতেছে বা গটল' করিতেছে, তাহার একটী দৈনিক মন্তব্য পুলিসে দিতে হইত।

আজকাল যেখানে পুলিসকোর্ট হইয়াছে, সেই স্থানে "হারমোনিক ট্যাভার্ণ" (Harmonic Tavern) বা সেকালের বিখ্যাত বিলাতী মদের দোকান ছিল। বর্ত্তমান সেণ্ট জন গির্জ্জার নিকট—"ইউনিয়ান" ও "রাইটস্ নিউট্যাভার্ণ" বলিয়া দুইখানি দোকান ছিল। আজকাল যেখানে কলিকাতা এক্সচেঞ্জ অফিস আছে, সেস্থানে "এক্সচেঞ্জ" "ক্রাউন ও এংকর" বলিয়া আরও দুইখানি দোকান ছিল।

১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানী-বাহাদুরের আবকারী-বিভাগের আয় দুইলক্ষ টাকার উপর দাঁড়ায়।

কোম্পানী-বাহাদুরের জমীদারী ও এতৎসম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথা

† To check in some degree the vice of drunkeness now so prevalent among the lower class of natives in the town of Calcutta and to impose such restrictions on the vend of spirituous liquors and toddy as shall prevent these shops from continuing as at present the rendezvous of thieves and robbers, vagabond of all descriptions, we beg leave to recommend, that duty charged on licenses for the retail of spirituous liquors be considerably raised and that the vendor be required to give security and enter into penalty bonds to obey the police regulations set forth in the Appendix—Letter from Justices of the Peace to Govr. Genl. dt. 31-1-1800

সার-সংগ্রহ করিয়া আমরা পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিলাম। ইহা হইতে   ইবেন, ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ হহইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ প এই একশত বৎসর মধ্যে প্রাচীন কলিকাতা সর্ব্ববিষয়ে কিরূ উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছিল।

MOHEARY PUBLIC LIBRARY
EST. 1886

পুরাকালের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ও কলিকাতা সহরের নকসা।

(পলাশী আমলে)

BLIC LIBRARY
সাধারণপুস্তকালয়
সন ১২৯৩
EST. 1886
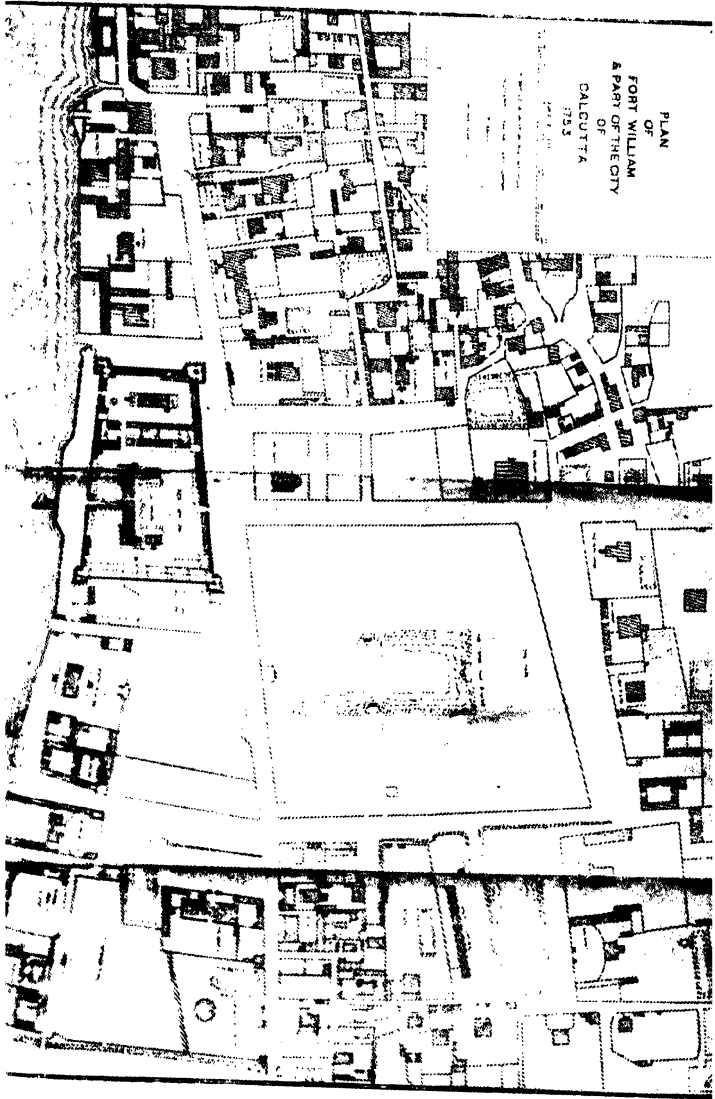
অষ্টাদশ অধ্যায়।

নবাব আলিবর্দ্দীর আমল—বর্গীর হাঙ্গাম—বর্গীবিভীষিকায় বঙ্গের অবস্থা—মহারাষ্ট্র পুরাণ—বা বর্গীর হাঙ্গামের বৃত্তান্ত সম্বলিত প্রাচীন পুঁথি—এই হাঙ্গামের সময় কলিকাতার অবস্থা—নানাস্থান হইতে লোকজনের কলিকাতা প্রবেশ—কলিকাতা সুরক্ষিত করিবার জন্য খাত খনন কল্পনা—নবাবের নিকট এই খাত খননের অনুমতি গ্রহণ—মারহাট্টা-ডিচ বা খাত—এই খাতের পূর্ণ বিবরণ ও স্থান নির্দ্দেশ—কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীদের এই খাতখনন ব্যাপারে সাহায্য—এই খাতের পরিণামে বর্ত্তমান সারকুলার রোডের সৃষ্টি—১৭৪২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামার সময় কলিকাতা সহরের অবস্থা—কলিকাতার চারিদিকে রক্ষাবন্ধনী বা প্যালিসেড—এই প্যালিসেডের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহের পরিচয়—কাপ্তেন উইলসের ১৭৫৩ খ্রীঃঅব্দের কলিকাতার নক্‌সা—এই নক্‌সা-বর্ণিত বাটী গুলির বর্ত্তমান কালে সমাবেশস্থান নির্ণয়—সেকালের কলিকাতার ইংরাজ কোয়াটারের পরিচয়—পলাশী আমলে বড় বড় ইংরাজদের বাটী—রামকৃষ্ণ শেঠ ও উমিচাঁদের আবাস স্থান নির্ণয়—হলওয়েলের বাটী—ক্লাইভের আবাস স্থান প্রভৃতির পরিচয়—পলাশী আমলের পূর্ব্বে দেশীয় সহরাংশের অবস্থা—ফৌজদারী বালাখানা।

১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দে, কলিকাতায় এক মহাঝড় হয়, এ ভীষণ ঝড়ের পরিচয় পাঠক ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন। এই ভীষণ ও প্রচণ্ড-ঝটিকাজনিত ক্ষতি সহ্য করিয়াও প্রাচীন কলিকাতা, আবার ধীরগতিতে উন্নতিরপথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু ইহার পাঁচ বৎসর পরে সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া, আবার এক মহা-উৎপাত উপস্থিত হয়। ইহাই ইতিহাসে "বর্গীর-হাঙ্গামা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নবাব আলিবর্দ্দির খাঁর আমলে, এই বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্গীনামধারী মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদের উৎপাতে, সমস্ত বঙ্গদেশ শ্মশানবৎ হইয়া পড়ে। বর্গীরা নগর গ্রাম জ্বালাইয়া, লোকজনকে হত্যা করিয়া, নিরীহ প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া, সোণার বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ করিয়া যায়। "ঐ বর্গী আসিতেছে" একথা শুনিলেই, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা ভয়ে থরহরি কাঁপিয়া উঠিত, কে কোথায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে স্থির করিতে পারিত না। মাতৃ-ক্রোড়ে নিরীহ শিশুও এই মহারাষ্ট্রীয়জাতির কলঙ্ক স্বরূপ, অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী বর্গীদের নামে শিহরিয়া উঠিত। বঙ্গদেশে এই বর্গী-হাঙ্গামার স্মৃতি-রক্ষার জন্য, একটী ঘুম-পাড়ানিয়া গীতের সৃষ্টি

হইয়াছে। অনেক ঠাকুরমা-দিদিমা, ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার সময় এই ছড়াটী সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

ছেলে ঘুমুলো, পাড়াজুড়ুলো, বর্গী এল দেশে
চড়া পাখীতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে ?

বর্গীর-হাঙ্গামাটা যে কি, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। বর্গীদের আক্রমণে, এই শান্তিভরা বঙ্গদেশে, বঙ্গের সুখময় পল্লীসমূহে, কি ভীষণ অনর্থ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ সরফরাজ খাঁকে পরাজিত করিয়া, বাঙ্গলার সুবেদারী লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে শান্তিলাভ ঘটিল না। যে রাজ্য তিনি অতি সহজে লাভ করিলেন, তাহা রক্ষা করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট শোণিত-ক্ষয়, সেনা-নাশ ও দশ বৎসর-ব্যাপী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

১৭৪২ খৃঃ অব্দে চৌথ আদায়ের জন্য, বর্গীগণ বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। এই মহারাষ্ট্রীয়-বর্গীদের হস্তে, বঙ্গবাসীদিগের যথেষ্ট নির্য্যাতন ঘটিয়াছিল। বর্গীরা, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নগর গ্রাম জ্বালাইয়া, শস্যক্ষেত্র বিমর্দ্দিত করিয়া, বাঙ্গালী প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহাদিগকে নানাপ্রকারে যন্ত্রণা দিয়া, বঙ্গদেশের একাংশ জনশূন্য করিয়া তুলিল। আলীবর্দ্দি খাঁ বঙ্গীয় প্রজাবর্গকে, এই লুণ্ঠনকারী দস্যুদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াও, বর্গীর উৎপাত নিবারণ করিতে পারেন নাই। বহুল নিষ্ফল চেষ্টার পর ১৭৫১ খৃঃ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দী, বারলক্ষ টাকা ও উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া, বঙ্গাদি দেশত্রয়কে বর্গীর অত্যাচার হইতে বিমুক্ত করেন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের পর সমস্ত উপদ্রবের শান্তি হইলে—বঙ্গবাসীগণ আবার শান্তির মুখ দেখিতে পায়।

স্কুলপাঠ্য পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গলায় বড় বড় ইতিহাসে এই "বর্গীর-হাঙ্গামা" ব্যাপারের নানাপ্রকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং সে সব কথা না বলিয়া, কলিকাতার সহিত এই বর্গীদের যতটুকু সম্বন্ধ, আমরা তাহাই বলিতেছি। আজকালকার প্রচলিত ইতিহাস ব্যতীত, অন্য একটী ক্ষুদ্রগাথায় এবং এক অজ্ঞাতনামা বাঙ্গালী কবির কাব্যের মধ্য দিয়া, এই ব্যাপারের অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই প্রাচীন লুপ্তপ্রায় পুঁথির নাম "মহারাষ্ট্র-পুরাণ।" ইহা শকাব্দা ১৬৭৩ ও সন ১১৫৮ সালে

বিরচিত। সুতরাং ধরিতে গেলে, ইহা ১৬২ বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ। ময়মনসিংহে এই পুঁথিখানির হস্তলিপি পাওয়া যায়। পরে ইহা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় অবিকল প্রকাশিত হয়।*

আমরা এই কাব্যখানির বানান প্রণালী সেকালের মতই রাখিলাম। ইহা হইতে পাঠক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা ভাষার নমুনাও দেখিতে পাইবেন।

মহারাষ্ট্র-পূরাণ।*

(১৬২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত)।

(বাঙ্গালীকবির লিখিত বর্গীর হাঙ্গামার বৃত্তান্ত)।

—:০(*)০:—

প্রথম কাণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।

রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা।
রাত্র দিন ক্রড়া করে পরস্ত্রী লইঞা॥
শৃঙ্গার কৌতুকে জিব থাকে সর্ব্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে।
এ সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥

---

* প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বাবু, তাঁহার "বাঙ্গলার ইতিহাসে" এই পুঁথি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে "এই পুস্তকের বর্ণনার মধ্যে—ঐতিহাসিক তথ্য এত নিহিত রহিয়াছে, যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঘটনার যথাযথ বর্ণনা ও নবাব আলিবর্দ্দী খাঁয়ের দরবারের অনেকের সঠিক নাম নির্দ্দেশ দেখিয়া, ইহা যে অভিজ্ঞ লোকের লিখিত, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। পারিষদের সংগৃহীত পুঁথি, ভাস্কর পণ্ডিতের নিধনের ঠিক আট বৎসর পরে নকল করা। এই পুঁথিখানি ময়মনসিংহে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা রাঢ়ের লোকের লিখিত কি, মুর্শিদাবাদ প্রবাসী ময়মনসিংহের কোন ব্যক্তির রচিত, তাহা স্থির করা কঠিন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গ্রামগুলির যথাস্থানে নির্দ্দেশ হইতে দেখা যায়—যে কবির এ অঞ্চল বিলক্ষণ জানা ছিল। ইহা হইতে একটা নূতন কথা জানিতে পারা যায়, যে ভাস্কর পণ্ডিত দাঁইহাটে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।" (কালীপ্রসন্ন বাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস পরিশিষ্ট পাদটীকা।)

---

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

এত জদি পাপ হইল পৃথিবী উপরে।
পাপের কারনৈ পৃথি ভার সহিতে নারে ॥
তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর।
কহিতে লাগীলা পৃথি ব্রহ্মা বরাবর ॥
পাপের কারনে প্রভু পৃথী হইল ভারি।
কত ব্যাম পাব আমী ভার সহিতে নারি ॥
এতেক স্থনিঞা ব্রহ্মা বোলিছে বচন।
ব্যাকুল না হইয় তুমি ধর্য্য কর মন ॥
পৃথী সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেলা শীব স্তানে।
কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা স্তুতি বচনে ॥
তুমি কর্ত্তা তুমি হর্ত্তা তুমি নারায়ণ।
স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন।
তুমি মাতা তুমি পীতা তুমী বন্ধুজন।
এ মহি মণ্ডল প্রভু তোমার শ্রিজন ॥
এতেক বিনয় যদি কৈলা ব্রহ্মাবর।
হাসিঞা তাহারে তবে বলিলা সঙ্কর ॥
এতেক মিনতি কর কীসের কারণ।
বোল দেখি স্থনি আমি তাহার বিবরণ।
তবে ব্রহ্মা বলিলেন হাসি ত্রিলোচনে।
পৃথি ভার সহিতে নারে পাপের কারণে ॥
পাপমতি হইল জিব করে দুরাচার।
পাপীষ্ট মারিআ প্রভু দুর কর ভার ॥
কহিতে লাগিলা হর এতেক স্থনিঞা।
পাপীষ্ট মারিছি দুত পাঠাইঞা ॥
এতেক বলিলা জদি ব্রহ্মার গোচর।
পৃথী সঙ্গে ব্রহ্মা তবে গেলা আপন ঘর।
তবে ব্রহ্মা বিদাএ করিলা পৃথীরে।
ভাবিতে ভাবিতে পৃথী আইলা য়াপন ঘরে ॥
ব্রহ্মাকে বিদাএ দিয়া শীব রহিলা ধ্যানে।
কথোক্ষণ পরে সেই কথা পইল মনে ॥

নন্দীকে ডাকীয়া সিব বলিছে বচন।
দক্ষিন সহরে তুমি জাহ ততক্ষণ ॥
সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবিতে।
অধিষ্ঠান হও জাইয়া তাহার দেহেতে ॥
বিপরিত পাপ হইল পৃথীবি উপরে।
দুত পাঠাইঞা জেন পাপি লোক মারে ॥

এতেক শুনিঞা নন্দী গেলা সিগ্রগতি।
উপনিত হইল গিয়া সাহুরাজা প্রতি ॥
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে।
অনেকদিন হইল বাঙ্গলার চৌথ না দেএ মোরে ॥
দুত পাঠাইয়া দেয় বাদসার স্থানে।
বাঙ্গলার চৌথাই না দেএ কীসের কারণে ॥

একখানি পত্র লিখ বাদসা প্রতি।
দুত জেন তাহা লইয়া জাএ সিগ্রগতি ॥
রঘুরাজা পত্র লিখে আখর পাচ সাতে।
পত্র লইঞা দুত তবে বাধিলেন মাথে ॥
রজনী প্রভাতে দুত জাএ সিগ্রগতি।
পত্র আসি দিলেন জেথানে দিল্লিপতি ॥

উজিরকে য়াজ্ঞা তবে দিলা দিল্লিশ্বরে।
সিগ্রগতি পত্র পড়ি শুনাও আমারে ॥
উজির পড়েন পত্র বাদসা স্তনেন।
সাহুরাজা লিখে বাঙ্গলার চৌথের কারণ ॥
বাদসা তবে আজ্ঞা দিলা উজিরেরে।
পত্র লিখহ তুমি সাহু রাজারে।

চাকর হইয়া মারিলে সুবারে।
জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে ॥
লোক-লস্কর তবে নাই আমার স্থানে।
হেন কোনজন নাই তারে গিয়া আনে ॥
বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে।
দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেএ মোকে ॥

জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে।
চৌথের কারণে লোক পাঠায় তথাতে॥
এতেক বচন পত্রে লিখীলা উজির।
পত্র পাইঞা দুত তবে নোঞাইল সির॥
দুত তবে বিদাএ হইলা তরিতে।
সিগ্রগতি য়াসি পহুছিলা সেতারাতে॥
সভা করিঞা রাজা বইসা আছে স্থানে।
হেনকালে পত্র দুত আনে সেইখানে॥
পত্র আসি দিলা দুত রাজার গোচর।
ডাড়াইয়া একভিতে করি জোড়কর।
আজ্ঞা দিল দেওয়ানকে পত্র পড়িবারে।
পত্র পড়িয়া দেওয়ান সুনান রাজারে॥
জবর হইল সুবা বাঙ্গালা সহরে।
দুই বৎসর হইল খাজনা না দেএ তারে॥
আজ্ঞা দিল বাদসা ফৌজ পাঠাইঞা।
চৌথাই নৈ এন জেন জবর করিঞা॥ (২)
এতেক সুনিঞা রাজা লাগিলা কহিতে।
কোনজনাকে পাঠাব মূলুক বাঙ্গালাতে॥
রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিআ।
কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥
আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই।
জবর করিয়া তথা আনিব চৌথাই॥
তবে তারে আজ্ঞা দিলেন রাজন।
তিনি পাঠাইলেন দেওয়ান ভাস্করণ॥
রঘু তবে আজ্ঞা দিল ভাস্করে।
তৎপর করিয়া চৌথাই আনি দিবে মোরে॥

রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া
সন্য সঙ্গে করিয়া সাজন।
ডঙ্কা নাগারা কত নীসান চলে সত সত
সন্য মধ্যে বাজিছে বাজন॥

সেতারা ছাড়িয়া তবে বিজাপুর আইলা তবে
এক রাত্রি রইলা সেইখানে।
রাগরঙ্গ হইল জত নাটুয়া নাচিল কত
কটক চলিল পর দিনে॥
গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ জত
নাগপুর আসি উপনিত।
সেখান ছাড়িয়া জবে লস্কর যাইলা তবে
পঞ্চকোটে আসিলা তরিত॥
ডাক দিয়া দুতকে ভাস্কর কহিল তাকে
নবাব আছে কোনখানে।
আজ্ঞা দিলা সেনাপতি দুত চলে সিগ্রগতি
নবাব য়াছে জেইখানে॥
দুত সংবাদ লইয়া সিগ্র চলিল ধাইয়া
আসিয়া কহিল তার স্থানে।
বর্দ্ধমান সহরে রাণির দিঘির পরে
নবাব আছে সেইখানে॥
দুত মুখে স্তুনি কথা ভাস্কর চলিল তথা
লস্কর লইয়া নিসাতে।
লস্কর নিসব্দে জাএ কেহ নাহি জানে তাএ
আইলা বৈসাখ উনিশাতে॥
বৈসাখের উনিশা জাএ বরগি আইলা তাএ
মহা য়ানন্দিত হইয়া মনে।
বিরভুই বামে থুইয়া গোআলা ভুইর কাছ হইয়া
আসিয়া ঘেরিল বর্দ্ধমানে॥
তবে বরগীর লস্করে চতুর্দ্দিগে আসি ঘিরে
হরকারা কেহ নাহি জানে।
দুই প্রহর রাইতে হরকরা আইলা তাথে
আর্জী কৈল রাজারাম স্থানে॥
রজনি প্রভাত হইল রাজারাম হরকারা আইল
আসিয়া কহিল নবাবেরে।

ইহা রামি না জানিল আচম্বিতে সন্থ আইল
আসিয়া ঘেরিল লস্করে॥
রাজারামে এত কএ নবাব সুনিয়া রএ
তদপরে দিলেন উত্তর।
হরকারা পাঠাইয়া হকিকত আন জায়া
কোথা হইতে আইল লস্কর॥
এতেক সুনিল জবে হরকারা পাঠাইল তবে
ফৌজের নির্ণয় জানিবারে।
সাজিঞা হরকারা লস্করে ফিরে তারা
আসিয়া কহিল নবাবেরে॥
চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার
চল্লিশ হাজার ফৌজ লইঞা।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে
সাহুরাজার হুকুম পাইঞা॥
এতেক কথা সুনিয়া জমাদার আনি ডাক দিয়া
কহিতে লাগিলা নবাব।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইলা চৌথ নিতে
ইহা কি বোলহ জবাব॥
বাদশাই খাজনা জাইত শেখানে চৌথাই পাইত
সুজা খাঁ আছিল জখন।
মুস্তফা খাঁ এত কএ জাহা তোমার চিত্তে লএ
তাহা তুমি করহ এখন॥
উকীলকে কহিল সন্থ সাইজা কেন আইল
এই কথা বল জাইয়া তারে।
উকীল কহেন কথা ভাস্কর সুনেন তথা
তবেত কহিল তার পরে॥
সাহুরাজা পাঠাএ মোরে চৌথাই নিবার তরে
তেকারণে আইলাম আমি।
জাইয়া বোল নবাবেরে চৌথ জেন দেএ মোরে
সিগ্রগতি চলি জাহ তুমি॥

এতেক সুনিয়া জবে উকীল কহিল তবে
অন্যাএ কথা কেনে বোল।
কোনকালে বাঙ্গালাতে বরগী আসে চৌথ নিত্তে
এইত অন্যাএ বড় হইল॥
ভাস্কর বুলিল তারে কেবা যন্যাএ করে
মনেতে কৈলে ভাবনা।
কাহার হুকুম পাইয়া মুলুক নিলা মারিয়া
বাদসাই খাজানা ভেজ না॥
সুনিয়া উত্তর দিলা চৌথ নিতে না জানিলা
উকীল পাঠাইতা তার কাছে।
উকীল জাইয়া পরে কহিতে নবাব তরে
চৌথাই দিতেন তিনী পাছে॥
আপন কটক লইয়া পুন জায় ফিরিয়া
কহ তবে বাদসার স্থানে।
সনদ জদি দেএ খাজানা তবে জাএ
চৌথাই পাবে সেইখানে॥
ভাস্কর তবে কএ বাদসার হুকুম হএ
চৌথ নিবার কারণ।
চৌথাই না দিবে জবে রায্য নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রন॥
এতেক বচন সুনি উকীল কহেন বানি
ভএ তুমি কিসে দেখায় তারে।
তোমার জতেক সেনা চত্তুদিগে দিল থানা
তারা সব কী করিতে পারে॥
তুমি যেমন এক জনা এমন আইসে সহস্র জনা
তব তার ভুরূক্ষেপ নাই।
চৌখুটা মুলুকে সবাই জানএ তাকে
নবাবের সমান কে আছে সিপাই॥
উকীল বুলিলা জবে ভাস্কর জানিলা তবে
কহিতে লাগিলা তারপরে।

চৌথাই না দিবে জবে যুদ্ধ করিব তবে
এই কথা বোল জাইয়া তারে ॥
উকীল আসিঞা পরে কহিল নবাবে তবে
রন করিতে সেহ চাহে।
এতেক স্তুনিঞা জবে নবাব জানিল তবে
ডাক দিয়া জমাদারে কহে ॥
জত জমাদার ছিল তারে নবাব কহিল
চৌথাই চাহে বারে বারে।
জতেক সরদার ছিল, তারা সব কহিল
সেই টাকা দেহ সিপাএরে ॥
আমরা জত লোকে মারিব বরগিকে
দেসে জেন আইস্তে নাই পারে।
বরগি সব মারিব দেশে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে ॥
স্তুনিয়া এতেক বানি সন্তুষ্ট হইলা তিনি
কহিতে লাগিলা ভাল ভাল।
পানবাটা কাছে ছিল পান তুইলা সভারে দিল
বিদাএ হইয়া সভে আইল ॥
এথা ভাস্কর সরদারে ডাক দেএ জমাদারে
কহিতে লাগিলা তা সভারে।
তোমরা কত জনা চতুর্দিগে দেয় থানা
কতজনা জায় লুটিবারে ॥
সরদারে কহে এত সাজে জমাদার এত
চতুর্দিগে জাএ লুটিবারে।
সাজিল জত জন শুন তার বিবরণ
একে একে নাম বলি তার ॥

ধাম্‌ধরমা জাএ আর হিরামন কাসি।
গঙ্গাজি আমড়া জাএ আর সিমন্ত জোসি ॥
বালাজি জাএ আর সেবাজি কোহড়া।
সম্ভুজি জাএ আর কেসজি আমোড়া ॥

কেসরি সিংহ মহন শিংহ এ দুই চামার।
জার সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাচ হাজার॥
এই দশজনা জাএ গ্রাম লুটিতে।
আর চৌদ্দজনা থাকে নবাবের চাইর ভিতে॥
বালারাও সেশরাও আরসিস পণ্ডিত।
সেমন্ত সেহড়া আর হিরামন মণ্ডিত॥
মোহন রাএ পিত রাএ আর সিসো পণ্ডিত।
জার সঙ্গে আছে বরগি মহা বিপরীত॥
শিবাজি সামাজি আর ফিরঙ্গ রাএ।
লুটিতে জাহার সঙ্গে বরগি দ্রিত ধাএ॥
* * * সুনতান খাঁ আর ভাস্কর।
এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লস্কর।
একদিন দুইদিন করি সাতদিন হইল।
চতুর্দিকে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল॥
মুদি বানিঞা জত বারাইতে নারে।
লুটে কাটে মারেছমুতে পাএ জারে॥
বরগির তরাসে কেহ বাহির না হএ।
চতুর্দ্দিকে বরগির তরে রসদ না মিলএ॥
চাউল কলাই মটর মুষরি খেসারি।
তেল ঘি আটা চিনি লবন একসের করি॥
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে নাই পাএ।
খুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ॥
গাজা ভাংগ তামাকু না পাএ কিনিতে।
আনাজ নাহি পাওয়া যাএ লাগিল ভাবিতে॥
কলার আইঠা জত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল॥
বিসম বিপত্য বড় বিপরিত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাবসাহেব খাইল॥

এই মতে লস্কর আছিল চৌদ্দ রোজ।
তবে নবাব কুচ কৈলা লইয়া সব ফৌজ॥
ঘোড়ার উপরে কত নিশান চলিল।
তবে ডঙ্কা নাগারা কত বাজিতে লাগিল॥
ঝাকুড় ঝাকুড় কত সাদিয়ানা বাজাএ।
সাহিসরা তবে নবাবের আগে জাএ॥

চাইদিগে লস্কর চলে নাই লেখাজোখা।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে বরগী দিল দেখা॥
চাইরদিগে বরগী আইল কত আর।
তা সভার হাতে দেখি লাহাঙ্গা তলোয়ার॥
তখন নবাবের লস্করে পইল হুড়বড়।
হেন বেলা তেরহইনাতে ধরিলা ডেহড়॥

হাজারে হাজারে ঘোড়া উঠাএ একিবারে।
হারা হারা কইরা আইসে কাছাইতে নারে॥ (১)
তবে মুস্তাফা খাঁ চাইর হার ঘোড়া লইয়া।
বরগি খেদাইয়া জাএ ডেহড় মারিয়া।
তবে সামনে হইতে বরগি পলাইল।
আর কত বরগি আইলা পিছাড়ি ঘেরিল।

মির হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল।
বেকাবুতে পইড়া সেহ মিসাইল॥
পিছাড়ি লুঁটিল বরগি য়াসি আর কত।
পোড়াইল ডেরাডাণ্ডা তাম্বু যত॥

খাজনার গাড়ি জত সাতে ছিল।
চাইর দিগে বরগি আইসা লুটিতে লাগিল॥
হাত্তি ঘোড়া কত লুইটা লইয়া জাএ।
বড় বড় সিপাই যত অমনি পলাএ॥
দউড়া দউড়ি আইলা তবে নিকুলসরাএ।
মোসাহেব খাঁ তবে পড়িল ঘেরাএ॥

(১) 'তেরইনাতে' পুঁথির বা ছাপার ভ্রম। 'হেন বেলাতে বহইনাতে' হইবে। বহইনাতে —বহনীয়াতে অর্থাৎ বাহকগণে। "হারা হারা"—অর্থাৎ হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ করিয়া।

ডেড় হাত্তির সাইর হইল তার সাএ।
পচিশ ঘোড়া সুর্দ্দা খেত আইল তাথে॥
মোসাহের খাঁ যদি পইল নিকুনেতে।
যল্দি নবাব সাহেব যাইল কাঁটয়াতে॥
এথাতে হাজি সাহেব রসদ লইঞা।
পাঠাইঞা দিল কত নৈকায় করিয়া॥

তবে রসদ আসিয়া কাটঞাতে পহুচিল।
নবাব সাহেবের লোক খাইয়া বাঁচিল॥
ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটঞাতে।
শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিলা ভাবিতে॥
ছিছিছি হাএ হাএ গেল পলাইয়া।
এতদিন ব্রথা আসিয়া ছিলাম ঘেরিয়া॥

তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোণার বাইনা পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিত্তল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥

কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥
সঙ্ক বণিক পলাএ করাত লইয়া যত।
চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥

ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে।
বরগীর পলানে পেটারি লইল মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলয়ারের ধনি।
তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ য়মনি॥
গোশাঞি মোহান্ত জত চোপলাএ চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া॥

চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা।
বিছন বলদের পিঠে লাঙ্গল লইয়া॥
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্তুইনা সব পলাইল॥
গর্ভবতি নারী যত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে॥

সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল।
বরগীর নাম স্তুইনা সব পলাইল॥
দস বিস লোক য়াইয়া পথে দাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই॥

কাঙ্গাল গরীব জত জাএ পলাইয়া।
কেথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিয়া॥
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি।
চাঞি ধাত্মুক পালাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল॥

চাইর দিকে লোক পলাঞ ঠাঞি ঠাঞি।
ছত্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি॥
এইমত সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিত বরগি ঘেরিল আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া॥

কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল ২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাধি দেয় তার গলাএ॥
এক জনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥

এইমতে বরগী কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় ২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডপ।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥

এইমতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিআ পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রূপি দেহ ২ বলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥

কাহুকে ধরিয়া বরগী পখইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জাএ॥
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না আইলে তারে প্রাণে মারে॥
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥

ত্রেতাজুগে রাজা ভগীরথ ছিলা।
অনেক তপস্যা করি গঙ্গা আনিলা॥
পৃথিবীতে নাম তার হইল ভাগিরথী।
তার পার হইয়া লোকে পাইলা অব্যাহতি॥
তবে কোন কোন গ্রাম বরগী দিলা পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম সুন মন দিয়া॥

চন্দ্রকোনা মেদিনিপুর আর দিগনপুর।
খিরপাই পোড়ায় আর বর্দ্ধমান সহর।
নিমগাছি সেড়গা আর সিমইলা।
চণ্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইলা॥
এইমতে বর্দ্ধমান পোড়াএ চাইর ভিতে।
পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে॥

সের খাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল।
তাহার কারণে বরগী লুটিতে নারিল।
সাতসইকা রাজবাটী আর চাঁদপুর।
কাথারা সরাই ডামধৈ জদুপুর॥
ভাটছালা পোড়াএ আর মেরজাপুর চান্দড়া।
কুড়বন-পালাসি য়ার বউচি বেড়ড়া॥
সমুর্দ্ধরগড় জার্ম্মগর আর নদিয়া।
মাহাতাপুর সুনণ্টপুর থইল পোড়াএ গিয়া॥
পরাণপুর ভাটয়া পোড়াএ আর মান্দড়া।
সরভাঙ্গা খিতপুর আর গ্রাম চান্দড়া॥
সাতাসইকা জাগিরাবাদ সকল পোড়াইঞা।
কুমিরা বউলতলি নিমদা পোড়াএ গিঞা॥
কড়ই বৈথন পোড়াএ আর চাড়ইল।
সিজি বাস্কা ঘোড়ানাস মন্তইল॥
গোটপাড়া চাঁদপাড়া আর রাগদিয়া।*
রাতারাতি পাটলি দিল পোড়াইয়া॥
আতাইহাট পাতাইহাট আর ডাঞ্চিহাট।
বেড়া-ভাওসিংহ পোড়াএ আর বিকীহাট॥
এইরূপে ইন্দ্রাইন পরগণা বরগি লুটি।
কাগাএ মোগাএ লুটে ওলন্দাজের কুটি॥†
এইরূপে কাগা মোগা পোড়াইঞা।
রাতারাতি পহচিলা জাউমাকান্দি গিয়া॥
তবে বিরভুই পরগণা বরগি দিল পোড়াইয়া।
আমডহরা মহসেরপুর থানা ট্রৈকল গিঞা॥
গোয়ালাভুঞি সেনভুঞি সব পোড়াইলা।
চতুর্দিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইলা॥
তবে বোন বিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষা করে।
প্রসাদ্য বরগির তবে কি করিতে পারে॥

---

* অগ্রদ্বীপ।

† কাগ্রাম মৌগ্রামে তখন ওলন্দাজের কুঠী ছিল।

সহর লুটিতে বর্গী তবে আইল ধাইয়া।
নৈহাটী উর্দ্ধানপুর কাটোয়া ডাইনে থুইয়া।
বাবলা নদী বরগি তবে পার হইল।
মাঙ্গনপাড়া সাটই কামনগর আইল॥

মহুলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া।
আধারমাণিক আইলা বরগী রাঙ্গমাইটা দিয়া॥
গোয়ালজান বুধইপাড়া আর নেয়ালিসপাড়া॥
সিঘ্রগতি আসিয়া পহচিল দাহাপাড়া॥

হাজি ছোট নবাব উপারে ছিল।
বরগির নাম স্নইনা কীল্লাএ সাঁধাইল॥
তবে বরগি পার হইল হাজিগঞ্জের ঘাটে।
শীঘ্রগতি আইসা জগৎ সেটের বাটী লুটে॥

আড়কাট * টাকা ঘরে যত ছিল।
ঘোড়ার থুরচি ভইরা সব টাকা নিল॥
তবে সও দুই তিন টাকা ছড়াইয়া।
শীঘ্রগতি গেলা বরগী গঙ্গাপার হইয়া॥

তবে ফকীর-ফাকীরা গিরস্ত জত ছিল।
সেই সব টাকা তারা লুটিতে লাগিল॥
তবে কাটঞাতে নবাব সাহেব স্নুনিল।
জগৎ সেটের বাড়ী বরগি লুইটা গেল॥

এতেক কথা যদি হরকরা কহিল।
কাটঞা হইতে নবাব শীঘ্র চলিল॥
রাতারাতী তবে নবাব আইল মোনকরা।
ভোর হইতে হইতে তবে পহছিলা ডেরা॥

তবে হাজি সাহেবকে নবাব অনেক বুলিল।
এতেক লস্কর রইতে বাড়ী লুইটা গেল॥
নবাব সাহেব যদি আইলা কীল্লাতে।
তবে সব বরগি জড় হইল কাটঞাতে॥

আড়কাট টাকা—আর্কট মুদ্রা।

আসাড় মাসের দেওয়া ঘন বরিষণ।
অজএ ভাসিয়া গঙ্গা ভরিল তখন॥
গঙ্গা ভরিল যদি ইপার উপার।
তবে বরগী লুটিবারে নাহি পাএ আর॥
কাটঞা ভাওসিংহ বেড়া ডাইহাট নিয়া।
চাইরদিগে বরগী ছায়নি কৈল গিয়া॥
গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তারা সবে আসি ভাস্ককে মিলিল॥
গ্রামে গ্রামে যত তাগিদার গেল।
তারা সব জাইয়া খাজনা সাদিতে লাগিল॥
এথা মির হবিব লইয়া কিছু সুন বিবরণ।
ফরাসবন্দির পর্ত্তন করিলা তখন॥
বড় বড় নৌকা যেথানে যত ছিল।
বেগার ধরিয়া সব নৌকা আনিল॥
ইপারে উপারে লাহাস দিল তানাইয়া।
নৌকা সব তার মধ্যে রাখিল বান্ধিয়া॥
গ্রামে গ্রামে হইতে আনে যত বাস।
নৌকার উপর বিছাইয়া বান্ধেন ফরাস॥
ঘাস চাটাই তার উপরেত দিল।
পাইছাএ পাইছাএ মাটী ফেলিতে লাগিল॥
মাটী ফেলিয়া তবে করে বরাবর।
হাজারে হাজারে ঘোড়া জাএ তার উপর॥
ডাঞিহাটের ঘাটে যদি পুল বাঁধা গেল।
কত সত বরগী তারা লুটিতে চলিল॥
এথা ভাস্কর লইয়া কিছু সুন বিবরণ।
জেরূপে ডাঞিহাটে কৈলা পূজা আরম্ভন॥
তবে গ্রামে গ্রামে যত জমিদার ছিল।
তা সভারে ডাক দিয়া নিকটে আনিল॥
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঞি।
জগতজননি মায়ের পূজা করিতে চাই॥

এই কথা ভাস্কর কহিলা তা সভারে।
শ্রদ্ধা পাইয়া তারা সব উর্জোগ করে॥
ঘটকর্পুর আনে কেহ করিয়া সম্মান।
আসিঞা প্রতিমা তারা করেন নির্ম্মান॥
এইরূপে কুমার প্রতিমা বানাইয়া।
ভাস্করের ঠাই তারা গেল বিদায় হইয়া॥
তারপর উপাদএ সামগ্রী আইল জত।
ভার বাহান্বিতে বোঝাএ কত শত॥
ভাস্কর করিবে পূজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে॥
এইমতে করে ভাস্কর পূজা আরম্ভন।
এথা মীর হবিব বরগী লইয়া করিল গমন॥
তবে বরগী ফরাসবন্দিতে পার হইয়া।
রাতারাতি ফুটীসাঁকো উঠিলেন গিয়া॥
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে হড়বড়ি হইল।
ফুটীসাঁকো বরগি আইল নবাব সুনিল।
তবে নবাব সাহেব নকিব পাঠাএ।
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে নকিব শীঘ্র ধাএ॥
নকিব আসিঞা তবে বোলে বারবার।
হুকুম নবাবের সোয়ারি করহ তৈয়ার॥
এতেক কহিল জদি নকিব আসিয়া।
তবে সব ঘোড়ায় জিন দিল চড়াইয়া।
একে একে জমাদার লাগিল সাজিতে।
ডঙ্কা নাগারা কত লাগিল বাজিতে॥
মুস্তাফা খাঁ সমসের খাঁ দুই জমাদার।
জার সঙ্গে যায় ঘোড়া বিস হাজার॥
রহম খাঁ করম খাঁ দুইজনাতে জাএ।
দশ হাজার ঘোড়া জার সঙ্গে ধাএ॥
আতাউল্লা মিরজাফর * দুইজনা সাজিল।
পোনের হাজার ঘোড়া সঙ্গে চলিল॥

* ইতিহাস প্রসিদ্ধ নবাব মীরজাফর।

উমর খাঁ আসালত তুই জনাতে গেল।
পাঁচ হাজার ঘোড়া সঙ্গে কইরা নিল।
ঠাকুরসিংহ জাএ আর বক্সি বহনিয়া।
চল্লিশ হাজার বহনিয়া সঙ্কেত করিয়া॥
ফতেহাজি ছেদনহাজি দুই জনাতে গেল।
পেএত্রিশ হাজার বহনিয়া সঙ্গে চলিল॥
সাইট হাজার ঘোড়া ডেড়লাক বহনিয়া।
তারকপুর আইল নবাব এত ফৌজ লইয়া॥
যেইমাত্র নবাব সাহেব তারকপুর আইল।
ফৌজের ধমক দেইখা বরগি পিছাইল।
তবে বরগি পিঠ দিয়া শীঘ্র চইলা জাএ।
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ॥
পলাসিতে যত বরগির থানা ছিল।
নবাব সাহেবের নাম সুইনা অমনি পলাইল॥
সিঘ্রগতি আসি বরগি পুলে পার হইল।
পার হইঞা পুল তবে কাটিঞাত দিল॥
এথা নবাব রাতারাতি আইল রহনপুরে।
দেখে বরগির ছাউনি কাটিঞাত উপরে॥
রহনপুরে নবাব সাহেব মোরচা দিল।
চতুর্দ্দিগে তোপ খা রুপিয়া রাখিল॥
পুরনিয়া পাটনাএ লেখিলেন খত।
চলিলা দুইজনা শুইনা হকিকত॥
হেথা জয়ন্দি আহম্মদ খাঁ আইলা পাটনা হইতে।
বার হাজার ঘোড়া ফৌজ লইয়া সাথে॥
নবাব বাহাদুর আইলা পুরনিয়া হতে।
পাঁচ হাজার ফৌজ সেহ লইয়া সাথে॥
তবে জয়ন্দি আহম্মদ বোলে নবাবকে।
পূজা না হইতে আগে মার ভাস্করকে॥
নবাব বোলে আগে দসরা জাউগ।
চাইর দিগে জল কাদা সকলি সুখাউগ॥

এত যদি নবাব বুলিলা তার তরে।
জয়ন্দি আহম্মদ খাঁ বোলে নবাবেরে॥
জল কাদা শুকাইলে বরগীর হবে বল।
চতুর্দিগে লুটিবে পোড়াবে সকল॥
ফৌজ পার কইরা দি নৌকায় করিয়া।
রাতারাতি যেন বরগী মারে গিয়া॥
জয়ন্দী আহম্মদ নবাব এই মনস্থবা করে।
মির হবিব লইয়া কিছু সুন তার পরে॥
বড় বড় কামান আইনা থুইল থরে থরে।
হুগলি হইতে সুলুফ আনে তার পরে॥
তবে গোলন্দাজে গোলা দাগিতে লাগিল।
মোরচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল।
জেই মাত্র গোলা আইসা ফৌজে পইল।
তখন নবাব সাহেবের অমনি পিছাইল॥
গোলা দাগিতে কামান গেল ফুইটা।
সুলুফ ডুবিল * তলা তার ফাইটা॥
দস বিস লোক তারা নিকটেতে ছিল।
কামান ফাটীয়া দুই চাইর জনা মইল॥
সুলুক কামান যদি দুই তবে গেল।
শুনিয়া মির হবিব তবে ভাবিতে লাগিল॥
ফতে নাই নাই বলে বারে বারে।
এতেক উর্জোগ করিলাম নারিলাম জিনিবারে॥
সূর্য্য অস্ত গেল সন্ধ্যা হইল তখন।
এথা নবাব লইয়া কিছু সুন বিবরণ॥
সম্বাদ লইয়া হরকারা আইলা হাইটা।
কহিল নবাবে কামান গেল ফাইটা॥
এতেক শুনিয়া নবাবে হৈল বল।
হুকুম করিলা ফৌজে আউগাউক সকল॥

---

* Sloop—ছোট নৌকা।

জত লস্কর তারা পিছে হইটা ছিল।
আপন আপন মোরচাএ সভাই আইল॥
তবে বল মহাতাব সব জালিয়াত দিল।
বরকন্দাজের পরা মোরচাএ লাগিল॥
হাজারে হাজারে আওয়াজ হয় একিবারে।
তাড়াইয়া বরগি সব দেখে উপারে॥

এই মতে নবাবের ফৌজ আছে বরাবরে।
এথা জয়ন্দি আহম্মদ খাঁ আইল উদ্ধারণপুরে॥
বড় বড় পাটেলি সাথে আইসা ছিল।
জুড়িন্দা বাধিয়া গুদারা লাগাইল॥
উর্দ্ধরণপুরে যত ফৌজ পার কৈলা।
য়জয়ের ধারে আইসা সব দাঁড়াইলা।

পুনরপি জুড়িন্দা আইনা লাগাইল।
দশ হাজার ফৌজ নিসন্দে পার হৈল॥
বাইস সও লোক সুর্দ্ধা রতন হাজারি।
পাটেলির উপরে তারা সভে চড়ি॥
যেইমাত্র পাটেলি আইল মধ্যখানে।
তলা ফাটীয়া ডুবিল সেইস্থানে॥

পাটেলি ডুবিল ফৌজে হইল কলরব।
উপারে বরগীর ফৌজ জানিলা সব।
মোগল আইল আইল পইল হড়বড়ি।
তখন ঘোড়ায় চড়িয়া বরগী জাএ দউড়া দউড়ি॥
বরগির লস্করে যদি পইল হড়বড়।
হেনকালে বহইনাতে ধুরিলা ডেহড়॥

এক এক ঘোড়ায় দুই দুই বরগি চড়িয়া।
দ্রব্য সামগ্রী কত জাএ ফেলাইয়া॥
সপ্তমী অষ্টমী দুই পূজা করি।
ভাস্কর পলাইয়া জাএ প্রতিমা ছাড়ি॥
মিষ্টান্ন সামগ্রী ছিল যত কাছে।
বহনিয়া লুটিতে লাগিল তার পাছে॥

ছাগ মৎস্য মহিষ জাহা যত ছিল।
বহনিয়া আসিয়া সব লুটিতে লাগিল ॥
এই মতে সামগ্রী লুটে বহনিয়া।
হোতা ফৌজ লইয়া ভাস্কর গেল পলাইয়া ॥
ভাস্কর পলাইয়ে যদি গেল অনেক দূরে।
জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ সুনিল তার পরে ॥

সাদিয়ামা নহবত কত বাজে থরে থরে।
ফকির ফুকুবাকে খএরাত কত করে ॥
আশ্বিন মাসে ভাস্কর গেল পলাইয়া।
চৈত্র মাসে পুনরূপি আইল সাজিয়া ॥
জেই মাত্রে পুনরূপি ভাস্কর আইল।
তবে সরদার সকলকে ডাকিয়া কহিল ॥

স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা ॥
এতেক বচন জদি বলিল সরদার।
চতুর্দিকে লুটে কাটে বোলে মারমার ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা সত সত কৈল ॥

হাজারে হাজারে পাপ কৈল দুর্ম্মতি।
লোকের বিপত্য দেখি রুষিলা পার্ব্বতী ॥
পাপিষ্ঠ মারিতে আদেশিলা পসুপতি।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হত্যা কৈল পাপমতি ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি।
এতেক কহিয়া তবে রুসিলা শঙ্করী ॥

ভৈরবি জোগিনী জত নিকটে ছিল।
জোড়হস্ত কৈরা তারা ছমুতে ডাড়াইল ॥
তবে দুর্গা কহে সুন যতেক ভৈরবী।
ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি ॥
এতেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন।
এখন জেরূপেতে ভাস্কর মৈল সুন ববরণ ॥

ভাস্কর পণ্ডিত যদি আইল কাটঞাতে।
শুনিঞা নবাবের ডেরা পইল মোনকরাতে॥
পাল চাই ধুম পইল সহরেতে।
মুদি বানিঞা চলে নবাবের সাথে॥
মোনকরাতে নবাবের ফৌজ হইল স্থমার।
ভাস্কর লইয়া কিছু তন্নে শুন আর॥

তবে আলি ভাই বলে ভাস্করের তরে।
এইরূপে কতবার আসিবা বারে বারে॥
ফৌজকে মানা কর গ্রাম লুটিতে।
আমি জাইয়া বন্দোবস্ত করি নবাবের সাথে॥
এতেক শুনিয়া ভাস্কর কহিলেন তাকে।
সাবধান হইয়া তুমি মিল নবাবকে॥

তবে আলি পচিশ ঘোড়া লইয়া সাথে।
নবাবের সাথে মিলিত আইল মোনকরাতে॥
ফুটীসাঁকো যদি আলি ভাই আইলা।
সেইখানে থাকিয়া উকিল পাঠাইলা॥
উকিল আসিয়া তবে কহে নবাবেরে।
আলি সাহেব আইসে নবাব সাহেবকে মিলিবারে॥

তবে নবাব বোলে বোল যাইয়া তারে।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা মিলুক আমারে॥
উকিল আসিয়া তবে কহিলেন তাকে।
হাতিয়ার থুইয়া যাইয়া মিল নবাবকে॥
আলি ভাই যাইলা তবে হাতিয়ার থুইয়া॥
পচিশ ঘোড়া সুদ্ধা মিলিল আসিয়া॥

নবাব বোলে তুমি আইলা কি কারণ।
আলি ভাই বোলে বন্দবস্তের কারণ॥
ভাস্করের সাথে বিবাদ কেনে কর।
দুই জনাতে মিইলা কিছু বন্দোবস্ত কর॥
তবে নবাব সাহেব বুলিলেন তারে।
ভাস্কর আসিয়া নাকি মিলিবে আমারে॥

জে সময়ে পূর্ব্বে ঘেইরাছিল বর্দ্ধমানে।
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তার স্থানে॥
বন্দবস্ত করিতে যদি থাকিত তার মনে।
সেই সমএ উকিল পাঠাইত আমার স্থানে॥
মুলুক পোড়াইল লুটিল বার বার।
কাঁউয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিব স্মারি॥
আলি ভাই বোলে যাহা হবার তা হৈল।
কদাচিত উকথা মুখে আর না বুইল॥
দুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে।
ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এই স্থানে॥
তবে নবাবসাহেব কহিল দুজনারে।
আলি ভাইএর সঙ্গে যাইয়া আন ভাস্করে॥
জানকীরাম মুস্তফা খাঁ দুজনে চলিল।
কাটোঞার যাইয়া ভাস্করকে মিলিল॥
ভাস্করকে আলি ভাই কহিতে লাগিল।
মুস্তাফা খাঁ জানকীরাম দুই জনাএ আইল॥
নবাব সাহেব পাঠাইল দুই জনারে।
সঙ্গে কইরা লইয়া যাইয়া মিলাবে তোমারে॥
এতেক শুনিয়া তবে মিরহবিব কয়।
কদাচিত ভাস্করকে জাইতে মত নএ॥
মিরহবিব কিছু তবে কহে ভাস্করে।
কদাচিত জাইয়া তুমি না মিল তাহারে॥
মোগলের ফের তুমি করিবা মোনসুবা।
আমার কথা শুন জদি কদাচিত না যাবা॥
তবে মুস্তফা খাঁ কহিতে লাগিল।
এতেক কথা তুমি কেনে কহিলা॥
আমরা দুই জনাএ তবে সঙ্গে কইরা নিব।
বন্দবস্ত কইরা পুনঃ এইখানে আনিব॥
কিছু কিন্তু জদি মনে কর তুমি।
কোরাণ দরমান কইরা কিরা খাইছি আমি॥

জানকীরাম কহে গঙ্গাজল সালগ্রাম লইয়া।
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনিব মিলাইয়া ॥
এতেক শুনিয়া ভাস্কর বোলে ভাল ভাল ॥
মুস্তাফা খাঁ বলে তবে শীঘ্র কইরা চল ॥
ভাস্কর বোলে সাথে ফোজ নিব কত।
জানকীরাম বোলে তোমার মনে লয় জত ॥
আলি ভাই বোলে ফৌজে নাহি কাম।
জন দশ বারো লোক সঙ্গে কইরা জান ॥
মির্ত্তু কাল হইলে যেন মতিচ্ছন্ন পাএ।
আলি ভাইএর কথায় ভাস্কর ভুইলা যাএ ॥
প্রথমে বৈশাখ মাস শুক্রবার দিনে।
ভাস্কর চলিল মিলিতে নবাবের সনে ॥
আলি ভাই আদি করি বাইস জনা যাইল।
পলাসি আসিঞা ভাস্কর ডেরায় থাকিল ॥
তার পরদিনে ভাস্কর করিল গমন।
এথা নবাব লইয়া কিছু শুন বিবরণ ॥
হরকারা বোলে নবাবকে ভাস্কর যাইসে।
এতেক শুনিয়া নবাব সভা কৈরা বৈসে ॥
সোটাবর্দ্দার খা সর্দ্দার নবাবের আগে।
বড় বড় জমাদার বসিলা চাইর দিগে ॥
দুসরঞি বৈশাখ মাস শনিবার দিনে।
ভাস্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে ॥
বিধাতা বিপত্য হইল বুধ্য গুইলা গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল ॥
ভাস্কর পণ্ডিত জদি মিলিল নবাবকে।
তার পরে নবাব কহেন কিছু তাকে ॥
আমার মুলুক তুমি লুটিলা বারে বারে।
বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলা আলি ভাইএর তরে ॥
যে কালে আসিয়া তুমি ঘেরিলা বর্দ্ধমানে।
সে সময় উকিল আমি পাঠাইলাম তোমার স্থানে ॥

বন্দোবস্ত করিতে যদি থাকিত তোমার মনে।
সেই সময় উকিল তুমি পাঠাইতে আমার স্থানে॥
তবে এতেক শুনিয়া ভাই আলি কহিল।
এত দিন জাহা হবার তাহা হইল।
ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলে তোমার সনে।
কিছু দিঞা বন্দোবস্ত কর ইহার সনে॥
এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেন হাসি।
খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি॥
পূর্ব্বে সভারি মন সুবা ছিল।
সেই মন সুবাএ নবাব উঠা গেল॥
নবাব উঠিয়া গেল হইল অনেকক্ষণ।
ভাস্কর পণ্ডিত কিছু কহেন তখন॥
দুই ডণ্ড বিলম্ব হইল কহে মুস্তফার ঠাই।
এখন তবে আমি সান পূজাএ যাই॥
মুস্তফা খাঁ বোলে চলো সভাই মিলে জাই।
সেপহরিতে আসিব নবাবের ঠাই॥
এতেক বলিয়া মুস্তফা খাঁ উঠিল।
তাহার দেখনে তবে ভাস্কর উঠিল॥
জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তরোয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে॥
সেইক্ষণে তবে ঘটাচট্টি হইল।
জত জনা য়াইসা ছিল সব জনা মইল॥
তারপরে নবাব সাহেব সমাচার সুনে।
সুনি আনন্দিত নবাব হইল সেইক্ষণে॥
সাদিয়ানা নহবত কত বাজিতে লাগিল।
ফকির ফুকুরাকে খএরাত কত দিল॥
মোনকরা মোকামে যদি ভাস্কর মইল।
মনসুদাবাদ উড়াইয়া কবি গঙ্গারাম কইল॥

ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব॥ সকাব্দা ১৬৭২,
সন ১১৫৮ সাল॥ তারিখ ১৪ পৌষ রোজ শনিবার॥

এই বর্গীর-আক্রমণে, বালেশ্বর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত ভূভাগ সমূহ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনেক স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িল। "অই বর্গী আসিতেছে" এই রব উঠিলেই, লোকে প্রাণভয়ে নগর ও গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করে। বর্গীরা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী "মকৃওয়া-থানা দুর্গ" দখল করে। ইহা নবাবী দুর্গ। এই দুর্গ দখলের পর, তাহারা হুগলী অভিমুখে ধাবিত হয়।*

কলিকাতা হুগলী পর্য্যন্ত অনেক গ্রামের লোক, প্রাণভয়ে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইল। ইংরাজেরা কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য—নবাব আলিবর্দ্দির নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান—"কলিকাতার চারিদিকে খাত-খনন করা ব্যতীত বর্গীর হাঙ্গাম হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির আর কোন আশা নাই।" নবাব ইংরাজদের এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে, ইংরাজেরা কলিকাতার চারিদিকে খাত-খনন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই Mahratta Ditch বা "মহারাষ্ট্র-খাত" বলিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। নানা কারণে কলিকাতার চারিদিক ব্যাপিয়া এই খাত খননের অবসর ও সুবিধা ঘটে নাই। ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিলে, ইহার বেষ্টন সাত মাইল হইত। ছয়মাসের মধ্যে তিন মাইল বা দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত খাত খনিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ যখন বুঝিলেন—বর্গীদের আর কলিকাতায় আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন এই খাত-খনন কার্য্য বন্ধ করা হয়।

এই অর্দ্ধাংশ খনিত খাতের মাটী সমূহ—কলিকাতায় দিকেই ফেলা হইয়াছিল। এজন্য বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত স্থান ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত উঁচু হইয়াছিল। এই সমুচ্চ স্থানকে সমতল করিয়া পরে একটী প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করা হয়। সেই রাস্তার দুই দিকে বৃক্ষাদি রোপিত হওয়ায় এই সুদীর্ঘ পথটী নগরবাসীদের সান্ধ্য-ভ্রমণের উপযুক্ত হইয়া উঠে।

এই খাত-খনন ব্যাপারে, কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীরাও আত্ম-রক্ষার জন্য কোম্পানী-বাহাদুরের যথেষ্ট সহায়তা করে। খাতটী এরূপভাবে চওড়া করা হয়—যাহাতে মহারাষ্ট্র অশ্বারোহীগণ সহজে ইহা উত্তীর্ণ হইতে না পারে। কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুর এই গ্রাম তিনখানি বেড়িয়া খালটী বর্ত্তমান চৌরঙ্গীর মিডল্টন ষ্ট্রীটের কাছে পৌঁছিবে, তৎপরে গোবিন্দ-

* আজকালকার বোটানিকেল গার্ডেনের যে বাড়ীতে বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বাস করিতেছেন—তাহাই পূর্ব্বে "মকৃওয়া থানার" অধিকৃত স্থান ছিল। বর্গীরা কলিকাতার এত নিকটে আসিয়াও যে কলিকাতা আক্রমণ করে নাই—সম্ভবতঃ তাহা ইংরাজের কামানের ভয়েই বলিয়া অনুমিত হয়।

পুরের অর্থাৎ বর্ত্তমান গড়ের মাঠের মধ্য দিয়া আসিয়া, খিদিরপুর কুলী-বাজারের মধ্য দিয়া গঙ্গার সহিত মিশিবে—এইরূপ কল্পনাই ছিল।* যে অংশটী ইতিপূর্ব্বে খনিত হইয়াছিল, তাহাতে দীর্ঘকাল ব্যয় হওয়ায় ও নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত—মহারাষ্ট্র-বর্গীদের সন্ধি স্থাপিত হওয়ায়, এই খাল অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। পরবর্ত্তীকালে নবাব সেরাজউদ্দৌলার আক্রমণ সময়েও ইংরাজেরা এই খাত আত্ম-রক্ষার উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে এই খাত, সহরের জঞ্জাল ও ময়লা দ্বারা ভরাট করিয়া ফেলা হয়। যে সমস্ত মাটী স্তূপাকারে কলিকাতার দিকে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা সমতল করিয়া "বর্ত্তমান সার্কিউলার রোডের" প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লির শাসনকালে, এই বিস্তৃত পন্থার দুই পার্শ্ব বৃক্ষাদি দ্বারা শোভিত হওয়ায়, ইহা প্রাচীন কলিকাতার—সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে। অনেক পদস্থ ইংরাজ, সন্ধ্যায় ও সকালে চেরিয়ট গাড়ী চড়িয়া, এই পথে বেড়াইতেন। তখন চৌরঙ্গীর অবস্থা এত সমুন্নত হয় নাই। কারণ ইহার অধিকাংশ স্থান বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়—যে এই মারহাট্টা খাতের অপর পারে যথেষ্ট দস্যুভয় ছিল। †

* The ditch was to extend for seven miles, forming a semicircle round three sides of the Town, the fourth side being protected by the river. It was begun in 1742 at Chitpur and followed the line of Circular Road southward as far as Jaun Bazar Street, here it turned to the southwest and was intended to take a line which would have crossed the Chowringee Road at the Junction of Middleton Street and continuing the same direction would have reached the River at Hastings about where the Commissariat Buildings and Jetties are situated—Kathleen Blychyndens's Old Calcutta.

† The country on the other side of the ditch was infested by bands of dacoits. When the Marquis Wellesley, whose influence gave a great stimulus to the improvement of the roads, came to Calcutta, the "deep broad Mahratta ditch" existed near the present Circular Road. It was then commenced to be filled up by depositing the filth of the town in it. The earth excavated in forming the ditch says a writer of that day, was so disposed on the inner or townward side, as to form a tolerably high road, along the margin of which was planted a row of trees and this constituted the more frequented and fashionable part about town. Another writer says in 1802—"Now on the Circular Road of Calcutta the young and the sprightly and the opulent during the fragrance of morning, in the

মহারাষ্ট্রগণ যে সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করে অর্থাৎ সেই ১৭৪২ খৃঃ অব্দে, কলিকাতা সহরের অবস্থা কিরূপ ছিল—তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার যে সকল নক্‌সা প্রস্তুত হয় তাহাতে এই খাতটী বিশেষ রূপে চিহ্নিত করা আছে। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে অপ্‌জনের ম্যাপেও এই খাতের স্থান নির্দ্দেশ দেখা যায়। রেভারেণ্ড হাইড এই নক্‌সা দেখিয়াই তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উঁমিচাঁদ ও ব্ল্যাক-জমীদার গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানগুলিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই খাতটী হাল্‌সীবাগানের নিকট বক্রাকারে ঘুরিয়া আসে।

১৭৪২ অব্দের এই নক্‌সা হইতে জানা যায়, এই সময়ে কলিকাতার ইংরাজ অধিবাসিগণের অধিকৃত স্থানের চারিদিকে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য, সুদীর্ঘ কাঠের বেড়া দেওয়া ছিল। ভাগিরথীর দিকেও এই বেড়াগুলি, ইহার তীরস্থ ইংরাজের বাগানবাটী ও বাসভবনের রক্ষাবন্ধনী স্বরূপে বর্ত্তমান ছিল। গঙ্গাতীরে—দুই এক স্থানে নগরের প্রবেশদ্বাররূপে দুই চারিটী গেট বা ফটক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আজকাল আমরা ষ্ট্রাণ্ড-রোড বা ভাগিরথী তীরবর্ত্তী প্রশস্ত পথটীকে যে ভাবে দেখিতে পাইতেছি, তখন তাহা নদীগর্ভে ছিল। নদীগর্ভ সরিয়া যাওয়ায়, তটভূমি ভরাট করিয়া পরে এই পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কয়লাঘাট ষ্ট্রীট ও ফেয়ার্লি-প্লেস্‌ অর্থাৎ যে স্থানের মধ্যে কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ ছিল, সেইস্থানে গঙ্গারধার দিয়া আর একটী ক্ষুদ্র পথ ছিল বটে, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান "ষ্ট্রাণ্ড-রোড" নহে। এই পথের পশ্চাতে ইংরাজদের বাগানবাটী, দুর্গের মালগুদামের একাংশ, জাহাজ মেরামতের জন্য একটী ক্ষুদ্র ডক্‌ ছিল। তখন হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের অস্তিত্ব ছিল না। আজকাল হেষ্টিংস ষ্ট্রীট বলিয়া যাহা পরিচিত, যাহার পার্শ্বে গবর্ণমেণ্ট-প্রিণ্টিং ও বরণ কোম্পানীর কার্য্যালয় প্রভৃতি অবস্থিত, তাহা তখন একটী খালমাত্র ছিল। খালটী বরাবর বর্ত্তমান ক্রীক্‌রোর মধ্য দিয়া ধাপায় গিয়া মিলিত হয়। খালটী যে নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল এরূপ বোধ হয় না। কারণ এই খালের জলে ১৭৩৭ খৃঃ অব্দের বিখ্যাত ঝড়ে একখানি জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছিল ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগিরথী ও এই খালের সংযোগস্থলে, বর্ত্তমান চর্চ্চ লেনের কোণে ও হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সান্নিধ্যে একটী চতুষ্কোণ মাটীর বুরুজ ছিল।

---

chariot of health, enjoy the gales of recreation.—Good Old days of John Company Vol I. P. 42.

এই বুরুজের উপর কয়েকটী কামানও সাজান ছিল। ভাগিরথীর দিক হইতে শত্রুর প্রবেশপথ পথ বন্ধ করিবার জন্য, এই কামানগুলি নদীর দিকেই মুখ ফিরাইয়া রাখা হয়। গঙ্গাগর্ভ হইতে বর্ত্তমান ফ্যান্সি-লেন চিহ্নিত স্থানের মধ্যে এই খালটীর উপর, তিনটী পুল ছিল। ইহার একটী পুলের ধারেই কোম্পানীর "বারুদ-ভাণ্ডার" বা ম্যাগাজিন গৃহ। এই বারুদ-ভাণ্ডার, বর্ত্তমান সেণ্টজন গির্জ্জার অতি সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল। আজকাল ফ্যান্সি-লেন যেস্থানে ওয়েলেস্‌লী প্লেসের সহিত মিশিয়াছে—সেই স্থান হইতেই সহরপরিবেষ্টনকারী এই বেড়াটী আরও বাঁকিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে একটী বৃহৎ বট গাছ ছিল। এই বট গাছে অপরাধীদের ফাঁসী দেওয়া হইত। রেভারেণ্ড হাইড অনুমান করেন—"এই ফাঁসী শব্দই ভবিষ্যতে "Fancy" (ফ্যান্সি) তে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে।" ওয়েলেসলী প্লেস্ পার হইয়া, বর্ত্তমান লারকিন্স লেনের নিকট দিয়া এই কাষ্ঠময় রক্ষাবন্ধনী, রাণীমুদীর গলিমুখে পেঁৗছিয়াছিল। অর্থাৎ সে পথ আজকাল ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-ষ্ট্রীট বলিয়া পরিচিত—ও যাহার মোড়ে সুবিখ্যাত উইলসনের হোটেল বর্ত্তমান। সেরাজ যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে এই রাণীমুদি-গলির সন্নিকটে, একটী ব্যাটারি বা তোপখানা তৈয়ারি হইয়াছিল। এই ব্যাটারি হইতে অজস্র অনল-রাশি উদ্গীরিত হইয়া, সেরাজ-সৈন্যকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। আপজনের ম্যাপে ইহা Rana Madda Lane বলিয়া উল্লিখিত। এই রাণীমুদী গলি নাম কেন হইল, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। প্রাচীন কলিকাতার পথঘাটের কথা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

এই রাণীমুদি গলি হইতে বারেটো-লেন ও তৎপরে বর্ত্তমান ম্যাঙ্গো-লেনের প্রথমাংশ দিয়া, এই রক্ষাবন্ধনীর গতি বর্ত্তমান মিসন-রো'র দিকে পরিবর্ত্তিত হয়। সেকালে এই মিসন রো—Rope-Walk নামে পরিচিত ছিল। রেভারেণ্ড কারনান্ডার কর্ত্তৃক ১৭৭৫ খৃঃঅব্দে এইস্থানে একটী গির্জ্জা স্থাপিত হওয়ার পর, ভবিষ্যতে ইহা "মিশন-রো" নামে অভিহিত হয়। এই মিশন-রোর সান্নিধ্যে, বর্ত্তমান স্কচ্-গির্জ্জার নিকটবর্ত্তী স্থানে, সুবিখ্যাত ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানীর ঘড়ীর দোকানের পার্শ্বে, সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণ সময়ে আর একটী ব্যাটারী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাটারীর কামানগুলি সেরাজের সেনাগণকে দুর্গ-প্রবেশে যথেষ্ট বাধা দিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠময় রক্ষা-বন্ধনী এই রোপ-ওয়াক্ হইতে লালবাজারের

দিকে যায়। বর্ত্তমান পুলিসকোর্ট যেখানে অবস্থিত—সেই স্থান ঘুরিয়া ইহা রাধাবাজারে আসিয়া পড়ে। তৎপরে এজরা ষ্ট্রীট হইতে আমড়াতলা ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত যায়। সম্ভবতঃ, বর্ত্তমান বেণ্টিক-ষ্ট্রীট অর্থাৎ কালীঘাটাভিমুখী পুরাতন যাত্রী-পথটীকে এই রক্ষা-বন্ধনীর সীমাভুক্ত করা হয় নাই। তখন এই স্থানে কসাই, তেলি, ডোম, প্রভৃতি জাতি বাস করিত। এই জন্ম আজও এই স্থানগুলি কসাইটোলা, ডোমটোলা, কলুটোলা প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত।

তৎপরে এই রক্ষাবন্ধনী পর্টুগীজ কোয়াটারকে বেষ্টন করিয়া আর্ম্মিনিয়ান ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়ে। তৎপরে হামাম-গলির * মধ্য দিয়া, মুরগীহাটা হইয়া, আর্ম্মানী গির্জ্জা ও গোরস্থানকে বেষ্টন করিয়া, দরমাহাটা ও খোংরা পটী হইয়া † পুরাতন চীনাবাজারের যে স্থান আজকাল বন্‌ফিল্ড লেন বলিয়া পরিচিত, তাহার মধ্য দিয়া রাজা উদ্‌মন্ত ষ্ট্রীটে আসিয়া গঙ্গার ধারে শেষ হয়। পাঠক ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন—সেকালের কলিকাতা কেবল যে দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ছিল তাহা নয়, সহরের চারিদিকে এই সুদীর্ঘ কাষ্ঠের-বেষ্ঠনী থাকায় আর কিছুই না হউক, চোর ডাকাতেরা সহসা বাহির হইতে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না।

বাগবাজার অঞ্চলে সেকালের পেরিন্‌স্‌-গার্ডেন ছিল। সেরাজ, সর্ব্ব প্রথমে এই স্থান আক্রমণ করে। এই পেরিন্‌স্‌-বাগান ও সুতালুটীর নিকটবর্ত্তি স্থান সমূহে দুই দশ ঘর ইংরাজ বাস করিতেন। সেকালের কলিকাতার অনেক ইংরাজ, সপত্নীক বা বন্ধুবান্ধব সঙ্গে এই বাগানে বেড়াইতে যাইতেন। কলিকাতা দুর্গ-প্রতিষ্ঠার পর ও সহর জনপূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অনেক ইংরাজ সুতালুটী পরিত্যাগ করিয়া খাস কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। ১৭৪৬ খৃঃ অব্দ হইতেই, এইখানে ইংরাজ অধিবাসীদের যাতায়াত মন্দীভূত হইয়া আসে। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে এই বাগান মেরামত অভাবে জঙ্গলময় হইয়া পড়ায় ২৫ হাজার টাকায় বিক্রী হয়।

* "হামাম গলিতে—প্রাচীন কলিকাতার সাধারণ স্নানাগার ছিল।" "হামাম" বা স্নানাগার হইতে এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে এই সমস্ত "হামামের" অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে এবং এই গলিটী আজও অতীতের স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানকে সংযোজিত রাখিয়াছে।

† খোংরাপটীর মধ্যে সেকালের নির্ম্মিত আজও এই পুরাতন গির্জ্জা ও গোরস্থান বর্ত্তমান। পাঠক বড়বাজারের খোংরাপটীর রাস্তার ধারেই এই পুরাতন গির্জ্জাটী দেখিতে পাইবেন।

কাপ্তেন পেরিনের, (ইঁহার নিজের দুই তিনখানি বাণিজ্য জাহাজ ছিল) নামেই এই উদ্যানের নাম Perrins Garden "পেরিনস্ গার্ডেন" হয়। ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে ইহা কর্ণেল স্কটের দখলে আসে। এই কর্ণেল স্কট কোম্পানীর ফৌজের অধ্যক্ষ ও ভবিষ্যত গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রথম পক্ষের শ্বশুর ছিলেন। কয়েক বৎসরের ইহা জন্য কোম্পানীর বারুদের কারখানায় পরিণত হয়। আপ্‌জনের ম্যাপে—ইহা এই জন্য "ওল্ড পাউডার মিল্ বাজার এণ্ড রোড" (Old Powder Mill Bazar and Road) বলিয়া চিত্রিত। এইস্থান হইতেই পূর্ব্বোক্ত "মারহাট্টা-ডিচ" আরম্ভ হইয়াছিল।

আপজনের ম্যাপ ব্যতীত লেফ্‌টেনাণ্ট উইলস্‌এর আর একখানি সমসাময়িক ম্যাপ হইতে এই সময়ের কলিকাতা সহরের আয়তন ও বাসিন্দাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।* এই উইলস্ সাহেব কোম্পানীর গোলন্দাজ-সেনার অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে এই নক্সাখানি প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে জানিতে পারা যায়—সেকালের ইংলিশ-কোয়াটার বা সাহেব-পল্লী, উত্তরে বর্ত্তমান ক্যানিং ষ্ট্রীট বা মুরগীহাটার রাস্তা, দক্ষিণে বর্ত্তমান হেষ্টিংস ষ্ট্রীট বা সেকালের খাল, পূর্ব্বে বর্ত্তমান লালদিঘীর নিকটস্থ মিশন রো, বা সেকালের "রোপওয়াক্" (Rope Walk) ও পশ্চিমে ভাগিরথী, এই সীমানা ব্যাপিয়া ছিল। ইহার মধ্যে ২৩০ খানি পাকা বাড়ী ছিল। এই সমস্ত বাড়ীর চারিদিকে প্রশস্ত বাগান ছিল—ও বাগানের মধ্যে দুই তিনটী ছোট বড় পুকুরও দেখা যাইত। কলিকাতায় তখন জমীর অভাব ছিল না ও সাহেবদের মধ্যেও বাগান-বাগিচা ও পুকুরওয়ালা জমীর উপর আবাস-বাটী এবং ভদ্রাসন প্রস্তুত করার রেওয়াজ ছিল। কলিকাতায় পানীয়-জলের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, অনেকে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইয়া লইতেন। এই সমস্ত বাগান-বাগিচাওয়ালা সাহেবী-কুঠীর নমুনা দেখিতে ইচ্ছা হইলে, পাঠক—মেটিয়াবুরুজের সান্নিধ্যে গার্ডেনরিচ রোডের পার্শ্ববর্ত্তী "পাঁচকুঠী" প্রভৃতি বাড়ী দেখিয়া সেকালের ইংরাজদের আবাস বাটীর অনেকটা আভাস পাইতে পারেন। বর্ত্তমান চৌরঙ্গীর মধ্যেও এরূপ বাগিচা ও পুষ্করিণী সমন্বিত পুরাতন বাটী খুঁজিলে এখনও দুই চারিখানা দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* Plan of Fort William and part of the City by William Wills Lieutenant of the Artillery Company in Bengal 1753

তখন সহরের মধ্যে যে সকল গলি ও সদর রাস্তা ছিল, আজকালকার মত তাহাদের বিশেষভাবে নামকরণ হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও উইলসের এই ম্যাপ হইতে পুরাকালের সেই স্থানগুলিকে চিনিয়া লওয়া বেশী কষ্টকর হয় না। আমরা এক্ষণে এই ম্যাপের নির্দ্দেশানুসারে পলাশী আমলের পূর্ব্বের কলিকাতার পরিচয় লইব।

এই প্ল্যানের মধ্যস্থানেই লালদিঘী। এই লালদিঘীর উত্তর পূর্ব্বে কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ। দুর্গের দক্ষিণ দিকে কোম্পানী বাহাদুরের আমদানী রপ্তানীর মালগুদাম বা Export and Import Warehouse. ১৭৪১ খৃঃ অব্দে এই সমস্ত মালগুদাম নির্ম্মিত হয়। এই মালগুদামের নিকট দিয়া একটী নাতি-প্রশস্ত পথ—নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাকে "কেল্লাঘাট বা ফোর্টঘাট ষ্ট্রীট বলিত।* দুর্গের সান্নিধ্যে, লালদিঘীর কোণে বর্ত্তমান রাইটার্স-বিল্‌ডিংএর কাউন্সিল-চেম্বারের নিকট, কলিকাতার আদি গির্জ্জা সেণ্ট এন্। এই গির্জ্জা ও লালদিঘীর মধ্যস্থান দিয়া একটী পথ লালবাজারে গিয়া পূর্ব্বকথিত কালীঘাট যাত্রীপথ বা Pilgrim Road সহিত মিলিত হইয়াছিল।† এই রাস্তার দুই পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপিত হওয়ায় ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

লালদীঘির উত্তর পূর্ব্ব কোণে "কোর্ট হাউস" অবস্থিত ছিল। ইহাই প্রাচীন কলিকাতার পুরাতন আদালত-গৃহ। এই কোর্টহাউস হইতেই ইহার নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান পথটীর (Old Court House Street) ওলড কোর্ট-হাউস ষ্ট্রীট নামকরণ হইয়াছে। আজকাল যেস্থানে সেণ্ট এনড্রু চর্চ্চ বা ঘড়িওয়ালা স্কটিশ-গির্জ্জা অবস্থিত সেই স্থানের অধিকার অরিয়াই এই "কোর্ট হাউস" ছিল। এই কোর্ট-হাউসের পশ্চাতে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল।

লালবাজারের মোড়ে, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের সম্মিলন-স্থলে পুরাতন জেলখানা ছিল। ইহাই ইংরাজের নির্ম্মিত কলিকাতার প্রথম জেলখানা। ইহার পর হরিণবাড়ী জেল নির্ম্মিত হয়। হরিণবাড়ী জেলের কথা আমরা পরে বলিব। লালদীঘির পুর্ব্বধারে যে সমস্ত বাড়ী ও বাঙ্গালা ছিল, তাহার কোন

* অনেকে এই কেল্লাঘাট নাম হইতে বর্ত্তমান "কয়লাঘাটা" নামকরণ হইয়াছে, এরূপ অনুমান করেন। ইহা কতদূর সঙ্গত তাহা ঠিক বলা যায় না।

† এই যাত্রীপথ বর্ত্তমান চিৎপুর রোড, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও ধর্ম্মতলা। এই সকল স্থান পূর্ব্বে জঙ্গল সমাবৃত ছিল ও কালিঘাটের যাত্রীরা এই পথ ধরিয়া চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া আদিগঙ্গা তীরবর্ত্তী কালীঘাটে যাইত।

অস্তিত্বই এখন নাই। ইহার উত্তরপূর্ব্ব কোণে যে বাঙ্গলায় গ্রাণ্ট সাহেব বাস করিতেন, তাহার অধিকৃত স্থানে এখন ঘড়িওয়ালা "ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোং" প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে।

মিসনরোর মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত কাছারী বাড়ীর সম্মুখে, একটী Play-House বা থিয়েটার-গৃহ ছিল। বর্ত্তমান রাইটার্স-বিল্‌ডিংএর পশ্চাতে আর একটী প্লে-হাউস ছিল। এই থিয়েটার গৃহটীই সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণ সময়ে (১৭৫৬ খৃঃ অব্দ) নবাব-সৈন্যগণ কর্ত্তৃক "ব্যাটারি" রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত প্লে-হাউসের পরই, লেডী রসেলের আবাসবাটী। ইনি সেকালের সুবিখ্যাত স্যর ফ্রান্সিস্ রসেলের পত্নী। এই রসেল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্রময়েলের বংশধর। পরবর্ত্তীকালে এই রসেল সাহেবের বাটীর অধিকৃত স্থানে— বর্ত্তমান মিসন চর্চ্চ (১৭৭৫ খৃঃ অব্দে) নির্ম্মিত হয়। ইহার পরের একটী বাটীতে মিঃ ব্রাউন বলিয়া একজন সাহেব থাকিতেন, সে বাড়ীটীর অস্তিত্ব এখন না থাকিলেও পরবর্ত্তীকালে সেই স্থানে আর একটী ত্রিতল বাটী নির্ম্মিত হয়। এই বাটী এখনও বর্ত্তমান। এই বাটীতেই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য জেনারেল ক্লেভারিং দেহত্যাগ করেন। পাঠক মনে রাখিবেন আমরা যে সমস্ত বাড়ীর ও স্থানের কথা বলিতেছি—তাহা বর্গীর-হাঙ্গামার সমসাময়িক। তখন নবাব আলিবর্দ্দীর আমল। জেনারেল ক্লেভারিং যে বাটীতে দেহত্যাগ করেন, সেই বাটীতে লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর, একখানি প্রস্তর-ফলক লাগাইয়া দিয়াছেন। এজন্য তাহা আজও সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি-বহন করিতেছে। সেকালের ম্যাঙ্গো-লেন আজও অপরিবর্ত্তিতভাবে বর্ত্তমান।

এইবার মিসন-রো ও ম্যাঙ্গো-লেন ছাড়াইয়া, করেন্সি আফিসের পার্শ্ব দিয়া—আমাদিগকে বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ আফিসের নিকট আসিতে হইবে। বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ-আফিস বিল্ডিং যেস্থানে আছে—সেই স্থানের সান্নিধ্যে, লালদীঘি ছাড়া আর একটী পুষ্করিণী ছিল। এই পুষ্করিণীর আশে পাশে কতকগুলি ছোট মেটে ও কোঠা বাড়ী ছিল। এই বাড়ীতে কোম্পানীর "কালিকো-প্রিণ্টারগণ" (Kalico-Printers) বাস করিতেন। এই কালিকো প্রিণ্টারদের আবাস স্থানের পরেই পলাশী আমলের পাদ্‌রী বেলামী সাহেবের আবাস-স্থান ছিল। পাদরী বেলামী সাহেবের বাটীর কম্পাউণ্ড বা সীমানা বর্ত্তমান ওয়েলেস্‌লি প্লেস ও ডালহাউসী স্কোয়ার অবধি বিস্তৃত ছিল। বড়লাট বাহাদুরের মিলিটারি সেক্রেটারির বর্ত্তমান আবাসস্থান—যে বাটীতে,

সেই স্থানেই পাদরী বেলামীর বাটী ছিল। কিন্তু তাঁহার বাটীর চতুঃ-পার্শ্বের সীমানা—লালদীঘির দক্ষিণ কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই বেলামী সাহেবের বাটীর পরে আর একটী উন্মুক্ত স্থান। তাহার পর কোম্পানী বাহাদুরের সরকারী আস্তাবল। আজকালকার কৌন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই এই আস্তাবল ছিল। আস্তাবলের পরই বর্ত্তমান হেয়ার-ষ্ট্রীটের প্রারম্ভস্থলে—কোম্পানীর সাধারণ হাঁসপাতাল ছিল। হাঁসপাতালের পরই—পাউডার-ম্যাগাজিন ও এই পাউডার ম্যাগাজিন বা বারুদ-ঘরের পার্শ্বেই কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গোরস্থান। এই গোরস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী জমীতে, বর্ত্তমান সেণ্টজন গির্জ্জা রহিয়াছে। এই সেণ্ট জন গির্জ্জার পাদরী সাহেব এখন যে বাটীতে বাস করেন, সেইস্থানে একটী পুষ্করিণী ছিল।

এই পল্লীতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেবের দুইখানি বাটী ছিল। কারণ এই প্ল্যানের মধ্যে দুইখানি বাটী হলওয়েলের নামে চিহ্নিত দেখা যায়। ইহার একখানির স্থান, বর্ত্তমান বাঁকশাল ষ্ট্রীটের মোড়ে, যে স্থানে বর্ত্তমান ছোট আদালত বা স্মলকজকোর্ট বিচারালয় বিরাজিত—সান্নিধ্যে আর একখানি বর্ত্তমান চর্চ্চ-লেন ও হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটের সন্ধিস্থলে। হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটের সেই পুরাকালের খালের একাংশ এই বাটীর দক্ষিণদিকে ছিল। আজকাল যেস্থানে ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেশনারী অফিস বর্ত্তমান, হলওয়েলের দ্বিতীয় বাস-গৃহ ঠিক সেইস্থানেই ছিল। এখন যেখানে ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেশনারী আফিস হইয়াছে—ও পূর্ব্বে যেস্থানে হলওয়েলের আবাস-বাটী ছিল, সেই স্থানে পলাশীযুদ্ধের বহুকাল পরে—কোম্পানী-বাহাদুরের পুরাতন টাঁকশাল-গৃহ স্থাপিত হইয়াছিল। এখন হলওয়েলের সে বাটীর চিহ্নও নাই—সেই পুরাতন টাঁকশালের চিহ্নও নাই—তাহার স্থানে বর্ত্তমান প্রাসাদ-তুল্য ষ্টেসনারী আফিস স্থাপিত হইয়াছে।

আজকালকার "ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী" এবং সাবেক মেট্‌কাফ-হলের বাটীর অধিকৃত স্থানটী—কাপ্তেন উইলসের ম্যাপে শেঠদিগের আবাস-বাটী বলিয়া চিহ্নিত। কোম্পানী-বাহাদুরের প্রধান দালাল, রামকৃষ্ণ শেঠ মহাশয়ের বাস্তুভিটা এই স্থানেই ছিল। এই বাস্তুভিটার চারিদিকে বাগান-বাগিচা থাকায়—বড়ই জাঁকাল দেখাইত। তখনকার কালে—রামকৃষ্ণ শেঠ ও অমিচাঁদ ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালীরই কলিকাতার ইংরাজ-টোলায় বাড়ী ছিল না। রামকৃষ্ণ শেঠের এই বাটি পরবর্ত্তীকালে তাঁহার মৃত্যুর পর

ভাড়া দেওয়া হয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমিয়াট সাহেব—এই বাটি ভাড়া লন। এই আমিয়াট—নবাবকর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের শোচনীয় পরিণাম হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য, ফলতায় পলায়ন করেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে—নবাব মীরকাশিমের হস্তে ইনি নিহত হন।

এইবার আমাদিগকে একবার লালদীঘির উত্তরে সেণ্ট এন গির্জ্জার কাছে যাইতে হইবে। এই স্থানে সেকালে কতকগুলি পাকা বাড়ী পাশা-পাশি ভাবে বর্ত্তমান ছিল। আজকাল যেখানে ফিন্‌লে মুর কোম্পানীর আফিস-গৃহ বর্ত্তমান, সেইস্থানে মিঃ এডওয়ার্ড আয়ার সাহেব বাস করিতেন। এই আয়ার সাহেব, চার্ণকের জামাতা আয়ার নহেন—ইনি পলাশী আম-লের লোক। ইনি কোম্পানী বাহাদুরের ভাণ্ডার-রক্ষক ছিলেন। কৌন্সিলে, ইনি দশম সদস্য। ইনিও ব্ল্যাকহোল হত্যাকাণ্ড হইতে বাঁচিয়া যান। ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন কর্ত্তৃক কলিকাতা পুনরাধিকৃত হইলে—এই আয়ার সাহেবের বাটির অধিকৃত স্থানে একটি থিয়েটার-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আজকাল যাহা লিয়নস্-রেঞ্জ বলিয়া সাধারণে পরিচিত—সেইস্থানে তিনখানি সারি সারি পাকা বাড়ী ছিল। এই তিনখানি বাড়ীর একখানি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অমিচাঁদ বা আমীরচাঁদের। দ্বিতীয় খানি মিঃ কোলসের (Coles) ইনি ব্লাক-হোলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৃতীয় বাটীখানি মিঃ জন নক্সের। ইনি কোম্পানীর সেনানি ছিলেন। সেরাজকে দুর্গ সমর্পণ করিবার সময় কলিকাতা দুর্গমধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইনি সেই অবসরে প্রাণরক্ষার্থে দুর্গ হইতে পলায়ন করেন।

অমিচাঁদের এই বাটীর সীমানার পার্শ্ব হইতে, একটী গলির চিহ্ন আপজনের ম্যাপে দেখা যায়। তাহা "থিয়েটার-ষ্ট্রীট" বলিয়া চিহ্নিত। আজকাল যেস্থানে লিয়নস্-রেঞ্জ ও পুরাতন চীনাবাজার রাস্তার সহিত নূতন চীনাবাজার রাস্তার মিলন হইয়াছে—ইহাই সেকালের থিয়েটার ষ্ট্রীট। পাঠক যেন এই পথটিকে বর্ত্তমান "থিয়েটার-রোড" বলিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

সম্ভবতঃ এই রথ্যাদ্বয়ের সংযোগস্থলের মধ্যে—কোম্পানীর সেক্রেটারী কুক সাহেবের আবাস বাটী ছিল। এই কুক্ সাহেবও অন্ধকূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া যান। প্রসিদ্ধ-ইতিহাস-লেখক অর্ম্মি সাহেবকে, এই সেক্রেটারী কুক্ সাহেবই ভবিষ্যতে "ব্লাকহোল" সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান করেন। আয়ার সাহেবের বাটীর পশ্চাতেই

কুক্ সাহেবের বাটী ছিল। ইহার পরেই চার্লস বেয়ার্ড সাহেবের আবাস বাটী। এই বাটীতে তাঁহার বিধবা-পত্নী বাস করিতেন। এই চার্লস বেয়ার্ডের পিতা জন বেয়ার্ডই রোটেসান-গবর্ণমেণ্টের আমলে কলিকাতা কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। বেয়ার্ড সাহেবের বাস্তুভিটার উপর পরবর্ত্তীকালে আর একটী বাটী নির্ম্মিত হয়। প্রবাদ এই—এই বাটীতে প্রথমে লর্ড ক্লাইভ ও পরে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কৌন্সিলের সদস্য স্বনামখ্যাত স্যর ফিলিপ-ফ্রান্সিস্ সাহেব বাস করিতেন। লর্ড কর্জ্জন এই বাটী প্রস্তর-ফলক চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই বর্ত্তমান "রয়াল এক-চেঞ্জের" অধিকৃত স্থান।

প্রাচীন কলিকাতা-দুর্গের উত্তরাংশে, মিঃ ক্রুটেনডেনের বাটি ছিল। বাড়ীটির কম্পাউণ্ড বা সীমানা বহুদূরব্যাপী ও ইহা ঠিক গঙ্গার ধারেই ছিল। তখন গঙ্গাগর্ভ ষ্ট্রাণ্ড-রোড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ক্রুটেনডেন সাহেব—এক সময়ে কোম্পানীর গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ফেয়ার্লি প্লেসের অধিকাংশ স্থানই এই বাটীর সীমাভুক্ত স্থান।

ক্রুটেনডেনের বাটীর পশ্চাৎভাগে—মিঃ উইলিয়াম টুক বাস করিতেন। এই টুক সাহেব ব্লাকহোল ব্যাপারের ও সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের একটি বিশদ বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। টুকের লিখিত এই কাহিনীটী পড়িবার ইচ্ছা হইলে, ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠক মিঃ হিলের সুবৃহৎ গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

ইতিপূর্ব্বে যে বাড়ীতে বার্ড কোম্পানীর আফিস-গৃহ ছিল, সেই বাটীর সান্নিধ্যেই কোম্পানী বাহাদুরের সোরার-গুদাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজকাল সেই স্থানে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই স্থানে নদীর দিকে—ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওয়াটস্ সাহেবের বাটী ছিল। এই ওয়াটস্ই কাশিম-বাজারের অভিনয়ে প্রধান অভিনেতা। ইনিই পলাশীযুদ্ধ ব্যাপারের একজন প্রধান হোতা। কাশিমবাজার অবরোধের পর সেরাজের হস্তে ইনিই নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ইনিই মীরজাফরের নিকট গুপ্তভাবে গিয়া তাঁহাকে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া সন্ধিতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই ওয়াটস্ পত্নীই ভবিষ্যতে "বেগমজন্‌সন" বলিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হন।

ইতিপূর্ব্বে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের যেস্থানে গ্রেহাম কোম্পানীর পুরাতন বাড়ী ছিল—সেই স্থানে মিঃ গ্রিফিথসের আবাস-স্থান। যে উইলস্ সাহেবের

নকসার উপর নির্ভর করিয়া, আমরা পলাশী-আমলের পূর্ব্বে কলিকাতার বাড়ী ঘরগুলির অবস্থান বিবরণ দিতেছি, তদনুসারে তাঁহার আবাসবাটি, বর্ত্তমান "গিলাণ্ডার্স-হাউসের" সান্নিধ্যে ছিল। ক্লাইভ-রোর তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে এইস্থানে একটী ক্ষুদ্র গলি ছিল, সেই গলি দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই, কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য ম্যাকেট সাহেবের বাটী দেখিতে পাওয়া যাইত। এই ম্যাকেট সাহেব, কলিকাতার বক্সী বা খাতাঞ্জি ছিলেন। হলওয়েলের লিখিত বৃত্তান্ত মতে, এই ম্যাকেট সাহেবই, ড্রেক ও মিনচিনের দুর্গত্যাগের পর, তাঁহার পীড়িতা পত্নীকে জাহাজে তুলিয়া দিবার অছিলায় দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

যে সকল ব্যক্তির নাম—ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, যাঁহারা সে সময়ে কোম্পানীর আমলের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, উইল্‌সের নকসার অনুসরণ করিয়া আমরা কেবল বর্ত্তমান কলিকাতার কোন কোন স্থানে তাঁহাদের আবাস স্থান ছিল—তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। সুদূর বর্ত্তমানে পুরাকালের স্মৃতি ডুবিয়া গিয়াছে। অতীতের সেই লালদীঘি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, যেন মায়াবলে এক সৌধময় স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ পলাশী-আমলের সময়ে সর্ব্বজন-বিদিত ছিলেন। তাঁহারা সেই সময়ে রাষ্ট্র-বিপ্লব-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া—বর্ত্তমান ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বল্পবিস্তর সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ক্লাইভ, ওয়াটস্‌, হলওয়েল, বেলামী, ম্যাকেট, মিনচিন, অমিচাঁদ, গোবিন্দরাম মিত্র, কাপ্তেন ইলিস্‌, জন বেয়ার্ড, প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র। উইলস্‌ সাহেবের নক্সা নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া, আরও অনেক ইংরাজ সেই প্রাচীন কলিকাতার বাসিন্দা ছিলেন। এই সমস্ত নক্সার চিহ্নিত স্থান হইতে প্রমাণ হয়, তখনকার লালদীঘি ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, বর্ত্তমান চৌরঙ্গীর ন্যায় ইংরাজ-পল্লীরূপে পরিগণিত ছিল। দেশীয়দের মধ্যে খুব কম লোকই এইস্থানে থাকিতেন। যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহাদের নাম আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাঁহারা তখন "কলিকাতার ইংরাজ" বলিয়া কথিত হইতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই "মার্চ্চাণ্ট" এবং কোম্পানীর সেনা-বিভাগের কর্ম্মচারী ও ফ্যাক্‌টার। *

---

* Omichand and the Setts are the only Indians whose names appear as house-owners and the Englishmen are all either factors or merchants or officers of the Garrisson. Calcutta Old and New—Cotton.

ইংরাজ-টোলার পরই, পর্টুগীজ ও আর্ম্মাণী-টোলা। বর্ত্তমান মুর্গীহাটার সীমা হইতে আরম্ভ হইয়া—বড়বাজার খোংরাপটীর আর্ম্মাণী-গির্জ্জা ও তৎসংলগ্ন গোরস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে, পর্টুগীজ ও আর্ম্মিনিয়ানগণ বাস করিত। ইহারা কোম্পানীর সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। খোজা সরহদ, খোজা পিট্রস প্রভৃতি আরমাণিগণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইহার পরই—এদেশীয় লোকেদের বাস-পল্লী। এই পল্লী পূর্ব্বোক্ত রক্ষাবন্ধনী বা "প্যালিসেডের" বাহিরে। উত্তরে সুতালুটী হইতে আরম্ভ করিয়া, শোভা-বাজার, কুমারটুলি বাগবাজার বেষ্টন করিয়া, মারহাট্টা খাতের পার্শ্ব দিয়া সার্কিউলার-রোড, হালসীবাগান, শিয়ালদহ, বৌবাজার প্রভৃতি সীমানার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ, দেশীয় ভদ্রলোকদের আবাসস্থান ছিল। অবশ্য এই সকল স্থানে তখন এত ঘন বসতি হয় নাই। অনেক স্থান বন জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। বর্ত্তমান চিৎপুর রোড একটী সরু জঙ্গলময় পথ ছিল। বৌবাজারের বর্ত্তমান রাস্তার অস্তিত্ব ছিল না। গোবিন্দরাম মিত্র ও বনমালী সরকারের জন্য কুমারটুলি জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণের জন্য শোভাবাজার গুলজার হইয়াছিল। বর্গীর ভয়ে, অনেক লোক নানাস্থান হইতে আসিয়া কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে বাস করে। ইহাতে প্রাচীন কলিকাতার দেশীয় পল্লীসমূহ ক্রমশঃ জনপূর্ণ হইয়া উঠে। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে, অপজনের ম্যাপে আমরা দেখিতে পাই—"নেটিভ টাউনের বিস্তৃতি বড়বাজার হইতে বৈঠকখানা বাজার পর্য্যন্ত ছিল।" হোগলকুঁড়িয়া, সিমুলিয়া প্রভৃতি স্থানও ক্রমশঃ জনপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।* তখন এত বাড়ী ঘর গলিঘুঁজির অস্তিত্বমাত্র ছিল না। চারিদিকে পর্ণকুটীর, মধ্যে মধ্যে জঙ্গল, কোথাও বা নালা-নর্দ্দামা- বড় বড় পুষ্করিণী ও বাগান-বাগিচা। তখনকার এক একটী পল্লীতে, এক এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বাস করিত। তাহাদের নামানুসারেই সেই সমস্ত পল্লীর নামকরণ হইয়াছিল। কুমারটুলীতে

* The demarcation between the "white" and "black" towns, were even sharper. The people of the country were indispensible to the prosperity of the factory, but they were not permitted within the pallisades. Outside the stocaded two hundred and twenty acres which comprised Christian Calcutta there had therefore sprung up to the north and last a large and flourishing "Native-town" within the wider contour of the Mahratta Ditch. Its importance and extent were materially increased by the influx of population from the western bank of the river which accompanied the Mahratta Scare in 1742. Cotton P- 51.

কুম্ভকার শ্রেণীর বাসস্থান ছিল। কলুটোলায় তৈলজীবিরা বাস করিত। মুচিপাড়ায় মুচিদের বাসস্থান ছিল। একটী সুবৃহৎ বট গাছের অস্তিত্ব জন্য "বটতলা" নামকরণ হইয়াছে। তুলাপটী প্রভৃতি অঞ্চলে তুলার বাজার ছিল। হোগলকুড়িয়ায়, অতিশয় হোগলাবন ছিল। প্রচুর সিমুল-গাছ পূর্ণ ছিল বলিয়া, সিমুলিয়া নামকরণ হইয়াছিল। কসাইটোলায়, কসাইগণ বাস করিত। হিন্তাল বা হাঁথাল-গাছের প্রাচুর্য্য জন্য হিন্তালী হইতে সম্ভবতঃ ইন্‌টালি তৎপরে ইটিলি নামকরণ হইয়াছিল। অবশ্য এই সমস্ত নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই—সবই আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র। পাকা রাস্তা আদতে ছিল না। বড় লোকেরা প্রাসাদ-তুল্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেন বটে, কিন্তু চোর-ডাকাতের ভয়ে, তাঁহাদের সিপাহী-শান্ত্রির ব্যবস্থা করিতে হইত। ভদ্র বাঙ্গালীগণ দলবদ্ধ হইয়া এক এক পল্লীতে বাস করিতেন।

সেকালে "ফৌজদারী-বালাখানা" একটু জাঁকাল ধরণের ছিল। এই ফৌজদারী বালাখানা, বর্ত্তমান লোয়ার চিৎপুর রোড ও কলুটোলার মোড়ে অবস্থিত। আজকাল কলুটোলার মোড়ের যে বাড়িটী, স্বর্গীয় বিনোদলাল সেন ও তাঁহার বংশধরগণের অধিকৃত, সেই বাটীর অধিকৃত স্থানেই হুগলীর ফৌজদারের কাছারী ছিল। তখন নবাবী আমল। হুগলীর ফৌজদারই তখন এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে মোকদ্দমা সমূহের বিচারক। এই সমস্ত ফৌজদারগণ কিরূপ প্রতাপশালী ছিলেন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তাঁহারা কত প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন—তাহার পরিচয় পাঠক ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। অনেক প্রতাপশালী ফৌজদার কলিকাতায় আসিলে, ইংরাজ-বণিকগণ তাঁহাদের যোড়শোপচারে পূজা দিতেন। ফৌজদারদের কিরূপ উপঢৌকন দেওয়া হইত, তাহার পরিচয়ও পাঠক পূর্ব্বে পাইয়াছেন। কোম্পানীর পুরাতন সেরেস্তার অনেক স্থানে তাহা উল্লিখিত আছে। কলিকাতায় ফৌজদারের এইরূপ আগমন ব্যাপার রহিত করিবার জন্য, ইংরাজেরা তাঁহাকে একটা মোটা টাকা নজররূপে প্রদান করিতেন।* এই উৎকোচ পাইয়াই ফৌজদার—

* ১৭৪২ খৃঃ অব্দের Fort William Consultation এর একাংশ এই :—"The Hoogly Phousdar demanding the annual present due in November last, amounting to current rupees two thousand seven hundred and fifty, agreed—that the President do pay the same out of the cash"

সাহেব কলিকাতা আসা বন্ধ করিয়া দেন। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের পর, তিনি কলিকাতার শাসনভার রাজা মাণিকচাঁদের উপর দিয়া যান। এই মাণিকচাঁদ হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। কলিকাতা নবাবের দখলে আসিবার পর—ফৌজদার রাজা মাণিকচাঁদ—কয়েক মাস কাল ফৌজদারী-বালাখানার এই বাটীতে আদালত করিয়া, দেশীয়দের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার নবাব—সেরাজউদ্দৌলা।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণ—ড্রেক সাহেবের পলায়ন—অন্ধকূপ-হত্যা ও আক্রমণের পরিণাম—প্রাচীন কলিকাতার শোচনীয় অবস্থা—হলওয়েল কর্ত্তৃক কলিকাতা রক্ষার চেষ্টা—লালদীঘির নিকট তোপমঞ্চ—রাণীমুদী গলির মুখে তোপমঞ্চ—ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীটে কোম্পানীর সোরার-গুদামের নিকট তোপমঞ্চ, পেরিন্স-পয়েণ্ট রক্ষার বন্দোবস্ত—মীরজাফরের সহিত পেরিন্স-পয়েণ্টে ইংরাজ সেনার সংঘর্ষ—মীরজাফরের দমদমায় পলায়ন—কলিকাতা আক্রমণের সময় কোম্পানীর কলিকাতার সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য—ক্লাইভ ও ওয়াটসন কর্ত্তৃক কলিকাতার পুনরুদ্ধার—পলাশী সমর—ক্লাইভের জয় ও সিরাজের অধঃপতন ও মৃত্যু—ক্লাইভ কর্ত্তৃক মীরজাফরের মসনদে অভিষেক—মীরজাফরের কৃতজ্ঞতা—মীরজাফরের সিরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ—কলিকাতা আক্রমণ সময়ে গোবিন্দরাম মিত্রের সাহস—দুর্দ্দশাগ্রস্ত কলিকাতাবাসীদের প্রতি কোম্পানীর সদ্ব্যবহার—ক্ষতিপূরণ-কমিশন—গোবিন্দরাম মিত্র ও শোভারাম বসাক প্রভৃতি এই কমিশনের প্রধান সদস্য—অন্যান্য দেশীয় কমিশনারগণের নামের তালিকা—তাঁহাদের নষ্ট সম্পত্তির দাবীর পরিমাণ—কোম্পানীবাহাদুরের মঞ্জুরী টাকা—কমিশনের প্রধান কর্ম্মচারী গোবিন্দরাম মিত্র প্রভৃতির অন্যায় দাবী, ক্ষতিপূরণপ্রার্থী কলিকাতাবাসীদের নামের তালিকা—কোম্পানীর ২৪ পরগণার জমীদারী—নবাবের এই জমীদারী দান সম্বন্ধে পরোয়ানা—কলিকাতায় ইংরাজের প্রথম টাঁকশাল স্থাপন—সিরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর ইহার শোচনীয় অবস্থা—এ সম্বন্ধে সমসাময়িক ব্যক্তিগণের বর্ণনা—পলাশীযুদ্ধের পর কলিকাতা সহরের অবস্থা—ব্ল্যাকহোলের স্মৃতি—কলিকাতার নাম আলিনগরে পরিবর্ত্তন—১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে পলাশীযুদ্ধের পর ভয়ানক মড়ক ও দুর্ভিক্ষ—প্রাচীন কলিকাতায় মহাহুলস্থূল—আইভসের বর্ণনা—এই মড়কে পলাশীবিজয়ী এড্‌মিরাল ওয়াটসনের অকাল-মৃত্যু—পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় কলিকাতায় মহামারীর আবির্ভাব—পঞ্চাশ হাজার বাঙ্গালীর মৃত্যু—কলিকাতার রাজপথে মৃতদেহ—পনর শত সাহেবের মৃত্যু—সেণ্টজন গির্জ্জার সমাধি-ভূমিতে স্থানাভাব, এই ভীষণ মড়কের কারণ সমূহ—কলিকাতার এইরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য পদস্থ ইংরাজদিগের সহর ত্যাগ ও সহরের বাহিরে বাগান-বাটীতে বাস—লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস—স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের বাগানবাটী—উমিচাঁদের বাগানবাটী—হাতিবাগান নাম হইবার কারণ—পলাশীযুদ্ধের দশবৎসর পরে কলিকাতার লোকের সামাজিক অবস্থা—গোবিন্দপুরে নূতন কেল্লা নির্ম্মাণ—অনেক পদস্থ বাঙ্গালীর গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া সহরের মধ্যে বসবাস—সেকালের কলিকাতার বাঙ্গালী বড়লোক—চৌরঙ্গী অঞ্চলের জঙ্গলময় অবস্থা—পথে ডাকাতের ভয়—সহরের প্রধান শোভা লালদীঘি—গ্রাণ্ডপ্রের লিখিত বিবরণ—পলাশী-আমলের পরে কলিকাতার পথ-ঘাট সমূহের পরিচয়—সেকালের চাকরবাকর ও তাহাদের মাহিনার হার—হুঁকাবরদার—সাহেবদের মধ্যে হুঁকায় ধূমপান প্রথা—রাইটার বা পুরাকালের সিভিলিয়ানগণ—তাঁহাদের সম্বন্ধে কোম্পানীবাহাদুরের নানাবিধ কঠোর আদেশ—পাল্কী ব্যবহার নিষেধ ইত্যাদি।—

নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণ।

কি কারণে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন, তাহার ইতিবৃত্ত অনেকেই জানেন। বর্ত্তমান যুগে স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালাভাষায় ও ইংরাজীতে লিখিত বড় বড় ইতিহাসে, নবাব ও ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সংঘর্ষ ব্যাপারের সম্পূর্ণ গূঢ় রহস্য সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলার মাসিক পত্রিকা সমূহেও এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সুপণ্ডিত হিল সাহেব, ১৭৫৬-৫৭ খৃঃ অব্দের ঘটনাবলী অবলম্বনে, সুবৃহৎ তিনখণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন। ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠক এই পুস্তক কয়খানি বিশেষ সহিষ্ণুতার সহিত পাঠ করিলে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরাজ-বণিকদিগের সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণের ফলে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ "অন্ধকূপ-হত্যা" ঘটনা ঘটে। পাঠক এই অন্ধকূপ-হত্যার সম্বন্ধেও অনেক অপ্রকাশিত নূতন তথ্য, হিলের এই সুবৃহৎ পুস্তকত্রয়ের মধ্যে দেখিতে পাইবেন। এ সমস্ত কথা বিশদভাবে আলোচনার স্থান আমাদের নাই। সুতরাং তাহা সন্নিবিষ্ট হইল না।

সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতার পুরাতন দুর্গ আক্রান্ত হইবার সময়, ইংরাজ গবর্ণর ড্রেক সাহেবের দুর্গ রক্ষার নিস্ফল চেষ্টা, অসম সাহসিক ধীর হলওয়েলের দুর্গরক্ষার চেষ্টা, নবাব কর্ত্তৃক দুর্গজয়, ইংরাজগণের কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ফল্‌তায় পলায়ন, নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতার নাম "আলিনগরে" পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ঘটনাবলী ইতিহাসানুরক্ত পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, পাঠকবর্গের সহিষ্ণুতার উপর অযথা আক্রমণ না করিয়া, আমরা কেবল সেই সময়ের কলিকাতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য কথা এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিব। তাহা হইতেই পাঠক অনেক নূতন তথ্য অবগত হইবেন।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিলে, এ দেশীয় অধিবাসীবর্গের অনেকে প্রাণভয়ে ও নবাবসেনা কর্ত্তৃক সম্পত্তি প্রভৃতি লুণ্ঠনাশঙ্কায়, নানাস্থানে পলাইয়া যায়। এই যুদ্ধের জন্য, লালদীঘির পার্শ্বস্থ অনেকগুলি বড় বড় বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বড়বাজার ও লালবাজার প্রভৃতি স্থানে অনেক বাড়ী নবাবের সৈন্য হস্তে, অগ্নিমুখে সমর্পিত হয়। কোথাও বা কামানের জ্বলন্ত গোলাগুলি পড়িয়া অনেক বাড়ী ঘর নষ্ট হইয়া যায়। মোটের উপর নবাবের আক্রমণে, প্রাচীন কলিকাতা কিয়ৎকালের জন্য হতশ্রী হইয়া পড়ে।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, এ সংবাদ পাইয়া—ইংরাজেরা কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য, সহরে অস্থায়ীভাবে এক খাত খনন করেন। প্রয়োজন মতে কতকগুলি বাড়ীও ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। লালদীঘির ধারেও এইভাবে অনেক নালানর্দ্দমা বুজাইয়া ফেলা হয়। বর্ত্তমান ওল্ড্‌কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে, দুইটী তোপমঞ্চ বা ব্যাটারি নির্ম্মিত হয়। আজকাল যেখানে ওয়েষ্টএণ্ড কোম্পানীর ঘড়ির দোকান, নর্টন-বিল্‌ডিং ও সেণ্ট এণ্ড্রুজ গির্জ্জা অবস্থিত—সেই স্থানে একটী তোপমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোম্পানীর সোরার গুদামের নিকট, আর একটী তোপমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। আজকাল যাহা ক্লাইভ ষ্ট্রীট বলিয়া পরিচিত—এই স্থানের সান্নিধ্যেই এই তোপমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৃতীয় তোপমঞ্চ, বর্ত্তমান হেষ্টিংস্‌ ষ্ট্রীট, কাউন্সিল-হাউস ষ্ট্রীট ও গবর্ণমেণ্ট প্লেসের সন্ধিস্থলে স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত বাগবাজারের "পেরিন্স-পয়েণ্ট" নামক স্থানটীও সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। এই পেরিন্স-পয়েণ্টেই নবাবের সেনাপতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ, মীরজাফর চালিত নবাবী-সেনাদলের সহিত ইংরাজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শেষ মীরজাফর পরাজিত হইয়া দমদমার দিকে পলায়ন করেন। পিকার্ড নামক এক যুবক সৈনিকের রণকৌশলেই মীরজাফর দমদমায় পলাইতে বাধ্য হন। তৎপরে দীর্ঘব্যাপী যুদ্ধের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা দুর্গাধিকার করেন। এ সমস্ত আখ্যান এখন সর্ব্বজন বিদিত।

অনেকের মনে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস—যে নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময়, কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ ধারণা যে ভ্রান্ত ও অমূলক, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতে প্রমাণ হয়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে—কলিকাতা দুর্গের ইঞ্জিনীয়ার ও সরভেয়ার প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা মিলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষীয়দের আদেশে কোম্পানীর অধিকৃত বাটীগুলির একটী মূল্য নির্দ্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা হইতে প্রমাণ হয়—

(১) দুর্গ ও তাহার মধ্যবর্ত্তী গৃহগুলির মূল্য—১২০০০০৲
(২) হাঁসপাতাল ... ১২০০০৲
(৩) কোম্পানীর আস্তাবল সমূহ ... ৪০০০৲
(৪) জেলখানা ... ... ৭০০০৲
(৫) সোরার গুদাম ... ... ৭০০০৲
(৬) কাছারি বাটী ... ... ১৫০০৲

(৭)	কোতোয়ালি হাজত	...	১০০০৲
(৮)	দুইটী পোল ...	...	৭০০০৲
(৯)	ছিট-প্রস্তুতকারকদের বাটী	...	৬০০০৲
(১০)	বারুদখানা ...	...	৬৯২৫৲
(১১)	ডক ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি	...	৭০০০৲
(১২)	নব নির্ম্মিত মালগুদাম	...	২৫০০০৲
(১৩)	বাগবাজারের রিডাউট বা রক্ষামঞ্চ		২১০০০৲

ক্লাইভ ও ওয়াটসন, কলিকাতা আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্য সদল-বলে মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া কলিকাতার পুনরুদ্ধার করেন। ইহাঁদের বাহুবলে কলিকাতায় ইংরাজাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরই কারণপরম্পরা উপস্থিত হইয়া, পলাশী মহাসমরের সূচনা ঘটে।

পলাশীযুদ্ধে ইংরাজ পক্ষ জয়লাভ করিলে, মীরজাফর, বীরপ্রবর ক্লাইভের পোষকতায়, বাঙ্গলায় মস্নদে উপবিষ্ট হন। মীরজাফর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য, ইংরাজ কোম্পানীকে ২৪পরগণার জমীদারী প্রদান করেন। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি মৌজার জন্য, ইংরাজদিগকে নবাব সরকারে ইতিপূর্ব্বে রাজস্ব দিতে হইত। নবাব মুরশীদ কুলীখাঁর আমল হইতেই, এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মীরজাফর নবাবী প্রাপ্তির পর, কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী মৌজা, নিষ্করদান রূপে কোম্পানীকে প্রদান করেন।

কলিকাতা আক্রমণের সময়, অনেক বাঙ্গালীর ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়া-ছিল। অনেক ইংরাজ বাসিন্দারও সম্পত্তি ধ্বংশ হইয়া যায়। নবাবসৈন্য কলিকাতা লুঠ করায়, অনেকের বহুমূল্য জিনিষ পত্রাদিও নষ্ট হয়। নবাব মীরজাফর, সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, ইংরাজ-কোম্পানীর প্রজাবর্গের জন্য ও কোম্পানীর যে সমস্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী এই আক্রমণ ফলে গতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন. তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ জন্য এক কোটী সত্তর লক্ষ টাকা, কোম্পানীকে দিয়াছিলেন। এদেশীয়দের মধ্যে অনেকে কলি-কাতা আক্রমণের সময় প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল—কলিকাতা রক্ষার জন্য ইংরাজের কোন সহায়তা করে নাই—এজন্য প্রথমে এই সংকল্প স্থির হয়, যে এদেশীয় লোকেরা কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবে না। এ দেশীয় অধিবাসীগণের মধ্যে যাহারা নবাবের সহায়তা করিয়াছিল—তাঁহার দলে যোগদান করিয়া-ছিল—সেইজন্য তাহাদেরও ক্ষতিপূরণের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। উমিচাঁদ গুপ্তভাবে নবাবের সহায়তা করিয়াছিলেন—এই সন্দেহে, প্রথমে তাঁহার সমস্ত

সম্পত্তি কোম্পানী বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়েন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ না পাওয়াতে, এই ক্রোকী-সম্পত্তি পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

কলিকাতার বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক প্রমুখ, কয়েকজন বাঙ্গালী সেই সময়ে কলিকাতা ত্যাগ করেন নাই। ইহাঁদের প্রার্থনামতে, কোম্পানী-বাহাদুর পরে একটী কমিশন বসান। কমিশনের কর্ত্তারা স্থির করেন—যে সকল বাঙ্গালী নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় সহর ত্যাগ করে নাই বা কোম্পানীর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, তাহারা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, নবাব মীরজাফর প্রদত্ত টাকার অংশ পাইবে। দেশীয়দের মধ্যে এই টাকা বিতরণ করিবার ভার—গোবিন্দরাম মিত্র ও শোভারাম বসাকের হাতে পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই—তাঁহারা এই খেসারত পূরণের টাকার খুব বেশী অংশই নিজেরা গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে কোম্পানীকে কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না—কারণ প্রথমে ক্ষতিপূরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেও, পরে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্থ বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে এই টাকা বিতরণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্রজা ও বসাক মহাশয়ের বন্দোবস্তের দোষে, অনেকের ভাগ্যে যৎসামান্যই পড়িয়াছিল।

এই টাকা বিতরণ করিবার জন্য তেরজন এদেশীয় কমিশনার নিযুক্ত হন। আমরা তাঁহাদের নামের তালিকা, ক্ষতিপূরণের দাবীর টাকার একটী তালিকা, এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই তালিকা হইতে পলাশী-আমলে কলিকাতার জনকয়েক অবস্থাপন্ন অধিবাসীর কথা জানিতে পারা যায়।

কমিশনারগণের নাম।	তাঁহাদের নষ্ট সম্পত্তির জন্য দাবীর পরিমাণ।		কোম্পানী বাহাদুরের মঞ্জুরী টাকা।
১ গোবিন্দরাম মিত্র ও রঘুনাথ মিত্র	৪১২৬৮০	।/০	৩৭৬৮০।/০
২ শোভারাম বসাক	৪৪১২৭৮	॥/০	৬৬২৭৮॥/০
৩ আলিজান ভাই	৩৪৪৫৭	”	১৭৪৫৭৲
৪ রতু সরকার বা রতন সরকার	১৮০৩২২	৶০	৪০৩২২৶০
৫ শুকদেব মল্লিক	৫০৯৪২	॥০	১০৯৪২॥০

৭২

কমিশনারগণের নাম।	তাঁহাদের নষ্ট সম্পত্তির জন্য দাবীর পরিমাণ।		কোম্পানী বাহাদুরের মঞ্জুরী টাকা।
৬ নয়নচাঁদ মল্লিক	৪৩৯২২	”	৫৯২২৲
৭ দয়ারাম বসু	৫১৫৩	”	১১৫৩৸৶০
৮ নীলমণি মিত্র	২৮১১৩	”	১০১১৩৸৶০
৯ হরেকৃষ্ণ ঠাকুর	১৩৭৮৮	৶০	৩৭৮৮৶০
১০ দুর্গারাম দত্ত	৬৪৭	”	১০০৲
১১ রামসন্তোষ	৬৪১০	”	৯১০৲
১২ মহম্মদ সাদেক্	২৭১৬	”	১৲
১৩ আইনুদ্দিন	*	*	*

পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকায়, কোম্পানী-বাহাদুরের নিযুক্ত তেরজন বাঙ্গালী কমিশনারের নাম ও নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের জন্য তাঁহাদের ক্ষতি-পূরণের দাবীর পরিমাণ পাঠক জানিতে পারিয়াছেন। এই তেরজন কমি-শনারের মধ্যে তিনজন মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহম্মদ সাদেকের দাবীর পরিমাণ ২৭১৬৲ টাকা। কিন্তু কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাকে একটী মাত্র টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—অনেকে লোভে পড়িয়া, আশার অতিরিক্ত দাবী করিয়া বসিয়াছিল। অপরন্তু এই তালিকা হইতে প্রমাণ হয়—কোম্পানী বাহাদুর সকলেরই দাবী যথেষ্ট কমাইয়া দিয়াছিলেন। এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, শোভারাম বসাক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা পান, আর গোবিন্দরাম মিত্র তাঁহার নিম্নে। এই তেরজন বাঙ্গালী কমিশনারের অনুগৃহীত, কলিকাতার অন্যান্য বাঙ্গালী অধিবাসিগণ, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কত টাকা পাইয়াছিলেন, পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য, আমরা তাহার আর একটী তালিকা পর পৃষ্ঠায় সংগ্রহ করিয়া দিলাম। পূর্ব্বোল্লিখিত তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে—নিশ্চয়ই তাঁহারা সেকালের কলিকাতায় বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন ও কোম্পানী-বাহাদুর তাঁহাদের যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণের টাকা বাঁটিয়া দিবার সময় উল্লিখিত কমিশনারগণ তাঁহাদের আশ্রিতগণেরই পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

কোম্পানী বাহাদুরের সেরেস্তার বানান	নাম	ক্ষতিপূরণের দাবী	যাহা মঞ্জুর হয়	দেশীয় কমিশনারগণের সহিত ক্ষতিপূরণ-প্রার্থীদের সম্বন্ধ
Chaithon Dass	চৈতন দাস	১৭০২৲	৩০২৲	রতু সরকারের আশ্রিত ব্যক্তি।
Dulob Lucky Canaut Nurry Churn Bysack	দুর্লভ লক্ষ্মী কানতনরী চরণ বসাক	৮২৩৩॥৶০	১২৩৩॥৶০	শোভারাম বসাকের আশ্রিত ব্যক্তি।
Curoy Bissas	কুড়রাম বিশ্বাস	৫৯৮৩।০	১৯৮৩।০	গোবিন্দরাম মিত্রের অধীনস্থ কুলীসর্দ্দার।
Gones Bose	গণেশ বোস	১৫১৭/০	৩১৭/০	কমিটির জনৈক কেরাণী
Rum deb Mittre	রামদেব মিত্র	৭৩৬৩॥০	১৩১৩॥০	গোবিন্দরামের সম্পর্কীয় ব্যক্তি (কিন্তু ১৭৪৭ সালে ইহার মৃত্যু হয়)
Sookdeb Mittre	শুকদেব মিত্র	২৩৮০।০	৩৮০।০	ঐ—কলিকাতা লুণ্ঠনের চারি বৎসর পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু হয়।
Ruttan Lelita Mutty Bewah	রতন ললিতা মতিবেওয়া	৩১৫২।০ ২৪১৯॥৵০ ৩৫৭৭৸০	৬৫২।০ ৪১৯॥৵০ ৫৭৭৸০	গোবিন্দরাম মিত্রের আশ্রিতা গণিকাগণ।
Ruajaram Palit	রাজারাম পালিত	৪২১৫৸০	১০১৫৸০	শোভারামের আশ্রিত ব্যক্তি।
Durgarm, Binda Gonga	দুর্গারাম, বিন্দু, গঙ্গা	৩০৯১৲	৫১৯৲	গোবিন্দরাম মিত্রের অনুগৃহিত ব্যক্তি।
Durgaram Surma	দুর্গারাম শর্ম্মা	৫৩২৸৶০	১৩২৸৶০	ঐ
Lilmoney Chandra	নীলমণি চন্দ্র	৭১০।০	১৬০।০	ঐ
Harryram Ghose	হরিরাম ঘোষ	৩৯০॥০	৯০॥০	ঐ
Ramcharn Sarkar	রামচরণ সরকার	৬৪৬৲	৯৬৲	কমিটীর কেরাণী।
Luckicond Ghose	লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ	৩১৮॥৵০	”	গোবিন্দরামের অনুগৃহিত
Niandas Dobah	নয়ানদাস ধোপা	১৬৬৭।/০	৪৬৭।/০	রতুসরকারের অনুগৃহিত
Guugadutt Pattar	গঙ্গাদত্ত পাত্র	২৫১৩৵০	৫১৩৵০	শোভারাম বসাকের আশ্রিত।
Bindabund and Fullichund	বৃন্দাবন ও ফুলচাঁদ	১২৩৯৫।০	২৮৯৫।০	রতুসরকারের আশ্রিত
Gopichurn Bysak	গোপীচরণ বসাক	৪০৫৬।৵০	১০৫৬।৵০	শোভারাম বসাকের আশ্রিত।
Ramkissor Chucerbutty	রামকিশোর চক্রবর্ত্তী	১৪২১৲	৪২১৲	গোবিন্দরাম মিত্রের আশ্রিত।
Radacond Roy	রাধাকান্ত রায়	৮৭৬৸০	১৭৬৸০	নীলমণি মিত্রের লোক
Ramsuncar Sircar	রামশঙ্কর সরকার	১১৪০।০	২৪০।০	রামসন্তোষের আশ্রিত
Berjokessore Siromony	ব্রজকিশোর শিরোমণি।	২১৯৮।০	৬৯৮।০	নীলমণি মিত্রের আশ্রিত ব্যক্তি।

পাঠক উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাইবেন, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের জন্য অনেক বাঙ্গালী অধিবাসী কোম্পানীর নিকট, তাঁহাদের নষ্ট-সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের জন্য দাবী করেন। কোম্পানী ইহাদের দাবী কতদূর সঙ্গত ও সত্য তাহা মীমাংসার ভার তৎকালীন কয়েকজন গণনীয় বাঙ্গালীর উপর দেন। ইহারাই "নেটিভ কমিশনার" বা মীমাংসাকারী হইয়াছিলেন। এই মীমাংসাকারীদের মধ্যে কলিকাতার ব্ল্যাক-জমীদার গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক, রতু সরকার, নীলমণি মিত্র, রামসন্তোষ প্রভৃতি কয়েকজন সেকালের নামজাদা বাঙ্গালী ছিলেন। গোবিন্দরাম মিত্র কুমারটুলীর অধিবাসী। নবাব যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন তিনি কলিকাতার আবাসবাটী ত্যাগ করেন নাই। নিজের সিপাহিদ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শোভারাম বসাক সম্ভবতঃ কলুটোলা অঞ্চলে থাকিতেন। আজও তাঁহার নামে একটী রাস্তা ঐ অঞ্চলে আছে। রতু সরকার, নীলমণি মিত্র ও শোভারাম বসাক, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ব্যবসা-সম্বন্ধে লিপ্ত ছিলেন। রতু সরকার—শোভারামের প্রতিবেশী। কলুটোলার দিল্লী-পটীতে আজও তাঁহার নামে একটী গলি বর্ত্তমান। নীলমণি মিত্র সম্ভবতঃ দরজীপাড়ায় থাকিতেন। নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট বলিয়া একটী রাস্তা আজও তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে।

উল্লিখিত তালিকা হইতে প্রমাণ হয়, যে সকল ব্যক্তি নবাব কর্ত্তৃক সম্পত্তি-নাশের ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছিলেন—তাঁহাদের অধিকাংশই উক্ত মিত্রজা সরকার ও বসাক মহাশয়দের অনুগৃহীত। প্রার্থীগণ যত টাকার দাবী করিয়াছিলেন, অবশ্য তাহার সমস্তটা পান নাই। প্রথম তালিকায় গোবিন্দরাম প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিজের জন্য বার লক্ষ, কুড়িহাজার চারিশত উনত্রিশ টাকা দাবী করেন। দ্বিতীয় তালিকাতেও দাবীর পরিমাণ তিয়াত্তর হাজার চারিশত তিপ্পান্ন টাকা। কোম্পানী-বাহাদুর গোবিন্দরামের দাবিটা কিছু অসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। কারণ তাঁহারা বলেন, নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের সময়, কোম্পানীর সিপাহীরাই গোবিন্দরামের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিল। যাহা হউক—এই ক্ষতি-পূরণের টাকা অনেকেই পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মূল দাবী হইতে অনেক টাকা বাদ গিয়াছিল।

পলাশীযুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভ, মীরজাফরকে বাঙ্গলার-মসনদে বসাইলেন

মীরজাফরের সহিত সন্ধির স্বত্ববলে—ইংরাজেরা মারহাট্টা-খাতের সীমামধ্যে ও সীমার বাহিরে ৬০০ গজ পর্য্যন্ত জমীর দখলী-স্বত্ব লাভ করেন। এই সময়ে কলিকাতার দক্ষিণে কুলপী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ-গুলি, কোম্পানীর জমীদারিভুক্ত হয়। অন্যান্য জমীদারদের ন্যায় কোম্পানীও সরকারী-রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকেন। এই সরকারী রাজস্বের পরিমাণ দুইলক্ষ বাইশ হাজার নয়শত আটার টাকা। এই জমীদারী চব্বিশটী-পরগণায় বিভক্ত ছিল, কিম্বা ইহার মধ্যে চব্বিশটী পরগণা থাকায়—ইহা 'চব্বিশপরগণা' নামে অভিহিত হয় এবং আজ পর্য্যন্ত এই নামই চলিয়া আসিতেছে। এই সময়ে নবাব, তাঁহার অধীনস্থ তালুকদার-গণের উপর এক পরওয়ানা জারি করেন। এই পরওয়ানায় লিখিত থাকে—"এখন হইতে এই সমস্ত জমীদারী কোম্পানী-বাহাদুরের হইল। তাঁহারা তোমাদের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক হইলেন। তাঁহারা তোমাদের সহিত যেরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার করিবেন, তাহাই তোমাদের মান্য করিতে হইবে। ইহাই আমার আদেশ।" *

পূর্ব্বে বলিয়াছি নবাব মীরজাফরের সহিত ইংরাজের সন্ধির স্বত্বানুসারে, সিরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময়, ইংরাজ ও দেশীয়গণের যে সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল বা অগ্নিদাহে যাহা কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার সম্পূরণার্থে নবাব এক ক্রোর টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করেন। কটন সাহেবের মতে—কলিকাতার ইংরাজ-অধিবাসীরা পঞ্চাশলক্ষ, হিন্দু ও মুসলমানেরা কুড়িলক্ষ ও আর্ম্মিনিয়াগণ সাতলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পান। দেশীয়গণের দাবীর দুইটী তালিকা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের এক বৎসরের পরে অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ৬ই জুলাই তারিখে—এক দফায় ৭৬ লক্ষ টাকা মুরশীদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসে। এই টাকা ৭০০টী কাঠের সিন্ধুকে আবদ্ধ ছিল ও একশতখানি নৌকাদ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় টাকা

* The purwana of the Nabob to the officials and land-holder of the granted lands ends with these quaint words—"Know then ye Zamin-ders, Chaudharis, Talookdars, Mutsuddis, and Recayas of the Chakla of Hooghly and others situated in Bengal, the Celestial Paradise you are dependants of the Company and you must submit to such treatment as they give you, whether good or bad and this is my express injunction."

আসিয়াছিল। ইহার দুই সপ্তাহ পরে কোম্পানীর ক্ষতিপূরণের জন্য আরও চল্লিশ লক্ষ টাকা কলিকাতায় পৌঁছায়। এতকাল কোম্পানী নবাবী টাকশাল হইতে টাকা তৈয়ার করাইয়া লইতেন। মীরজাফরের সহিত সন্ধির ফলে, ইংরাজেরা কলিকাতার টাকশাল স্থাপন ও তাহাতে নিজেদের মুদ্রা অঙ্কন করিবার স্বত্ব লাভ করেন। ১৭৫৭ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখে—কোম্পানী বাহাদুর নিজের টাকশালে সর্ব্বপ্রথম টাকা তৈয়ারি করেন। অবশ্য এই সমস্ত টাকা দিল্লীর বাদসাহের নামযুক্ত হইয়া অঙ্কিত হইত। তাহাতে উর্দ্দূ-ফারসী ভাষায় সব কথা লেখা থাকিত। ইংলণ্ডের সম্রাট চতুর্থ উইলয়মের সময় হইতে ইংরাজ-কোম্পানী ইংলণ্ডাধিপের মূর্ত্তি সম্বলিত, মুদ্রার প্রথম প্রচলন করেন। এ মুদ্রা এখনও অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

লর্ড ক্লাইভ ও ওয়াটসন—নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের সাত মাস পরে তাহা পুনরধিকার করেন। এই সময়ে কলিকাতার অবস্থা বর্ণনা করিয়া একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজলেখক লিখিয়াছেন—"ক্লাইভ্ ও ওয়াট্‌সন্ আসিয়া দেখিলেন, কলিকাতার অবস্থা অতি শোচনীয়—অনেক বড় বড় বাড়ী ভগ্নস্তূপে পরিণত। সাহেব-পল্লীর অনেকগুলি বাড়ী অগ্নিবিদগ্ধ হইয়া অঙ্গারভস্মে পরিণত। সেণ্ট এন্ গির্জ্জা ধ্বংশপ্রায় অবস্থায় উপনীত। গির্জ্জারমধ্যে, আর্ম্মিনী ও পর্টুগীজদের গির্জ্জা, অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ছিল। নাগরিকগণের বহুমূল্য সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহার অধিকাংশই তাহারা কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়নের সময় সঙ্গে লইয়া গিয়াছে—কিম্বা তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, নবাবসৈন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। সহরের ইউরোপীয় অংশের অবস্থাই এইরূপ। দেশীয়—বিভাগের অবস্থা আরও শোচনীয়। সমগ্র বড়বাজার অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত। অনেক ঘর বাড়ী শূন্য পড়িয়া আছে—তাহাতে লোকজন নাই। কলিকাতার দুর্গের মধ্য-স্থলে, মুসলমানেরা একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। এই মস্‌জিদের অবস্থান স্থান সঙ্কুলনের জন্য তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী বাড়ী ভাঙ্গিয়া তাহার ইট-কাঠ লুঠিয়া লইয়াছে। অর্থলোলুপ মাণিকচাঁদকে, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতার সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। নবাবের প্রথম আক্রমণ সময়ে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার অধিবাসী প্রাণভয়ে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। মাণিকচাঁদের উৎপীড়ন ভয়ে, তাহারা কলিকাতায় শান্তি স্থাপিত হইলেও ফিরিয়া আসিতে সাহস করে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়

পলাশী-ক্ষেত্রে বিখ্যাত ক্লাইভের সহযোগী

এডমিরাল চার্লস ওয়াটসন।

এই, কলিকাতা দুর্গমধ্যস্থ মালগুদামে তখনও অনেক টাকার মাল অলুণ্ঠিত অবস্থায় ছিল। ইহার কারণ এই, নবাবের ভয়ে কেহ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। "সিরাজ-উদ্দৌল্লা নিজে এইগুলি লইবেন" এই কথা শুনিয়া কেহ তাহা স্পর্শও করে নাই।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠন সময়ে, চার্ণক প্রতিষ্ঠিত, ধীরে ধীরে নির্ম্মিত, প্রাচীন কলিকাতার প্রায় একরূপ ধ্বংশসাধনই হইয়াছিল। নবাব মীরজাফরের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার পর, অনেকে নূতন করিয়া ঘর বাড়ী করিতে আরম্ভ করে। ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন্ কলিকাতায় ইংরেজাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলে—কলিকাতার পলায়িত অধিবাসীরা পুনরায় এই সহরে ফিরিয়া আসে। ১৭৫৭ সাল হইতে আবার নূতন ভাবে কলিকাতা সহর নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। ধরিতে গেলে, এই সময় হইতে বর্ত্তমান কলিকাতার দ্বিতীয়বার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

পলাশী-যুদ্ধের পর—কলিকাতা কিরূপ ছিল, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। কি করিয়া ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন্ কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন, তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই জানেন। তাহার পর পলাশীক্ষেত্রে নবাব ও ইংরাজের ভাগ্য-পরীক্ষা হয়। পলাশীযুদ্ধে জয়ী হইয়া, লর্ড ক্লাইভ গৌরব-মুকুট-মণ্ডিত হন। দুর্ভাগ্য সিরাজউদ্দৌলা, সিংহাসনচ্যুত হইয়া, মুরশীদাবাদ হইতে পলায়ন কালে পথিমধ্যে ধৃত হন। মীরজাফরের পুত্র মীরণের হস্তে, তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়। এই পলাশীযুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশদ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা সুপণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিলের সুবৃহৎ গ্রন্থগুলি পাঠ করিবেন।

ব্লাক-হোল ঘটনার শোকাবহ স্মৃতি * পলাশীর রণাভিনয়ে প্রক্ষালিত

---

* ব্লাকহোলের নৃশংস ব্যাপার প্রকৃতই ঘটিয়াছিল কিনা, ইহা হলওয়েলের স্বকপোল কল্পিত কাহিনী কিনা, এই কথা লইয়া বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি মিঃ হিলের সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায়, এই ব্যাপারের একরূপ পূর্ণ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা হিলের গ্রন্থ আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন, ব্লাকহোলের ব্যাপার আদৌ কল্পনা-প্রসূত নহে। হলওয়েল নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সম্পূর্ণরূপে এই নৃশংস ব্যাপারের জন্য কলঙ্ক মুক্ত করিয়া গেলেও ঐতিহাসিকগণ তর্কের কলরব তুলিতে ছাড়েন নাই। নবাব ইহার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জমাদারগণের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ব্লাকহোলের মৃত ব্যক্তিগণের দেহ পরদিন প্রভাতে একটী খাতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্ত্তী কালে হলওয়েল—"ব্লাকহোলের" নৃশংস ব্যাপারের স্মৃতিরক্ষার জন্য, এই খাত বুজাইয়া একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন। সে স্মৃতিস্তম্ভটী পরে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। আধুনিক কালে আমাদের ভূতপূর্ব্ব-রাজ প্রতিনিধি, প্রত্নতত্ত্ববিৎ লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর, হলওয়েলের স্মৃতিস্তম্ভের অধিকৃত

হয়। ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সনের বীরকীর্ত্তিতে সমগ্র বঙ্গদেশ মুখরিত হইয়া উঠে। দেশের লোকে জানিতে পারে, ইংরাজ জাতি এতদিন বাণিজ্য করিয়াই আসিয়াছেন, কিন্তু সমরনীতিতেও তাঁহারা অদ্বিতীয়। অনেক দূরদর্শী অভিজ্ঞ লোকে বুঝিল—"ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সনের বাহুবলে বঙ্গদেশে ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে। একদিন সমগ্র বঙ্গদেশ ইংরাজেরই হইবে।" ফরাসী, ডচ্ প্রভৃতি ব্যবসায়ী বণিকগণ, এই সময় হইতে লোকের চক্ষে অতি হীনশক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। লোকে বুঝিল—ইংরাজের কলিকাতা, এখন বিপদে আপদে তাহাদের আশ্রয়কেন্দ্র হইল। কলিকাতা আক্রমণের সময়, যে সমস্ত লোক সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা পুনরায় সহরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। শ্রীহীন শ্মশানবৎ কলিকাতা, পলাশী-যুদ্ধের পর হইতেই আবার ধীরে ধীরে নবশ্রী সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। সমগ্র বঙ্গদেশ—বঙ্গদেশ কেন—সমগ্র ভারতে, ইংরাজ জাতির শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা, ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হইতে লাগিল। দিল্লীর ক্ষমতাহীন বাদসাহের কর্ণেও ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন্ কর্ত্তৃক কলিকাতা পুনরধিকার ও পলাশী-সমরের বিজয়বার্ত্তা পৌঁছিল।

ইংরাজজাতি বাহুবলে সমগ্র বঙ্গমধ্যে যে শক্তিসঞ্চয় করিলেন, এইবার তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হইল। মীরজাফরের সহিত পূর্ব্ব সন্ধির স্বত্বানুসারে, ক্লাইভ—তাঁহাকে মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কলিকাতা লুণ্ঠনের সময়, নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কোম্পানীর প্রজাবর্গের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার পূরণার্থে নবাব মীরজাফর ক্রোরাধিক মুদ্রা প্রদান করিলেন। এ মুদ্রা কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে কিরূপ ভাবে বিতরিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা পাঠক পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন।

সিরাজ কলিকাতার নাম আলিনগর রাখিয়াছিলেন। ক্লাইভ কলিকাতা উদ্ধারের ও পলাশীসমরের পর, তাহা পুনরায় কলিকাতায় পরিবর্ত্তিত করেন। *

স্থানে, ঠিক সেইরূপ একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাইটার্স-বিলডিংএর যে কোণে সেকালের সেণ্টএন গির্জ্জা ছিল, তাহার সান্নিধ্যেই এই স্মৃতিস্তম্ভ অবস্থিত। লর্ড কর্জ্জন বহু চেষ্টার পর, ব্লাকহোলের স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া সেই অন্ধকূপবৎ কারাগৃহের অধিকৃত ভূমির একাংশ কৃষ্ণপ্রস্তর মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকে ব্লাকহোল স্মৃতিচিহ্ন দুইটীর ছবি দিলাম।

* এখনও এই আলিনগর নামের অপভ্রংশ "আলিপুর" এর অস্তিত্ব রহিয়াছে। নবাব মীরজাফর আলি এইস্থানে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করেন। আজকাল

ব্লাক্‌হোলের স্মৃতিচিহ্ন। (লর্ড কর্জ্জনপ্রতিষ্ঠিত)।
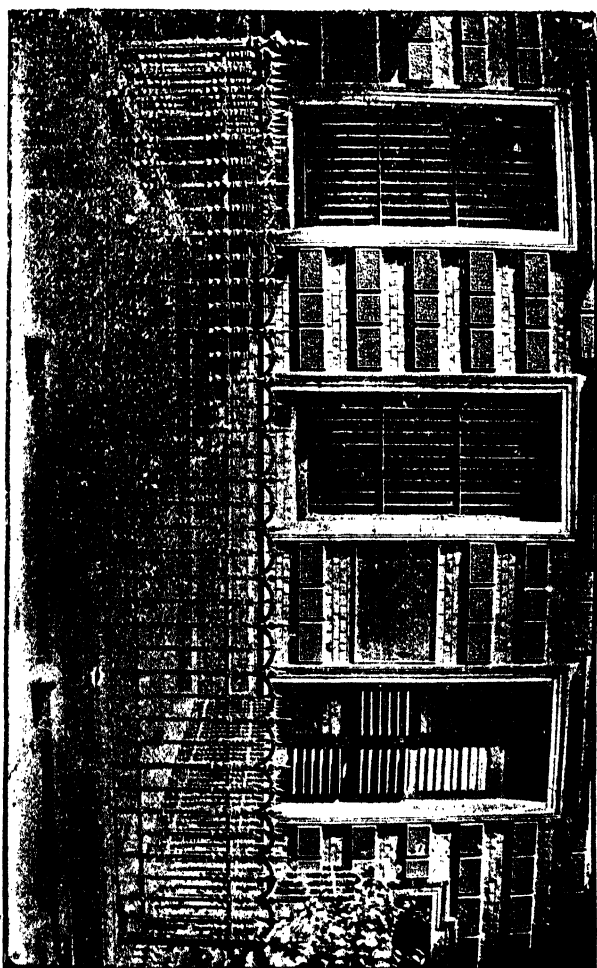
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠে। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি-সঞ্জাত বিপ্লবের পর, প্রায়ই মড়ক ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভীষণ মড়ক দেখা দিল। অনেক লোক জন মরিতে লাগিল। নবাবের আক্রমণে, কলিকাতার যে ক্ষতি হইয়াছিল, শমনের আক্রমণে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইতে লাগিল। সহরময় একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

ওয়াটসনের নৌ-বহরের "কোর্ট" জাহাজের চিকিৎসক আইভস সাহেব, এই মড়ক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাঁহার উক্তির একাংশ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিতেছেন—

"এই সময়ে কোম্পানীর হাঁসপাতাল, রোগীতে পরিপূর্ণ। ফেব্রুয়ারী হইতে (১৭৫৭) আগষ্ট পর্য্যন্ত এই সাত মাসের মধ্যে ১১৫০ জন রোগী হাঁসপাতাল হইতে রোগমুক্ত হয়। ইহাদের সকলেই ইংরাজ। স্কর্ভি, পৈত্তিক-জ্বর, পিত্তশূল প্রভৃতি রোগেই অনেকে ভুগিতেছিল। ইহাদের মধ্যে জ্বর-রোগীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই সাত মাসের মধ্যে ৫২ জন লোকের হাঁসপাতালে মৃত্যু হয়। ৭ই আগষ্ট হইতে ৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে, আরও ১১৭ জন রোগী হাঁসপাতালে প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে ১০১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মৃতের দলের মধ্যে, পলাশী-বিজয়ী এড্‌মিরাল ওয়াট্‌সনও ছিলেন। তিনিও জ্বররোগে ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৭৫৭ অব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।* যে ওয়াট্‌সন এত কাণ্ড করিয়া বঙ্গদেশে ইংরাজের যশঃগৌরব বিকীর্ণ করিলেন—তাঁহাকে অধিক দিন সে যশ সম্ভোগ করিতে হয় নাই।

শী-যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৬২ খৃঃ অব্দে, আর একবার

যেখানে এগ্রিহর্টিকলচরাল্ সোসাইটীর বাগান, অনেকে অনুমান করেন, সেইস্থানের উপর একটী প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা ছিল। ইহাই মীরজাফরের আবাস-বাটী। আবার অন্য মতে হরিণবাড়ী জেল যেস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে—সেইস্থানে তাঁহার প্রাসাদ ছিল। আজ-কাল যেস্থান অধিকার করিয়া জুলজিক্যাল-গার্ডেন আছে, সেইস্থানে মীরজাফরের প্রণয়িনী মণিবেগমের কলিকাতা বাসগৃহ ছিল।

* বর্ত্তমান সেণ্টজন চর্চ্চ-ইয়ার্ডই সেকালের সমাধিভূমি ছিল। এই সমাধিভূমির মধ্যেই ওয়াট্‌সনের মৃতদেহ প্রোথিত হয়। আজও একখানি প্রস্তর স্মৃতিফলক তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। সেণ্টজন গির্জ্জার পার্শ্বেই কোম্পানীর সাধারণ হাঁসপাতাল ছিল। সমাধিক্ষেত্র ততদূর প্রশস্ত ছিল না। পরিশেষে এই সমাধিক্ষেত্র পরিবর্জ্জন করিয়া ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে পার্ক-ষ্ট্রীটের নূতন সমাধিক্ষেত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা আজকাল Old Burial Ground বলিয়া বিখ্যাত। সেকালের অনেক গণ্যমান্য ইংরাজের সমাধি এইস্থানে আজও বর্ত্তমান।

কলিকাতায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। প্রথমবারের আক্রমণে অনেক ইংরাজ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিল। ১৭৬২ অব্দের মহামারীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাঙ্গালী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার আট বৎসর পরে, সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী মহা দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মহামারীও দেখা দেয়। "হিকিস্-গেজেট" সেকালের একমাত্র ইংরাজী সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রের বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায়, কেবল কলিকাতা সহরেই ৭৬ হাজার লোক তিন মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মেকলে এ সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই ভয়াবহ। কলিকাতার রাজপথ ও অলি গলিসমূহ মৃতদেহে পরিপূর্ণ। কোথাও বা মৃতদেহ সৎকারাভাবে পড়িয়া আছে—তাহা শকুনি-গৃধিনীর উদরস্থ হইতেছে, কোথাও বা মুমূর্ষু-ব্যক্তি পথের ধারে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। যাহারা পারিতেছে, তাহারা গঙ্গাতীরে বালুকার উপর মৃতদেহ ফেলিয়া রাখিয়া যাইতেছে। সৎকারের লোক নাই—সৎকার করে কে? এই মড়কের সময় জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে, পনর শত সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কলিকাতা যে এই সময়ে ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর স্থান হইয়াছিল—তাহা এই মড়কের আবির্ভাব হইতেই বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। নগরের মধ্যে নালানর্দ্দামা ও ড্রেনের সুবন্দোবস্ত ছিল না। এই ক্ষুদ্র সহরের চারিদিক ব্যাপিয়া অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও বনজঙ্গল। ধরিতে গেলে সহরের মধ্যে একমাত্র উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী মারহাট্টাডিচ্। তাহাও আবার সহরের চারিদিক ব্যাপিয়া নহে। ব্লাকহোলের রাশিকৃত মৃতদেহ সহরের মধ্যবর্ত্তী এক গভীর খাদে সমাহিত হয়। এই গলিত দুর্গন্ধময় মৃত-দেহজাত বিষাক্ত বাষ্পও তৎসময়ে কলিকাতার স্বাস্থ্যহানির কারণস্বরূপ হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া তখন পূর্ণমূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। সহরের বহিরাংশে পূতিগন্ধময় ধাপা বা Salt Water Lake. কাজেই কলিকাতায় ঐ প্রকার মড়ক আবির্ভাব সম্বন্ধে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

ইংরাজ অধিবাসীদের মধ্যেও মৃত্যুসংখ্যার বিরাম ছিল না। সকালে বা মধ্যাহ্নে যে ইংরাজ তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একত্রে খানা খাইয়া গিয়াছেন, হয় ত পরদিন প্রাতে তাঁহার বন্ধুগণ সেই ব্যক্তির শবদেহ বহনের জন্য আহূত হইলেন। নূতন সমাধিক্ষেত্র তখন হেষ্টিংস ষ্ট্রীট হইতে পার্ক ষ্ট্রীটে নির্ম্মিত হইতেছে। সে সময়ে আজকালকার মত শবদেহ-বাহী শকটের প্রচলন ছিল না। ইংরাজগণ তখন আমাদের মত কাঁধে করিয়া

শবদেহ লইয়া যাইতেন। পার্ক-ষ্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রের পথে, প্রায়ই শবদেহ-বাহীদের যাতায়াত দেখা যাইত। ইংরাজ-রমণীগণ এই ব্যাপারে বড়ই ভীত হইয়া পড়েন। রাজপথে ইংরাজের মৃতদেহ দেখিলেই, তাঁহাদের প্রাণে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এজন্য সেই সময়ে গভীর নিশীথে শবদেহ সমূহ সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।*

এই সময়ে কলিকাতার এইরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য অনেক পদস্থ ইংরাজ, সহরের বাহিরে ফাঁকা জায়গায় থাকিতে ভাল বাসিতেন। লর্ড ক্লাইভ. দমদমায় বাস করিতেন। সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সুপ্রীম-কোর্টের জজ স্যর উইলিয়ম জোন্স সাহেব, গার্ডেন-রিচে থাকিতেন। সুপ্রীম-কোর্টের অন্যতম জজ চেম্বার্স, যিনি নন্দকুমারের মোকদ্দমার সময়, স্যর ইলাইজা ইম্পির সহযোগী ছিলেন, তিনি কাশীপুরে থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত ভবানীপুরেও তাঁহার আর একখানি বাগানবাটী ছিল। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের কাগজপত্রে আমরা দেখিতে পাই—"ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব কালীঘাট প্রান্তবাহিনী—গঙ্গার উপরে একটী পুল তৈয়ারি করিবার জন্য বিলাত হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" হেষ্টিংস, আলিপুরে তাঁহার বাগান বাটীতেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। বর্ত্তমান আলিপুর জজ-আদালতের সান্নিধ্যে "হেষ্টিংস-হাউস" এখনও সেই অতীতের স্মৃতি-বহন করিতেছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কৌন্সিলের মেম্বর স্যর ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ সাহেবও আলিপুরে থাকিতেন। খিদিরপুরের সেণ্ট-ষ্টীফেন গির্জ্জার সান্নিধ্যে, যে প্রাসাদ-তুল্য বাটীটি আছে—সেই বাড়ীতে গবর্ণর হেষ্টিংসের কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য, বারওয়েল সাহেব বাস করিতেন।† এই বাটীটি আজও অক্ষত-দেহে দণ্ডায়মান। গার্ডেন-রিচে কোম্পানীর খাস কর্ম্মচারী ব্যতীত, অনেক অবস্থাপন্ন ইংরাজ বাগান-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। এখনও "পাঁচকুঠী" প্রভৃতি সৌধ, গার্ডেন-রিচে বর্ত্তমান থাকিয়া, অতীতকালের ইংরাজদের ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে।

হালসী-বাগানে উমিচাঁদের বাগান-বাটী ছিল। কলিকাতা আক্রমণের সময়, নবাব সিরাজউদ্দৌলা এই বাগানেই ছাউনি করেন। প্রবাদ এই,

* State of Calcutta after Plassey (Cotton).

† বারওয়েল সাহেবের এই বাড়িটী পরে "মিলিটারি অর্ফান এসাইলম" নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহার "বল্‌রুম" বা নাচঘর প্রাচীন কলিকাতার একটী গণনীয় শোভনদৃশ্য ছিল।

অন্ধকূপ-হত্যার পরদিন হলওয়েলকে এই বাগানেই নবাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ইটালি পদ্মপুকুরের এক অংশে হাতিবাগান বলিয়া একটা পল্লী আজও বর্ত্তমান। জনপ্রবাদ এই, কলিকাতা আক্রমণের সময়, এই স্থানের একটী বাগানে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদলভুক্ত হস্তীগুলি রক্ষিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই "হাতীবাগান" নামকরণ হইয়াছে।

১৭৬৭ খৃঃ অব্দে লর্ড ক্লাইভ বিলাতে চলিয়া যান। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে লিখিত মিসেস্ কিণ্ডার্সলীর লিখিত বিবরণ হইতে, কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।* তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—"মান্দ্রাজের সহিত তুলনায় কলিকাতার অবস্থা যে অধিক উন্নত তাহা নহে। কলিকাতা সহরটী আয়তনে বড় হইলে কি হয়, ইহার মধ্যে যে সমস্ত বাড়ী ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা না থাকায়, ইহার সাধারণ দৃশ্য নেত্রের বড়ই অতৃপ্তিকর। চারিদিকে যেন একটা বিশৃঙ্খল ভাব। কোথাও বা বড় বড় বাটী, কোথাও চালাঘর। রাস্তাঘাটের বিশৃঙ্খলাও সেইরূপ। বাড়ীগুলা কোথাও যেন আকাশের গাত্র স্পর্শ করিতে যাইতেছে, আবার কোথাও বা একেবারে নীচে নামিয়া গিয়াছে। যে যেখানে সুবিধামত জায়গা-জমী যোগাড় করিয়াছে, সেই খানেই নিজের পছন্দমত বাড়ীঘর তৈয়ারি করিয়াছে।"

"বাজারের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি যেন একটু জমকালো। যেখানে কোনরূপ মালপত্র বিক্রয় হইত বা তদুপযোগী "বৈঠক" বা দোকান থাকিত, সেইস্থানটাই যেন একটু গুলজার। এই সকল বাজারের দোকানদারগণ সবই এদেশের লোক।"

"ইংরাজেরা খুব কমই এই সব বাজারে যাইতেন। তাঁহাদের হাটবাজার যাহা কিছু হইত, সবই তাঁহাদের বেনিয়ান ও চাকরদিগের মারফৎ হইত। সহরের মধ্যস্থানে পুরাতন কেল্লা। এইস্থানেই "ব্লাকহোল" হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।"

"সহরের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশে আর্ম্মিনীয়ান ও পর্টুগীজেরা বসবাস করে। উভয় জাতিরই স্বতন্ত্র গির্জ্জা আছে। পর্টুগীজেরা রোমীয়-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে শোভাযাত্রা ও নানাবিধ উৎসব করে। এই সমস্ত উৎসবের অনুষ্ঠান তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পল্লীমধ্যেই হইয়া থাকে। পর্টুগীজদের সহিত আমাদের

* Letters of Mrs Kindersley (June 1768)
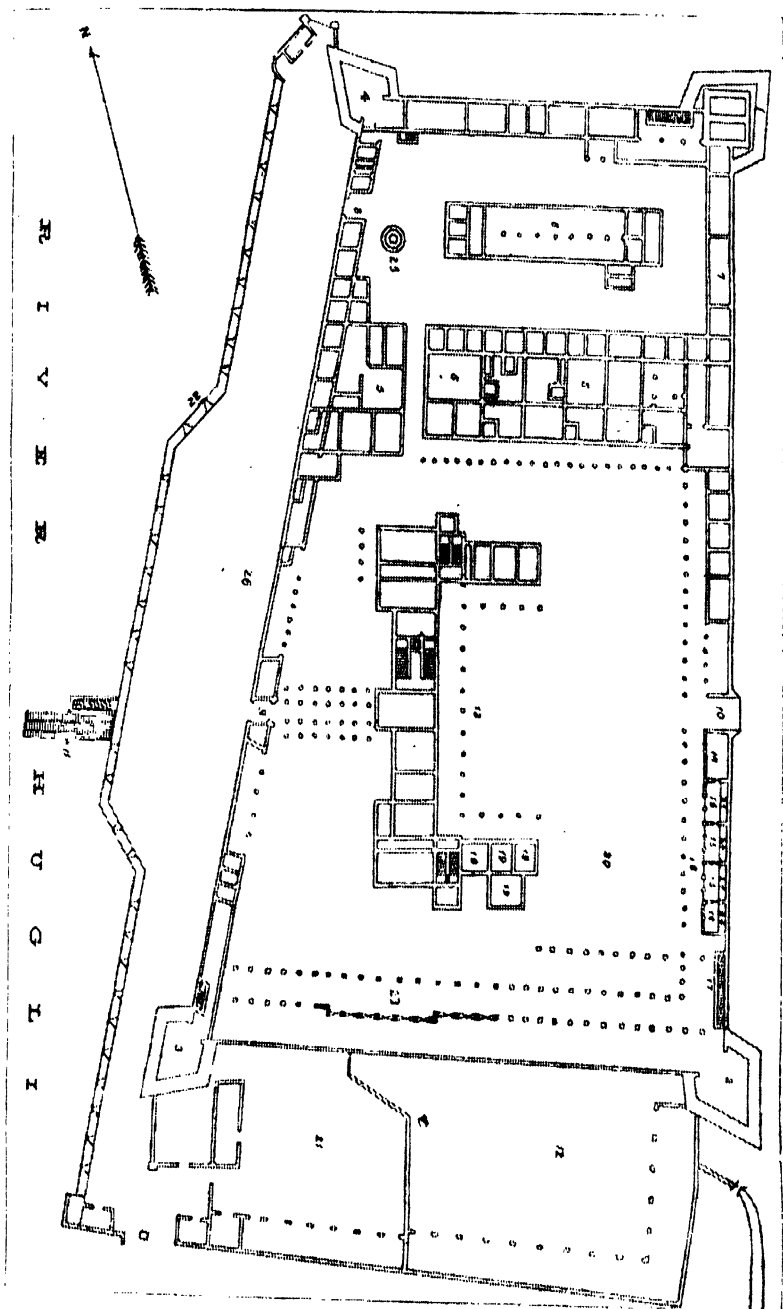
প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। (১৭৫৬ খৃঃ অব্দ)

(লেফটেনান্ট ওয়েলস-এর প্ল্যান)

এইটুকু সম্বন্ধ—যে তাহাদের স্ত্রীলোকেরা আমাদের বাড়ীতে দাসীরূপে নিযুক্ত হয়, পুরুষেরা কেরাণীর কাজ অথবা পাচকের কার্য্য করে।"

"মান্দ্রাজে নিম্নশ্রেণী দেশীয়দের জন্য যেমন একটী স্বতন্ত্র বাসপল্লী নির্দ্দিষ্ট আছে—কলিকাতায় সেরূপ নাই। কলিকাতায় অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক সহরের ইংরাজ-পল্লীর নানাস্থানে বাস করিতেছে। ইহাদের বাড়ীঘর গুলির মাটীর দেওয়াল ও তাহার উপর খড়ের ছাউনি। এই সকল খড়ের চালা এত ক্ষুদ্র, যে একজন লোক সিধা হইয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন আহারাদি প্রস্তুত করিবার জন্য উনানে আগুণ দেয়, তখন কুটীরগুলির পার্শ্বস্থ রাজপথ সমূহ, ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে দেশীয় পল্লীর রাজপথে পরিভ্রমণ করা অতি কষ্টকর ব্যাপার হইয়া পড়ে।"

"কলিকাতার নূতন দুর্গ—যাহা গোবিন্দপুরে নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। পুরাতন দুর্গ হইতে ইহা এক মাইল দক্ষিণে ও নদীর ধারে। ইহার সীমামধ্যে যে সমস্ত বাড়ীঘর করিবার কল্পনা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ হইলে, এই দুর্গই একটী ক্ষুদ্র সহরের আকার ধারণ করিবে। ইহার মধ্যে কোম্পানীর রাইটারগণের জন্য স্বতন্ত্র আবাসস্থান, সেনাদের জন্য ব্যারাক্, বারুদ ও তোপখানা, জেলখানা প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে।*

"পলাশী-যুদ্ধের পর ইংরাজগণ প্রকারান্তরে দেশনায়ক হওয়াতে, তাহাদের অধিকৃত বাঙ্গলার রাজধানী, কলিকাতা সহরের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। নানাস্থান হইতে লোক আসিয়া, ইংরাজদের এই সুরক্ষিত সহরে বাস করিতেছে। সাহেবী-কোয়ার্টারে, বাড়ী পাওয়াই দুর্ঘট। বিলাতের মত চিত্রিত কাগজে গৃহের দেয়াল মুড়িবার ব্যবস্থা কলিকাতায় নাই। এখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও উই প্রভৃতির জন্য এ সমস্ত কাগজমোড়া দেয়াল বেশী দিন যায় না। সমস্ত গৃহের দেয়ালগুলি চুণকাম করা। বালীর উপর চুণের পলস্তা দিয়া, গৃহের অভ্যন্তরস্থ দেয়ালগুলি নির্ম্মিত হয়। ঘরের মেঝেও এইরূপ ভাবে চুণ সুরকীর মিশ্রণে পেটা। ইহাতে বাড়ীগুলি দেখিতে মন্দ হয় না।"

* মিসেস্ কিণ্ডার্সলির বর্ণিত এই দুর্গই গড়-গোবিন্দপুরের বর্ত্তমান কেল্লা। পলাশী যুদ্ধের পর ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। কিণ্ডার্সলি ইহাকে নিতান্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়াই এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

"গৃহসজ্জার মধ্যে চেয়ার, টেবিল ও আলমারী প্রভৃতির সংখ্যা বড় কম। এদেশে এ সকল জিনিস প্রস্তুত হয় না। ক্যাবিনেটের অর্থাৎ কাঠ-কাঠরার কোন দোকানও কলিকাতায় নাই। ঘরের মেঝেগুলির উপর ম্যাটিং করা হয়। ঘরের জানালাগুলি বেত্রনির্ম্মিত। দুই চারিজন অবস্থাপন্ন লোকের আবাসগৃহে, গৃহভিত্তি বিলম্বিত দুই একখানি দর্পণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল দর্পণ ইউরোপ হইতে আনীত। এক একটী বাড়ীর মধ্যে কামরার সংখ্যা কম। কিন্তু কামরাগুলি খুব দীর্ঘ ও প্রশস্ত।"

"টেবিল, চেয়ার ও আলমারি প্রভৃতি বড়ই দুষ্প্রাপ্য। যাঁহারা একটু অবস্থাপন্ন, তাঁহারা ইউরোপ হইতে কলিকাতায় আগত জাহাজের কাপ্তেন-দের নিকট জিনিসপত্রাদি খরিদ করিয়া থাকেন। কেহ বা চীনদেশ ও বোম্বাই সহর হইতে গৃহ-সজ্জার উপযুক্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত উপাদানগুলি সংগ্রহ করেন। এ দেশের মিস্ত্রীরা যাহা কিছু আসবাব নির্ম্মাণ করে, তাহা অতি কদর্য্য। কলিকাতাবাসী ইংরাজদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা ও ভাগ্য অপ্রসন্ন, তাঁহারা এইরূপ চেয়ার আলমারীপূর্ণ গৃহ-সজ্জা করিয়া থাকেন।"

কিণ্ডার্সলীর উল্লিখিত বর্ণনা হইতে পাঠক পলাশীযুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ের কলিকাতার অবস্থা জানিতে পারিবেন। কিণ্ডার্সলীর বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য উপাদান হইতে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতেছি।

১৭৫৮ খৃঃ অব্দে লর্ড ক্লাইভের প্রস্তাবানুসারে, কলিকাতায় নূতন কেল্লার নির্ম্মাণ সূচনা হয়। ইহাই বর্ত্তমান গড়ের-মাঠের কেল্লা। ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে শেষ হয়। প্রথ-মতঃ ভাগিরথী তীরেই এই নব সংকল্পিত কেল্লার বনিয়াদ গাড়িবার সংকল্প স্থির হয়। কিন্তু পরে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায়, গঙ্গাগর্ভের একটু দূরে গোবিন্দপুর গ্রামের অধিকৃত স্থানে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়।

গোবিন্দপুর গ্রাম তখন বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছে। অনেক পদস্থ ঐশ্বর্য্যবান বাঙ্গালী, এখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গোবিন্দ-পুরের আশে পাশের জঙ্গলও অনেকটা পরিস্কৃত হইয়াছে। গোবিন্দপুরের পাশে কালীঘাটের পথ-পার্শ্ববর্ত্তী, চৌরঙ্গীর জঙ্গল তখনও পরিস্কৃত হয় নাই। ধর্ম্মতলার অর্থাৎ বর্ত্তমান এস্প্লানেডের অবস্থাও তখন অনেক উন্নত।

গোবিন্দপুরে দুর্গনির্ম্মাণ উপলক্ষে, এ স্থানের আদিম অধিবাসীদের অনেক-কেই গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে হয় নবাব মীরজাফরের

নিকট হইতে ইংরাজেরা Restitution money বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহার উদ্বৃত্তাংশ গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের দেওয়া হয়। অনেকে সহরের আশে পাশে এওয়াজি-জমী পাইয়া গোবিন্দপুরের ভদ্রাসন ত্যাগ করেন। এই সময়ে তালতলা, কুমারটুলী, শোভাবাজার প্রভৃতি স্থান লোক পূর্ণ হইয়া উঠে। অনেক অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী, এই সব স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্লাইভের মুন্সী, মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর এওয়াজিরূপে সুতালুটি অঞ্চলে ও শোভাবাজারে অনেক জমী পান। মহারাজা নবকৃষ্ণের আবাসভবন সেকালের কলিকাতায় একটি দর্শনীয় জিনিস ছিল। দুর্গোৎসব উপলক্ষে, তাঁহার বাটীতে মহা সমারোহ হইত। জনশ্রুতি এই, পলাশী-বিজয়ী লর্ড ক্লাইভ দুই একবার তাঁহার মুন্সীর বাড়ী দুর্গোৎসবের রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, নাচগানে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

তখন কলিকাতার সুতালুটী অঞ্চলে রায়রায়াঁ মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র, রাজা গুরুদাস সুতালুটীর মধ্যে চড়ক-ডাঙ্গায় বাস করিতেন। বর্ত্তমান-কালের নূতনবাজারের নিকটস্থ স্থানটী আজও চড়ক ডাঙ্গা বলিয়া পরিচিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্ত্তমান বিডন-বাগানের অধিকৃত স্থানেই রাজা গুরুদাসের আবাসস্থান ছিল। বিডন্-ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসের পাশ দিয়া, যে রাস্তাটী মাণিকতলা ষ্ট্রীটে আসিয়া মিলিয়াছে, তাহা এখনও রাজা "গুরুদাসের-ষ্ট্রীট" বলিয়া উল্লিখিত। আন্দুল-রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান রামচরণ, গবর্ণর ভান্সিটার্টের বেনিয়ান ছিলেন। দেওয়ান রামচরণ, পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পাইকপাড়া রাজবংশের আদিপুরুষ। এই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ যোড়াসাঁকোতে বাস করিতেন। কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, হেষ্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবুর যোড়াসাঁকোতে আবাসগৃহ ছিল। মিঃ হুইলারের দেওয়ান, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, পাথুরিয়া-ঘাটায় থাকিতেন। হেষ্টিংস্ ও বারওয়েলের পারসী-মুন্সী, সদরউদ্দিন মেছুয়াবাজারে থাকিতেন। মদনমোহন দত্ত—নিমতলায় থাকিতেন। বনমালী সরকার, পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান ছিলেন কুমারটুলির মধ্যে বনমালী সরকারের প্রাসাদ-তুল্য আবাসস্থান আজও বর্ত্তমান আছে। বনমালী সরকারের এই প্রাসাদ-তুল্য আবাস-ভবন প্রাচীন কলিকাতার একটী বিশেষ গৌরবের জিনিস ছিল। আর ব্লাক-জমীদার

গোবিন্দরাম মিত্রের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। তাঁহার প্রাসাদ-তুল্য কুমারটুলীর আবাস-ভবন, নবরত্ন, কলিকাতার একটী দর্শনীয় জিনিস ছিল। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দের মহাঝড়ে অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের কুড়ি বৎসর আগে, নবরত্ন মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উমিচাঁদ, কলিকাতা সহরের মধ্যেই থাকিতেন। তাঁহার আবাসস্থান, একটী সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদের মত নানা অংশে ভাগ করা ছিল। কলিকাতার অনেকগুলি বড় বড় ভাড়াটিয়া বাড়ীর তিনি মালিক ছিলেন। ইংরাজেরা এই বাড়ীগুলি বসবাসের জন্য ভাড়া লইতেন। উমিচাঁদের হালসীবাগানে এক উদ্যান-বাটীও ছিল। এই বাগানেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার তাঁবু ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আত্মীয়, বাবু হুজরীমলও কলিকাতায় বাস করিতেন। আজও হুজরীমল্‌স ট্যাঙ্কলেন তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে। এই বাবু হুজুরীমল, কোম্পানীর পক্ষে কোন হিতজনক কার্য্য করিয়া, কালীঘাটের মধ্যে অনেক নিষ্কর জমী পাইয়াছিলেন। কালীঘাটে একটী বাঁধাঘাট, মন্দির ও অতিথিশালা নির্ম্মাণের কল্পনা ছিল। কিন্তু অপরের দান করা জমীতে ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিতে নাই ভাবিয়া, হুজুরীমল এ সংকল্প ত্যাগ করেন। কালীঘাট-প্রসঙ্গে আমরা এ কথার উল্লেখ করিয়াছি।

মহারাজ নবকৃষ্ণের বাটীই সুতালুটী অঞ্চলের গৌরবস্বরূপ ছিল। পূজার দালান, দেবমন্দির, নাটমন্দির, বাগান ও পুষ্করিণী-শোভিত প্রাসাদতুল্য শোভাবাজার রাজবাটী কলিকাতার সেকালের অনেক ধনীর ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল। কাশীনাথ বাবু বড়বাজারে থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মভীরু বৈষ্ণবচরণ শেঠ, নিঃস্বার্থদাতা গৌরী সেন বড়বাজারের অধিবাসী ছিলেন। বাবু শোভারাম বসাক ও নীলমণি মিত্রও এই সময়ে বেশ অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী ছিলেন। বাগবাজারের গোকুল মিত্রের, চোরবাগান ও বড়বাজারের মল্লিক বাবুদের আদিপুরুষগণও পলাশীযুদ্ধের পর কলিকাতায় আবাসস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভূকৈলাস রাজবংশের আদিপুরুষ, গবর্ণর ভেরিলষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ইনিও গোবিন্দপুর হইতে বাস উঠাইয়া, খিদিরপুরে প্রাসাদতুল্য গড়বন্দী রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া "ভূকৈলাস" নাম প্রদান করেন। এই বংশের জয়নারায়ণ ঘোষাল, দেওয়ান গোকুল ঘোষাল প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। এ বাটী ও গড়খাই আজও বর্ত্তমান।

বাঙ্গালীটোলার কথা ত বলা হইল। এখন আমরা পুনরায় ইংরাজ-

ও সমাজের অবস্থা বর্ণনা করিব। চৌরঙ্গী-অঞ্চলে ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দ হইতেই লোকের বসবাস আরম্ভ হয়। তখন ইহা একখানি জঙ্গল-বেষ্টিত গ্রাম বই আর কিছুই নহে। এই জঙ্গলে ডাকাতের ভয় বড়ই প্রবল ছিল। হলওয়েল এই পথটীকে "the road leading to Collegot (Kalighat) এই আখ্যা দিয়াছেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে আমরা দেখিতে পাই, চৌরঙ্গীর মধ্যে সেই সময়ে দুই দশ জন সাহেব-সুবো বসবাস করিতেছেন। সুপ্রীম-কোর্টের প্রথম চিফ্ জষ্টিস্, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্যর ইলাইজা ইম্পি সাহেব, বর্ত্তমান মিডল্টন রো'র সান্নিধ্যে, এক সুবৃহৎ উদ্যান-বাটীতে বাস করিতেন। ইম্পির বাটীর চারিদিকে হরিণদিগের বিহার-ভূমি ছিল। এই "ডিয়ার-পার্ক" হইতেই বর্ত্তমান পার্ক ষ্ট্রীটের নামকরণ হইয়াছে। ইম্পির সময়ে এই জঙ্গলপূর্ণ চৌরঙ্গীর অবস্থা এত বিপদসঙ্কুল ছিল, যে পাল্কী-বাহকেরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে এ সকল স্থানে আসিতে হইলে, ডবল-ভাড়া দাবী করিয়া বসিত। সাহেবদের চাকর-বাকরদের মধ্যে যাহারা কাজকর্ম্ম সারিয়া রাত্রিকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিত, তাহারা দলবদ্ধ না হইয়া ফিরিত না। তখন লুঠের ও রাহাজানীর এত ভয় ছিল, যে তাহারা দামী গাত্রবস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত মনিব বাড়ীতে রাখিয়া আসিত।

লালদীঘির কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। কোম্পানীর প্রথম আমল হইতেই, এই লালদীঘি কলিকাতার জনসাধারণের "সখের-বাগান" ছিল। তখন—কলিকাতায় পুষ্করিণীর জল ব্যতীত, পানীয় জলের প্রত্যাশা আর কোথাও ছিল না। ইংরাজ ও এদেশীয়, সকলেই পুষ্করিণীর জল-পান করিতেন। গঙ্গার জল যে সময়ে ভাল থাকিত, সেই সময়ে গঙ্গোদক ব্যবহারও চলিত। লালদীঘির কাছে—বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ-আফিসের অধিকৃত স্থানে, আর একটি বড় পুকুর ছিল। পরবর্ত্তীকালে তাহার কেবল নামোল্লেখ মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাবেক নক্সা প্রভৃতি হইতে ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। লালদীঘির মত অমন সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ বড় পুষ্করিণী কলিকাতায় আর দ্বিতীয় ছিল না। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে গ্রাণ্ড-প্রে কলিকাতা-ভ্রমণে আসেন। তিনি লিখিয়াছেন—"সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র এই বিচিত্র শোভনোদ্যান আর তাহার মধ্যে এক বিস্তীর্ণ সরসী, নেত্রপত্রে পতিত হয়। ইহা কলিকাতা জনসাধারণের প্রমোদোদ্যান। সন্ধ্যার সময় ও প্রাতঃকালে অনেকে এস্থানে ভ্রমণার্থে আসেন।

সাধারণের বিশুদ্ধ পানীয়-জল এই পুষ্করিণী হইতেই সংগৃহীত হয়। এই বাগানের চারিদিক ব্যাপিয়া আবক্ষ-উন্নত প্রাচীর ও তাহার উপরে কাঠের রেলিং। দৃশ্যটী বড়ই মনোহর।" তখন ইডেন-গার্ডেন ও চৌরঙ্গী গভীর জঙ্গলের মধ্যে—কাজেই সবে ধন নীলমণি এই লালদীঘি প্রমোদোদ্যানের যথেষ্ট সমাদর ছিল।

দুর্গের কয়েক রশি দূরেই, পুরাতন কৌন্সিল-হাউস ছিল। এইস্থান আজও পর্য্যন্ত কৌন্সিল-হাউস ষ্ট্রীট ও হেষ্টিংস-ষ্ট্রীট নামক দুইটী পথ্যার সহায়তায় অতীতের স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে কোম্পানী-বাহাদুর, এই কৌন্সিল-হাউস বাড়ীটী কিনিয়া লয়েন। এই বাড়ীতে মিঃ কোর্ট বলিয়া কোম্পানী-বাহাদুরের একজন কর্ম্মচারী বাস করিতেন। এই কোর্ট-সাহেবও ব্লাকহোলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে বাঁচিয়া যান।

ইহার সান্নিধ্যেই যে খাল ছিল, তাহা বুজাইয়া একটী রাস্তা নির্ম্মিত হয়। অতীতের এই রাস্তা অধুনাতন-কালে হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট বলিয়া বিখ্যাত। এই হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটে, ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের কলিকাতা-নিবাস ছিল। এই বাড়ীতেই তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী ব্যারনেস্ ইমহফ্, বল-নৃত্যাদি প্রভৃতির অনুষ্ঠানে, প্রাচীন কলিকাতা সমাজের সজীবতা রক্ষা করিতেন।

হেষ্টিংসের মন্ত্রী-সভার সভ্য, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ফ্রান্সিস সাহেবের কলিকাতার আবাস-বাটী, বর্ত্তমান রয়েল-এক্সচেঞ্জ নামক বাড়ী। ফ্রান্সিসের পূর্ব্বে, লর্ড ক্লাইভ এই বাটীতে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন, গ্রেহাম কোম্পানীর পুরাতন অফিস যে বাটীতে ছিল, তাহাই ক্লাইভের আবাস-স্থান। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে মীমাংসিত হইয়াছে—বর্ত্তমান রয়েল-এক্সচেঞ্জ বাটীই পলাশী-বিজেতা, ভারতে ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা, ক্লাইভের কলিকাতার আবাস-বাটী।

হেষ্টিংসের কৌন্সিলের অন্য দুইজন সদস্য, জেনারেল ক্লেভারিং ও মনসন সাহেব, বর্ত্তমান মিসন-রোর পার্শ্ববর্ত্তী দুইটী বাটীতে থাকিতেন। এই মিশন-রো, সেকালে Rope-walk নামে বিখ্যাত ছিল। ইঁহারা যে দুইটী বাটীতে থাকিতেন—লর্ড কর্জ্জন তাহাদের গাত্রে স্মৃতিফলক মারিয়া দিয়া, অতীতের কীর্ত্তি সজীব রাখিয়াছেন।

আজকাল যেস্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান "ট্রেজারি-বিল্ডিংস" অবস্থিত, পূর্ব্বে এইস্থানের একটী বাটীতে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেনাপতি স্যর আয়ার কূট

বাস করিতেন। আজকাল যেস্থান অধিকার করিয়া টাউনহল বর্ত্তমান, সেই স্থানের একটী বাটীতে সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম জজ, হাইড সাহেব বাস করিতেন। হাইডের সহযোগী জজ্ লিমেষ্টার, বর্ত্তমান ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীটের সন্নিকটস্থ একটী বাটীতে থাকিতেন। উপরে আমরা যে সমস্ত জজের নাম করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেই মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দামায় বিচারকরূপে বসিয়াছিলেন।

এইবার প্রাচীন কলিকাতার চাকর-বাকরদের সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিব। সেকালে সাহেবদের অনেক রকমের চাকর ছিল। এখন আর তাহাদের কতকগুলির নাম বড় একটা শোনা যায় না।

১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের, ২১শে তারিখে, জমীদারদের মন্ত্রণা-সভার অধিবেশনে কলিকাতাবাসী ইংরাজদের ভৃত্যবর্গ সম্বন্ধে নানা কথা আলোচিত হয়। এই সভায় জমীদার হলওয়েল, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড ও রিচার্ড বিচার উপস্থিত ছিলেন। "কলিকাতাবাসী ইংরাজদের ভৃত্যবর্গ উদ্ধত হইয়াছে—অতিরিক্ত হারে বেতনের দাবী করিতেছে" এই সব বিষয়ের আলোচনা এই সভায় হয়। এই আলোচনার পরিণামে চাকরদের বেতনের হার নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। ইহাতে আরও স্থির হয়—ভৃত্যদিগের বেতন সম্বন্ধে, যে দর স্থির করিয়া দেওয়া হইল—তাহারা যদি তাহাতে চাকরী করিতে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে অপরাধীরূপে জমীদার সাহেবের নিকট হাজির করা হইবে। তাহাদের এরূপ অবাধ্যতার জন্য জমীদারের বিচারে জরিমানা, বাসোচ্ছেদ, কারাদণ্ড বা দৈহিক শাস্তিবিধান পর্য্যন্ত হইতে পারে। যদি কোন ভৃত্য একমাস পূর্ব্বে নোটিস না দিয়া তাহার প্রভুর চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে জমীদার-সাহেবের বিচারে, তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ শাস্তি হইতে পারে। যদি কোন স্থলে, প্রভু ভৃত্যের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন বা তাহার উপর অন্যায় অত্যাচার করেন, তাহা হইলে সেই ভৃত্য জমীদারগণের আদালতে, প্রভুর নামে প্রকাশ্যভাবে নালিশ করিতে পারিবে। পাঠক! পরপৃষ্ঠায় সেকালের চাকর-বাকরের শ্রেণী বিভাগ ও তাহাদের মাসিক বেতনের ফর্দ্দ দেখুন।

সেকালে জিনিষ পত্র সস্তা ছিল, কাজেই চাকরবাকরদিগের মাসিক তলবানাও সেই অনুপাতে কম ছিল! তবুও এই সমস্ত ভৃত্যবর্গ মধ্যে মধ্যে চাকরি ছাড়িয়া পলাইত বলিয়া, সাহেব মহলে সদা সর্ব্বদা গণ্ডগোল ঘটিত।

পদবী	মাসিক বেতনের হার (আর্কটীটাকা)	পদবী	মাসিক বেতনের হার (আর্কটী টাকা)
(১) খানসামা খৃষ্টান, মুসলমান	পাঁচ টাকা	(১১) পেয়াদা	আড়াই টাকা
(২) চোপদার (হিন্দু)	”	(১২) বেহারা	ঐ
(৩) প্রধান বাবুর্চ্চি	”	(১৩) ধোপা (সমগ্র পরিবারের)	তিন টাকা
(৪) কোচম্যান	”	(১৪) ঐ একজন ব্যক্তির	দেড় টাকা
(৫) পর্টুগীজ হেড-আয়া	চারি টাকা	(১৫) সহিস	দুই টাকা
		(১৬) মশালচী	ঐ
(৬) জমাদার	তিন টাকা	(১৭ নাপিত	দেড় টাকা
(৭) খিদ্‌মতগার	”	(১৮) পরচুলাসাজাইবারনাপিত	ঐ
(৮) পাচকেরপ্রধানসহকারী	”	(১৯) খরচপরদার	দুই টাকা
(৯) সর্দ্দার বেহারা	”	(২০) মালী	ঐ
(১০) দ্বিতীয় আয়া	”	(২১) ঘেসেড়া	৸৹ টাকা
		(২২) দাসী (সমগ্র পরিবারের)	দুই টাকা
		(২৩) ঐ (একজনের)	এক টাকা
		(২৪) হুক্কা বরদার	ঐ

বর্ত্তমানকালে চোপদার, মশালচী, পরচুলা-সাজাইবার নাপিত, (wig-barbar) খরচ-পরদার, হুক্কাবরদার প্রভৃতি চাকর শ্রেণী লোপ পাইয়াছে। চোপদারেরা রূপার আসাসোটা লইয়া, মনিবের অগ্রপশ্চাত যাইত। মশালচীর কাজ ছিল—আলোক বা লণ্ঠন হস্তে পথ দেখান।

“হুঁকা-বরদারেরা” প্রভুর তামাকু সাজিত। মনিবের আদেশ পাইবা-মাত্রই তাহারা গুড়গুড়ি লইয়া, তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইত। এতদ্ব্যতীত “আবদার” বলিয়া আর একশ্রেণীর ভৃত্য ছিল। গ্রীষ্মকালে সোরা প্রভৃতির সহায়তায়, পানীয় জলকে শীতল রাখাই—ইহাদের কাজ ছিল। প্রাচীন কলিকাতার সাহেবেরা ফুরসীতে তামাকুর ধুম পান করিতেন। প্রত্যেক সাহেবের এক একজন খাস “হুঁকা-বরদার” থাকিত। কোন কোন ভোজক্ষেত্রে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত, অন্যান্য ভৃত্যের ন্যায় হুঁকাবর-দারকেও প্রভুর সঙ্গে যাইতে হইত। ভোজনের ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে, গুলের আগুনে, খুব বড় কলিকায় উত্তমরূপে তামাকু সাজিয়া, হুঁকা-বরদারেরা তাহাদের প্রভুর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইত। সাহেবেরা ইচ্ছামত ধুম পান করিতেন। ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দেও হুঁকা-বরদারদের প্রাধান্য ছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কলিকাতার বাড়ীতে উক্ত বৎসরে এক ঐক্যতান-বাদন ও ভোজোৎসব উপলক্ষ্যে অতিথিদিগকে অনুরোধ করা হয়—“আপনাদিগকে সম্মানের সহিত জানান যাইতেছে, নিমন্ত্রণ-সভায় আসিবার সময় দয়া

করিয়া অন্য কোন চাকর সঙ্গে আনিবেন না। তবে "হুঁকা-বরদার" সঙ্গে আনিলে কোন আপত্তি নাই।" কিন্তু ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের এক নিমন্ত্রণ-পত্রের প্রতিলিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, এ সময়ে সাহেবী-সমাজে হুঁকার প্রচলন একেবারে বন্ধ না হইলেও—উপরের তলায় বা ভোজক্ষেত্রে "হুঁকা-বরদারের" প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর সাহেবী-সমাজে হুঁকায় তামাকু সেবনের ব্যবস্থার কথা আর শোনা যায় না।

১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে, চাকরদের বেতন তিনগুণ বাড়িয়া উঠে। বিচার ও হলওয়েল প্রভৃতি, চাকর-বাকরদের যে তলবানা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে পরবর্ত্তীকালে আর চাকর পাওয়া যাইত না। পুরাতন কাগজ-পত্র হইতে জানা যায়—পরবর্ত্তীকালে খানসামার বেতন মাসিক পঁচিশ টাকা, পাচক ও কোচম্যানের মাসিক কুড়ি টাকা ও খিদমৎগার ও বেহারাদের মাসিক দশ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছিল। এ বেতন না দিলে তখনকার সাহেবেরা চাকর-বাকর পাইতেন না। কিন্তু চাকর রাখিবার খরচ-বৃদ্ধির সঙ্গে, চাকরের সংখ্যা কমাইবার জন্য যে কোনরূপ চেষ্টা হইত, তাহারও প্রমাণ নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী তালিকায় আমরা যে কয়েক শ্রেণীর চাকরের কথা উল্লেখ করিয়াছি—তাহারাই এইরূপ বৃদ্ধির হারে নিযুক্ত হইত। ম্যাক্রেবী সাহেব, তখন কলিকাতায় জেলের বড়কর্ত্তা ছিলেন। এই ম্যাক্রেবী, হেষ্টিংসের কৌন্সিলের সদস্য, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের সেক্রেটারী ও নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয়। এই ম্যাক্রেবীর কর্ত্তৃত্বাধীনেই মহারাজ নন্দকুমার, জেলের মধ্যে ছিলেন। ম্যাক্রেবী সাহেব এই সময়ে কলিকাতার সাহেব-সুবোদিগের এইরূপ বড় মানুষী দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"চাকরের বেতন চারিগুণ বাড়িয়াছে–তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন—ইহার সঙ্গে চাকরের সংখ্যা কমান হইয়াছে। আমি জানি, কোন ইংরাজ-পরিবারে কেবলমাত্র চারিজন লোকের জন্য, এক শত দশ জন চাকর নিযুক্ত আছে। হায়! এ সত্ত্বেও লোকে আমাদের মিতব্যয়ী বলিয়া থাকে!"

মোটের উপর কথা হইতেছে, সেকালের ইংরাজেরা এইরূপভাবে চাকর-বাকর না রাখিয়া চলিতে পারিতেন না। এই সমস্ত বেতনভোগী ভৃত্য ছাড়া, অনেক সাহেব-সুবো আবার ক্রীতদাস রাখিতেন। সেকালের সাধারণ সংবাদপত্রে, এইরূপ ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের অনেক মজাদার বিজ্ঞাপন আছে। ক্রীতদাসদের মধ্যে অনেকেই কাফ্রি। যে সকল ক্রীতদাস—খানসামা

ও রাঁধুনীর কাজ জানিত—তাহারা চারি শত টাকা মূল্যে ক্রীত হইয়াছে, এরূপ উদাহরণও পাওয়া যায়। অনেক ক্রীতদাস, ক্ষৌর-কার্য্যে পারদর্শিতার জন্য, গান-বাজনায় দক্ষতার জন্য—উচ্চমূল্যে ক্রীত হইত। সকল ক্রীত-দাস ও দাসী যে নিগ্রো ছিল, তাহা নয়। এ দেশীয় নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও অনেক ক্রীতদাস পাওয়া যাইত। যে সকল দরিদ্র-সন্তান, শৈশবে পিতৃ-মাতৃ-হীন হইয়া আশ্রয়বিহীন হইত, তাহাদের ধরিয়া আনিয়া দাস ব্যব-সায়ীরা ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির সময়ে এইরূপ অনেক পিতৃ মাতৃ-হীন বালক-বালিকা পাওয়া যাইত। তখন ভারতের সকল কেন্দ্রেই ক্রীতদাসের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসগণের প্রভুরা, এই সকল হতভাগাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ সম্বন্ধে সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক আইন প্রচলিত করেন। তাহার পর হইতেই উহা বন্ধ হইয়া যায়।

তখন কোম্পানীর কার্য্যে "রাইটার" বলিয়া এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। ইহারা প্রথমে কোম্পানীর দপ্তরের লেখাপড়ার কাজ করিতেন, পরে কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিলে—নানাস্থানের ব্যবসায়-কেন্দ্রে বা কুঠীতে, প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইতেন। তখনকার কালে রাইটার-সিভিলিয়ানদের বেতন খুব কম ছিল। রাইটারগণ তাঁহাদের প্রাপ্য-বেতনের অতিরিক্ত খরচ পত্র করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িতেন, এবং সেই সমস্ত খরচ পত্রের ব্যয় কোম্পানীর তহবিলের স্কন্ধে চাপাইতেন। ইহাতে কোম্পানী-বাহাদুরের বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বড়ই বিরক্ত হইতেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা এই সমস্ত কর্ম্মচারিগণকে সায়েস্তা রাখিবার জন্য—মিতব্যয়ী করিবার জন্য, বিলাত হইতে কলিকাতায় কড়া মেজাজে চিঠি লিখিতেন। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারদের লিখিত একখানি পত্র হইতে আমরা দেখিতে পাই—তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণর সাহেবকে লিখিতেছেন—"আমাদের নির্দ্ধারিত আদেশ এই, আপনি রাইটারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, যতদিন তাঁহারা রাইটাররূপে সামান্য বেতনে কার্য্য করিবেন—ততদিন কেহ পালকী বা গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন না। করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইবে।"* পলাশীযুদ্ধের পর বিলাতের কর্ত্তারা এই সমস্ত সিবিলিয়ান

* "রাইটার্স-বিল্ডিং" এখনও এই রাইটারদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। যে বাড়ীতে আজকাল বঙ্গীয়-গবর্ণমেণ্টের আপিস সমূহ স্থাপিত—সেই স্থানেই রাইটার্স-বিল্ডিং ছিল! অবিবাহিত রাইটারগণ এই বাটীতেই বাস করিতেন। পুরাতন রাইটার্স-বিলডিং কলি-

রাইটারদের উপর সদয় হইয়া অনেক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। বিলাতের কর্ত্তাদের সেই ব্যবস্থা হইতে আমরা জানিতে পারি—"রাইটারগণ শীত ও বর্ষাকালে যাতায়াতের জন্য কেবল মাত্র পালকী ব্যবহার করিতে পারিবেন। কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দূরতর স্থানে বাস করেন। কিন্তু কলিকাতার মধ্যে কোম্পানীর প্রয়োজনীয় কার্য্যালয় ও বাটীগুলি নির্ম্মাণ হইয়া গেলে, তাঁহারা সেই বাটীতেই আসিবেন। তখন আর পালকী প্রভৃতির জন্য অতিরিক্ত খরচের আবশ্যক হইবে না।"

এই রাইটারদের মধ্যে অনেকেই অপরিণত বয়স্ক যুবক। ক্লাসের দুষ্ট ছেলেদিগকে শাসনে রাখিতে অতি কঠোর প্রকৃতির মাষ্টার মহাশয়, যেরূপ এক এক সময়ে অসমর্থ হইয়া পড়েন—সেকালের সিভিলিয়ান অথবা রাইটারদিগকে শাসনে রাখিতে, কোম্পানী-বাহাদুরের কর্ত্তৃপক্ষগণকেও অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর ভেরিলষ্টের সময়েও দেখিতে পাওয়া যায়—বিলাতের কর্ত্তারা, যেন বেত্রদণ্ড হস্তে লইয়া ইহাঁদের শাসন করিতেছেন। বিলাতের কর্ত্তারা, গবর্ণর সাহেবকে লিখিতেছেন— "এই সমস্ত অপরিণামদর্শী যুবক কর্ম্মচারিগণের বিশৃঙ্খল ব্যবহারের মাত্রা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার দমন একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি তাহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ না হয়, এখনও তাহাদের সদ্বুদ্ধি-সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে তাহারা আমাদের চাকরী করিবার যোগ্য নহে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া বিলাতে আসাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ।" এই সময়ে রাইটারগণকে সায়েস্তা করিবার জন্য, একটী "তদারকী-সভা" আহূত হয়। সেই সভার বিচারে, রাইটারদিগকে মিতব্যয়ী করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির প্রচলন হয়। প্রথম—অবিবাহিত কর্ম্মচারিগণের পক্ষে, দুইজন চাকর ও একজন রাঁধুনীই যথেষ্ট। এই দুইজন চাকরের একজন তাঁহার গৃহস্থালীর ভার লইবে। তিনি যখন কোম্পানীর কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে যাইবেন, তখন দ্বিতীয় চাকর তাঁহার সঙ্গে যাইবে ও অন্য ব্যক্তি তাঁহার কলিকাতার সম্পত্তি রক্ষা করিবে। কিম্বা তিনি পীড়িত হইলে, একজন তাঁহার গৃহস্থালী দেখিবে, অপর ব্যক্তি তাঁহার রোগের সেবা করিবে। দ্বিতীয়—কোন রাইটারই

কাতার পুরাতন দুর্গের অতি সন্নিকটেই ছিল। আমরা কলিকাতার প্রাচীন কালের—যে ছবি দিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক এই রাইটার্স বিল্ডিংএর তখনকার অবস্থা দেখিতে পাইবেন। রাইটারগণই বঙ্গের প্রথম সিভিলিয়ান।

গবর্ণরের অনুমতি ব্যতীত, ঘোড়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না। নিজের খরচায় বা দুই তিন জনে মিলিয়া বাগান-বাগিচা করিতে পারিবেন না। তৃতীয়—তাঁহারা এমন কোনরূপ পরিচ্ছদ পরিতে পারিবেন না—যাহাতে বিলাসিতা প্রকাশ হয়। ভদ্রলোকোচিত সাদাসিদে পরিচ্ছদই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট।" পাঠক! আজকালকার সিভিলিয়ানদের সহিত, সেকালের রাইটার—সিভিলিয়ানদের অবস্থার তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন—এই দুই শ্রেণীর কর্ম্মচারীর মধ্যে কালপরিবর্ত্তনে অবস্থায় কত পার্থক্য ঘটিয়াছে।

বিংশ অধ্যায়।

পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে প্রাচীন কলিকাতার অবস্থা—কলিকাতার ড্রেণের উন্নতি। জঙ্গল কাটিয়া ইষ্টকের পাঁজা-পোড়ান—দুর্ভিক্ষ ও লোকজনের মৃত্যু—১৭৫১।৫২ খৃঃ অব্দে চাউলের দর—লালদীঘির উন্নতির জন্য খরচ—জমীর খাজনা—মেয়র কোর্টের খরচা—লালদীঘির শোচনীয় অবস্থা—"ফিরিঙ্গি" শব্দের আইন-ঘটিত অর্থ—এ সম্বন্ধে হলওয়েলের অভিমত—সাহেবীপল্লীতে বাড়ীর দর—বিবাহের শুল্কে গরীবের কষ্ট—বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের আদেশ—গোবিন্দরাম মিত্র—বাজারে পিতলের বাটখারা প্রচলন—ইংরাজবণিকদের সম্বন্ধে উমিচাঁদের অভিমত—প্রাচীন কলিকাতায় পলাশী-আমলে ইট ও চূণেরদর—ডাক্তার সাহেবের বিল ও ভিজিট—কড়ির বদলে আনির প্রচলন—গঙ্গাদত্ত ঠাকুরদিগের দরখাস্তের প্রতিলিপি—ফরাসডাঙ্গার ফেরারি আসামী—কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইভের অভিমত—এড্‌মিরাল ওয়াটসনের মৃত্যুতে ক্লাইভের শোকপ্রকাশ, এ দেশীয় ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা—গোবিন্দপুরে নূতন কেল্লা ও তজ্জন্য জমী গ্রহণ—সরকারী আফিসে কড়ির ব্যবহার—তন্তুবায়দিগকে উৎসাহদানের আদেশ—থিয়েটার-গৃহে গির্জ্জার স্থান পরিবর্ত্তন—কলিকাতায় প্রথম দেওয়ানী আদালত—কলিকাতার রাজপথে রাত্রিকালে চৌকী দিবার ব্যবস্থা—বাগান ও আবাসবাটীর জন্য অতিরিক্ত জমী-গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা—কলিকাতার প্রথম ডাক প্রতিষ্ঠা—ভোজপুরে সিপাহী—প্রতি শুক্রবারে অপরাধীদের বেত্রাঘাত ব্যবস্থা—লুকাইয়া মদ্য-বিক্রয়ের দণ্ড—আতসবাজী প্রস্তুতের লাইসেন্স—কোম্পানী-বাহাদুরের অতিথি-সৎকার—পলাশী আমলে ধোপা, নাপিত ও দর্জ্জির মেহনত আনা—বাজেয়াপ্ত মালামাল বিক্রয়—কলিকাতায় প্রথম টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা, গবর্ণর সাহেবের সফরের খরচা—বর্দ্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদকে উপহার প্রদান—বর্গী কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান লুঠ—জগৎশেঠের কাঁধ-ভাঙ্গা—নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কিস্তিবন্দী—নবাবী-সেনার তলবানা সম্বন্ধে গোলযোগ এবং ঐ বিষয়ে রাজা রাজবল্লভের পত্র—কলিকাতায় প্রথম স্কাভেঞ্জার বা ময়লা-ফেলা বিভাগ—বেহালা-বড়িশার জমীদার সন্তোষরায়,শস্যাদির দুর্ম্মূল্যাবস্থা ও কোম্পানী-বাহাদুরের গরীবের প্রতি দয়া—প্রাচীন কলিকাতার জঙ্গল-কাটা—কলিকাতার জমীর খাজনার হার বৃদ্ধি -সহরের মধ্যে আতসবাজী ছোঁড়া বন্ধ—রাজা মাণিকচাঁদের মৃত্যু—কোম্পানীবাহাদুর কর্ত্তৃক মাণিকচাঁদের শিশুপুত্রকে আশ্রয় দান—সেকালের চাউল, দাউল, ঘৃত মিষ্টান্নাদির বাজারদর—শান্তিপুর ফ্যাক্টরী লুট—১৭৬৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতার গণ্যমান্য বাঙ্গালীগণ—একখানি পুরাতন জমীদারী পাট্টার নকল—প্রাচীন কলিকাতার জেলখানা—এ দেশীয়গণের সহিত সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইভের আদেশ—ইউরোপীয় ভবঘুরের দল বৃদ্ধি—কলিকাতার জমীবিলি সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইভের মত—রায়তের উপর কোম্পানীর দয়া—লর্ড ক্লাইভের সুপারিশে মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের উন্নতি—মগের মুলুক।

পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে কলিকাতার অবস্থা।

(কোম্পানী-বাহাদুরের পুরাতন সেরেস্তা হইতে সংগৃহীত।)

(১৭৪৮ খৃঃ হইতে ১৭৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত।)

নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে তিনি কোম্পানীর অনেক কাগজ-পত্র ও সেরেস্তা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। ভবিষ্যতে, তিনি ইহার কতকাংশ প্রত্যর্পণ করেন। যেগুলি হারাইয়া গিয়াছিল বা নষ্ট হইয়াছিল, কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাদের কপি বা নকল বিলাত হইতে আনান। এই জন্য এই সময়ের কতক কাগজ-পত্র দুষ্প্রাপ্য ও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশগুলি হইতে, পাঠক ১৭৪৮ হইতে ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। পূর্ব্বে আমরা কোম্পানীর প্রথম আমলের কতকগুলি সেরেস্তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দিয়াছি। তাহা হইতে পাঠক নবাবী-আমলে ইংরাজ কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়াছেন। নিম্নলিখিত গুলি হইতে পলাশী-আমলের কলিকাতা ও তাহার পরবর্ত্তীকালের নানা কথা জানা যাইবে।

কলিকাতায় ড্রেনের উন্নতি।

"আমরা কলিকাতার জমিদারকে আদেশ করিয়াছি, যেন তিনি কলিকাতার ড্রেনগুলির একটী সার্ভে করেন। কোন ড্রেন মেরামত বা নূতন করিতে কত খরচা পড়িবে—ইহারও একটী এষ্টিমেট আমরা চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাদের একটী রিপোর্টও এ সম্বন্ধে দিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এই ড্রেণগুলির উন্নতি করিয়া কলিকাতাকে স্বাস্থ্যকর করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছি।" Despatch to Court of Directors. (January 13, 1749 Para 12.)*

* পূর্ব্বোক্ত ও পরবর্ত্তী উদ্ধৃতাংশগুলি কলিকাতার পুরাতন সেরেস্তা হইতে সংগৃহীত। কলিকাতার সকৌন্সিল গবর্ণর, এখানকার কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত পত্র বিলাতের কোর্ট-অফ-ডাইরেক্টারদের লিখিতেন, তাহা Despatch to Court বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আমরা এই সমস্ত ডেস্পাচের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি। যেখানে D. to C. লেখা আছে তাহাই এই ডেস্পাচের উদ্ধৃতাংশ। পাশে যে তারিখ আছে তাহা ডেস্পাচের তারিখ। এতদ্ব্যতীত আমরা কোম্পানী-বাহাদুরের সেকালের Calcutta Consultations বহির উদ্ধৃতাংশ হইতেও অনেক অজ্ঞাত তথ্য পাইয়াছি। লং সাহেব এই প্রাচীন রেকর্ডগুলির সারাংশ সংকলন করিয়া দেড়শত বৎসরের অতীত ইতিহাসের একটী অভাব মোচন করিয়া গিয়াছেন।

জঙ্গল কাটিয়া পাঁজা পোড়ান।

"সহরের আশে পাশে যে সমস্ত ঝোপ ও পুরাতন গাছ আছে—তাহা কাটিয়া ফেলিবার জন্য, আমরা জমিদার-সাহেবকে আদেশ প্রদান করিয়াছি। কলিকাতা দুর্গের বাকী কাজগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য, ইঞ্জিনিয়ার রবিন সাহেব এখানে পৌছাইলেই, আমরা ঐ জঙ্গলের কাঠগুলি দিয়া ইটের-পাঁজা পোড়াইবার ব্যবস্থা করিব। ইহাতে কোম্পানী-বাহাদুরের খরচের অনেক সাশ্রয় হইবে।" (D to C Aug 28—1752.).

দুর্ভিক্ষ ও লোকের মৃত্যু।

"কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে—জিনিস-পত্রের দর বাড়িয়াছে—ও নিম্ন-জমিতে চাষ-আবাদ যাহা কিছু হইয়াছিল—তাহার সবই ডুবিয়া গিয়াছে। লোকে অনেকস্থলে না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। শস্তের ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যাদির দর আরও চড়িবার সম্ভাবনা। ১৭৫১—৫২ এই দুই বৎসরে চাউল ও গম প্রভৃতি শস্তের দর চড়িয়াছে—তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে প্রমাণ হইবে।

	চাউলের দর	অন্যান্য শস্যাদি	গম	ময়দা	তৈল
১৭৫১	টাকায়—১মঃ ৩২ সের	টাকায়—১মণ	টাকায় ১ মণ ৩২ সের	টাকায় ১মঃ ৩ সের	টাকায় ১ মণ
১৭৫২	„ ১ মন ১৬ সের	„ ১মঃ ১২সের	১ মণ ৬ সের	১মণ—	১ মণ

(Letter from Govindram Mittra (Black Zaminder) to Hon'ble Roger Drake and Council—Dated 10th. Novr. 1752.)

কলিকাতায় শস্তের দর বৃদ্ধি হওয়ায় ও জমী বিলির হার কম হওয়ায় কলিকাতা-কৌন্সিল তাঁহাদের ব্ল্যাক-জমীদারের একটা কৈফিয়ৎ তলব করেন। ব্ল্যাক-জমীদার গোবিন্দরাম আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে এই কৈফিয়তে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। আমরা কেবল তাহার মধ্য হইতে পলাশী-যুদ্ধের পাঁচবৎসর আগের বাজার দর যে অংশটুকুতে আছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি। টাকায়—১মন ৩২ সের চাউল আগের বৎসরে বিকাইয়াছে। ১মণ ১৬ সের হওয়াতেই দুর্ভিক্ষের হাহাকার! গমও টাকায় ১মণ ৩২ সের বিকাইত। ময়দার দর ১ মণ তিন সের। তৈল টাকায় এক মণ! পাঠক!

এখনকার বাজার-দরের সহিত ঐ সব জিনিসের মূল্যের একটা তুলনায় সমালোচনা করিয়া তখনকার লোকে কি করিয়া সামান্য মাহিনায় দোল দুর্গোৎসব করিত, তাহা অনুমান করিয়া লউন।

লালদীঘির উন্নতির জন্য খরচ।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারীর কন্‌সলটেসান-বহিতে নিম্নলিখিত হিসাবগুলি লেখা আছে—

৩ জন সার্জ্জেন্টের খোরাকী ও পথের উপরিস্থ গাছ কাটিবার খরচা—	৮৯।৶৫
লালদীঘির চারিদিকের ক্ষুদ্র পথগুলি মেরামত পুষ্করিণী-সংস্কার ইত্যাদি বাবত—(মাসিক)—	২০।৫
কমলা-লেবুর গাছ (বাগানে বসাইবার জন্য)—	২৪৲
ঈশ্বরী ও ভবী নামক দুইজন বেশ্যার মালা-মাল বিক্রয়—ও দয়ারাম সিংহের সম্পত্তি যাহা কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন তাহার মূল্য—	৫৩৯।৩

পাঠক উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখিতে পাইতেছেন, কোম্পানী তাঁহাদের সখের লালদীঘির উন্নতির জন্য মাসিক কুড়ি টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। বাগানে—কমলালেবুর গাছ বসাইবার জন্যও ২৪৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল।

কোম্পানীর জমীদারীর খাজনা।

"হুগলীর ফৌজদার, চারি মাসের প্রাপ্য খাজনা তলব করিয়াছেন। এজন্য নিম্নলিখিত হারে তাঁহাকে খাজনা পাঠাইবার আদেশ হইল।

দং—সুতালুটী (কলিকাতা)—৩০৫৲ টাকা।
দং—গোবিন্দপুর (পাইকান)—৭০৲ টাকা।
দং— " (কলিকাতা)—৩৩৲ টাকা।
বক্সীর খরচা— ১॥০ দেড় টাকা।

এই খাজনা ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে দেওয়া হইয়াছিল। প্রতি চারি মাস অন্তর কোম্পানীকে সরকারী প্রাপ্য খাজনা হুগলীতে পাঠাইতে হইত।"

মেয়র-কোর্টের খরচা।

কলিকাতায় ইংরাজের প্রথম বিচারালয় "মেয়র-কোর্ট"। আগে মেয়র-কোর্টের নির্দ্দিষ্ট কোন বাড়ী ঘর ছিল না। কলিকাতার একটী "চ্যারিটী

স্কুলের” কর্ত্তাদের নিকট হইতে বাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়া, তাহাতে আদালত বসিত। এই বাড়ীর ভাড়ার জন্য কোম্পানীকে মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে গণিতে হইত। মেয়র-কোর্টে যাঁহারা বিচার করিতেন—তাঁহারা সকলেই ইংরাজ। কৌন্সিলের সভ্যগণের মধ্য হইতে, এই সমস্ত বিচারক নির্ব্বাচিত হইতেন। ইঁহাদিগের পদবী ছিল, এল্ডারম্যান (Alderman) বিচারকার্য্যে ইঁহাদের তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। অনেক এল্ডার-ম্যান, সামান্য-অছিলায় কাছারী হইতে অনুপস্থিত হইতেন। হয়ত বিচারের দিনও নির্ব্বাচিত বিচারপতি অনুপস্থিত থাকিতেন। এইজন্য কোম্পানী ব্যবস্থা করেন—“যদি কোন নির্ব্বাচিত এল্ডারম্যান বা বিচারক, কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হইবে। নিম্নে আমরা ১৭৫৩ খৃঃ অব্দের অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের চারি বৎসরের পূর্ব্বের মেয়র-কোর্টের খরচের একটী হিসাব তুলিয়া দিলাম।

চ্যারিটী-স্কুলের বাটীর ট্রষ্টিদের বাড়ী ভাড়া বাবত, মাসিক ৩০৲ (আর্কট টাকা) হিসাবে চারি মাসের জন্য	১২৯॥৴১০
এলডারম্যান সাহেবের বিচার-পরিচ্ছদ বা গাউন নির্ম্মাণের জন্য তাফ্‌তা কাপড় খরিদ	১২৮৶১৫
আদালতের হুকুমানুসারে আদালতে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে সমস্ত সেরেস্তার নকল রাখার জন্য—মুহুরীর মজুরি	৬৪৸০
মোমজামা কাপড় খরিদ	১৲
এল্ডারম্যান সাহেবের বিচারাসনের জন্য ভেলভেট্ (মখমল) খরিদ	৩৭।৫
ইণ্টারপ্রিটার বা দ্বিভাষীর বেতন	২০৲
আদালতের পাহারার জন্য দুই জন এদেশীয় জমাদার ২।০ হিঃ—	৪॥০
২ জন এলডারম্যান—পকেট খরচ ১৫৲ হিঃ	৩০৲
২ জন ইউরোপীয় কোর্ট-সার্জ্জেণ্ট বা দারোগা সাহেব ১০৲ হিঃ—	২০৲
আলোকের জন্য মোমবাতি খরিদ (৬ মাসের)	১০৲
একজন ব্রাহ্মণ (?)	৩।০
একজন হাড়ি (মেথর) (ইংরাজিতে A harry আছে—)	১৲

মেয়র আদালতের কলিও বহিতে (Folio-Book) মোকদ্দামার বিবরণ রেজিষ্টারী করিবার জন্য প্রতি পেজে ॥/০ হিসাবে ফিঃ লওয়া হইত। এই ফিঃ হইতে বৎসরে কমবেশী ১৬০০৲ টাকা আয় হইত।

পাঠক বর্ত্তমান বিশালায়তন, জনসংঘপূর্ণ, অসংখ্য সার্জ্জেণ্ট ও পাহারা-ওয়ালা পরিবেষ্টিত, শামলা-গাউনধারী উকীল-ব্যারিষ্টারের জনতাপূর্ণ হাইকোর্টের সহিত, এই প্রাচীন 'অল্ডারম্যানকোর্টের একটা তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখুন। সেকালের মেয়রকোর্টে একজন ইণ্টারপ্রিটার ২০৲ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন, আর বর্ত্তমান কালের হাইকোর্টে বা পুলিস-কোর্টের ইণ্টারপ্রিটারের বেতন কাল পরিবর্ত্তনে কত বেশী।

লালদীঘির শোচনীয় অবস্থা।

"জমীদার-সাহেব (হলওয়েল এই সময়ে জমীদার ছিলেন) আমাদের গোচরে আনিয়াছেন—যে লালদীঘির অবস্থা দিন দিন বড়ই পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় হইয়া পড়িতেছে। ইহার যে অংশে কলেট, বেচার, ও নিখেল সাহেবের বাটী অবস্থিত, সেখানে পচা জলের দুর্গন্ধ অতি প্রবল! পুকুরের পাড় এরূপভাবে ধসিয়া গিয়াছে, যে তাহাতে তাঁহাদের বাড়ী সমূহের অনিষ্ট হইতে পারে। এই পুষ্করিণীরজল খারাপ হওয়ায় সকলেরই বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। ধরিতে গেলে, এই পুষ্করিণীর জল খাইয়া সমগ্র নগরের গরীবেরা জীবন ধারণ করে। এই জন্য পুষ্করিণীর আশু সংস্কার অতি আবশ্যক। অনেকে এই পুষ্করিণীর জলে স্নান করে ও ঘোড়ার গা ধোয়ায় বলিয়া জলের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়। যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ এরূপ করিতে না পারে তজ্জন্য উপযুক্ত আদেশ প্রচার করা হইয়াছে।" (Cons—Dated 12-5-1755.)

"ফিরিঙ্গি" শব্দের আইনঘটিত অর্থ।

মেয়রকোর্টে, আর্ম্মিনিয়ান, মুসলমান ও হিন্দুদের সহিত ইউরোপীয়ান-দের প্রায়ই মামলা মোকদ্দামা হইত। অনেক মামলা ফিরিঙ্গি বনাম মুসলমান বা হিন্দু থাকিত। এই সময়ে কোন কারণে জমীদার হলওয়েল সাহেবের সহিত মেয়রকোর্টের বিবাদ বাধে। বিচার-সীমানা বা জুরিস্-ডিকসান্ এই বিবাদের প্রধান কারণ। এই ব্যাপারে হলওয়েল সাহেব—মেয়রকোর্টের কর্ত্তাদের যে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন—তাহাতে তিনি এই "ফিরিঙ্গি" শব্দটী লইয়া একটু আলোচনা করিয়াছেন। এ আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ এই—

"আমার মতে ফিরিঙ্গি শব্দের অর্থ এই—কলিকাতা সহরে যে সমস্ত পর্টুগীজ-খৃষ্টান বাস করে, তাহারাই ফিরিঙ্গি। পর্টুগালের খাঁটি পর্টুগীজ-দিগের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধই নাই। এই সমস্ত খ্রীষ্টান-পর্টুগীজদের অধিকাংশের শরীরে, হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত আছে। ইহারা ধরিতে গেলে, এই রাজ্যের আইনানুসারে মোগলের-প্রজা। একজন ইংরাজ যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডাধিপের সহিত তাহার রাজা-প্রজা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এইজন্য রয়াল-চার্টারে, ইহারা হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই—"নেটিভ" বলিয়াই হইয়াছে। (Con. June 15. (1755)

সাহেবী-পল্লীতে বাড়ীর দর।

"হলওয়েল সাহেব, কৌন্সিলের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন—ইউরোপীয়ানগণ যে বাটীতে বাস করেন, সেই বাটীর বিক্রেয়-মূল্যের উপর, শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে ডিউটী আদায় করা হউক। কারণ এই বাড়ী গুলি দ্বিতল ও দশ হইতে ১২ হাজার টাকা দরেও বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। আদেশ হইল, হলওয়েল সাহেবের প্রস্তাবমত কার্য্য আরম্ভ হউক।"

পাঠক উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখিতে পাইতেছেন—যে সাহেবী-কোয়ার্টারে (White Town) এর বাড়ীগুলি সেই পুরাকালে দশ বার হাজার টাকাতেও বিক্রয় হইত! পাঠক যেন মনে রাখেন আমরা পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। (Cons. Dated July 26—1753)

ফৌতের সম্পত্তি।

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রমাণ হয়, নবাব আলিবর্দ্দি-খাঁর আমলেও উত্তরাধিকারী হীন ফৌত বা মৃতদিগের সম্পত্তি নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। ১৭৫৫খৃঃ অব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের কন্সলটেসানে প্রকাশ—"নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ, এই কলিকাতার অধিবাসী লক্ষ্মী, রাধানাথ ও গোষ্ঠরামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর দাবি করিতেছেন। ইহাঁরা কলিকাতার দেশীয় ব্যবসায়ী ও নিঃসন্তান এবং অন্য প্রকার উত্তরাধিকারী বিহীন। এইজন্য এই সমস্ত ফৌতের সম্পত্তি, নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। কিন্তু এই সকল ব্যবসায়ীদের সকলেই কোম্পানীর নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছে। এজন্য এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া নবাবকে পত্র লেখা প্রয়োজন।"

ব্রাহ্মণদের দান বন্ধ।

"কোম্পানী বাহাদুর ব্রাহ্মণদিগকে বাৎসরিক যে ১০১৩৲ টাকা দান করিতেন। এ বৎসর তাহা বন্ধ করা হইল। (Cons—dated 27th Oct—1755)

আড়ঙ্গের দাদনি।

কোম্পানীর রেশমের ব্যবসায় ও সূতার কারবার কতদূর উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল—তাহা নিম্নলিখিত আড়ঙ্গগুলির দাদনী হইতে প্রমাণ হয়। এই সময়ে (১৭৫৫ খৃঃ অব্দে) নিম্নলিখিত আড়ঙ্গগুলিতে প্রায় তের লক্ষ খাটিত। আমরা সেকালের সেরেস্তার বানানসমেত আড়ঙ্গ-গুলি নাম ও দাদনী টাকা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১)	শান্তিপুর	(Santipore)	৯৩৫৯২৶১৫
(২)	হরিপাল	(Harrypaul)	৮৫৪৪৩॥১০
(৩)	ধনেখালি	(Dorneacally)	৩৮৫৩৩।৶৫
(৪)	গলাগোড়(?)	(Gollagore)	৩৮৫১৮৶১০
(৫)	কাটোরা (?)	(Cuttorah)	৫১৪৯০।৵১০
(৬)	বুরণ (?)	(Burron)	৮২২৬১৲৫
(৭)	হরিয়াল (?)	(Hurriall)	২২৪১২০।৵১৫
(৮)	বুদল (?)	(Budoul)	৭৯৪৮৩৸৵১০
(৯)	ক্ষীরপাই	(Keerpye)	১৬২৫৭০৸০
(১০)	মালদহ	(Malda)	২৬৪০০৭৵১০
(১১)	কলিকাতা	(Calcutta)	৫৯৫০০৲
(১২)	বরাহনগর	(Barnagore)	৭৩০১৫৵০
(১৩)	সোণামুখী	(Soonamokie)	২২০৯৯৸৵১০

বিবাহের শুল্কে গরীবের কষ্ট।

কোর্ট-অব-ডিরেক্টারদিগের ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দের ৩১ জানুয়ারীর পত্রে প্রকাশ,—"আপনারা আমাদিগকে জানাইবেন—জরিমানা ও অন্যান্য বাব প্রচলন দ্বারা, কোম্পানীর গরীব প্রজাদের কোনরূপ কষ্ট হইতেছে কি না? উদাহরণস্বরূপ আমরা বিবাহের ডিউটীর বা শুল্কের কথা বলিতেছি।

অনেক গরীব লোকের পক্ষে—এরূপ শুল্ক দিতে কষ্টবোধ হয়। আমাদের মতে, এইরূপ বিবাহ-শুল্ক একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত। বড়-লোকদের সম্বন্ধে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা।”

কলিকাতাবাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের আদেশ।

“আমাদের অধিকৃত স্থান সমূহে যে সমস্ত প্রজা বাস করে, তাহাদের উপর কোনরূপ কঠোরভাবে শাসন করিবেন না। বিশেষ সমদর্শিতার সহিত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। অন্যায় ও অতিরিক্ত বাবসমূহ আদায়ের দ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করা উচিত নহে? অবশ্য এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা উচিত, যাহাতে কোম্পানীর আয়ও না কম হইয়া যায়। সাধ্যমতে যেন কোন প্রজার উপর কোনরূপ অত্যাচার চেষ্টা না করা হয়।”*

বিলাতের কোর্ট-অব-ডাইরেক্টারেরা, কলিকাতা-কৌন্সিলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন—তাহার একাংশ হইতে উপরোক্ত অংশটী উদ্ধৃত হইল। তাঁহাদের দেশীয়-প্রজাদের প্রতি, যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হয়, তাহাদের উপর টেক্স খাজনা ও অন্যান্য বাব চাপাইয়া তাহাদিগকে অনর্থক ব্যতিব্যস্ত করা না হয়, কোম্পানী-বাহাদুরের তৎসম্বন্ধীয় এ উপদেশ, উক্ত আদেশ পত্রাংশ হইতেই প্রমান হইতেছে।

তখন বিলাতের কোর্ট-অব-ডিরেক্টার সভাই, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে এ দেশের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ নানাবিধ আদেশ পাঠাইতেন। কলিকাতাবাসীদের প্রতি এরূপ সহৃদয়তা প্রকাশে, তাঁহাদের মহত্ত্বই প্রকাশ হইয়াছে।

গোবিন্দরাম মিত্র।

“কোম্পানীকে প্রতারণা করা অপরাধে, গোবিন্দরাম মিত্রকে পদচ্যুত করা হইল।” এই আদেশটী ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দের এক মন্তব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। হলওয়েল—গোবিন্দরামকে প্রতারণা অপরাধে, পদচ্যুত করিবার আদেশ দেন। কিন্তু কৌন্সিলের বিচারে, গোবিন্দরাম মিত্র তহবিলে গরমিল ৩৩৯৭৲ টাকা দিয়া পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, কোম্পানী-বাহাদুরের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মিত্রজা মহাশয়কে বড়ই স্নেহের

* Court's Letter to Calcutta Council, Para 80 Dated 31—1—1755.

চক্ষে দেখিতেন। এই সময়ে গোবিন্দরামের পদবী ছিল—"রাজস্ব-বিভাগের ম্যানেজার" ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, গোবিন্দরামকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু উক্ত বৎসরের নবেম্বর মাসের তাঁহার লিখিত একখানি পত্র হইতে প্রমাণ হয়, যে তিনি পুনরায় পূর্ব্বপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।*

পিতলের বাটখারা।

"আমরা দেখিতেছি, সীসার ও লোহার বাটখারা বহুকাল ব্যবহারে ওজনে কমিয়া যায়। এজন্য পিতলের বাটখারাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাকর। আমরা বিলাত হইতে পিতলের বাটখারা ও মাপদণ্ডের নমুনা তৈয়ারি করিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। কলিকাতার বাজার সমূহে এইরূপ বাটখারাই অতঃপর ব্যবহার করিতে পারেন।"

কলিকাতায় যিনি জমীদার থাকিতেন—জমীদারীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত, তাঁহার উপর বাজার পরিদর্শনের ভারও থাকিত। ইনি বাজারে আমদানী জিনিসের অবস্থা ও ওজন প্রভৃতির উপর নজর রাখিতেন। অপরাধিগণ ধৃত হইয়া শাস্তি পাইত। কোম্পানী-বাহাদুরের চালানী মালামালও এইরূপ বাটখারায় ওজন হইত। কিন্তু বিলাতে পুনঃপুনঃ চালানী মালের পরিমাণ কম হওয়ায়, কোর্ট-অব ডিরেক্টারেরা বাজারের বাটখারা বিভ্রাটের প্রতিকার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করেন।

Court's Letter (Feb 11 Para 116.)

ইংরাজদের সম্বন্ধে অমিচাঁদের অভিমত।

কৌন্সিলের একটী মন্ত্রণাসভার কার্য্যবিবরণের মধ্যে লিখিত আছে, "ওয়াটস্ সাহেব আমাদিগকে তাঁহার এক পত্রে জানাইয়াছেন—অমিচাঁদ ইংরাজের সম্বন্ধে, নবাবের নিকট (সেরাজউদ্দৌলা) অতি সুন্দর মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন। অমিচাঁদ নবাবকে বলেন—"আমি প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল ইংরাজদের আশ্রয়ে থাকিয়া, তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা-সূত্রে লিপ্ত আছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও আমি তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম দেখি নাই। ইংরাজেরা কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না।" একথা প্রমাণের জন্য, অমিচাঁদ নবাবের সম্মুখে ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ করিয়া দিব্য করিয়াছেন।" (Select Committee's Proceedings 25—2—1757.)

* Consultations, December 9th (1752).

কুলী ও মুটিয়াদের প্রতি কোম্পানীর দয়া।

"বক্সী সাহেব বোর্ডকে জানাইয়াছেন, যে চন্দননগর অবরোধ ব্যাপারে, লর্ড ক্লাইভের সেনাদলভুক্ত অনেক মুটিয়া ও কুলী, যুদ্ধস্থলে নিহত হইয়াছে। তাহাদের পরিবারবর্গ দুরবস্থায় পড়িয়া আমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। এজন্য আদেশ করা গেল—যে সকল কুলী ও মুটিয়া, এই যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আহত হইয়াছে বা মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের আশ্রিত ও পোষ্যগণকে সাহায্য-স্বরূপ, প্রত্যেক পরিবারে প্রয়োজন মত ৮৲।১০৲ টাকা হিসাবে সাহায্য দেওয়া হউক।"

Proceedings of the Board. April 1757.

ইট ও চুণের দর।

প্রাচীন কলিকাতার ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চুণ ও ইটের দর কিরূপ ছিল, তাহার একটী সামান্য উদাহরণ দিতেছি। একটী মন্তব্যে প্রকাশ—"গড়ের মাঠের নূতন কেল্লা নির্ম্মাণের "কমিটী-অব-ওয়ার্ক" সমিতির অধ্যক্ষ, আমাদের রিপোর্ট দিয়াছেন—"যে তাঁহারা ৩৸৵০ করিয়া (প্রতি হাজার) কোম্পানীর মাপ অনুযায়ী ইট প্রস্তুত করিবার জন্য, ইটওয়ালাদের আদেশ দিয়াছেন। চুণের দরও একশত মণ ৩৯৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে। যত ইট প্রয়োজন হইবে, উক্ত দরেই পাওয়া যাইবে। চুণ, আপাততঃ চল্লিশ হাজার মণ অর্ডার দেওয়া গেল।" (Proceedings Sept 26. 1757.)

ডাক্তারের বিল।

"নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময়, যে সমস্ত ইংরাজ-সৈনিক আহত অবস্থায় চুঁচুড়ায় গিয়া পৌছিয়াছিল, তাহারা সেইস্থানেই চিকিৎসিত হয়। চুঁচুড়ার ডাক্তার সাহেব ঔষধ ও ভিজিটের মূল্য বাবত ৬৫০৲ টাকা বিল করিয়াছেন। এই বিল বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য রাখা হইল।" (Proceedings Octr 3rd—1757.)

কড়ির বদলে আনির প্রচলন।

এই সময়ে বহরমপুরে ইংরাজদের একটী ছোটখাট কেল্লা নির্ম্মিত হইতেছিল। ইঞ্জিনিয়ার ব্রোহিয়ার সাহেব, কুলী মজুরদিগের হিসাব-আনা প্রদান সম্বন্ধে, কলিকাতা কৌন্সিলের অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে লেখেন—"কারিগর ও কুলীদিগকে কড়ি দ্বারা পারিশ্রমিক দিতে গেলে, বড়ই

অসুবিধা হইয়া পড়ে। কড়ির পরিবর্ত্তে তাম্র কিম্বা রৌপ্য-নির্ম্মিত "আনির" প্রচলন হইলে, বড়ই কাজের সুবিধা হয়। কোম্পানীর দুই জন "সরফ্" এখানে আসিয়া কড়ি ও আনির আদান-প্রদান কার্য্যের ভার লইবেন, এইরূপ ব্যবস্থাই সুবিধাকর। এই সরফেরা, কড়ির জন্য কোনরূপ বাট্টার দাবী করিতে পারিবেন না। কারণ এরূপ বাট্টা লইলে গরীব শ্রমজীবিগণের ক্ষতি হইবে ও তাহারা কার্য্যে আসিবে না।"

(Proceedings Oct—13—1757.)

গঙ্গারাম ঠাকুরদিগের দরখাস্ত।

নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময়, গঙ্গারাম ঠাকুর, নকুড় সরকার প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ, কোম্পানীর তৎকালীন প্রয়োজন মত, বস্তাসমেত চাউল বিক্রয় করিয়াছিল। নবাব কলিকাতা অবরোধ করিলে তাহারা কলিকাতা ছাড়িয়া ভয়ে পলায়ন করে। কলিকাতা ইংরাজের পুনরধিকৃত হইলে, তাহারা পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসে ও তাহাদের প্রদত্ত মালের মূল্যের জন্য, কলিকাতা-কৌন্সিলের সেক্রেটারী সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে। সেই দরখাস্তের অনুবাদ এই—

"অনারেবল রজার ড্রেক সাহেব মহোদয় ও তদধীনস্থ কৌন্সিল বরাবরেষু—"

"কলিকাতার ব্যবসায়ী গঙ্গারাম ঠাকুর ও নকুড় সরকারের বিনীত দরখাস্ত এই—আমরা অতি সম্মানের সহিত জানাইতেছি, গত জুন মাসে (১৭৫৬) নবাব যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য, আমরা চাউল ও অনেকগুলি বস্তা, বকসীখানায় পাঠাইয়াছিলাম। আমরা আশা করি, এই চাউল ও বস্তা প্রভৃতির মূল্যদানে আদেশ দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। আমরা কলিকাতার জমীদার সাহেবের মুখে শুনিলাম, অন্যান্য ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ তাহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া পাইয়াছে। আমাদের দরখাস্ত করিতে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছে—কারণ নবাবের আক্রমণ সময়ে, আমরা কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া যাই ও সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছি। আমরা প্রথমতঃ সেক্রেটারি সাহেবের নিকট এই পাওনা টাকার জন্য দরখাস্ত করি। কিন্তু তিনি আমাদের জানাইয়াছেন—পূর্ব্বোক্ত দোকানদারগণের প্রাপ্য চুকাইয়া দিবার পর আপনারা আদেশ করিয়াছেন, আর কাহাকেও প্রাপ্য টাকা দেওয়া

হইবে না। * আমরা যেদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহার দুই এক দিন পূর্ব্বে আপনাদের এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। আমরা গরীব লোক—অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। এজন্য প্রার্থনা, আমাদের প্রাপ্য টাকাগুলি প্রদান করিবার হুকুম-দানে বাধিত করিতে আজ্ঞা হয়। এ দয়ার কথা আমরা চিরদিনই স্মরণ রাখিব।

Proceedings 17th Novr. (1757.)

পলাতক আসামী।

শ্রীযুক্ত অনারেবল রজার ড্রেক—প্রেসিডেণ্ট ও গবর্ণর
এবং কৌন্সিলের সদস্যগণ বরাবরেষু—

দরখাস্তকারিগণ—ব্রজদুলাল, নাটু, কীর্ত্তি ও শ্যাম কোত্‌মা
কলিকাতাবাসী ব্যবসায়িগণ।

আমাদের বিনীত নিবেদন এই—আমাদের আত্মীয়গণ, কান্ত কোত্‌মা, পরাণ কোত্‌মা প্রভৃতি আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ফরাসী-দিগের অধিকৃত চন্দননগরে গিয়া বহুদিন হইতে লুকাইয়া আছে। আমাদের এই অপহৃত সম্পত্তির মধ্যে, ফরাসী ও ইংরাজ-কোম্পানীর হুণ্ডী ও অনেক টাকার খত প্রভৃতি আছে। ইংরাজ-কোম্পানীর প্রদত্ত দুইখানি হুণ্ডীর টাকা পাইবার জন্য, আমরা আপনাদের সরকারে দরখাস্ত করিয়া এই চুরির ব্যাপার পূর্ব্বে জানাইয়াছিলাম। তখন আপনারা ফরাসী-অধ্যক্ষদের লিখিয়াছিলেন—যেন এই হুণ্ডীগুলির পরিবর্ত্তে টাকা না দেওয়া হয়। এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছায়, আপনারা চন্দননগর ধ্বংস করিয়াছেন এবং উক্ত পলাতক আসামিগণও এক্ষণে কলিকাতায় উপস্থিত আছে। এজন্য প্রার্থনা, ইংরাজ কোম্পানীর প্রদত্ত উল্লিখিত দুইখানি বণ্ডের টাকা আমাদিগকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়। আর আমাদের দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, উক্ত পরাণ ও কান্তর নিকট আমাদের আর যে সমস্ত খত আছে, তাহাও আদায় করিয়া আমাদের প্রত্যর্পণের আদেশ হয়। শীঘ্র এ বিষয়ের ব্যবস্থা না করিলে, আসামীরা কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইতে পারে।"

Proceedings 20th Dec (1757.)

* নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় যাহারা সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল বা ইংরাজদের কোনরূপ সহায়তা করে নাই—সকৌন্সিল গবর্ণর সাহেবের আদেশে তাহাদের দাবী-দাওয়া নাকচ করিয়া দিবার হুকুম হয়।

কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে, ক্লাইভের অভিমত।

"বাজে খরচ কমাইবার উদ্দেশ্যে—আমি সেনাদের জন্য "ভাতা" ও অন্যান্য উপরি বাব বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছি। তাহারা কলিকাতা দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় বাস করিবে, ইহাই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিকাতার অবস্থা অতি অস্বাস্থ্যকর। এই সঙ্কট সময়ে সেনাগণকে কলিকাতায় রাখিলে তাহাদের অনেকেই "পাক্কাজ্বরে" মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সেনাগণের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি আপাততঃ তাহাদের কলিকাতা-বাস রহিত করিলাম। আমি আশা করি, আমার এই ব্যবস্থায় কোম্পানীর সেনাগণের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে।" *

চৌরঙ্গীর জঙ্গল, ভাগীরথীর জঙ্গলময় আর্দ্র সৈকতভূমি, কলিকাতাকে সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র করিয়া তুলিত। এই সময়ে এক রূপ জ্বর দেখা দিত, ইংরাজেরা তাহাকে "পাক্কাফিভার" বলিতেন। ইহা ম্যালেরিয়ার রূপান্তর। একবার যাহাকে ধরিত, সহজে তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না। তখন কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্তই ছিল না। অনেক স্থান ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই জঙ্গলগুলি কাটাইবার জন্য, মধ্যে মধ্যে সরকারী আদেশ প্রচারিত হইত। কিন্তু সমস্ত গাছপালা ও জঙ্গল একেবারে পরিষ্কার করা, অতি ব্যয়সাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার। এইজন্য কোম্পানী-বাহাদুর, অধিবাসীদের সহায়তায় কলিকাতাকে জঙ্গলবিমুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে এ সম্বন্ধে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা এই—"সহরের মধ্যে ও আশে পাশে বড় বড় গাছগুলি কাটাইয়া, কলিকাতাকে রৌদ্র ও বায়ুপূর্ণ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, আমাদের অধিকারের মধ্যে যাহারা বসবাস করিতেছে, তাহারা নিজব্যয়ে স্ব স্ব দখলী জমীর, বাগানের ও পতিত-ভূমির জঙ্গল কাটাইয়া লইবে। কমলা লেবু ও অন্যান্য ফলের গাছগুলি কেবল তাহারা কাটিতে পারিবে না। যাহারা নিজব্যয়ে জঙ্গল কাটাইবে, তাহারা কর্ত্তিত বৃক্ষাদির স্বত্বাধিকারী হইবে। কোম্পানী এসব বৃক্ষ সম্বন্ধে কোনরূপ দাবীদাওয়া করিবেন না।" পাঠক মনে রাখিবেন—পলাশী যুদ্ধের পরও কলিকাতার বন জঙ্গল এই অবস্থায় ছিল। কলিকাতার অনেক বাগানে ও জঙ্গলে তখন কমলালেবুর গাছ জন্মিত

* Lord Clive's Letter to the Court—Para 11. Dated 22 August 1757.

তাহারও প্রমাণ উল্লিখিত আদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে। রত্নগর্ভা বঙ্গভূমি, চিরদিনই যে সুরসাল ফলের গাছপূর্ণ।

ওয়াটসনের মৃত্যুতে, ক্লাইভের শোকপ্রকাশ।

ইতিহাস অভিজ্ঞ পাঠকগণ জানেন, এড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন ও লর্ড ক্লাইভই পলাশী-সমরের প্রধান অভিনেতা। ওয়াটসন, একজন প্রতিভান্বিত সেনাপতি ছিলেন। হতভাগ্য অমিচাঁদের ব্যাপার সম্বন্ধে, ওয়াটসনের নাম চির গৌরবান্বিত। তাঁহার ন্যায় সুচতুর রণকুশল সেনানী সে সময়ে খুব কম ছিল। ক্লাইভও তাঁহার উপযুক্ত সহযোগীর সহায়তাকে বড়ই বহুমূল্য জ্ঞান করিতেন। এই এড্‌মিরাল ওয়াটসনের একখানি ছবি আমরা এই পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছি। কলিকাতাতেই ইহাঁর মৃত্যু হয়। যে "পাকাজ্বরের" কথা আমরা উপরে বলিয়াছি—তাহাই তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ। তাঁহার সমাধি এখনও সেণ্টজন গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে বর্ত্তমান। ক্লাইভ ওয়াটসনের অকাল-মৃত্যুতে যে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহার মর্ম্মার্থ এই—"ওয়াটসন আর ইহলোকে নাই, আমরা তাঁহার এই শোচনীয় অকাল-মৃত্যুতে সকলেই ব্যথিত ও সন্তপ্ত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ প্রকৃতির লোক অতি দুর্লভ। কোম্পানীর কার্য্যসাধনে, তিনি জীবন-ব্যাপী চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হায় ভাগ্য। পলাশীর সঙ্কটময় যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, শেষ কি না তিনি এইরূপে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন? তাঁহার বীরকীর্ত্তি, তাঁহার গৌরবময় বিজয়-কাহিনীর পূর্ণ ফল উপভোগ করিতে পাইলেন না! এই প্রকার মৃত্যুই আমাদিগের মনে মনুষ্যের নশ্বর জীবনের স্মৃতি পরিস্ফুট করিয়া দেয়।"*

এ দেশীয় ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন।

লর্ড ক্লাইভ—তাঁহার একখানি পত্রে বিলাতের কর্ত্তাদের লিখিতেছেন—"ওয়াটস সাহেব (কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ) আমার সঙ্গে আছেন বলিয়া, আমি বিশেষ উপকৃত বোধ করিতেছি। তিনি বহুদিন এদেশে বাস করিতেছেন। বাঙ্গালীর রীতি-প্রকৃতি ও ভাষাজ্ঞানও তাঁহার যথেষ্ট। কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারিগণের এরূপ দেশীয় ভাষাজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য।" †

* Lord Clive's Letter to Court. Para 5. 22nd August (1757.)

† Lord Clive's Letter to Court. Para 2, 23rd December (1757.)

ওয়াটস্ সাহেব, কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। বহুদিন হইতেই তিনি বঙ্গের নানা স্থানে কোম্পানীর কুঠী সমূহের অধিনায়কতা করিয়াছিলেন। নবাব, কাশিমবাজারের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া এই ওয়াট্‌-সনসাহেবকেই বন্দী করেন। পলাশীযজ্ঞে ইনি একজন প্রধান হোতা।

গোবিন্দপুরে নূতন দুর্গনির্ম্মাণ জন্য জমীগ্রহণ।

"যে সকল বাঙ্গালী ও এদেশীয় লোক গোবিন্দপুর গ্রামে বাস করিত, নূতন ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য, আমরা তাহাদিগকে স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছি। যাহাদের পাকা বাড়ী আছে—তাহাদের বাটী সমূহের দরদস্তর ঠিক ন্যায্যভাবেই হইয়াছে। তাহারা মূল্যের জন্য প্রার্থনা করিলেই—তখনিই মূল্য দেওয়া হইবে। যাহাদের চালা ঘর আছে—তাহাদিগকে স্থানান্তরে চালা উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য খরচা দেওয়া হইবে। যাহাদের খরিদা জমী ছিল, তাহাদিগকে সহরের অন্য স্থানে তাহাদের ইচ্ছামত এওয়াজি-জমী দেওয়া হইয়াছে। যে সকল লোকের চালাঘর উঠাইয়া লইয়া যাইবার খরচা বেশী ও এতজ্জন্য বিশেষ অসুবিধা ও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী স্থানে জমী দেওয়া হইল।" *

পলাশী-যুদ্ধের পর, গড়েরমাঠের বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মাণের জন্য, গোবিন্দ-পুরে প্রজার বাস উঠাইয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বপ্রথমে গঙ্গার ধারে পুরাতন ডক্‌ইয়ার্ডের অধিকৃত স্থানে এই নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের কল্পনা হয়। যেখানে আজকাল বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক অবস্থিত, সেইখানেই এই ডক্‌ইয়ার্ড ছিল। কিন্তু ইহার চারিদিকে দূরে অদূরে বাড়ীঘর থাকায়, এ সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। সেরাজের কলিকাতা আক্রমণের সময়, ইংরাজপক্ষ যে কোনরূপ সুবিধাকর আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই, তাহার প্রধান কারণ—দুর্গের চারিদিকে অনেক বড় বড় পাকা বাড়ী ছিল। ঠেকিয়া শিখিয়া, ইংরাজ-কোম্পানী গোবিন্দপুরের উন্মুক্ত স্থানে কেল্লার স্থান নির্ণয় করেন। তখন গোবিন্দপুরের একদিকে জাহ্নবী ও চারিপার্শ্বে ব্যাঘ্র শ্বাপদাদি পূর্ণ বনজঙ্গল। ভবিষ্যতে দুর্গ নির্ম্মাণ সূচনার সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের বনজঙ্গল কাটাইয়া দুর্গের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান সম্পূর্ণরূপে ফাঁকা ময়দান করা হইয়া ছিল। এইরূপ কল্পনা করিয়াই, বর্ত্তমান গড়ের

* Letter to Court—dated 10th January 1758, Para 110.

মাঠের অধিকৃত স্থানে অবস্থিত গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের উঠাইয়া দেওয়া হয়। গোবিন্দপুর এই সময়ে একখানি জনপূর্ণ গ্রাম ছিল। গঞ্জ ও বাজার প্রভৃতির বাহুল্যে, এ স্থান ব্যবসা-বাণিজ্যও খুব জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল। গোবিন্দপুরের অনেক আদিম অধিবাসী এই সময়ে সহরের উত্তরাংশে অর্থাৎ শোভাবাজার প্রভৃতি স্থানে বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আপিসে কড়ির ব্যবহার।

"বোর্ড অনেক টাকার কড়ি কিনিয়া রাখিয়াছেন। এজন্য ইহার সদ্ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। এহেতু আদেশ করা যাইতেছে—কোম্পানীর অধীনস্থ কলিকাতার প্রধান প্রধান অপিস-সমূহের কর্ত্তারা, যাহাতে কড়ির প্রচলন বেশী হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বক্সী-সাহেবকে লিখিলেই তাঁহারা প্রয়োজন মত "কৌড়ি" ইন্‌ডেণ্ট করিতে পারিবেন।"*

তন্তুবায়দিগকে উৎসাহদানের আদেশ।

"কোম্পানীর গোমস্তাগণ, তন্তুবায়দিগকে ইতিপূর্ব্বে যে ভাবে দাদ্‌নির টাকা দিয়া আসিয়াছে—আমাদের মতে তাহাই সমীচিন। উপস্থিতে সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিধান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। যাহাতে তন্তুবায়-গণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করে, তজ্জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের পার্শ্ববাহিনী নদীর দুইকূলে, কলিকাতা সহরের মধ্যে এবং আমরা কলি-কাতার পার্শ্ববর্ত্তী যে আটত্রিশখানি গ্রামের দখলীস্বত্ব পাইয়াছি, তাহার মধ্যে তন্তুবায়গণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কাশীজোড়া, শান্তিপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে চেষ্টা করিয়া ইহাদের কলিকাতায় আনান উচিত।" †

বস্ত্রের ব্যবসায়েই কোম্পানী বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের তন্তুবায়গণের পরিশ্রম-প্রসূত, বিচিত্র বস্ত্রাবলী ইউরোপের নানা বন্দরে, বহু নগরে আদরের সহিত বিক্রীত হইত। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় বোধ হয় অনেক তন্তুবায় কলিকাতা হইতে পলাইয়া গিয়াছিল। নচেৎ বিলাতের কর্ত্তারা এরূপ আদেশ প্রচার করিবেন কেন?

* Court's Letter Dated 10th Jany (1758)
† Do Do Do 3rd March. (1758)

শান্তিপুর ও ঢাকার আড়ঙ্গের বস্ত্র চিরদিনই বিশ্ববিখ্যাত। ঢাকাই-মসলিন বাঙ্গালার মহা-মূল্যবান কার্পাস শিল্প। ইউরোপ ও এসিয়ার অনেক রাজ্ঞীর, ভারতের মোগল-সম্রাটদিগের অনেক বেগমের, বরাঙ্গের সৌন্দর্য্য বাঙ্গালার সূক্ষ্মবস্ত্রে বৃদ্ধি হইত। এই জন্যই জব চার্ণক, ভাগীরথী তীরবর্ত্তী অন্যান্য স্থান ত্যাগ করিয়া, তন্তুবায়দিগের বসবাসপূর্ণ সুতালুটীতে কোম্পানীর কুঠি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখনকার কার্পাসের সূক্ষ্মশিল্পই বাঙ্গালীর ও ইংরাজের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ছিল।

থিয়েটারকে গির্জ্জায় পরিবর্ত্তন।

"কলিকাতায় ইংরাজ-অধিবাসীদের জন্য একটী গির্জ্জার বিশেষ প্রয়োজন। আমরা শুনিয়াছি, যে বাটীটি আগে থিয়েটার-গৃহ ছিল—অভিনয় উদ্দেশ্যে তাহার এখন কোন ব্যবহারই হয় না। সেইটীকে অনায়াসে গির্জ্জায় পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কলিকাতাবাসী ইংরাজ জন-সাধারণের চাঁদায় যখন ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা এই সাধারণ গৃহটী ধর্ম্মার্থে ব্যবহৃত হইতে দিতে সম্ভবতঃ কোনরূপ আপত্তি করিতে পারেন না। আমরা আপনাদিগকে আদেশ করিতেছি—কোম্পানীর খরচায় এই থিয়েটার গৃহটীকে গির্জ্জা রূপে সুসজ্জিত করা হইবে।"

সিরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা অবরোধ সময়ে, কলিকাতার প্রথম গির্জ্জা সেণ্টএন্ একবারে ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পর কলিকাতা পুনরায় ইংরাজাধিকৃত হইলে কোন নূতন গির্জ্জা নির্ম্মাণ করা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত থিয়েটারগৃহ বর্ত্তমান স্কচ্-গির্জ্জার (লালদীঘির কোণের ঘড়ীওয়ালা গির্জ্জা) উত্তর পশ্চিম দিকে ছিল।

কলিকাতার প্রথম দেওয়ানী-আদালত।

এদেশীয়দের মধ্যে সম্পত্তি-ঘটিত মোকদ্দমা সমূহের নিষ্পত্তির জন্য একটী আদালত প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ প্রয়োজন বোধে, আমরা আদেশ করিতেছি—যে এদেশীয়দের মধ্যে দেনা-পাওনা ঘটিত কুড়ি টাকার উপর দাবীভুক্ত যে সমস্ত মামলা দায়ের হইবে—তাহার বিচারার্থ পাঁচজন ইংরাজ-বিচারক নিযুক্ত হইবেন। কৌন্সিলের সদস্য ব্যতীত, আমাদের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মধ্য. হইতেও বিচারক নির্ব্বাচন করা হইবে। ইহাদের মধ্যে একজন প্রধান-জজ রূপে নির্ব্বাচিত হইবেন ও তিনি এক বৎসরকাল ধরিয়া এই কার্য্য করিবেন। বৎসরান্তে পুনরায় নূতন নির্ব্বাচন

হইবে। কলিকাতার গবর্ণর সাহেব, কৌন্সিলের সহিত পরামর্শ মতে এই সমস্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আবার প্রয়োজন বুঝিলে তাহাদিগকে বর-তরফ্ করিবার ক্ষমতাও সকৌন্সিল গবর্ণরের হস্তে ন্যস্ত রহিল।*

রাত্রে কলিকাতায় চৌকী দিবার ব্যবস্থা।

"সহর কোতোয়ালের পদ ইতিপূর্ব্বেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতার চারিদিকে চৌকী দিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। আমাদের মেজর সাহেব—সহরের নানাস্থানে চৌকী দিবার জন্য, গোরা পুলিসের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। রাত্রি দশটা হইতে প্রভাত পাঁচটা পর্য্যন্ত, সহরের চারিদিকে গোরা পাহারার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে কোন কোন এলাকায় চৌকী দিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা আপনারাই করিয়া দিবেন। নদীতীর ও সহরের মধ্যে প্রবেশদ্বার গুলিতে—যেন কঠোর চৌকী রাখিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। যাহাতে গুপ্তচর প্রভৃতি সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।" †

বাগান ও আবাস-বাটীর জন্য অতিরিক্ত জমী গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা।

"আমরা সন্ধির নূতন স্বত্বানুসারে, নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে যে সমস্ত ভূভাগ পাইয়াছি, তাহাতে লোক জন বসবাস করান প্রয়োজন। এই সমস্ত জমী, বাজে লোককে বিলি না করিয়া, যাহারা কোম্পানীর কাজে লাগিতে পারিবে, তাহাদেরই জমা দেওয়া উচিত। যাহাতে নূতন অধিবাসীরা পূর্ব্বকার মত অধিক পরিমাণে জমী লইয়া বাগান-বাটী ও আবাস-গৃহ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যতটুকু জমী প্রত্যেক লোকের বসবাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত জমী যেন কাহাকেও বিলি না করা হয়।"

---

* Court's Letter Dated 3rd March. (1758).

† Courts Letter Dated 3rd March 1758. সেকালের কলিকাতায় বক্সী ও পাইক্‌ম্যান্ (সড়কীধারী) বলিয়া আরও দুই শ্রেণীর পাহারাদার ছিল। এগুলি কোম্পানী বাহাদুর উঠাইয়া দেন। পূর্ব্ব কথিত মেজর সাহেব—কেল্লার মধ্যে থাকিতেন। তাঁহার অধীনে পাঁচশত গোরা সৈন্য ও পাঁচশত সিপাহী থাকিত। এই সময়ে সৈন্য-বিভাগের কার্য্য ব্যতীত তিনি পুলিস-বিভাগের কার্য্য করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

সেকালের ইংরাজেরা ও বাঙ্গালীরা বড় বড় বাগান-বাটীতে থাকিতে বড় পছন্দ করিতেন। অনেকে এজন্য সুবিধামত অধিক পরিমাণে জমী জমা করিয়া লইতেন। কলিকাতায় অধিবাসী সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বোধ হয়, কর্ত্তারা এইরূপ জমী বিলির আয়তন সংক্ষেপের আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে ক্রীক্-রো হইতে আরম্ভ করিয়া চৌরঙ্গীর জঙ্গলাধিকৃত ভূমিতে প্রজা বসাইবার চেষ্টা করা হইতেছিল। তখন জমীর দর বড় কম ছিল ও জমার হারও খুব সুলভ ছিল। চৌরঙ্গীর প্রথমার্দ্ধের জঙ্গল কাটাইয়া বোধ হয় এই সময়ে প্রাচীন কলিকাতা সহরটীকে বিস্তৃত ও জনপূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হয়।*

কলিকাতার প্রথম ডাক।

আদেশ করা হইল—"কলিকাতা ও মুরশীদাবাদের মধ্যে নানাস্থানে ডাকচৌকী ও ডাক-পিয়াদা রাখা হইবে।"

এই ব্যবস্থানুসারে—কলিকাতা হইতে মুরশীদাবাদ ও মুরশীদাবাদ হইতে কলিকাতায় ৩০ ঘণ্টার মধ্যে সংবাদাদি আসিবার ও যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ধরিতে গেলে, ইহাই কলিকাতার প্রথম ডাক ব্যবস্থা।

ভোজপুরী সিপাহী।

"জঙ্গী-জোয়ান, এক সহস্র এদেশীয় লোককে কোম্পানীর সিপাহী দলে গ্রহণ করার আদেশ পাওয়ার পর, এক হাজার ভোজপুরী সিপাহী সংগ্রহ করা হইয়াছে।" উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ একটী মন্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

লর্ড ক্লাইভের দলে, আগে তেলিঙ্গী বা মান্দ্রাজী দেশী সিপাহীর ভাগই বেশী ছিল। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে পশ্চিম প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ ভোজপুরীদের সেনাদলে গ্রহণ করা হয়। সম্ভবতঃ ইহাই কোম্পানীর আমলের প্রথম হিন্দুস্থানী সিপাহীর রেজিমেণ্ট।

প্রতি শুক্রবারে বেত্রাঘাত।

তখনকার ফৌজদারী-বিধি ব্যবস্থাও নূতন ধরণের ছিল। এখন তাহার স্মৃতি মাত্র কেবল পুরাতন সরকারী কাগজ-পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামীগণের প্রতি, কোন কোন

* Courts Letter Dated 3rd March, Para 156.

অপরাধে, বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করা হইত। কাহারও প্রতি বা একশত ঘা বেত, কাহারও প্রতি বা পঞ্চাশ বেত, এইরূপ আদেশ হইত। এই বেত্রাঘাতের অপর নাম ছিল—"চাবুক-লাগান"। যাহারা চাবুক লাগাইত, তাহাদিগকে—"চাবুক-সওয়ার" বলিত। অপরাধীকে বেত্রাঘাত করাই এই সমস্ত চাবুক-সওয়ারের কাজ ছিল। ৫ই এপ্রেল তারিখের প্রোসিডিংস্ বা কার্য্য-বিবরণী হইতে আমরা দেখিতে পাই—"জমীদার-সাহেব প্রমুখ বিচারকগণ, আসরফ্ খাঁ ও মাণিক দাসের অপরাধের বিচার করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে প্রতি শুক্রবারে ১০১ একশত এক-ঘা বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা এ দণ্ড কার্য্যে পরিণত করিবার আদেশ প্রদান করিতেছি।"*

এই মাণিক দাস ও আসরফ্ খাঁ কি অপরাধে এরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হয়—তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে তাহারা যে কোনরূপ ফৌজদারী অপরাধের জন্য এরূপভাবে শাস্তি পাইয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সপ্তাহের অন্য দিনে চাবুক মারিবার ব্যবস্থা না করিয়া, শুক্রবারে কেন যে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হইল, তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই। প্রতি শুক্রবারে তাহাদের উপর ১০১ চাবুকের আদেশ হয়। এইরূপভাবে তিন মাস তাহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছিল।

ইহার পর আর একটী হুকুম হইতে জানিতে পারা যায়—"ইদু সেখ বলিয়া একজন মুসলমান লস্কর, তাহার স্ত্রী পাঁচীকে হত্যা করার অপরাধে প্রতি শুক্রবারে এই ভাবে একশত ঘা চাবুক খাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল।"*

লুকাইয়া মদ্য বিক্রয়ের দণ্ড।

এক জন আর্ম্মিনিয়ান, তাহার লাইসেন্সের অনুমোদিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে "আরক-মদ্য" কলিকাতা সহরে আনিয়া গোপনে বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছিল। আদেশ হইল, এইরূপ ভাবে গোপনে আনীত মদ্য, কোম্পানীর লোকে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে।†

আতসবাজী প্রস্তুতের লাইসেন্স।

মইনদ্দি বাজীওয়ালা দরখাস্ত করিয়াছে—"হাউই ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার বাজী তৈয়ারী করিবার জন্য সে সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করে।"

* Report of the Select Committee dated 18th February (1758)
† Do Do dated March 20th (1758)

এই সমস্ত হাউই দ্বারা সহরের চালাঘরগুলির যথেষ্ট বিপদ সম্ভাবনা। এজন্য তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে—হাউই ব্যতীত সে অন্যান্য বাজী প্রস্তুত করিতে পাইবে। *

কোম্পানী বাহাদুরের অতিথি-সৎকার।

একবার নবাব মীরজাফর, কলিকাতার কোম্পানী বাহাদুরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার জন্য যে সমস্ত খরচপত্র হইয়াছিল, ক্লাইভের স্বাক্ষরিত তাহার একটী বিস্তৃত হিসাব আছে। সে হিসাবটী আদ্যোপান্ত তুলিতে গেলে, আমাদের স্থানে কুলাইবে না। খাওয়া দাওয়া, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি ছাড়া আরও কয়েকটী বাব বাবতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সে বাবগুলি এই—১৫ জোড়া পিতলের দেওয়ালগিরি ২২॥০ কোর্ট হাউস বাড়ীতে মদ্য খরচ—৭৬৯৲ টাকা। নবাবের জন্য একটী কাফ্রি-ক্রীতদাস খরিদ বাবত ৫০০৲ টাকা। সওগাদবাহী ভৃত্যদিগের পুরস্কার ৩১০৲ টাকা, ১৫ বাক্স গোলাপজল—৩৯৭৲ টাকা। নবাবের প্রাসাদে ব্যবহারের জন্য ১০ মণ মোমবাতি—৩৪৩৲ টাকা। ৬০ পাউণ্ড মসলীপট্টন চুরুট—৫০০৲ টাকা, দুই মণ ভিনিগার ৮০৲ টাকা, ৫ মণ কাফি—৩৩২৲ টাকা।

ধোপা-নাপিত ও দর্জ্জির মেহনত আনা।

১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে ধোপা-নাপিত ও দর্জ্জিরা তাহাদের কার্য্যের জন্য যে মেহনত আনা লইত, তাহার সহিত তুলনায় বর্ত্তমানে (১৭৬০ খৃঃ অব্দ) তাহার চারি গুণ দাবী করিতেছে। এজন্য আদেশ করা হইতেছে, আগামী ১লা এপ্রিল (১৭৬০ খৃঃ অব্দ) হইতে তাহারা নিম্ননির্দ্দিষ্ট হারে মেহনত আনা পাইবে। ইহার অতিরিক্ত দাবী করিতে পারিবে না।

(১) জামা তৈয়ারি করিবার সেলাই খরচ তিন আনা।
(২) চারিদিকে বর্ডার দেওয়া জামার সেলায়ের মজুরী সাত আনা।
(৩) ১টা আঙ্গরাখার মজুরী দুই আনা।
(৪) এক কুড়ী কাপড় কাচিবার জন্য ধোপা সাত পণ কড়ি পাইবে।
(৫) একজন লোককে ক্ষৌরী করিবার জন্য নাপিত সাত গণ্ডা কড়ি পাইবে। †

* Proceedings dated 5th, 9th April and 14th May (1757).
† Do Do 27th March (1760).

বাজেয়াপ্ত মালামাল বিক্রয়।

কষ্টম-হাউসের নিয়ম লঙ্ঘন করায় যে সকল মালামাল কোম্পানী আটক করিয়াছিলেন—সেগুলি নিম্নলিখিত হারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বিক্রয় করা হইল। *

দ্রব্যের জায়	বস্তার পরিমাণ	মণ	খরিদদারের নাম	মূল্য টাকা
মিহি চাউল	২১	৪০।০	ফৈজু খানসামা—১৮৶০ মণ	৭৭৸৶১০
মোটা চাউল	১৮	৩৭/৭॥	ফ্রান্সিস ডেকষ্টা—১৷৵০ „	১৬০।৶০
গালা বাতি	৪	৪/৯	দর্পনারায়ণ ঠাকুর—৫৷৵০ „	২৩৸১০
গালা	১৯	২৮॥৬	ঐ ৭৵০ „	২০৪৵০
লোহা	২৫৪৫ পিশ্	১১০।৫৵০	কেবলরাম নিয়োগী ৭।/০ „	৮০৬।৫
মিছরী	১৮ কুঁদো		রাধাচরণ মিত্র	২০।০

তোপে-উড়ান।

"হত্যা প্রভৃতি চরম অপরাধে, আগে চাবুকের আঘাতে অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা হইত। কিন্তু এরূপ আঘাত জেলের মধ্যে করা হয় বলিয়া, বাহিরের দুষ্ট লোকের মনে তাহাতে ভয়ের উদ্রেক হয় না। সুতরাং চাবুক আঘাতে মৃত্যু-সংঘটন ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইল। এইবার হইতে কোম্পানীর জমীদারীর মধ্যে চরম অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে, তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।"

বোর্ডের এই আদেশ প্রচারের কয়েকদিন পরে, হত্যাপরাধে অপরাধী নয়ান ছুতারকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।†

কলিকাতার টাকশাল প্রতিষ্ঠা।

(নবাবের পরওয়ানার একাংশ)

"কলিকাতায় আপনারা টাকশাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা এই টাকশালে নির্ম্মাণ হইবে। টাকাগুলি মুরশীদাবাদের নবাব সরকারের প্রচলিত আসরফি ও টাকার মত ওজন ও গঠন হইবে। তাহাতে কলিকাতার নাম মুদ্রিত থাকিবে। বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে এই সকল মুদ্রা অবাধে প্রচলিত হইবে। মুরশীদাবাদে নবাবের রাজ-

---

* Proceedings dated 20th March (1760).

† Proceedings dated 17th Novr. 1760.

কোষেও কলিকাতার টাকশালের টাকা গৃহীত হইবে। এই টাকার জন্য কেহ কোনরূপ বাট্টা বা কমিশন দাবী করিতে পারিবে না।"*

(১১ই চান্দ্র জেলহদ্দ ৪র্থ বৎসর) *

গবর্ণর সাহেবের সফরের খরচ।

সেকালের ইংরাজ গবর্ণরগণ কিভাবে বিদেশ যাত্রা করিতেন, তাঁহার জন্য কিরূপ খরচপত্র হইত তাহারও একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন। তখন রেলপথ ও ঘোড়া গাড়ীর পথ ছিল না, মোটর প্রভৃতিরও প্রচলন হয় নাই। এক নদীপথই দূরতর প্রদেশ যাত্রার প্রধান অবলম্বন। ক্লাইভের বিলাত গমনের পর, হেন্‌রি ভানসিটার্ট সাহেব, বাঙ্গলায় কোম্পানীর অধিকার সমূহের গবর্ণর নিয়োজিত হন। এই গবর্ণর ভানসিটার্ট, একবার মুরশীদাবাদে নবাবদরবারে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার শোভাযাত্রার জন্য কিরূপ খরচ পত্র হইয়াছিল তাহার একটী তালিকা কোম্পানী বাহাদুরের পুরাতন সেরেস্তায় আছে। যাতায়াতে এক মাস ছয় দিন সময় লাগে। এ সময়ের মধ্যে যে খরচপত্র হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার একাংশের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম।

গবর্ণর সাহেবের নিজের ব্যবহার জন্য ৩ খানি বজরা	
ভাড়া—প্রতিদিন ৩৲ হিসাবে—	২১৬৲ টাকা
২০ খানি—৬ দাঁড় নৌকা – মাসিক ২৮৲ হিঃ—	৬৭২৲ "
২২ " ৮ " " " ৩৬৲ হিঃ—	৪৯০৲ "
১২ " ১০ " " " ৪০৲ হিঃ—	৫৭৬৲ "
২ " ৪ " " " ২৪৲ হিঃ—	৫৭৲ "
মোট নৌকা ভাড়া—	২০১১৲ টাকা।
নবাবের ভৃত্যবর্গকে বক্‌সীস প্রদান—	১৯২৩৲ "
নবাবের নজর (৪০ খানি সোণার-মোহর ও ৬৯টী সিক্কা টাকা)	৬৭৪৷৷০ "
মুরশীদাবাদের উকীলকে খেলাৎ (পোষাক) প্রদান	২৫৭৲ "
চাকরদিগের ভাতা (১৬৯ জনের) (ইহাদের মধ্যে চোবদার, পেয়াদা, মসাল্‌চী, সোঁটাবরদার, বরকন্দাজ মুন্সী, সরকার ও বেহারাগণও ছিল) ...	৭২৪৷০ "

* Translation of the Nawab's Perwannah for the establishment of a Mint in Calcutta (Proceedings dated 25th November 1760.)

পাল্কী বেহারাদের ভাড়া (কাশিমবাজার হইতে) ৮৩৩॥• টাকা
৩• জন মসালচীর মেহনত-আনা (১মাস ৬ দিনের জন্য) ১২•৲ „
যাতায়াতে, খানার ও মদ্যাদির খরচা ... ৩৫••৲ „
বেহারাদের পরিচ্ছদ ও বন্দুকের আচ্ছাদনীর জন্য
লাল কাপড় ... ... ২৪•৶• „
তৈল, মশাল ইত্যাদি ... ... ২৩৮॥• „
(কলিকাতা, ৩১শে অক্টোবর ১৭৬•) হেন্‌রি ভান্‌সিটার্ট (গবর্ণর)।

মহারাজ তিলকচাঁদকে উপহার প্রদান।

বৰ্দ্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদ বাহাদুরের সহিত কোম্পানীর রাজস্ব সম্বন্ধীয় দেনা-পাওনা লইয়া একটা গোলযোগ বাধে। এ গোলযোগের মীমাংসাও হইয়া যায়। ১৭৬• খ্রীঃ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বরের প্রোসিডিংসে মহারাজকে ও তাঁহার কৰ্ম্মচারীবর্গকে যে উপহার দেওয়া হইয়াছিল— তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

উপহারের বাব	উপহার দ্রব্য	টাকা
রাজা তিলকচাঁদের জন্য	১টী হস্তী	২•••৲
	১প্রস্থ পোষাক	৬••৲
	হীরকমণ্ডিত শিরপ্যাচ	৪••৲
দেওয়ান অমরচাঁদের জন্য	১ প্রস্থ পোষাক	৫••৲
	১টী অশ্ব	৫••৲
	১খানি তলোয়ার	৫•৲
	১টী শিরপ্যাচ	৩••৲
রামদুবে নায়ক	১প্রস্থ পোষাক	২২৫৲
	একটী অশ্ব	৫••৲
গোকুল মজুমদার	১স্যুট পোষাক	২২৫৲
	১টী অশ্ব	৫••৲
রাজীবেন্দ্র রায়	১প্রস্থ পোষাক	২২৫৲
রাজচন্দ্র রায়, উকীল	১প্রস্থ পোষাক	২২৫৲
	একটী অশ্ব	৫••৲
ধনঞ্জয় রায়, উকীল	১প্রস্থ কাপড়	১৭৫৲
অন্য ছয় জন, উকীল	৭ জোড়া শাল	৬••৲

বর্গী কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান লুঠ।

"আপনারা এস্থানের দুরবস্থার কথা বোধ হয় অবিদিত নহেন। তাহা হইলেও, আমি প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে আপনাদের টাকা শোধ করিতে পারিব, এরূপ আশা করি। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য, যে দুর্দ্দান্ত বর্গীগণ আমার দেশ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছে—প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়াছে। এই সমস্ত কারণেই কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা বাকী পড়িয়াছে। আমার রাজ্যে পুনরায় সুখ সৌভাগ্যময় অবস্থা আনয়ন করিতে আমাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে। দেশের দুরবস্থাই এখন আমার প্রধান চিন্তার কারণ।" (বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচাঁদের পত্র) *

জগৎশেঠের কাঁধ-ভাঙ্গা।

"গত ২০এ মহরম, শনিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময়, আমি কোন নিমন্ত্রণ-ক্ষেত্র হইতে আহারাদি করিয়া ফিরিতেছিলাম। পথিমধ্যে সহসা পা পিছলাইয়া যাওয়ায় আমি পড়িয়া যাই। ইহার ফলে, আমার গ্রীবা-সন্ধির অস্থি স্থানচ্যুত হইয়াছিল। ইহার দুই ঘণ্টা পরে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আমি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। চিকিৎসা দ্বারা আমার রোগের কিছু উপশম হয়। এখন আমি অনেকটা ভাল আছি, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার মত হস্তচালনা করিতে সমর্থ হই নাই। আপনারা আমার আহত স্থানে দিবার জন্য যে তৈল ও অন্যান্য ঔষধাদি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আপনাদের আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয়। আপনারা যে ঔষধ গুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন, ব্যবহার-বিধি না লিখিয়া দেওয়াতে এ পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহার করিতে পারি নাই। অতএব অনুগ্রহ করিয়া ব্যবস্থাপত্র পাঠাইবেন। আমার হাতখানি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আপনাদের তৈল ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ঔষধ, ব্যবস্থাপত্র ও সেই সঙ্গে একজন ইংরাজ ডাক্তার আমার নিকটে যত শীঘ্র পারেন, পাঠাইয়া দিয়া উপকৃত করিবেন। যতদিন আমি বাঁচিব, ততদিন আপনাদের কৃতোপকার ভুলিব না।"

"পুনশ্চ—গতকল্য হইতে ডাক্তার ফ্রান্কক আমায় ঔষধ দিতেছেন। আমি কেবল আপনাদের জ্ঞাত কারণার্থে এই পত্র লিখিতেছি। আমি আশা করি, আপনারা এ সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্রান্ককে যথোপযুক্ত উপদেশ

* Extract from a letter to Government in the Persian Department

দিয়াছেন। আপনাদের এই অনুগ্রহের জন্যই আমি উপকার পাইতেছি। ভগবান আপনাদের দীর্ঘায়ু ও প্রাচুর্য্যবান করুন।*

নদীয়া-রাজের কিস্তিবন্দী।

"আপনার কুশল সংবাদসম্বলিত অনুগ্রহ-লিপি পাইলাম। নদীয়ার রাজার সম্বন্ধে আপনি যে অনুকূলজনক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আনন্দিত হইলাম। নবাব, তাঁহার নিজের কাজ ও কোম্পানীর কাজ একই বলিয়া মনে করেন। আপনাদেরও নবাব-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সেইরূপ ধারণা। কিন্তু নদীয়ার রাজার সম্বন্ধে যে আমি কি বলিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রায় দুই মাস কাল তিনি কেবল করার ও নানাবিধ ওজর করিয়া টাকা দিতেছেন না। প্রথমতঃ তিনি বলিয়া পাঠান—দুর্গা-পূজা উপস্থিত এ সময়ে টাকা দেওয়া অসম্ভব। তার পর বলিয়া পাঠাইলেন, "শ্যামাপূজা উপস্থিত। কাজেই টাকার যোগাড় হয় নাই।" তারপর এখন শুনিতেছি, রাজা আপনাদিগকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পত্নীর পীড়ার জন্য টাকার বন্দোবস্ত হয় নাই। তিনি যে মুরশীদাবাদে আসিবার জন্য এইরূপ নানা অছিলা ও ওজর আপত্তি করিতেছেন, তাহার কারণ আর কিছুই নয়—পাছে এখানে আসিলে আমরা জবরদস্তিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় করি। রাজা নিজে এখানে না আসিলে টাকা আদায়ের কোন সম্ভাবনাই নাই। তাঁহার উকীল আসিলে, কোন ফলই হইবে না। আপনারা বোধ হয় শুনিয়াছেন—টাকার অভাবের জন্য, নবাব তাঁহার সেনাদের বেতন দিতে পারিতেছেন না। আমরা নদীয়ার জমীদারকে এখানে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। আপনারাও তাঁহাকে লিখিবেন—যেন তিনি দুইটী কীস্তিবন্দীর উপযুক্ত পরিমাণ সরকারী রাজস্ব লইয়া রাজধানীতে আসেন। বাকী টাকা পরে দিলেও কোন অসুবিধা হইবে না।†

নবাবীসেনার তলবানা সম্বন্ধে গোলযোগ।

(মহারাজা রাজবল্লভের পত্র)

আমি টাকা সংগ্রহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। অন্য কোন উপায় করিতে না পারিয়া আমি আমিয়ট সাহেবের নিকট হইতে

---

* Letter from Juggut Sett dated September—1760.

† Letter form Roy Rayan dated December—1760.

কয়েক থান বনাত লইয়া সিপাহীদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে দিয়াছি। ১লা রবিউস্‌শানী তারিখে, সোবাবন্দ, মীর ফজল আলি ও আনামতউল্লা খাঁ, আমার দেওয়ানখানায় উপস্থিত হয় এবং আমাকে বলে, তাহাদের বেতন চুকাইয়া না দিলে তাহারা সেখান হইতে নড়িবে না। সেখ দীন মহম্মদ প্রভৃতিও এই সময়ে দেওয়ানখানায় উপস্থিত হইয়া ঐরূপ কথা বলে। আমি অন্যঘরে বসিয়া, তখন ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিতেছিলাম। মীর ফজল আলি, আমার নিকটে আসিয়া মিষ্টভাষায় তাহাদের আগমনের কারণ বুঝাইয়া বলে। আমি তাহাদিগকে সমস্ত হাল বুঝাইয়া বলি—"তোমাদিগকে যত শীঘ্র পারি সন্তুষ্ট করিব। কিন্তু তাহারা আমার কথা না শুনিয়া আমাকে দেওয়ানখানায় যাইতে বলে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, সেখানে অনেক অসন্তুষ্ট সৈনিক বসিয়া আছে। তাহারা আমাকে মধ্যে বসাইয়া আমার চারিধারে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে আমার বরকন্দাজেরা আমার রক্ষার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। দুই দলের লোক একত্রিত হওয়ায় আমি ভাবিয়াছিলাম, একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা না হইয়া যায় না। কিন্তু তাহা হয় নাই। হইলে বোধ হয় মুরশীদাবাদ লুঠপাট হইত, সরকারের কার্য্য হানি ঘটিত। আমি এই অশান্ত সেনাগণকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করায়, তাহারা দেওয়ানখানা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।*

কলিকাতার প্রথম স্ক্যাভেঞ্জার-সর্দ্দার।

মিঃ হ্যাণ্ডেল বোর্ডকে জানাইয়াছেন—"যে সহরের ময়লা প্রভৃতি স্থানান্তরকরণ কার্য্যে তাঁহাকে বহুক্ষণ ধরিয়া বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়। আর এই কাজে কষ্টও যথেষ্ট।" বোর্ডও এই ঘটনা অবগত আছেন। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে—হ্যাণ্ডেল সাহেব তাঁহার এই পরিশ্রমজনক কার্য্যের জন্য আরও ২০৲ টাকা অতিরিক্ত বেতন পাইবেন।

এই হ্যাণ্ডেল সাহেব আগে "আরক" নামক মদের চোলাইএর কারবার করিতেন। কিন্তু তাহা রহিত হইয়া যাইবার পর, তিনি প্রাচীন কলিকাতার "আবর্জ্জনাপরিষ্কার বিভাগের" প্রথম কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে সহরের মধ্য হইতে ময়লা নিষ্কাসিত করিবার জন্য—আর কাহাকেও যে এরূপ তদারকী ভার দেওয়া হয় নাই, তাহা হ্যাণ্ডেলের আবেদন হইতেই বুঝা যাইতেছে।†

* Lettor from Maharaja Raj Bullub. Dated December 1760

† Proceedings of the Board dated 12th April 1760

বেহালা বড়িশার জমীদার সন্তোষ রায়।

সন্তোষ রায় প্রমুখ, মাগুরা পরগণার জমীদারগণ, বোর্ডের নিকট এক আবেদন পত্র পাঠাইয়া জানাইতেছেন—যে তাঁহারা মাগুরা পরগণার জমীদারি জমা লইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে অনেক টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছে। এ কর্জ্জ, নবাবী রাজস্বের জন্যই হইয়াছে। এই কর্জ্জ জন্য তাঁহাদের নামে উত্তমর্ণেরা "কাছারী-কোর্টে" অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এখন ঘটনাবশে, জমীদারী তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। এজন্য যে সমস্ত করারে ইহা অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই হেতু তাঁহারা আমাদের অনুরোধ করিতেছেন—"আপনারা আমাদের পাওনাদারদিগকে টাকা আদায়ের জন্য নবাব-দরবারে অভিযোগ করিতে বলুন।"*

শস্যাদির দুর্ম্মূল্যাবস্থা—ও কোম্পানী-বাহাদুরের গরীবের প্রতি দয়া।

কলিকাতার শস্যাদি মহার্ঘ্য হওয়ায় গরীব লোকের বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এই কষ্ট দূর করিবার জন্য, অন্যস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য ক্রয় প্রয়োজন। এই হেতু বোর্ড প্রস্তাব করিতেছেন—মফঃস্বলের নানাস্থান হইতে শস্য খরিদ করিয়া, কলিকাতায় আনা হউক। এজন্য বোর্ড, অর্থব্যয় করিতেও প্রস্তুত। এই শস্য মফঃস্বল হইতে কিনিয়া আনিয়া সুবিধামত দরে, কলিকাতা সহরে বিক্রয় করা হইবে। এজন্য আমরা যে টাকা দিব, বাবু হজুরীমল তাহার এক চতুর্থাংশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ও এই শস্য ক্রয়কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমরা এই চাউল খরিদ জন্য, বক্সী সাহেবকে ৩৭৫০০৲ (কোম্পানীর) টাকা দিতেছি। হজুরী বাবুও ১২৫০০৲ টাকা দিতেছেন। এই অৰ্দ্ধ লক্ষ টাকা বকসী সাহেব হজুরীমল বাবুর হস্তে শস্য ক্রয় জন্য দিবেন। "চাউল প্রভৃতি মহার্ঘ্য হওয়ায় গরীবদের বড় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে" এই মৰ্ম্মে পত্র লিখিয়া বোর্ড এই সময়ে লক্ষ্মীপুর, ঢাকা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানের ইংরাজ-ফ্যাক্টারীতে সাহায্যের জন্য আদেশ প্রদান করেন।

---

* Proceedings Dated 6th November 1760.

কলিকাতার কলাগাছ ও জঙ্গল-কাটা।

বোর্ডের অভিমত এই—"যে কলিকাতাকে কলাগাছ ও জঙ্গলশূন্য করিতে হইবে। তাহা না করিলে সহরের স্বাস্থ্য-রক্ষা অসম্ভব।" এজন্য সরভেয়ার সাহেবকে আদেশ করা যাইতেছে—মহারাষ্ট্র-খাতের সীমার মধ্যে জঙ্গল ময় সমস্ত স্থান তিনি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিবেন।*

কলিকাতার জমীর খাজনার হার-বৃদ্ধি।

কালেক্টার সাহেব, কলিকাতা সহরের এবং মারহাট্টা-খাতের মধ্যস্থ ভূমি পরিমাণ ও তাহার আদায়ী খাজনার এক ফর্দ্দ দাখিল করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ৬০৫৭ বিঘা ১৩ কাঠা জমী হইতে বাৎসরিক ১৭৭৪৪৸০ রাজস্ব আদায় হইয়াছে। গড় পড়তা তিন টাকা করিয়া, বিঘা বিলি করা আমাদের ব্যবস্থা ছিল। তদনুসারে ধরিতে গেলে, জমীর খাজনা যে হ্রাস হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কলিকাতা সহরের অনেক উন্নতি হইয়াছে ও সহরের উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করিতে হইতেছে। এইজন্য কলেক্টার সাহেবকে আদেশ করা যাইতেছে, যে তিনি যে জমীর খাজনার হার দ্বিগুণ করিয়া ধরিবেন। অনেকে বিনা দলিলে, অনেক নিষ্করভূমি উপভোগ করিতেছে। এই সমস্ত জমীর মধ্যে যাহার দলিল-পত্র কিছুই নাই, সেগুলি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কার্য্য আরম্ভ করা হয় নাই। এজন্য কালেক্টার সাহেবকে আদেশ করা যাইতেছে, যে তিনি এইরূপ নিষ্করভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। তবে যাহারা এ সম্বন্ধে দলিলপত্রাদি দেখাইতে পারিবে, তাহার কথা স্বতন্ত্র।*

কলিকাতা সহরে আতসবাজী বন্ধ।

দেখা যাইতেছে—সহরের মধ্যে আতসবাজী ছোড়ায় অনেক স্থানের চালা ঘরে আগুন লাগিয়া, পল্লীকে পল্লী ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। পেরিন পয়েন্টে ও সহরের মধ্যে আমাদের যে বারুদখানা বা ম্যাগাজিন আছে—এরূপ অগ্নিক্রীড়ায় তাঁহারও বিপদ ঘটিতে পারে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, কলিকাতার মধ্যে আর আতসবাজী ছুড়িতে দেওয়া হইবে না। এবং বাজীর দোকানগুলি তুলিয়া দেওয়া হইবে।*

* Proceedings Dated 12 December 1762.

রাজা মাণিকচাঁদের মৃত্যু।

ঢাকা হইতে প্রেরিত এক পত্রে আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, যে কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ান রাজা মাণিকচাঁদ, ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কার্টিয়ার সাহেবকে মৃত্যুর পূর্ব্বে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন— "যেন তিনি তাঁহার পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।" এই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, কার্টিয়ার সাহেব রাজার বাড়ীর দরজাগুলি শীল করিয়া দিয়া, দশজন সিপাহীকে বাটী চৌকী দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। জনরব এই, যে তিনি মৃত্যুকালে অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন,—একথা নবাবের কাণেও পৌছিয়াছে। পাছে নবাবের কর্ম্মচারীরা এজন্য কোন হাঙ্গাম উপস্থিত করে কিম্বা রাজার উত্তরাধিকারীগণকে তাঁহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, এইজন্য কোম্পানী এই রাজপরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। রাজা মাণিকচাঁদ কোম্পানীর অনেক উপকার করিয়াছিলেন।*

মাণিকচাঁদের শিশুপুত্রকে আশ্রয়দান।

"ঢাকা হইতে লিখিত ৯ই ও ১০ই তারিখের পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পত্র হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি—যে মাণিকচাঁদের পুত্রের বয়স মোটে চারি বৎসর। মাণিকচাঁদ কোম্পানীর দেওয়ানী করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মতে তাঁহার পুত্রকে ঐ পদ প্রদান করা উচিত। কিন্তু চারি বৎসরের শিশুদ্বারা ত কোনরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভব নহে। এজন্য আমাদের অনুরোধ, এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে সামান্য বেতনে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের তালিকাভুক্ত করিয়া রাখা হউক। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এ কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।"

এই রাজা মাণিকচাঁদ সেরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণ সময়ে ইংরাজদের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে তিনি নানা বিষয়ে কোম্পানীর যথেষ্ট উপকার করেন। এজন্য কোম্পানী-বাহাদুর, তাঁহাকে দেওয়ান পদ দেন। কার্টিয়ার সাহেব মাণিকচাঁদের শিশু পুত্রকে ও পরিবারবর্গকে কিরূপে রক্ষা করেন, তাহা পাঠক পূর্ব্বে দেখিলেন। তাঁহার সম্পত্তির উপর নবাব সরকারের যে আইনসঙ্গত দাবীদাওয়া ছিল—তৎপ্রদানে তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। মাণিকচাঁদের পরিবার-

---

* Proceedings dated. 29-11-1762.

বর্গের প্রতি এইরূপ কৃপা প্রকাশ করায়, কোম্পানী বাহাদুরের যথেষ্ট মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে। কলিকাতার সান্নিধ্যে বেহালা গ্রামে, রাজা মাণিকচাঁদের একখানি বাগান ছিল। এখনও তাহার ধ্বংশপ্রায় ফটকটী বর্ত্তমান। এই বাগান এক্ষণে বেহালার সুবিখ্যাত জমীদার রায়-পরিবারগণের দখলে।*

সেকালের বাজারদর।

একবার নবাব মীরজাফর কোম্পানীর অতিথিরূপে কলিকাতায় আসেন। তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গের লোকজনকে যে সিধা দেওয়া হইয়াছিল, তার একটী পুরাতন ফর্দ্দ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। এই ফর্দ্দ হইতে পাঠক সেই সময়ের জিনিস-পত্রাদির মূল্য অবগত হইতে পারিবেন।

নবাব ও তাঁহার সঙ্গীগণের জন্য প্রেরিত দ্রব্যাদির তালিকা।

দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য	
চাউল	৪০ মণ	৭৫৲	প্রতিমণ কমবেশী ১৸৴০
দাল	৮ „	২০৵০	„ „ ২॥০
ঘৃত	৫ „	৭৭৲	„ „ ১৫।৵০
তৈল	৬ „	৫১৲	„ „ ৮।৵০
লবণ	৩॥ „	৪।৵০	„ „ ১।০
ময়দা	৮ „	২৭৲	„ „ ৩।৵০
চিনি	৫ „	৩৬।০	„ „ ৭।০
মিষ্টান্ন মেঠাই	৬ „	৬০৲	„ „ ১০৲
মোরব্বা	১ „	১৯৲	„ „ ১৯৲
বাদাম কিসমিস্	১ „	৩১।০	
খাসি	৫০ টা	৫০৲	প্রত্যেক খাসি ১৲ হিঃ
শাকসব্জী		১৬৲	
লেবু		৭৲	
মসলা		১৪০।৵০	
পাণ ও তামাকু		১০৸০	
হাঁড়ি ও কাঠ		২৬৲	
ঝুড়ি থলে ইত্যাদি		২৪৲	

* Proceedings dated. 17-1-1763.

শান্তিপুরের ফ্যাক্টারি আক্রমণ।

১৭৬৪ খৃঃ অব্দের ১২ নবেম্বরের প্রোসিডিংস হইতে দেখা যায়, কোম্পানীর "একস্পোর্ট অয়ার-হাউস কিপার" শান্তিপুরের ফ্যাক্টারীতে নিযুক্ত কোম্পানীর গোমস্তাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত, নিম্নলিখিত অভিযোগটী বোর্ডের নিকট পেশ করিতেছেন।

"রামচন্দ্র সেন, পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সেন, সহসা দুই তিন শত অশ্বারোহী সিপাহী ও বরকন্দাজ লইয়া "শান্তিপুরের আড়ঙ্গে" উপস্থিত হয়। পঞ্চাশ জন লোক আড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা আমাদিগকে বলে যে রামচন্দ্র সেনের নিকট আমাদের তখনই হাজির হইতে হইবে। আমরা ইহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহারা বলপূর্ব্বক আমাদের গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া লইয়া যায়। এই ভট্টাচার্য্য, কোম্পানীকে সুতার যোগান দিত। তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়ায় কোম্পানীর কাজ অচল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের এরূপ করিবার কারণ যে কি, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। এজন্য আমরা নিধিরাম মুখোপাধ্যায় ও গোপাল ভট্টাচার্য্যকে আপনাদের নিকট কলিকাতায় পাঠাইতেছি। ইহাদের নিকট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া আপনারা এ বিষয়ে তদন্ত করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"*

১৭৬৬ খঃ অব্দে কলিকাতার বাঙ্গালী অধিবাসিগণ।

গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয়ের পৌত্র, রাধাচরণ মিত্রের জাল-অপরাধে, বিলাতী আইন অনুসারে বিচার হইয়া যখন ফাঁসীর হুকুম হয়, সেই সময়ে কলিকাতা সহরের তদানীন্তন অধিবাসিগণ, গবর্ণর সাহেবের নিকট এই ফাঁসীর হুকুম রদ করাইবার জন্য এক দরখাস্ত করেন। এই দরখাস্তে কলিকাতার সেকালের ৯৫৭ জন গণ্যমান্য অধিবাসী নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই নামের তালিকা হইতে কলিকাতার তৎকালীন গণনীয় ব্যক্তিদের নাম জানিতে পারা যায়। আমরা এই অসংখ্য স্বাক্ষরের মধ্য হইতে কতকগুলি বাছা বাছা নাম তুলিয়া দিলাম।

নবকৃষ্ণ মুন্সী (মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর)		মদন দত্ত
হুজুরীমল	শুকদেব মল্লিক	শ্যামচাঁদ দত্ত
গোকুল ঘোষ	রাসবিহারী শেঠ	হরিকৃষ্ণ দত্ত
দয়ারাম ঘোষ	নিমাইচরণ শেঠ	মাণিক দত্ত

* Proceedings of the Secret Dept. Dated Novr—12th (1764)

কন্দর্প ঘোষ	পীতাম্বর শেঠ	চুড়ামণি দত্ত
রামচাঁদ ঘোষ	বিনোদবিহারী শেঠ	কৃষ্ণচাঁদ দত্ত
শঙ্কর হালদার	গুরুচরণ শেঠ	রামনিধি ঠাকুর
পূর্ণানন্দ বসাক	নীলাম্বর শেঠ	বিশ্বনারায়ণ ঠাকুর
শোভারাম বসাক	গোকুলকিশোর শেঠ	দয়ারাম ঠাকুর
রাধামোহন বসাক	কুন্দ ঘোষাল	দুর্গারাম ঠাকুর
দুর্গারাম সেন	বাবুরাম পালিত	হরিকৃষ্ণ ঠাকুর
নন্দরাম সেন	বনমালী বানার্জ্জি	শ্যাম চক্রবর্ত্তী
দয়ারাম শর্ম্মা	রাধাকৃষ্ণ মল্লিক	কেবলরাম ঠাকুর
রামলাল শর্ম্মা	দয়ারাম মুখোপাধ্যায়	রামচরণ রায়
জয়কৃষ্ণ শর্ম্মা	মনোহর মুখোপাধ্যায়	কৃপারাম মিত্র
উদয়রাম শর্ম্মা	তোতারাম বসু	রামসুন্দর মিত্র
রাধাকান্ত শর্ম্মা	রামশঙ্কর বসু	গোবর্দ্ধন মিত্র
		গণেশ বসু
রামনিধি শর্ম্মা	রামশঙ্কর দত্ত	গঙ্গারাম মিত্র
রাধাচরণ মল্লিক	দুর্গারাম দত্ত	গোকুল মিত্র

সমস্ত স্বাক্ষরগুলি তুলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়—এজন্য আমরা বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটী নাম তুলিয়া দিলাম। পাঠক ইহা হইতে দেখিতে পাইবেন, কায়স্থগণই তখন কলিকাতার প্রধান ছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ শোভাবাজারের আদিপুরুষ। দত্তগণের মধ্যে অনেকে বোধ হয়, হাট-খোলার দত্ত পরিবারভুক্ত। শেঠ ও বসাকগণের মধ্যে শোভারাম বসাক, রাসবিহারী শেঠ প্রভৃতি গণনীয়। ঠাকুর-গোষ্ঠীর দুই একজনের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। শর্ম্মা বলিয়া যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ অধ্যাপক শ্রেণীর লোক। চুড়ামণি দত্তের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহারই পুত্র কালীপ্রসাদ দত্তের নামে, এখনও একটী রাস্তা বর্ত্তমান। শঙ্কর হালদার, আহিরীটোলার হালদারদের আদিপুরুষ। তাঁহার পাঁচকুড়ে দালানওয়ালা সুবৃহৎবাটী এখনও অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান। নন্দ-রাম সেনের নামেও একটী গলি আছে। মদন দত্তের নাম, আজও একটী গলির সহিত বিজড়িত। হুজুরীমলস্ ট্যাঙ্কলেন—হুজুরীমলের নাম রক্ষা করিতেছে। গোকুল মিত্র বাগবাজারের মিত্রদের আদিপুরুষ। ইঁহার বাড়ীতেই মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। ইহাই "বাগবাজারের মদনমোহন" বলিয়া পরিচিত। গোকুল মিত্রের সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য আবাসবাটী, নাট্যমন্দির, দোল ও রাসমঞ্চ আজও তাঁহার অতীত ঐশ্বর্য্যময় অবস্থা ঘোষণা

জমা দেওয়ার প্রস্তাব আদৌ গ্রহণীয় নহে। এই সমস্ত জমী, জমা দিবার জন্য, সাধারণভাবে নোটিশ জারী হউক।"

বাৎসরিক তের লক্ষ টাকা রাজস্ব দানের করার হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, মহারাজ নবকৃষ্ণের অবস্থা সেই সময়ে বড়ই উন্নত ছিল। কোম্পানীর [illegible] মাত্র আছে [illegible]

লর্ড ক্লাইভ ও দেশীয় [illegible] প্রতি সদয় ব্যবহার।

"লর্ড ক্লাইভ ও তাঁহার অধীনস্থ কমিটি, প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন—যাহাতে কোম্পানীর ইংরাজ-গোমস্তাগণ, এ দেশীয় লোকদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে। কিন্তু কলিকাতা-কৌন্সিলের ৯এ ফেব্রুয়ারির পত্রে, মহম্মদ রেজা খাঁর যে অভিযোগ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, যে এখনও ইংরাজ-গোমস্তাগণ দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারে ক্ষান্ত হয় নাই।"†

ইউরোপীয় ভবঘুরের দলবৃদ্ধি।

কলিকাতা-কৌন্সিল—বিলাতের কর্ত্তাদের যে পত্র লিখিতেছেন, তাহার একাংশ এই—"কলিকাতার বাৎসরিক সেন্‌সাসের ফল আপনাদের নিকট প্রেরিত হইতেছে। কলিকাতার ইংরাজগণের বর্ণানুক্রমিক একটী তালিকা আমাদের ডেস্‌প্যাচের মধ্যে আছে, দেখিতে পাইবেন। এই তালিকা হইতে দেখিবেন, কলিকাতায় ভবঘুরে ইংরাজ ও ইউরোপীয়ের সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহারা বিলাত ও ইউরোপের নানা স্থান হইতে জাহাজে করিয়া লুকাইয়া পলাইয়া আসে। এরূপ বিশৃঙ্খল প্রকৃতির উদ্দেশ্যহীন লোকের আগমনে সহরের অশান্তি বৃদ্ধি হয়। আমরা ইহাদের অনেককে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছি বা জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছি। এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, তাহারও চেষ্টা করিব।"

কলিকাতার জমীবিলি সম্বন্ধে ক্লাইভের মন্তব্য।

"কলিকাতায় কোম্পানীর যে খাস-দখলী জমী-জমা আছে, তাহা যথাযথ বিলি হইলে কোম্পানীর যথেষ্ট আয়-বৃদ্ধি হইতে পারে।

* Proceedings of the Board dated 21st December 1767.

† Letter of the Court of Directors to the President in Council Dated 4th March, Para 14 (1767).

কন্দর্প ঘোষ	পীতাম্বর শেঠ	চূড়ামণি দত্ত
রামচাঁদ ঘোষ	বিনোদবিহারী শেঠ	কৃষ্ণচাঁদ দত্ত
শঙ্কর হালদার	গুরুচরণ শেঠ	রামনিধি ঠাকুর
পূর্ণানন্দ বসাক	নীলাম্বর শেঠ	বিশ্বনারায়ণ ঠাকুর
শোভারাম বসাক	গোকুলকিশোর শেঠ	দয়া[illegible] ঠাকুর

বেনামে-সনামে কতক[illegible] তাহাদের অধ[illegible] দেশীয় কর্ম্মচারীরাই এইরূপ বেনামীর প্রধান উপলক্ষ্য। কিন্তু লাভের অংশ দেশীয়গণই ভোগ করে। আমি শুনিয়াছি, এই সমস্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী ও বেনিয়ানেরা আট আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত হারে কলিকাতার জমী সমূহ জমা লইয়াছে। কিন্তু অন্য প্রজাগণ, সেই স্থলে ২৷৹ হইতে ২৸৹ পর্য্যন্ত খাজনা দিয়া থাকে। আমি যেরূপ বিবরণ সংগ্রহ করিতেছি—তাহাতে বোধ হয়, ভবিষ্যতে এই সমস্ত জমী খাসে আনিয়া পুনরায় বিলি করিলে, কোম্পানীর জমীদারীর আয় বাৎসরিক চৌদ্দ পনর লক্ষ টাকা হইতে পারে। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে কোম্পানীর নিজের কর্ম্মচারিগণই তাঁহাদের প্রভুর এইরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছেন।"*

আমরা পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। বহুকাল হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু লর্ড ক্লাইভের আমলে এ সম্বন্ধে একটা আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আট আনা করিয়া কলিকাতার জমীর বিঘা বিলি—এখনকার কালে এক অদ্ভুত ঘটনা।

রায়তের উপর কোম্পানীর দয়া।

মহারাজ নবকৃষ্ণ ও গোকুল মিত্র উভয়ে মিলিয়া ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে চব্বিশ পরগণা ও খাস কলিকাতা ও ডিহি কলিকাতার জমীগুলি বাৎসরিক তের লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে, কোম্পানী বাহাদুরের নিকট জমা লইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু গবর্ণর ও কৌন্সিল, ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া বিচার করিয়া, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা এই—"দেশের মধ্যে নবকৃষ্ণের অবস্থা ও ক্ষমতা আজকাল যেরূপ হইয়াছে, তাঁহাতে তাঁহাকে ও তাঁহার সহযোগী গোকুলকে প্রস্তাবিত স্বত্বানুসারে জমী জমা দেওয়া যাইতে পারে না। এরূপ করিলে, রায়তেরা অত্যাচার ভয়ে ভীত হইবে। কোন দেশীয় ব্যক্তিকেই অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া উচিত নহে। এইজন্য নবকৃষ্ণ ও গোকুলকে এই জমীসমূহ

* Proceedings of the Council dated 19th Jaunary 1767.

জমা দেওয়ার প্রস্তাব আদৌ গ্রহণীয় নহে। এই সমস্ত জমী, জমা দিবার জন্য, সাধারণভাবে নোটিশ জারী হউক।"

বাৎসরিক তের লক্ষ টাকা রাজস্ব দানের করার হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, মহারাজ নবকৃষ্ণের অবস্থা সেই সময়ে বড়ই উন্নত ছিল। কোম্পানীর সেরেস্তায় "গোকুল" শব্দটী মাত্র আছে, উপাধি নাই। সম্ভবতঃ ইনি বাগবাজারের গোকুল মিত্র ও মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রতিবেশী। তৎকালে সমাজে ও রাজদ্বারে মহারাজ নবকৃষ্ণের যথেষ্ট সম্মান ছিল। অর্থবল ও লোকবল প্রভৃতি কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। এজন্য পাছে এই অপরিমিত ক্ষমতাবান ব্যক্তির অধীনে থাকিলে প্রজাদের উপর খাজনা আদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ জুলুম জবরদস্তি হয়, কোম্পানী-বাহাদুর এই আশঙ্কায় তাঁহাদের জমী জমা দিতে চাহেন নাই।*

লর্ড ক্লাইভের সুপারিসে নবকৃষ্ণের উন্নতি।

লর্ড ক্লাইভ, মুন্সী নবকৃষ্ণকে কমিটির নিকট সুপারিস করিতেছেন— "নবকৃষ্ণ অতিশয় পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে কোম্পানীর "পলিটিক্যাল-বেনিয়ান" পদে নিযুক্ত করা গেল।" †

ইহার পূর্ব্বে নবকৃষ্ণ, লর্ড ক্লাইভের মুন্সী ও পারসী বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

মগের মুল্লুক।

"এটা মগের মুল্লুক নাকি" বলিয়া একটা জনপ্রবাদ আজও কলিকাতায় প্রচলিত আছে। কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার দেখিলে, লোকে এই কথাই বলিয়া থাকে। এই জনপ্রবাদের কারণ আর কিছুই নয়— মগদস্যুরা এক সময়ে কলিকাতা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল। এই মগেরা চট্টগ্রাম ও বর্ম্মার সীমান্তবাসী দস্যু-সম্প্রদায়। নদীগর্ভে বাণিজ্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, লোকজনকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া, নদীবক্ষে ডাকাতি প্রভৃতি মগদিগের জীবনের লক্ষ্য ছিল। কলিকাতার কর্ত্তাদেরও অনেক সময় এই মগদিগের কথা ভাবিতে হইত। পর্টুগীজগণ চিরদিনই "বোম্বেটে" বলিয়া বিখ্যাত। মগেরা এই পর্টুগীজদিগকে তাহাদের দলে লইয়া, বাঙ্গালার নানা

* Proceedings Dated 20th August 1867.

† Select Committee's Proceedings Dated 16th January, 1767.

স্থানে নদীবক্ষে লুটপাট করিয়া বেড়াইত। কখনও বা তাহারা তীরে নামিয়া বাটী ঘর দ্বার জ্বালাইয়া দিত। গ্রামকে গ্রাম ভস্মসাৎ করিত, ছেলেমেয়েদের ধরিয়া লইয়া যাইত। এই সমস্ত আরাকানী মগদস্যুদের উৎপাতে, এক সময়ে কলিকাতাবাসীদের পর্য্যন্ত উত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। সুন্দরবন, ঢাকা, ২৪ পরগণা, প্রভৃতি বিভাগের নদীর মধ্যে মগদস্যুগণ অবাধে বিচরণ করিত। নবাব অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাদের শাসন করিতে পারেন নাই। মগেরা প্রতি বৎসর এক একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে, এক একটী দেশে দেখা দিত। ১৭৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর পুরাতন কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এই মগদস্যুদের দমনের জন্য নানাবিধ উপায় চিন্তা করিতেছেন।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা কোম্পানী-বাহাদুরের কলিকাতা-কৌন্সিলের প্রোসিডিংস্ ও বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারদের পত্রের অংশ বিশেষ হইতে গৃহীত। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধীয় কুড়ি বৎসরের নানা বিষয়িণী ঘটনার কথা, এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ভবিষ্যতে পরবর্ত্তী বৎসর সমূহের ঘটনা আলোচিত হইবে।

একবিংশ অধ্যায়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমলে ইংরাজাধিকারের প্রথম গবর্ণর জেনারেল—হেষ্টিংসের সহায়তার জন্য বিলাত হইতে কৌন্সিলের মেম্বরগণের নিয়োগ—নূতন মন্ত্রণা-সভার সভা, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস্, জেনারেল ক্লেভারিং, বারওয়েল ও কর্ণেল মনসন্—সুপ্রীম-কোর্টের প্রথম চিফজষ্টিস্ ইম্পি, বিলাত হইতে সভ্যগণের এদেশে আগমন ও চাঁদপাল-ঘাটের অবতরণ ঘটনা—তোপধ্বনির ব্যাপারে গোলমালের সূচনা—কৌন্সিলের সভ্যগণের সহিত হেষ্টিংসের মনোবাদ—নন্দকুমারের ঘটনা—ওয়ারেণ হেষ্টিংস সম্বন্ধে নানা কথা—হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ—আলিপুরের "ডুয়েল এভেনিউ"—হেষ্টিংসের আলিপুরে বাস—হেষ্টিংস-হাউস—নবাব মীর-জাফরের আলিপুরে বাস—হেষ্টিংসের বাগানবাটী ও সম্পত্তি বিক্রয়—ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথা—কলিকাতায় পর্টুগীজ গোরার উৎপাত—বর্ষা সমাগমে ডাক চলাচল বন্ধ—সিমুলিয়ায় খুন—লারকিন্স লেনে দরোয়ান খুন—হেষ্টিংসের উপর তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা ডিরেক্টারদের সহানুভূতি—বজরাডুবি ও সাহেবের মৃত্যু—সে কালের ডাকঘরের মাশুল খরচের কথা—দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মৃত্যু—সে কালের গাড়ী-ঘোড়া—সে কালের বেঙ্গল ব্যাঙ্ক—চীনে জেলে—ক্রীতদাস চুরী—স্থলপথে ডাক-গাড়ীর খরচা—নোটের প্রথম প্রচলন—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রামকান্ত মুন্সীর বাটীতে চুরী—বজরা ও নৌকার ভাড়া—সে কালের লাট-বাড়ীর কথা—হারমোনিক টাভার্ণ—সেকালের সতীদাহের একটী ভীষণ দৃশ্য—এ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা—কলিকাতা চীনেবাজারে চোরের আড্ডা—সেকালের ফ্যান্সি-ড্রেসবল—ময়দানে প্রথম বেলুন-বাজী—ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মালামাল বিক্রয়—গাড়ীওয়ালা ষ্টুয়ার্ট কোম্পানী—ঘোড়ার দানার কারখানা—সে কালের মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যবস্থা—১৭৮৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতার ৩১টী থানার নাম—ইংরাজ-সন্তানগণের জন্য প্রথম বিদ্যালয়—বাঘ বিক্রয়—পলাতক ক্রীতদাস—ভগবদ্গীতা বিক্রয়—বিলাতে গীতার প্রথম মুদ্রাঙ্কণ—গবর্ণর ভান্সিটার্টের মৃত্যু—সেকালের পর্ব্বাদি উপলক্ষে সরকারী আফিসের ছুটী—কলিকাতায় মালাই—মানিলা ও কাফ্রি গুণ্ডার উৎপাত—অহল্যাবাইয়ের গয়ায় মন্দির-প্রতিষ্ঠা—বর্দ্ধমানে দামোদরের মহাবন্যা (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ)—সেকালের গঙ্গাতীরের ঘাটসমূহের নাম।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলের কথা

ধরিতে গেলে, পলাশী যুদ্ধের পরই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকারান্তরে

বঙ্গদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর মীরজাফর, মীরকাশেম প্রভৃতি যে সমস্ত নবাব, বাঙ্গালার মস্‌নদে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই ইংরাজের সহায়তায় বাঙ্গালার সিংহাসন পাইয়াছিলেন। ক্লাইভ সহায় না থাকিলে মীরজাফর দুই এক মাসও রাজত্ব করিতে পারিতেন না। মীরকাসেম ধরিতে গেলে, বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব। তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি, প্রজাপ্রীতি ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য ইংরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। ইহার ফলে, মীরকাশেমের বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া পলায়ন, পাটনার হত্যাকাণ্ড, আর বঙ্গের শাসন তন্ত্রের ঘোরতর পরিবর্ত্তন। এ সমস্ত ঘটনা, বাঙ্গলার সুবৃহৎ ইতিহাসে বর্ণিত আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই সে সব কথা জানেন, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

বাঙ্গালার দেওয়ানী-সনন্দ লাভ করিয়া, ইংরাজের অবস্থা নূতন দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ধরিতে গেলে, তখন ইংরাজ-কোম্পানীই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার মালিক। রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদের হস্তে। নবাব তাঁহাদের বাহুবলে সুরক্ষিত ও সকল বিষয়েই মুখাপেক্ষী।

পলাশী-রণপ্রাঙ্গণে, সমর-প্রতিভার বিকাশ করিয়া, বঙ্গে ইংরাজাধিকারের ভিত্তিস্থাপন করিয়া, লর্ড ক্লাইভ যথাসময়ে স্বদেশে চলিয়া গেলেন। এখানে রহিল—তাঁহার কীর্ত্তি ও যশগৌরব, বাঙ্গলার ভাগ্য পরিবর্ত্তন, রাষ্ট্র-বিভাগে বিশৃঙ্খলা—আর সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া ইংরাজের সমর-শক্তি ও বাহুবলের উদ্দাম প্রতিধ্বনি। এ ভীষণ প্রতিধ্বনি শুনিয়া, দিল্লীর হীনতেজ সম্রাট পর্য্যন্ত বিচলিত হইলেন।

কিন্তু সমগ্র বঙ্গ ব্যাপিয়া তখন সকল বিষয়েই একটা বিশৃঙ্খলভাব। নবাব ও ইংরাজ-কোম্পানী উভয়েই দেশের শাসনকর্ত্তা। রাজস্ব আদায়ে মহা বিশৃঙ্খলা। বিলাতের কর্ত্তাদের কাণে, এই সব বিশৃঙ্খলার কথা পৌছিল। তাঁহারা এই দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার প্রতিকারার্থে, ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে বাঙ্গলার গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করিলেন। বঙ্গে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠার পর, হেষ্টিংসই প্রথম গবর্ণর-জেনারেল। বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা, হেষ্টিংসের বেতন ধার্য্য লইল। তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য, একটী মন্ত্রণা-সভাও স্থাপিত হইল। এই মন্ত্রণা-সভার কয়েকজন সভ্য বিলাত হইতে প্রেরিত হইলেন। বিচার-বিভাগে সুশৃঙ্খলা আনয়নের জন্য, কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম সুপ্রীমকোর্ট বা প্রধান বিচারালয়

হেষ্টিংসের কৌন্সিলের সদস্য স্যর জন্ ক্লেভারিং।

স্যর ফিলিপ্‌ ফ্রান্সিস্‌ (হেষ্টিংসের কৌন্সিলের সদস্য)।

স্থাপিত হইল। এই সুপ্রীমকোর্টের জন্য একজন চিফ্-জষ্টিস ও তিনজন "পিউনী" বা সহকারী জজ নিযুক্ত হইলেন।

হেষ্টিংস এ দেশে থাকিয়া, এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাইলেন। তাঁহার সহকারী ও মন্ত্রণাসভার সভ্যগণের মধ্যে বারওয়েল সাহেবই এ দেশে ছিলেন। অপর তিনজন অর্থাৎ সার ফিলিপ ফ্রান্সিস, জেনারেল জন্ ক্লেভারিং ও কর্ণেল জর্জ্জ মন্‌সন্ বিলাত হইতে আসেন। অপর একখানি জাহাজে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি, স্যর ইলাইজা ইম্পি ভারতে যাত্রা করেন।

কৌন্সিলের সদস্য ও জজেরা ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় উপস্থিত হন। যাহা আজ কাল "চাঁদপাল-ঘাট" বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা সেই ঘাটেই অবতরণ করেন। তাঁহাদের সম্মানার্থে ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গ প্রাকার হইতে তোপধ্বনি হয়। এই তোপধ্বনির সংখ্যা কম হইয়াছিল বলিয়া, ফ্রান্সিস-প্রমুখ সদস্যগণ অপমানিত বোধ করেন ও তাঁহাদের মনে একটা অভিমান জন্মে। তাহারা মনে মনে ভাবিলেন—"তবে কি আমরা গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অপেক্ষা পদ-গৌরবে ছোট! তিনি তাঁহার সম্মান স্বরূপ যে তোপধ্বনি পান, আমাদের তাহা দেওয়া হইল না কেন?"

ধরিতে গেলে—চাঁদপাল-ঘাটের এই অবতরণ ব্যাপার হইতে, হেষ্টিংস ও তাঁহার সহযোগীগণের মধ্যে বিষম মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। এ মনোমালিন্য পরিশেষে কিরূপ ভয়ানক অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে দেওয়া অসম্ভব। হেষ্টিংসের দলে রহিলেন, কেবলমাত্র বারওয়েল। কৌন্সিলের অপর তিনজন সদস্য, প্রত্যেক কার্য্যেই হেষ্টিংসের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের মধ্যে, সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান জজ স্যর ইলাইজা ইম্পি, হেষ্টিংসের প্রধান সহায় ছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার, তখন দেশের মধ্যে একজন গণ্য মান্য লোক। তাঁহার ক্ষমতাও যথেষ্ট। ফ্রান্সিসের সহায়তা পাইয়া, মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কৌন্সিলের সমক্ষে, তাঁহার নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করেন। ব্যাপারটী ক্রমে বড়ই সাংঘাতিক অবস্থায় উপস্থিত হইল। কিন্তু ঘটনাচক্রে, মহারাজার নামে এই সময়ে সুপ্রীম-কোর্টে জাল করার এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমার প্রধান বিচারক স্যর

ইলাইজা ইম্পি ও তাঁহার সহযোগীগণ। ইম্পির বিচারে, তৎকালে প্রচলিত ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে, মহারাজ নন্দকুমার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন।

নন্দকুমারের মোকদ্দমা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা, তাঁহার ফাঁসির দিনের ঘটনা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথা পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন। বর্ত্তমানে এই টুকু জানিয়া রাখুন—কলিকাতায় ইহাই প্রথম ব্রাহ্মণের ফাঁসী। এই ব্যাপার লইয়া তখন কলিকাতায় একটা মহা হুলস্থুল উপস্থিত হয়। অনেক বাঙ্গালী এই শোচনীয় ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া, কলিকাতা ত্যাগ করিয়া, ভাগীরথীর অপর পারে বাস উঠাইয়া লইয়া যান।

হেষ্টিংসের প্রতিপক্ষ সহযোগীগণের মধ্যে, মন্সন সাহেব ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে প্রথমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কলিকাতায় আসিবার পর, এক দিনও তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যায় নাই। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি হুগলীতে যান ও সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনিয়া সমাহিত করা হয়। মন্সন সাহেবের পত্নীও স্বামীর অনুগামিনী হন। এই দম্পতির সমাধিস্তম্ভ, এখনও পার্কষ্ট্রীটের পুরাতন গোরস্থানে বর্ত্তমান। ইহার পর বৎসরে জেনারেল ক্লেভারিংও গতাসু হন।*

ক্লেভারিং ও মন্সনের মৃত্যু হওয়ায়, ফ্রান্সিস্ একা পড়িলেন। হেষ্টিংসের ক্ষমতা পুনরায় বাড়িয়া উঠিল। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ইহার তিন বৎসর পরে ফ্রান্সিসও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান।†

* সেকালের "রোপ্-ওয়াক্" (আজকালকার মিশনরোর মধ্যে) যে বাটীতে বর্ত্তমান পিগট চ্যাপম্যান কোম্পানীর অফিস আছে, সেই বাটীতেই মন্সন সাহেব বাস করিতেন। যে বাটীটি আজকাল জে, টমাস কোম্পানীর দখলে, সেই বাটীতে জেনারেল ক্লেভারিংএর মৃত্যু হয়। এই দুইটী বাটীর ভিত্তিগাত্রে, লর্ড কর্জ্জন দুইটী প্রস্তর-ফলক মারিয়া দিয়াছেন। স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস—বর্ত্তমান রয়েল-এক্সচেঞ্জের অধিকৃত বাটীতে বাস করিতেন। ফ্রান্সিসের পূর্ব্বে, লর্ড ক্লাইভ এই বাটীতে বাস করিয়া গিয়াছেন। বারওয়েল সাহেব—খিদিরপুরে থাকিতেন। কলিকাতা সহরে তাঁহার আবাসস্থান কোন্‌টী ছিল, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। হেষ্টিংস সাহেব—বর্ত্তমান হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে, বরণ কোম্পানীর অধিকৃত বাটীতে বাস করিতেন।

† হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের কোন দিনই বনিবনাও হয় নাই। কৌন্সিলের এক অধিবেশনে, ফ্রান্সিসের চরিত্র সম্বন্ধে হেষ্টিংস সাহেব কোন কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই মন্তব্যে তিনি ফ্রান্সিসকে প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী বলিয়া উল্লেখ করেন। এ অপমান বাক্য সহিতে না পারিয়া, ফ্রান্সিস হেষ্টিংসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। বর্ত্তমান জুওলজিকাল উদ্যানের বা আলিপুরের পশুশালার পশ্চাতে, শাস্ত্রী-লাইনের

গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মন্ত্রীসভার সদস্য
রিচার্ড বারওয়েল।

হেষ্টিংসের আমলের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা, বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। এই সমস্ত ঘটনার পুনরবতারণা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সহযোগী সদস্যগণের মৃত্যুতে, হেষ্টিংস যথেষ্ট ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। বঙ্গের রাজস্ব ও বিচার-বিভাগ সম্বন্ধে, সমস্ত ব্যবস্থা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধিকল্পে মনোযোগ প্রদান করেন। তাঁহার আমলের দুইটী কীর্ত্তি এখনও অক্ষতভাবে দণ্ডায়মান। ইহাদের একটী বর্ত্তমান সেণ্টজন বা পাথুরিয়া-গির্জ্জা—দ্বিতীয় এসিয়াটিক-সোসাইটী। সেণ্টজন-গির্জ্জা যে জমীতে অবস্থিত, তাহা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জমী। হেষ্টিংস চেষ্টা করিয়া নবকৃষ্ণের নিকট হইতে এই জমী টুকু অধিকার করিয়া, গির্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য প্রদান করেন। আজও তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এই জমী-দানপত্র উক্ত গির্জ্জার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। এই দানপত্রে হেষ্টিংস, মহারাজ নবকৃষ্ণের ধর্ম্মার্থে দান ও সৌজন্যতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংসের চেষ্টায়, বর্ত্তমান এসিয়াটিক-সোসাইটীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। এই সোসাইটীর দ্বারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের কিরূপ সহায়তা হইয়াছে—তাহা সুধীমাত্রেই জানেন। সোসাইটীর সদস্যগণ, ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে এই সভার মুরুব্বি বা "পেট্রণ" নির্ব্বাচিত করেন। প্রাচ্য ভাষানুশীলনের উৎসাহ-দান কল্পে, হেষ্টিংস যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে উর্দ্দু ও পারসী খুব ভালরূপ জানিতেন। সংস্কৃত জানিতেন কি না, তাহা ঠিক জানি না। তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি যাহা এখন কলিকাতা টাউনহলে সুরক্ষিত—তাহার এক পার্শ্বে একজন পণ্ডিত ও অপর পার্শ্বে একজন মৌলবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। হেষ্টিংসের অনুরোধে, স্বনামখ্যাত স্যর উইলিয়ম জোন্স সাহেব এই এসিয়াটিক-সোসাইটী সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

হেষ্টিংসের সহিত, কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী আলিপুরের স্মৃতি ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এই আলিপুরেই হেষ্টিংস সাহেব বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বাস-ভবন—আজও "হেষ্টিংস-হাউস" নামে পরিচিত। এই বাড়ীটি লর্ড কর্জ্জনের চেষ্টায়, নবভাবে সংস্কৃত হইয়াছে। ইদানীং ইহা কলিকাতায় সমাগত, ভারতীয় সামন্তরাজগণের আবাস

মধ্য দিয়া যে দেবদারু-বৃক্ষ-শোভিত একটী বর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে, ইহারই সান্নিধ্যে এই দ্বন্দ যুদ্ধ হয়। এই জন্য এই দেবদারু-ফটক Duel Avenue নামে এখনও পরিচিত। এই দ্বন্দ যুদ্ধে ফ্রান্সিস, হেষ্টিংসের গুলিতে আহত হন।

বাটীরূপে পরিণত হইয়াছিল। হেষ্টিংসের আমলের অনেক পুরাতন বৃক্ষ, ইতিপূর্ব্বে এই স্থানে দেখা যাইত। এখনও তাঁহার আমলের পুরাতন "লেক্" বা ঝিলটী বর্ত্তমান।

কেবল হেষ্টিংস নহেন, ফ্রান্সিসের স্মৃতির সহিতও এই আলিপুরের নাম বিজড়িত। নবাব মীরজাফরও বহুদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের তিন বৎসর পরে, যখন মীরজাফর বাঙ্গলার মসনদ্ হইতে, গবর্ণর ভান্সিটার্ট কর্ত্তৃক অপসৃত হন এবং তাঁহার জামাতা মীরকাশেম বাঙ্গলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন, সেই সময়ে বৃদ্ধ নবাব গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে আলিপুরে আগমন করেন।

নবাব মীরজাফর, আলিপুরের কোন্ স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে একটু মত বিভিন্নতা আছে। কেহ কেহ বলেন এগ্রিহার্টিকল্‌চরাল সোসাইটীর উদ্যানের অধিকৃত স্থানে তাঁহার প্রাসাদ ছিল—আর মণিবেগম বর্ত্তমান জুলজিক্যাল-গার্ডেনের অধিকৃত স্থানে বাস করিতেন। আবার অন্য মতে, বর্ত্তমান জজ-আদালত যেস্থানে, সেইস্থানেই বাঙ্গালার নবাব বাস করিতেন। পরে এই সমস্ত সম্পত্তি, তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে দান করিয়া যান।* এই কথাই যেন প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে, মীরজাফর আবার বাঙ্গলার মসনদে বসেন। এই সময়ে আলিপুরের সম্পত্তি তাঁহার হস্তান্তরিত হয়। এ সম্পত্তি তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে দান করেন, কি হেষ্টিংস নবাবের নিকট হইতে ইহা কিনিয়া লয়েন, তাহার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইহার কয়েক মাস পরে আমরা দেখিতে পাই—"হেষ্টিংস সাহেব কলিকাতা-বোর্ডের নিকট "টলিস্-নালার" উপর—কালিঘাটের সন্নিকটে, একটী পোল

---

* মীরজাফর, লর্ড ক্লাইভের প্রতিও যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি ক্লাইভকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ, এক লক্ষ সোণার মোহর, পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরত ইত্যাদি বাবত প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন। কারণ ক্লাইভের জন্যই তিনি বাঙ্গলার মসনদে বসিতে পান। তাঁহার দানপত্রের একাংশের ইংরাজী অনুবাদ এই, Three lacs and fifty thousand Rupees in money, fifty thousand rupees in Jewels and one lac in Gold Mohurs, in all five lacs of rupees in money and effects, to the light of my eyes, the Nabob farm in war, Lord Clive the Hero—"Calcutta Past and Present by Miss Blechynden."

কিন্তু উদার-হৃদয় লর্ড ক্লাইভ নবাব মীরজাফরের এ দান নিজে গ্রহণ করেন নাই। আহত সৈনিক ও তাহাদের বিধবাদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাদের সাহায্য জন্য তিনি একটী ফণ্ডের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নবাব প্রদত্ত এই পাঁচ লক্ষ টাকা সেই ফণ্ডে দান করেন।

নির্ম্মাণ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণ এই স্থানে পোলটী নির্ম্মিত হইলে, তাঁহার বাগান-বাটীতে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে।*

আজকাল যাহা "হেষ্টিংস-হাউস" বলিয়া পরিচিত, তাহা হেষ্টিংসেরই নির্ম্মিত। তবে তখন ইহার এরূপ অবস্থা ছিল না। বর্ত্তমানে আবার লর্ড কর্জ্জন, ইহার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। হেষ্টিংস-হাউসের বর্ত্তমান বাটীর সান্নিধ্যে, আর একটী দ্বিতল বাটী ছিল। হেষ্টিংস প্রথমে সেই বাটীতেই বাস করিতেন। পরে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, বর্ত্তমান সুবৃহৎ বাটিটী নির্ম্মিত হয়।

১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা গেজেটে, নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হয়—"ওল্ডকোর্ট-হাউস ষ্ট্রীটে, মেসার্স উইলিয়াম ও লি এণ্ড কোম্পানী—আগামী ১০ই মে তারিখে (১৭৮৫) বঙ্গের গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের সম্পত্তির কয়েকটী অংশ প্রকাশ্য-নিলামে বিক্রয় করিবেন। ইহা তিনটী "লটে" বা অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ক্রেতাগণ ইচ্ছা করিলে, উক্ত কোম্পানীর আফিসে এই "লট" বা বিভাজিত অংশগুলির নক্সা দেখিতে পাইবেন।"

লট নং ১—"প্যাডক-গেটের সম্মুখের দিকে একটী বাড়ী। এই বাড়ীতে একটী হল আছে। হলের চারিদিকে বারান্দা। এই বাটীর সান্নিধ্যে দুইটী ছোট ছোট "বাঙ্গলো" আছে। জমীর পরিমাণ ৬৩ বিঘা। ইহার কতকাংশ তৃণাচ্ছাদিত জমী। বাকী অংশ নানাবিধ ফলন্ত বৃক্ষ-পরিপূর্ণ উদ্যান। বাগানের বৃক্ষগুলির অধিকাংশই ফলের গাছ। বাগানের সীমার মধ্যে একটী বৃহৎ পুষ্করিণীও আছে।"

লট নং ২—একটী দ্বিতল বাটী। প্রত্যেক তলেই একটী করিয়া সুবৃহৎ হল-কামরা। হল-কামরার পার্শ্বে দুইটী বড় বড় ঘর। প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়ি। মাদ্রাজী-চুণে দেয়ালগুলি চূণকাম করা। নীচের হল কামরার পার্শ্বে, চারিটী শয়ন-গৃহ। শয়নগৃহের পার্শ্বেই স্নানাগার।

* তখন টালিসনালা বা আদিগঙ্গা এত সংকীর্ণকায়া ছিল না। ইহার উপরে সেই সময়ে যে পোল নির্ম্মিত হয়, তাহা এখন নাই। কালীঘাটের গঙ্গা, আদিগঙ্গা বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান পুল আধুনিক। হেষ্টিংসের নির্ম্মিত, "ঝোলা-পুল" আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। সেই পুল এক দিন সহসা ভাঙ্গিয়া পড়ায়, বর্ত্তমান পুল তৈয়ারি করা হয়। অনেকে মনে করেন, হেষ্টিংসের নির্ম্মিত পুলই বর্ত্তমান জিরাট-ব্রিজ—যাহা বেলভেডিয়ার যাইবার পথের উপর সংস্থিত। কিন্তু জিরাট-ব্রিজ, ইহার অনেক পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সমস্ত অট্টালিকাটী মান্দ্রাজী-চূণে "পঙ্খের" কাজ করা। চৌদ্দটী ঘোড়া রাখিবার উপযুক্ত সুবৃহৎ আস্তাবল ও চারিখানি কৌচগাড়ি রাখিবার গৃহ। এই পাকা-আস্তাবল ভিন্ন আরও একটী চালায় নির্ম্মিত আস্তাবল আছে। শেষোক্ত আস্তাবলে বারটী ঘোড়া ও ছয়খানি গাড়ি রাখা যাইতে পারে। জমীর পরিমাণ ৪৬ বিঘা।

লট নং ৩—প্যাড্‌ক-গেট সম্বলিত ৫২ বিঘা জমী। এই জমীর চারিদিক কাষ্টের রেলিং দেওয়া।

হেষ্টিংস সাহেব, বিলাতে তাঁহার পত্নীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারও এক অংশে আছে,—"আমার জমীজমা বাগান প্রভৃতি তিনটী অংশে বিভক্ত করিয়া বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছি। পুরাতন বাটী ও তৎসংলগ্ন বাগান লইয়া একটী লট্ হইয়াছে। নূতন বাড়ী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বহির্বাটীগুলি দ্বিতীয় লট্ হইয়াছে। প্যাড্‌ক-সম্বলিত জমীখণ্ড তৃতীয় লটে বিভক্ত। আমার সমস্ত অশ্বগুলিই, আমি ইতিপূর্ব্বে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি।"

এই জমীগুলির অবস্থান স্থান নির্দ্দেশে কোন গোলযোগই হয় না। আমরা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানগুলি দেখিয়াছি। তখন যাহা দেখিয়াছিলাম, এখন আর তাহা নাই। পূর্ব্বে যেস্থানে বহু বিঘাব্যাপী আরারুট-বাগান ছিল, এখন সেইস্থানে অসংখ্য অট্টালিকা দেখা দিয়াছে। বনজঙ্গল পূর্ণ উদ্যান ভূমি, এক্ষণে আলিপুরের "ছোট-চৌরঙ্গীতে" পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান জজকোর্টের সম্মুখবর্ত্তী স্থানটী সম্পূর্ণরূপে অট্টালিকা শূন্য খালি জমী ছিল। এখানে তখন আরারুটের চাষ হইত।

হেষ্টিংসের এই সম্পত্তির প্রথম দুইটী লটের ক্রেতা, মেসার্স টর্ণার ও জ্যাকসন। আরারুট বাগানের প্লট, হনিকুম্ব বলিয়া একজন সাহেব ক্রয় করেন। এই হনিকুম্ব সাহেব, সেকালের সুপ্রীম-কোর্টের একজন এ্যাটর্ণি ছিলেন। ইহার পর ইহা স্পিড্ সাহেবের দখলে আসে। স্পিড্ সাহেব, এইস্থানে আরারুটের চাষ আরম্ভ করেন ও ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। তাঁহার আমলে ও তাহার পরে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইহা—"The Penn" এই নামে পরিচিত ছিল। প্রস্তর-ফলক-মণ্ডিত "পেনের" এই পুরাতন গেটটী আমরা দেখিয়াছি। এই পুস্তক মধ্যে অতি প্রাচীন এবং বর্ত্তমানকালের এই হেষ্টিংস-হাউসের দুইখানি চিত্র প্রদান করা হইল। গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেব, বেলভেডিয়ারে বাস করিতেন বলিয়া একটা

জনপ্রবাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা অমূলক জনরব মাত্র। *

লর্ড ক্লাইভ, ভারতে ব্রিটিশাধিকারের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণরগণের মধ্যে, ওয়ারেণ হেষ্টিংসই সেই ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করেন। দেশের মধ্যে—"ডবল-গবর্ণমেণ্ট" অর্থাৎ নবাবী ও ইংরাজ শাসন দুইই প্রবর্ত্তিত থাকায়, মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। হেষ্টিংসের চেষ্টায়, সে অনর্থের প্রতিকার হয়। রাজস্ব-সম্বন্ধে নানাবিধ সুব্যবস্থা প্রণোদিত হওয়ায়, প্রজাগণ কোম্পানীর অধীনে শান্তির সুখময় ক্রোড়ে বিরাজ করিতে থাকে। হেষ্টিংসের একাধিপত্যের একান্ত বিরোধী স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, ১৭৮০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া যান। ইহার পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর কাল, হেষ্টিংস স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া, বঙ্গদেশে ইংরাজ-শাসনের একটা স্থায়ী শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। যে ইংরাজ কোম্পানী, এত-দিন ধরিয়া দেশীয় শাসনকর্ত্তাদের হস্তে নানা প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়া আপনাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন—তখন তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা হইয়া উঠিলেন। ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে, হেষ্টিংস বঙ্গদেশের নিকট চিরবিদায় লইয়া বিলাত-যাত্রা করেন। কিন্তু হায়! জীবনের শেষ অবস্থাতেও তিনি আদৌ সুখী হন নাই। পার্লামেন্টের মহা-বিচারে, দীর্ঘকাল ধরিয়া জড়িত থাকায়, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া যায়। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের "ইম্‌পিচ্‌মেণ্ট" বা মহা-বিচার সম্বন্ধীয় ঘটনা, সুশিক্ষিত পাঠকের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে ও পরবর্ত্তীকালে প্রাচীন কলিকাতার সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথা।

(১৭৮৪ হইতে ১৭৯৭ পর্য্যন্ত)

১৭৮৪ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, কলিকাতা-গেজেট প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা তখনকার কালে আধা-সরকারী ও আধা সাধারণ সংবাদ পত্র ছিল। পুরাতন কলিকাতা গেজেটের জীর্ণপত্রগুলি অনুসন্ধান করিলে, এক শত ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বের অনেক ঘটনা জানিতে পারা যায়। কাজেই আমরা ১৭৮৪ হইতে ১৭৯৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, প্রাচীন

* Dr. Busteed's letter to the Calcutta "Englishman" dated 17th May, 1872

কলিকাতার এই একমাত্র সংবাদ-পত্রের জীর্ণপত্রগুলির মধ্য হইতে কতকগুলি কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপারের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। পাঠক ইহা হইতে ওয়ারেণ-হেষ্টিংস ও তাঁহার পরবর্ত্তী আমলের অর্থাৎ এক শত ত্রিশ বৎসরের পুরাতন কথা জানিতে পারিবেন। "আইন-আকবরীর" অনুবাদক, পারস্যভাষাবিৎ, সুপ্রসিদ্ধ ফ্রান্সিস গ্লাডউইন সাহেব সর্ব্বপ্রথমে এই গেজেটের সম্পাদক পদে ব্রতী হন। ধরিতে গেলে, ইহাই প্রাচীন কলিকাতার প্রথম সরকারী সংবাদপত্র।

কলিকাতায় পর্টুগীজ গোরার উৎপাত।

সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল সাহেবের নিকট গ্রাণ্ডজুরীর এক আবেদন পত্র পৌঁছিয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম এই—"পর্টুগীজ জাহাজের গোরাগণ, সহরে নামিয়া নানাবিধ উৎপাত অত্যাচার করে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, এই সকল জাহাজের অধ্যক্ষেরা, যেন নিম্নলিখিত আদেশটী বিশেষ মনোযোগের সহিত পালন করেন। অর্থাৎ প্রাতঃকালে সাতটার পূর্ব্বে, কোন পর্টুগীজ মাঝি-মাল্লা, সহরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সন্ধ্যা পাঁচটার পর সহর ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে জাহাজে উঠিতে হইবে। এই বিধানের লঙ্ঘন করিলে, তাহারা সহরের পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফাটকে আবদ্ধ থাকিবে।" (11-3—1784)*

ডাকবন্দোবস্ত রহিত।

"আগামী ৩০এ জুন হইতে অনারেবল কোম্পানী বাহাদুরের ডাক বেহারাগণ ডাকের কার্য্য বন্ধ করিবে।" (10-6-1784)

তখন ডাক-বিভাগের কার্য্য প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। ডাকের মাশুল প্রভৃতি কিরূপ বেশী ছিল—কোন স্থান হইতে কত দিনে ডাক যাইত, তাহার পরিচয় পাঠক পরে পাইবেন। ডাকবেহারাদের চলাচল বন্ধ করিবার কারণ, বর্ষা সমাগমে পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ষার সময়ে সেকালে ডাক-চলাচল বন্ধ থাকিত।

উক্ত বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বরে এক সরকারী আদেশ প্রচারিত হয়—"আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কোম্পানী-বাহাদুরের ডাকবেহারারা পুনরায়

* প্রত্যেক বিষয়ের শেষে বন্ধনীর মধ্যে, যে তারিখ ও বৎসর আছে, তাহাই সেকালের গেজেটের তারিখ। পাঠক উল্লিখিত আদেশ হইতে দেখিতে পাইবেন—কলিকাতা সহরে তখন একজন পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই সহর-কোতোয়ালির কর্ত্তা ছিলেন।

কার্য্য আরম্ভ করিবে।" এই আদেশ হইতে জানিতে পারা যায়—জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, এই চারিমাস ডাক-বিভাগের কার্য্য বন্ধ থাকিত।

শিমুলিয়ায় খুন।

শিমুলিয়ার—হরিনারায়ণ শেঠ নামক এক ব্যক্তিকে, কোন দুর্বৃত্ত অতি নিষ্ঠুর ভাবে খুন করিয়া গিয়াছে। দত্তরাম নাপিত বলিয়া একজনের উপর সন্দেহ হওয়ায়, সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল আদেশ করিতেছেন—"যে ব্যক্তি উক্ত দত্তরামকে ধরিয়া, সহরের বা মফঃস্বলের কোন আদালতে হাজির করিয়া দিতে পারিবে বা তাহার গতিবিধি সম্বন্ধে পুলিশ-আফিসে সংবাদ দিতে পারিবে, তাহাকে সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল সাহেব, দুইশত সিক্কা টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন।" (28-9-1784)

গেজেটের মধ্যে নাম আছে—"সিমুলশা"। সম্ভবতঃ এটী বানানের ভ্রম-প্রমাদ। সেকালে সহরের মধ্যে বা আশে পাশে, শিমুলিয়া ব্যতীত শিমুলশা নামের কোন স্থান ছিল না। এই সরকারী বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারা যায়—সেকালের খুনের পুরস্কার ঘোষণা, পুলিশ হইতে না হইয়া, গবর্ণর-জেনারেল সাহেবের দপ্তর হইতেই হইত।

দরোয়ান-খুন।

গত রাত্রের প্রভাতে, মার্টিন সাহেবের দরোয়ানকে কে অতি নৃশংস ভাবে খুন করিয়া গিয়াছে। সাহেবের বেহারারা, কাজকর্ম্ম সারিয়া প্রথম প্রহরের পর, সাহেবের কুঠী ত্যাগ করে। এই সময়ে দরোয়ান, তাহাদের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। সাহেবের সর্দ্দার-বেহারা, সাহেবের নিকট দ্বিতলেই ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কোন প্রয়োজনে সহসা নীচে আসায়, সর্দ্দার-বেহারা দেখিতে পায়, মেজের উপর রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। আর দরোয়ানের ঘর হইতেই সেই রক্ত, স্রোত বাহির হইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া ভয় পাইয়া, সে খিদমতগার ও হুক্কাবরদারকে জাগাইয়া, এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখে, যে দরোয়ানের গলা সম্পূর্ণরূপে কাটা। আর তাহা হইতেই এই রক্তধারা বাহির হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দরোয়ান যে গৃহে থাকিত, তাহার ঠিক উপরের ঘরেই মার্টিন সাহেব ছিলেন। তিনিও কোন রূপ ধস্তাধস্তির আওয়াজ শুনেন নাই। দরোয়ান যে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অথচ অন্য কোনও ব্যক্তির উপর এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনরূপ সন্দেহও হইতেছে না। (8-4-1784)

লারকিন্স লেনে এই হত্যাকাণ্ড হয়। সে সময়েও যে হুকাবরদারগণ সাহেবদের বাটীতেই থাকিত ও রাত্রিকালে প্রভুর তামাকু সাজিত, তাহাও এই ঘটনা হইতে জানা যায়।

হেষ্টিংস ও তাঁহার নিয়োগকর্ত্তাগণ।

"গত নবেম্বর মাসে বিলাতের কোর্ট অব্ ডাইরেক্টার সভা, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল (মিঃ হেষ্টিংসকে) ধন্যবাদ দিয়া ও তাঁহার কৃতকার্য্যসমূহের পোষকতা করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছেন—যতদিন পর্য্যন্ত না বাঙ্গলার ও ভারতীয় ইংরাজাধিকারসমূহে পূর্ণশান্তি স্থাপিত হয়, ততদিন তিনি যেন পদত্যাগ না করেন।" (24-6-1784)

বজরা-ডুবি ও সাহেবের মৃত্যু।

মার্টিন সাহেব তাঁহার বজরা করিয়া, চাঁদপাল ঘাট হইতে যাত্রা করেন। তখন ভোর পাঁচটা। একে ভোরের অন্ধকার, আবার তাহার উপর চারিদিকে কোয়াসা। সাহেব মাঝিদিগকে নিষেধ করেন, তাহারা যেন খুব সাবধানে জাহাজের পথ ছাড়িয়া, ফাঁকা পথে নৌকা চালায়। কিন্তু দাঁড়িমাঝিরা তাঁহার উপদেশমত কার্য্য না করায়, বজরা উল্‌টাইয়া যায়। মার্টিন সাহেব বজরার মধ্যে ছিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার হেড্-বেহারাও ছিল। বজরা ডুবির পর, বেহারা ও সাহেব দুই জনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মার্টিন সাহেবের মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও পাওয়া যায় নাই। বেহারার মৃতদেহ হোয়েলার সাহেবের বাগানের ঘাটে পাওয়া গিয়াছে। নৌকার দাঁড়ি-মাঝিরা সকলেই নিরুদ্দেশ। (16-9-1784)

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মৃত্যু।

গত শনিবার প্রাতে লেফ্‌টেনাণ্ট হোয়াইটের মৃত্যু হইয়াছে। শুক্রবার সন্ধ্যার সময় তিনি একটী দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন ও দুর্ভাগ্যক্রমে আততায়ীর গুলিদ্বারা আহত হন। এই আঘাতের ফলেই তাঁহার জীবন বায়ু দেহত্যাগ করিয়াছে। (27-7-1784)

গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের সহিতই যে তাহার কৌন্সিলের সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইয়াছিল—তাহা নহে। সেকালে এই নিয়ম ছিল, প্রকাশ্যে বা অপর কাহারও কাছে, কেহ কাহাকে কোনরূপ অপমান-কর বা নিন্দাসূচক কথা বলিলে—নিন্দিত ও অপমানিত ব্যক্তি তাঁহার
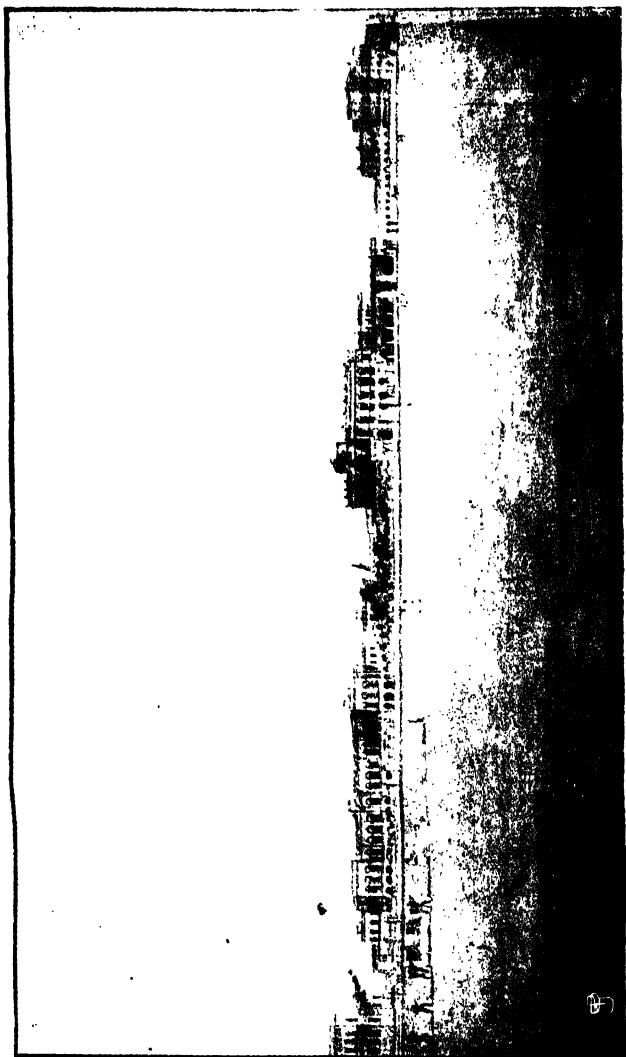
আততায়ীর সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। তরবারি এবং অধিকাংশ স্থলে পিস্তল লইয়া এই যুদ্ধ হইত। এই যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের নির্ব্বাচিত এক একজন সহকারী বা Seccond থাকিতেন। ইঁহারা দেখিতেন, যুদ্ধার্থীগণের মধ্যে কেহ কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন কিনা? এই ব্যাপারে যে কোন পক্ষ আহত হইতেন, তাঁহার দলের লোক তখনই তাহাকে উঠাইয়া লইয়া আসিতেন। তখনকার আইনে এরূপ দ্বন্দযুদ্ধ-প্রথা দূষণীয় ছিল না।

আলিপুরে, গবর্ণর হেষ্টিংসের সহিত যখন তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্য ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তখন কর্ণেল পিয়ার্স, হেষ্টিংসের "সেকেণ্ড" বা সহকারী ছিলেন। কর্ণেল ওয়াটসন, ফ্রান্সিস সাহেবের সহায়তা করেন। এই কর্ণেল ওয়াটসন, কোম্পানী-বাহাদুরের সেনাবিভাগের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। খিদিরপুরের গবর্ণমেণ্ট ডক্ইয়ার্ড, ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। খিদিরপুরে তিনি একটী বাজার বা গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাজার আজও "ওয়াটগঞ্জ" বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

সেকালের গাড়ী ঘোড়া।

একটী ফিটন, একটী চার-স্প্রিংওয়ালা বগী, আর একখানি দুই স্প্রিংওয়ালা বগী, একখানি সুন্দর পাল্‌কী (Lady's Palanquin) রাধাবাজারে মিঃ ম্যানের দোকানে বিক্রয়ার্থে মজুত আছে। এই মালগুলি সমস্তই নূতন। (6-5-1784)

এই বিজ্ঞাপন হইতে দেখা যায়, তখনকার দিনে বগী, চিরেট ও পাল্কীর ব্যবহারাদি বেশী ছিল।

সেকালের বেঙ্গলব্যাঙ্ক।

সেকালে (১৭৮৪ খৃঃ) কলিকাতায় একটী বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব ছিল। বর্ত্তমান বেঙ্গলব্যাঙ্ক, তাহারই উত্তরাধিকারী কিনা, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তখন টিপুসুলতানের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধে অনেক ইংরাজ-সেনা, টিপুর হস্তে বন্দী হয়। টিপু, পরিশেষে তাহাদের স্বাধীনতা দান করেন। এই যুদ্ধে যাহারা মরিয়া গিয়াছিল, তাহাদের পরিবারবর্গের ও দুস্থ সেনাগণের সাহায্যার্থে, একটী চাঁদার ভাণ্ডার খোলা হয়। সমস্ত চাঁদার টাকা "বেঙ্গল ব্যাঙ্কে" গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল ও এই বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গৃহেই চাঁদাদাতাগণের সভা হইয়াছিল। (27-5-1784)

সেকালের ডাকঘরের কথা।

বৃহস্পতিবার (২রা ডিসেম্বর ১৭৮৪)।

কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহের মধ্যে ডাকের খরচা।

স্থানের নাম	২॥ সিক্কা টাকা ওজনের চিঠি	২॥ ও তদূর্দ্ধ সিক্কা টাকার ওজন	২॥ হইতে ৪॥ সিক্কা ওজন	৪॥ হইতে ৫॥ পর্য্যন্ত	৫॥ হইতে ৬॥ পর্য্যন্ত
	মাশুলের হার	মাশুলের হার	মাশুলের হার	মাশুলের হার	মাশুলের হার
বারাকপুর	/০ আনা	৵০ আনা	৶০ আনা	।০ আনা	।/০ আনা
হুগলী	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,,	।/০ ,,
চন্দননগর	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,,	।/০ ,,
বর্দ্ধমান	৵০ ,,	।০ ,,	।৵০ ,,	॥০ ,,	॥৵০ ,,
মুরশীদাবাদ	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,,	॥৵০ ,,
রাজমহল	৶০ ,,	।৵০ ,,	॥/০ ,,	৸০ ,,	৸৶০ ,,
ভাগলপুর	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,,	৸৶০ ,,
দিনাজপুর	।০ ,,	॥০ ,,	৸০ ,,	১৲ টাকা	১।০ টাকা
মুঙ্গের	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,,	ঐ
পাটনা	।/০ ,,	॥৵০ ,,	৸৶০ ,,	১।০ টাকা	১॥/০ টাকা
বক্সার	।৵০ ,,	৸০ ,,	১৵০ ,,	১॥০ টাকা	১৸৵০ টাকা
বারাণসী	।৶০ ,,	৸৵০ ,,	১।/০ ,,	১৸০ টাকা	২৶০ টাকা
রাজাপুর	৵০ ,,	।০ ,,	।৵০ ,,	॥০ আনা	॥৵০ আনা
ঢাকা	৶০ ,,	।৵০ ,,	॥/০ ,,	৸০ ,,	৸৶০ আনা
চট্টগ্রাম	।৵০ ,,	৸০ ,,	১৵০ ,,	১॥০ টাকা	১৸৵০ টাকা
কুলপী	৵০ ,,	।০ ,,	।৵০ ,,	॥০ আনা	॥৵০ আনা
মেদিনীপুর	,, ,,	,, ,,	,, ,,	॥০ ,,	॥৵০ ,,
বালেশ্বর	,, ,,	,, ,,	,, ,,	॥০ ,,	॥৵০ ,,
কটক	৶০ ,,	।৵০ ,,	॥/০ ,,	৸০ ,,	৸৶০ ,,
গঞ্জাম	।/০ ,,	॥৵০ ,,	৸৶০ ,,	১।০ টাকা	১॥/০ টাকা

সাধারণকে নোটিস দেওয়া যাইতেছে—যে সাড়ে নয় ইঞ্চি লম্বা ও চার ইঞ্চি চওড়ার অতিরিক্ত আয়তনের পত্র, আগামী ৩০ নবেম্বরের পর হইতে প্রতিদিন আর লওয়া হইবে না। সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রে কেবল এইরূপ পত্র লওয়া হইবে। ইহার অতিরিক্ত ওজনের পত্র ও পার্শেল ডাকে প্রেরিত না হইয়া, বাঙ্গিতে যাইবে।

জেনারেল পোষ্ট অফিস। সি, কক্‌রেল
(২০ নবেম্বর ১৭৮৪।) পোষ্টমাষ্টার জেনারেল।

ডাকের খরচ।

তখন দেশের নানাস্থানে, কোম্পানী-বাহাদুরের ডাক-চৌকী ছিল। এই সমস্ত ডাক-চৌকীতে পাল্‌কী ও বেহারা থাকিত। এই ডাক-চৌকী সমূহ, পোষ্টাফিস বিভাগের অধীন ছিল। কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে, অবস্থাপন্ন লোকে এই সমস্ত ডাক-পালকীর সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইহাদের ভাড়াও বড় কম ছিল না। সরকারী-ডাক ছাড়া, বাহকগণ ভ্রমণকারীর মালপত্রও লইত। এইরূপ মালের-ডাককে তখন "বাঙ্গি" বলিত। নিম্নে আমরা একটী ভাড়ার তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে সেকালের লোকের ভ্রমণের ও মালের খরচা সমেত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইতে কত টাকা পড়িত, পাঠক তাহার আভাস পাইবেন। কলিকাতা হইতে এই এই ডাক কাশী পর্য্যন্ত যাইত।

কলিকাতা হইতে	ভাড়া টাকা	কলিকাতা হইতে	ভাড়া টাকা
চন্দননগর কিম্বা ঘিরেটি ও	২৪॥০	রাজমহল	২৫৭৵০
চুঁচুড়া, হুগলী, বাঁশবেড়ে মির্জ্জা-	৪৬।০	ভাগলপুর	৩৫৪৵০
পুর (উত্তর পশ্চিমের নহে)	৭৬৲	মুঙ্গের	৪০৬।০
বহরমপুর কালকাপুর ময়দাপুর	১৫৯॥০	পাটনা বাঁকিপুর	৫৪০৲
কাশিমবাজার মুরশীদাবাদ মুরাদবাগ	১৫৯॥০	দানাপুর বক্সার	৫৫৩॥০ ৬৬৪৵০
সুতী	২০৮৲	বেনারস	৭৬৪৲

উল্লিখিত তালিকায়, পালকী-বেহারার ভাড়া ও যাত্রীর লগেজ বা মালের ভাড়া একত্র করিয়া দেখান হইয়াছে। তখনকার অর্থাৎ একশত ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে, কাশী যাইতে হইলে সাত শত চৌষট্টি টাক', পালকী-ডাক ব্যয় পড়িত। তখন রাজমহল ও ভাগলপুর হইয়া বেনারস যাওয়ার প্রথা ছিল। (৬।১।১৭৮৫)

নোটের প্রথম প্রচলন।

ইংরাজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এদেশে ব্যাঙ্কও স্থাপিত

হইয়াছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসও তাহার পরবর্ত্তী কালে, আমরা সেকালের কলিকাতায় মধ্যে "বেঙ্গল" ও "জেনারেল" নামক দুইটী ব্যাঙ্কের নাম দেখিতে পাই। বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক দুইজন স্বাধীন ব্যবসায়ীর সম্পত্তি। তাহাদের নাম জ্যাকব রাইডার ও এডওয়ার্ড হে। ইহাঁদের নামেই ব্যাঙ্কের নোট প্রভৃতি চলিত। এই বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের একটী বিজ্ঞাপন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত রাইডার ও হে সাহেব সাধারণে প্রচার করিতেছেন—"অতঃপর এই বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, নোট-প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বত্বাধিকারীদের স্বাক্ষরযুক্ত পাঁচশত টাকা, একশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা ও এক মোহরের নোট সাধারণে প্রচলিত হইল।"

"জেনারেল-ব্যাঙ্ক" ইহার পরে স্থাপিত হয়। বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক যেমন দুইজন ব্যক্তির সম্পত্তি, জেনারেল-ব্যাঙ্ক সেরূপ ছিল না। ইহা সাধারণের নিকট হইতে সেয়ার লইয়া প্রতিষ্ঠিত। (১৮।৮।১৭৮৫)

ভয়ানক চুরি।

রামকান্ত মুন্সী নামক কলিকাতার জনৈক ধনী অধিবাসীর, বনমালী বলিয়া একজন ভৃত্য ছিল। কোন দোষের জন্য রামকান্ত, বনমালীকে কর্ম্মে জবাব দেয়। বনমালী জানিত, তাহার প্রভুর গুপ্ত সম্পত্তি কোথায় থাকে। সে কলিকাতা সহরের বদমায়েসের আড্ডায় ঢুকিয়া, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তার জন্য, উপযুক্ত লোক খুঁজিতে থাকে। মুন্সীবাবুর বাটী প্রহরী-রক্ষিত, কাজেই কেহ সহজে স্বীকৃত হইতে চাহিল না। সেই সময়ে শ্রীরামপুরে গোবিন্দরাম চক্রবর্ত্তী বলিয়া একজন নামজাদা সিঁদেল-চোর ছিল। আগে লোকটা কলিকাতাতেই থাকিত, কিন্তু ইংরাজ-পুলিশ তাহাকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দেওয়ায়, সে শ্রীরামপুরে দিনেমার সেটেল্‌মেণ্টে আশ্রয় লয়। বনমালী, অবশেষে এই গোবিন্দরামের নিকট গিয়া তাহার পূর্ব্ব মনিবের সম্পত্তি চুরির প্রস্তাব করে। গোবিন্দরাম তাহার দুইজন সঙ্গীকে লইয়া গুপ্তভাবে কলিকাতায় আসে ও বনমালীর সহিত পরামর্শ মতে, চুরী সম্বন্ধে সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করে। একদিন গোবিন্দরাম সকলকে লইয়া কালীঘাটে চলিয়া যায়। কালীঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার পর সে তাহার সঙ্গীদের ও বনমালীকে লইয়া একটু রাত্রি হইলে মুন্সীর বাগানের প্রাচীরের কাছে উপনীত হয়। তৎপরে সে মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা কোন কিছু করিয়া, তাহার সঙ্গীদের বলে,—"আর কোন

ভয় নাই। ধুলোপড়া ছড়াইয়া দিয়াছি। বাড়ীর সকলে নিশ্চয়ই মড়ার মত ঘুমাইবে। যা তোরা সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া আয়।" বনমালী পাঁচিল টপ্‌কাইয়া, তাহার সঙ্গীদের সহিত বাগানের ভিতর পড়ে। বাড়ীর ঘর দ্বার সবই তার জানা শুনা ছিল, সুতরাং সে অতি সহজে যে ঘরে টাকা থাকিত, সেই ঘরে যায়। সেই ঘরের মধ্যে, কর্ত্তা স্বয়ং ঘুমাইতেছিলেন। বাড়ীর মধ্যেও চাকর বাকর প্রভৃতি লইয়া ৬৪ জন লোক ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বনমালী ও গোবিন্দরাম অতি সহজেই সিন্দুক খুলিয়া সমস্ত টাকা কড়ি সংগ্রহ করিয়া পলাইয়া যায়। গোবিন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাহার বখরা লইয়া, সেই রাত্রেই শ্রীরামপুরে চলিয়া গিয়াছিল। শীতকাল, পৌষমাস। কাজেই রাত্রে এ ঘটনাটা কোনরূপে প্রকাশ হইল না। পরদিন প্রাতে সকল কথা জানিতে পারিয়া, রামকান্ত মুন্সী প্রধান সহর কোতোয়াল, মট সাহেবকে সংবাদ দেন। মট সাহেব আসিয়া অকুস্থল দেখিয়া বলেন—"জানাশুনা লোকের সহায়তা ভিন্ন একাজ হয় নাই।" পরিশেষে বনমালীর উপর সন্দেহ হওয়ায়, তাহাকে পাকড়াও করা হয়। বনমালী সমস্ত দোষ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ঘাড়ে চাপায় ও সমস্ত ঘটনা বলিয়া ফেলে। মিঃ বাই, তখন শ্রীরামপুর দিনেমার সেটেল্‌মেণ্টের কর্ত্তা। ইংরাজ-পুলিশ পত্র লিখিয়া মিঃ বাইয়ের সহায়তায় গোবিন্দরামকে গ্রেপ্তার করান। গোবিন্দরামও তাহার সঙ্গীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে আটক করিয়া রাখা হয়। বনমালীও হাজতে যায়। শেষ নিরুপায় হইয়া কঠোরশাস্তির ভয়ে, গোবিন্দরাম হাজতের মধ্যে গলায় দড়ি দেয়। (২০।১।১৭৮৫)

সেকালের বজরা ও নৌকার ভাড়া।

ডাক-পালকীতে যাইবার খরচপত্রের একটী তালিকা আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। তাহা হইতে পাঠক স্থলপথে যাতায়াতের ভাড়ার পরিমাণ জানিতে পারিয়াছেন। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে পাঠক জানিতে পারিবেন, সেকালে বজরা, নৌকা ও বড় বোট সমূহের ভাড়া কিরূপ ছিল।

তখন কলিকাতা পুলিশ-আফিস, এই সমস্ত বোট ও বজরার বন্দোবস্ত করিতেন। পুলিসের অধীনেই এই বোট-বিভাগটী ছিল। পুলিস জানিয়া শুনিয়া, বিশ্বাসী লোক দেখিয়া দাঁড়ি-মাঝি নির্ব্বাচন করিতেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দের ১০ মার্চ্চ তারিখের এক পুলিশ বিজ্ঞাপনী হইতে আমরা এই ভাড়ার ও কলিকাতা হইতে নদীপথে নানা স্থানে পৌঁছিবার সময় জানিতে পারি।

(স্থান) কলিকাতা হইতে	সময়	মোট ও বজরার প্রকার-ভেদ	দৈনিক ভাড়া
" বহরমপুর	২০ দিন	৮ দাঁড়	২৲
" মুরশীদাবাদ	২৫ "	১০ "	২৷৷০
" রাজমহল	৩৭৷৷ "	১২ "	৩৷৷০
" মুঙ্গের	৪৫ "	১৪ "	৫৲
" পাটনা	৬০ "	১৬ "	৬৲
" বেনারস	৭৫ "	১৮ "	৬৷৷০
" কানপুর	৯০ "	২০ "	৭৲
" ফৈজাবাদ	১০৫ "	২২ "	৭৷৷০
" মালদহ	৩৭৷৷ "	২৪ "	৮৲
" রঙ্গপুর	৫২৷৷ "	মালবোঝাইবোট	
" ঢাকা	৩৭৷৷ "	২৫০ মণ	২৯৲
" লক্ষ্মীপুর	৪৫ "	৩০০ "	৩৪৲
" চট্টগ্রাম	৬০ "	৪০০ "	৪০৲
" গোয়ালপাড়া	৭৫ "	৫০০ "	৫০৷৷০

উল্লিখিত তালিকা হইতে একটা আনুমানিক হিসাব করা যাইতে পারে। ১৮ দাঁড় বজরায়, কাশী যাইতে হইলে ৭৫ দিনে পৌঁছিত, প্রতিদিন ৬৷৷০ টাকা হিসাবে এই পঁচাত্তর দিনে প্রায় ৪৮৮৲ টাকা পড়িত। দাঁড়ী-মাঝির সংখ্যা যত কম হইত, নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছিতেও তত বিলম্ব হইত। এজন্য অবস্থাপন্ন লোকেরা বেশী দাঁড়ওয়ালা বজরাই পছন্দ করিতেন। তখনকার দিনে, জলপথে ভাগীরথীবক্ষ বহিয়া কাশী যাইতে হইলে যে খরচ পড়িত, এখনকার দিনে সেই টাকায় তদপেক্ষা স্বল্প সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসা যায়। এত বেশী খরচ পত্র পড়িত বলিয়া, সেকালে বড়লোক ভিন্ন অন্য কেহ কাশী প্রভৃতি স্থানে যাইতে সাহস করিতেন না। যাঁহারা যাইতেন, তাঁহারা নিজের সেপাহী-শান্ত্রী সঙ্গে লইতেন। কেন না সে সময়ে সর্ব্বত্রই প্রবল দস্যু ভয়। ভারতের সর্ব্বস্থলে ইংরাজের শক্তি ও বাহুবল তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

লাটবাড়ীর কথা।

ম্যাক্‌ফারসন সাহেব, হেষ্টিংসের পর মাস কয়েকের জন্য বাঙ্গলার লাট হইয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস যেরূপ জনসাধারণের সহিত অবাধ ভাবে মিশিতেন, ম্যাক্‌ফারসনও সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। পুরাতন সরকারী গেজে-

কোন লোক বা শ্রেণী বিশেষের অভিনয় দেখাইতেন। একটী ছদ্মবেশধারী নৃত্যের (Masquarde) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রকাশ হয়। "গত সোমবার রাত্রের "মস্কারেড" অতি সুন্দরভাবে হইয়া গিয়াছে। গৃহ-সজ্জা ও আলোকের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। নিম্নলিখিত অংশাভিনয়গুলিই অতি সুন্দর হইয়াছিল। (১) দুইটী জিপ্সী, (২) ফরাসী বাবু ও বিবি, (৩) এক-জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী, (৪) তিনজন জাহাজী গোরা, (৫) এক সুন্দরী গোয়ালিনী, (৬) এক নাগা-সন্ন্যাসী (খুব ভাল হইয়াছিল), (৭) এক ইহুদী, (৮) এক পাহারাওয়ালা, (৯) একজন যোগী (Joghee), (১০) একজন গোরা, (১১) এক মেথরাণী (A Methrany) (খুব ভাল হইয়াছিল), (১২) এক একজন সুবাদার, (১৩) একজন মুন্সী। ইহা ব্যতীত অনেক মোগল, পাঠান ও পারসীর ভূমিকা। পাঠক ইহা হইতে দেখিতে পাইবেন, সেকালের সাহেবেরা ছদ্ম-আনন্দ-নৃত্যে, যোগী, নাগা, ফকির, মেথরাণী, সুবেদার, মুন্সী প্রভৃতির ভূমিকা অভিনয়ে আনন্দ উপভোগ করিতেন।

ময়দানে বেলুন বাজী।

গত শুক্রবার রাত্রে, মিঃ উইন্‌টল রাত্রি আটটা নয়টার সময়, একটী বেলুনে চড়িয়া শূন্যে উঠেন। এস্‌প্লানেড্ হইতে উঠিয়া, কিয়ৎক্ষণ শূন্য-ভ্রমণের পর, তিনি পুনরায় ভূতলে অবতরণ করেন। তিনি প্রায় পোয়া-টাক মাইল উপরে উঠিয়াছিলেন। আবার আগামী সোমবার, তিনি ঐ সময়ে বেলুন যাত্রা করিবেন।

(৪।৮।১৭৮৫)

গভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মালামাল বিক্রয়।

আগামী ৭ই মার্চ্চ সোমবার (১৭৮৫) ওল্ড-কোর্ট-হাউস বাড়ীতে, প্রকাশ্য নিলামে, ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের মালামাল সমূহ বিক্রয় করা হইবে। সে মালগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা এই—(১) রৌপ্যের-বাসন ও প্লেট প্রভৃতি, (২) টেবিল চেয়ার কৌচ ইত্যাদি, (৩) অয়েলপেন্টিং ও ষ্টিল-প্রিণ্টস্, (৪) একটী বড় অর্গান বা সংগীতযন্ত্র, (৫) কারুকার্য্য-খচিত ঘোড়ার সাজ, (৬) কারুকার্য্যময় হাতীর-হাওদা, (৭) কয়েকখানি ঝালরদার-পাল্কী, (৮) কার্পেট ও সতরঞ্চ ১ দফা, (৯) ফিল্-চেরা বা সখের দেশী ভ্রমণ-নৌকা, (১০) কতকগুলি তাম্বু আর নানাবিধ

মালামাল। তাহাদের পূর্ণ পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব। নগদ টাকায় বিক্রী। মালামাল খরিদের পাঁচ দিন পরে ক্রীত-মাল উঠাইয়া না লইলে, পুনরায় তাহা অন্য লোককে বিক্রয় করা হইবে।

গাড়ীওয়ালা ষ্টুয়ার্ট-কোম্পানী।

পাঠক, আজও নর্টন-বিল্‌ডিংএর নিকট, ষ্টুয়ার্ট-কোম্পানীর পুরাতন গাড়ীর কারখানা দেখিতে পাইবেন। এই ষ্টুয়ার্ট-কোম্পানী ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত ষ্টুয়ার্ট-কোম্পানীর ১৭৮৫ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের একটী বিজ্ঞাপন এই—"আমরা বিলাত হইতে একখানি সুন্দর গাড়ী আনাইয়াছি। তাহার মূল্য আট শত সিক্কাটাকা। আমরা অর্ডার পাইলে চিরেট, ফিটন, বগী প্রভৃতি, ইউরোপের মত নিখুঁতভাবে তৈয়ার করিয়া দিব।"

কলিকাতায় প্রথম মাসিকপত্র।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দের ৭ই এপ্রেলের একটী বিজ্ঞাপন হইতে দেখা যায়, "ওরিয়েণ্ট্যাল ম্যাগাজিন এবং কলিকাতার আমোদ-প্রমোদ" নামক একখানি নূতন মাসিক-পত্রের প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। প্রতি মাসের প্রথম বুধবারে ইহা বাহির হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যায় নিম্নলিখিত চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলি আছে। (১) হেষ্টিংস সাহেবের জীবনী ও এদেশের কার্য্য-বিবরণী সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস—(ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সাহেবের সুবৃহৎ ছবি সম্বলিত, (২) ভারতের ইংরাজাধিকার সমূহে সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য, পার্লিয়ামেণ্ট যে নূতন বিধান বা রেগুলেশন প্রচলিত করিয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিবরণ। ইহা ছাড়া আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে আছে। গর্ডন ও হে সাহেবের ছাপাখানায় ইহা পাওয়া যাইবে।"

উল্লিখিত বিজ্ঞাপনী হইতে জানিতে পারা যায়, যে—তখন কলিকাতায় ইংরাজ-পরিচালিত আর একটী নূতন ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল। আর এই ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী দুইজন ইংরাজ। অন্য ছাপাখানা হইতে সরকারী গেজেট প্রভৃতি মুদ্রিত হইত।

ঘোড়ার দানা-যোগান।

১৭ই মার্চ্চ তারিখে (১৭৮৫) একজন ইংরাজ-ব্যবসায়ী যে বিজ্ঞাপন সাধারণে প্রকাশ করেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—"কলিকাতায়

যে সকল ভদ্রলোক ঘোড়া গাড়ী রাখেন, তাঁহাদিগকে ঘোড়ার খোরাক লইয়া, মধ্যে মধ্যে বড়ই বিভ্রাটে পড়িতে হয়। সহিস, সরকার ও মুদী এই তিন শ্রেণীর লোকে চক্রান্ত করিয়া, দানার দর চড়াইয়া দেয়। অনেক সময়ে নিয়মিতরূপে পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠে। এজন্ত আমি জন-সাধারণের সমক্ষে প্রস্তাব করিতেছি—যদি তাঁহারা আমার নিকট তাঁহাদের নামধাম ও প্রয়োজনীয় দানার পরিমাণ লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমি নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে বা প্রতি ছয়মাস অন্তর, তাঁহাদের ঘোড়ার খোরাক যোগাইতে পারি। খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে, আমি একার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। যাঁহারা এইভাবে, নির্দ্ধারিত দরে আমার নিকট হইতে দানা লইয়া—আমায় উৎসাহিত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ত্বরায় নাম ধাম ও ঠিকানা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।"

রামরতন ঠাকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ী।

"নূতন কোর্ট হাউসের নিকট এস্প্লানেডে, যে সুন্দর বাড়িটীর ভাড়া আগে মাসিক ছয় শত টাকা ছিল, তাহা পাঁচ শত টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাটীর স্বত্বাধিকারী রামরতন ঠাকুরের নিকট আবেদন করুন।"

এই বিজ্ঞাপনে বর্ত্তমানে প্রচলিত "Tagore" শব্দটীই ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সময়ে ঠাকুর-গোষ্ঠীর অবস্থা যে উন্নত ছিল, তাহা এই বিজ্ঞাপন হইতেই প্রমাণ হইতেছে।

সেকালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে, পলাশী-সমরের ২৮ বৎসর পরে, কলিকাতায় বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটীর মত কোন কিছু ছিল না বটে, তবে তখন পুলিশ কমিশনারদের অধীনে—একটী "ময়লা-ফেলা বিভাগ" যে স্থাপিত হইয়াছিল—তাহা নিম্নলিখিত আদেশপত্র হইতে প্রকাশ।

১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে ৯ই জুন তারিখে নোটিশ দেওয়া হয়—"কমিশনার অব পুলিশ, সহরের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি নূতন বিধান প্রচলিত করিয়াছেন। সেগুলি সাধারণের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশিত হইল। এই বিভাগ মিঃ জোসেফ সেরবোরণের তত্ত্বাবধানে খোলা হইল। তাঁহার নিজ-প্রতিষ্ঠিত বাজারের, এক হইতে তিন নম্বর কামরায়

"স্কাভেঞ্জার-আফিস" স্থাপিত হইয়াছে। সহরের অধিবাসিগণকে জানান যাইতেছে—মহামান্য গবর্ণর জেনারেল ও কৌন্সিলের আদেশে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আইনগুলি গঠিত হইয়াছে।"

(১) সমগ্র সহর ৩১টী থানায় বিভক্ত হইল। প্রত্যেক অংশই এক একজন স্বতন্ত্র থানাদারের অধীন।

(২) সাহেবী-পল্লীতে সাতটী থানা স্থাপিত হইল। প্রত্যেক থানার অধীন চারিখানি ময়লা ফেলা গাড়ী থাকিবে। দেশীয়-পল্লীর থানাগুলির প্রত্যেকের অধীনে, দুইখানি করিয়া ময়লা-ফেলা গাড়ী রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

(৩) ময়লা-সাফ্ সম্বন্ধীয় দরখাস্ত, প্রত্যেক থানার কর্ম্মচারিগণকে দিতে হইবে। ইহাতে যদি নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা কোনরূপ মনোযোগ প্রদান না করে, তাহা হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-জেনারেল সাহেবের নিকট দরখাস্ত দিলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে।

(৪) বর্ত্তমানে রাস্তায় ময়লা-ফেলা ড্রেন, প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহাই পূর্ণভাবে বলবৎ রহিল।

এই ৩১টী থানার নাম হইতে সহরের তৎকালীন বিভাগগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য কেবল থানার নামগুলিই উদ্ধৃত করিলাম। প্রত্যেক থানার পার্শ্বে সে সমস্ত থানাদারের নাম আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। তবে পাঠক এইটুকু জানিয়া রাখুন, সেকালের থানাদারদের অধিকাংশই মুসলমান।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতা সহরের ৩১টী থানার নাম।

১ আর্ম্মিনিয়ান চার্চ্চ
২ ওল্ড ফোর্ট (পুরাতন দুর্গ)
৩ চাঁদপাল ঘাট
৪ লালদিঘির দক্ষিণদিক
৫ ধর্ম্মতলা
৬ ওল্ড কোর্ট-হাউস
৭ ডোমতলা (?)
৮ আমড়াগলি পঞ্চাননতলা
৯ চীনাবাজার
১০ চাঁদনী-চক
১১ তুরুলবাজার (?)
১২ গোঁমাপুকুর (?)
১৩ চড়কডাঙ্গা
১৪ শ্রিমলাবাজার
১৫ নুন-লঙ্কা-বাজার (?)
১৬ মলঙ্গা পটলডাঙ্গা

করি, আপনি ভবিষ্যতে সুস্থদেহে থাকিয়া এইরূপ অনেক প্রাচ্য লুপ্ত-রত্নের উদ্ধার করুন।* (১৫।৬।১৭৮৫)

গবর্ণর ভান্সিটার্টের মৃত্যু।

"ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই ভান্সিটার্টের নাম ও কার্য্য-প্রণালী জানেন। সেকালের সংবাদ-পত্রে প্রকাশ,—"গত ৭ই অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণে, গবর্ণর হেন্‌রি ভান্সিটার্ট কয়েকদিবসব্যাপী পীড়ার পর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজ ও এদেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের তিনি অতি প্রিয় ছিলেন। কোম্পানীর লবণ-বিভাগের আয়, এই ভান্সিটার্ট সাহেব, পঞ্চাশ লক্ষে দাঁড় করাইয়াছিলেন। এদেশীয় যে সমস্ত লোক তাঁহার অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, তাহারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিত। তিনি তাহাদের সমস্ত ন্যায্য অভাব অভিযোগ শুনিয়া, তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। গ্রীক, ল্যাটিন ভাষায়, তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। আরবিক পারসী ভাষাতেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আরবী হইতে তিনি অনেকগুলি পদ্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। পারসী হইতে "আলমগীর (ঔরঙ্গজেব) বাদসার রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরের ঘটনার এক ইংরাজী ইতিহাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক-সোসাইটীর তিনি একজন উজ্জ্বল-রত্ন ছিলেন।"

(১২।১০।১৭৮৬)

হিন্দু ও মুসলমান পর্ব্বদিন।

"রায়রায়াঁর নিকট হইতে হিন্দু ও মুসলমানদের পর্ব্বদিন সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে—গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীদিগের অবগতির জন্য তাহার ইংরাজী অনুবাদ—গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের আদেশানুসারে প্রকাশিত হইল। জে-ডনক্যান (রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট—৩০।৪।১৭৮৭)

হিন্দু পর্ব্ব ও উৎসব-দিনের তালিক।

(বাঙ্গলা—১১৯৪ সাল)

রথযাত্রা	...	১ দিন	রাখী পৌর্ণমাসী	...	১ দিন
পুনর্যাত্রা	...	১ দিন	জন্মাষ্টমী	...	২ দিন

* Copy of a Letter from Nath. Smith, Chairman of the Hon'ble Court of Directors Dated 24—9—1785 to Mr. Wilkins.

দুর্গাষ্টমী ...	২ দিন	শিবরাত্রি ...	২ দিন
অমাবস্যা মহালয়া ...	১ দিন	হোলি ...	৫ দিন
দুর্গাপূজা ...	৫ দিন	বারুণী ...	১ দিন
দেওয়ালী ...	৩ দিন	চড়কপূজা ...	১ দিন
উত্থান-একাদশী ...	১ দিন	রামনবমী ...	১ দিন
তিলওয়া-সংক্রান্তি ...	১ দিন	উল্লিখিত ছুটীর দিন সমূহে সরকারী	
বসন্ত-পঞ্চমী ...	১ দিন	কার্য্যালয় সমূহ একেবারে বন্ধ হইত।	

নিম্নলিখিত পর্ব্বাহগুলিতে প্রয়োজন হইলে
ছুটী পাওয়া যাইত।

অক্ষয়-তৃতীয়া ...	১ দিন	লক্ষ্মী-পূজা ...	১ দিন
নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ও পৌর্ণমাসী	২ দিন	যমতর্পণ (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া)	১ দিন
দশমী ও একাদশী		অন্নকূট-যাত্রা ...	১ দিন
(জ্যৈষ্ঠমাসে) ...	২ দিন	কার্ত্তিক-পূজা ...	১ দিন
স্নানযাত্রা ...	১ দিন	দুর্গা-নবমী (জগদ্ধাত্রী)	১ দিন
শয়ন-একাদশী ...	১ দিন	রাস-যাত্রা ...	১ দিন
অরন্ধন ...	১ দিন	অগ্রহায়ণ নবমী ...	১ দিন
গণেশ-পূজা ...	১ দিন	রটন্তী অমাবস্যা ...	২ দিন
অনন্ত-ব্রত ...	১ দিন	মৌনী সপ্তমী } ...	২ দিন
বুধ-নবমী ...	১ দিন	ভীষ্মাষ্টমী }	
নবরাত্রি ...	১ দিন	বাসন্তী-পূজা ...	৪ দিন

এখনকার কালের সহিত তুলনায়—সেকালে অনেকগুলি সরকারী ছুটীর প্রচলন ছিল। কিন্তু এ তালিকার মধ্যে আমরা অন্নপূর্ণা-পূজার কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। জনপ্রবাদ, মহারাজ-রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র, বঙ্গ-দেশে অন্নপূর্ণা-পূজার প্রচলন করেন। "চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে" ইহা ভারতচন্দ্রের উক্তি। বোধ হয় সে সময়ে এই পূজা সমগ্র বঙ্গব্যাপী হয় নাই।

এই সব পর্ব্বদিনের ইংরাজী নামকরণ, যেরূপভাবে কোম্পানীর সেরেস্তায় বর্ত্তমান, তাহার দুই একটী নমুনা দিব। অন্নকূট-যাত্রা (Ancote jaterah) বাসন্তী-পূজা (Byunt poojeh) মৌনী সপ্তমী (Mauney Septumy)

শয়ন একাদশী (Syne Ekadassy) অক্ষয় তৃতীয়া (Akhy Tirtea) এইরূপ বানানের জন্য অনেক পর্ব্বদিন সহজে বুঝা যায় না। (৩৫।১৭৮৭)

মুসলমানদেরও (১) ইদলফেত্তর (২) ইতুজ্জোহা (৩) সোবেবারাৎ (৪) মহরম (৫) বরা উয়াফাৎ (৬) তেরাতাজিয়া (৭) আথেরিচাহার (৮) নওরোজ প্রভৃতি উৎসবে ১৩ দিন বন্ধ থাকিত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় পর্ব্বে মোট ৭২ দিন ছুটী হইত।

কলিকাতায় মালাই মানিলা ও কাফ্রির উৎপাত।

"রাইট অনারেবল গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের বরাবরে অভিযোগ আসিয়াছে, যে মালাই ও ম্যানিলা দেশীয় জাহাজের খালাসীরা ও কাফ্রিরা কলিকাতায় চুরী-ডাকাতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতেছে। এজন্য আদেশ করা হইল—আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের পর এই শ্রেণীর যে সমস্ত লোক জাহাজে চাকরি জোগাড় করিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া না যাইবে, তাহাদিগকে ফাটকে আটক করা যাইবে।" (৮ই জুলাই ১৭৮৭)।

অহল্যাবাইয়ের গয়ার মন্দির।

"রাণী অহল্যা-বাই গয়াতীর্থে একটী বিষ্ণুমন্দির ও লক্ষ্মীর-মন্দির প্রতিষ্ঠা-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে—এই স্থানে তাঁহার নিজেরও একটী প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইবে। ভবিষ্যৎ যুগে তিনিও অন্যান্য হিন্দুদেবতাদের মত পূজিতা হইবেন।"

Calcutta Gazette—(News) 83-17-87

বর্দ্ধমানে দামোদরের বন্যা।

গত বৎসরের বর্দ্ধমানের বন্যার কথা, আজও পাঠকের স্মৃতিমধ্যে উজ্জ্বল-ভাবে জাগরূক। ইহার ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নাকি আর একবার এইরূপ ভয়ানক বন্যা হয়। কিন্তু শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে, একবার দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গে। সেই সময়ের কলিকাতা গেজেটে (১০।১১।১৭৮৭) একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।—পত্রখানি অবশ্য ইংরাজীতেই প্রকাশ হয়। বর্দ্ধমানবাসী কোন ভদ্রলোক, এই ভীষণ বন্যার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কলিকাতাবাসী সহোদরকে বাঙ্গালায় একখানি পত্র লেখেন। গেজেট-সম্পাদক তাহা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া বন্যার প্রকৃত অবস্থা সাধারণের গোচর করেন। সে তর্জ্জমার বাঙ্গালা এই—

"ভায়া! এস্থানের অবস্থা তোমাকে আমি লিখিয়া বুঝাইতে পারিব কি না সন্দেহ! ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। গত ১৬ই আশ্বিনের মহাবৃষ্টিতে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। বারদ্বারির নিকট যে বাঁধ ছিল, তাহা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই বাঁধ-ভাঙ্গায়, অনেক গঞ্জ গোলা হাটের চিহ্নমাত্র নাই। কত বড় বড় গাছপালা ও গরু, ছাগল, ভেড়া, ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের অবস্থা এখনও নিরাপদ। কিন্তু ঘর বাড়ী কাহারও নাই। ধনী দরিদ্র সবারই সমাবস্থা। আমাদের ঘর বাড়ী এখনও থাকিলেও ভবিষ্যতে থাকিবে কি না সন্দেহ। এ বিপদ ঘটিলে কি যে হইবে, তাহা ভগবানই জানেন।"

গেজেট ইহার উপর মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছেন—"এই পত্র ছাড়া, অন্যান্য স্থান হইতেও আমরা সংবাদ পাইয়াছি—দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সহরের পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রাম নষ্ট করিয়াছে। দুই হইতে তিন ফিট পর্য্যন্ত জল জমিয়াছে। লোকে কেবল পুষ্করিণী প্রভৃতির উচ্চ পাহাড়ের উপর আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছে।"

ইহা হইতেছে, ইংরাজী ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দের কথা—অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসর হইতে একশত সাতাইশ বৎসরের পূর্ব্বের ব্যাপার।

প্রাচীন কলিকাতার (১৭৯২ খৃঃ অব্দে) প্রধান প্রধান ঘাট সমূহের তালিকা।

(১) ওল্ড পাউডার মিল ঘাট।
(২) রঘুমিত্রের ঘাট।
(৩) কাশীরাম মিত্রের ঘাট।
(৪) বনমালী সরকারের ঘাট।
(৫) কিতোয়া ঘাট।
(৬) বটতলা ঘাট।
(৭) সুতানুটী ঘাট।
(৮) আহিরিটোলা ঘাট।
(৯) মাণিক বসুর ঘাট।
(১০) মদন দত্তের ঘাট।
(১১) টুনু বাবুর ঘাট।
(১২) নিমতলা ঘাট।
(১৩) জোড়াবাগান ঘাট।
(১৪) গোকুল বাবুর ঘাট।
(১৫) কাত্‌মার ঘাট।
(১৬) পাথুরিয়া ঘাট।
(১৭) গিরি বাবুর ঘাট।
(১৮) শিবতলা ঘাট।
(১৯) হাটতলা ঘাট।
(২০) হরিনাথ দেওয়ানের ঘাট।
(২১) শোভারাম বসাকের ঘাট।
(২২) নবাবের ঘাট।
(২৩) বৈষ্ণব দাস শেঠের ঘাট।
(২৪) কাশীনাথ ঘাট।

(২৫) কদমতলা ঘাট।
(২৬) কাশীনাথ বাবুর ঘাট।
(২৭) হুজুরীমল্লস্ ঘাট।
(২৮) নয়ান মল্লিকের ঘাট।
(২৯) বলরাম চন্দ্রের ঘাট।
(৩০) বড়বাজার ঘাট
(Great Bazar)
(৩১) রস সাহেবের ঘাট।
(৩২) বারেটো সাহেবের ঘাট।
(৩৩) জ্যাক্‌সন ঘাট।
(৩৪) ফোরম্যান্‌স ঘাট।
(৩৫) ব্লাইথার সাহেবের ঘাট।
(৩৬) ওল্ডকোর্ট ঘাট।
(৩৭) নিউ হোয়ার্ফ ঘাট।
(৩৮) কাঁচাগুঁড়ি ঘাট।
(৩৯) চাঁদপাল ঘাট।

বাগবাজার হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত, তখন ৩৯টী ঘাট ছিল। এখন এ সমস্ত ঘাটের মধ্যে অনেকগুলির নাম ও অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। সেকালের সাহেবেরাও, বাঙ্গালীদের মত গঙ্গাতীরে ঘাট বাঁধাইয়া স্ব স্ব নামে তাহার নামকরণ করিতেন।
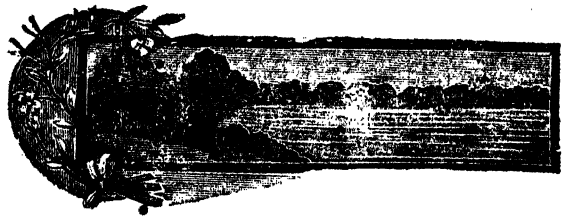
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রতিকার—নদীপথে বোম্বেটের উৎপাত—বাগবাজার চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি—সেকালের বাঙ্গালীর সাহেব-পূজা—অতিকায় ভেট্‌কীমাছ—সুন্দরবন বিভাগে ডাকাতি—কলিকাতা সহরের মধ্যে চুরী ও রাহাজানি—বেহারি বাবুর চাকরী জবাব—ময়দানে ঘোড়া-ব্রেক করা সম্বন্ধে পুলিস অর্ডার—ক্রীতদাস ক্রয় সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেলের আদেশ—বাঙ্গালা-দেশে প্রথম নীলের চাষ আরম্ভ—ধর্ম্মতলার পুষ্করিণী খনন—উড়িয়া-মহলের বাব—কলিকাতা হইতে নানাস্থানের ডাক মাশুল—সাহেব-চোর—সূর্য্যাস্তের পর মদের দোকান বন্ধ—পুরীতে জগন্নাথদেবের রথে সিপাহী-পাহারার বন্দোবস্ত—লাট সাহেবের বল—বজবজ দুর্গত্যাগ—কলিকাতা সহরের পথে কুকুরের উৎপাত—পালকীর ভাড়া—স্যর উইলিয়াম জোন্স—সাহেব-চোরের উৎপাত—কলিকাতা হইতে কাশী যাইবার খরচা—মহারাজা নবকৃষ্ণের দান—চাউলের দরবৃদ্ধি—কলিকাতা ভবানীপুরে ডাকাতি—খিদিরপুরে ছেলে-বিক্রীর আড্ডা—বরানগরে ডাকাতি—বাজারে হত্যাকাণ্ড—ব্রহ্মহত্যা—মহরম ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে মহাদাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড—কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ—কলুটোলায় ডাকাতি—আলিপুরে এক সাহেব বাড়ীতে ডাকাতি—সতীমন্দির ও জীবন্ত-সমাধির এক ভীষণ ঘটনা—কাশীনাথ বাবুর মৃত্যু—সুপসাগরে বাঘ—সেকালের বাঙ্গালীদের অভিনন্দনের নমুনা—সেকালের নববর্ষের উৎসব—সেকালের ঘোড়দৌড়—স্যর উইলিয়াম জোন্সের মৃত্যু—কলিকাতা সহরের সীমা নির্দ্দেশ—কলিকাতায় প্রথম পাকা রাস্তা—সাহেব-ডাকাত কর্ত্তৃক কোম্পানী-বাহাদুরের খাজনা-লুট—রসাপাগলার ডাকাতি—ভয়ানক শিলাবৃষ্টি ও ঝড়—বাঙ্গালীর বাড়ীতে সাহেব-ডাকাত—ধর্ম্মতলায় রাহাজানি—আলিপুরের পুল ভাঙ্গা—প্রথম বাঙ্গালা গ্রামার ও ডিক্সনারী সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের আবেদন—কলিকাতায় প্রথম নেটিভ-হাঁসপাতাল—ইংরাজের বিপদে বাঙ্গালীর সহানুভূতি—সেকালের ইংরাজদের বিবাহ—সেকালের ঔষধের দাম ও ডাক্তারের ভিজিট—খসখসের টাটির প্রচলন—সেকালের যানবাহন—নাচের মজলিস—ইংরাজী-থিয়েটারে বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—সেকালের থিয়েটারের কথা—ঘোড়দৌড়ের মাঠ—কলিকাতায় প্রথম ক্রিকেট-খেলা—সেকালের আদালতের জজদিগের এদেশীয় ভাষাশিক্ষা—সেকালের লাট-দর্শনের ব্যবস্থা—এক মজাদার বিজ্ঞাপন—কলিকাতায় বাঁধা-কপির প্রথম চাষ—পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন সম্বন্ধে প্রথম লেক্‌চার—কলিকাতায় প্রথম ইন্‌সুরেন্স কোম্পানী—শতবৎসর পূর্ব্বে লংক্লথের দাম—লালবাজারে সুন্দরবনের বাঘ বিক্রী।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও স্যরজন্ শোরের আমল।

(১৭৮৯—৯৮ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের কথা)

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রতিকার।

গভর্ণর-জেনারেল বাহাদুর অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন—যে কলিকাতা সহর, মুরশিদাবাদ ও ঢাকায় শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এইজন্য কৌন্সিলের সহিত মন্ত্রণাক্রমে, গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, এই প্রকার ব্যবস্থায় উক্ত স্থান সমূহে—শস্যের মহার্ঘতা দূর হইতে পারে।

আদেশ করা হইল—কলিকাতা মুরশিদাবাদ ও ঢাকা প্রভৃতি সহরে সে সকল স্থানে চাউলের গঞ্জ ও আড়ত আছে—সেই সকল স্থান হইতে সরকারের প্রাপ্য কোনরূপ টোল, ডিউটী ও কষ্টম আদায় করা হইবে না। যতদিন না শস্যের মূল্য চলিত অবস্থায় আসে, ততদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। এজন্য কষ্টম-অফিসার ও জেলার-জজ সমূহকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আমদানী ও রপ্তানী উভয় ক্ষেত্রেই, এই শুল্ক ও বাবসমূহ পরিত্যক্ত হইবে। কোম্পানীর উল্লিখিত কর্ম্মচারীরা, যদি জানিতে পারেন, যে গঞ্জের দারোগারা জুলুম করিয়া এই সমস্ত স্থানে টোল প্রভৃতির টাকা আদায় করিতেছে—কিম্বা এই আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে—তাহা হইলে এই সকল স্থলে তাহারা যত টাকা শুল্ক আদায় করিবে, কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহার দশগুণ টাকা তাহাদিগকে জরিমানা করিতে পারিবেন।

এরূপ শোনা গিয়াছে—যে এই প্রকার দুর্ভিক্ষের সময়, অনেক মহাজন ও গোলদারগণ অধিক পরিমাণে শস্য কিনিয়া গোলায় সঞ্চয় করিয়া রাখে, পরে সুযোগ বুঝিয়া, তাহা খুব চড়া দামে বিক্রয় করে। এই নোটিশ দ্বারা জানান যাইতেছে, যদি কেহ এরূপভাবে—শস্যাদি চড়া দামে বিক্রী করে, কিম্বা আরও দর চড়াইবার জন্য শস্যাদি আটক করিয়া রাখে—কোম্পানী-বাহাদুরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা, তাহা জানিতে পারিলে—তাহাদের সমস্ত শস্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারিবেন। (ফোর্ট উইলিয়ম—১।২।১৭৮৮)

নদীপথে বোম্বেটের উৎপাত।

ডায়মণ্ড-হারবারের মুখে, হিজলীর পথে, গেঁয়োখালি প্রভৃতি স্থানে সে সময়ে বোম্বেটের বড় উৎপাত ছিল। এজন্য সরকার বাহাদুর নানাস্থানে "গার্ড-বোট" বা চৌকি-নৌকার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এই সকল নৌকা, নদীর নানাস্থানে পাহারা দিত। পাহারা দিবার জন্য থানাদারেরাই নৌকায় থাকিতেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দের ২৪এ এপ্রিল তারিখের একটী সরকারী আদেশ হইতে জানিতে পারা যায়—"গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর, হিজলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে হুকুম দিতেছেন—যে নিম্নলিখিত স্থানে চৌকী স্থাপিত হইল। (১) ফল্তা। (এই চৌকীতে ১ হইতে ২ নংএর বোট, থানাদারের অধীনে উলুবেড়িয়া হইতে কুকড়াহাটি পর্য্যন্ত চৌকী দিবে।) (২) রাঙ্গাফুলী—এই চৌকীতে ৩ ও ৪ নংএর গার্ডবোট থাকিবে। এই বোট, কুকড়াহাটি হইতে বড়তলা পর্য্যন্ত স্থান চৌকী দিবে। (৩) সন্দীয়া-গণ্ডিয়া। এই স্থান হলদী-নদীর মুখে। বড়তলা হইতে—তালপাতি পর্য্যন্ত স্থান—৫ ও ৬ নংএর গার্ডবোট দ্বারা রক্ষিত হইবে। (৪) গেঁয়োখালি তালপাতি হইতে হিজলীর বাঁক পর্য্যন্ত ৭ ও ৮ নংএর বোট পাহারা দিবে। থানাদারের বোট চিনিবার সঙ্কেত এই, প্রত্যেক চৌকী-নৌকায় একটী করিয়া লাল-নিশান ও সেই নিশানের উপর সাদা অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় নৌকার নম্বর থাকিবে।" গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের হুকুমে এই আদেশ প্রচারিত হইল। (২৪।৪।১৭৮৮)

ঠিক্ বলিতে পারা যায় না—বাঙ্গালী বা মগ কোন শ্রেণীর দস্যুরা, সেই সময়ে এই সকল স্থানে নদীপথে রাহাজানি করিত। কোম্পানী বাহাদুরের রাজত্বের প্রথম আমলে, মগ-দস্যুরা যে মেটিয়াবুরুজ ও কলিকাতার সীমা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিত—ইহার প্রমাণ পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

বারাসতে ঘোড়দৌড়।

তখনকার দিনে বর্ত্তমান ঘোড়দৌড়ের-মাঠ জঙ্গলে আবৃত ছিল। তাহা বলিয়া সাহেবদের প্রধান আমোদ ঘোড়দৌড় বন্ধ থাকিত না। ঐ সময়ের একটী বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারা যায়—"যে যদি আবহাওয়া ভাল থাকে, তাহা হইলে বারাসতের মাঠে ঘোড়দৌড় হইবে।

সময় অপরাহ্ন। সেলবী সাহেব উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দের জন্য খানখা ও টিফিনের বন্দোবস্ত করিবেন।"

বাগবাজার চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি।

গত ৬ই এপ্রিল তারিখে, অমাবস্যার দিন শনিবারে, চিৎপুরের কালীমন্দিরে একটী ভীষণ নরবলি হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারময় রজনীর অন্তরালে, এই ভীষণ কাণ্ড একজন বা একাধিক লোক দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কয়জন লোক এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মন্দিরের পুরোহিত বলেন—যে তিনি রাত্রে পূজাদির পর, যথারীতি দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কেহ গভীর রাত্রে দ্বার ভাঙ্গিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে। যে মানুষটীকে বলি দেওয়া হইয়াছিল—তাহার রুধিরাক্ত মুণ্ডটী, মন্দিরের প্রতিমার পদতলের উপর ছিল—ধড়টা মন্দিরের বাহিরে একটী স্থানে পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া একখানি বহুমূল্য বেনারসী শাটী, সোণার কণ্ঠমালা ও দুই একখানি রৌপ্যালঙ্কার ও সেই প্রতিমার নিকট ছিল। এই নরবলি-যজ্ঞের উপযুক্ত যে সমস্ত পাত্রাদি প্রয়োজন, তাহাও সেইস্থানে পাওয়া গিয়াছে। যে শাস্ত্রের বিধানানুসারে এইরূপ নরবলি দিবার নিয়ম আছে, তদনুযায়ী এই সমস্ত পাত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। পূজার উপকরণ, জিনিসপত্র ও মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারাদি দেখিয়া প্রমাণ হইতেছে, কোন ধনবান বাঙ্গালী এই ঘটনার মূলে আছেন। অনুষ্ঠান পদ্ধতি দেখিয়া ইহাও বোধ হয়, তিনি কেবল ধনবান নহেন, তন্ত্রাদি-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত। যাহাকে বলি দেওয়া হইয়াছে—তাহার আকৃতি দেখিয়া চণ্ডাল-শ্রেণীর লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। সাধারণে এই অনুমানেরই সমর্থন করিয়াছে। নিহত ব্যক্তি কলিকাতার লোক নহে, সম্ভবতঃ নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রাম হইতে তাহাকে আনা হইয়াছিল। ঘটনাস্থলে ফৌজদার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তদারক করেন। তিনি মন্দিরের নিত্যপূজক ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনরূপ নূতন কথা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। (২৪।৪।১৭৮৮)

সেকালের বাঙ্গালীর সাহেব-পূজা।

সেকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদিগকে খুব ভাল বাসিতেন, তাহাদের

হতে খুব মেলামিশি করিতেন। কিসে তাহাদের দুঃখ দূর হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। বাঙ্গালী প্রজাগণকে সন্তানের ন্যায় পালন করিতেন। এখনকার কালেও যে এ দৃশ্য দুর্লভ—তাহা নহে। আজকালও এমন অনেক প্রজাপ্রিয় রাজকর্ম্মচারী আছেন, যাঁহারা এ দেশের লোকদিগকে যথেষ্ট প্রীতির চক্ষে দেখেন। এ যুগের বাঙ্গালীরা তাঁহাকে জোর হয়, একটা বিদায়ী অভিনন্দন না হয় প্রীতি-ভোজ দিয়া, কৃতজ্ঞতা জানাইয়া থাকে। কিন্তু সেকালের অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্ব্বের একটী ঘটনা শুনিয়া রাখুন।

মিষ্টার টিলম্যান হেংকেল সাহেব, যশোরের প্রথম কলেক্টার। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে তিনি এই পদ লাভ করেন। শেষ তিনি সুন্দরবনের নিমকীমহলের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হন। যে সকল গরীব "মলঙ্গী" তাঁহার অধীনে চাকরী করিত, লবণ প্রস্তুত করিত, তিনি তাহাদের সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। তখনও তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত। কৃতজ্ঞ প্রজারা, তাহাদের প্রাণের আন্তরিক্তি দেখাইবার জন্য, প্রত্যেক গৃহে তাঁহার মৃণ্ময় মূর্ত্তি গড়িয়া দেবতার মত পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই কথাটী পরে সংবাদরূপে সেকালের একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। (২৪।৪।১৭৮৮)

অতিকায় ভেট্‌কী।

লক্ষীয়া নদীতে একটী ভেট্‌কী (সেকালে ইংরাজেরা ভেট্‌কী-মাছকে Cockup বলিতেন) ধরা পড়িয়াছিল। এত বড় ভেট্‌কী-মাছ কখনও কাহারও চোখে পড়ে নাই। মাছটীকে কোম্পানীর ঢাকা-ফ্যাক্টারিতে আনা হয়। দুইটী বংশদণ্ডে বাঁধিয়া আটজন কুলীতে ইহা বহিয়া আনে। মাছের পিঠে নয়টী বড় বড় কাঁটা ছিল। এ দেশের লোকেরা বলিল, মাছটী নয় বৎসরের। প্রত্যেক বৎসরে একটী করিয়া কাঁটা গজাইয়া উঠে। চোয়াল হইতে লেজের শেষ পর্য্যন্ত—ইহার দীর্ঘতা ছয় ফিট আট ইঞ্চি। দেহের পরিধি চারি ফিট দশ ইঞ্চি। সমস্ত মাছের পাকা ওজন—তিন মন দশ সের। (১৫।৫।১৭৮৮)

খিচুড়ী বিতরণ।

বোধ হয় ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা সহরের মধ্যে গরীবদের বিশেষ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য দরিদ্রদের মধ্যে অন্ন বিতরণ জন্য, একটী কমিটি সংগঠিত হয়। এই কমিটি, চাউল ও নগদ পয়সা গরীবদের মধ্যে বিতরণ

করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু উক্ত খৃষ্টাব্দের এক বিবরণী হইতে দেখা যায়, নগদ পয়সা ও চাউল বিতরণে কুলাইয়া না উঠায়, কর্তৃপক্ষগণ দরিদ্র সাধারণের মধ্যে "খিচুড়ী বা ভাত" বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ—"প্রেসিডেন্সির মধ্যে দরিদ্রদের সাহায্য জন্য, যে ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, তাহার সদস্যগণ সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হইবে না। খিদিরপুর, বৈঠকখানা ও বীর্জিতালাও এই তিনটী স্থানে তিনটী "অন্নক্ষেত্র" প্রস্তুত হইবে। এই স্থান-সমূহ হইতে দরিদ্রদিগকে ভাত বা খিচুড়ী বিতরণ করা যাইবে। যাহারা অনাহারে ইতি পূর্ব্বে রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের জন্য, এই ফণ্ডের অর্থ হইতে বৈঠক-খানার বাজারে একটী অস্থায়ী হাঁসপাতাল করা হইল।" (৪।৯।১৭৮৮)

ডাকাতির সংবাদ।

"আজকাল ডাকাতগণ বড়ই সাহসী ও অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকজন সিপাহী পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া বীরভূম হইতে বর্দ্ধমানে আসিতেছিল। ডাকাতেরা দুইজন সিপাহী ও তিনজন পেয়াদাকে হত্যা করিয়া ৩০ হাজার টাকা লুটিয়া লইয়া গিয়াছে।" (১৬।১০।১৭৮৮)

সুন্দরবন হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত নদীপথে এই সময়ে ডাকাতের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। ডাকাতেরা নৌকা করিয়া দল বাঁধিয়া নদীবক্ষে ডাকাতি করিত। অনেক ডাকাতি-নৌকায়, কোম্পানী-বাহাদুরের নিশানের অনুরূপ নিশান রাখা হইত। প্রকাশ্য দিবাভাগেও এই দুর্দ্দান্ত ডাকাতগণ যাত্রী ও মালের নৌকা আক্রমণ করিত। কিন্তু সাহেবগণের নিকট বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি থাকায়, ডাকাতেরা অনেক স্থলে নিরাশ হইয়া প্রস্থান করিত। (১৩।১১।১৭৮৮)

সুন্দরবন ছাড়া কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী নদীসমূহেও ডাকাতের ভয় ছিল। একজন নায়েক ও ৮ জন সিপাহী-পূর্ণ একখানি নৌকা কলিকাতা হইতে কাল্না যাইতেছিল। চুর্ণী নদীর উপর ডাকাতেরা এই সিপাহী-নৌকা আক্রমণ করে। ডাকাতদের সঙ্গেও অনেকগুলি নৌকা ছিল। প্রত্যেক নৌকায় ১৬ হইতে ১৮ জন লোক ছিল। ডাকাতেরা সিপাহীদের নৌকায় উঠিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করে। অনেক সিপাহীকে তাহারা জখম করিয়া রাখিয়া যায়। প্রস্থানের সময়, তাহারা সিপাহীদের বন্দুক ও কিরিচগুলি কাড়িয়া লইয়া যায়।

সেই সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশ, যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট হেংকেল সাহেব এক সময়ে ২২জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেন। নিমকীর-এজেন্ট, সণ্ট সাহেবও ১১জন ডাকাতকে বন্দী করেন। (২০।১১।১৭৮৮)

সুন্দরবনের এই ডাকাতের দলের সর্দ্দার পরে ধরা পড়ে ও তাহার ফাঁসী হয়। (৬।১২।১৭৮৮)

সহরের মধ্যে চুরী ও রাহাজানি।

১৭৮৮ খৃঃ অব্দের সেসনে, সুবিখ্যাত সুপ্রীমকোর্টের জজ, স্যর উইলিয়াম জোন্স পুলিশ ব্যবস্থার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন—তাহার মর্ম্মার্থ হইতে জানা যায়—"কলিকাতা সহরে তখন গুণ্ডা ও বদমাইসদের বিশেষ প্রাবল্য ছিল। স্যর উইলিয়ম বলিয়াছিলেন—"গত দেড় মাসের মধ্যে সহরের মধ্যে আমি নানারূপ অশান্তির অভিযোগ পাইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে এরূপ অবস্থা ছিল না। মারামারি দাঙ্গা ও রাত্রে সিঁধ কাটিয়া বা জবরদস্তীতে কাড়িয়া লওয়া প্রভৃতি ব্যাপার, সহরের মধ্যে ইদানীং বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফৌজদারী বালাখানার নিকটস্থ একটী রাস্তার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—"এই রাস্তার উপর অনেকগুলি ইটালিয়ান, স্প্যানিশ্ এবং পর্টুগীজ হোটেল ও মদ্যপানাগার আছে। এই সকল স্থানেই উৎপাত উপদ্রব কিছু বেশী।" (১১।১২।৮৮)।

চাকরী জবাব।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক ছাড়া আর একটী ব্যাঙ্ক ছিল। তাহার নাম জেনারেল-ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের একটী সাধারণ নোটিশ হইতে জানিতে পারা যায়—"বেহারীলাল বাবু এদেশীয় লোকেদের নিকট হইতে "ব্যাঙ্ক-বিলের" উপর অন্যায় দস্তরী লইতেন। সম্প্রতি তাঁহার এ কার্য্য ধরা পড়ায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল।" এ সকল সংবাদও তখন আবশ্যকীয় বোধে সরকারী-গেজেটে প্রকাশ হইত। তখন ইংরাজী জানা বাঙ্গালী চাকুরের সংখ্যা খুব কম ছিল। (১৭।৭।১৭৮৮)

ঘোড়া-ব্রেক সম্বন্ধে পুলিশ অর্ডার।

"এস্প্লানেডের মধ্য দিয়া যে রাস্তাটী গিয়াছে, সেই রাস্তায় ও তাহার সংশ্লিষ্ট পথসমূহে, আগামী ২০এ মার্চ্চ হইতে আর কেহ ঘোড়া "ব্রেক" করিতে পারিবেন না। এইজন্য সাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা

শতাব্দী পূর্ব্বে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট ও এস্প্লানেড (১৭৯২ খৃঃ অব্দ)।
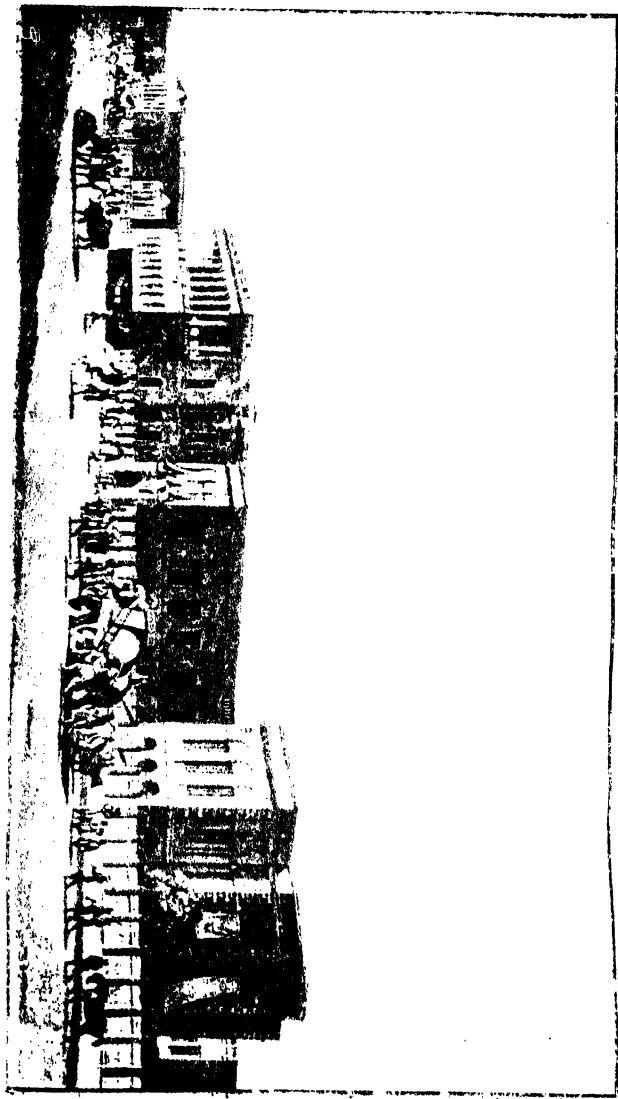
উড়িয়া মহলের বাব-আদায়।

পাঠক! কলিকাতায় সেকালে উড়িয়ার আমদানী যথেষ্ট না থাকিলেও কতক-পরিমাণে ছিল বটে। কলিকাতা সহরে এই সমস্ত উড়িয়াদের একজন সর্দ্দার থাকিত। তাহাকে "পরামাণিক" বলিত। পরামাণিকেরা কলিকাতায় নবাগত ও অধিবাসী উড়িয়াদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয় বাবতে বৃত্তি আদায় করিত।

(১) যে কোন উড়িয়া কলিকাতায় চাকরীর জন্য আসিবে, তাহাকে বাৎসরিক চারি আনা দিতে হইবে।

(২) যে কোন উড়িয়া, সহরের মধ্যে স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিবে, তাহাকে বাৎসরিক এক টাকা দিতে হইবে।

(৩) যে সমস্ত উড়িয়া স্ব স্ব শ্রেণী মধ্যে বিবাহাদি করিবে, তাহাকে ক্ষমতামত কিছু "রসুম" দিতে হইবে।

(৪) বিবাদস্থলে, যাহার দোষ প্রমাণ হইবে, তাহার নিকট হইতে দণ্ড "স্বরূপ" কিছু আদায় করা হইবে।

(৫) যখন কোন লোকের বিবাহের অনুষ্ঠান হইবে, তখন তাহাকে একশত পান ও দশটী সুপারি দিতে হইবে।

(৬) যদি কোন উড়িয়া, অন্য লোকের নিকট দুই চার টাকা ধার করে, আর দুষ্টামি করিয়া তাহা শোধ করিতে না চায়—এবং এরূপ স্থলে মহাজন যদি নালিশ করে, তাহা হইলে পরামাণিক, খাতককে উক্ত ঋণের টাকা দিতে বাধ্য করিবে।

(৭) যে কোন উড়িয়া, নিজের শ্রেণী ভিন্ন—দুষ্টামি করিয়া অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করিবে, তাহাকে দণ্ড-স্বরূপ কিছু দিতে হইবে।

(৮) যে উড়িয়া নিজের জাতি ছাড়া অপরের অন্ন-গ্রহণ করিবে, তাহাকে দণ্ড-স্বরূপ কিছু অর্থ দিতে হইবে।

(৯) যদি কোন উড়িয়া-ব্যাপারী, বা কাপড়-বিক্রেতা, ভগবানের কৃপায় (?) কলিকাতায় ব্যবসা করিতে আসে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহার দোকানের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া দিবে।

(১০) উড়ে সেক্‌রা, ধোপা, চিনি-ব্যবসায়ী, মিস্ত্রী, শস্য-বিক্রেতাগণ কিছু কিছু বৃত্তি দিতে বাধ্য।

(১১) যে সকল উড়িষ্যাবাসীর কলিকাতায় মৃত্যু হইবে, তাহার

মৃত্যুসংবাদ তখনই পরামাণিকের বা সহরের মধ্যে উড়িয়া-সর্দ্দারের নিকট পাঠাইতে হইবে। এরূপ স্থলে পরামাণিক, সেই মৃত-ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি জন্য যে টাকা প্রয়োজন, তাহা মৃত-ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে দেওয়াইবেন। বাকী—যাহা থাকিবে, তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইবে। যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে—তাহা হইলে শ্রাদ্ধাদির ব্যয়ের জন্য কিছু দিয়া, বাকী যাহা তাহা পরামাণিকই লইবে।

(১২) যদি কোন উড়িয়া-বেহারা মরিয়া যায়, আর উক্ত মৃত ব্যক্তির কলিকাতায় কেহ না থাকে, তাহা হইলে পরামাণিক তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ছয় মাসকাল রাখিয়া দিবেন। ইতিমধ্যে দেশ হইতে যদি কোন উত্তরাধিকারী আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই মৃতের সমস্ত সম্পত্তি লইবে। কিন্তু এরূপ উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে—পরামাণিক, মৃত-ব্যক্তির সম্পত্তি কোন দাতব্য-কার্য্যে ব্যয় করিবেন।

(১৩) উড়িয়া-ব্রাহ্মণ ও যাদুকর-বৃত্তি (?) অবলম্বনকারী উড়িষ্যা-বাসিগণ পরামাণিককে সাধ্যমত কিছু দিবে।

একজন উড়িয়া পরামাণিক, তৎকালীন বোর্ড-অব-রেভেনিউর, সেক্রেটারি সাহেবের নিকট, তাহার প্রাপ্য বাব সম্বন্ধে, উল্লিখিত একটী তালিকা দাখিল করে। এইরূপ প্রথা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। গবর্ণর-জেনারেল সাহেবের চক্ষে, এই সকল বাব-আদায় প্রথা নীতি-বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, তিনি ১৭৯০ খৃঃ অব্দের ৫ই আগষ্টের ঘোষণাপত্র দ্বারা এই উপরি আদায়ের পথ বন্ধ করিয়া দেন।

এই "পরামাণিকই" সেকালের কলিকাতার অধিবাসী উড়িয়াগণের নেতা ছিল। এই ঘটনা হইতে জানা যাইতেছে—উড়িয়াগণ কোম্পানীর মধ্যের আমল হইতেই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরীর জন্য আসিয়া জুটিয়াছে।

উড়িয়া বেহারারা সেকালে অনেক বড় মানুষের বাড়ী চাকরি করিত। মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের অনেক উড়িয়া চাকর ছিল। তখনকার দিনে গাড়ী ঘোড়ার প্রচলন বেশী ছিল না। পাল্কীই তখনকার সাধারণের ব্যবহার্য্য যান ছিল। ভাড়াটিয়া পাল্কী ছাড়া, অনেক বাঙ্গালী ও সাহেব বড়লোক, ঘরের পাল্কীতে চড়িতেন। উড়িয়ারাই এই সব পাল্কী-বহন করিত।

কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে চিঠি পাঠাইবার পোষ্টেজের হার।

(১৭৯১ খৃঃ অব্দ)

	ঠিক ২॥ তোলা ওজনেরচিঠি	২॥ হইতে ৩॥ তোলা ওজনেরচিঠি	৬॥ হইতে ৭॥ তোলা ওজনেরচিঠি
বেনারস	।৶০ আনা	৸৵০ আনা	২॥৵০টাকা
পাটনা	।/০	॥৵০	১৸৵০
সারগটী ও রামগড়	।/০	॥৵০	১৸৵০
বৌগা (?) চৌসা	।৶০	৸৵০	২॥৵০
সরকার সারণ	।৵০	৸০	২।০
বক্সার	।৵০	৸০	২।০
ত্রিহুত	।৵০	৸০	২।০
রঘুনাথপুর	৶০	।৵০	১৵০
বারাকপুর, হুগলী, চন্দননগর	/০	৵০	।৵০
নদীয়া, শান্তিপুর, সুখসাগর	৵০	।০	৸০
বর্দ্ধমান	৵০	।০	৸০
সুরী, বীরভূম	৶০	।৵০	১৵০
মুর্শিদাবাদ	৵০	।০	৸০
বহরমপুর	৵০	।০	৸০
রাজমহল	৶০	।৵০	১৵০
ভাগলপুর	৶০	।৵০	১৵০
পুর্ণিয়া ও কুচবেহার	।০	॥০	১॥০
রঙ্গপুর ও দিনাজপুর	।০	॥০	১॥০
নাটোর	৶০	।৵০	১৵০
মুঙ্গের	।০	॥০	১॥০
ঢাকা	৶০	।৵০	১৵০
কয়দা (Coydah)	।/০	॥৵০	১৸৵০
শিলেট	।/০	॥৵০	১৸৵০

সাহেব-চোর।

গত মঙ্গলবার রাত্রে (১৭৯১—নবেম্বর) চৌরঙ্গীর পথে, তিনজন সাহেব রাহাজানি ও চুরী করিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা জাহাজের নাবিক। এই ব্যাপারে এক ভদ্রলোকের সোণার-ঘড়ী ও সোণার-চেন খোয়া গিয়াছে। যে কেহ এই সমস্ত অপহৃত দ্রব্যের বা চোরের কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে বা চোর ধরাইয়া দিতে পারিবে, তাহাকে চারিশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। (২।১১।১৭৯১)

সূর্য্যাস্তের পর মদের দোকান-বন্ধ।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে—মদের দোকানের অধিকারীগণ এই নোটিসের তারিখ হইতে, ঠিক সূর্য্যাস্তের সময় তাহাদের মদের দোকান বন্ধ করিবেন।

পুলিশ আফিস
১৯ নবেম্বর ১৭৯১ } জি, সি, মেয়ার
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

জগন্নাথের-রথে সিপাহীর বন্দোবস্ত।

"প্রত্যেক সেনাদল হইতে, একজন জমাদার ও ২০ জন করিয়া সিপাহী লইয়া, একটী দল সংগঠিত হইবে। এই জমাদার ও সিপাহী, হিন্দু ব্রাহ্মণ হওয়া চাই, কারণ তাহাদিগকে পুরীধামে, জগন্নাথের-রথের সময় পাহারা দিতে হইবে। তাহারা দুই তিনদিন, জগন্নাথক্ষেত্রে থাকিয়া যাত্রীদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবে।" (Extract from D. O. dated 26/12/1792.)

লাট-সাহেবের বল।

সেকালে বল ও সপার (নাচ ও রাত্রে-ভোজনের) নিমন্ত্রণ উৎসব লাট-সাহেবের বাড়ীতে হইত না। তখন বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদের অস্তিত্ব-মাত্র ছিল না। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী তাহার প্রমাণ—"সে সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণ ইংলণ্ডেশ্বরের ও কোম্পানী-বাহাদুরের সেনাবিভাগে ও সিভিল-বিভাগে নিযুক্ত আছেন, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাদিগকে ১৮ই জানুয়ারি (১৭৯৩) থিয়েটার-গৃহে বল ও সপারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ঐ দিন ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মতিথি, এইজন্যই এই ভোজের ও আমোদের আয়োজন।" (C. G. 10/1/1793)

বজবজ্ দুর্গত্যাগ।

বহুকাল হইতে ঐতিহাসিক বজবজ-দুর্গ, কোম্পানীর দখলে ছিল। নবাব রাজউদ্দৌলার সময়ে ও তাহার পূর্ব্ব হইতে "বজবজের-কেল্লা" ইংরাজের কটী প্রধান আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে, তাঁহার াদেশে, বজবজ-দুর্গ পরিত্যক্ত হয়। এখানে যে সমস্ত কামান ও যুদ্ধের জ-সরঞ্জাম ছিল, তাহা গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের আদেশে, নবনির্ম্মিত র্ত্তমান ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গে স্থানান্তরিত হয়। এই সঙ্গে বজবজ-দুর্গ, ঘর ও তৎসংক্রান্ত বাড়ীঘরগুলি, বোর্ড অব রেভেনিউয়ের হস্তে দেওয়া য়। (৭-৩-১৭৯৩)। ইহার পরে ২৩এ মে (১৭৯৩) খৃঃ অব্দের নোটীশ ইতে জানিতে পারা যায়, "সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে াগামী ১০ই জুন (৩০এ জ্যৈষ্ঠ ১২০০ সাল) ২৪ পরগণার কালেক্টার াহেবের কাছারীতে, অনারেবল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বজবজিয়ার য সমস্ত বাড়ীঘর ও মালামাল আছে, তাহা প্রকাশ্য-নীলামে বিক্রয় রা হইবে। এই সমস্ত বাড়ীঘর ও জিনিস-পত্র দেখাইবার জন্য জবজিয়াতে কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারীকে রাখা হইয়াছে।

সহরের পথে কুকুরের উৎপাত।

"পুলিশ-কমিশনারগণ সাধারণকে জানাইতেছেন, কলিকাতা সহরের াজপথে, কুকুরের উৎপাত বড় বেশী হইয়াছে। এজন্য স্ক্যাভেঞ্জার-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে—যে আগামী ২১শে মে হইতে (১৭৯৩ খৃঃ অব্দ) জুন মাসের ১লা তারিখ পর্য্যন্ত, সহরের পথে যে সমস্ত কুকুর দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকে হত্যা করা যাইবে। প্রত্যেক মৃত কুকুরের জন্য, দুই আনা হিসাবে পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাঁহাদের পোষা কুকুর আছে, তাঁহারা যেন ঐ—নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদের কুকুরগুলিকে বাহিরে ছাড়িয়া না দেন। এই প্রথানুসারে এখনও Stray dog সম্বন্ধে নোটিস্, পুলিস আফিস হইতে বাহির হইয়া থাকে। (Police Notification May 21st—1793)

পাল্কীর ভাড়া।

বালেশ্বরবাসী উড়িয়া বেহারাদের সর্দ্দার-পরামাণিকদিগকে, জষ্টিস-

অব-দি-পিস্ মহোদয়দিগের নিকট আহ্বান করিয়া পালকীর ভাড়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধানগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারাও এই মতে কার্য্য করিতে স্বীকৃত। (Order dated 28-5—1794) Office of the Sitting Justices.

(১) পাঁচজন ঠিকা বেহারার জন্য সমগ্র একদিনের জন্য—ভাড়া, এক সিক্কা টাকা।

(২) ঐ ঐ ঐ অর্দ্ধদিনের জন্য—আট আনা মাত্র।

(৩) কলিকাতার বাহিরে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত দূরে যাইতে হইলে, প্রত্যেক বেহারার ভাড়া দৈনিক চারি আনা।

(৪) চারি ক্রোশ বা আট মাইলের ভাড়া একদিনের ভাড়ার মত।

উড়িয়া বেহারাদের সর্দ্দার পরামাণিকেরা, এই ভাড়ায় স্বীকৃত হইয়া তাহাদের নাম সহী করিয়া দিয়াছে।

স্যার উইলিয়ম জোন্স।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর, স্যরজন্ শোর, গবর্ণর জেনারেল হন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলেই বর্ত্তমান "এসিয়াটিক-সোসাইটীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তখন গবর্ণরেরাই, সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি পদে নিযুক্ত হইতেন। স্যর উইলিয়াম, বহু ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, পারসী প্রভৃতিতে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনে, তিনি সুপ্রীম-কোর্টের জজরূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, মেধাবী, সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ, সর্ব্ববিধ জ্ঞানাধার, মহাপণ্ডিত জজ্ এদেশে একজনও আসেন নাই। তিনি হিন্দু-পণ্ডিত ও মুসলমান-মৌলবীদিগের সহায়তায়, হিন্দু ও মুসলমান আইন-ঘটিত মোকদ্দমা সমূহের বিচার করিতেন। তাঁহার হিন্দু-সহকারীকে "জজ্-পণ্ডিত" বলিত। প্রবাদ এই, সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জোন্সের আমলে জজ্-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। স্যর উইলিয়াম জোন্স, গার্ডনরিচে একটী বাগান বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার আমলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগেরই আমূলে সংস্কার হইয়াছিল। সেকালে কলিকাতায় চোর-ডাকাতের বড় উৎপাত ছিল। স্যর উইলিয়াম, তাহাদের প্রায় একরূপ উচ্ছেদ করিয়া যান। তিনি বলিতেন—"আমি যদি পৃথিবীর সমস্ত ভাষা না শিখিয়া মরি, তাহা হইলে আমার জন্য কেহ যেন অশ্রুপাত না করে।"

স্যর উইলিয়াম জোন্সের মৃত্যুর পর, এসিয়াটিক্-সোসাইটির এক বিশেষ অধিবেশনে (২রা মে ১৭৯৪) গবর্ণর জেনারেল স্যর জন্ শোর (পরে লর্ড টেন্‌মাউথ) মৃতব্যক্তির গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া, একটী সুদীর্ঘ সন্দর্ভ পাঠ করেন। উক্ত সন্দর্ভ অতি দীর্ঘ ও নানা কথায় পরিপূর্ণ। সবিস্তারে তাহা অনূদিত করা অসম্ভব। এজন্য আমরা তাহার একটী সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। ইহা হইতে পাঠক দেখিবেন, স্যর উইলিয়াম জোন্স কিরূপ প্রতিভাশালী ও বাণীর বরপুত্র ছিলেন। গবর্ণর সাহেবের বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই—

"এই সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যর উইলিয়াম জোন্স, ইহজগতে আর নাই। কিন্তু তিনি আমাদের সকলের মনের মধ্যে জাগ্রতভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় একজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিতকে সভাপতিরূপে পাইয়া এই সভা ধন্য হইয়াছে।

তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা কতদূর ছিল, তাঁহার জ্ঞান কতদূর বৈচিত্রময়ী ছিল, তাঁহার গবেষণা কিরূপ মৌলিক ছিল, নানাদেশের ভাষায় অতি অল্প বয়সে তিনি কিরূপ ভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিবার অধিকার ও শক্তি আমার নাই।

পৃথিবীর সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান ভাষায়, তিনি প্রচুর দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীক্ ও রোমান-সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ ও অপরিমেয়। কিশোর অবস্থাতেই, তিনি এই পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ্, ইটালিয়ান, জর্ম্মান ও পর্টুগীজ ভাষাতেও তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। জীবনের মধ্যাবস্থায়, তিনি প্রাচ্য-ভাষা সমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সর্ব্বপ্রথমে হিব্রু, তৎপরে, পারসী ও আরবী ভাষা তাঁহার আয়ত্তাধীনে আসে। তুর্কি ও চীনভাষাতেও তাঁহার মোটামুটি জ্ঞান হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে আগমনের পর, তিনি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। প্রগাঢ় মনীষাবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা একবাক্যে আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন, সংস্কৃতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি অতি গভীর ও ভাষাজ্ঞান অতি প্রশংসনীয়। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি এই সমস্ত পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া আনি। পণ্ডিতেরা, স্যর উইলিয়ামের মৃত্যুতে অধীর হইয়া, আমার সম্মুখে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সুপ্রীমকোর্টের জজরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া, তিনি মূল পারসী ও আরবী ভাষা হইতে মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আইনের মুসুবিদা করেন। সংস্কৃত হইতে হিন্দু-দায়াধিকার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থার সঙ্কলন করেন। যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান অর্থী-প্রত্যর্থী, মোকদ্দমার বিচারকালে, তাহাদের জাতীয়-আইন হইতে, যথারীতি সাহায্য পায়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে তিনি কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। এই জন্য তিনি হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র "মনুসংহিতা" ও মুসলমানের দায়াধিকার তত্ত্বসম্বন্ধীয় পুস্তক "সীরাজিয়া" "জেইদ" প্রভৃতি আরবী-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

স্যর উইলিয়াম জোন্সের গুণ-গরিমা, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে. অনেক কথাই গবর্ণর জেনারেল স্যর জন শোর বলিয়া গিয়াছেন। তাহার সবিস্তার অনুবাদ দিতে গেলে, আট দশটী পৃষ্ঠা হইয়া পড়ে। ধরিতে গেলে, তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত-ইংরাজ, এদেশে খুব কম আসিয়াছিলেন। স্যর উইলিয়াম জোন্স, বহু বিষয় সম্বন্ধে, যে সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ বা রচনা করিয়াছিলেন, আমরা গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের বর্ণিত তালিকা হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতেই পাঠক, তাঁহার অদ্বিতীয় মনীষার ও গবেষণার পরিচয় পাইবেন।

(ভারতবর্ষ সম্বন্ধে)।

(১) ভারতের পুরাতন ভুগোল (পুরাণাদি হইতে)।

(২) ভারতীয় নানাবিধ. গাছগাছড়া ও ভৈষজ্য সম্বন্ধে, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান। (নানা কোষ হইতে সংগৃহীত)।

(৩) পাণিনি ব্যাকরণের সার মর্ম্মানুবাদ।

(৪) ৩২ খানি অভিধান ও নিরুক্ত হইতে সঙ্কলিত—সংস্কৃত ভাষাভিধান বা শব্দকোষ।

(৫) প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীত শাস্ত্র।

(৬) ভারতীয় ভৈষজ্য-বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ ও দ্রব্যগুণাভিধান।

(৭) ভারতের পুরাকালের বিজ্ঞান ও দর্শনাদির স্থূল মর্ম্ম।

(৮) বেদের অনুবাদ।

(৯) প্রাচীন হিন্দুদিগের জ্যামিতি, বীজগণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র।

(১০) পুরাণ সমূহের অনুবাদ।

(১১) মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদ।

(১২) ভারতীয় প্রাচীন নাট্যকলা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সন্দর্ভ।

(১৩) হিন্দু জ্যোতিষ ও গ্রহ-বিজ্ঞান।

(১৪) ভারতের হিন্দুপ্রধান কালের ইতিহাস (মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) কাশ্মীরের সংস্কৃত ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত।

আরবী।

(১) মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরব দেশের ইতিহাস।

(২) হামাসার অনুবাদ।

(৩) হারিরির অনুবাদ।

(৪) তকাবাৎ-উল্-খুল্সার অনুবাদ।

পারসী।

(১) সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক্, তুর্কী পারসীর প্রাচীন পুস্তকাদি হইতে সঙ্কলিত পারস্যের ইতিহাস।

(২) মহাকবি ফর্দ্দুসীর "খরচনামা"।

(৩) পারসী ভাষার অভিধান।

(৪) নিজামীর পদ্য সমূহের গদ্যানুবাদ।

চীন।

(১) শি-শিং এরং অনুবাদ।

(২) কন্ফুৎসুর অনুবাদ।

তাতার।

(১) মোগল, অটোম্যান, প্রভৃতি তাতার-জাতির বিস্তৃত ইতিহাস। (তুর্কী ও পারস্য ভাষা হইতে অনূদিত)।*

সাহেব চোরের উৎপাত।

পুলিস্ আফিস হইতে ১৭৯৫ খৃঃ অব্দের ১৬ এপ্রিল একটী নোটীশ জারি হয়, তাহার মর্ম্ম এই—

"গত দুই মাস কাল ধরিয়া এস্প্লানেড ও কেল্লায় যাইবার ও আসিবার পথে ও ময়দানে, বড়ই রাহাজানি চলিতেছে। নীচ প্রবৃত্তির সাহেবেরা যে

* A discourse delivered at a meeting of the Asiatic Society on the 2nd of May 1794 by Sir John Shore Bart. President,

ছদ্মবেশে এই সমস্ত রাহাজানি করিয়া থাকে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ফোর্ট-উইলিয়ামের দুর্গের কয়েকজন গোরা-সৈনিককে, এই ব্যাপারে জড়িত বলিয়া প্রমাণ হওয়ায়, সাধারণকে জানান যাইতেছে—যাঁহাদের জিনিস পত্র খোয়া গিয়াছে, তাঁহারা কলিকাতা সহরের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিবেন।

কলিকাতা হইতে কাশী।

সেকালের জেনারেল পোষ্টাফিসের ২২ মার্চ্চ (১৭৯৬) তারিখের এক নোটীশ হইতে জানা যায়, পোষ্টাল-ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা হইতে পাটনা ও বেনারস যাতায়াতের সম্বন্ধে আর একটী নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

"সাধারণকে জানান যাইতেছে—সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের আদেশে, কলিকাতা হইতে বেনারস ও পাটনা পর্য্যন্ত পুনরায় ডাক বসান হইয়াছে। ভাড়ার নিয়ম এই—

কলিকাতা হইতে বারাণসী—৫০০ সিক্কা টাকা।
কলিকাতা হইতে পাটনা—৪০০ "

যাঁহারা এই পথের মধ্যে অন্য কোন মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে মাইল হিসাবে এক টাকা দুই আনা ভাড়া দিতে হইবে। এক ক্রোশের ভাড়া দুই টাকা চারি আনা।

ডাকবেহারা ভাড়া লইবার জন্য, পোষ্টমাষ্টার জেনারেল (জেনারেল পোষ্ট-আপিস) বলিয়া দরখাস্ত করুন। বারাণসী, পাটনা, চৌসা প্রভৃতি স্থানের পোষ্ট-মাষ্টারদিগের নিকট আবেদন করিলেও চলিবে। যাঁহারা কলিকাতা হইতে বারাণসীর মধ্যপথে কোন ষ্টেসনে অবতরণ করিবেন, পোষ্টমাষ্টারকে পূর্ব্বে জানাইলে, তিনি ডাকবেহারা বন্দোবস্ত ও যাইবার ভাড়া ঠিক করিয়া দিবেন।

তখনকার দিনে কাশী যাইবার ভাড়া ছিল পাঁচশত টাকা। এখনকার দিনে থার্ড-ক্লাশে পাঁচটী টাকা দিলেই কাশী যাওয়া হয়। সেকালে যাঁহারা খুব বড়লোক, তাঁহারা ভিন্ন কাশী যাইতে অপরে সক্ষম হইতেন না।

মহারাজ নবকৃষ্ণের দান।

নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সেণ্টজন

গির্জ্জা-নির্ম্মাণের জন্য, মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর, তাঁহার নিজখরিদা ছয় বিঘার উপর জমী, সাহেবদের দান করেন। শুনিয়াছি, এই দানপত্র ও তৎসঙ্গে হেষ্টিংসের ধন্যবাদ-পত্র, এখনও সেণ্টজন-গির্জ্জার মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত। এই গির্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য, একটী কমিটী সংগঠিত হয়। এই কমিটীর মধ্যে স্বয়ং গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস হইতে, সেকালের সমস্ত পদস্থ ইংরাজ, কার্য্যকারকরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই কমিটীর সম্পাদক সাহেব—এই দানের জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিয়া যে পত্র লেখেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি এই—

Letter of Thanks From The Gentlemen of The Church Committee—To Maharaja Nobkissen Bahadur of Calcutta.

Sir.

The Committee of Gentlemen appointed by the subscribers for erecting a church, to carry into effect the purpose of their subscription,have received from the Honorable Governor General and Council, a copy of your Durkhast in which you give and make over to the Hon'ble Warren Hastings Esquire, Governor General, in order that a Church may be erected thereon, Six Bighas and ten Biswas of land purchased by you for your own use in Calcutta.

This gift is a most liberal instance of your generosity and has afforded to the English Settlement general, a great and most seasonable aid, towards giving effect to their wishes for building a place of public worship and I am, desired, Sir, to render you the thanks of the Committee for it.

I am also to acquaint you that the Hon'ble Governor General aud Council, entertain the same sense of your liberality and have particularly marked it in a letter which they have lately written to the Hon'ble the Court of Directors.

I am Sir,

Your Most Obedient humble Servant.

(Signed by the Secretary to the Committe.)

চাউলের দরবৃদ্ধি।

কলিকাতায় চাউলের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে—ইহা বড় ভাবনার কথা। বেনারস ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবারে শস্য জন্মায় নাই, এজন্য শস্যাদি ঐ সমস্ত স্থানে চালান হওয়াই, বোধ হয় এ মূল্য বৃদ্ধির কারণ। কলিকাতা সহরে আজকাল যে দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে, তাহার তালিকা এই—*

মুরশীদাবাদী চাউল	(টাকায়)	সাতাশ সের।
পাট্‌নাই ”	”	ঐ
দিনাজপুরী ”	”	আটাশ সের।
হুগলী ও হিজলীর চাউল ১নং	(”)	কুড়ি সের।
ঐ ঐ ২নং	(”)	পঁচিশ সের।
বীরভূম ও বৰ্দ্ধমানের চাউল	(”)	বাইস সের।

কলিকাতা ভবানীপুরে ডাকাতি।

“গত শুক্রবার রাত্রে, একদল ডাকাত ভবানীপুরের একজন ভদ্রলোকের বাটীতে প্রবেশ করে। তাহারা গৃহস্বামীকে মাটীতে ফেলিয়া, তাহার গলা টিপিয়া ধরে। এজন্য সে বেচারা প্রথমে একটুও চীৎকার করিতে পারে নাই। বিশেষ সুযোগ পাইয়া, তাহারা প্রায় সহস্রাধিক টাকা সংগ্রহ করে। তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। ডাকাতেরা কতকগুলি দরকারী কাগজপত্রও লইয়া গিয়াছিল। ভদ্রলোকটী তাহা জানিতে পারিয়া, ডাকাতদের চীৎকার করিয়া বলেন - “আমার দরকারী কাগজগুলি আমাকে ফিরাইয়া দিয়া যাও।” ডাকাতেরা তাঁহার এ চীৎকারের অর্থ বুঝিতে না পারায় মনে ভাবিল—লোকটা গোলমাল করিয়া হয়তঃ লোকজনকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। এজন্য তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তিনবার পিস্তলের আওয়াজ করে। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটীর সৌভাগ্যক্রমে একটীও তাঁহার গায়ে লাগে নাই।

যে ভদ্রলোকের বাটীতে ডাকাতি হইয়াছিল, তাঁহার কোন নামোল্লেখ নাই। তখনও চৌরঙ্গী অঞ্চলের অনেকাংশে জঙ্গলপূর্ণ এবং লোকের বসবাস হয় নাই, সুতরাং এরূপ ডাকাতি অসম্ভব নহে।†

* Calcutta Gazette 9—4—1789

† Calcutta Gazette 22—1—1789

মহরম ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে মহাদাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড।

— আমরা বর্ত্তমান বৎসর হইতে ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের আর একটী সংবাদ দিতেছি। এ সংবাদটী তৎকালীন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়।

"এই বৎসরে দুর্গোৎসব ও মহরম একই সময়ে পড়ে।* এই উপলক্ষে বাজারে ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী ছোট খাট দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত ঘটনাটী অতি ভয়ানক। এজন্য ইহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।"

"গত সোম[illegible] অপরাহ্নে (১লা অক্টো[illegible]

বরাহনগরের ডাকাতি।

৩০এ এপ্রিল (১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দ) তারিখের, গেজেটে প্রকাশ হয়—"গত বৃহস্পতিবার রাত্রে একদল অস্ত্রধারী ডাকাত, বরাহনগরের দত্তরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে ডাকাতি করিতে যায়। বাড়ীতে যাহা কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল, সবই ডাকাতেরা লইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত লুণ্ঠিত-সম্পত্তির মূল্য দশ হাজার টাকা। ডাকাতেরা যখন লুটপাট করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তখন চট্টোপাধ্যায় তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন—"আচ্ছা! এখন তোমরা যাও। পরে আমি তোমাদের দেখিয়া লইব। তোমাদের সনাক্ত করিবার জন্য আমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। আদালতে তোমাদের ভাল করিয়া দেখিব।" এই কথা শুনিয়া ডাকাতেরা পুনরায় ফিরিয়া আসে—এবং অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার শরীরের চারি পাঁচ স্থানে "রাম-দা" দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। এই চট্টোপাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ তুলা-ব্যবসায়ী। ইহাঁর মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করিবার জন্য আনা হইলে—ইহার স্ত্রীও সেই সময়ে সহমরণে যান।*

বাজারে হত্যাকাণ্ড।

গত শনিবার (১লা অক্টোবর ১৭৮৯) সুতালুটী-হাটখোলা বাজারে, একজন কয়লা-বিক্রেতার শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে। লোকটা এই বাজারের একজন পুরাতন কয়লা বিক্রেতা। বাজারের ইজারাদার, তাহার নিকট

* গেজেটের লেখক Chatterjee র স্থলে Chillimille ও Baranagar কে Balanagar বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা সেকালের সাহেবদের দেশীয় নাম ও উপাধিজ্ঞানের অজ্ঞতার ফল। (Calcutta, Gazette—30-4-1789)

[illegible] ব্রাহ্মণ, [illegible]
একজন প্রসিদ্ধ ধনী নিমাই মল্লিকের বেহারাও সেই সময়ে সেই পথ [illegible]
যাইতেছিল। সহসা সেই ব্রাহ্মণের গায়ে, বেহারার গা ঠেকে। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই চাকরকে এক চপেটাঘাত করেন। চাকরও মায় সুদ সেই আঘাত ফিরাইয়া দেয়। ব্রাহ্মণ পরিশেষে, নিমাই মল্লিকের বাটীতে গিয়া বলে—"আপনার চাকর আমাকে মারিয়াছে।" নিমাই মল্লিক, চাকরকে ডাকাইয়া এই বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে জানিতে পারেন, যে ব্রাহ্মণই প্রথমে চাকরকে প্রহার করেন। কাজেই তিনি বলেন—"চাকরের কোন দোষই নাই। আপনি চলিয়া যান।" ব্রাহ্মণ ইহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হন এবং পরদিন প্রাতে একটী বন্দুক হস্তে উক্ত মল্লিকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া, দরোজার পার্শ্বেই আত্মহত্যা করেন।"

"এই ব্যাপারে ভয়ানক হুলস্থুল বাধিয়া যায়। নিমাই মল্লিকের চাকরেরা, ভয়ে দরোজা বন্ধ করিয়া দেয়। সেই স্থলে অনেক লোক সমবেত হইয়া একটা মহা জনতা উপস্থিত করে। অন্যান্য পশ্চিমে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া, নিমাই মল্লিকের বাটীর সম্মুখেই চিতা-রচনা করিয়া, মৃত-দেহ দাহ করে। পাছে এই অসন্তুষ্ট নাগরিকগণ, তাঁহার বাড়ী লুঠ করে, এই ভয়ে তিনি পুলিসের বড়-কর্ত্তা মট্ সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পুলিস হইতে চোপদারগণ আসিয়া তাঁহার বাটী চৌকী দেয়।* ইহা হইতেছে ১২৫ বৎসরের পূর্ব্বে ঘটনা। তখন কলিকাতার এই সব অসম্ভব ঘটনাও ঘটিত। (সংবাদ)

---

* সম্ভবতঃ এই মট্ সাহেবের নাম হইতে "মট্স্-লেন" নামকরণ হইয়াছে। এ লেনটী এখনও বর্ত্তমান।

মহরম ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে মহাদাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড।

— আমরা বর্ত্তমান বৎসর হইতে ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের আর একটী সংবাদ দিতেছি। এ সংবাদটী তৎকালীন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়।

"এই বৎসরে দুর্গোৎসব ও মহরম একই সময়ে পড়ে।* এই উপলক্ষে বাজারে ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী ছোট খাট দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত ঘটনাটী অতি ভয়ানক। এজন্য ইহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।"

"গত সোমবার অপরাহ্নে (১লা অক্টোবর ১৭৮৯) কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ধনী ও বেনিয়ান, রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গা-প্রতিমা, ভাসানের জন্য রাজপথে বাহির করা হয়। প্রতিমার সঙ্গে অনেক লোকজন ছিল। পালকীতে বাড়ীর মেয়েরাও ছিলেন। দরোয়ান-পাইক, আশাসোটারও অভাব ছিল না। বৈঠকখানা বাজারের নিকট প্রতিমাখানি আসিলে, একদল মুসলমান সেই প্রতিমা আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে, ভয়ানক দাঙ্গা বাধে, ও উভয় পক্ষের লোকজন জখম হয়। অবশেষে মুসলমানেরা প্রতিমাখানিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়। তৎপরে রামকান্ত বাবুর পুত্রবধূর পালকীও বদমায়েসেরা আক্রমণ করে, ইহাতে তাঁহার পুত্র-বধূ সাংঘাতিকরূপে আহত হন। রামকান্ত বাবু, এ ব্যাপারে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য, পরদিন (মঙ্গলবার) প্রাতে, ষাটজন অস্ত্র-ধারী বরকন্দাজ লইয়া, বৈঠকখানা-অঞ্চলে মুসলমানদের যতগুলি "দরগা" ছিল, সবই ধ্বংস করিয়া দেন।

"মুসলমানেরা সেইদিন সন্ধ্যার সময়, দুই তিনশত লোক সংগ্রহ করিয়া একটী দল বাঁধে। রামকান্তের বাটী, অস্ত্রধারী প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত, সুতরাং তাঁহার কিছু করিতে না পারিয়া, তাহারা বৌবাজারে সুখময় ঠাকুরের বাটী আক্রমণ করে। যাহা কিছু তৈজসপত্র, জুয়েলারি সবই লুঠ করে। পাঁচ হাজার টাকার সোনার-মোহর, ও আট হাজার টাকার কোম্পানীর-বণ্ড ও সার্টিফিকেট প্রভৃতিও তাহারা লুঠ করিয়া লইয়া যায়। যাইবার সময়ে, সেই বাটীর মধ্যে দুইটী গোহত্যা করে।

* ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে মিউটিনির বৎসরেও, দুর্গোৎসব ও মহরম এক সময়ে পড়িয়াছিল। তাহার পর এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই।

সুখময় ঠাকুর ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করেন। এই ব্যাপারে, তাঁহার দুই-জন ভৃত্য ও একজন দরোয়ান নিহত হয়। মুসলমানদের পক্ষে অনেকে আহত হইয়াছিল।"

সুপ্রীমকোর্টে, মিঃ জষ্টিস হাইডের নিকট, এই মোকদ্দমার বিচার হইতেছে। জজের নিকট সুখময় ঠাকুর এফিডেবিট করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার বাটী হইতে লুণ্ঠিত অনেক মালামাল, মুসলমানেরা নিকটস্থ এক মাদ্রাসায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। এজন্য জজ বাহাদুর* সার্চ্চওয়ারেণ্টের আদেশ দেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, অনেক অপহৃত দ্রব্য, এইস্থানে পাওয়া গিয়াছে ও অনেকগুলি দাঙ্গাকারী, পুলিসের হস্তে ধৃত হইয়াছে।

মচ্ছিবাজারে (মেছুয়াবাজারে?) কানাই-বৈরাগীর বাটীও এইরূপে লুঠ করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কোম্পানীর সিপাহীরা আসিয়া পড়ায়, দুর্বৃত্তেরা পলায়ন করে।

সহরের মধ্যে শান্তি-স্থাপনের জন্য, কোম্পানী-বাহাদুর নানাস্থানে সিপাহী পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

কালিদাসের শকুন্তলা।

সুপ্রীমকোর্টের মহানুভব বিচারক—পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, স্যর উইলিয়ম জোন্স মহোদয় প্রাচীন হিন্দু-নাটক শকুন্তলা (Fatal Ring) ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, অসমর্থ অধমর্ণদের (Insolvent Debtors) উদ্ধারের জন্য ব্যয়িত হইবে, জজ-বাহাদুর এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এ মহত্ত্বময় দান প্রশংসনীয়।

স্যর উইলিয়ম জোন্সকে ভগবান, আদর্শ মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণা যেরূপ অদ্বিতীয়, নিরপেক্ষ বিচার পদ্ধতি ও অপরাধীর প্রতি দয়াও সেইরূপ অতুলনীয়। তিনি অতিশয় শান্ত প্রকৃতির লোক হইলেও, কলিকাতার চোর-বদমায়েসেরা তাঁহার নামে ভয়ে কাঁপিত। হিন্দু-আইন ঘটিত ব্যাপারের বিচার সময়ে, তিনি একজন পণ্ডিতের সাহায্য লইতেন। অক্ষম যোত্রহীন আসামীরা, তাঁহার আদেশেই জেলে প্রেরিত হইত, কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জরিমানার টাকা প্রভৃতি নিজের পকেট হইতে দিয়া তাহাদের মুক্তির উপায় করিতেও ছাড়েন নাই।

* মিঃ জষ্টিস হাইড, মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমার একজন বিচারক ছিলেন।

আর কাহারও মুখে কখনও শুনি নাই। জীবিতাবস্থায় সমাধি হওয়া আরও ভয়ানক ব্যাপার! যদি আপনার পাঠকগণের মধ্যে কাহারও চক্ষে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সাধারণে প্রকাশ করিলে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিব।"

কাশীনাথ বাবুর মৃত্যু।

গত সোমবার (১২-৪-১৭৯২) কলিকাতার জনৈক বিখ্যাত ধনী কাশীনাথ বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। কাশীনাথ বাবু একজন সর্ব্বজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার নিজের নির্ম্মিত গঙ্গাতীরস্থ ঘাটে, মৃতদেহ ভস্মীভূত করা হয়। প্রচুর চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা চিতা রচিত হইয়াছিল। তাঁহার চারিটী সহধর্ম্মিণী। সুখের বিষয়, ইহাদের কেহই স্বামীর সহিত সহমৃতা হন নাই। লোকের বিশ্বাস, কাশীনাথ বাবু মৃত্যুকালে ষাট লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। এক উইল দ্বারা তিনি এই সম্পত্তি তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সমানাংশে বিভাজিত করিয়া দিয়াছেন। এই কাশীনাথ বাবু, নন্দকুমারের মোকদ্দমায়, একজন গণনীয় সাক্ষী ছিলেন।

সুখসাগরে বাঘ।

সুখসাগরে (নদীয়া বিভাগে) তিনটী খুব বড় বাঘ বাহির হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, বারেটো সাহেব তাহাদের একটীকে গুলিদ্বারা নিহত করিয়াছেন। অপর দুইটীকে ফাঁদ পাতিয়া ধরা হয়। (১৯।৪।১৭৯২)

সুখসাগর তখন একটী স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। অনেক পদস্থ ইংরাজ, নৌকা বোট বজরা করিয়া, সুখসাগরে বেড়াইতে ও শিকার করিতে যাইতেন।

সেকালের বাঙ্গালীদের অভিনন্দনের নমুনা।

লর্ড কর্ণওয়ালিস, ভারতের ইংরেজাধিকারের সেনাপতি ও গবর্ণর-জেনারেল দুইই ছিলেন। সেকালের গবর্ণর জেনারেলদের এই দুই কাজই করিতে হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিসের অমিত পরাক্রমে, টিপু সুল-তানের ধ্বংশ-সাধন হয়। "শ্রীরঙ্গপত্তন-অবরোধ" ভারতেতিহাসের একটী অত্যুজ্জ্বল ঘটনা। এই যুদ্ধ উপলক্ষে, লর্ড কর্ণওয়ালিসকে বহুকাল ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে থাকিতে হয়। বিজয়লাভান্তে যখন তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময়ে কলিকাতার ইংরাজ-সম্প্রদায়, তাঁহাকে

একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। এ অভিনন্দন পত্র অবশ্য ইংরাজী ভাষাতেই দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত সেকালের কলিকাতা সহরের গণ্যমান্য বাঙ্গালীগণ, লর্ড সাহেবকে পারসী ভাষায় একখানি অভিনন্দন দান করেন। তাহা এই—

অসীম সম্মানাস্পদ, অমিত বীরচূড়ামণি, শ্রীল শ্রীযুক্ত আরল্ কর্ণওয়ালিস কে, জি, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর বরাবরেষু—

টিপুসুলতানের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল, ভগবান আপনাকে জয়যুক্ত করিবেন। যাহাতে আপনি রণজয়ী হইয়া বিজয়-গৌরব লাভ করেন, তজ্জন্য আমরা ভগবৎসমীপে চিরদিন প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি।

আপনি মহাবল-চমূ লইয়া শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করেন। অসীম সাহসে শত্রুবিজয় করিয়া আপনি এখন যশস্বী। যেমন অগ্নি-সংযোগে, তৃণের সম্পূর্ণ ধ্বংশসাধন হয়, আপনার অমিতবিক্রমে শত্রুসৈন্য সেইরূপ ধ্বংশ হইয়াছে।* ইহাতে আপনি যশোগৌরবে অমরত্বলাভ করিয়াছেন এবং এই বিজয়-ব্যাপারে আপনার প্রজাগণের সম্পত্তি, সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন।

সেকালের নববর্ষের উৎসব।

আজকাল নববর্ষের দিনে গড়ের মাঠে কুচ-কাওয়াজ, সৈন্যপ্রদর্শনী ও উপাধি বিতরণ হইয়া থাকে। সেকালে অর্থাৎ ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ-ভাবে উৎসব হইত—তাহা দেখুন।

"গত মঙ্গলবার ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মদিন উপলক্ষে, ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ হইতে তাঁহার সম্মানার্থে প্রভাত-প্রারম্ভে তোপধ্বনি হইয়াছিল। অপরাহ্নে

---

* পাঠকের অবগতির জন্য এই অভিনন্দনের একটী প্যারাগ্রাফের মূল এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

Your Lordship entered the enemy's country with a brave army, and by the ardour of your courage destroyed the enemy's numbers in every place, as straw is consumed by fire and by thus humbling his (Tippoo's) pride accomplished of our prayers, the news of which was equally as a draught from the cup of immortality. Your Lordship has secured the safety of our persons, liberty and properties. (Extract from an Address to Right Hon'ble Earl Cornwallis signed by (162) principal Native Inhabitants of Calcutta.

লর্ড কর্ণওয়ালিস, থিয়েটারগৃহে একটী নাচ ও সান্ধ্য-ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। অনেক পদস্থসাহেব, এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। মিসেস চ্যাপম্যান, প্রথমে নৃত্য স্থচনা করেন। রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত সাহেবী-নাচ চলিয়াছিল। রাত্রি বারটার সময়, নিমন্ত্রিত অতিথিগণ ভোজনাগারে গিয়া আহারাদি শেষ করেন। তাহার পর তাঁহারা পুনরায় থিয়েটার-হলে ফিরিয়া আসেন, এইবার বাইনাচ প্রভৃতি আরম্ভ হয়। এ দেশীয় নৃত্যকলা দেখিয়া, সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাত্রি চারিটার সময় এই নৃত্য শেষ হয়।

তখনকার দিনে নববর্ষ উৎসবে সমস্ত রাত্র-ব্যাপী বল ভোজ হইত। এই ভোজ-সভায়—এ দেশীয় নৃত্যকলাও প্রচলিত ছিল। বাইনাচ প্রভৃতি দেখিয়া, সেকালের সাহেবেরা নাসিকা কুঞ্চন করিতেন না।

সেকালের ঘোড়দৌড়।

১২ই ডিসেম্বরে (১৭৯৩) খৃঃ যে ঘোড়দৌড়ের ইস্তাহার বাহির হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—"আগামী ৮ই, ৯ই ও ১০ই জানুয়ারীর বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঘোড়দৌড় হইবে। এজন্য প্রাতরাশ ও সঙ্গীতের আয়োজন করা হইয়াছে। ঘোড়দৌড়ের পর শুক্রবার "বল ও সপার" হইবে। যাঁহারা ঘোড়া ছুটাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ঘোড়াসম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যকীয় তথ্য সম্পাদকের নিকট জানিতে পারেন।

সম্ভবতঃ এই ঘোড়দৌড়, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে হইয়াছিল। সেই সময়ে বারাশতেও ঘোড়দৌড় হইত। বর্ত্তমান ঘোড়দৌড়ের মাঠ, তখন সম্পূর্ণরূপে জঙ্গল-বিমুক্ত হয় নাই। কিন্তু স্যর জন শোর (পরে লর্ড টেন্‌মাউথের) এর আমলে, কলিকাতার মাঠে ঘোড়দৌড়ের বন্দোবস্ত দেখা যায়।

স্যার উইলিয়াম জোন্সের মৃত্যু।

গত রবিবার প্রাতঃকালে (১লা মে ১৭৯৪) সুপ্রীমকোর্টের স্বনামপ্রসিদ্ধ জজ, স্যার উইলিয়াম জোন্সের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়স এই সময়ে মোটে ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। গার্ডনরিচের বাগানবাটীতে, তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তৎপরে তাঁহার মৃতদেহ, সহযোগী জজ, হাইড্ সাহেবের বাটীতে চৌরঙ্গীতে আনা হয়। সোমবার প্রাতঃকালে, সাত ঘটিকার সময়

শববাহী-গাড়ী করিয়া, এই মৃতদেহ "পার্কষ্ট্রীট সমাধি-ক্ষেত্রে" লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতাবাসী সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ, পাল্কী ও গাড়ী করিয়া শবদেহের অনুগমন করেন। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ-প্রাকার হইতে, প্রতি মিনিটে শোকসূচক তোপধ্বনি করা হয়। দুর্গ হইতে প্রেরিত পদাতিক-সৈন্য ও গোলন্দাজের দল—এই সমাধিযাত্রার সঙ্গী হইয়াছিল। সমাধি-ক্ষেত্রের দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলে, কোম্পানীর সৈন্যগণ রাস্তার দুইদিকে, অস্ত্র অবনত করিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। ব্যাণ্ড হইতে পবিত্র ধর্ম্ম-সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। মিঃ জষ্টিস্ হাইড * ও স্যর উইলিয়াম উইল্‌কিনের তত্ত্বাবধারণে, স্যর উইলিয়াম জোন্সের পবিত্র দেহ সমাহিত হয়।

কলিকাতা সহরের সীমা-নির্দ্দেশ।

গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি মিঃ হে, কলিকাতায় সেরিফ্ ও মিঃ এড্‌মণ্ডষ্টোনকে (সরকারী পারসী-অনুবাদক) সঙ্গে লইয়া কোর্ট-হাউসে, উপস্থিত হন। কলিকাতা সহরের সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া যে মন্তব্য গবর্ণমেণ্ট সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিতে ইচ্ছুক, তাহা সর্ব্বসমক্ষে "ঘোষণা" রূপে পাঠ করা হয়। (১১।৯।১৭৯৪)

কলিকাতায় প্রথম পাকা রাস্তা।

গবর্ণমেণ্টের আদেশে, কলিকাতার কাঁচা রাস্তাগুলি পাকা করিবার জন্য, বীরভূম হইতে অনেক পাথর আনা হইয়াছে। এই পাথরগুলির সহায়তায়, নূতন ভাবে পথ্যা-সংস্কার হইলে, সহরের যথেষ্ট উন্নতিসাধিত হইবে। ধূলা ও কাদার জন্য সহরের অনেক পথই সময়ে সময়ে দুর্গম হইয়া পড়ে। রাস্তাগুলি পাকা হইলে, সহরবাসিগণ সকল বিষয়েই উপকৃত হইবেন। (১১।৯।১৭৯৪)

সাহেব-ডাকাত কর্ত্তৃক কোম্পানীর খাজনা-লুঠ।

গত সোমবার—নয়জন সাহেব, একদল সিপাহীকে, উলুবেড়িয়ার নিকট আক্রমণ করে। সিপাহীরা, মেদিনীপুর হইতে, কোম্পানী-বাহা-

---

* এই হাইড সাহেব, বহুদিন ধরিয়া সুপ্রীম-কোর্টের জজীয়তী করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত জাল-মোকর্দ্দমাতেও হাইড সাহেব চারিজন জজের অন্যতম ছিলেন।

দুরের খাজনা লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিল। সহসা সাহেবদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায়, তাহারা একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। ডাকাতেরা টাকা কড়ি লইয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল, এরূপ সময়ে সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া পুনরায় তাহাদের আক্রমণ করে ও তাহাদের সকলকে বন্দী করে। বহু চেষ্টার পর অপহৃত অর্থ উদ্ধার করিয়া, তাহারা কলিকাতায় চলিয়া আসে। সুখের বিষয়, এই ডাকাতদের মধ্যে অনেকেই সেলার বা নাবিক। আরও সুখের কথা এই—তাহাদের মধ্যে একজনও ভদ্র ইংরাজ নহে।" (২০।১১।১৭৯৪)

রসাপাগলার ডাকাতি।

রসাপাগলা, ভবানীপুর ও কালিঘাটের সান্নিধ্যে। এখনও রসারোড পূর্ব্বের স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারির একটী সংবাদে প্রকাশ—"গত শুক্রবার রাত্রে, লেফ্টেনাণ্ট মার্শারের বাটীতে (রসাপাগলায়) ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। লেফ্টেনাণ্ট সাহেব বাটীতে ছিলেন না—তিনি সপরিবারে চুঁচুড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বাড়ীটি দুইজন চৌকীদারের জিম্মায় ছিল। সোমবার রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে, একশত কি দেড়শত ডাকাত, বন্দুক ও তরোয়াল লইয়া বাটী-রক্ষাকারী চৌকীদারদের আক্রমণ করে ও সমস্ত টাকা-কড়ি লুঠ করিয়া লইয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, দুইজন ডাকাত ধরা পড়িয়াছে ও এ ডাকাতি সম্বন্ধে তদারক চলিতেছে।

ভয়ানক শিলাবৃষ্টি।

"গত রবিবার সন্ধ্যার সময়, ভবানীপুর রসাপাগলা অঞ্চলে ও সহরের দক্ষিণাংশে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এমন ভয়ানক শিলাবৃষ্টি পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই। এক একটী শিল, কমলালেবুর মত বড়। আলিপুরে একজন ভদ্রলোক, একটী শিলা ওজন করিয়া দেখেন, তাহার ভার—সাত আউন্স। অনেক গরীব লোকের কুটীরাদি এই ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে।" (২।৪।১৭৯৫)

বাঙ্গালীর বাড়ীতে সাহেব-ডাকাত।

সেকালের কলিকাতায় কিরূপভাবে চুরী ডাকাতি হইত, নিম্নলিখিত মোকদ্দমার বিবরণই তাহার প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে—কলিকাতা সহরের

মধ্যে বাঙ্গালী ধনীর বাটী লুঠ করিবার জন্য সাহেব-ডাকাত, আর তাহাদের পদপ্রদর্শক একজন বাঙ্গালী গোয়েন্দা। ডাকাতগণ এই সময়ে কলিকাতায় চৈতনশীল নামক এক ধনীর বাটীতে ডাকাতি করে। চৈতনশীলের চীনাবাজারে একখানি দোকান ছিল। এই ডাকাতের দলে সত্তর জন বেকার ভবঘুরে সাহেব থাকিত ও তাহারা এত দুঃসাহসী, যে সেই সময়ের কলিকাতার প্রধান ব্যাঙ্ক—"হিন্দুস্থান-ব্যাঙ্ক" পর্য্যন্ত লুঠ করিবার কল্পনা করিয়াছিল: কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই।

মোকদ্দমার বিবরণ ও সাক্ষীর জবানবন্দী হইতেই এই ডাকাতি সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা পাঠক জানিতে পারিবেন। বিচার অবশ্য সুপ্রীমকোর্টে হইয়াছিল।

কলিকাতা সুপ্রীমকোর্ট।

(মিষ্টার জষ্টিস হাইড সাহেবের এজলাস।)

ফরিয়াদী—অনারেবল কোম্পানী বাহাদুর ও চৈতনশীল।	আসামীগণ। মিঃ রুসো " বুফাস্ " জারান্ " ব্ল্যাঙ্ক " কোয়েল " ফ্যাসিনেভ্ মোহনপাল

চৈতনশীলের জবানবন্দী। আমি একজন হিন্দু-ব্যবসায়ী। চীনাবাজারে আমার একখানি দোকান আছে। গত ২৮এ মাঘ তারিখের রাত্রে, আমার বাটীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। তখন রাত্রি দুইটা। এই সময়ে, সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বাড়ীর মধ্যে অনেকগুলি লোকের গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া, আমি বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ি। দেখিলাম—বাটীর সদর-দরোজা খোলা। তখন আমি খুব উচ্চৈঃস্বরে আমার চাকরদের ডাকিতে লাগিলাম। একজন চাকর, আমার ডাক শুনিয়া, উঠানের দিকে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি তাহার চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। তার পর আর কোন সাড়া শব্দ নাই। অনুমানে বুঝিলাম, ডাকাতেরা তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। কথাটী কহিবার বা চেঁচাইবার কোন উপায় রাখে নাই। এই সময়ে আমি বুঝিতে পারি, ডাকাতেরা

আমার অন্দরমহলেও প্রবেশ করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিতেছে। বাহিরের মহলে, আমার একটী গুদামঘর ছিল। ডাকাতেরা একটী শাবল দিয়া, সেই ঘরের হুড়কা খুলিয়া গুদামের মধ্যে প্রবেশ করিল। তার পর দেখিলাম, ডাকাতেরা আমার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। আমি প্রাণভয়ে মশারির আড়ালে লুকাইলাম। ডাকাতেরাও সেই গৃহে কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া, একটী কাঠের সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া সোণারূপার জিনিসগুলি লইয়া চলিয়া গেল। একখানি চৌকীর উপর কতকগুলি নূতন কাপড় ও পরিচ্ছদাদি ছিল। প্রস্থান সময়ে ডাকাতেরা তাহাও লইতে ভুলে নাই।

ডাকাতদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া আমার বোধ হইল—তাহারা সকলেই সাহেব। তবে তাহাদের সঙ্গে আর একজন লোক ছিল, তাহার বেশ-ভূষা দেখিয়া, তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। আমার ক্ষতির পরিমাণ, আনুমানিক চারি হাজার টাকা। (কতকগুলি বামাল এই সময়ে সাক্ষীকে দেখান হয়। সাক্ষী সেগুলি সনাক্ত করিয়া বলে, এসবি আমারই জিনিস)।

চৈতনশীলের চাকরের জোবানবন্দী। গত ১৮ই মাঘ তারিখে রাত্রি আন্দাজ দুটোর সময়, আমার মনিবের বাটীতে ডাকাত পড়ে। ঐ সময়ে আমি গোয়াল-ঘর সংলগ্ন একটী চালায় ঘুমাইতেছিলাম। রাত্রি দুইটার সময় বাড়ীর উঠানে, অপরিচিত লোকজনের কথা শুনিতে পাইয়া, আমি বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসি। দেখিলাম, উঠানে তের চৌদ্দজন সাহেব দাঁড়াইয়া। তাহাদের দুই তিনজনের হাতে একটী করিয়া জ্বলন্ত মোমবাতি। সাহেবেরা আমায় দেখিতে পাইয়া, তখনই আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিল। তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে দড়ি দিয়া আমার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল, আর একজন আমার বুকের উপর বসিল। আমি ভয়ে চীৎকার করিতে পারিলাম না, বা কোথায় কি হইতেছে দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর আমি সিন্ধুক ও দরজা ভাঙ্গার শব্দ পাইলাম। কাজ শেষ হইলে, তাহারা বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। তাহাদের দলে কেবল একজন লোক ছিল সে লোকটাকে বাঙ্গালী বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

গোরা-সার্জ্জন ওগিলবি সাহেবের জোবানবন্দী। গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে, আমি মিষ্টার স্মিথের (জষ্টিস অব দি পিস) নিকট হইতে

এক ওয়ারেণ্ট পাই। এই ওয়ারেণ্টে, বর্ত্তমান আসামীগণের অন্যতম, রুসো সাহেবকে ধরিবার আদেশ ছিল। এই আদেশ-পত্র পাইয়াই আমি ফিট্জেরাল্ড নামক আর এক কনষ্টেবলকে লইয়া, রুসোর বাটী খানা-তল্লাসী করিতে যাই। এই খানা-তল্লাসীর ফলে, আমরা একটা আঁধারে লণ্ঠন, কতকগুলি কাপড়ের থান, একখানি তরবারি ও একটী লালরঙ্গের জ্যাকেট পাই। এই জ্যাকেটটী যাহাতে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তজ্জন্য আসামী রুসো আমাদের বিস্তর অনুরোধ করে। সেই প্যাকেট পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখি, জামার আস্তরের মধ্যে এক গুপ্তস্থানে, একটী গুলিভরা পিস্তল লুকান আছে। তাহার পর আমি রুসো ও অন্যান্য আসামীদের ধরিয়া ফেলি। অপহৃত মালপত্র আদালতে দাখিল করিয়াছি।

জারানের জোবানবন্দী। এই ব্যক্তিও একজন আসামী। কিন্তু কোম্পানী-বাহাদুরের পক্ষে ইহাকে সাক্ষী করিয়া লওয়া হয়। জারান বলিল—"আমি হানোভার দেশের লোক। পনর বৎসর এই ভারতবর্ষে বাস করিতেছি। পাঁচ বৎসর, আমি মান্দ্রাজে একজন ইংরাজের চাকরী করিয়াছিলাম। তৎপরে আমি কলিকাতায় আসি। কলিকাতাতেও আমার পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে। কলিকাতায় টাইলার ও লেড্লী সাহেবের বাটীতে চাকরী করিয়াছি। আমি আসামীদের সকলকে চিনি। আমরা সকলে মিলিয়া, চৈতনশীলের বাড়ী ডাকাতি করিতে গিয়াছিলাম। গত ২৭এ জানুয়ারি, মার্কস্ আমার কাছে আসিয়া বলে, তুমি রুসোর বাড়ী চল। একটা ডাকাতি করিতে হইবে। আমি তাহার সঙ্গে রুসোর বাটীতে যাই। সেখানে—আরও নয়জন সাহেব ডাকাত উপস্থিত ছিল; রাত্রি দশটার পর, মোহন পাল—(ঐ আসামী) আমাদের নিকট আসিয়া সংবাদ দিল—"আজ আর ডাকাতির কোনরূপ সুবিধা হইবে না বোধ হয়। কারণ এখনও তাহার বাটীতে অনেক লোকজন জাগিয়া বসিয়া আছে।" সেদিন আর ডাকাতি করা হইল না। ২৯এ তারিখে, আবার আমরা রুসোর বাড়ী জমায়েত হই। মোহনপাল সেদিন রাত্রি বারটার সময়ে আসিয়া বলিল—"দল সব জমায়েত হইয়াছে ত? আজই বেশ সুযোগ।" তার পর মোহনপাল পর্টুগীজ ভাষায় আমাদের বলিল—"আমি আবার একবার সন্ধান লইয়া আসি—পথ পরিষ্কার কি না।" তার পর সে রাত্রি একটার সময় ফিরিয়া আসিয়া, আমাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া চৈতনের বাড়ী উপস্থিত হইল।

তখন আমাদের মধ্যে একটা বচসা আরম্ভ হইল। বচসার বিষয় এই, সদরদ্বারের কাছে চৌকী দিবে কে? শেষ ঠিক হইল, আমি কোয়েল ও আর একটী লোক সদর-দরোজা চৌকী দিব। ইহার পর, দলের অন্যান্য লোক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এই সময়ে আমরা বাটীর ভিতরে একটী দরোজা ভাঙ্গার শব্দ পাইলাম। তখনই মার্কস আসিয়া বলিল—কোয়েল রাস্তার ধারে দরোজায় চৌকী দিক। তুমিও ঐ পর্টুগীজ ভদ্রলোকটী, ভিতরের যে দরোজা ভাঙ্গা হইয়াছে—সেইখানে চল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন লোক "বাবু! বাবু! দোহাই সাহেব!" বলিয়া চীৎকার করিতেছে শুনিতে পাইলাম। তারপরে স্ত্রীলোক ও ছেলেদের কান্নার শব্দও আমার কাণে আসিল। এই সময়ের মধ্যে মোহনপাল দুইবার বাটীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিয়া গেল, বাহিরের চৌকী বন্দোবস্ত ঠিক আছে কিনা। দলের লোকেরা বেশী দেরী করিতেছে দেখিয়া, আমি বলিলাম—"তোমরা শীঘ্র কাজ সারিয়া লও। বড় দেরী হইতেছে।" এই সময়ে মোহনপাল ও তাহার সঙ্গীরা ফিরিয়া আসিল। মোহন বলিল—"এইখানে কোথায় একটা মালগুদাম আছে। তাহার দরোজাটা ভাঙ্গিয়া একবার দেখা যাউক।" রুসো, সাবল দিয়া সম্মুখের একটা ঘরের দরোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি দামী কাপড় বাছাই করিয়া লইয়া, ম্যাথিয়াস তাহার ক্যাম্বিসের ব্যাগটী পূর্ণ করিল। তাহার পর সমস্ত দল বাটীর বাহিরে আসিয়া, তাহাদের হাতের বাতি নিভাইয়া ফেলিল। মোহনপাল ছাড়া, আমরা সকলেই রুসোর বাটীতে গেলাম।

রুসোর বাটীতে ম্যাথিয়াস ব্যাগ খুলিয়া, লুণ্ঠিত কাপড় বখ্‌রা করিতে আরম্ভ করিল। আমার সঙ্গীরা ও আমি আট পিস্ কাপড় ভাগে পাইলাম। সোনা রূপার জিনিসগুলি, মোহনপালকে দিয়া সেকরার কাছে বিক্রয় করাইবার জন্য পাঠান হইল।

পরদিন প্রভাতে আমি পুনরায় মার্কসের বাড়ী গেলাম। সেখানে ম্যাথিয়াস, বুয়াকস্, মোহনপাল ও আর একজন বাঙ্গালীকে দেখিতে পাই। মার্কস বলিল—"সোনারূপার জিনিস বিক্রয় করা হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকের ভাগে ছাব্বিশ টাকা বখরা পড়িয়াছে। সাক্ষী জারমান জেরার মুখে একথাও স্বীকার করে "আমাদের দলে ইউরোপীয়ান, পর্টুগীজ, ইটালিয়ান, ও অন্যান্য লোকও আছে। সকলকে জড় করিলে দুই শত লোক হয়। এই সমস্ত লোক জড় করিয়া আমরা একদিন "হিন্দুস্থান-ব্যাঙ্ক" লুঠ করিব মনে ভাবিয়াছিলাম।"

চিফজষ্টিস হাইড সাহেব, জুরীদের চার্জ্জ দিলেন। জুরীরা একবাক্যে আসামীদের দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। ষোলঘণ্টা কাল ধরিয়া এই চুরী মোকদ্দমার বিচার চলিয়াছিল।

৬ই আগষ্ট (১৭৯৫ খৃঃ অব্দের) এক সংবাদে প্রকাশ—"পূর্ব্বোক্ত ডাকাতির আসামীদিগকে জেলখানায় আনিয়া রাখা হইয়াছে। ছয়জনের উপর এইরূপ ডাকাতি করার জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য ডাকাতদের মনে ভয়োৎপাদন জন্য—যেখানে তাহারা ডাকাতি করিয়াছিল, তাহার নিকটে প্রকাশ্য স্থানে তাহাদের ফাঁসি দেওয়া হইবে। চৈতন শীলের বাড়ীর কাছে একটী বাজার আছে। স্থির হইয়াছে, এই বাজারেই ডাকাতদের ফাঁসি হইবে।" পাঠক উল্লিখিত ঘটনা হইতে সবই বুঝিতে পারিবেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আর একটী সাহেবী রাহাজানি।

টমাস গিলবার্ট, টমাস হকিন্স ও দানিয়েল বেকার, তিন নম্বর ইউ-রোপীয়ান সেনাদলের সেনা। তাহাদের বিরুদ্ধে এস্‌প্লানেডে (ধর্ম্মতলায়) রাহাজানি করিবার অভিযোগ উপস্থিত হয়। বিচারাজ্ঞা এই হইল—"যে তাহাদের হস্তের একাংশ দগ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে ও তৎপরে তাহাদিগকে জেলের মধ্যে আটক রাখা হইবে। এজন্য তাহাদের উপর দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইল।

সেকালে ডাকাতির দায়ে ফাঁসি হইত। চুরী ও রাহাজানি করিলে হাত পোড়াইয়া দেওয়া হইত, তারপর দীর্ঘকাল সশ্রম মেয়াদ। সে সময়ে কলিকাতায় সাহেব চোর-ডাকাতের বড়ই উৎপাত ছিল। পরে সুপ্রীমকোর্ট প্রসঙ্গে পাঠক এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

আলিপুরের পোল ভাঙ্গা।

"গত ৩রা সেপ্টেম্বর (১৭৯৫) আলিপুরের পোল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পোলটী বহুদিন হইতেই বেমজবুত হইয়াছিল। গভীর রাত্রে পুলটী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই।"

এই আলিপুরের পুল যে কোনটী, আমরা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। ওয়ারেণ হেষ্টিংস তাঁহার আলিপুরস্থ হেষ্টিংস-হাউসে আসিবার সুবিধার জন্য যে পুল প্রস্তুত করান, তাহা কালীঘাটের পোল। অবশ্য বর্ত্তমান

পোলটী নহে—ইহার পূর্ব্বে আর একটী ঝোলা পুল ছিল। জিরাটের নিকট যে পুলটী আছে, সেইস্থানে ইতিপূর্ব্বে আর একটি পুরাতন পুল ছিল। সম্ভবতঃ সেইটীই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গলা গ্রামার ও ডিক্সনারী।

২৩এ এপ্রিল (১৭৮৯) খ্রীঃ অব্দের পুরাতন কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশ হয়।

We hnmbly beseech any gentleman will be so good to us as to take the trouble of making a Bengali Grammer and Dictionary in which we hope to find all the common Bengal Country words made into English. By the means, we shall be enabled to recommend ourselves to the English Goverment and understand their orders, this favor will be remembered by us and our posterity for ever.

ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠক, এই বিজ্ঞাপনটীর প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করুন। সেকালে অর্থাৎ ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে—বাঙ্গালীরা একখানি ইংরাজি অভিধান ও গ্রামারের জন্য কতই না লালায়িত ভাবে ইংরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে খুব কম বাঙ্গালীই ভালরূপে ইংরাজি বুঝিতে পারিতেন। সাহেব ও বাঙ্গালীর মধ্যে কথাবার্ত্তা অধিকাংশ স্থলে হিন্দী ও পারসীতে হইত।

উক্ত আবেদনের ফলে, ডাক্তার মেকিনান নামক একজন সাহেব, একখানি বাঙ্গলা ও পারসী-গ্রামারের বিজ্ঞাপন দেন। ১৭৯০ সালের ২৩এ সেপ্টেম্বরের গেজেটে এই বিজ্ঞাপনটী বাহির হয়। এই ব্যাকরণখানি, ইংরাজি, পারসী ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা একাধারে ব্যাকরণ, শব্দকোষ, ইংরাজি ভাষা শিক্ষার একমাত্র গ্রন্থ হইয়াছিল। সেই সময়ে কোম্পানী বাহাদুর কলিকাতায় একটী ছাপাখানা স্থাপন করেন। তাহা The Hon'ble East India Company's Press বলিয়া পরিচিত ছিল। উক্ত গ্রন্থখানি কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রেই ছাপা হয়।

কলিকাতায় প্রথম নেটিভ হাঁসপাতাল।

১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় প্রথম নেটিভ হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়।

তাহার নাম হইয়াছিল—"An Hospital for the relief of Natives requiring the assistance of a Surgeon., এই হাঁসপাতালের কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার, সাহেব ও এদেশীয় লোক লইয়া সংগঠিত একটী কমিটির হস্তে থাকে। কলিকাতার অধিবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক হন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে, এই হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আটাশ জন লোকের অর্থ-সাহায্যে, এই হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে তৎকালীন গবর্ণর-জেনারেল, লর্ড কর্ণওয়ালিস একাই তিন হাজার টাকা দান করেন। গঙ্গানারায়ণ দাস ও কৃষ্ণকান্ত সেন বলিয়া দুই জন বাঙ্গালী প্রত্যেকে ৫০০৲ শত টাকা দান করিয়াছিলেন।

ইংরাজের বিপদে বাঙ্গালীর সহানুভূতি।

বিলাত হইতে সংবাদ আসে (১৭৯৮ খৃঃ অব্দ) যে ফরাসীগণ ইংলণ্ড আক্রমণ করিবে। ইহাতে ইংলণ্ডে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। সমস্ত ইংলণ্ডবাসী সভাসমিতি করিয়া, তাঁহাদের মাতৃভূমির রক্ষার্থে ও ইংলণ্ডাধিপের অর্থবল প্রবল করিবার জন্য চাঁদা তোলেন। এই চাঁদার পরিমাণ বড় কম নহে। "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে," ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত দেড় মিলিয়ান টাকা জমা দেওয়া হয়।

লণ্ডনের ও সমগ্র ব্রিটিশ-দ্বীপবাসীদের এইরূপ সহানুভূতির কথা, এদেশে আসিয়া পৌঁছিলে, কলিকাতাবাসী ইংরাজেরা, সেরিফের সহায়তায়, থিয়েটার-গৃহে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান করেন। ১৭ই জুলাই কলিকাতায় এই মহা সভা হয়। কেবল কলিকাতায় নহে—মান্দ্রাজ, বোম্বে প্রভৃতি ইংরেজাধিকৃত স্থান সমূহেও এই সময়ে সভাসমিতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতার এই ইংরাজ-সভায়, একদিনে দেড় লক্ষ টাকার উপর চাঁদা উঠে। মান্দ্রাজের সভায় ১৮৫৯১৬ প্যাগোডা আদায় হয়। বোম্বের সভায় ২৪৪৭০৭ টাকা আদায় হইয়াছিল। এই সমস্ত টাকাই বিলাতে প্রেরিত হয়। এই বিষয় লইয়া সমগ্র ভারতের ইংরাজ-মহলে তখন এমন একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, যে সামান্য ইংরাজ গোরা পর্য্যন্ত তাহাদের এক মাসের বেতন চাঁদা স্বরূপ দান করে।

ইংরাজদিগকে এই ভাবে সভা-সমিতি করিতে দেখিয়া, ইংলণ্ডাধিপের

বিপদে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য ও রাজভক্তি প্রকাশের জন্য, কলিকাতা সহরের সেই সময়ের গণ্যমান্য বাঙ্গালীগণ একটী সভা করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১ আগষ্ট, এই সভা কলিকাতায় আহুত হয়। এই সভার অনুষ্ঠাতাগণের মধ্যে—গৌরচরণ মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক, রামকৃষ্ণ মল্লিক, গোপীমোহন ঠাকুর, কালীচরণ হালদার, রসিকলাল দত্ত, গোকুলচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সভায় সেই দিনে ২০৮০০৲ টাকা চাঁদা আদায় হয়।

সেকালের ইংরাজের বিবাহ।

তখন অতি অল্প সংখ্যক ইংরাজ মহিলাই এদেশে আসিতেন। যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদেরও সহজে বিলাত যাওয়া ঘটিত না। এজন্য কোন নূতন ইংরাজ মহিলা কলিকাতায় আসিলে, তাঁহার বাড়ীতে পরিচিত অপরিচিত ইংরাজদের ভিড় লাগিয়া যাইত। অবশ্য ইহাদের সকলের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইত না। যে ভাগ্যবান ইংরাজ—সেই নবাগত বরবর্ণিনীর হৃদয়াধিকার করিতে সমর্থ হইতেন, তিনি তাঁহাকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন। খোদ গবর্ণর-সাহেবের লাইসেন্স ব্যতীত, কোন বিবাহই সেকালে মঞ্জুর হইত না। পাদরী সাহেবেরা বিবাহ দিবার সময় খুব লম্বা চৌড়া বৃত্তি পাইতেন। এক একটী বিবাহে, পাদরীগণ ১৬ হইতে ২০ মোহর পর্য্যন্ত যজমানের নিকট আদায় করিতেন।

সেকালের ঔষধ ও ডাক্তারের ভিজিট।

সেকালে এদেশীয় লোকেরা বিলাতী ঔষধ খাইত না। সাহেব ডাক্তারও খুব কম লোকেই দেখাইত। মধ্যবিত্ত ইংরাজদেরও সেই দশা। সেকালের ইংরাজ ডাক্তারেরা পাল্কী করিয়া রোগী দেখিতেন। ডাক্তারের ভিজিট ছিল—একটী সোণার মোহর। যদি কোন বাটীতে একটীর অধিক রোগী থাকিত, তাহা হইলে এই হিসাবেই প্রত্যেক রোগীর জন্য ভিজিট্ দিতে হইত। ঔষধের দামও সেইরূপ চড়া ছিল। কলিকাতায় বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মিত হইবার পর, কোম্পানী-বাহাদুর পুরাতন কেল্লার মধ্যে, একটী ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে সুবিধা দরে ঔষধ বিক্রী হইত। এই সুবিধার দরটা একবার দেখুন। কোন কিছু ভেষজ-দ্রব্যের ছালের দাম, প্রতি আউন্স তিন টাকা। কোন প্রকার বিরেচক শোধিত-লবণের মূল্য প্রতি আউন্স এক টাকা। একটী

বেলেস্তারার দাম দুই টাকা। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দের একটী মোকদ্দমার বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, ডাক্তার হ্যালিডে, তাঁহার রোগীর নামে ছয়টী ভিজিটের মূল্য বাবত ৩৮৪ সিক্কা টাকার দাবিতে "কোর্ট অব দি রিকোয়েষ্টস্" নামক আদালতে নালিশ রুজু করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভিজিটের দাম তাহা হইলে ৬৪ টাকায় দাঁড়াইতেছে। সেই সময়ে ডাক্তারের দরটা কত বেশী ছিল, তাহা পাঠক উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারিবেন।

খস্‌খসের টাট্টী।

তখন টানা পাখা ছিল না। "ইলেক্‌ট্রিক্‌-ফ্যান" ত স্বপ্ন-রাজ্যের কথা। গ্রীষ্মকালে জল ঠাণ্ডা করিবার জন্য, সোরার স্তূপের মধ্যে জল পাত্র বসাইয়া রাখা হইত। দুর্দ্দমনীয় গ্রীষ্মের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য, তখন অবস্থাপন্ন ইংরাজেরা খসখসের টাট্টি ব্যবহার করিতেন। ডাক্তার ক্যাম্বেল বলিয়া একজন সম সাময়িক ইংরাজ লিখিতেছেন, "বাহিরে হাওয়া খুব গরম হইলে বাড়ীর মধ্যে কামরার হাওয়া অতি ঠাণ্ডা। এ ঠাণ্ডাটা ঠিক যেন বিলাতের মত। যে সকল গৃহে এরূপ পরদা নাই, কার সাধ্য সেখানে বাস করে!" (১০।৫।১৭৮৯)

সেকালের যান-বাহন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে, কলিকাতায় গাড়ীর প্রচলন হয়। ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় ষ্টুয়ার্ট কোং বেশ জাঁকাইয়া উঠে। এই কোম্পানী বিলাত হইতে গাড়ী আমদানী করিতেন। সে সকল দামী গাড়ী, পদস্থ ইংরাজেরাই ব্যবহার করিতেন। সেকালের "হিকিস্‌-গেজেটে" এইরূপ গাড়ী আমদানীর বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চেরিয়ট গাড়ী ছিল। আরও অনেক পদস্থ ইংরাজেরও ছিল। অনেকে তখন বগী-গাড়ীও ব্যবহার করিতেন। মেম-সাহেবেরা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহেবেরা, পাল্কী ব্যবহার করিতেন। অনেকে অশ্বারোহণে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় নদীতীরে বেড়াইতে যাইতেন।

সেকালের লাট-সাহেবদের "ময়ূরপঙ্খী" প্রভৃতি সুবৃহৎ জলযান ছিল। লর্ড ভ্যালেন্‌সিয়া ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় আসেন। তিনি লিখিয়াছেন "আমি গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লির সুবৃহৎ জলযানে কলিকাতায় উপস্থিত হই। এই জলযান, সোনালির কাজ করা ও নানাবিধ

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তলিপি।

(ভারতীর চিত্রের অনুলিপি।)
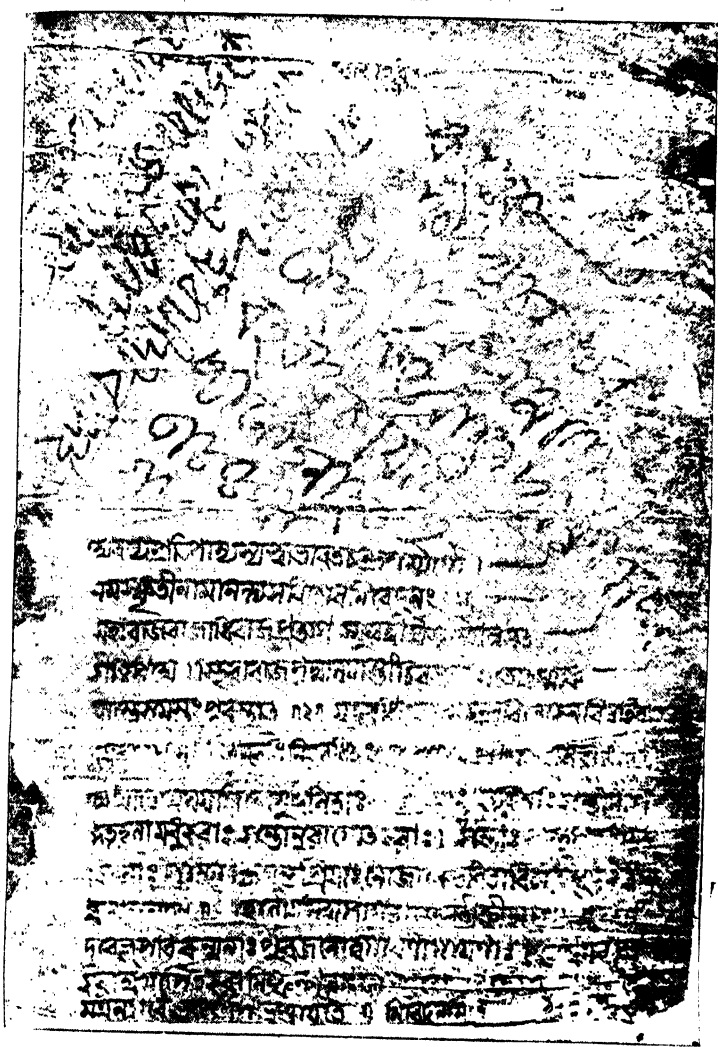
বিচিত্র বর্ণে সুন্দর রূপে চিত্রিত। এই জাহাজের সম্মুখ দিকে, সোনার গিলটী করা ইগল-পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি। পশ্চাতে একটী সুচিত্রিত বাঘের মাথা। কুড়িজন লোক সুখাসীন হইয়া, এই নৌকায় যাইতে পারে।" তখন অনেক ইংরাজ, প্রতিদিন কলিকাতা হইতে গার্ডেনরিচে নৌকা করিয়া বেড়াইতে যাইতেন। দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে—তাঁহারা চন্দননগর, সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। ষ্টাভোরিন্স ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় আসেন। তিনি লিখিতেছেন—"এদেশের একরকম বোট দেখিতে অতি সুন্দর ও বিচিত্র রূপে চিত্রিত। এ গুলি "ময়ূরপঙ্খী" বলিয়া সাধারণে পরিচিত। বোট গুলি খুব লম্বা ও সরু। অনেক স্থলে লম্বায় একশত ফিট। চওড়ায় আট ফিট্। চল্লিশজন লোকে দাঁড় লইয়া এই "ময়ুরপঙ্খী" চালাইত। নৌকার মাথার দিকে হয় সুবৃহৎ সর্প-মূর্ত্তি, না হয় সুচিত্রিত ময়ুর-মূর্ত্তি। নৌকার পশ্চাতের দিকে, ডেকের উপর চারিটী রৌপ্য-দণ্ডে একখানি রেশমী চাঁদোয়া খাটানো থাকিত। নৌকার অধিকারী, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এই উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া, নদীবক্ষে প্রবাহিত শীতল বায়ু সেবন করিতেন। এই সব নৌকা নানাবিধ বিচিত্রবর্ণে সোণালী রঙ্গে চিত্রিত করা হইত, এজন্য এ গুলির দাম বড় বেশী। গঙ্গার উপর এ প্রকার নৌকায় চড়িয়া, প্রভাত বা সান্ধ্য-ভ্রমণ বড়ই তৃপ্তিজনক।'

নাচের মজলিস্।

সেকালে দুর্গোৎসব উপলক্ষে, অনেক বড় বড় বাঙ্গালীর বাড়ীতে নাচের মজলিস্ হইত। মহারাজ নবকৃষ্ণ খুব জাঁকাইয়া দুর্গোৎসব করিতেন তাহাতে অনেক বড় বড় ইংরাজ নিমন্ত্রিত হইতেন। এরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—লর্ড ক্লাইব, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি এই সব নাচের মজলিসে উপস্থিত থাকিতেন। রাজা সুখময় রায়ের দুর্গোৎসবও খুব জাকালো ছিল। সাহেবদের সুবিধার জন্য রাজা বাহাদুর, দুইখানি বড় বড় টানা পাখার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁর বাটীতেই, হিন্দুস্থানী গতের সহিত ইংরাজী গত মিশাইয়া, সাহেবদের তৃপ্ত্যর্থে ত্রৌর্য্যত্রিকানুষ্ঠান হইত।

ইংরাজী-থিয়েটারে বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

প্রথমে লালবাজারে ইংরাজদের একটী থিয়েটার স্থাপিত হয়। এ

থিয়েটার সেরাজের কলিকাতা আক্রমণের সময় বর্ত্তমান ছিল। তার পর সেটী উঠিয়া যাওয়ায়, বর্ত্তমান রাইটার্স বিলডিংএর পিছনে আর একটী থিয়েটার হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বাটীতে থিয়েটার চলে। তাহার পর গোপীমোহন ঠাকুর এই বাড়ি ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী জমীগুলি কিনিয়া লইয়া, একটী বাজার স্থাপন করেন। সেই বাজারের নামকরণ হয়—নূতন চীনে-বাজার। এখনও পর্য্যন্ত এই নাম প্রচলিত।

১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে ডোমতলায় আর একটী থিয়েটার স্থাপিত হয়। পুরাতন চীনেবাজারের নিকটস্থ একটি পল্লী ডোমতলা বলিয়া অভিহিত হইত। এইখানে মিষ্টার লেফেডেফ্ বলিয়া একজন সাহেব, থিয়েটার খোলেন। তাহার নাম ছিল—"মিঃ লেফেডফ্‌স নিউ থিয়েটার।" এই থিয়েটারের একটু বিশেষত্ব আছে। তাহা নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী হইতেই প্রকাশিত—বিজ্ঞাপনটী এই "গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সম্মতি অনুসারে মিঃ লেফেডফের থিয়েটার, বাঙ্গালী-ধরণে সজ্জিত করা হইয়াছে। শীঘ্রই এখানে Disguise বলিয়া একখানি নাটকের অভিনয় হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীই অভিনয় করিবেন। ঐক্যতান-বাদ্যে অনেক হিন্দুস্থানী-গত বাজান হইবে। বিলাতী বাদ্যযন্ত্রের সহিত, সে সকল বাদ্যযন্ত্র বাঙ্গালীদের প্রিয়, তাহাও ব্যবহৃত হইবে। বাঙ্গালীর সর্ব্বজন প্রিয় কবি, ভারতচন্দ্র রায়ের একটী শব্দঝঙ্কার পূর্ণ কবিতার সঙ্গীতাবৃত্তি হইবে।"

ইহার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে, কলিকাতায় আরও দুইটী থিয়েটারের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের একটীর নাম "কলিকাতা থিয়েটার" অপরটীর নাম—"হোয়েলার-প্লেস থিয়েটার।"

ইহার পর এই দুটী থিয়েটারের অস্তিত্ব লোপ হয়। তখন চৌরঙ্গী জনপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। এইজন্য চৌরঙ্গীতে একটী নূতন থিয়েটার নির্ম্মিত হয়। ইহার নাম হইয়াছিল—"চৌরঙ্গী থিয়েটার"। ১৮১৪ খৃ-অব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের মে মাসে ইহা অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়। এই থিয়েটার বর্ত্তমান—"থিয়েটার রোডের" উপর ছিল, এবং তাহা হইতেই "থিয়েটার-রোড" নামকরণ হইয়াছে।

১৮১২ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮ নং সার্কিউলার রোডে আর একটী থিয়েটার নির্ম্মিত হয়। তাহার নাম ছিল—"দি এথিনিয়াম।" "আর্ল অব এসেক্স" নামক ঐতিহাসিক নাটক ও Raising the Wind

নামক প্রহসন, এখানে খুব সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। টিকিটের দাম ছিল একটী মোহর।

এতদ্ব্যতীত "চৌরঙ্গী ড্রামাটিক-সোসাইটী" নামে এক সখের থিয়েটার ১৮১৪ স্থাপিত হয়। তাহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে খিদিরপুরে এক থিয়েটার স্থাপিত হইয়াছিল। এ থিয়েটারও স্বল্পজীবি। Lying Valet বলিয়া একখানি নাটক এখানে অভিনয় হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে বহুদূরে, ফরাসী অধিকার চন্দননগরে, সেই সময়ে আর একটী থিয়েটার স্থাপিত হয়। (এপ্রিল ১৮০৮) এখানে একদিন অভিনয়ের সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সে ঘটনাটী এই—চন্দননগরের এই থিয়েটারে একদিন L' Afocat নামক একখানি ফরাসী-নাটক অভিনয় হইতেছিল। নাটকের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই—এক মেষপালক কোন ধনী ব্যক্তির অধীনে চাকরী করিত। এই ধনীর ফারমের মেষগুলি দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আর তাহাদের গায়ের লোমও অতি সুন্দর। হতভাগ্য মেষপালক, দুইটী মেষ চুরী করিয়া মারিয়া ফেলে। তাহার প্রভু ভৃত্যের নামে স্থানীয় জজের-আদালতে মেষহত্যা দাবীতে নালিশ করেন। নাটকের ঘটনাস্থল ইংলণ্ড।

তখন থিয়েটার চলিতেছে। যে দৃশ্যে জজ বিচারাসনে উপবিষ্ট, মেষপালক অপরাধীরূপে দণ্ডায়মান, জজ অপরাধীকে দণ্ড দিলেন—সেই দৃশ্যাভিনয়ের সময়ে একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

চন্দননগর থিয়েটারের ম্যানেজার মহাশয় উইংসের পার্শ্বে ছিলেন। একজন বাঙ্গালী মিস্ত্রি, সেই ষ্টেজে ভৃত্যরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে মিস্ত্রিও তখন ষ্টেজের মধ্যে। এমন সময়ে ম্যানেজার জানিতে পারেন, যে জনৈক অভিনেতার একটী দামী জিনিস তখনই চুরী গিয়াছে। সেই মিস্ত্রির উপর তাঁহার সন্দেহ হয়। অভিনেতা জজ, তখনও ষ্টেজে বসিয়া। অপরাধী মেষপালকের উপর যেমন দণ্ডাজ্ঞা হইয়া গেল—ঠিক সেই সময়ে ম্যানেজার সেই অপরাধী মিস্ত্রিকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, সেই অভিনেতা বিচারকের সম্মুখে খাড়া করিয়া বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার! এ ব্যক্তি একজন অভিনেতার কোন জিনিস চুরী করিয়াছে—কিন্তু কবুল করিতেছে না।" জজ, ভ্রুকুটীভঙ্গি করিয়া তাহাকে বলিলেন—"সত্য কথা বল্, তুই চোর কিনা?" সেই মিস্ত্রিও

এই ব্যাপার দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। সেই অভিনেতা জজের সম্মুখে সে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। জজ তাহাকে কঠোর তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"এবার তোমায় ছাড়িয়া দেওয়া গেল। কিন্তু আর কখনও চুরী করিও না ও এই থিয়েটারের ত্রিসীমানায় আসিও না।" বলুন দেখি পাঠক! এটা জীবন্ত অভিনয় নয় কি?

১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে দমদমাতেও একটী থিয়েটার স্থাপিত হয়। এই থিয়েটার বহুদিন বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত বৈঠকখানা বাজারেও "থিয়েটার বৈঠকখানা" বলিয়া একটি থিয়েটার ছিল।

তখনকার থিয়েটারে ইলেক্‌ট্রিক পাখা ছিল না, গ্যাসের আলোও ছিল না। তেলের আলোতেই কাজ চলিত। ভবিষ্যৎ গবর্ণর জেনারেল লর্ড অক্‌লাণ্ডের ভগিনী, কুমারী ইডেন * তাহার একখানি বিলাতী-পত্রে সেকালের সাহেবী থিয়েটারের কষ্টের কথা অনেক বলিয়া গিয়াছেন।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

ঘোড়দৌড় কলিকাতায় অনেকদিন হইতে প্রচলিত। ১৭৮০ খৃঃ অব্দের "হিকিস-গেজেটে" এই ঘোড়দৌড়ের প্রথম বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলের শেষভাগে। ইহার পর ১৭৯৫ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘোড়দৌড় হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠক পূর্ব্বে দেখিয়াছেন! ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে "জকিক্লবের" প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। আগে গার্ডেনরিচের বা বর্ত্তমান মেটিয়াবুরুজের উপান্তভাগে, আকড়া-বারুদখানায় ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। বারুদখানা নামের কারণ. এখানে কোম্পানীর একটী ম্যাগাজিন বা বারুদাগার ছিল। বর্ত্তমান ঘোড়দৌড়ের মাঠ ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে খোলা হয়। এতদ্ভিন্ন বারাসতেও ঘোড়দৌড় হইত।

ক্রিকেট।

প্রাচীন কলিকাতায় ক্রিকেটের প্রথম প্রচলন হয়, ১৮০৪ খ্রীঃ ১৯শে জানুয়ারী। উক্ত দিবসে কোম্পানীর ইটোনিয়ান সিভিল-সার্ভেণ্ট ও অন্যান্য ইংরাজদের মধ্যে প্রথম "ক্রিকেট-ম্যাচ" হয়। ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ্য ভাবে ক্রিকেট-ম্যাচের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

* বর্ত্তমান ইডেন-গার্ডেন এই কুমারী ইডেনই প্রতিষ্ঠা করেন।

সেকালের আদালতের জজদিগের এদেশীয় ভাষা শিক্ষা।

তখন আদালত সমূহে ইংরাজীর এত প্রচলন হয় নাই। পারসী ভাষায় লিখিত দলিলের ও সওয়াল-জবাবের তখন খুব প্রাধান্য ছিল। অনেক দলিল বাঙ্গালাতেও লিখিত হইত। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর ও তৎপরে ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারী এক আদেশ প্রচার করেন—"আদালতের জজদিগকে হিন্দী, পারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া ঐ সমস্ত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাঁহারা জজীয়তী পাইবেন না।"

(১) যে কোন সিভিলিয়ান, বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা রেজিষ্টারের কাজ করিবেন, তাঁহাদের পারসী ও হিন্দুস্থানী জানা আবশ্যক।

(২) রেভেনিউ-কালেক্টার, কষ্টম-কালেক্টার, কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট, নিমকির-এজেণ্ট প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ, যাঁহারা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার মধ্যে কাজ করিবেন, তাঁহাদের বাঙ্গালাভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

(৩) রেভেনিউ-কালেক্টার, কষ্টম-কালেক্টার, অপিয়ম-এজেণ্ট, কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ, যাঁহারা বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে কাজ করিবেন, তাঁহাদের হিন্দুস্থানী ভাষা জানা আবশ্যক।*

সেকালের লাট-দর্শনের ব্যবস্থা।

সেকালের এরূপ ব্যবস্থা ছিল, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে কোন ভদ্রশ্রেণীর প্রজা, লাট-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার অভাব অভিযোগ জানাইতে পারিত। সাধারণের অভিযোগ ও দরখাস্ত, সবই লাট-বাহাদুর একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে গ্রহণ করিতেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দের ২৫এ সেপ্টেম্বরের একটী সাধারণ নোটিস হইতেই ইহা প্রমাণিত। সে নোটিসটী এই—

The Most Noble the Governor General wiil give audience from 6 untill 12 o'clock on Monday next.

এক মজাদার বিজ্ঞাপন।

সেকালের টাকার কত ছড়াছড়ি ছিল, তাহা নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী

* Govt. Order dated 21th December. 1798.

হইতে প্রকাশ হইতেছে। কোন্ ভদ্রলোকের আঙ্গুলে জুতার কড়া হইয়াছিল। ইহার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সেই ক্ষুদ্র নবাব বিজ্ঞাপন দেন—"আমার পায়ে কতকগুলি কড়া হওয়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছি। যে লোক এই কড়াগুলি আরাম করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক হাজার সিক্কা টাকা পারিতোষিক দিব। ৮৩ নং জিগ্ জ্যাগ্ লেনে সংবাদ লউন।" (১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দ।)

কলিকাতায় প্রথম বাঁধাকপির চাষ।

এদেশে ইংরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, গোল-আলুর প্রচলন হইয়াছে। সেকালের অনেক দুর্গা-পূজার হিসাবে গোলআলুর নাম নাই, তবে রাঙ্গাআলুর ব্যবস্থা আছে। সর্ব্বপ্রথমে ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে, কলিকাতায় বাঁধা-কপির প্রথম প্রচলন হয়। ইহা সাহেবী-মহলে অবশ্য প্রথম সমাদৃত হয়। এসম্বন্ধে একটী বিজ্ঞাপন দেখুন। যাহারা বাঁধাকপির লোভনীয় আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিতে চান, তাঁহারা চাঁদপাল ঘাটের সান্নিধ্যে, পুরাতন অর্ফান-হাউসের একটু দক্ষিণে, কাপ্তেন ম্যাকিন্‌টারের বাগানে অনুসন্ধান করুন। একশত কপির দাম—৮৲ সিক্কা টাকা।

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন।

তখন, এদেশে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উচ্চ শিক্ষার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ইংরাজী স্কুল সংখ্যা খুব কম ছিল। উচ্চ শিক্ষার নাম গন্ধ ছিল না। এজন্য বিলাত হইতে মধ্যে মধ্যে এক একজন বিশেষজ্ঞ সাহেব আসিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেকচার দিতেন। অবশ্য সাহেবেরাই এই সমস্ত লেকচার শুনিতেন। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দের একটী বিজ্ঞাপন হইতে আমরা দেখিতে পাই—"ডাক্তার ডিগ্‌উইডি ভদ্রসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন—যে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান (Physics) এবং রসায়ন (Chemistry) সম্বন্ধে আগামী ২১এ এপ্রিল হইতে কয়েকটী লেকচার দিবেন। ২৫ বা ৩০টী লেকচারেই "কোর্স" সম্পূর্ণ হইবে। ইহার ব্যয় ১০টী সোণার মোহর।"

কলিকাতায় প্রথম ইন্সুরেন্স-কোম্পানী।

আজকাল পঙ্গপালের মত, দেশী-বিদেশী ইন্সুরান্স কোম্পানীতে কলিকাতানগরী ছাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ১৭৯৫ খৃঃ অব্দের ১লা জুন,

অর্থাৎ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতায় "ইউনিয়ান ইন্‌সুর‍্যান্স কোম্পানী" বলিয়া একটী বীমা-কোম্পানীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এই কোম্পানী কেবল জাহাজ ও জাহাজের মাল বীমার কাজ করিত, জীবন বীমা করিত না।

শত বৎসর পূর্ব্বে লংক্লথের দাম।

"কয়েক থান সুন্দর লংক্লথ, বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে—কেন না বিশেষভাবে অর্ডার দিয়া ইহা প্রস্তুত করান হইয়াছে। প্রত্যেক থানের মূল্য ৫৬ হইতে ১১০ সিক্কা টাকা। মিঃ আর, এবট সাহেবের নিকট আবেদন করুন।" (১৭৯৫ খৃঃ অব্দ)

লালবাজারে বাঘ বিক্রি।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ১৪ই নবেম্বরের একটী বিজ্ঞাপন হইতে প্রকাশ—২৩০ নং লালবাজারে মিঃ স্মিথের দোকানে—একটী Royal Bengal Tiger বা সুন্দরবনের বৃহৎ বাঘ, বিক্রয়ার্থে আনান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চারি মাস বয়সের দুইটী বাঘের ছানা ও একটী চিতাবাঘও বিক্রয় করা হইবে। গ্রাহকগণ স্বচক্ষে দেখিয়া, বাঘের মূল্যাদি স্থির করুন। বাঘ দেখিবার জন্য, ইহার রক্ষককে আট আনা বক্‌শিশ দিতে হয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের বঙ্গদেশে আগমন—লাট-কৌন্সিলে তাঁহার একাধিপত্য. সেকালের লাট-সাহেবদের দৈনিক জীবন—ওল্ড কোর্ট-হাউসের ধ্বংসসাধন, সদর দেওয়ানী আদালত—দশ-শালা বন্দোবস্ত—টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধে কর্ণওয়ালিসের জয়লাভ—কর্ণওয়ালিসের আমলে কলিকাতার উন্নতি—লর্ড ওয়েলেসলির আমল—তাঁহার আমলে কলিকাতা-সহরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি—বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদে প্রথম বল ও দরবার—শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ—মার্শম্যান ওয়ার্ড ও ক্যারি—বাঙ্গালার মধ্যে ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা—বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অক্ষর নির্ম্মাণ ও ছাপাখানা স্থাপন—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রথম মুদ্রাঙ্কণ—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—গঙ্গাসাগরে পুত্র-কন্যা ভাসাইয়া দেওয়ার প্রথা রহিত হওয়া—কলিকাতায় তৎকালীন জন-সংখ্যা—আইন আদালতের কথা—সুপ্রীমকোর্টের প্রথম চিফ্-জষ্টিস সার ইলাইজা ইম্পি সম্বন্ধে নানাকথা—ইম্পির কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ ও অভিনন্দন ব্যাপার—সুপ্রীমকোর্টের জজ সার রবার্ট চেম্বার্স—ম্যাডাম গ্রাণ্ডের মোকদ্দমা—সার উইলিয়ম জোন্স—১৭৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুপ্রীমকোর্টের চিফ্-জষ্টিস ও পিউনি জজগণের নামের তালিকা ও কার্য্যকাল—সেকালের ব্যারিষ্টারের ফি—সেকালের সুপ্রীমকোর্টের দণ্ড ব্যবস্থা—চুরী,ডাকাতি ও রাহাজানি, মিথ্যা সাক্ষী প্রভৃতি সম্বন্ধে মোকদ্দমার বিচার ও দণ্ডের নমুনা—সেকালের ফাঁসী দিবার ব্যবস্থা—সেকালের ইংরাজি সংবাদ পত্রাদি—সেকালের বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের তালিকা (১৮১৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৫২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত)—সেকালের প্রকাশিত বহুমূল্য ইংরাজী পুস্তক—প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্র—সমাচার দর্পণ, চন্দ্রিকা ও কৌমুদী—রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মণ-পত্রিকা—বঙ্গদূত—বাঙ্গালা দেশে ছাপার অক্ষরে প্রথম পঞ্জিকা প্রচার—অগ্র দ্বীপের ছাপাখানা—লটারি কমিটি—লটারি-কমিটির সহায়তায় কলিকাতার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি—বঙ্গদেশে প্রথম ষ্টীমার-সার্ভিস্—হুগলি নদীতে প্রথম ষ্টীমার চলাচল—কাশী পর্য্যন্ত—ষ্টীমার যোগে যাতায়াত—খিদিরপুর গবর্ণমেণ্ট ডক-ইয়ার্ড—লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে—জলপথে ষ্টীমার চালাইবার জন্য নানাবিধ বন্দোবস্ত।

প্রাচীন কলিকাতার ক্রমোন্নতি ও আয়তন বিস্তার।

(লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল হইতে লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমল পর্য্যন্ত।)

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকার সমূহের দ্বিতীয় গবর্ণর-জেনারেল রূপে এদেশে আসেন। ১৭৮৬ খ্রীঃ

অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হন। হেষ্টিংসের পদত্যাগের পর হইতে কর্ণওয়ালিসের কলিকাতায় আগমন সময় পর্য্যন্ত, এই কুড়ি মাস কাল, স্যর জন ম্যাক্ফারসন একটিনি গবর্ণরী করেন। ম্যাক্ফারসনের আমলে, এমন কোন নূতন ঘটনা ঘটে নাই—যাহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তবে তিনি গর্ব্ব করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেন,—"ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধিকার সমূহের সুব্যবস্থা ও দুর্নীতিসূচক কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া, আমি কোম্পানীর আড়াই লক্ষ টাকা বাঁচাইয়া দিয়াছি।"

লর্ড কর্ণওয়ালিস একজন শক্তিমান্ পুরুষ। ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজমন্ত্রী পিট্ ও কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণ, তাঁহার হস্তে শাসন-সম্বন্ধে অসীম ক্ষমতা ও একাধিপত্য প্রদান করিয়া, তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। হেষ্টিংসের আমলে, রাজ্যশাসন ব্যাপার সম্বন্ধে, ক্ষমতা প্রকাশ ব্যাপার লইয়া, কৌন্সিলের সদস্যগণের সহিত, গবর্ণর হেষ্টিংসের অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছিল। তাহার ফলে হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিসে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ—রাজ্যশাসন প্রণালীতে ঘোর বিশৃঙ্খলতা। কিন্তু বিলাতের কর্ত্তারা, কর্ণওয়ালিসকে স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়াছিলেন—"কৌন্সিলের সদস্যগণের উপর আপনার হুকুমই শেষ হুকুম। যাহাতে বাঙ্গালার শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ-রূপে দোষশূন্য হয়, তাহার ব্যবস্থা আপনি স্বেচ্ছানুসারে করিবেন।"

লর্ড কর্ণওয়ালিস দৃঢ়চেতা ও নির্ভীক রাজপুরুষ ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই শাসনতন্ত্র সংস্কারে মনযোগ দেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ও সেকালের সিবিলিয়ানেরা বেতন কম পাইতেন বলিয়া, গুপ্তভাবে নানারূপ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেনামী কারবারে যোগ দিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ প্রচুর পরিমাণে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, তাহাদের গুপ্ত ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ করিয়া এবং এ সম্বন্ধে অপরাধীদের শাস্তি দিয়া, শাসনতন্ত্রের এক বিরাট সংস্কার সাধন করেন। লর্ড ক্লাইভ, বহু চেষ্টাতেও যে সমস্ত কুপ্রথা দমন করিতে পারেন নাই, কর্ণওয়ালিস তাহা অতি সহজে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। টিপু সুলতানের ধ্বংসসাধন ও মহারাষ্ট্রশক্তির ক্ষয় করিয়া, লর্ড কর্ণওয়ালিস ইতিহাসে প্রথিতযশা হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে, তাঁহার যশের প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ Permanent Settlement বা "চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত" এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী-বিধির সংস্কার।

তাঁহার শাসনকালের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, তিনি খুব কমই

কলিকাতায় থাকিতেন। টিপু স্থলতানের বিরুদ্ধে অভিযান ও মহারাষ্ট্রীয়-যুদ্ধ ব্যাপারের জন্য, অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে রণক্ষেত্রে থাকিতে হইয়াছিল। কলিকাতায় শান্তিময় জীবন তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না।

কর্ণওয়ালিস্, তাঁহার পুত্র লর্ড ব্রোমারকে তাঁহার কলিকাতা-বাস সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশের সারমর্ম্ম এই—"কলিকাতায় থাকার সময়ে, আমাকে ঘড়ীর কাঁটার অধীন হইয়া কাজ করিতে হয়। প্রত্যেক দিন সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে, আমি অশ্বারোহণে ময়দানে বেড়াইতে যাই। একই রাস্তা, একই দূরত্ব, একই দৃশ্য দেখিয়া রোজ ঘুরিয়া আসিতে হয়। তাহার পর সূর্য্যকিরণ প্রখর হইতে আরম্ভ হইলে আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসি। মধ্যাহ্নকালের সমস্ত সময়টাই, রাজকর্ম্মে অতিবাহিত হয়। তার পর মধ্যাহ্ন ভোজন। অবশেষে অপরাহ্নে ফিটনে করিয়া পুনরায় নগর-ভ্রমণ ও সান্ধ্যবায়ু সেবন। ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমনের পর আমার কাছে সরকারী কাজের যে সমস্ত চিঠিপত্র ও ডেস্‌প্যাচ্ আসিয়াছে, তাহা পাঠ করা। তাহার পর রাত্রি নয়টার সময় আমার সহকারী দুই তিনজন পদস্থ কর্ম্মচারীকে লইয়া, রাত্রি-ভোজন বা সপার। রাত্রি ভোজনের পর প্রতিদিন নিয়মিতরূপে দশটা রাত্রে আমি শয্যা আশ্রয় করি।"

কলিকাতায় অতি স্বল্পকাল থাকিলেও তিনি কলিকাতার বাহিক উন্নতি ও সৌষ্ঠবসাধনে ত্রুটি করেন নাই। সহরের মধ্যে যাহাতে শান্তিরক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়, নগরবাসীরা নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। তখন সহর কলিকাতায় ও ইহার উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থান সমূহে, অর্থাৎ ভবানীপুর, আলিপুর প্রভৃতি স্থানে রাহাজানি ও ডাকাতি যেন নিত্যপ্রথা ছিল। ইহার পরিচয় পাঠক ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। যাহাতে কলিকাতাবাসী বদমায়েসদের ও নরহন্তা-দের সম্পূর্ণরূপে দমন হয়, তজ্জন্য তিনি কঠোর পুলিস পাহারার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার আমলেই বাঙ্গলায় দাস ক্রয়বিক্রয় প্রথার মূলোচ্ছেদের জন্য, প্রথম সরকারী আদেশ বাহির হয়।

"ওল্ড-কোর্ট-হাউস্" অর্থাৎ যে বাটীতে মহারাজা নন্দকুমারের নামে জাল অপরাধের বিচার হয়, তাহা বর্ত্তমান "কোর্টহাউস" পথের শেষাংশে, ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর বাড়ীর গায়েই ছিল। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের

আদেশে, এই পুরাতন কাছারী বাড়িটীকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। আজ কাল যেখানে হাইকোর্ট আছে, সেইস্থানে "নিউ-কোর্ট হাউস" নির্ম্মিত হয়। ভবিষ্যতে এই নিউ-কোর্ট-হাউস্ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, সেইস্থানে প্রথমে সদর দেওয়ানী-আদালত, তৎপরে বর্ত্তমান হাইকোর্টের স্থান হইয়াছে। আর পুরাতন কোর্ট হাউসের ভূমি অধিকার করিয়া, বর্ত্তমান স্কচগির্জ্জা (যাহা রাইটার্স বিল্ডিংএর নিকট আজও বর্ত্তমান) নির্ম্মিত হইয়াছিল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে এদেশ ত্যাগ করেন। তাঁহার স্থানে স্যার জন শোর (পরে লর্ড টেন্‌মাউথ) বাঙ্গলার ভাগ্যবিধাতা হন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব, সেকালের কলিকাতার প্রথম "সাহেব-জমীদার"। এই জমীদারের কাজ ছিল, সহরের উন্নতি, পথ্যা-সংস্কার, শান্তিস্থাপন ও কলিকাতার প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করা। স্যর জন শোর এই "জমীদারের" পদ উঠাইয়া দেন। "জষ্টিসেস্-অব্-দি-পিস" নামধেয় সমিতির হস্তে, তাঁহার আমলেই কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল-বিভাগের ভার অর্পিত হয়। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে এই পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থানসমূহের সীমাও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে, ভারতের সর্ব্বস্থানেই ইংরাজের রাজশক্তি প্রকট হইয়া উঠে। তাঁহার আমলেই কলিকাতার বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট-হাউস নির্ম্মিত হয়। নবনির্ম্মিত গবর্ণমেণ্ট-হাউসে, প্রবেশ সময়ে খুব জাঁক-জমক হইয়াছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে, ইংরাজেরা কোম্পানীর আমলের "আকবর" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সময়ে কলিকাতার লাট-প্রাসাদে, একটী মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়—সেরূপ্ মহোৎসব সেকালে আর হয় নাই। সাত আট শত পদস্থ ইংরাজ নরনারী ও এদেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, গভর্ণর ওয়েলেস্‌লির এই নিমন্ত্রণ মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। এসপ্লানেডের নিকটস্থ বাড়ীগুলি, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গপ্রাকার ও কলিকাতার প্রধান প্রধান অট্টালিকা, উজ্জ্বল আলোক-মালায় পরি-শোভিত হইয়াছিল। নদীবক্ষে অসংখ্য পোতরাজি ও পতাকাদি শোভিত হইয়া এই দৃশ্যের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

বর্ত্তমান নূতন লাট-প্রাসাদের উত্তরদিকের বারান্দায়, এই গৃহপ্রবেশ দিনে লর্ড ওয়েলেসলি একটি দরবার করেন। এই দরবারে ভারতীয় প্রধান প্রধান সামন্তরাজ ও জমীদারগণের প্রতিনিধিসমূহ উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোকও এই দরবারে হাজির হন। দরবারের

কার্য্য শেষ করিয়া লাট বাহাদুর "বল্‌রুমে" যান। এইস্থানে এক সুদীর্ঘ বিচিত্র ও বহুমূল্য কার্পেটের উপর এক সিংহাসন স্থাপিত ছিল। এই বহুমূল্য কার্পেট-খানি একসময়ে টিপু-সুলতানের দরবার-গৃহের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিত।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সিংহাসনে বসিলে—নৃত্যাদি আরম্ভ হইল। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত এই নৃত্যোৎসব চলিয়াছিল। তারপর আতসবাজী ছোড়া আরম্ভ হয়। লক্ষ্ণৌ, মুরশীদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত কারিকরগণ, এই সমস্ত বাজি তৈয়ারি করিয়াছিল। আতসবাজির পর আবার নৃত্যারম্ভ। রাত্রি চারিটা পর্য্যন্ত সমানভাবে নৃত্য চলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, দরবারের পূর্ব্বেই ভোজের ব্যাপারটা শেষ হইয়া গিয়াছিল। ইহাই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট-হাউসের প্রথম "ষ্টেট্‌বল্"।

ওয়েলেস্‌লীর আমলে, কলিকাতার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। সার্কিউলার রোড এই সময়ে পাকা করা হইয়াছিল। "জষ্টিস-অব-দি-পিস"গণ মহোৎ-সাহে সহরের উন্নতির জন্য খাটিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে (১৮০১ খৃঃ অব্দে) একটি বিজ্ঞাপন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়—"তাঁহারা ৮৫ জোড়া বলদ ও ৮৫ খানি স্কাভেঞ্জার গাড়ির জন্য টেণ্ডার দিতেছেন।" কলিকাতা সহরের ময়লা নিষ্কাসনের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছিল। বর্ত্তমান কালে যেরূপ টাউন-ইম্‌প্রুভমেণ্ট কমিটি স্থাপিত হইয়াছে—শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলেও এইরূপ একটী কমিটি স্থাপিত হয়। কি করিলে কলিকাতা সহরের প্রকৃত উন্নতি হইবে, কিরূপভাবে ড্রেণ ও পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করা উচিত, কি প্রকারে বাঁধ প্রভৃতি প্রস্তুত দ্বারা, সহরের মধ্যে বর্ষার সময় গঙ্গার জল প্রবেশ সূচনা বন্ধ হয়, ইত্যাদি বিধানও লর্ড ওয়েলেস্‌লি করিয়া দেন। রাস্তাঘাটের ও গলিগুলির সংস্কার ও নামকরণ, সাধারণ কশাইখানা, গোরস্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান প্রচলন ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তিনি কলিকাতাকে প্রাচ্যদেশের একটি "শ্রেষ্ঠ-নগরী" করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি এদেশ হইতে চলিয়া যান, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার অনুষ্ঠিত সংস্কার কার্য্য গুলি—শেষ হয় নাই।

মার্কুইস ওয়েলেস্‌লি অতি সুদক্ষ, দৃঢ়চেতা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সামরিক প্রতিভাতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার অমিত পরাক্রমেই, টিপু-সুলতানের অধঃপতন হয়—মহীশূর ইংরাজের দখলে আসে। দাক্ষিণাত্যের অনেকগুলি ভূভাগ, ইংরাজসাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। এই কৃতকার্য্যতার জন্য

বাড়ী সমূহের ক্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি

১৭৯৩ খৃঃ হইতে	পাকা বাড়ী	কাঁচা বাড়ী	পাকা বাড়ীর মধ্যে একতল, দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি বাড়ী ছিল। কাঁচার মধ্যে অনেক-গুলির খোলার চাল, বাকী খড়ের বা গোল পাতার।
১৮২১	১৪২৩০	৬৭৫১৯	
১৮৫০	১৩০৭৮	৬১৩৯২	
১৮৮১	১৭৯৮৪	৩৮৬৫১	
১৯০১	৬৮৫৭৪	৮৭৫৮১	

বর্ত্তমানে আমরা প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে নানাবিষয়িণী কথায় আলোচনা করিব।

আইন আদালতের কথা।

পাঠক পূর্ব্বে ওল্ড-কোর্ট-হাউসের কথা শুনিয়াছেন। এ নামকরণ হইবার কারণই "মেয়র্স-কোর্ট" বা ওল্ডকোর্ট। ইংরাজের প্রজাকে, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত বিলাতি-আইন দ্বারা বিচার বিতরণ করিবার জন্যই, এই আদালত স্থাপিত হয়। পুরাতন কোর্ট বাড়িটী ব্রোচিয়ার সাহেবের নির্ম্মিত। এই মেয়র-কোর্টে বিচার করিবার জন্য একজন মেয়র ও নয়জন এল্ডারম্যান নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের বিচারই চূড়ান্ত ছিল না। ১৭২৭ খৃঃ অব্দে এ আদালত স্থাপিত হয়। আপীলের মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন প্রেসিডেণ্ট-ইন্-কাউন্সিল বা স্বয়ং কলিকাতার গবর্ণর সাহেব। ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে যে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার হইত, সেইগুলিই মেয়র সাহেব করিতেন।

মেয়রের নীচেই ছিলেন—জমীদার সাহেব। তিনি একাধারে কালেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট্। এই সাহেব-জমীদার আজকালকার বাঙ্গালী জমীদার বা ভূম্যধিকারী নহেন। এই জমীদার সাহেব, কোম্পানী-বাহাদুরের সেকালের সিবিলিয়ান। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব, বহুদিন জমীদারের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালী সহকারী ছিলেন—গোবিন্দরাম মিত্র। নন্দরাম সেন বলিয়া আরও একজন বাঙ্গালী-ডেপুটী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের দুইজনের নাম ছাড়া, আরও অনেক বাঙ্গালী জমীদারের নাম পাওয়া যায়। পাঠক তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। জমীদার, কোম্পানী-বাহাদুরের জমীদারির প্রাপ্য খাজনা, প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে সে সমস্ত ছোট

থাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা হইত, তাহারও বিচার করিয়া, দণ্ডাজ্ঞা দিতেন। সামান্য অপরাধের দণ্ডবিধানে তাঁহার সরাসর ক্ষমতা ছিল। কিন্তু যথন কোন আসামীর চরম বা প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, সেই সময়ে তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের মত লইতে হইত। তবে সাধারণ দণ্ড অর্থাৎ বেত্রাঘাত, চাবুকমারা, কয়েদ করা প্রভৃতি ব্যাপারে, তিনি সর্ব্বেব ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। একাধারে তিনি জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কাজ করিতেন।

এই সাহেব-জমীদারের একজন এদেশীয় সহকারী বা ডেপুটী ছিলেন, একথা আমরা আগে বলিয়াছি। ইনিই "ব্লাক্-জমীদার"। ইঁহারও ফৌজদারী-বিভাগে শাসনকর্ত্তৃত্ব চলিত—দস্তুরমত কোর্ট-কাছারী বসিত। ব্ল্যাক-জমীদার গোবিন্দরাম মিত্র—বড়ই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ছিলেন। তিনি তাঁহার উপরওয়ালাদের বড় একটা ভয় করিতেন না। তাঁহার প্রচণ্ড-শাসনে চৌরঙ্গীর জঙ্গলে ও কলিকাতার নির্জ্জনতর স্থান সমূহের ডাকাতগণ বড়ই জব্দ হইয়াছিল। তাঁহার নামে তাহারা ভয়ে জড়সড় হইত। এরূপ জনপ্রবাদ, যে একবার তাহারা লোক চিনিতে না পারিয়া—খোদ মিত্রজার পাল্কী ঘেরাও করে। শেষে তাহারা যথন শুনিল—যে সে পাল্কী মিত্রজার, তথন "এ যে ডাকাতের বাবার পাল্কী ছেড়ে দে" বলিয়া সরিয়া পড়ে। এটা গল্পই হউক, আর জনপ্রবাদই হউক, সেকালের ইংরাজী অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী, যে খুব জবরদস্ত হাকিম হইতে পারিত, তাহার প্রমাণ বটে।

প্রথমে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এদেশে ব্যবসা করিতেই আসিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন না—এই বাণিজ্য ব্যাপার হইতেই তাঁহাদের রাজলক্ষ্মী লাভ হইবে। সেকালের প্রতাপশালী বাদসাহ আর প্রাদেশিক নবাব ও ফৌজদারের হাতে তাঁহারা এই বাণিজ্যের স্বত্বাদি লাভ, বাণিজ্য ছাড়, কুঠী-নির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। এই নিগ্রহকারীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছেন, বাঙ্গালার মোগল-ভাইসরয় নবাব-উল-মুলুক সায়েস্তা খাঁ বাহাদুর। তার পর নবাব মুরশীদকুলী খাঁ দেওয়ান এবং সুবেদারের যুক্তপদ লাভ করিয়া, ইংরাজ-বণিকদের বড় কম উৎপীড়ন করেন নাই। ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞ সুপণ্ডিত উইলসন সাহেবের যত্নে ও চেষ্টায়, আজ তাহা শিক্ষিত পাঠক সমাজে অপরিচিত নহে।

ভারতের নানাস্থানে কোম্পানীর কুঠী ছিল। মান্দ্রাজ, বোম্বাই,

সুরাট, বালেশ্বর, ও বাঙ্গালার নানাস্থানে বিশেষতঃ পাটনা, মালদহ, কাশিমবাজার, কলিকাতা প্রভৃতি কেন্দ্রে তাঁহাদের কুঠীতে অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী কাজ করিতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে "সিভিল ও ক্রিমিন্যাল" উভয় শ্রেণীর অপরাধ করিত। কিন্তু ইহাদের শাসনকর্ত্তা হইতেছেন কোম্পানী বাহাদুর। তখন কোম্পানী, ইংলণ্ডের সম্রাটের নিকট চার্টার বা সনন্দ প্রাপ্ত বণিকসমিতি বই আর কিছু নয়। এজন্য এদেশে ইংরাজগণের বিচার-কার্য্যে, ইংলণ্ডীয়-আইন প্রচলন করিবার জন্য, কোম্পানীর বিলাতের ডাইরেক্টারেরা, বিলাতের পার্লামেণ্টের নিকট তিনবার সনন্দ প্রার্থনা করেন। ১৬৬১ খ্রীঃ, ১৬৮৩ খ্রীঃ, ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দের তিন সনন্দের বলে—তাঁহারা এদেশে আদালত স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই জন্য প্রাচীন কলিকাতায় এই মেয়র-কোর্ট, কোর্ট-অব-আয়ার-এণ্ড-টার মিনার, কোর্ট-অব-রিকোয়েষ্টস্ প্রভৃতি নানা নামধারী আদালত স্থাপিত হয়। লর্ড ক্লাইভ কর্ত্তৃক কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই ভাবেই বিচার কার্য্য চলিয়া আসিয়াছিল। তখনকার সরকারী আদালত, নবাব নাজিমের খাসে—তবে তাহাতে ইংরাজের কতক কর্ত্তৃত্ব চলিত। ইহাতে বিচার সম্বন্ধে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ হয়। শেষ ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের চার্টারে সুপ্রীমকোর্টের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সময় হইতে কলিকাতায় শাসনকেন্দ্র যেন একটু পাকা রকমের হইল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস, বাঙ্গালা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের এবং বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম গবর্ণর জেনারেল বা লাট-সাহেব হইলেন। তাঁহার অধীনে একটী মন্ত্রীসভাও স্থাপিত হইল। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান-জজ বা চিফ্‌জষ্টিস ও তাঁহার সহযোগীগণ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া, এদেশে বিচার বিতরণে আসিলেন।

সুপ্রীমকোর্টের উদ্দেশ্য এই—"To protect natives from oppression and to give India benifits of English Law. অর্থাৎ এদেশীয় লোকদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা ও তাহাদের ইংলণ্ডীয় আইনের স্বত্ব ও সুবিধা প্রদান। অবশ্য সুপ্রীমকোর্টের পরবর্ত্তী বিচারকগণের মধ্যে, অনেকেই এদেশবাসীদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। আজকালও অনেকে করিতেছেন। বর্ত্তমানের উজ্জ্বল উদাহরণ, সর্ব্বজনপ্রিয় হাইকোর্টের চিফ্‌জষ্টিস স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স। বস্তুতঃ এই সুপ্রীমকোর্ট ছিল বলিয়া, আর ইহার রূপান্তর হাইকোর্ট

আছে বলিয়াই, আজও ইংরাজ-শাসনের ন্যায়পরতা ও গৌরব সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

ইম্পি, বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠে নাম রাখিয়া গিয়াছেন। নন্দকুমারের মোকদ্দমার জন্য, তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। বাল্যকালে ছেলেরা ইতিহাসে পড়ে—"সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ স্যর ইলাইজা ইম্পির বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।" আজকালকার ঐতিহাসিক গবেষণার দিনে নন্দকুমারের কথা সর্ব্বজন জানিত ঘটনা। অধুনাতনকালে ভূতপূর্ব্ব সিভিলিয়ান বেভারিজ সাহেব—স্যর জেম্‌স, ফিট্‌জেম্‌স ষ্টিফেন সাহেব, নন্দকুমারের নামে আনীত জাল ও চক্রান্ত মোকদ্দমা, তাঁহাদের প্রধান বিচারক ইম্পির সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন।

সুপ্রীমকোর্টের প্রথম জজ স্যর ইলাইজা ইম্পির একটু পরিচয় প্রয়োজন। ১৭৩২ খৃঃ অব্দে তাঁর ইংলণ্ডে জন্ম হয়। তখন কলিকাতা জঙ্গলময়। তাঁহার পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইম্পি, বিলাতের ট্রিনিটি-কলেজে প্রবিষ্ট হন। পলাশী যুদ্ধের বৎসরে, তিনি বি, এ, পাশ করিয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। বিলাতে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারে থাকিবার সময়, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত ইম্পির প্রথম পরিচয় হয়। কে জানিত—যে ভবিষ্যতে তাঁহাদের দুইজনকেই দুইটী বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের, কঠোর দায়িত্বপূর্ণ ভার লইয়া কলিকাতাতেই থাকিতে হইবে। ইম্পি, হেষ্টিংসের অপেক্ষা ছয় বৎসরের বড়। বাল্যকালের এই বন্ধুত্ব—বরাবরই অবিচলিত ছিল। কি ইংলণ্ডে—কি এদেশে। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে, কলিকাতায় ইম্পি যখন ভয়ানক পীড়িত হন, তখন গবর্ণর হেষ্টিংস, ইম্পিকে তাঁহার আলিপুরের বাগানবাটীতে থাকিতে অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি উইলিয়াম কাউপারও ইম্পির সহাধ্যায়ী।

ইম্পি ও তাঁহার সহযোগী জজ তিনজন—১৭৭৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতা চাঁদপালঘাটে অবতরণ করেন। ডিসেম্বরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—সুপ্রীমকোর্ট বসে নাই। পার্লামেন্টের যে আইন অনুসারে, গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল এবং সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল, সে আইনের অনেক গলদ্ ছিল। প্রত্যক্ষ কার্য্যক্ষেত্রে, এই সমস্ত গলদ্ বাহির হইয়া পড়িল। গবর্ণরের কৌন্সিল ও সুপ্রীমকোর্ট উভয়ের মধ্যে কে বড়, এই ব্যাপার লইয়া ক্ষমতা প্রকাশ ব্যাপারে মহাবিপত্তি উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষই

স্বস্ব প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিলেন। নন্দকুমারের ব্যাপার লইয়াই কৌন্সিল ও কোর্টের মধ্যে এই বিবাদটা যেন কিছু বেশী প্রস্ফুট হইয়া উঠে। এই শোচনীয় মনোমালিন্যের সময়েই, নন্দকুমার সুপ্রীমকোর্টের করাল চক্রনেমিপৃষ্ঠ হইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন। ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্তও কৌন্সিল ও সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা লইয়া এই বিবাদ মেটে নাই। শেষ হেষ্টিংস এই ব্যাপারটীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য, ইম্পিকে সদর দেওয়ানী-আদালতের অতিরিক্ত চাকরী বা জজীয়তী পদ প্রদান করিলেন। ইহার বেতন মাসিক পাঁচ হাজার টাকা। এইবার ইম্পির ডবল চাকরী হইল। একদফা সুপ্রীমকোর্টের চিফ্-জষ্টিসগিরি, অন্য দফা সদর-দেওয়ানী-আদালতের জজীয়তী। ইম্পি, হেষ্টিংসের খাতিরে এই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না।*

ইম্পির প্রধান শত্রু ছিলেন, কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেব। ফ্রান্সিস, বিলাতে গিয়াও ইম্পির প্রতিযোগিতা করিতে ছাড়েন নাই। দুই বৎসরকাল ইম্পি সদর-দেওয়ানীর জজীয়তীর এই অতিরিক্ত চাকরী করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া সম্ভবতঃ ফ্রান্সিসের প্ররোচনাতেই বিলাতের লর্ড-চ্যান্সেলার, ভবিষ্যতে একটা মহা হুলস্থুল উপস্থিত করেন। ইহার ফলে ইম্পিকে চাকরী ছাড়িতে হয়, তৎপরে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া বিলাতযাত্রা করেন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের ১৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে বসিয়াছিলেন। ইহার পর বৎসর জুন মাসে তিনি বিলাতে পৌঁছান। তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থাটা, তাঁহার প্রিয়বন্ধু হেষ্টিংসের মত দুঃখেই কাটিয়াছিল। ইম্পির আমলে, সুপ্রীমকোর্টে দুইটী বড় বড় মোকদ্দমা হইয়াছিল। একটী মহারাজ নন্দকুমারের নামে জাল-মোকদ্দমা—ও অপরটী "পাটনা-কজ্" বলিয়া পরিচিত। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে স্যর গিলবার্ট ইলিয়াট (পরে লর্ড মিণ্টো) হাউস অব কমন্সের নিকট, ইম্পিকে "ইমপিচ্" বা অভিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। এজন্য একটী কমিটী স্থাপিত হইয়া ইম্পির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যাদি পর্য্যন্ত গৃহীত হয়। অনেক সম্ভ্রান্তব্যক্তি এই

* The Sudder Dewani Adalat is placed under my management. It will be no agreeable thing to me but as it was the Governor's act, I am contented (Impey's letter to Barwell.) 27-1-1781.

মোকদ্দামায় সাক্ষী দিয়া গিয়াছিলেন। মিঃ টমাস ফারার, যিনি নন্দকুমারের কৌন্সলী ছিলেন, তিনিও ইম্পির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে, ইম্পি হাউস-অব-কমন্সের সম্মুখে আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য নিজেই বক্তৃতা আরম্ভ করেন। এরূপ তেজগর্ভ বক্তৃতা আর কেহ কখনও শোনে নাই। কি আইনের কুটতর্কে, কি ভাষার ইন্দ্রজালে, ইম্পি সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া দেন। ইহার ফলে, হাউস-অব-কমন্স তাঁহাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। ইম্পিও গৌরবের সহিত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পান।*

দোষ ও গুণ লইয়া মানুষ। তা মূর্খই বা কি পণ্ডিতই বা কি? ইম্পির দোষ গুণ দুই ছিল। নন্দকুমারের মোকদ্দামা যে Fair-trial হয় নাই—এই লইয়া সেই সময়ে ও বর্ত্তমানকালে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। লর্ড মেকলে, ইম্পিকে—"নররাক্ষস" প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। আবার অন্যপক্ষে বিলাতের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ লর্ড ম্যান্সফিল্ড, স্যর হেনরি মেইন, ব্লাকষ্টোন প্রভৃতি আইনজ্ঞ মনীষিগণ নন্দকুমারের মোকদ্দামা ব্যাপারে, প্রথমে ইম্পির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতপোষণ করিলেও, পরে মোকদ্দামার সমস্ত কাগজপত্র পড়িয়া, ইম্পিকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। অধুনাতম কালে স্যর জেমস্‌ ষ্টিফেন, তাঁহার Story of Nuncomer and Impey নামক পুস্তকে দক্ষ ব্যারিষ্টারের ন্যায়, তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এবং অন্যপক্ষে বঙ্গের সুদক্ষ সিবিলিয়ান, ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞ, মহাত্মা বেভারিজ, স্যর জেম্‌সের ভ্রমপ্রমাদ সমূহ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়া Trial of Maharaja NundaKumar বলিয়া এক সুবৃহৎ গবেষণাপূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তক পাঠ করিলে সুপণ্ডিত পাঠক, ইম্পিচরিত্রের গভীর রহস্য অবগত হইবেন।

যাহা হউক—ইম্পি এ দেশ হইতে যাইবার সময়, আর্ম্মিনিয়ান, হিন্দু, ইংরাজ, সকল সম্প্রদায়ের স্বাক্ষরিত এক অভিনন্দনপত্র পাইয়াছিলেন। ইংরাজ সম্প্রদায় যে অভিনন্দন দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথম স্বাক্ষরকারী মিঃ ম্যাক্রেবী। এই ম্যাক্রেবী সাহেব—সেকালের কলিকাতার জেলের বড় কর্ত্তা ছিলেন। নন্দকুমার তাঁহারই হেপাজতে কলিকাতার কারাগারে থাকেন।

* এই বক্তৃতা ও মুক্তির পর, বিলাতের তদানীন্তন আইনজ্ঞ পণ্ডিত, লর্ড ম্যান্সফিল্ড ইম্পির সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলেন—"So Sir Elizah you have passed safe over the coals." Impey's Memoirs. P. 295.

ইনি সম্পর্কে ফ্রান্সিসের ভগ্নীপতি বা শ্যালক এইরূপ একটা কিছু হইবেন। ফ্রান্সিস, সাহেব হেষ্টিংস ও ইম্পির প্রধান শত্রু। এই ফ্রান্সিসের জন্যই ভবিষ্যতে ইম্পিকে খুব লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

ইম্পি, পারসী পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন। এটা অবশ্য এদেশে আসিয়া হইয়াছিল। তাঁহার এক মাতামহ বিলাতে বসিয়া—নাদির সাহের এক জীবনবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন।

ইম্পির বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে, যে মোকদ্দামা উপস্থিত হয়, তাহার কবল হইতে তিনি অতি সহজেই উদ্ধার পান। কিন্তু হেষ্টিংস, তাঁহার নিজের মোকদ্দামার জন্য পথের ভিখারি হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও শেষ দশাটা, ইম্পির বড়ই কষ্টে কাটিয়াছিল। সঞ্চিতধন সুদে বাড়াইবার জন্য, তিনি বিলাতে গিয়া অনেক টাকার "ফ্রেঞ্চ-বণ্ড" বা নোট কেনেন। তদানীন্তন ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের জন্য, সে সব নোটের দাম খুব কমিয়া যায়। ইম্পি এইরূপে বড়ই হীনাবস্থা হইয়া পড়েন ও লণ্ডনের বাটী বিক্রয় করিয়া, সসেক্সে নিউইক্ পার্ক নামক এক গ্রামে, জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ঐ গ্রামেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

হাইকোর্টে এখনও স্যর ইলাইজা ইম্পির দুইখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র আছে। যেরূপ পরচুলা পরিয়া, লাল-পোষাকে, তিনি সুপ্রীমকোর্টে—নন্দকুমারের ও অন্যান্য মোকদ্দামার বিচার করিতেন সেই মূর্ত্তিই, এ চিত্র দুইখানিতে চিত্রিত হইয়াছে। ইহাদের একখানি নন্দকুমারের মোকদ্দামার পর, চিত্রিত হয়। কেটল ইহার চিত্রকর। আর একখানি ছবি, যাহা সুবিখ্যাত চিত্রকর জোফানীর হস্তাঙ্কিত, তাহা ইম্পির ভারত ত্যাগের পর চিত্রিত হইয়াছিল। পাঠক! ইচ্ছা করিলে হাইকোর্টে গিয়া, ছবি দুখানি দেখিয়া আসিতে পারেন।

সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম জজ স্যর রবার্ট চেম্বার্স। ইনি নন্দকুমারের বিচারকালে, ইম্পির সহযোগী ছিলেন। ১৭৬১ অব্দে ইনি এম, এ, পাশ করেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে মিডল-টেম্পল হইতে বি, সি, এল উপাধি পান। চেম্বার্স, একজন আইনজ্ঞ ও সুপণ্ডিত জজ ছিলেন। স্যর উইলিয়ম ব্লাকষ্টোন অবসর গ্রহণ করিলে, ইনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী কলেজের আইনের অধ্যাপক হন। চেম্বার্সের সহিত, প্রসিদ্ধ রাসেলাস্-প্রণেতা ডাক্তার জন্সনের সহিত খুব বন্ধুত্ব ছিল। বসওয়েলের লিখিত জন্সন-জীবনীতে বহুবার এই জজ চেম্বার্সের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এদেশে

আসিবার সময়, জন্সনই চেম্বার্সকে হেষ্টিংসের উপর একখানি সুপারিস পত্র দেন।

চেম্বার্স, আইনজ্ঞ ও সুপণ্ডিত জজ ছিলেন। তাঁহার অন্য দুইজন সহযোগী—অর্থাৎ লিমেষ্টার ও হাইডের অপেক্ষা তাঁহার আইন-সম্বন্ধীয় জ্ঞান খুব বেশী ছিল। তিনি যদি একটু দৃঢ়চিত্তে কাজ করিতেন—সহজে তাঁহার সহযোগীদের মতে সায় না দিতেন, তাহা হইলে নন্দকুমার হয়ত প্রাণে বাঁচিয়া যাইতেন। সম্রাট দ্বিতীয়-জর্জ্জের আইন অনুসারে, নন্দকুমারের নামে জাল-অপরাধের "চার্জ্জ" হয়। চেম্বার্সই প্রথমে আপত্তি তোলেন, "দ্বিতীয়-জর্জ্জের আইন অনুসারে না হইয়া সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের আইনানুসারে এই মোকদ্দমার চার্জ্জ করা হউক।" দ্বিতীয়-জর্জ্জের আইন অনুসারে—ইংলণ্ডে জাল করার দণ্ড ছিল—ফাঁসী। কিন্তু এলিজাবেথের আইনে—তাহা ছিল না। তাঁহার সহযোগীগণ, তাঁহার এই অভিমতের বিরুদ্ধে মত প্রদান করেন—এবং চেম্বার্স তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার জন্য, এ বিষয়ে আর তর্কাতর্কি না করিয়া সহযোগীদের মতেই মত দেন। ইহার পর সমস্ত মোকদ্দামাটার সময়ই তিনি প্রতিদিন বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, বাদপ্রতিবাদ সবই শুনিয়াছিলেন, এবং প্রাণদণ্ডাজ্ঞাও সমর্থন করিয়াছিলেন।

ইম্পির এজলাসে আর একটী মজার মোকদ্দামা হয়। ঘটনাস্থল বর্ত্তমান আলিপুর। কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য ফ্রান্সিসের আলিপুরে একটী পল্লী-নিবাস ছিল। ইহা বর্ত্তমান বেলভেডিয়ারের নিকটস্থ কোন স্থানে হইবে, এবং হেষ্টিংস-হাউস হইতে কিছু দূরে। বেলভেডিয়ার সান্নিধ্যে মিঃ লি-গ্রাণ্ড বলিয়া একজন ইংরাজ থাকিতেন। তাঁহার পত্নী, সেকালের কলিকাতা সমাজে পরমা সুন্দরী রমণী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় কেতাদুরস্ত, সুন্দরী তখনকার কলিকাতায় ছিল না।

স্বনামখ্যাত ফিলিপ ফ্রান্সিস, এই সুন্দরীর রূপ দেখিয়া মোহিত হন। এবং প্রবৃত্তিদমন করিতে না পারিয়া, নিশাভিসারে উদ্যত হন। একটী দড়ির সিঁড়ির সহায়তায়, গভীর রাত্রে তিনি লি-গ্রাণ্ডের বাড়ীর উপরতলে উঠেন। সাহেব সেদিন বাড়ী ছিলেন না। মেম-সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলে, তিনি সহসা ফ্রান্সিস্‌কে তাঁহার বিশ্রাম কক্ষে উপস্থিত দেখিয়া, বড়ই আতঙ্কিত হন।

এই ঘটনার পনর মিনিটের পরে একটা সোরগোল হইয়া পড়ায়, ফ্রান্সিস ধরা পড়িবার ভয়ে সেই দড়ির সিঁড়ি দিয়া নীচে পলায়ন করেন। তাঁহার

সঙ্গে তাঁহার প্রিয়বন্ধু মিঃ শী ছিলেন (পরে স্যর জর্জ্জ শী)। লি-গ্রাণ্ডের একজন জমাদার-সিপাহী, মেম-সাহেবের চীৎকার শুনিয়া এই শী সাহেবকে ধরিয়া ফেলে।

গ্রাণ্ড, পরদিন এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, ফ্রান্সিসকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সিস কতকগুলি কারণ দেখাইয়া, তাহা প্রত্যাখ্যান করায়, গ্রাণ্ড সাহেব সুপ্রীমকোর্টে—ফ্রান্সিসের নামে তাঁহার স্ত্রীর মানহানি, ইজ্জতনাশ ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের অভিযোগ উপস্থিত করেন। বিচারক ছিলেন, স্যর ইলাইজা ইম্পি, চেম্বার্স ও হাইড। চেম্বার্স বলেন "যখন প্রকৃত অপরাধের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, তখন কোনরূপ ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে না।" কিন্তু ইম্পি বলেন,—"কোনরূপ অত্যাচারের প্রমাণ না থাকিলেও, গ্রাণ্ড-পত্নীর বিশ্রামকক্ষে গভীররাত্রে প্রবেশ করিয়া, ফ্রান্সিস তাঁহার সম্ভ্রমের হানি করিয়াছেন।" এরূপ স্থলে চেম্বার্স, তাঁহার সহযোগীদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে না পারিয়া বলেন—"বিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হউক।" জজ হাইড বলেন—"মান ও ইজ্জতের তুলনায় এ ক্ষতিপূরণ বড় কম—এক লাখ্ টাকা দেওয়া হউক।" শেষ ইম্পি মধ্যে পড়িয়া রফা করিয়া দেন—"পঞ্চাশ হাজার।" ইহাই সর্ব্ববাদীসম্মতক্রমে গৃহীত হয়।

ইম্পি এদেশ ত্যাগ করিলে ১৭৯১ খৃঃ অব্দে চেম্বার্স সুপ্রীমকোর্টের চিফ্-জষ্টিস হন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তিনি এদেশ হইতে চলিয়া যান। তিনিও এসিয়াটিক-সোসাইটীর সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। চেম্বার্সের কলিকাতার বাটীতে, একটী সুবৃহৎ লাইব্রেরী ছিল। এই লাইব্রেরীর মধ্যে অনেক সংস্কৃত, উর্দ্দু, পারসী, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য গ্রন্থ ছিল। অনেক সংস্কৃতগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এই লাইব্রেরীতে ছিল। এগুলি তিনি বিলাতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তাঁহার সংগৃহীত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি "বার্লিনের রয়াল-লাইব্রেরী" উচ্চমূল্যে কিনিয়া লয়েন।

ইহার পর সুপ্রীমকোর্টের রত্ন, ইংলণ্ডের ও সর্ব্বজগতের গৌরবস্থল বাঙ্গালীর ও সর্ব্বভারতের অতিপ্রিয়, স্যর উইলিয়াম জোন্সের সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলা উচিত। যিনি আমাদের দেশের সংস্কৃত-সাহিত্য লইয়া অতটা নাড়াচাড়া করিয়া গেলেন, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সংক্ষেপেই বলিতেছি।

১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে, স্যর উইলিয়ামের জন্ম হয়। তিনি ইংরাজ নহেন, ওয়েলস্ দেশ তাঁহার জন্মস্থান। কিন্তু তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় আচার-ব্যবহারে জগতের গর্ব্বস্বরূপ। তাঁহার পিতা একজন সুদক্ষ গণিতবিৎ এবং স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের ছাত্র ও বন্ধু। কলেজের পাঠ শেষ করিয়া, জোন্স সাহেব ভ্রমণে বাহির হন। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে কয়েক মাস তিনি পারিসে বাস করেন। ঘটনাক্রমে ফ্রান্সের অধিপতির দরবারে, তিনি সম্রাটের সহিত পরিচিত হন। জোন্সের সহিত ফরাসী-সম্রাটের নানাবিষয়িণী কথোপকথন হয়। জোন্স, রাজ সভা হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইলে, সম্রাট তাঁহার একজন প্রিয় সদস্যকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"এ যুবকের পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। আমার অপেক্ষাও দেখিতেছি ইনি আমার মাতৃভাষায় দক্ষ।" সভাসদ বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন—"সম্রাট! আপনার অনুমানই ঠিক। লোকটা অতি অদ্ভুত শক্তিশালী। তবে জগতের সকল ভাষাই উনি জানেন বটে, কিন্তু নিজের দেশের ভাষা অর্থাৎ "ওয়েল্‌স" ভাষা জানেন না।"

১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে স্যর উইলিয়ম জোন্স, বাঙ্গালার সুপ্রীমকোর্টের একজন পিউনী-জজরূপে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। ইহার পূর্ব্বে বিলাতে তিনি Law of Bailments বলিয়া একখানি গবেষণাময় আইনগ্রন্থ প্রচার করেন। ইহাতে তাঁহার নাম ও যশ বাড়িয়া যায়। এদেশে আসিবার পর জোন্স, এসিয়াটিক-সোসাইটীর মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও ইহার সভাপতি পদে বরিত হন। এই সময় হইতে ইনি সংস্কৃত ও আরবী পারসী পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে, তিনি Digest of Hindu and Mohamedan Law নামক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি এ পুস্তক শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।* ইহার পরই তিনি মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করেন। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ইহা প্রকাশিত হয়। উক্ত বৎসরের ২৭এ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সুপ্রীমকোর্টের সমস্ত জজগণের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না। সুপ্রীমকোর্টের পর হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হয়।

* সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কোলব্রুক পরিশেষে ইহা সম্পূর্ণ করিয়া ১৮০০ খৃঃ অব্দে Digest of Hindu Law বলিয়া বাহির করেন। আইন-ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ।

হাইকোর্টের বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া যাইবে। ১৭৭৪ হইতে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত চিফ্-জষ্টিস ও পিউনী-জজ সুপ্রীমকোর্টে বসিয়াছিলেন, তাহাদিগের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল

চিফ-জষ্টিস	পিউনী-জজ্
স্যর ইলাইজা ইম্পি—১৭৭৪ *	স্যর রবার্ট চেম্বার্স—১৭৭৪
স্যর রবার্ট চেম্বার্স—১৭৯১ *	ষ্টিফেন সিজার লিমেষ্টার—১৭৭৪ *
স্যর জন এন্সট্রুথার—১৭৯৮	জন হাইড্ ১৭৭৬ *
স্যর হেনরি রসেল—১৮০৬	স্যর উইলিয়ম জোন্স—১৭৮৩
স্যর এডওয়ার্ড হাইড্ ইষ্ট—১৮১৩	স্যর উইলিয়ম ডন্কিন—১৭৯১
স্যর বরার্ট ব্লসেট—১৮২৩	স্যর জেমস্ ওয়াট্সন—১৭৯৬
স্যর ক্রিষ্টোফার বুলার—১৮২৪	স্যর জন রয়েড্স্—১৭৯৭
স্যর চার্লস গ্রে—১৮২৫	স্যর হেনরি রসেল—১৭৯৮
স্যর উইলিয়ম রসেল—১৮৩২	স্যর উইলিয়ম বরোজ—১৮০৬
স্যর এডওয়ার্ড রায়ান—১৮৩৩	স্যর ফ্রান্সিস ম্যাকনাটন—১৮১৫
স্যর লরেন্স পিল—১৮৪২	স্যর এন্থনি বুলার—১৮১৬
স্যর জেম্স কল্‌ভিলি—১৮৫৬	স্যর জন ফ্রাঙ্কস—১৮২৫
স্যর বার্ণিস পীকক—১৮৫৯	স্যর এডওয়ার্ড রায়ন—১৮২৭
	স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট—১৮৩৩
	স্যর বি, কে, ম্যালকিন্—১৮৩৫
	স্যর এচ, ডব্লু, সিটন—১৮৩৮
	স্যর আর্থার বটলার—১৮৪৮
	স্যর উইলিয়ম কলভিলি—১৮৫৫
	স্যর চার্লস জ্যাকসন ১৮৫৫
	স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্—১৮৫৯

* চিহ্নিত জজগণ মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমার বিচারকরূপে উপবিষ্ট হন। স্যর রবার্ট চেম্বার্স ভবিষ্যতে চিফ্-জষ্টিস পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

সেকালের সুপ্রীমকোর্টে, দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা আজকালকার মত এত বেশী না থাকিলেও বারিষ্টারের অভাব ছিল না। যে সকল ইংরাজ তখন এদেশে বারিষ্টারি করিতে আসিতেন, তাঁহারা অতুল ধনেশ্বর হইয়া গিয়াছেন। "হার্টলি-হাউস" নামক একখানি গ্রন্থে এই সময়ের বারিষ্টারদের সম্বন্ধে লিখিত আছে, "বারিষ্টারদের মুখে কেবল টাকা—টাকা—রব।" উক্ত গ্রন্থের একাংশে লিখিত আছে—"এদেশ হইতে

যাহারা বারিষ্টারি করিয়া বিলাতে ফিরিয়া যায়, তাহারা যে অতুল ধনেশ্বর হইবে, তাহা বেশী কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। বারিষ্টারদের ফিঃ বড়ই বেশী। যদি তুমি তাঁহাদের একটী প্রশ্ন করিতে চাও, তখনই একটী সোণার মোহর দিতে হইবে। যদি তিনি তোমার জন্য তিন লাইন একখানি চিঠি লিখিয়া দেন, তাহা হইলে তখনই আটাশ টাকা গুণিয়া দিতে হইবে। যদি কখনও কোন বারিষ্টারের পাল্লায় আমায় পড়িতে হয়, এই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইয়া উঠি। একখানি উইল করিতে হইলে, তাহার দীর্ঘতা অনুসারে ব্যারিষ্টারের ফিঃ পাঁচ সোণার মোহর হইতে—আরও বেশী। বিবাহ-সম্বন্ধে চুক্তি-নামার দরও এইরূপ। আর যাহারা মোকদ্দমার জন্য তাহাদের হাতে গিয়া পড়ে, তাহাদের হৃতসর্ব্বস্ব হওয়া অনিবার্য্য। যদি কোন বারিষ্টার সাতটী বৎসর ধরিয়া একমনে রোজগার করেন, আর জুয়াখেলায় মত্ত না হন, তাহা হইলে তিনি লক্ষপতি হইয়া বিলাতে ফিরিতে পারেন।"

এই ত গেল সেকালের বারিষ্টারের কথা। এখন অপরাধীদের দণ্ডের কথা কিছু বলিব। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে ১৮ই আগষ্টের গেজেট হইতে, নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি জানিতে পারা যায়। উক্ত গেজেটের এক জায়গায় আছে—"অনেকগুলি অপরাধী বিচারার্থে সুপ্রীমকোর্টে আনীত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকের হাত পোড়াইয়া দিবার আদেশ হইয়াছে।" বোধ হয়, সেই সময়ে গরম লোহা বা আর কোন কিছু দিয়া অপরাধীকে ছাঁকা দেওয়া হইত। আর কতকগুলিকে "তুড়ুম্" ঠুকিবার ব্যবস্থা হয়।* "টুলক্ কোম্পানীর দোকান হইতে যে ফিরিঙ্গিটা ঘড়ী চুরী করিয়াছিল, তাহার হাত পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এক আদেশ হইতে দেখা যায়, ডাকাতির জন্য কতকগুলি বদমায়েসের ফাঁসি হইবার আদেশ হইয়াছে। সেকালের সুপ্রীমকোর্টের নিম্নলিখিত দণ্ডগুলি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) টমাস ফরেষ্ট—একজন গোরা। অপরাধ দুর্ব্ব্যবহার ও গুণ্ডামি। দণ্ডাজ্ঞা— জেলের মধ্যে গোপনে বেত্রাঘাত ও একমাস ফাটক।

(২) ল, করণ—ইউরোপীয়। অপরাধ—হাফ-মোহর ও রূপার গহনা

* এই দণ্ড-কাষ্ঠ বা pillorya মধ্যে অপরাধীর মাথা গলাইয়া ও তাহার হাত দুখানিকে আবদ্ধ করিয়া সাধারণের সম্মুখে অপমানিত করা হইত।

চুরী। দণ্ডাজ্ঞা—বড়বাজারে সাধারণের সমক্ষে বেত্রাঘাত এবং তিন মাস জেল।

(৩) কানাই দে। অপরাধ—হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক হইতে মোহর চুরী। ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত জেলে থাকিবে। ইহার পর বড়বাজারের দক্ষিণদিকে লইয়া গিয়া, চাবুক মারিতে মারিতে উত্তরদিক পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইবে। তার পর ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই পর্য্যন্ত সশ্রম কারাবাস।

(৪) কৃষ্ণমণি বেওয়া। অপরাধ—চুরী। তাহার হাত পোড়াইয়া দিবার আদেশ হইল। তৎপরে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিনমাস জেল। (১৭৯৩ খৃঃ অব্দ)

(৫) সেখ মহম্মদ। অপরাধ—মানুষকে ছুরী মারা। হাত পোড়াইয়া দিবার পর এক বৎসর জেল। (১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দ)

(৬) ফ্রান্সিস রোজা ও অন্যান্য অপরাধীগণ। অপরাধ—ডাকাতি। দণ্ড—মৃত্যু ব্যবস্থা।

(৭) রঘুনাথ কুমার। অপরাধ—বড় গোছের চুরী। দণ্ড—হাত পোড়াইয়া দিবার পর দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস। (১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দ)

(৮) গঙ্গারাম মিত্র ও কাঙ্গালী। অপরাধ—হত্যা করিবার জন্য নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ। দণ্ডাজ্ঞা—এক বৎসর কারাগারে থাকিবে। তৎপরে পাঁচশো সিক্কা-টাকার মুচলেখা লইয়া, তিন বৎসর সদ্ব্যবহারের করারে মুক্তি দান। মুচলেখা না দিতে পারিলে আবার কারাবাস। (১৭৯৫ খৃঃ অব্দ)।

(৯) স্বরূপ পোদ্দার, মোহন সিং, গঙ্গারাম ও রামজয়। অপরাধ—জাল-টাকা চালান। দণ্ডাজ্ঞা—৪ঠা জানুয়ারি পর্য্যন্ত অপরাধীগণ জেলে থাকিবে। তৎপরে লালবাজারে তাহাদের লইয়া গিয়া, দুই ঘণ্টাকাল দণ্ডকাষ্ঠ (pillory)তে আবদ্ধ রাখা হইবে। তার পর ১৮ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পুনরায় জেলে আটক রাখিয়া, বড়বাজারের দক্ষিণদিকে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। এইভাবে বাজারের উত্তরদিক পর্য্যন্ত চাবুক লাগাইতে লাগাইতে আনা হইলে ও দুইদিন এইভাবে চাবুক খাইলে, তাহাদের পুনরায় জেলে আটক করা হইবে। ইহাদের মধ্যে, যাহাদের দীর্ঘকাল মেয়াদের হুকুম হয় নাই—তাহাদের এক সিক্কা টাকা জরিমানা ও পাঁচ হাজার টাকার মোচলেখা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। (১৭৯৫ খৃঃ অব্দ)।

(১০) পার্ব্বতী বেশ্যা। অপরাধ—চোরাই মাল রাখা। ৮ই আগষ্ট অবধি জেলে আবদ্ধ থাকিবে। তার পর বড়বাজারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করতঃ এক টাকা জরিমানা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। (১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দ)

(১১) হিঙ্গন ওরফে শিবু। অপরাধ—সামান্য চুরী। দণ্ড—বড়বাজারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত ও এক টাকা জরিমানা। (১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দ)

(১২) প্রহ্লাদ রক্ষিত ওরফে আত্মারাম রক্ষিত। অপরাধ—মিথ্যাসাক্ষ্য। দণ্ডাজ্ঞা ছয়মাস কারাবাস ও এক টাকা জরিমানা। (১৭৯৫ খৃঃ অব্দ)

(১৩) মীর গোলাম আলি। অপরাধ—চুরী। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু।

(১৪) ব্রজমোহন দত্ত। অপরাধ—এক গৃহস্থের বাড়ী ২৫৲ টাকা মূল্যের জিনিস পত্র চুরী। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু। (১৮০০ খ্রীঃ অব্দ)

(১৫) হরি পাল, প্রসাদ পাল, রামজয় ও চৈতন। অপরাধ—রাজপথে রাহাজানি। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু। (১৮০০ খৃঃ অব্দ)

(১৬) বিষ্ণুপ্রসাদ শ্রীমানী। অপরাধ—জাল। লালবাজারে লইয়া গিয়া তুড়ুম-প্রয়োগ। তৎপরে দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস। (১৮০০ খ্রীঃ অব্দ)

(১৭) জোসেফ লেপারুজ। অপরাধ—হত্যা ও নৌকা লুঠ। দণ্ড—মৃত্যু। ফাঁসীর পর দেহ—লোহার শিকলে বাঁধিয়া, সাধারণ রাজপথে গাছের ডালে ঝোলাইয়া দেওয়া হইবে। (১৮০২ খ্রীঃ অব্দ)

(১৮) বৈজু মশালচী। অপরাধ-চুরী। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু। (ঐ)

(১৯) পলি ষ্ট্রাটী, আনন্দীরাম ইত্যাদি। অপরাধ—চক্রান্ত। দুই বৎসরের মেয়াদ ও তুড়ুম। (ঐ)

(২০) রামসুন্দর সরকার। অপরাধ—মিথ্যা সাক্ষ্য। দণ্ড—সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর। (ঐ)

(২১) টার জ্যাকব, টার পিটুস। অপরাধ—মিথ্যা সাক্ষ্য। অপরাধী একজন আর্ম্মিনিয়ান পাদরী। দণ্ড—দুই বৎসর জেল ও জরিমানা এক টাকা। (ঐ)

(২২) ইমামবক্স গলিয়া। অপরাধ চুরী। দণ্ড—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

(২৩) টমাস নর্ম্মাণ মর্গান। অপরাধ—জাল। দুই বৎসর মেয়াদ, তুড়ুম ও জরিমানা এক টাকা। (ঐ)

(২৪) জন ম্যাকলচিন। অপরাধ—নরহত্যা। দণ্ড—একমাস জেল ও এক টাকা জরিমানা। (১৮০৪)

(২৫) মহম্মদ টিণ্ডাল। অপরাধ—নরহত্যা দণ্ড—এক মাস জেল ও এক টাকা জরিমানা। (ঐ)*

(২৬) কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রামকানাই ঘোষ। অপরাধ—জাল। ইহারা তামার প্লেট প্রস্তুত করিয়া ২৫০০৲ টাকার "ট্রেজারি-বিল" জাল করে। প্লেট করিয়া নোট জাল বা বিল জাল, কলিকাতায় এই প্রথম হয়। অপরাধিগণের দুই বৎসরের মেয়াদ ও একদিন তুড়ুমের ব্যবস্থা হয়।

(২৭) এন্‌সাইন সোডে। অপরাধ—নরহত্যা। দণ্ডাজ্ঞা—২০০৲ টাকা জরিমানা, এক বৎসরের মেয়াদ।

(২৮) উইলিয়াম সোবিজ। অপরাধ—বাঙ্গলোঘরে আগুন লাগান। দণ্ড—দুই বৎসরের মেয়াদ।

(২৯) বৃন্দাবন দোবে। অপরাধ নরহত্যা। হাত পোড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহার উপর এক বৎসর মেয়াদ। (১৮১২ খৃঃ অব্দ)

(৩০) ব্যারী ও বয়েল নামক দুইজন গোরা। অপরাধ—রাহাজানি। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু। (১৮১৩ খৃঃ অব্দ)

(৩১) রডরিক্। অপরাধ—পে-এ্যাবস্‌ট্রাক্ট অর্থাৎ তলবানাপত্র জাল। দণ্ড—কদম ব্যবস্থা। প্রথমবার এই অদ্ভুত ব্যবস্থা হয়।

আর একটী ঘটনা—ইহা ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে ২৪শে জানুয়ারির কথা। ঘটনাটী এক ফকিরের ফাঁসি। বলা যায় না কি কারণে, এই ফকির, উইলিয়াম বোচ্যাম্প বলিয়া এক সাহেব শিশুকে, হাবড়াঘাটে হত্যা করে। তখন হাবড়ার যে স্থান "স্কুলগ্রাউণ্ড" বলিয়া পরিচিত ছিল, সেইখানে ফাঁসিকাষ্ঠ নির্ম্মিত হয়। এ ফাঁসি দেখিবার জন্য অনেক মুসলমান জড় হইয়াছিল—কেন না মুসলমান ফকিরের ফাঁসী। কিন্তু সমবেত জনতা, অপরাধীকে প্রহরীদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার কোন চেষ্টাই করে নাই, বরঞ্চ স্থিরভাবে ব্যাপারটা দেখিয়াছিল।

তার পর আর এক পেটুকের ফাঁসির কথা বলিতেছি। কথায় বলে—"ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নেওয়া।" লোকটার ঠিক তাই হইয়াছিল। একজন সমসাময়িক ভ্রমণকারী তাঁহার পুস্তকে লিখিতেছেন—"আমরা ফাঁসীর স্থলে উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার জেল হইতে কিছুদূরে এক মাঠে ফাঁসির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ফাঁসি দেখিবার জন্য একটীও লোক সেখানে উপস্থিত নাই। লোকের মধ্যে কেবল—আমরা

গ্রাহ্য হইল। কিন্তু বেগম ইতিমধ্যে একখানি মোচলেখা ও জামিন নামা দিবেন—যেন, ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে বিলাত হইতে রাজার হুকুম আসিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিবার জন্য পুনরায় আদালতে হাজির হইবেন।" মোকর্দ্দমার তারিখ—১৮২৮ খ্রীঃ অব্দ ২১এ এপ্রিল।

তখনকার কালে ফাঁসী দেওয়া ব্যাপারটা চুপে চুপে হইত না। প্রকাশ্য স্থলে, অসংখ্য জনতার মধ্যে ফাঁসি হইলে লোকের মনে ভয় সঞ্চার হইবে ও এরূপ দুষ্কর্ম্ম লোকে আর করিবে না, এই ভাবিয়া প্রায়ই "চৌমাথার উপর" (where four roads meet) অস্থায়ী ফাঁসি-কাষ্ঠ রচিত হইত। বেত্রাঘাত ব্যবস্থা, তুড়ুমের ব্যবস্থা—তাও প্রকাশ্য রাজপথে জনসঙ্ঘের দৃষ্টির সম্মুখে। লালবাজারে ও বড়বাজারের জনপূর্ণ স্থানে বাজারের একদিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, অপরাধীকে চাবুকের দ্বারা আঘাত করা হইত। তুড়ুম—দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রকাশ্য স্থানে। তা—অপরাধী এদেশীয় লোকই হউক বা সাহেবই হউক। এইরূপ দুই একটী ফাঁসির উদাহরণ দিয়া, আমরা আইন আদালতের কথা শেষ করিব। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি—কুলীবাজারের নিকটস্থ মাঠে হয়। ইহার পরে প্রাণদণ্ডের আসামীদের মধ্যে, অধিকাংশই মৃত্যু। [illegible] পর [illegible] নির্দ্দিষ্ট বা [illegible]-গাছের ডালে ঝোলাইয়া দেওয়া হইবে। (১৮০২ খ্রী: অব্দ)

(১৮) বৈজু মশালচী। অপরাধ—চুরী। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু। (ঐ)

(১৯) পলি ষ্ট্রাটী, আনন্দীরাম ইত্যাদি। অপরাধ—চক্রান্ত। দুই বৎসরের মেয়াদ ও তুড়ুম। (ঐ)

(২০) রামসুন্দর সরকার। অপরাধ—মিথ্যা সাক্ষ্য। দণ্ড—সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর। (ঐ)

(২১) টার জ্যাকব, টার পিট্রুস। অপরাধ—মিথ্যা সাক্ষ্য। অপরাধী একজন আর্ম্মিনিয়ান পাদরী। দণ্ড—দুই বৎসর জেল ও জরিমানা এক টাকা। (ঐ)

(২২) ইমামবক্স গলিয়া। অপরাধ চুরী। দণ্ড—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

(২৩) টমাস নর্ম্মাণ মর্গান। অপরাধ—জাল। দুই বৎসর মেয়াদ, তুড়ুম ও জরিমানা এক টাকা। (ঐ)

(২৪) জন ম্যাকলচিন। অপরাধ—নরহত্যা। দণ্ড—একমাস জেল ও এক টাকা জরিমানা। (১৮০৪)

কর্ত্তারা, গঙ্গাগর্ভের উপরই এই পাঁচজন দণ্ডিত আসামীর ফাঁসির ব্যবস্থা করেন। দুই খানা ভড়, পাশাপাশি রাখিয়া, তাহার উপর ফাঁসিকাষ্ঠ নির্ম্মিত হয়। এরূপ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়—যে হুগলী নদীতে যত জাহাজ আছে—সকল জাহাজ হইতেই একখানি বোট আসিবে ও সেই বোটে সেই জাহাজের লোকজন থাকিবে। নাবিকদের মনে ভয়োৎপাদন করাই এই ব্যবস্থার মূল কারণ। প্রভাতে—ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ হইতে একটী কামানধ্বনি হইল। যেখানে ফাঁসি হইবে, সেইস্থানে বধমঞ্চের উপর একটী হল্‌দে রঙের পতাকা উড়িল। দেখিতে দেখিতে জাহ্নবী বক্ষে নৌকার গাদি লাগিয়া গেল। নদীর উভয় কূলবর্ত্তী জাহাজের ডেকও লোক পরিপূর্ণ। বেলা নয়টার সময় একদল সিপাহী বেষ্টিত হইয়া অপরাধীগণকে ওল্ডকোর্ট ঘাটে আনা হয়। তার পর তাহাদের সমভাবে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া, সেই ফাঁসিমঞ্চের উপর লইয়া যাওয়া হয়। যাহা কিছু সে ক্ষেত্রে করণীয় কাজ, তাহা শেষ করিয়া ঠিক ৯টা ২০ কুড়ি মিনিটে আবার এক তোপ পড়িল এবং সেই সঙ্গে পাঁচজন অপরাধীর ফাঁসি হইয়া গেল। অপরাধটা সেলার বা নাবিক দলেরই কৃত—সুতরাং তাহাদের সমবৃত্তিসম্পন্ন অন্যান্য লোকদের মনে ভয় জন্মাইবার জন্য গঙ্গাবক্ষে ফাঁসি দিবার এই অদ্ভুত ব্যবস্থা হয়।

আর একটী ঘটনা—ইহা ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে ২৪শে জানুয়ারির কথা। ঘটনাটী এক ফকিরের ফাঁসি। বলা যায় না কি কারণে, এই ফকির, উইলিয়াম বোচাম্প বলিয়া এক সাহেব শিশুকে, হাবড়াঘাটে হত্যা করে। তখন হাবড়ার যে স্থান “স্কুলগ্রাউণ্ড” বলিয়া পরিচিত ছিল, সেইখানে ফাঁসিকাষ্ঠ নির্ম্মিত হয়। এ ফাঁসি দেখিবার জন্য অনেক মুসলমান জড় হইয়াছিল—কেন না মুসলমান ফকিরের ফাঁসী। কিন্তু সমবেত জনতা, অপরাধীকে প্রহরীদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার কোন চেষ্টাই করে নাই, বরঞ্চ স্থিরভাবে ব্যাপারটা দেখিয়াছিল।

তার পর আর এক পেটুকের ফাঁসির কথা বলিতেছি। কথায় বলে—“ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নেওয়া।” লোকটার ঠিক তাই হইয়াছিল। একজন সমসাময়িক ভ্রমণকারী তাঁহার পুস্তকে লিখিতেছেন—“আমরা ফাঁসীর স্থলে উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার জেল হইতে কিছুদূরে এক মাঠে ফাঁসির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ফাঁসি দেখিবার জন্য একটীও লোক সেখানে উপস্থিত নাই। লোকের মধ্যে কেবল—আমরা

কয়েকজন। অপরাধী একটী পাত্রে করিয়া ভাত খাইতেছে, আর সিপাহিরা তরোয়াল খুলিয়া তাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। একজন বাঙ্গালী কেরাণী কাগজ-কলম লইয়া সে স্থানে উপস্থিত। ফাঁসির সময়ে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট-পাঠাইবার জন্যই, কেরাণীবাবুকে সেখানে উপস্থিত রাখা হইয়াছে।

জেলার বা কারাধ্যক্ষ একজন মুসলমান। তিনিও কেরাণীর কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। একজন সাহেব এসিষ্ট্যাণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটও সেখানে উপস্থিত। সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট জেলারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব প্রস্তুত ত?" জেলার বলিল—"হাঁ জনাব। তবে লোকটার এখনও খাওয়া শেষ হয় নাই।" সেই অপরাধী একথা শুনিতে পাইয়া বলিল—"আর এক মিনিট অপেক্ষা করুন সাহেব। এই কটা ভাত আমি এখনই খাইয়া লইতেছি।" এই বলিয়া সে ভাতক'টা খাইয়া লইল। একটা টিনের পাত্রে দুধ ছিল তাহাও চুমুক দিয়া খাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে বলিলেন—"অপরাধী! তোমার কিছু বলিবার আছে?" এই কথা শুনিয়া লোকটা সত্য মিথ্যা, অনেকগুলা কথা একবারে বলিয়া ফেলিল। কেরাণী তাহা টুকিয়া লইলেন। তার পর উপযুক্ত সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হস্তেঙ্গিতে বলিলেন—"এইবার লটকাইয়া দাও।" এই আদেশ পাইবামাত্রই, লোকটাকে বধমঞ্চে উঠান হইল ও তাহার গলায় ফাঁস পড়িল।*

সেকালের সংবাদ-পত্রাদি।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অর্থাৎ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া, পরবর্ত্তী কালের ইংরাজী সংবাদপত্রগুলির কথা আমরা প্রথমে বলিব। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে "ইণ্ডিয়া-গেজেট" নাম দিয়া এক ইংরাজি সংবাদপত্র বাহির হয়। এ সংবাদপত্রের প্রচার, মহারাজ নন্দকুমারের সমসময়ের। কিন্তু ইহা সরকারী সংবাদ পত্র বই আর কিছুই ছিল না— তবে অনেক এদেশীসংবাদ ও বিলাতী খবর, সরকারী আদেশ ও ইস্তাহার সমূহ পাশাপাশি হইয়া ইহাতে ছাপা হইত।

১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে, অর্থাৎ নন্দকুমারের ফাঁসির পাঁচ বৎসর পরে "হিকিজ গেজেট" বা "বেঙ্গল-গেজেট" বলিয়া এক ইংরাজি সংবাদপত্র বাহির হয়। হিকি সাহেব এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি

* Lang's Wanderings—Good Old days of Honble John Company.

ওয়ারেণ হেষ্টিংস, স্যর ইলাইজা ইম্পি, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রভৃতি অনেক পদস্থ কর্ম্মচারীদের গালাগালি দিয়া গিয়াছেন। এখনও এই জীর্ণ গেজেটের কাপি বিলাতের ব্রিটিশ-মিউজিয়মে বর্ত্তমান। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে লেখক তাহার একখণ্ড বাঁধান কাপি, সাবেক মেটকাফ-হল বা বর্ত্তমান ইম্পিরিয়াল-লাইব্রেরীতে দেখিয়াছিলেন।

১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে গর্ডন ও হে কোম্পানীর ছাপাখানা হইতে "ওরিয়েণ্ট্যাল-ম্যাগাজিন" নামক এক মাসিকপত্র বাহির হয়। ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে "কলিকাতা-ম্যাগাজিন" ও "ওরিয়েণ্টাল-মিউজিয়াম" এই যুগ্ম-নামে আরও একখানি মাসিক সংবাদপত্রের জন্ম হয়। মেসার্স হোয়াইট এণ্ড কোং ৫১ নং কসাইটোলা ষ্ট্রীট হইতে ইহা বাহির করেন।

১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে, ইণ্ডিয়া-গেজেটের নব পরিবর্ত্তিত সংস্করণ বাহির বাহির হয়। এই সময়ে বিলাতের ও ইউরোপের নানা স্থানের সংবাদ এই কাগজে প্রকাশ হয়। তবে সে সময়ের কাগজে আজকালকার মত টাটকা বিলাতী সংবাদ দেখিতে পাওয়া যাইত না—কারণ তখন টেলিগ্রাফও ছিল না এবং বিলাত হইতে কলিকাতায় জাহাজ আসিতে ছয় মাসের উপর সময় লাগিত। ফরাসীবিপ্লব, লুই ও বোঁর্ব্বো পরিবার-গণের ফাঁসির ঘটনা—বারমিংহামের মহাদাঙ্গা, লর্ড কর্ণওয়ালিসের শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ অবরোধ সম্বন্ধে, নানাবিধ সংবাদ, এই সব কাগজে থাকিত। তখনকার সংবাদপত্রের কর্ত্তারা, এই সব অতি বিলম্বিত বিলাতী সংবাদ পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকিতেন। কোন জাহাজ ভাগীরথী-মুখে ঢুকিয়াছে সংবাদ পাইবামাত্র, কাগজে-কর্ত্তারা, দ্রুতগামী বোট ডাউলে পাঠাইয়া ভাগীরথীর মোহানা পর্য্যন্ত লোক পাঠাইতেন। শোনা গিয়াছে, অনেক সময়ে ইঁহারা কেজিরি পর্য্যন্ত গিয়া বিলাতী সংবাদ এই সব নবাগত জাহাজ হইতে সংগ্রহ করিতেন।

১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দের ১লা নবেম্বর "কলিকাতা-মন্থলি-জর্ণাল" বলিয়া, আর একখানি নূতন মাসিকপত্র বাহির হয়। ওয়েষ্টন লেন হইতে এ কাগজখানি বাহির হইয়াছিল। ইহার প্রিণ্টার ছিলেন—জে, হোয়াইট্ বলিয়া একজন সাহেব।

১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ২০ জানুয়ারী "বেঙ্গল হরকরার" প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এখানি কলিকাতার দ্বিতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ওরিয়েণ্টাল-ষ্টার আফিসে ইহা মুদ্রিত হইত।

উক্ত বৎসরের ৪ঠা অক্টোবরে, "ইণ্ডিয়ান এপলো" বলিয়া আর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কলিকাতা হইতে বাহির হয়। এ পত্র খানি প্রতি রবিবারে ১৫৮ নং চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশ হইত।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ৪ঠা এপ্রিল "রিলেটার" বলিয়া আর একখানি সংবাদ পত্র বাহির হয়। ইহা সপ্তাহে দুইবার বাহির হইত—ও ইহাতে বিলাতি সংবাদই কিছু বেশী থাকিত। জন্ হাউএল ইহার সম্পাদক।

১৮১৮খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বরে "কলিকাতা-জর্ণাল" ও "কলিকাতা এক্সচেঞ্জ প্রাইস-করেণ্ট" নামে দুখানি সংবাদ পত্র বাহির হয়। শেষোক্ত কাগজ খানি এখন সর্ব্বজন বিদিত--"এক্সচেঞ্জ-গেজেট" নামে পরিচিত। উক্ত বৎসরের জুলাই মাসে—"এসিয়াটিক্ ম্যাগাজিন্ ও মেডিকেল-মিসলেনী" বলিয়া আর একখানি ইংরাজী মাসিকপত্র বাহির হয়। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ কর্ত্তৃক—"ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন এই ফ্রেণ্ড অব-ইণ্ডিয়া ষ্টেটস্ম্যানের সহিত মিলিত।

১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ২১ জুন—"এসিয়াটিক ম্যাগাজিন" বলিয়া আর একখানি মাসিক, ৭নং পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট হইতে বাহির হয়। এই মাসিকের—প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য, নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকের জন্য চারি টাকা। যাহারা নিয়মিত গ্রাহক নহেন—তাঁহাদের জন্য প্রত্যেক সংখ্যা ছয় সিক্কা টাকা।

প্রত্যেক সংবাদপত্রের ধারাবাহিক বিবরণ দিতে গেলে, পুঁথি বাড়িয়া যায়। এজন্য আমরা নীচে একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম। এই সংবাদ পত্রগুলির প্রচার হইতে প্রমাণ হইতেছে তখন কলিকাতা সহরে একাধিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর এই সব ইংরাজী কাগজের পাঠক ইংরাজ-সম্প্রদায়।

ইংরাজী সংবাদপত্রের নাম	আবির্ভাবের তারিখ	মন্তব্য
উইকলি গ্লিনার	৩১।১০।১৮২৪	* * *
জন বুল ইন্ দি ইষ্ট	২।৭।১৮২১	জেমস মেকেঞ্জি (সম্পাদক)
কলিকাতা কুরিয়ার	৬।৫।১৮২৭	এচ্., নেলন্ কোং
ওরিএণ্টাল ম্যাগাজিন	১৮২৭	* * *

সংবাদ পত্রের নাম।	আবির্ভাব সময়।	সম্পাদকের নাম।
সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা	—	গোবিন্দচন্দ্র দে
সর্ব্বশুভকরী	—	মতিলাল চট্টোপাধ্যায়
সত্য-প্রদীপ	—	এম্, টাউনসেণ্ড
বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়	—	রামচরণ ভট্টাচার্য্য
সংবাদ-সুধাংশু	" ১৮৫২	রেভারেণ্ড, কে, এম, বানার্জ্জি
উপদেশক	—	রেভারেণ্ড, জে, ওয়েন্‌জায়
সত্যসঞ্চারিণী	—	শ্যামাচরণ বসু
সংবাদ-নিশাকর	—	নীলকমল দাস
ধর্ম্ম-অর্থ-প্রকাশিকা	—	
ভক্তিসূচক	—	রামনিধি দাস
দূরবীক্ষণিকা	—	
জ্ঞানোদয়	—	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
জ্ঞানদর্শন	—	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়
কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা	—	কাশীদাস মিত্র
মেদিনীপুর ও হিজলী গার্জিয়েন	" ১৮৫২	এচ, ভি, বেলী, সি, এস।
বিবিধার্থ সংগ্রহ	—	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
জ্ঞানারুণোদয়	—	কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার
সুলভ পত্রিকা	—	তারানাথ দত্ত

উল্লিখিত তালিকা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন—১৮১৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসরের মধ্যে কতগুলি সংবাদপত্র, এই কলিকাতা সহরে ও উপকণ্ঠের নানাস্থানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে চৌদ্দ আনা পরিমাণ সংবাদপত্র, অতি স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। উক্ত তালিকা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কেবল বাঙ্গালী সম্পাদক নহে, জনকয়েক পাদরী সাহেবও কয়েকখানি বাঙ্গালা কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। এই দলের মধ্যে একজন সিভিলিয়ানও আছেন। সেকালের কাগজগুলির কিরূপ

ভাবে নামকরণ হইত, তাহাও পাঠক উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাইবেন।*

এক্ষণে সেই পুরাকালে, ইংরাজী ভাষায় কি কি আবশ্যকীয় পুস্তকাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। সকল গুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব বিবেচনায়, আমরা কেবল সেই সমস্ত পুস্তকের নাম, গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় ও মুদ্রণের বা প্রকাশের বৎসর দিয়া, একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।

পুস্তকের নাম	মুদ্রণের বা প্রকাশের তারিখ	গ্রন্থকর্ত্তার নাম	মূল্যাদি
ইণ্ডিয়ান গাইড (সচিত্র ভ্রমণ পুস্তক)	১৭৮৫ খ্রী অব্দ	নাম নাই	—
দি মিরর (পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ কমেডি)	১৭৯৫ „	মিঃ সনাব্যাট	দুই সোনার মোহর
ইণ্ডিয়ান ট্রাভেলার (৩ ভলম)	—	—	
বেভি অব ক্যালক্যাটা বো	—	—	এক মোহর
উর্দ্দু ডিক্‌সনারী—	১৭৮৭ „	প্রোফেসর গিল-ক্রাইষ্ট	—
বাঙ্গলা ও পারসী মিশ্রিত ইংরাজী ব্যাকরণ	১৭৯০ „	ডাক্তার মেকিনন	কোম্পানী বাহাদুরের ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়।
উলূকাদ্ উদউইয়ে (Materia Medica) (মহম্মদ আবদুল সিরাজী, সাহজাহান বাদসাহের গৃহ চিকিৎসক প্রণীত।)	১৭৯৩ „	ফ্রান্সিস গ্লাডউইন	দুই মোহর
পার্সিয়ান মুন্সী	„	ঐ	ষাটসিক্কাটাকা

* সংবাদপত্র সমূহের এই বিস্তীর্ণ তালিকা, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রেভারেণ্ড জে, লং কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টে পেশ হয়। Vide Selections from Records of the Bengal Government No XXII P. 145 quoted by Raja B. K Dev.

পুস্তকের নাম	মুদ্রণের তারিখ	গ্রন্থকর্ত্তার নাম	মন্তব্য
ডিক্সনারী অব্ মেহমেদান ল।	—	ফ্রান্সিস্ গ্লাডউইন	৩০৲ টাকা।
সিষ্টেম অব রেভেনিউ একাউণ্টস্।	—	ঐ	ঐ
পারস্য ভাষার ছন্দ ও কবিতার বিচার	—	ঐ	ঐ
ইংলিশ ও পারসী ভকাবলারী	—	ঐ	১৬৲ টাকা
তুতি নামা	—	ঐ	ঐ
বাঙ্গলা ভাষার অভিধান	১৮১৫ খৃঃ	—	—
কলিকাতা সহরের নক্সা	১৭৯২ „	মিঃ বেলি	বাঁধান ম্যাপ—২৫ সিক্কা টাকা
জেনারেল মিলিটারি রেজিষ্টার।	১৭৯৫ „	—	১ মোহর প্রতি কাপি—(ইহাই প্রথম আর্ম্মি লিষ্ট)
ইণ্ডিয়ান সার্পেণ্টস (সচিত্র)		ডাঃ প্যাট্রিক রসেল	৩৫ সিক্কা টাকা।
ভারতের উদ্ভিদ বিজ্ঞান	—	ডাঃ রক্সবরা	১২ সিক্কা টাকা।
মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাস	—	—	৫০৲ টাকা।
মুসলমানী দায়ভাগ।	১৭৯২ „	স্যর উইলিয়ম জোন্স	১৬৲ টাকা কপি। এইপুস্তকের বিক্রয় লব্ধ অর্থ, যোত্রহীন ঋণীদিগের কারা-মুক্তির জন্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়।
সাহ আলমের রাজত্বের ইতিহাস।	১৭৯৮ „	কাপ্তেন ফ্রাঙ্কলিন্	—
মহীসুর দৃশ্যাবলী (সচিত্র)	—	লেফটেনাণ্ট কোলব্রুক	১২০ আর্কট টাকা প্রতি কাপি।

পুস্তকের নাম	মুদ্রণের তারিখ	গ্রন্থকর্ত্তার নাম	মন্তব্য
বাঙ্গালা হইতে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া স্থলপথে ইংলণ্ড-যাত্রা	—	জর্জ্জ ফরস্টার	২৫ সিক্কা টাকা।
বাঙ্গলা ব্যাকরণ।	১৭৭৮ খৃঃ	মিঃ হ্যালহেড*	

এই সময়ে শ্রীরামপুরের মিশনরীদের চেষ্টায় "সমাচারদর্পণ" নামক এক বাঙ্গলা খবরের কাগজ বাহির হয়। (২৩এ মে ১৮১৮) তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব হেষ্টিংস, এদেশীয় সংবাদপত্র প্রচারের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। এদেশীয়দের মধ্যে সংবাদপত্র সাহায্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। সমাচার-দর্পণ বাহির হইলে তিনি ইহার সম্পাদককে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া উৎসাহ প্রদান করেন। মার্কুইস অব হেষ্টিংস এর মনে এদেশীয়দিগকে উচ্চশিক্ষা দানের কিরূপ ইচ্ছা ছিল—তাহা ফুটনোটে † উদ্ধৃত ইংরাজী অংশটুকু হইতে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে। এই সমাচার-দর্পণ প্রায় ত্রিশবৎসর জীবিত ছিল।

১৮২১ খ্রীঃ অব্দে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়—"ব্রাহ্মণপত্রিকা" বলিয়া এক মাসিক প্রকাশ করেন। কিন্তু এই পত্রিকা বহুদিন স্থায়ী হয় নাই।

* হ্যালহেড সাহেব চলিত বাঙ্গলা খুব ভাল জানিতেন। তিনি স্বচ্ছলভাবে বাঙ্গালী সমাজে মিশিতেন। বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়া তিনি যখন কথাবার্ত্তা কহিতেন, তখন কাহারও সাধ্য ছিল না, যে তাঁহাকে ইংরাজ বলিয়া চিনিতে পারে। বাঙ্গালা গ্রামারের অক্ষর খোদাই, স্যার চার্লস উইলকিন্সের যত্নেই হইয়াছিল। এই উইলকিন্সই গীতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। উইলকিন্স সাহেবের উপদেশানুসারে পঞ্চানন কর্ম্মকার প্রথম বাঙ্গালা টাইপ তৈয়ারি করেন। পঞ্চানন একজন সুদক্ষ হরপ-মেকার ছিল। এই টাইপে প্রতাপাদিত্য চরিত প্রথম মুদ্রিত হয়। (১৮০১)

† ১৮১৬ খৃঃ অব্দে তদানীন্তন ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—"It is human—it is generous to protect the feeble, it is meritorious to redress the injured, but it is godlike bounty to bestow expansion of intellect to infuse the Promethean spark into the statue and waken it into a man." ইহার সারমর্ম্ম এই—যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের রক্ষা করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, যাহারা ক্ষতিগ্রস্থ তাহাদের ক্ষতিপূরণ করা প্রশংসার্হ, কিন্তু জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধির চেষ্টা ঐশ্বরিক দানের মত গৌরবজনক।

Good Old days of Hon'ble John Company. Vol I.

১৮২৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম পঞ্জিকা প্রচারিত হয়। প্রচার স্থান অগ্রদ্বীপ। এই স্থানে বাঙ্গালীদিগের পরিচালিত একটী ছাপাখানা প্রথম স্থাপিত হওয়ায়, পঞ্জিকা এই ছাপাখানা হইতেই বাহির হইয়াছিল।

এই সময়ে (১৮২১ খৃঃ অব্দ) চন্দ্রিকা ও কৌমুদী নামে দুইখানি প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্র বাহির হয়। চন্দ্রিকা হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র ছিল। ইহার ক্রিয়াশক্তি লোপ করিবার জন্য, রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ খৃঃ অব্দে কৌমুদী বাহির করেন।

১৮২৯ খৃঃ অব্দে "বঙ্গদূতের" জন্ম হয়। মিঃ আর, মার্টিন, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির সমবেত চেষ্টায় এই কাগজখানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

১৭৯২ খৃঃ অব্দে মহাকবি কালিদাসের "ঋতুসংহারের" ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মূল্য—প্রতি খণ্ড দশ টাকা।

১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে "সামসুল-অক্‌বার" নামে একখানি পারসী পত্রিকার প্রচার হয়। বলা বাহুল্য এ কাগজখানি তৎকালীন মুসলমান-সমাজের নিকট কোনরূপ উৎসাহ না পাওয়ায় ইহার অকালমৃত্যু হইয়াছিল।

১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে পণ্ডিতপ্রবর এচ, এচ, উইলসন সাহেব—কালিদাসের "মেঘদূতের" ইংরাজী অনুবাদ Cloud Messenger প্রকাশ করেন। সমগ্র পুস্তকের মূল্য ১৬ সিক্কা টাকা।

১৮২১ খ্রীঃ অব্দের ৩১ এ মে গবর্ণমেণ্ট-গেজেটে প্রকাশিত একটী বিজ্ঞাপন হইতে "মধুসূদন মুখার্জ্জির ওরিএণ্টাল লাইব্রেরী" বলিয়া একটী পুস্তকালয়ের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সেকালের কলিকাতায় উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই প্রথম ইংরাজী পুস্তক-বিক্রেতা। তাঁহার দোকান বর্ত্তমান লালদীঘির নিকট, সেণ্ট এন্‌ড্রু গির্জ্জার কাছে ছিল।

লটারি কমিটী।

সেকালের কলিকাতার উন্নতির জন্য, যে সমস্ত বড় বড় ঘর বাড়ী তৈয়ারি হইয়াছিল—সবই লটারি-কমিটির সহায়তায় নির্ম্মিত। এই লটারি-কমিটির সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রথম প্রথম যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। প্রাচীন-কলিকাতার উন্নতির ইতিহাসের সহিত এই লটারি-কমিটির নাম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।* আমরা বর্ত্তমানে এই লটারি-কমিটির সম্বন্ধে দুই চারি কথা

* Strange that for almost every laudable Charitable scientific or educational project lotteries were considered the Sine Qua Non in those days. The Good Old days of Hon'ble John Company Vol II.

বলিব। বিলাতেও এই সময়ে একটা লটারির বাতিক জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই ব্যাধি ক্রমশঃ এদেশে সংক্রামিত হইয়া পড়ে।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলের শেষভাগে, এই লটারি-কমিটির ক্রিয়াশক্তি অতি প্রবল হইয়া উঠে। ধরিতে গেলে ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দ হইতেই, কলিকাতায় ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়।

১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার "এক্সচেঞ্জ" গৃহ প্রথম স্থাপিত হয়। এই গৃহ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে, সমস্ত খরচা লটারি দ্বারা উঠিয়াছিল। এই লটারির টিকিট ছোট বড় সকলেই কিনিতেন। এমন কি পাদরী সাহেবেরা পর্য্যন্ত বাদ যাইতেন না।

১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার একটী সাধারণ, সমিতিগৃহ—নির্ম্মাণের জন্য লটারি করা হয়। ইহাই ভবিষ্যৎ টাউন-হলের পূর্ব্ব সূচনা। এই লটারিতে পাঁচ হাজার টিকিট বিক্রয় হয়। টিকিটের মূল্য ৬০ সিক্কা টাকা। ইহার মধ্যে ১৩৩১টী প্রাইজ ছিল—বাকী সব ব্ল্যাঙ্ক।

নামজাদা চিত্রকরগণের নানাবিধ, বহুমূল্য অয়েল-পেণ্টিং, কাঁচের জিনিস, উৎকৃষ্ট মদিরা, সৌখীন দ্রব্য ও পুস্তকাদি এই সময়ে বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া এদেশে আসিত। লটারিতে এই সমস্ত জিনিস, টিকিট করিয়া বিক্রয় হইত। এক একজন লোভের বশে একাধিক টিকিট ক্রয় করিতেন। যাঁহাদের ভাগ্যে কোন জিনিস উঠিত, তাঁহারা টিকিটের দামের অপেক্ষা মূল্যবান জিনিস পাইতেন। এইজন্য এই সমস্ত লটারির গ্রাহক সংখ্যা খুব বেশী ছিল। সময়ে সময়ে লাখ্ টাকারও টিকিট বিক্রয় হইয়া যাইত।

বর্ত্তমান টাউনহল নির্ম্মাণের জন্য ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে এক লটারি হয়। এই লটারির বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—"Under the sanction and patronage of His Excellency the Most Hon'ble the Governor General in Council". অর্থাৎ সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে এই লটারি খোলা হইতেছে।" এই লটারির টিকিটের মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা। ইহাতে এক হাজার প্রাইজ ও চারি হাজার Blank বা শূন্য ছিল। কিন্তু টাউনহল নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থ, প্রথমবারে সংগৃহীত না হওয়ায়, কর্ম্মকর্ত্তারা, যতদিন পর্য্যন্ত না পুরাদস্তুর টাকা জোগাড় হয়, তজ্জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া উপরিউপরি কয়েকটী লটারি করিয়াছিলেন। চতুর্থ বারের "টাউনহল" লটারিতে, ছয়লক্ষ যাট হাজার টাকার প্রাইজ

বতরিত হয়। ইহার মধ্যে পনর হাজার টাকা লটারির খরচ বাবদ বাদ যায়। উদ্বৃত্ত পঁচাত্তর হাজার টাকা টাউনহল নির্ম্মাণের জন্য প্রদত্ত হয়। পাঠক মনে রাখিবেন, তখন পব্লিক-ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট বলিয়া কোন কিছু ছিল না।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা সহরের উন্নতির জন্য, আর একটী লটারি হয়। ইহাতেও লাট সাহেবের সহানুভূতি ও সম্মতি ছিল। এই লটারির সর্ব্বাপেক্ষা দামী প্রাইজ বা পুরস্কার একলক্ষ টাকা। সর্ব্ব-সমেত তিন লক্ষ টাকা প্রাইজ দেওয়া হয়। লটারির খরচ-খরচা বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তাহার দ্বারা কলিকাতার রাস্তাঘাট সংস্কার, ড্রেণের উন্নতি, সাধারণ ভ্রমণ-স্থান বা স্কোয়ার প্রভৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও কয়েকখানি বড় বড় বাড়ী নির্ম্মিত হয়।

অনেক ইংরাজ-ব্যবসায়ী এবং কলিকাতার ও উপনগরের অধিবাসিগণ তাহাদের দ্রব্যজাত এবং বাড়ী ও বাঙ্গালো এই লটারির সহায়তায় নীলাম করিতেন। টেরিটীবাজারের প্রতিষ্ঠাও, এইরূপ লটারির দ্বারা হইয়াছিল। অনেক বহুমূল্য পুস্তকাদিও লটারি দ্বারা বিক্রয় হইত। তখন এক মোহরের কম—কোন পুস্তকেরই মূল্য ছিল না। পাঠক ইতিপূর্ব্বে তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

এই সময়ে প্রসিদ্ধ গাড়ীওয়ালা ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীরও একটী লটারির বিজ্ঞাপন দেখা যায়। উক্ত কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিতেছেন—"বিলাত হইতে আমরা একখানি অতিসুন্দর কারুকার্য্য খোদিত বহুমূল্য কোচগাড়ি আমদানী করিয়াছি। ইহা চারি ঘোড়ায় টানিবার উপযুক্ত। গাড়ী ও ঘোড়ার সাজের দাম—ছয় হাজার টাকা। প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুইশত টাকা। যাঁহারা টিকিট লইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অনতিবিলম্বে, উক্ত ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীকে জানাইবেন।"

কিন্তু পরিশেষে গবর্ণমেণ্টের আদেশে * এই প্রকার লটারিপ্রথা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮০০ খ্রীঃ ২০এ মে লটারি প্রথার রদ সম্বন্ধে এক হুকুমনামা বাহির হয়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল-লটারি" বলিয়া আর একটী প্রথার অনুষ্ঠান হয়।

* "Notice is hereby given that the Right Honorable the Governor General in Council has been pleased to prohibit the establishment of any lotteries, the prizes in which are to be payable in money without the express permission of His Lordship in Council." G. O. D. of Hon. John Company. Vol II.

ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল—এদেশীয়দের জন্য একটী হাঁসপাতাল স্থাপন। কিন্তু টাকা অতি কম উঠায়, হাঁসপাতাল-কমিটী তাহা লইতে অস্বীকার করেন। এই টাকা পরিশেষে যোত্রহীন অক্ষম ঋণী—যাহারা দেনার দায়ে কারাগারে আবদ্ধ আছে, তাহাদের সাহায্যে ব্যয়িত হয়। একটী সভায় স্থির হয়—প্রত্যেক ইংরাজ দেনদার দশ টাকা, পর্টুগীজ সাত টাকা ও এদেশীয় দেনদারগণ দুই টাকা হিসাবে এই ফণ্ড হইতে সাহায্য পাইবে।

১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে এইরূপ লটারির দ্বারা একটী "চ্যারিটেবল-ফণ্ড" বা দাতব্য-ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। গবর্ণর-জেনারেল এই ভাণ্ডারের পেট্রন বা মুরুব্বি ছিলেন। বড়দিন, ও গুড্ ফ্রাইডে প্রভৃতি খ্রীষ্টান উৎসব দিনে, দরিদ্র খ্রীষ্টানদিগকে অর্থ বিতরণ করা এ ফণ্ডের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তীকালে ইহা "ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল-সোসাইটীতে" পরিবর্ত্তিত হয়। এ সোসাইটী এখনও বর্ত্তমান।

নদীপথে গমনাগমন।

তখন রেল ছিল না, এজন্য কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমে কোন স্থানে যাইতে হইলে হয় পাল্কীর ডাক, না হয় বোট-বজরার সহায়তা লইতে হইত। বোট ও বজরার ভাড়ার তালিকা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে, বাষ্পীয়-তরণীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেই সময়ে বিলাতে আর্ল ষ্ট্যানহোপ, এ সম্বন্ধে প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই।

১৮০১ খৃঃ অব্দের ১৮ই আগষ্ট, গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর বারাকপুরে এক মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করেন। এই সভায় স্থির হয়—"পিটার স্পিক সাহেব ফোর্ট-উইলিয়মের ডেপুটী গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।" এই সময়ে খোদ লাট-বাহাদুর একবার জলপথে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই যাত্রার বিবরণী হইতে জলপথে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বারাকপুর হইতে যাত্রা করিয়া তিনি প্রথমে চুঁচুড়ায় পৌছেন। ২৬এ তারিখে দায়ুদপুরে পৌছিলে, মুরশিদাবাদের নবাব তাঁহাকে সেইস্থানে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসেন। ৩১এ তারিখে, লাট-বাহাদুর বহরমপুরে পৌছান। ৩রা সেপ্টেম্বর, তিনি মুরশিদাবাদ নবাব-প্রাসাদের ঘাটে অবতরণ করেন। মুরশিদাবাদে নামিয়া নবাবের আতিথ্য-স্বীকার করিয়া ও বেগমদের সঙ্গে সাক্ষাতান্তে লাট-বাহাদুর রাজমহল যাত্রা করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজমহল ছাড়াইয়া যান। ১৬ই

তারিখে ভাগলপুর ও ২১এ তারিখে মুঙ্গের অতিক্রম করেন। ২৬এ তারিখে দানাপুরে পৌঁছেন। ১০ই নবেম্বরে গাজিপুর অতিক্রম করিয়া ১৫ই নবেম্বরে বেনারসে পৌঁছেন। ৩রা ডিসেম্বরে, মির্জ্জাপুর অতিক্রম করিয়া ১১ই তারিখে এলাহাবাদে উপস্থিত হন। তারিখগুলি দিবার কারণ এই, লাট-বাহাদুর কয়দিনে এক একটী নগর অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে লাট বাহাদুর অনেকস্থানে পদস্থ রাজা, মহারাজা বা সিবিল ও মিলিটারি কর্ম্মচারীদের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ধরিতে গেলে, আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত কমবেশ পাঁচ মাসকাল লাট সাহেবকে জলপথে যাত্রা করিয়া এলাহাবাদ পৌঁছিতে হইয়াছিল।

১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে খিদিরপুরের ডকের মধ্যে "জন শোর" বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার ভাগিরথীতে ভাসান হয়। নদীপথে গমনাগমনই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়।

১৮১৯ খৃঃ অব্দে লক্ষ্ণৌএর নবাবের ব্যবহার জন্য, ট্রিকেট বলিয়া একজন ইঞ্জিনিয়ার, একখানি ক্ষুদ্র "ষ্টীম-লঞ্চ" নির্ম্মাণ করেন। এখানি ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দেও বর্ত্তমান ছিল। উক্ত বৎসর লাট-সাহেব লর্ড অক্ল্যাণ্ড লক্ষ্ণৌ ভ্রমণে যান। নবাব তাঁহার ব্যবহারের জন্য এই ষ্টীম-লঞ্চখানি দিয়াছিলেন।

হুগলী নদীতে ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে প্রথম কলের ষ্টীমার চলাচল আরম্ভ হয়। সমসাময়িক কলিকাতা গেজেটে (১৪-৮-১৮২৩) এতৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রকাশ হইয়াছিল। "বর্ত্তমানে এই ষ্টীমারখানি হুগলী নদীতেই ফেরির কাজ করিতেছে। এদেশীয় লোকেরা, কলের সহায়তায় জলের উপর জাহাজ চলিতেছে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে, নদীর উভয় উপকূলে সমবেত হইয়া, নিত্যই মহাজনতা উপস্থিত করে। আমরা শুনিয়াছি—গত্য কল্য রবিবার এই ষ্টীমারখানি কতকগুলি যাত্রী লইয়া চুঁচুড়া পর্য্যন্ত গিয়াছিল।" এই ষ্টীমারের নাম "ডায়েনা"।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে নদীর মধ্যে বড় জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য "পাইলট-ভেসেল" সম্বন্ধে এক রিপোর্ট সরকারে দাখিল হয়। এই সময়ে দুই একখানি জাহাজটানা-ষ্টীমারও তৈয়ারি হইয়াছিল। "গ্যাঞ্জেস" নামক একখানি ষ্টীমার, সমুদ্রপথে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাত্রা করিয়াছিল। প্রথম বর্ম্মাযুদ্ধ সময়ে এই ষ্টীমারখানি, যুদ্ধের সরঞ্জাম বহিবার কার্য্যে নিয়োজিত হয়।

"টেনিকা" বলিয়া আর একখানি জাহাজ, কোন উদ্যমশীল ইংরাজ, ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় আনেন। এই ষ্টীমারখানি জাহাজ টানিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট ৬১ হাজার টাকায় ইহা কিনিয়া লয়েন।

১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে পূর্ব্বোক্ত "ডায়েনা" জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এণ্ডারসন "কমেট ও ফায়ার-ফ্লাই" বলিয়া দুইখানি ফেরী-ষ্টীমার, কলিকাতায় নির্ম্মাণ করেন। এই ষ্টীমার চুঁচুড়া অবধি যাতায়াত করিত। প্রত্যেক লোকের যাতায়াতের ভাড়া ছিল—আট টাকা।

হাবড়ার ডকে, ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে আর একখানি "টগ" বা জাহাজ-টানা ষ্টীমার তৈয়ারি হয়। এই ষ্টীমারের নাম "ফরবস্"। ইহার অধিকারী ছিলেন—ম্যাকিণ্টস্ এণ্ড কোং। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে ফরবস্ ষ্টীমার, জামিসানা নামক একখানি আফিম বোঝাই পাইলের জাহাজকে চীন পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

বর্ম্মাযুদ্ধে ডায়েনা ষ্টীমারের দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল দেখিয়া, গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর—বিলাতের কর্ত্তাদের লিখিয়া পাঠান "দুইখানি ষ্টীমার, কামান দ্বারা সজ্জিত করিয়া যুদ্ধের জন্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে—যথেষ্ট ফল-লাভ সম্ভাবনা।" বিলাতের কর্ত্তারা ইহাতে সম্মতি দান করিয়া ডেপ্ট-ফোর্ড হইতে বড় ষ্টীমারের উপযোগী দুইখানি এঞ্জিন, কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ কিড্ কোম্পানী এই দুইখানি এঞ্জিন সহায়তায়, বিলাতি প্ল্যানে—দুইখানি ক্ষুদ্র যুদ্ধজাহাজ তৈয়ারি করেন। ইহাদের প্রত্যেক খানিতেই দশটী করিয়া কামান রাখিবার স্থান ছিল। ষ্টীমার দুইখানির নাম হইয়াছিল—"গাঞ্জেস্" ও "ইরাবতী"। কিড্ কোম্পানী, এই দুইখানি জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য, জাহাজপ্রতি এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট লইয়াছিলেন।

১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে আর একখানি ষ্টীমার গঙ্গাবক্ষে ভাসান হয়। এই ষ্টীমার মালদহ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। গঙ্গার স্রোত অতি প্রবল হওয়ায়, ইহা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

১৮২৪ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে "হুগলী" বলিয়া একখানি ষ্টীমার কাশী পর্য্যন্ত যায়। কাশী যাইতে ২৪ দিন সময় লাগে। কিন্তু ফিরিতে ২৪ দিনের বেশী সময় লাগে নাই। জাহাজখানি মোটে দুইদিন মাত্র বেনারসে অপেক্ষা করিয়াছিল। বেনারস হইতে কলিকাতা

জলপথে ১৬১৩ মাইল। এই পথ অতিক্রম করিতে ষ্টীমারখানির তিনশত ঘণ্টা লাগিয়াছিল। ধরিতে গেলে গড়পড়তায়, ষ্টীমারখানি প্রতি ঘণ্টায় ৪॥ সাড়ে চারি মাইল গিয়াছিল। তাহার পর আর একবার এই ষ্টীমারখানি এলাহাবাদ অবধি অগ্রসর হয়। কিন্তু বালির চড়ায় বসিয়া যাওয়ায়, বড়ই বিপত্তি ঘটে।

১৮২৯ খৃঃ অব্দের এপ্রিল কিম্বা মে মাসে, দ্বিতীয়বার এই ষ্টীমার পুনরায় কাশী যাত্রা করে। এবারে ২১ দিনে কাশী পৌছাইয়াছিল। ইহা মির্জ্জাপুর পৌছিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু নদীর জল কম হওয়ায় পারে নাই।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সাহেব, এই সময়ে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল। যাহাতে ষ্টীমার সহায়তায় জলপথে যাত্রার পথ সুগম হয়, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন। তাঁহার চেষ্টায়, কলিকাতায় প্রথম লৌহ নির্ম্মিত ষ্টীমার নির্ম্মিত হয়। এই জাহাজের নাম "লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক।"

খিদিরপুর গবর্ণমেণ্ট ডকইয়ার্ড হইতে নিম্নলিখিত জাহাজগুলি প্রস্তুত হয়। (১) হরিণঘাটা (১৮৪১), (২) ব্রহ্মপুত্র (১৮৪১), (৩) ইণ্ডস্ (১৮৪২), (৪) দামোদর (১৮৪৩), (৫) মহানদী (১৮৪৬), (৬) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক (১৮৪৫), (৭) নর্ম্মদা (১৮৪৫)।

উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই মহানগরী কলিকাতা, এক সময়ে সমগ্র ভারতের রাজধানী কলিকাতা, বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের অন্যতম রাজধানী কলিকাতা, জব চার্ণকের আমল হইতে (১৬৯৮ খৃঃ) আর এই ১৯১৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ২২৬ বৎসরের ঘটনা স্রোতের মধ্য দিয়া, অতি ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে। সমুদ্রমেখলা বোম্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া দিলে, কলিকাতার মত সুবৃহৎ নগরী ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। দুইশত বৎসর পূর্ব্বের বন জঙ্গল পরিপূর্ণ, বাদাভূমি-সমাকীর্ণ, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণের নিবাসভূমি, সুতালুটী, কলিকাতা, ও গোবিন্দপুরের পরিবর্ত্তে, আজ আমরা এক প্রাসাদসৌধময়ী, স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যপূর্ণ সুবৃহৎ নগরী দেখিতে পাইতেছি। কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের পক্ষে, সমাধিগর্ভ হইতে উঠিয়া আসা যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে তিনিও ঠিক বুঝিতে পারিতেন না—মাত্র একখানি পাকা বাড়ী অর্থাৎ সাবর্ণ-মজুমদারদের

কাছারী বাড়ী লইয়া তিনি যে কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা যুগ যুগান্তরের ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া, বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যময় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

—০:)*(:০—
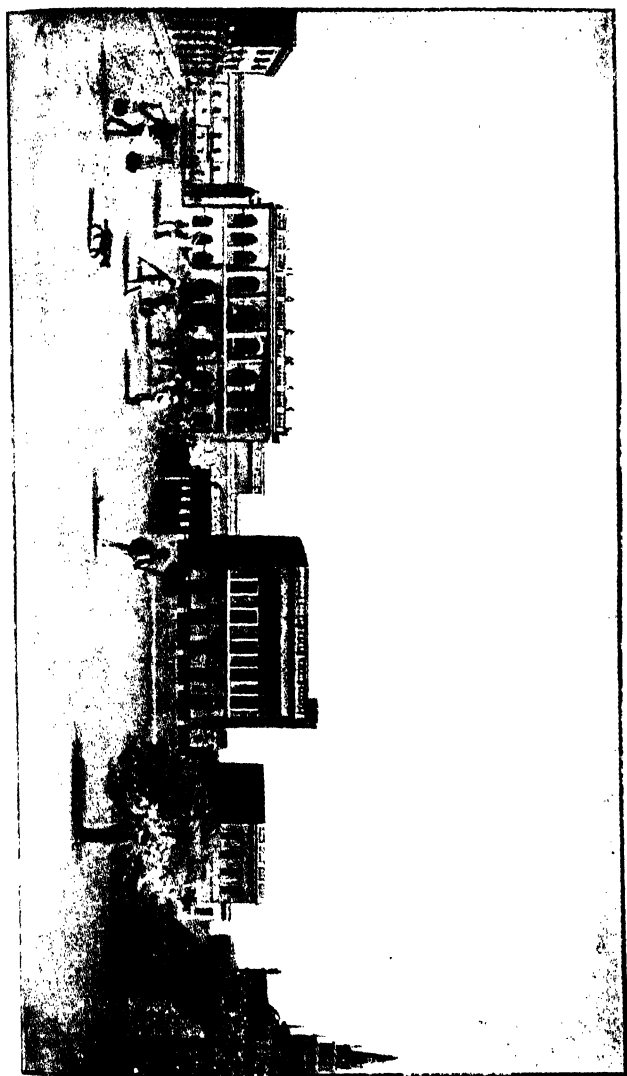
পথের কথা।

চৌরঙ্গী রোড—থিয়েটার রোড—হ্যারিংটন ষ্ট্রীট—মিডলটন ষ্ট্রীট—রসেল ষ্ট্রীট—পার্ক ষ্টীট—ক্যামাক্ ষ্ট্রীট—উড্ ষ্ট্রীট—ফ্রিস্কুল ষ্ট্রীট—মটস্ লেন—রয়েড্ ষ্ট্রীট—ইলিয়াট রোড—রিপন ষ্ট্রীট—কিড্ ষ্ট্রীট—সদর ষ্ট্রীট—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট—বেণ্টিঙ্কষ্ট্রীট—ওয়েষ্টন লেন—এস্প্লানেড্ রো—ডেকার্স লেন—ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট—লারকিন্স লেন—ফান্সি লেন—কাউন্সিল-হাউস ষ্ট্রীট—হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট—ষ্ট্রাণ্ড রোড—চর্চ্চ লেন—হেয়ার ষ্ট্রীট—কয়লাঘাট ষ্ট্রীট—লালবাজার ষ্ট্রীট—ক্লাইভ ষ্ট্রীট—ফেয়ার্লিপ্লেস—ক্যানিং ষ্ট্রীট—রাজা উদমন্ত ষ্ট্রীট—হ্যারিসন রোড—টিরেটাবাজার ষ্ট্রীট—হরিণবাড়ী লেন—সার্কিউলার রোড—বোণ্টস্ লেন—কটন ষ্ট্রীট—ফিয়ার্স লেন—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—এণ্টনিবাগান লেন—চিৎপুর রোড—বৌবাজার ষ্ট্রীট—বৈঠকখানা—শোভাবাজার রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট—রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট—বাগবাজার ষ্ট্রীট—শ্যামবাজার ষ্ট্রীট—নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট—অভয়চরণ মিত্রের ষ্ট্রীট—কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট—সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট—বৃন্দাবন মল্লিকের লেন—রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট—রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট—মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট—ভীমঘোষের লেন—বিশ্বনাথ মতিলালের লেন—বৈষ্ণবচরণ শেঠের ষ্ট্রীট—বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট—দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট—দুর্গাচরণ পিতুড়ির লেন—ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন—দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট—দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন—গোকুল মিত্রের গলি—বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট—হরিঘোষের ষ্ট্রীট—হুজুরীমল্স ট্যাঙ্ক লেন—কাশী ঘোষের লেন—খেলাত ঘোষের গলি—কেশবচন্দ্র সেনের গলি—কৃষ্ণদাস পালের লেন—মথুর সেনের গার্ডেন লেন—নীলমণি হালদারের লেন—নীলমণি মিত্রের লেন—নরেন্দ্রনাথ সেনের গলি—নন্দলাল মল্লিকের লেন—উমেশচন্দ্র দত্তের লেন (রামবাগান)—অনাথ দেবের লেন—অনাথ বাবুর বাজার লেন—বলরাম দের ষ্ট্রীট—দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট—মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর গলি—মতিলাল শীলের ষ্ট্রীট—পিয়ারীচরণ সরকারের ষ্ট্রীট—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট—প্রতাপ ঘোষের লেন—রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ লেন—রাজা কালীকৃষ্ণ লেন—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ লেন—রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ লেন—রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ লেন—রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট—রমাপ্রসাদ রায়ের ষ্ট্রীট—রামমোহন মল্লিকের ষ্ট্রীট—মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণের লেন—রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের লেন—সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট—শোভারাম বসাকের লেন—শঙ্কর ঘোষের লেন—অক্রুর দত্তের লেন, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট—বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট—হিদেরাম ব্যানার্জ্জি লেন—কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট ও কলিকাতার অন্যান্য গলি ও পথ সমূহের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয়।

পথের কথা।

এইবার আমরা বর্ত্তমান কলিকাতার রাজপথগুলির ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বলিয়া যাইব। এই সমস্ত রাজ-পথের সহিত অতীত যুগের অনেক খ্যাতাপন্ন, উচ্চপদস্থ, ইংরাজ বাঙ্গালীর নামেরও স্মৃতি বিজড়িত।

চৌরঙ্গী রোড।

এখন যে চৌরঙ্গী—সাহেবী-কোয়াটার, কলিকাতা নগরীর মুকুটমণি, আগে তাহা বনজঙ্গল সমাচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। এই গ্রাম ও তাহার আশেপাশের স্থান গুলি গভীর জঙ্গলপূর্ণ ছিল। দিনের বেলায় লোকে সাহস করিয়া গোবিন্দপুর বা সুতালুটী যাইতে পারিত বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়ে, বা গভীর রাত্রে ডাকাতের ভয়ে কেহই চৌরঙ্গীর এ জঙ্গল পার হইত না।

জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী নামক এক সন্ন্যাসী এই জঙ্গলে বাস করিতেন। তাহার নাম হইতেই এই ক্ষুদ্র গ্রামের নাম চৌরঙ্গী হইয়াছিল। জঙ্গল গিরি সম্বন্ধে আমরা ইতি পূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছি।

চৌরঙ্গী একটী গ্রামের বা স্থানের নাম। এই গ্রামের নাম হইতেই রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। ১৭১৪ খৃঃ অব্দেও চৌরঙ্গীর নাম শোনা যায়। হলওয়েল সাহেবও চৌরঙ্গীর রাস্তাকে "কালীঘাটের রাস্তা "Road to Colligot" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আজ কাল যাহা বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও সেই বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট যেখানে ধর্ম্মতলায় মিশিয়াছে, তাহা ইংরাজদের কলিকাতার আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই একটী সরু রাস্তা ছিল। এই সরু রাস্তার দুই ধারে গভীর জঙ্গল। এই জঙ্গল মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়াই, যাত্রীগণ চিত্রেশ্বরীর মন্দির হইতে কালীঘাটে যাইত। পুরাতন ম্যাপ সমূহে চৌরঙ্গী একটী স্থানের নাম বলিয়াই উল্লিখিত। পরে এই চৌরঙ্গী নাম, রাস্তাকে দান করা হইয়াছে।

১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে উড্ সাহেব কলিকাতার এক নক্সা তৈয়ারি করেন। উডের এই ম্যাপে, ধর্ম্মতলা হইতে পার্কষ্ট্রীট পর্য্যন্ত পথটী চৌরঙ্গী রোড বলিয়া চিহ্নিত ছিল। পার্কষ্ট্রীটের দক্ষিণের স্থানটীকে চৌরঙ্গী গ্রাম বলিত। কিন্তু ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে প্রস্তুত অপজনের ম্যাপে, চৌরঙ্গী ও তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব ভূভাগ "ডিহি বিরজী" বলিয়া উল্লিখিত।

এই সময়ে চৌরঙ্গীর সীমা ছিল—পূর্ব্বে সারকিউলার রোড, দক্ষিণে

পার্ক ষ্ট্রীট, উত্তরে কলিঙ্গা ও পশ্চিমে বর্ত্তমান রোডের কিয়দংশ। পাঠক একবার কল্পনাবলে চৌরঙ্গীর বর্ত্তমান প্রাসাদ-তুল্য, বিদ্যুতালোক উজ্জ্বলিত, বাড়ীগুলির চিত্র মন হইতে মুছিয়া ফেলুন। আর সেই কল্পনার সহায়তায় দেখুন—বর্ত্তমান চৌরঙ্গীর পার্শ্বস্থ মাঠটী, জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই জঙ্গল বাঘ, বন্যশূকর ও ডাকাতের বিহারভূমি।

১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে চৌরঙ্গীর জঙ্গল কাটান আরম্ভ হয়। উক্ত বৎসরেই বর্ত্তমান গড়ের মাঠের কেল্লার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। জনরব এই, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলেও বীর্জ্জিতলায় অবস্থিত বর্ত্তমান লাট-গির্জ্জার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই জঙ্গলে হরিণ শিকার করিতে যাইতেন, এরূপ একটা জনপ্রবাদও আছে।

থিয়েটার রোড।

চৌরঙ্গীর থিয়েটার-রোড পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। এই রাস্তার উপর, চৌরঙ্গী ও বর্ত্তমান থিয়েটার রোডের মিলনস্থলে একটী ইংরাজী থিয়েটার ১৮১৩—৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। ইহা হইতেই রাস্তাটীর নামও "থিয়েটার-রোড" হইয়াছে। থিয়েটার রোডের এই থিয়েটারের অভিনেতারা, সখের জন্য অভিনয় করিতেন—কিন্তু অভিনেত্রীরা বেতন গ্রহণ করিতেন ও থিয়েটার-গৃহেই থাকিতেন। আগুন লাগিয়া ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে এই থিয়েটার বাড়িটী পুড়িয়া ভস্মসাৎ হয়। তাহার পর আর এস্থানে নূতনভাবে থিয়েটার-গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। থিয়েটারাধিকৃত স্থানে, পরবর্ত্তীকালে একটী সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত জজ মার্কবী সাহেব, এই বাড়ীতে বাস করিতেন—বর্ত্তমানে ইহা একটী বোর্ডিং-হাউস হইয়াছে।

হ্যারিংটন ষ্ট্রীট।

থিয়েটার রোডের পরই হ্যারিংটন-ষ্ট্রীটের নাম উল্লেখযোগ্য। সেকালের সদর-দেওয়ানী আদালতের জজ হ্যারিংটন সাহেবের নামানুসারে, এই পথের নামকরণ হইয়াছে। ৪নং হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে, হাইকোর্টের বিখ্যাত চিফ্-জষ্টিস স্যর রিচার্ড গার্থ সাহেব বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। তিন নম্বরের বাড়ীতে, স্বনাম খ্যাত বিশপ হিবার সর্ব্বপ্রথমে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে এ বাটীতে তাঁহার সুবৃহৎ লাইব্রেরী ও পরিজনবর্গের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, তিনি রসেল ষ্ট্রীটে উঠিয়া যান।

মিডল্‌টন ষ্ট্রীট।

মিডল্‌টন ষ্ট্রীটের নামকরণ লইয়া একটু মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন মতে, বিশপ মিডলটনের নামানুসারে, এই রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। আবার অন্যমতে স্যামুয়েল মিডলটনের নাম হইতেই এই রাস্তার নামকরণ। এই স্যামুয়েল মিডলটন, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে, কোম্পানির সিভিল-সার্ভিস ভুক্ত ছিলেন। ইনি কয়েক মাস কাল কলিকাতার পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন—তৎপরে সুন্দরবন কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়া, অনেক ডাকাত দমন করেন। (১৭৯২ খ্রীঃ অব্দ) এই পথের আশে পাশে এই শেষোক্ত মিডলটন সাহেবের অনেক জমী জমা ছিল। এই মিডলটন ষ্ট্রীট সাহেবী-কোয়াটার হইলেও এখানে দ্বারবঙ্গের মহারাজের একটী প্রাসাদ আছে।

রসেল ষ্ট্রীট।

সেকালের সুপ্রীমকোর্টের চিফ্‌-জষ্টিস স্যর হের্নরি রসেলের নামে, এই পথ্যার নামকরণ হইয়াছে। রসেল সাহেব ১৮০৬ হইতে ১৮১৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুপ্রীমকোর্টের জজীয়তি করিয়াছিলেন। তিনিই এই পথি-পার্শ্বে, প্রথম বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই পথের ১২ নম্বরের বাড়ীতে স্বনাম-খ্যাত চিফ্‌জষ্টিস্ স্যর বার্ণিস পীকক বাস করিতেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি জজিয়তী করেন। ১৩নং বাটীতে স্বনাম প্রসিদ্ধ জন নর্ম্মাণ সাহেব বাস করিতেন। এই নর্ম্মাণ সাহেবকেই একজন মুসলমান, হাইকোর্টের মধ্যে হত্যা করে। (১৮৭১ খ্রীঃ অব্দ)

পার্ক ষ্ট্রীট।

সুপ্রীমকোর্টের প্রথম চিফ্‌-জষ্টিস, স্যর ইলাইজা ইম্পির সময় হইতে "পার্ক ষ্ট্রীট" এই নামের উদ্ভব সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ইম্পি এক সুবৃহৎ উদ্যানবাটীর মধ্যে বাস করিতেন। তাহার চতুঃপার্শ্ব ব্যাপিয়া একটী "পার্ক" ছিল। আজকাল যাহা "লরেটো-কন্‌ভেন্ট" বলিয়া পরিচিত, তাহাই স্যর ইলাইজা ইম্পির আবাসবাটী ছিল। এই স্থান, ইম্পির সময়েও জঙ্গল পূর্ণ ছিল। সেকালে অস্ত্রধারী সিপাহীরা, ডাকাত তাড়াইবার জন্য চিফ্‌-জষ্টিস ইম্পির বাটী পাহারা দিত। যে সকল চাকর বাকর তাঁহার বাড়ীতে কাজ করিত, তাহারা সন্ধ্যার পর, পার্ক ষ্ট্রীট হইতে কলিকাতায়

আসিতে হইলে দলবদ্ধ না হইয়া আসিত না। এই স্থানে গবর্ণর ভান্সিটার্টের বাগান-বাটী ছিল। (১৭৬০—৬৪ খৃঃ অব্দ) ইম্পির আমলে এই পার্ক, পূর্ব্ব পশ্চিমে বর্ত্তমান রসেল ষ্ট্রীট হইতে ক্যামাক্ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পার্ক ষ্ট্রীটের সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ বাটীটী (৬নং) সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জির আবাস ভবন ছিল। ইহার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ণর স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট (১৮৫৯—৬২ খ্রীঃ অব্দ) এই বাটীতে বাস করিতেন। বঙ্গের ছোটলাট-দিগের ব্যবহারের জন্য, গ্রাণ্ট সাহেব এই ৬নং এর বাড়ীটী গবর্ণমেণ্টকে ক্রয় করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অমত করেন। পরিশেষে বেলভেডিয়ার-ভবনেই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ছোট-লাটদের বাসভবন নির্দ্ধারিত হয়।

৫ নং পার্ক ষ্ট্রীটের বাটীতে, এসিয়াটিক সোসাইটী গৃহ বর্ত্তমান। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দের ১৮ই জানুয়ারি, এই সোসাইটীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তৎকালীন গবর্ণর জেনেরেল স্বনামখ্যাত ওয়ারেণ-হেষ্টিংস সাহেব, ইহার প্রধান মুরুব্বি বা পেট্রণ, এবং স্বনামখ্যাত স্যর উইলিয়াম জোন্স ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট। প্রাচীন ভারতের লুপ্ত প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনাদির উদ্ধারই, এই সোসাইটীর মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে, প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, জীবজন্তু-তত্ত্ব, ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প, প্রভৃতি নানা বিষয়ের গবেষণাময় আলোচনা এখানে হয়। দেশের বড় বড় লোক, নামজাদা পদস্থ ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই সভার সদস্য ও অলঙ্কার স্বরূপ। এই সোসাইটী ধরিতে গেলে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। লাট-সাহেবগণ, সাধারণতঃ এই সভার প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলারগণও কথন কথন সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। পুরাকালে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এই বিদ্বৎ-সমিতির অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে, জষ্টিস স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় হর-প্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুপণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মনীষিগণ এই সভার সদস্য। ইহাঁদের দ্বারা অনেক নূতন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়িণী তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাকালে স্যর উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক, উইলকিন্স, ডেভিস, এচ, এচ, উইলসন, জেমস্ প্রিন্সেপস্, হজসন, মিল,

ওয়ালিস, ম্যাকলেলাণ্ড, বেভারিজ প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই সমিতির নামজাদা সদস্য ছিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে এই এসিয়াটিক সোসাইটীর নিজের গৃহ ছিল না। তদানীন্তন সুপ্রীমকোর্টের "গ্রাণ্ড-জুরী" গৃহের মধ্যে, ইহার অধিবেশন হইত। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে এই সোসাইটীর জন্য স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণের কল্পনা হয়—কিন্তু ১৮০৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। জ্যাকো পিচার নামক এক ফরাসী-স্থপতি এই বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন। বাড়িটী তৈয়ারি করিতে ত্রিশহাজার টাকা খরচ হইয়াছিল।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে নানা ভাষার পুস্তক শ্রেণী অসংখ্য। ১৯০৬ খৃঃ অব্দের একটী তালিকা হইতে প্রমাণ—

ইংরাজী পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি		"	১৯৮৪২ ভলম্
আরেবিক	"	"	১১৬১ "
পারসী	"	"	১৫০৬ "
উর্দ্দু	"	"	৩০০ "
সংস্কৃত	"	"	৩৩৭৮ "
সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ও হস্তাক্ষর লিখিত পুঁথি			২৫০৭ "
তিব্বতীয়	"	"	২৫৬ "
চাইনিজ	"	"	৩৫০ "
বর্ম্মিজ ও সায়ামিজ লিপি		"	১২৫ "
		মোট	২৯৪২৫

ইহাই হইতেছে আট দশ বৎসরের পূর্ব্বের তালিকা। বর্ত্তমানে এই সংখ্যার উপর আরও নূতন পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীরঙ্গপট্টন প্রাইজ-কমিটি এই সমিতিতে অনেক বহুমূল্য পুস্তক দান করেন। (১৮০৮ খৃঃ অব্দ ফেব্রুয়ারি) টিপু-সুলতানের ধ্বংসসাধনের পর, তাঁহার বহুমূল্য পাঠাগারটী বিজয়ী ইংরাজেরা দখল করিয়া লয়েন। টিপুর এই লাইব্রেরীতে, অনেক বহুমূল্য ও প্রাচীন পুস্তকাদি ছিল। সুন্দর সুচিত্রিত, দুই তিনশত বৎসরের লিখিত কোরাণ প্রভৃতি এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইত। অতি পুরাকালে, গুলেস্তাঁর যে প্রথম নকল হয়, সে পুস্তকখানিও টিপুর পাঠাগারে ছিল। দুই একখানি কোরাণে এবং তৎসাময়িক পুস্তকে, (যাহা মোগল-বাদসাহদের সম্পত্তি ছিল) আকবর প্রভৃতি বাদসাহগণের স্বহস্ত-লিখিত স্বাক্ষর আজও বর্ত্তমান। "পাদসা-নামা" বা সাজাহান বাদসাহের

রাজত্বের ইতিহাস নামধেয় সুবৃহৎ সুচিত্রিত পুস্তক, সাজাহানের রাজত্বকালে তাঁহারই আদেশে লিখিত হয়। ইহাতে সাজাহান বাদসাহের স্বাক্ষর আছে। এই প্রাচীন বাদসাহী-গ্রন্থগুলি, এখন এসিয়াটীক-সোসাইটীর সম্পত্তি। সোসাইটী, ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল হলের জন্য, গবর্ণমেণ্টকে এগুলি প্রদান করিয়াছেন। পাঠক ইচ্ছা করিলে, বেলভেডিয়ার রাজ-প্রাসাদে গিয়া এগুলি দেখিয়া আসিতে পারেন। ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে অনেক প্রাচীন সংস্কৃত, আরবী ও পারসী পুস্তকের হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ছিল। উক্ত কলেজ উঠিয়া গেলে, গবর্ণমেণ্ট সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি, এসিয়াটিক সোসাইটীকে প্রদান করেন। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগার একটী দর্শনীয় পদার্থ। ইহা অতীত যুগ হইতে, বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত, মহাপণ্ডিতগণের গবেষণা মন্দির এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও স্যর উইলিয়ম জোন্সের জীবন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ।

পার্ক ষ্ট্রীটের পার্শ্ববর্ত্তী, বর্ত্তমান সেণ্টজেভিয়ার কলেজের সহিত প্রাচীন কালের একটু সম্বন্ধ আছে। আগে এই বাড়ীতে "Sans Souci" থিয়েটার ছিল। সেণ্টজেভিয়ার কলেজের প্রবেশ পথে যে বড় বড় সিঁড়িগুলি আজও বর্ত্তমান, তাহা উক্ত "সাঁ-সুসী" থিয়েটারের সিঁড়ি। এই থিয়েটারের সহিত অতীত কালের একটী শোচনীয় ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত। মিসেস্ এস্থার লিচ্ নামক এক যুবতী ইংরাজ-মহিলা, এই থিয়েটারের একজন নামজাদা অভিনেত্রী ছিলেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে থিয়েটার রোডের পূর্ব্বকথিত থিয়েটারটী অগ্নিদগ্ধ হইয়া ধ্বংস হইলে, পার্ক ষ্ট্রীটে এই "সাঁ-সুসী" থিয়েটারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। ইংলিশম্যান পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ষ্টকেলার সাহেব, এই মিসেস্ লিচকে পুরোবর্ত্তী করিয়া একটী থিয়েটার খুলিবার চেষ্টা করেন। তজ্জন্য অনেক টাকা চাঁদাও সংগৃহীত হয়। ভারতবর্ষের তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল, লর্ড অক্ল্যাণ্ড, এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য, এক হাজার টাকা চাঁদা দেন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে এই থিয়েটার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দ হইতে অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রথম অভিনয় রাত্রে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। মিস্ লিচ্, এক অভিনয় রাত্রে তাঁহার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য, "উইংসের" নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন। তখন কলিকাতায় কেরোসিন ল্যাম্প বা গ্যাসের প্রচলন হয় নাই, থিয়েটারের ষ্টেজের ভিতর, তেলের আলো জ্বলিত। এই

আলোতে মিস্‌ লিচের পোষাক ধরিয়া যায়। ব্যাকুলভাবে প্রাণভয়ে তিনি ষ্টেজের মধ্যে আসিয়া সাহায্যের জন্য চীৎকার করেন। দর্শকমণ্ডলী ষ্টেজে আগুন লাগিয়াছে ভাবিয়া, বিচলিত হইয়া উঠেন। মিস্‌ লিচ্‌কে সাহায্য করা দূরে থাক, তাঁহারা নিজের ভাবনাতেই বিভোর হইয়া পলায়নে উদ্যত। ষ্টেজের একজন লোক এই অৰ্দ্ধদগ্ধ অভিনেত্রীর সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসে। কিন্তু জ্বলন্ত আগুন নিভাইবার পুর্ব্বেই, মিস্‌ লিচের শরীরের নানাস্থান ভয়ানকরূপে পুড়িয়া যায়। ইহার দুই দিন পরে এই প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। যে বাটীতে এখন রোমান্‌-ক্যাথলিক আর্চ্চবিশপ বাস করিতেছেন, সেই বাড়ীতেই মিস্‌ লিচের মৃত্যু হয়। "সাঁ-সুশী" থিয়েটারটী পরিশেষে এক ফ্রেঞ্চ-কোম্পানী ভাড়া লয়েন। তাহার পর এই বিখ্যাত থিয়েটারের জীবলীলার পরিসমাপ্তি হয়।

ক্যামাক্‌ ষ্ট্রীট।

পার্ক ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ করিয়া, এই পথটী লোয়ার সার্কিউলার রোড অবধি গিয়াছে। ক্যামাক্‌ সাহেব, লর্ড ওয়েলেস্‌লি ও কর্ণওয়ালিসের আমলে, একজন সিনিয়ার-মার্চ্চেন্ট ছিলেন। এই রাস্তার আশে পাশে অনেকটা স্থান তাঁহার সম্পত্তিভুক্ত ছিল। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা গেজেটে, এই সব সম্পত্তি বিক্রয়ের একটী বিজ্ঞাপন দেখা যায়। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের ডাইরেক্টরীতে দেখা যায়, এই ক্যামাক্‌ সাহেব ঢাকা ও ত্রিপুরার জেলার জজ হইয়াছিলেন। ইঁহার এক সহোদর, লর্ড ওয়েলেসলির এডিকং ছিলেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে, এই স্থানের চারিদিকে অনেক বস্তি ছিল—এখন সেই সব বস্তির ধ্বংসসাধন করিয়া প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। আগে এই পথটীর নাম ছিল—"ডন্‌কান্‌-বস্তিকা-রাস্তা"। তৎপরে উক্ত ক্যামাক্‌ সাহেবের, নামানুসারে ইহা "ক্যামাক্‌-ষ্ট্রীট" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

উড-ষ্ট্রীট।

উড্‌ সাহেবের নাম হইতে এই রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। এই উড্‌ সাহেব কোম্পানীর আমলে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এই উড্‌-ষ্ট্রীটের একটী বাটীতে "হিন্দু-ষ্টুয়ার্টের" আবাস স্থান ছিল। তাঁহার আদত নাম কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট। তিনি হিন্দু ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে "হিন্দু-ষ্টুয়ার্ট" বলিত। খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে

তিনি কোন পার্থক্য দেখিতেন না। জনশ্রুতি এই, তিনি নিত্য গঙ্গা স্নান করিতেন। অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি তিনি নিজ বাটীতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সাউথ পার্ক ষ্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে আজও তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ বর্ত্তমান। এ সমাধিস্তম্ভটী একটী প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ইহার গাত্রে "ভগীরথ" "পৃথ্বিদেবী" প্রভৃতির খোদিত আকৃতি ও অনেক সাধুসন্ন্যাসীর মূর্ত্তি আছে।

ফ্রিস্কুল ষ্ট্রীট।

ইহা আগে (১৭৮০ খ্রীঃ অব্দ) বাঁশের জঙ্গল ছিল। রাত্রে লোকে এ ভীষণ জঙ্গল পার হইতে ভয় পাইত। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে, এখানে সাহেবদের জন্য একটী ফ্রিস্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুল হইতেই এ পথের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। যেখানে এখন এই স্কুল গৃহটী বর্ত্তমান—বহুকাল পূর্ব্বে সেইস্থানে আর একটী বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতে সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম জজ, লিমেষ্টার সাহেব থাকিতেন। এই লিমেষ্টার, নন্দকুমারের মোকদ্দমার অন্যতম বিচারক। ইনিই নন্দকুমারকে জেলে পুরিবার আদেশ প্রদান করেন। এই রাস্তার ৩২ নং বাড়ীতে, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার উইলিয়াম থ্যাকারের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা রিচমণ্ড থ্যাকারে কোম্পানীর আমলে বোর্ড-অব-রেভেনিউর সেক্রেটারি ও চব্বিশ পরগণার কালেক্টার ছিলেন। আলিপুরে তিনি যে বাড়ীতে বাস করিতেন--সেই বাড়ীতেই হেষ্টিংসের কৌন্সিলের মেম্বর, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস্ বাস করিতেন বলিয়া একটী জনপ্রবাদ আছে। আলিপুর জেলের প্রবেশের পথটী এখনও "থ্যাকারে-রোড" বলিয়া পরিচিত।

মটস্ লেন।

মটস লেন—মিঃ মটের নামানুসারে চিহ্নিত হইয়াছিল। হেষ্টিংসের বিলাতি চিঠিপত্রে, এই মট সাহেবের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। মট-সাহেব প্রথমে প্রাচীন কলিকাতার একজন স্বাধীনব্যবসায়ী ছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ক্লাইভের আদেশে, তিনি উড়িষ্যায় মণিরখনি আবিষ্কার করিতে গমন করেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি একখানি কেতাবও লিখিয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রথম আমলে, তিনি বেনারসে থাকিতেন। তৎপরে চুঁচুড়ায় আসেন। গবর্ণর হেষ্টিংস, প্রায়ই মট সাহেবের চুঁচুড়ার বাড়ীতে আমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহার গোপনীয় চিঠিপত্রের অনেকস্থলে—তিনি

"বিবি-মটের" নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসরকাল, মট্‌সাহেব সেকালের কলিকাতার পুলিশ-বিভাগের বড়কর্ত্তার কাজ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, ইম্পির স্বহস্ত লিখিত যে সব কাগজপত্র আজও বর্ত্তমান, তাহার মধ্যেও মিঃ মটের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "জীবনের শেষভাগে তাঁহার দারুণ অর্থকৃচ্ছতা ঘটিয়াছিল ও এজন্য তিনি কলিকাতা-জেলে দেনার দায়ে আবদ্ধ হন—"ইম্পি তাঁহার পত্রে মটের সম্বন্ধে এই কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন এই মট্‌স-লেন, ইণ্ডিয়ান-মিরার ষ্ট্রীট নামে পরিচিত। এই গলির মধ্যে মিরর-সম্পাদক স্বর্গীয় রায় নরেন্দ্র নাথ সেন বাহাদুরের আবাসবাটী ও মিরার অফিস।

রয়েড্ ষ্ট্রীট।

৪১ নং ফ্রিস্কুল ষ্ট্রীট হইতে এই রাস্তা আরম্ভ হইয়া, ইলিয়ট রোডে গিয়া মিশিয়াছে। কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের পিউনী-জজ, স্যর জন রয়েডের নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়। রয়েড্ সাহেব ১৭৮৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮১৬ পর্য্যন্ত এদেশে জজিয়তী করেন। দুই একবার তিনি সুপ্রীমকোর্টের সেসনেও বসিয়াছিলেন। জজ রয়েডের এক মন্তব্য হইতে জানিতে পারা যায়, তাঁহার দাপটের চোটে, এই সময়ে কলিকাতার পুলিশ-বন্দোবস্ত খুব ভাল ছিল। কারণ প্রথম সেসনে তিনি দুইটী বই মোকদ্দমা পান নাই ও তাহা একদিনেই শেষ হয়। পার্ক ষ্ট্রীটে ইঁহার সমাধি এখনও বর্ত্তমান আছে।

ইলিয়াট রোড।

ট্রাম-কোম্পানীর দৌলতে, এখন ইলিয়াটরোড সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত। ইলিয়াট সাহেব পূর্ব্বোক্ত জজ রয়েডের সমকালীন ব্যক্তি। ইলিয়াট সাহেব, সেকালের কলিকাতা-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং পুলিশ ও কন্সারভেন্সির বড় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে, কলিকাতা সহরে চোর ডাকাতের ভয় কমিয়া যায়। চোর-ডাকাত ধরিতে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পার্ক ষ্ট্রীটে ইহার সমাধি বর্ত্তমান। ইলিয়াট রোড কলিকাতার পুরাতন ম্যাপে "আহম্মদ জমাদারের রাস্তা" বলিয়া উল্লিখিত।

রিপণ ষ্ট্রীট্।

রিপণষ্ট্রীট, মার্কুইস ষ্ট্রীট, রিপণ লেন, পাশাপাশি ও নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। সর্ব্বজন প্রিয় ভুতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রিপণের নামে এই পথ

গুলির নামকরণ হইয়াছে। আগে এই গলিগুলি, সাউথ-কলিঙ্গা, এনিস্-বারবারের লেন্, জোড়া-তালাও লেন্, মিশির-খানসামার লেন্ প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান নয় নম্বর রিপণ-ষ্ট্রীটে, জন উইলিয়াম রিকেটস্ সাহেব বাস করিতেন। (১৭৯১—১৮৩৫ খৃঃ) এই রিকেটস্ সাহেব জাতিতে ফিরিঙ্গি। তিনি ফিরিঙ্গি ও এদেশীয় লোকদের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে, তিনি ডভ্‌টন-কালেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে, তিনি বিলাতে গিয়া, হাউস্-অব-লর্ডস ও কমন্সের সম্মুখে, ফিরিঙ্গি-সমাজের প্রতিনিধিরূপে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। এই সময়ে ভারতের সিভিল-সার্ভিস সম্বন্ধে, বিলাতে একটী সিলেক্ট-কমিটি বসে। তিনি এই কমিটিতে ভারতবাসীর হইয়া সাক্ষ্য দেন। ১৮৩৩ খৃঃ যে চার্টার্-এ্যাক্ট্ প্রচলিত হয়—তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আদেশ থাকে, যে কোন জাতি বা ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, গবর্ণমেণ্টের অধীনে সিবিল-বিভাগে নিযুক্ত হইতে পারিবে। এরূপ বন্দোবস্ত রিকেটস্ সাহেবের পার্লামেণ্টে সাক্ষ্য-প্রদানের ফলেই হইয়াছিল।

কিড্ ষ্ট্রীট।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বোটানিকেল-গার্ডেন প্রতিষ্ঠাতা, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল রবার্ট কিডের নামানুসারে, এই পথের নামকরণ হইয়াছে। কর্ণেল কিড্, বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্টের মিলিটারি-সেক্রেটারি ও একজন শ্রেষ্ঠদরের উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে, তিনি বোটানিকেল-গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পুত্র জেমস্ কিড্, ১৮০৭ খৃঃ অব্দে, খিদিরপুরে এক ডক্ প্রতিষ্ঠা করিয়া যশস্বী হন। এই কিডের নাম হইতেই—"কিডারপুর" ও তদপভ্রংশ "খিদিরপুর" নামকরণ হইয়াছে। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে খিদিরপুরেই কিডের মৃত্যু হয়। কিড্, তৎকালীন ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের অনেক প্রধান নেতা ছিলেন।

সদর-ষ্ট্রীট।

সদর ষ্ট্রীট বর্ত্তমান মিউজিয়ম-বিল্‌ডিংএর নিকট আরম্ভ হইয়া, ফ্রিস্কুল-ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত সরাসর চলিয়া গিয়াছে। আগে এই পথের একাংশের নাম ফোর্ড ষ্ট্রীট ও অপরাংশ স্লিকষ্ট্রীট বলিয়া পরিচিত ছিল। মিঃ স্লিক্ ১৭৮৯ হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, কৌন্সিলের-মেম্বর ছিলেন। বর্ত্তমান মিউজিয়াম

বিল্ডিংএর অধিকৃত স্থানের মধ্যে তাঁহার বাটী ছিল। এই বাড়ীর চারিদিকে সুবৃহৎ কম্পাউণ্ড থাকায়, বাটীর সীমা কিড্-ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। স্পিক সাহেবের এই বাটীতে একদিন একটী ভয়ানক ঘটনা ঘটে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৌন্সিলের-মেম্বর ছিলেন। তাঁহার বাটীর ফটকে সিপাহী পাহারা থাকিত। একজন শিখ, কোন অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা জন্য তাঁহার নিকট এক দরখাস্ত করে। স্পিক্ সাহেব শিখের দরখাস্ত লইতে অস্বীকার করায়, সেই শিখ ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেবের এক ভৃত্যকে হত্যা করিয়া উপরের ছাদে উঠিয়া যায় ও অপর লোকদিগকে হত্যা করিবার ভয় দেখায়। শেষ সিপাহিদিগকে ডাকিয়া, স্পিক্ সাহেব সেই উন্মত্ত শিখকে হত্যা করান। এই বাড়িটী স্পিক্ সাহেব, পরিশেষে গবর্ণমেণ্টকে ভাড়া দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এই বাটীতে "সদর-কোর্ট" বলিয়া একটী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্য পথটীর "সদর-ষ্ট্রীট" নামকরণ হইয়াছে।

লিণ্ডসে ষ্ট্রীট।

এই লিণ্ডসে-ষ্ট্রীট, বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল বাজারের নিকট। ইহার পার্শ্বেই কলিকাতার সুবিখ্যাত গ্রাণ্ড-অপেরা-হাউস। এই রাস্তাটি বহুদিনের। অনারেবল রবার্ট লিণ্ডসে, কোম্পানীর অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। লিণ্ডসে সাহেব, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে একজন রাইটার বা সিভিলিয়ান রূপে এদেশে আসেন (১৭৭২ খৃঃ)। কয়েক বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া তিনি ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, ঢাকার কলেক্টার পদে নিযুক্ত হন। তখন কোম্পানীর সিভিল-সার্ভেণ্টগণ, বেতন কম পাইতেন বলিয়া, অর্থাগমের জন্য নানারূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন। লিণ্ডসেরও এরূপ অনেক গুপ্ত কারবার ছিল। তাঁহার প্রধান ব্যবসা ছিল, বাঘ শিকার ও হাতী ধরা। তখন শ্রীহট্টের জঙ্গলে, এসব জানোয়ারের অভাব ছিল না। বৎসরে তিনি ৬০।৭০টী ব্যাঘ্র বধ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের নিকট একতালিকা পাঠাইতেন। কোম্পানী-বাহাদুর, এজন্য তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিতেন। হাতী ধরিয়া, তিনি কোম্পানীর সেনা-বিভাগে ব্যবহৃত হইবার জন্য পাঠাইতেন। এই সব হাতি, গবর্ণমেণ্ট উচ্চদরে কিনিয়া লইতেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীহট্টের জঙ্গল কাটাইয়া, তিনি শাল-সেগুণের ব্যবসাও করেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হইয়া বিলাতে চলিয়া যান।

এই লিণ্ডসে-ষ্ট্রীটে অপেরা-হাউস ছিল। ইহার পূর্ব্বের অবস্থা আমরা দেখিয়াছি। এখন অবস্থা অন্যরূপ ও সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত। স্বর্গীয় সম্রাট প্রথম এডওয়ার্ড ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে, যখন প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ রূপে কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার সম্মানার্থে "My Awful Dad" নামক একখানি নাটিকা, এই অপেরা-হাউসে অভিনীত হয়। সেদিন এত ভিড় হয়, যে অধ্যক্ষেরা বসিবার আসনের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। ছয় জনের বসিবার উপরের বক্সের দাম হইয়াছিল একহাজার টাকা। নীচের বক্স (ছয় জনের বসিবার) পাঁচ শত টাকা। ষ্টল—পঞ্চাশ টাকা।

ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীট।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, এই নামকরণ কেন হইল, তদ্বিষয়ে দুইটী মত প্রচলিত আছে। এখন ধর্ম্মতলায় যে মসজেদ আছে, তাহার পার্শ্বেই কুক্-কোম্পানীর ঘোড়ার আস্তাবল। এই আস্তাবল বাটীর অধিকৃত জমীতে, অতি পুরাকালে আর একটী মসজেদ ছিল। অনেকের মতে, এই মসজেদ ও তৎসংলগ্ন দরগা হইতে "ধর্ম্মতলা" নামকরণ হইয়াছে। সে মসজেদ এখন আর নাই। ইহার পার্শ্বের বর্ত্তমান মসজেদটী, টিপু-সুলতানের বংশধর, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ কর্ত্তৃক ১৮৪২ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। দ্বিতীয় মতের প্রচারক—ডাঃ হর্ণেল। ইনি বলেন, জানবাজারে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের যে আড্ডা ছিল, তাহা হইতেই "ধর্ম্মতলা নামকরণ হইয়াছে। আগে এই ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীটের দুইধারে, বড় বড় খানা ছিল, পথটিও পাকা হয় নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বড়-জমাদার জাফরের অনেক জমীজমা এই ধর্ম্মতলায় ছিল। ধর্ম্মতলার শীলবাবুদের একটি বাজার ছিল। আর একটি বাজার, তাঁহাদের দখলের বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে, এই স্থানে ছিল বলিয়া শুনা যায়। সে বাজারের নাম ছিল মেম্বা-পীরের বাজার। ধর্ম্মতলার হগ সাহেবের বাজার প্রতিষ্ঠার পর, পুরাতন বাজারের প্রতিপত্তি কমিয়া যায়।

এই ধর্ম্মতলার উত্তরদিক দিয়া একটি ছোট খাল, চাঁদপাল-ঘাট হইতে বেলিয়াঘাটা সল্ট-লেক বা ধাপা-পর্য্যন্ত পুরাকালে প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমান ওয়েলিংটন-স্কোয়ার ও ক্রীকরোর মধ্য দিয়া, সেই খালটি হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটে চলিয়া গিয়াছিল। খালটি খুব প্রশস্ত ছিল ও ইহাতে বড় বড় মালের নৌকা যাতায়াত করিত। বর্ত্তমান ক্রীক্রোর নিকটস্থ কোন্ স্থানে, এই খালের উপর একখানি জাহাজ ও কতকগুলি ডিঙ্গি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, এই স্থানের

নাম "ডিঙ্গাভাঙ্গা" হইয়াছে। ১৭৩৭ খৃঃ অব্দের মহাঝড়ে, এই জাহাজখানি গঙ্গাগর্ভ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই খানে উপস্থিত হয়, ও তৎপরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। হুউইট সাহেবের অতি পুরাকালে লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাসে "ভারতে ইংরাজ-বাণিজ্য ও কলিকাতা-সেটেলমেণ্ট" প্রস্তাবে, এই খালের একটি নক্‌সা দেওয়া আছে। তাহা হইতে প্রমাণ হয়, পূর্ব্বোল্লিখিত এই খালটি, কলভিন্ ঘাট বা কাঁচাগুড়ি ঘাট হইতে আরম্ভ হইয়া হেষ্টিংস্-ষ্ট্রীটের অধিকৃত স্থান দিয়া, পুরাতন সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্ববাহিনী হইয়া (এই পুরাতন সমাধিক্ষেত্র বর্ত্তমান কালের সেণ্টজন গির্জ্জার পার্শ্বস্থ ভূমি) বরাবর ধর্ম্মতলার দিকে চলিয়া গিয়াছিল। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে উইল্‌সের ম্যাপে, খালের চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই ম্যাপে দেখা যায়, বর্ত্তমান হেষ্টিংস্-ষ্ট্রীট ও কাউন্‌সিল-হাউস ষ্ট্রীটের সন্ধিস্থলে, এই খালের উপর একটি পুল ছিল। অর্ম্মিও, এই খালের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জলের যে ট্যাঙ্ক আছে, তাহা এই খালের গর্ভের উপর নির্ম্মিত। আগে এই স্থান ডিঙ্গাভাঙ্গা নামেই পরিচিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে "ক্রিক্‌রো" "ওয়েলিংটন-স্কোয়ার" ইত্যাদি বিবিধ নামকরণ হইয়াছে। এই খাল বুজাইয়া, জমীভরাট করা, পূর্ব্বোক্ত "লটারি-কমিটির" দ্বারাই হইয়াছিল। ১৮২১ খৃঃ অব্দের কলিকাতা গেজেটে হইতে জানা যায়, পুরাকালে এই সমতল ক্ষেত্র "ধর্ম্মতলা-স্কোয়ার" বলিয়া পরিচিত ছিল। তখনও ইহার নাম "ওয়েলিংটন-স্কোয়ার" হয় নাই।

বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীট।

ভারতের প্রসিদ্ধ গবর্ণর-জেনারেল, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের নামে এই পথ্যার নামকরণ হইয়াছে। পুরাকালে এই স্থান "কসাইটোলা" নামে পরিচিত ছিল। কস্যাই শ্রেণীর নীচ জাতীয় লোকে এইস্থানে বাস করিত বলিয়া, এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। চিৎপুর হইতে বরাবর একটী জঙ্গলময় বনপথ, বর্ত্তমান বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীটের উপর দিয়া আসিয়া ধর্ম্মতলায় মিশিয়াছিল ও তাহা চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া কালীঘাটে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাই সেকালের "কালীঘাট-যাত্রীর" পুরাতন পথ। পলাশী-যুদ্ধের বৎসরেও এই সমস্ত স্থান জঙ্গলপূর্ণ ছিল। কারণ পুরাতন নক্সা সমূহে, বর্ত্তমান বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীটের পূর্ব্বদিকের স্থানগুলি কেবল বৃক্ষ ও ঝোপ দ্বারা চিহ্নিত দেখা যায়। ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দের এক বিবরণী হইতে জানা যায়—বৃষ্টির ফলে অত্যন্ত

কাদা হইত বলিয়া, এই পথটী অতি দুর্গম ছিল। ১৭৮৪ হইতে ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে এই কসাইটোলা পল্লীতে অনেক ফিরিঙ্গি ও ইংরাজ-ব্যবসায়ী দোকান খুলিয়া কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই পল্লীতে সেকালের "ট্রেন্‌হোমের-ট্যাভার্ণ" জন পায়ারের—অণ্ডার-টেকারের কারখানা, গাড়ীওয়ালা মিঃ অলিফ্যাণ্টের ইউনিয়ান টাভার্ণ, মিঃ মেকিননের ইংরাজী স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। আজকাল যে বাড়ীতে, লোয়েলীন কোং'র কার্য্যালয়—সেই বাড়ীতে কয়েক বৎসরের জন্য, অতি পুরাকালে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট-হাউস স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও এই বাড়ীর মধ্যে সেকালের থ্রোন্‌রুম ও কৌন্সিল-চেম্বাররূপে ব্যবহৃত, পুরাকালের কামরাগুলি এখনও বর্ত্তমান।

এই পথের আশেপাশের পল্লীতে, যে সমস্ত গলিগুলি আজও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের নামের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই পুরাকালের নামই আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ—গ্রাণ্টস্‌-লেন, মেরিডিথ্‌স-লেন, ওয়েষ্টন্‌-ষ্ট্রীট, জিগ্‌জ্যাগ্‌-লেন, ইমাম-বাড়ী-লেন, স্টুটার-কিন্স-লেন, চাঁদনী-চক, ম্যাঙ্গো-লেন, ডেকার্স-লেন, ক্রুকেড্‌-লেন, ফ্যান্সি-লেন, লারকিন্স-লেন প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র সেকালের "রাণীমুদী-গলির" নামটী ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-ষ্ট্রীটে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

গ্রাণ্টস্‌-লেন।

গ্রাণ্টস্‌-লেনটী অতি পুরাতন। বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীট হইতে এই গলি আরম্ভ হইয়াছে। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দের ম্যাপ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মাত্র কয়েক ঘর ইংরাজ এই গলির মধ্যে প্রথম বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চার্লস গ্রাণ্টের নামানুসারে, এই গলির নামকরণ হইয়াছে। এই গ্রাণ্ট সাহেব, কোম্পানীর অধীনে একজন সিভিলিয়ান বা রাইটার ছিলেন। তিনি একজন খাঁটি খ্রীষ্টান ছিলেন। ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে, তিনি কোম্পানির কার্য্য হইতে অবসর লয়েন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের গবর্ণর হইবার পূর্ব্বে, তিনি কোম্পানীর কার্য্যে প্রবেশ করেন। ভবিষ্যতে বিলাতে গিয়া ইনি প্রথমে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টার ও পরে চেয়ারম্যান পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। (১৮০৮ খৃঃ) মিশন-রোর পুরাতন গির্জ্জা, যাহা পাদরী জন্ কারণাণ্ডারের স্থাপিত,—সেই ভজনালয়েই তিনি "গির্জ্জা"

করিতেন। এই গির্জ্জা—কারণাগারের নিজের সম্পত্তি। পাদরী সাহেবের ব্যক্তিগত দেনার দায়ে, ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে এই গির্জ্জা আদালতের হুকুমে শীল করা হয়। কিন্তু গ্রাণ্ট সাহেব দশ হাজার টাকা দিয়া গির্জ্জাটী নিজের দখলে আনেন। এখনও এই গির্জ্জার মধ্যে তাঁহার নামে একটী ট্যাবলেট্ বা স্মৃতিফলক বর্ত্তমান। ৭৮ বৎসর বয়সে, লণ্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি উপনিবেশ সমূহের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে ইনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

ওয়েষ্টন-ষ্ট্রীট্।

আজকালকার ওয়েষ্টন-ষ্ট্রীট সকলেরই পরিচিত। এই পথ, বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়া, কপালিটোলা পল্লীতে মিশিয়াছে। চার্লস ওয়েষ্টনের নামে এই গলির নামকরণ হইয়াছিল। ওয়েষ্টন, সেকালের কলিকাতার একজন নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন। লালবাজারের সন্নিহিত, টিরাটা-বাজারের একটী বাড়ীতে, তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—সেকালের মেয়র-কোর্টের রেকর্ডার বা সেরেস্তাদার ছিলেন। নন্দকুমারের মোকদ্দমায়, এই ওয়েষ্টন সাহেব একজন জুরীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ পার্ক-ষ্ট্রীট গোরস্থানে ইঁহার সমাধি হয়। ৭৮ বৎসর বয়সে, সেকালের এই নামজাদা দানশীল ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ওয়েষ্টন সাহেব, সেকালের কলিকাতার একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন। তিনি দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, সকলেই সমানভাবে অর্থ বিতরণ করিতেন। জীবনের প্রারম্ভে, তিনি ইতিহাস-বিখ্যাত হলওয়েল সাহেবের অধীনে চিকিৎসকের শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। হলওয়েল সাহেব তাঁহাকে একবার বিলাতে লইয়া যান। হলওয়েল, ভবিষ্যতে সিভিলিয়ান রূপে, কোম্পানীর অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, ওয়েষ্টনও ডাক্তারী ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন। সেরাজের কলিকাতা আক্রমণের সময়, ওয়েষ্টন দুর্গ-মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার প্রভু হলওয়েলের মালামাল, নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য, সেরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা দুর্গাধিকারের আগের দিনে, তিনি গোপনে দুর্গের বাহিরে চলিয়া যান। এজন্য তিনি অন্ধকূপ-হত্যা ব্যাপার হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ওয়েষ্টন, তাঁহার প্রভু হলওয়েলের মালামাল লইয়া, ফল্‌তায় না গিয়া বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া, চুঁচুড়ার ডচ্‌দিগের ফ্যাক্টারীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হলওয়েল

এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার সময়—ওয়েষ্টনকে দুই হাজার টাকা পুরস্কার এবং আরও পাঁচ হাজার টাকা ঋণ স্বরূপে দেন। এই টাকা মূলধন করিয়া, নিজের প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে, ওয়েষ্টন সাহেব এক এজেন্সির কারবার খোলেন। ১৭৯১ খৃঃ অব্দের লটারিতে, টেরিটিবাজার বিক্রয় হইয়া যায়। ওয়েষ্টনের ভাগ্যে এই বাজার পড়ে। এই বাজারের আয় হইতে, তিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। আর হলওয়েল প্রদত্ত মূলধন, সুদে খাটাইয়া, যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি করিয়া, তাহা দাতব্য-কার্য্যে ব্যয় করিতেন। সেণ্টজন গির্জ্জায় এই দয়ালু ওয়েষ্টন সাহেবের একখানি তৈলচিত্র আজও সুরক্ষিত। এরূপ প্রবাদ আছে, যে ওয়েষ্টন সাহেব তাঁহার চুঁচুড়ার বাগান বাটীতে গিয়া, প্রতি রবিবারে এদেশীয় দরিদ্রদের মধ্যে অর্থাদি বিতরণ করিতেন।

এই ওয়েষ্টন-ষ্ট্রীট বর্ত্তমানে ফিরিঙ্গি-কোয়াটার। বর্ত্তমান ওয়েষ্টন ষ্ট্রীটের প্রান্তভাগে, কাপালিটোলার এলেকায়, বগুড়ার নবাব আবদস্ সোভান চৌধুরী সাহেবের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা বর্ত্তমান। এই নবাব-প্রাসাদের পার্শ্বে, ধনবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ও বঙ্গদেশের লাট-কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য, নবাব সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী সাহেবের প্রাসাদতুল্য বাটী। ইঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষিত মুসলমান সমাজের নেতা ও অধিনায়ক। নবাব নওয়াব আলি সাহেব একজন বঙ্গসাহিত্যসেবী। ইঁহার প্রণীত কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ, মুসলমান সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

এস্প্লানেড-রো।

লাট-সাহেবের বাড়ীর অর্থাৎ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকট, যে প্রশস্ত পথ, সরাসর ধর্ম্মতলায় আসিয়া মিশিয়াছে, তাহা "এস্প্লানেড রো" নামে পরিচিত। ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের আমলে, এই পথ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট-হাউস-কম্পাউণ্ডের উপর দিয়া, বরাবর ইডেন-গার্ডেন ও চাঁদপাল-ঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময়ে, বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। এখন এই লাট-প্রাসাদ, এস্প্লানেড-রোর দীর্ঘতা ও প্রশস্তভাব কমাইয়া দিয়াছে। হেষ্টিংসের আমলে, ইডেন-গার্ডন ও বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদের অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। এজন্য এই এস্প্লানেড্ পথটী চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত সরাসরভাবে বিস্তৃত ছিল। জনপ্রবাদ ওয়ারেণ—হেষ্টিংস, ৪নং এস্প্লানেড রোডের একটী বাটিতে থাকিতেন। ইহাই তাঁহার

কলিকাতায় কাছারী-বাটী ছিল। ব্যারণেস্ ইম্‌হফ্‌কে বিবাহ করিবার পর, হেষ্টিংস সাহেব, বর্ত্তমান হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বসবাস আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই বাড়ীটি এখন, সুপ্রসিদ্ধ বরণ-কোম্পানীর অফিস। লর্ড কর্জ্জন, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অধিকৃত পুরাকালের এই বাড়ীর গায়ে একখানি স্মৃতিফলক বা ট্যাবলেট্ মারিয়া দিয়াছেন।

ডেকার্স-লেন।

এই গলিটী এসপ্লানেড রো হইতে আরম্ভ হইয়া, বরাবর ওয়াটারলু ষ্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। এই পথটী কলিকাতার মধ্যে অতি প্রাচীন। পি, এম, ডেকার্স সাহেব, ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে, কলিকাতার কালেক্টার ছিলেন। পরে তিনি কৌন্সিলের মেম্বরও হন। কোম্পানীর জমীদারী-লাভের পর, দিনকতক ইনি হলওয়েলের মত "জমীদারের" কাজও করিয়াছিলেন। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা দুর্গ-অবরোধ সময়ে, এই ডেকার সাহেব ২০৲ টাকা মাসিক বেতনের একজন "রাইটার" ছিলেন। ইনিই কলিকাতার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট বা গবর্ণর ড্রেকের নিকট, সর্ব্বপ্রথমে ভলণ্টিয়ার-সৈন্যদল সংগঠনের প্রথম প্রস্তাব করেন।

ওল্ড কোর্ট-হাউস ষ্ট্রীট।

এই রাস্তাটীর এক প্রান্তে, লাট-প্রাসাদ ও অপর প্রান্তে ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালদিঘি। বর্ত্তমান সেণ্ট এন্‌ড্রু (ঘড়ীওয়ালা গির্জ্জা) যেখানে আছে, সেই স্থানে পুরাতন কোর্ট-হাউস ছিল। এই কোর্ট-হাউস্ হইতেই, পথটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। নবাব সেরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে, এই পথটী বর্ত্তমান মিশন-রো পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে এই রাস্তাটীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। আগে এই পথটী, গির্জ্জার কোল হইতে আরম্ভ হইয়া, বর্ত্তমান রেড্-রোডের স্থান অধিকার করিয়া, গড়ের মাঠের মধ্য দিয়া অতীতকালের "সরম্যান্‌স-ব্রিজ" এবং বর্ত্তমানকালের খিদিরপুরের পোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেকালের দীর্ঘ-পথটী এখন নানাস্থানে নানাবিধ নামে বিভক্ত হইয়াছে। আজকাল পেলিটি-কোংর পার্শ্বে, যে বাড়ীটি এজরা-ম্যান্‌সন্‌স বলিয়া পরিচিত, সেই স্থানে ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের কৌন্সিলের অন্যতম সভ্য, জেনারেল ক্লেভারিংএর অস্থায়ী আবাস-বাটী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ লং সাহেব এইরূপ একটা অনুমান

করেন। জেনারেল ক্লেভারিং, কলিকাতায় মোটে তিনবৎসর ছিলেন। ৮নং মিশন-রোর বাড়িটী, এখন যাহা টমাশ-কোংর কার্য্যালয়, সেই বাড়ীতে জেনারেল সাহেবের মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত ওল্ডকোর্ট হাউসের বাটীতে, তিনি অতি অল্পদিনই বাস করিয়াছিলেন। এখানে ইতিপূর্ব্বে যে পুরাতন বাটীটি বর্ত্তমান ছিল, এবং যাহা ভাঙ্গিয়া এখন "এজ্‌রা—বিলডিংস্‌" নামক সুবৃহৎ নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই পুরাতন বাটীতে মিসেস্‌ লিচ্‌ ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে, চারি শত লোক বসিবার উপযুক্ত, এক অস্থায়ী থিয়েটার নির্ম্মাণ করেন। ইহার পরই "সাঁ—সুশী" থিয়েটার, বর্ত্তমান সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজবাটিতে পার্কষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শেষোক্ত থিয়েটারে অভিনয় কালে, পরিচ্ছদে আগুন লাগায়, পরমা সুন্দরী মিস্‌ লিচ্‌ অকালে পরলোকে প্রস্থান করেন।

লারকিন্স লেন।

ওল্ড-কোর্টহাউস হইতে, এই ক্ষুদ্র গলিটী আরম্ভ হইয়া, ওয়েলেসলী-প্লেসে মিশিয়াছে। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে উডের ম্যাপেও এই লেন্‌টি বর্ত্তমান ছিল। উইলিয়ম লারকিন্স সাহেবের নামে এই গলির নামকরণ হয়। এই লারকিন্স সাহেব, ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কয়েক বৎসরের জন্য তিনি কোম্পানীর অধীনে একাউণ্টাণ্ট-জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস, এদেশীয় রাজাদের নিকট যে অর্থ নজরানা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য, পার্লামেণ্টে তাঁহার মহা-বিচারের সময়, লারকিন্স সাহেব বিলাতে গিয়াছিলেন।

ফ্যান্সি-লেন।

এই গলিটি ওয়েলেস্‌লী-প্লেসের এক অংশ হইতে আরম্ভ হইয়া, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে গিয়া পড়িয়াছে। আর্চ্চডিকন হাইডের মতে, "ফ্যান্সি" কথাটি "ফাঁসী" শব্দের সহজ অপভ্রংশ। পুরাকালের কলিকাতায়, সম্ভবতঃ জব চার্ণকের পরের আমলে, এইস্থানের সান্নিধ্যে, একটি ফাঁসি-মঞ্চ ছিল। ইহার নিকট দিয়া একটি খাল, বরাবর পশ্চিমবাহিনী হইয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছিল। ইহাই হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটের সেই পুরাতন ক্রীক্‌ বা খাল।

কাউন্সিল-হাউস্‌-ষ্ট্রীট।

এই পথটী বর্ত্তমান পাথুরিয়া-গির্জ্জা বা সেণ্ট জন ভজনাগারের পার্শ্ব

দিয়া, বরাবর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। এইখানে বহুকাল পূর্ব্বে একটী "কাউন্সিল-হাউস" বা মন্ত্রণাগৃহ ছিল। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে এই পুরাতন মন্ত্রণাসভা-গৃহটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। পুরাকালে এই কাউন্সিল-হাউস ষ্ট্রীট, সরাসর ময়দানের মধ্যে গিয়া পূর্ব্বোক্ত এসপ্লানেড-রোডের সহিত মিশিয়াছিল। এখন এই পথের কিয়দংশ "গবর্ণ-মেণ্ট-প্লেশ ওয়েষ্ট" বলিয়া পরিচিত। যে বাড়ীতে ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে কাউন্‌সিল-হাউস বা কোম্পানীর মন্ত্রণাগৃহ স্থাপিত হয়, সেই বাড়িটি, আগে কোর্ট নামক একজন ইংরাজের সম্পত্তি ছিল। কোম্পানী, মন্ত্রণাগৃহরূপে ব্যবহার করিবার জন্য, কোর্ট সাহেবের নিকট হইতে এই বাটী কিনিয়া লয়েন। এই কোর্ট সাহেব, কোম্পানীর-আমলের একজন "সিনিয়ার-মার্চ্চেণ্ট" ছিলেন ও অন্ধকূপহত্যা কাণ্ডে মৃত্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, হলওয়েলের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়, মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। গঙ্গা নদীতে ডুবিয়া গিয়া ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে, এই কোর্ট-সাহেবের অপমৃত্যু ঘটে।

হেষ্টিংস-ষ্ট্রীট।

হেষ্টিংস ষ্ট্রীট সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছি। একটি খাল বুজাইয়া বর্ত্তমান পথটি নির্ম্মিত হয়। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময়, বর্ত্তমান সেণ্টজন গির্জ্জার নিকট, এই হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটের পূর্ব্বপ্রান্তে এক তোপখানা বা ব্যাটারি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বরণ-কোম্পানীর বাড়িটিই, গবর্ণর জেনরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আবাস বাটি ছিল। ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে হেষ্টিংস, ব্যারনেস ইম্‌হফ্‌কে দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া, তিনি এই বাটিতেই বাস করিয়াছিলেন। পুরাকালের কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায়, যে গবর্ণর হেষ্টিংস পদব্রজে গির্জ্জায় যাইতেন। কোন কোন মতে এই গির্জ্জাটি বর্ত্তমান সেণ্টজন-গির্জ্জা। গির্জ্জার অধিকৃত স্থান মহারাজ নবকৃষ্ণের সম্পত্তি। তিনি এই গির্জ্জা নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় সমস্ত জমী, গির্জ্জা-নির্ম্মাণ-কমিটির হস্তে দান করেন। এই সেণ্টজন গির্জ্জা নির্ম্মাণের প্রধান উদ্যোগী, গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস।

ওল্ড পোষ্টঅফিস ষ্ট্রীট।

চর্চ্চ-লেন ও হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থল হইতে, ওল্ড-পোষ্টাফিস-ষ্ট্রীট

আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান হাইকোর্টের নিকটে, সেকালের পোষ্টাফিস বা বড় ডাকঘর ছিল। আগে এই স্থানে, অনেক ইংরাজের বসবাস ছিল। হাইকোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর হইতে, ইহা উকীল ও এটর্ণি-পাড়ায় পরিণত হইয়াছে। সেকালের পুরাতন বাড়ীগুলি—এখন ছায়াবাজির দৃশ্যের ন্যায় অদৃশ্য হওয়ায়, তাহাদের অধিকৃত স্থানে প্রাসাদতুল্য ত্রিতল চতুস্তল নূতন বাটি সমূহ নির্ম্মিত হইতেছে। ওল্ড-পোষ্ট-আফিস ষ্ট্রীট পার হইয়া গেলেই, সেকালের এস্‌প্লানেডের বড় রাস্তা। ইহা "চাঁদপাল-ঘাট" পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজকাল যে স্থানে কলিকাতা মহানগরীর টাউনহল বর্ত্তমান, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে, সেই স্থানে সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম জজ হাইড সাহেবের আবাস-স্থান ছিল। জনশ্রুতি এই,—জজ হাইড এই বাড়ীটির জন্য মাসিক বারশত টাকা ভাড়া দিতেন। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ দিনই এই বাটি উৎসব-সমাকুল হইয়া থাকিত। জজ সাহেবের পত্নী, সেকালের কলিকাতার বড় বড় ইংরাজ ও বারিষ্টারগণকে প্রত্যেক "টার্মের" পূর্ব্বে একটি করিয়া ভোজ দিতেন। বর্ত্তমান হাইকোর্টের অধিকৃত স্থানে, ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে, নূতন কোর্ট-হাউস স্থাপিত হয়। বারিষ্টারেরা, জজ হাইডের বাড়ী হইতে এই "টার্ম" আরম্ভের দিনে—প্রাতরাশাদি করিয়া দলবদ্ধ হইয়া, আদালত গৃহে যাত্রা করিতেন। এখনকার দিনে এরূপ ব্যাপার অতি দুর্লভ!

ষ্ট্রাণ্ড-রোড।

এই ষ্ট্রাণ্ড-রোড, বর্ত্তমান কলিকাতার এক বিশেষ গৌরবের জিনিস। প্রিন্‌সেপস্‌-ঘাট হইতে আরম্ভ হইয়া হাটখোলা পর্য্যন্ত এই পথটির বিস্তৃতি। ইহার পার্শ্বেই নন্দনকানন সদৃশ "ইডেন-উদ্যান।" ইহার এক দিকে বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক ও বহুবিধ সওদাগরী, ও রাজকীয় কার্য্যালয় এবং অপরদিকে পোর্ট কমিশনারদের জেটি। এখন এই ষ্ট্রাণ্ড-রোডের দুই পার্শ্ব, বড় বড় প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকায় পরিপূর্ণ। কিন্তু নবাব সেরাজউদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সে সময়ে এই ষ্ট্রাণ্ড-রোড, গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে ইহার পত্তন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত লটারি-কমিটির সহায়তায়, এই সুদীর্ঘ রাজপথটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই ষ্ট্রাণ্ড-রোডের উপর, ইডেন-গার্ডেনের সান্নিধ্যে "বাবু-ঘাট"। জানবাজারের সুপ্রসিদ্ধ রাণী রাসমণির স্বামী, বাবু রাজচন্দ্র দাস এই ঘাটটি

নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তৎকালের গবর্ণর জেনারেল, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের নামে এই ঘাটটি উৎসর্গীকৃত হয়।

ইডেন-গার্ডেন, অতি পুরাকালে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল। লর্ড অকলাণ্ডের শাসন কালে, এই উদ্যানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগ্নী, মিসেস ইডেন ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে এই সাধারণ ভ্রমণো-দ্যানের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে লোহিত কঙ্করময় ভ্রমণ-পথ, শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্র, ফলপূর্ণ বৃক্ষাদি, কৃত্রিম হ্রদ থাকায়, ইহা এক শোভনীয় রমণোদ্যানে পরিণত হইয়াছে। ইহা এখন ইংরাজ-বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী-মাড়োয়ারি প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর আরাম-উদ্যান। সন্ধ্যার পর এই উদ্যানের এক অংশ বিদ্যুতালোকে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য, অসংখ্য ইংরাজ নরনারী ও এদেশীয় ভদ্রজন-সজ্য, এই উদ্যানে সমবেত হন। ইহার মধ্যে একটি "ব্যাণ্ড-ষ্টাণ্ড" আছে। প্রতিদিন কেল্লার ও ভলণ্টিয়ার-ব্যাণ্ড সমূহ, মধুর বাদ্য-নিক্কণে দিকদিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলে। মোটর-ফিটন, ভিক্টোরিয়া-ব্রুহাম প্রভৃতি অসংখ্য যান সমূহে, এই উদ্যান পার্শ্ববর্ত্তী রাজপথ, উৎসব দৃশ্যময় হইয়া পড়ে।

এই ষ্ট্রাণ্ড-রোডের উপরই ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেকালের "চাঁদপাল-ঘাট" বর্ত্তমান ছিল। কটন ও লং সাহেবদ্বয় বলেন—"এই ঘাটের সান্নিধ্যে, চন্দ্রনাথপাল বলিয়া এক মুদী দোকান করিত। তখন ইহার চারি পাশ গভীর বন জঙ্গল সমাবৃত। যে সকল পান্থ বা নৌকাযাত্রী এই স্থানে নামিত, তাহারা চন্দ্রপালের দোকান হইতে আহার্য্যাদি সংগ্রহ করিত। নবাব যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে চাঁদপাল ঘাটের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে ইহা যে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সেকালে যে সমস্ত উচ্চপদস্থ ইংরাজ, এদেশে কোম্পানী-বাহাদুরের চাকুরী করিতে আসিতেন, তাঁহারা এই ঘাটেই অবতরণ করিতেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য, স্যর ফিলিপ্ ফ্রান্সিস, এই ঘাটের সিঁড়িগুলির উপর দাঁড়াইয়া—ফোর্ট-উইলিয়াম হইতে তাঁহার সম্মানার্থে যে কয়েকটী তোপধ্বনি হইতেছিল, তাহার এক একটী করিয়া গুণিয়াছিলেন। গবর্ণর-জেনারেলের প্রাপ্যসম্মান-তোপ ১৯টী। কিন্তু ফ্রান্সিস তাঁহার মন্ত্রণা-সভার সদস্য হইয়া— যখন ১৭টী তোপ সম্মানার্থে পাইলেন, তখনই তাঁহার রোষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজেকে বড়ই অপমানিত বোধ করিলেন। এই অপমান-স্মৃতি তাঁহার

মনে, গবর্ণর হেষ্টিংসের উপর ভীষণ বিরাগ উৎপাদন করিল। ফ্রান্সিস যতদিন এদেশে ছিলেন, ততদিন সকল কাজেই হেষ্টিংসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রেভারিজের মত এই,—"যদি ফ্রান্সিস্ ও হেষ্টিংসে এইরূপ ভীষণ মনান্তর না ঘটিত, তাহা হইলে হয়ত নন্দকুমারের নামে জাল-মোকদ্দমা আদৌ উপস্থিত হইত না।" ফ্রান্সিসকে সহায়রূপে পাইয়াই, মহারাজ নন্দকুমার, কৌন্সিলের নিকট হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনয়ন করেন। ইহার অবান্তর পরিণাম, নন্দকুমারের নামে চক্রান্ত ও জাল-মোকদ্দমা। এই ঘাটে সুপ্রীমকোর্টের প্রথম চিফ্-জষ্টিস স্যর ইলাইজা ইম্পি ও তাঁহার সহযোগীগণও অবতরণ করিয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী, চিরকালই শুধুপায়ে থাকে। কৌন্সিলের মেম্বর ও সুপ্রীমকোর্টের জজদিগকে দেখিবার জন্য এই সময়ে চাঁদপাল-ঘাটে, এদেশীয়দের একটী মহা জনতা হয়। এই জনতার মধ্যে, অধিকাংশ লোকই নগ্নগাত্র ও নগ্নপদ। ইহাদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইম্পি তাঁহার সহযোগীদের বলিয়াছিলেন—"দেখ—ভাই! আমরা ঠিক সময়েই এদেশে আসিয়াছি। এদেশের লোকের পায়ে জুতা নাই—তাহারা নগ্নগাত্র! কি ভয়ানক অত্যাচার! দেখিতেছি, ঠিক সময়েই এদেশে উচ্চ-আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ছয়মাস এখানে কাজ করিবার পর, আমি এই সব লোককে নিশ্চয়ই জুতা ও ষ্টকিং পরাইতে বাধ্য করিব। ইহাদের এ দুর্দ্দশা দূর করিব।"*

চর্চ্চ-লেন।

পাথুরিয়া-গির্জ্জা বা সেণ্টজন চ্যাপেলের পার্শ্ব দিয়া, যে পথটী ছোট আদালতের সম্মুখে আসিয়া মিশিয়াছে, তাহা চর্চ্চ-লেন নামে অভিহিত। সেণ্টজন গির্জ্জা ইহার পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া, এই গলিটীর "চর্চ্চ-লেন" নামকরণ হইয়াছে। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে, পাথুরিয়া-গির্জ্জা প্রস্তুত হয়। এই পাথুরিয়া-গির্জ্জার সংলগ্ন ভূভাগটী, যাহা এখন গির্জ্জার কম্পাউণ্ড বা সীমানাভুক্ত, তাহার মধ্যে অতি পুরাকালে একটী প্রাচীন

* See brother! the wretched victims of tyranny! The Crown Court was not surely established before it was needed. I trust it will not have been in operation six months before we shall see all these poor creatures comfortably clothed in shoes and stockings.—Cotton's Calcutta. p. 324.

সমাধিভূমি বহুদিন ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল। এই সমাধিক্ষেত্র-গর্ভে, প্রাচীন কলিকাতার অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইংরাজের দেহাবশেষ মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দের উইলস্ সাহেবের ম্যাপে, এই পথটীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাস্তার শেষ মুখ—যাহা বর্ত্তমানে হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটের সহিত সম্মিলিত, সেইস্থানে নবাবের কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে একটী পুল ছিল। হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটের অধিকৃত স্থান দিয়া যে ক্রীক্ বা খালটী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল—এই পুল সেই খালের উপর ছিল। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে উড্ সাহেব কলিকাতার যে নক্সা প্রস্তুত করেন, তাহাতে "চর্চ্চ-লেন"এর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথের চার ও পাঁচ নম্বরের বাড়ী—যাহা সেকালে গঙ্গাতীরে ছিল, সেই বাড়ী দুটীতে পুরাতন টাকশাল-গৃহ ছিল। এখন সেই বাড়ী ভাঙ্গিয়া, প্রাসাদতুল্য বর্ত্তমান ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেসনারি আফিস নির্ম্মিত হইয়াছে।

হেয়ার-ষ্ট্রীট

হেয়ার-ষ্ট্রীটের নাম, ইংরাজি বাঙ্গলা সংবাদপত্রের জন্য আজকাল খুব জাহির হইয়াছে। বাঙ্গলা-সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা, প্রায়ই আমাদের "হেয়ার-ষ্ট্রীটের সহযোগী" বলিয়া অবান্তর ভাবে, ইংলিসম্যানকে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধাদি লেখেন। এই হেয়ার-ষ্ট্রীটের পত্তন—লটারি কমিটীর চেষ্টাতেই হইয়াছিল। বাঙ্গালীর অমায়িক বন্ধু—এদেশে বঙ্গবাসীর মধ্যে, উচ্চ শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক, মনস্বী ডেভিড্ হেয়ারের নামে এই পথটীর নামকরণ হইয়াছে। এই পথ, হেয়ারস্কুল, আর প্রেসিডেন্সি কালেজের ময়দানে তাঁহার শ্বেত প্রস্তরমূর্ত্তি ও গোলদীঘিতে তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ, ডেভিড্ হেয়ারের পবিত্র স্মৃতি আজও জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে। এই হেয়ার-ষ্ট্রীটেই—ইংরাজের মুখপত্র ইংলিসম্যান পত্রিকার অফিস। এই হেয়ার-ষ্ট্রীটেই, ছোট-আদালত, র‍্যালিব্রাদার্সের প্রাসাদতুল্য অফিস, ইম্পিরিয়েল-লাইব্রেরী বা সাবেক মেট্‌কাফ্-হল অবস্থিত। বর্ত্তমান ছোট-আদালতের প্রবেশ পথ সেখানে, অর্থাৎ যে অংশটী বাঁকশাল ষ্ট্রীটের দিকে—অতি পুরাকালে সেইস্থানে আর একটী বৃহৎ বাটী ছিল। এই বাটীতে অতীতকালের কলিকাতার সর্ব্বময় কর্ত্তা, প্রেসিডেণ্ট বা গবর্ণর-সাহেব বাস করিতেন। প্রাচীন কলিকাতা-দুর্গের মধ্যেও

গবর্ণর-সাহেবের একটী সুন্দর আবাস-বাটী ছিল। কিন্তু অনেক সময়, তিনি দুর্গের মধ্যে না থাকিয়া, উদ্যান-পরিবেষ্টিত এই বাটীতেই বাস করিতেন। এই বাটী-সংলগ্ন বাগানটী, গঙ্গার ধার হইতে বরাবর লালদীঘি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে, নবাব কলিকাতা আক্রমণ করেন। ইহার পর বৎসর, লর্ড ক্লাইভ ও কর্ণেল ওয়াটসন কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন। সেই সময়ে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের এই বাড়িটী কোম্পানি বাহাদুরের "মেরিন্-ইয়ার্ডে" পরিণত হয়।

চর্চ্চ-লেনের পূর্ব্বে ও পুরাতন গোরস্থান অর্থাৎ সেণ্টজন-গির্জ্জার উত্তরে, হেয়ার-ষ্ট্রীট হইতে একটী ক্ষুদ্র গলি আরম্ভ হইয়াছে। এই গলিটীর নাম "গারষ্টিন্স-প্লেস"। মেজর-জেনারেল জন গারষ্টিনের নামে এই গলিটী প্রতিষ্ঠিত। এই গারষ্টিন সাহেবের তত্ত্বাবধানে ও প্ল্যান অনুসারে বর্ত্তমান টাউনহল নির্ম্মিত হয়। গারষ্টিন সাহেব—এই গলির মধ্যে, কতকগুলি দ্বিতল ও ত্রিতল বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া ভাড়া দিয়াছিলেন।

কয়লাঘাট ষ্ট্রীট।

ডালহৌসী-স্কোয়ারের পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ হইয়া, এই পথটী ষ্ট্রাণ্ড-রোডের সহিত মিশিয়াছে। এই রাস্তার ধারেই, কলিকাতার পুরাতন-কেল্লার পশ্চিম প্রাচীর ছিল। এই প্রাচীর নিকটে, গঙ্গাতীরে একটী ঘাট সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিল। তাহার নাম ছিল "কেল্লা-ঘাট"। এই কেল্লা ঘাটের অপভ্রংশ হইতে "কয়লাঘাট" দাঁড়াইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই ঘাট হইতেই জাহাজে করিয়া পাথুরিয়া-কয়লা চালান হইত। এজন্যও কয়লাঘাট নামকরণ হইতে পারে। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে, অপ্‌জনের ম্যাপে এই পথটী Tankshall টাঁকশাল ষ্ট্রীট নামে লিখিত হইয়াছে।

এইবার আমাদের লালদীঘির নিকট আসিতে হইবে। আজকাল লালদীঘির চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান, ডালহৌসী-স্কোয়ার নামে পরিচিত। আগে এই স্থানটীর নাম ছিল—ট্যাঙ্ক-স্কোয়ার। ডচ্ এডমিরাল ষ্ট্যাভেরিনস্ ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা দেখিতে আসেন। তিনি—তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিয়াছেন—"গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য, এই পুষ্করিণীটী খনিত হইয়াছিল। ইহার জল অতি পরিষ্কার ও পুষ্করিণীর তলদেশে কয়েকটী গুপ্ত প্রস্রবণ থাকায়, এই পুষ্করিণীর জল কখনও কমিয়া যায়

না। ইহার চারিদিকে কাঠের বেড়া দেওয়া। এই পুষ্করিণীতে সাধারণের স্নান করা নিষিদ্ধ।" ইংরাজাধিকারের প্রথম আমলে, এই লালদীঘির সাধারণ নাম ছিল—Green before the Fort" সেই সময়ে গড়েরমাঠ, চৌরঙ্গী ও এস্প্লানেড, ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সাহেবদের বেড়াইবার উপযুক্ত কোন স্কোয়ার বা ময়দান ছিল না। এই জন্য এই ট্যাঙ্ক স্কোয়ারই, তখন ইডেন-গার্ডেনের কাজ করিত। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে, এই পুষ্করিণী বৃহদায়তনে পরিণত হয়—ইহার চারিরিকে পাহাড় বা "পাড়" বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

লালদীঘির মধ্যেই, আকবরী-আমলের লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের কাছারী বাড়ী এবং—শ্যামরায়ের মন্দির ছিল। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের পাকা কাছারী বাড়িটীই কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক, কোম্পানীর সেরেস্তা রাখিবার জন্য কিনিয়া লয়েন। শ্যামরায়ের দোল উপলক্ষে, এই পুষ্করিণীর জল আবিরে লাল হইয়া যাইত। এইজন্য ইহার নাম "লালদীঘি" হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেবের পিতামহ, জন্ এণ্টনি বলিয়া একজন ফিরিঙ্গি, লক্ষ্মীকান্তের কর্ম্মচারী ছিলেন। একবার কয়েকজন ইংরাজ ফ্যাক্টার, ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায়, এই জন্ এণ্টনি তাহাদিগকে বাধা দেন। জব চার্ণক এই কথা শুনিয়া, সেই স্থানে আসিয়া এণ্টনিকে উত্তম করিয়া চাব্‌কাইয়া দিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ নির্ম্মিত হয় নাই।

বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্ট-অফিস ও লালদীঘির মধ্যে "চার্ণক-প্লেস।" লর্ড কর্জ্জন—কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব-চার্ণকের নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য—এই স্থানটী "চার্ণক-প্লেস" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান লিয়ন্স—রেঞ্জের উত্তর পশ্চিম দিকে—যে বাটীতে আজকাল ফিন্‌লে-মুর কোম্পানীর আপিস অবস্থিত, সেইস্থানে কলিকাতার প্রাচীন থিয়েটার-গৃহ ছিল। এই থিয়েটার-গৃহ ১৭৭৫ হইতে ১৮০৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। এই থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কেবল সখের-অভিনয় করিতেন। এই থিয়েটারের-মধ্যে, একটী প্রকাণ্ড বল-রূম ছিল। এইজন্য এই থিয়েটার-গৃহের একটু বিশেষত্ব আছে। থিয়েটার-সংলগ্ন বল-রূমে, সেকালে লাট-সাহেবদের বলনাচ প্রভৃতি হইত। গবর্ণমেণ্ট-হাউস বা লাটপ্রাসাদ তখন তৈয়ারি হয় নাই। লাট-সাহেবদের বল, ষ্টেট্-রিসেপ্সান ও ভোজ প্রভৃতি সবই এই থিয়েটার-গৃহেই হইত। এই সব—

অনুষ্ঠানের সাধারণ বিজ্ঞাপন, আমরা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। লর্ড কর্ণওয়ালিস ও লর্ড ওয়েলেসলির সময় পর্য্যন্ত, ইহা গবর্ণর-জেনারেলদের দরবার-গৃহরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ইহার পরই রাইটার্স-বিল্ডিংস্। এখনও এই সুবৃহৎ প্রাসাদ-তুল্য বাটীটি—বর্ত্তমান। পূর্ব্বে ইহা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সেকালের "রাইটার" বা সিভিলিয়ানদের বাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। তবে সে সময়ে ইহার বাহ্যিক সৌষ্ঠব এরূপ গৌরবময় ছিল না। অধুনাতনকালে, এই সুবৃহৎ বাড়িটী সম্পূর্ণ নূতনভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। রাইটার্স-বিল্ডিংসে, ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণরদিগের সর্ব্ববিভাগীয় কার্য্যালয় সংস্থাপিত ছিল। এখন ইহা বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের কার্য্যালয় হইয়াছে।

এই বাড়ীর যে গৃহটী, বঙ্গদেশীয় ছোটলাটগণের মন্ত্রণাসভারূপে ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ যে চূড়াময় গৃহটী বর্ত্তমানে হলওয়েল-স্মৃতিস্তম্ভের অতি সান্নিধ্যে, পূর্ব্বে এই স্থানাধিকার করিয়া কলিকাতার প্রথম গির্জ্জা, সেণ্ট এনস্ চর্চ্চ বর্ত্তমান ছিল। ১৭৩১ খৃঃ অব্দে এই গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ১৭৩৭ খ্রীঃ-অব্দের মহাঝড়ে, ইহার সুবৃহৎ চূড়াটী ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে নবাব সেরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, সে সময়ে দুর্গ-রক্ষার ও যুদ্ধকার্য্যের সুবিধার জন্য, এই গির্জ্জাটী সমভূমি করিয়া ফেলা হয়।

বর্ত্তমান রাইটার্স-বিল্ডিংসের পশ্চাতের পথটীর নাম "লিয়ন্স-রেঞ্জ"। টমাস লিয়ন সাহেবের নাম হইতে এই পথটীর নামকরণ হইয়াছে। ইনি পলাশী-আমলের লোক। সেরাজের আক্রমণ সময়ে, পুরাতন রাইটার্স-বিল্ডিংসের অস্তিত্ব ছিল না। যুদ্ধকালে গোলাগুলি চালাইবার সুবিধার জন্য, এইস্থানে অন্যান্য যে সব বাড়ী ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া সমভূমি করা হয়। ক্লাইভ কর্ত্তৃক কলিকাতার পুনরধিকারের পরও, বহুদিন পর্য্যন্ত এই সব জমী এবং ইহার পার্শ্বস্থ ভূখণ্ড পতিত অবস্থায় থাকে। ১৭৭৬ খ্রীঃ-অব্দে মিঃ লিয়ন, এই জমীখণ্ড পাট্টা করিয়া লয়েন। এই পাট্টা এখনও কলিকাতা-কালেক্টারীতে বর্ত্তমান। লিয়ন সাহেব, এই জমী পাট্টা করিয়া লইয়া, ইহার উপর প্রাসাদতুল্য এক প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করেন। প্রকৃত পক্ষে এ জমিগুলি, হেষ্টিংসের কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বারওয়েল সাহেবেরই বেনামে গৃহীত। লিয়ন সাহেব কেবল বেনামদাররূপে তাঁহার হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। কারণ ১৭৮০ খৃঃ অব্দে

কোম্পানী বাহাদুর, যখন তাঁহাদের অধীনস্থ জুনিয়ার সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী-দের জন্য এই বাড়ীটি ভাড়া লয়েন, তখন যে দলিল প্রস্তুত হয়, তাহাতে বারওয়েল সাহেবেরই নাম ছিল—লিয়নের ছিল না। কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য হেষ্টিংসের পরম শত্রু ফ্রান্সিস, তাঁহার ডায়ারির এক-স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—"বাৎসরিক ৩১৫৭২০৲ টাকা ভাড়ায় বারওয়েল সাহেব এই বাটীটি ভাড়া লইয়াছেন।" বহুদিন পর্য্যন্ত এই বাটীতে কোম্পানীর সেকালের সিভিলিয়ানেরা বাস করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণর স্যর এস্‌লি ইডেনের সময়, এই সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য বাটীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং এখনও ইহা সেই-ভাবেই আছে।

১৮০০ খৃঃ অব্দে, সুবিখ্যাত ফোর্ট-উইলিয়াম কালেজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। স্বনামধন্য গবর্ণর জেনারেল—লর্ড ওয়েলেসলি, সেকালের সিভি-লিয়ানদিগকে এ দেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য, এই কালেজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। আজ কালকার লালদীঘির কোণে, অর্থাৎ কাউন্সিল হাউস-ষ্ট্রীটের মোড়ে ও হংকং-সাংঘাই ব্যাঙ্কের পার্শ্বে যে বাড়িটী আছে, ইতিপূর্ব্বে যেখানে মেকিঞ্জি-লায়াল কোম্পানীর পুরাতন অফিস ছিল এবং পরে বেঙ্গল-নাগপুর-রেলের আপিস হয়—সেই বাটীতেই সেকালের ফোর্ট উইলিয়াম কালেজ প্রথম স্থাপিত হয়।

লালদীঘির অপর পারে—আজকাল যেখানে নিউম্যান কোং নাম-ধারী বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতার দোকান আছে—এইস্থানের ইতিহাসও একটু পুরাতন কালের। পলাশী-আমলে, এই জমী পতিত অবস্থায় ছিল। তৎপরে ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে হলওয়েলের সহকারী, পূর্ব্বোক্ত ওয়েষ্টন সাহেব এই জমী পাট্টা করিয়া লয়েন। সেই পাট্টায় লিখিত আছে—"ডিহি কলিকাতার অন্তঃর্ভুক্ত কোম্পানী-বাহাদুরের দখলীকৃত এক বিঘা ষোল কাঠা আন্দাজ জমী, ওয়েষ্টন সাহেবকে নিম্নলিখিত করারে পাট্টা দেওয়া হইল—যে তিনি ইহার উপর কোনরূপ এমারতাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। জমীটি কেবলমাত্র কাঠের বেড়া দিয়া রাখিবেন।" ওয়েষ্টন সাহেব পনর বৎসরকাল এই করার পালন করিয়া, ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে ইহা ছয় হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। তখনও এই করার পূর্ব্ববৎ বলবৎ থাকে। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে, মিঃ বারেটো ইহা ক্রয় করেন। তৎপরে আরও নয় বৎসরকাল, এই জমী পতিত অবস্থায় ছিল। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে,

দলিলের এই অদ্ভুত করারটীকে, প্রত্যাহার করা হয়। তাহার পর এই জমীর উপর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে, অ্যালপোর্ট কোং এই বাড়ী ভাড়া লয়েন। তৎপরে এই বাটীতে "বেঙ্গল-ক্লাব" স্থাপিত হয়। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে, এই জমী ও বাটী ৮২ হাজার টাকায় আবার বিক্রয় হয়। তৎপরে আরও দুই তিন হাত ফিরিবার পর, স্যর ওয়াল্টার ডিসুজা নামক একজন ধনী ইউরেশীয়ান, এই বাটী এক লক্ষ আশি হাজার টাকায় কিনিয়া, পরিশেষে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায়, ইহা হস্তান্তর করেন। এই সময়ে জমীর দাম প্রায় ষাইট্ গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বশেষে এই বাড়ীতে নিউম্যান-কোম্পানীর বর্ত্তমান কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ষ্টাণ্ডার্ড-বিল্ডিংএর পার্শ্বে ও ডালহৌসী-ইনস্টিটিউটের সম্মুখের ক্ষুদ্র গলিটী ভান্সিটার্ট-রো নামে বিখ্যাত। হলওয়েলের পর, ভান্সিটার্ট বাঙ্গালার গবর্ণর হন। তিনি কলিকাতা-কৌন্সিলের একজন জুনিয়ার সদস্য ছিলেন। লর্ড ক্লাইভের সুপারিসে, তিনি গবর্ণরী পদ পান। এই ব্যাপার লইয়া, তাঁহার সহযোগীরা বিলাত পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলেন। ভান্সি-টার্টের শাসনকালে—বঙ্গের শেষ নবাব, মীরকাসেমের অধঃপতন ঘটে। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাটনার ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটে। বিলাতে গিয়া ভান্সিটার্ট, পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টাররূপে নিযুক্ত হন। ভান্সিটার্ট, আরবী ও পারসী ভাষা ভালরূপ জানিতেন। এদেশের লোককে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন।

লালবাজার-ষ্ট্রীট।

লালবাজারের কোণে, বর্ত্তমান নর্টন-বিল্ডিংসের সম্মুখ হইতে, মিসন রো পথটী আরম্ভ হইয়া ম্যাঙ্গো-লেনে আসিয়া মিশিয়াছে। এখানে যে গির্জ্জাটী আজও বর্ত্তমান, তাহা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে নির্ম্মিত। জন্ জ্যাকরিয়া কারণাণ্ডার ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে এই গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। ভবিষ্যতে তাঁহার দেনার দায়ে, এই গির্জ্জাই "শীল" হইয়াছিল। গ্রাণ্টস্-লেনের পূর্ব্বকথিত গ্রাণ্ট সাহেব, ইহা কিনিয়া লয়েন। এই গির্জ্জাটী কলিকাতার অতি পুরাতন গির্জ্জা। এখন মিসন-রো ও ওল্ডকোর্ট-হাউস্-ষ্ট্রীটের মধ্যের ভূমিখণ্ডে—নিউম্যান কোং, করেন্সি আপিস, ওয়েষ্ট-এণ্ড-ওয়াচ-কোং, স্মিথ-ষ্টানিস্ ষ্ট্রীট-কোং প্রভৃতির যে বাড়ীগুলি বর্ত্তমান—১৭৫৬

খৃঃ অব্দে এগুলির অস্তিত্বমাত্র ছিল না। এজন্য লালদীঘির সীমা এই মিসন-রো পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, নবাব সেরাজ-উদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ সময়ে, এই স্থানে ইংরাজ ও নবাবপক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ বাধে। বর্ত্তমান স্কচ্-গির্জ্জার সন্নিকটে, মিসন-রোর পার্শ্বে একটী ব্যাটারী বা তোপখানা স্থাপিত হইয়াছিল। হলওয়েল এই স্থানে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, তৎপরে দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই মিসন-রো আগে "Rope-walk" নামে পরিচিত ছিল। লালবাজার ও মিসন-রোর কোণে, একটী বাড়ী ছিল—সেই বাড়ীটি প্রাচীন কলিকাতার পুরাতন থিয়েটার। নবাব-সৈন্য এই থিয়েটার-গৃহটী দখল করিয়া, তাহাদের আশ্রয়-কেন্দ্র করে। মিসন-রোর মধ্যে ১নং ও ৮নং বাড়িটী ঐতিহাসিক বাড়ী। ১নং বাড়ী অর্থাৎ যে বাড়ীটি, ঠিক ওল্ড-মিসন-চার্চ্চের সম্মুখে, সেই স্থানে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য, জেনারেল মন্সন বাস করিতেন। ৮নং বাড়ী যাহা এখন টমাস কোংর অফিস—সেই বাড়ীতে হেষ্টিংস-কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য, স্যর জন ক্লেভারিংএর মৃত্যু হয়। মনসনের মৃত্যু হুগলীতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত থিয়েটার-গৃহের কয়েকখানি বাড়ীর পরে—একটী বাড়ীতে লেডী রসেল বাস করিতেন। তাঁহার স্বামী স্যর ফ্যান্সিস্ রসেল ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা-—কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ, অলিভার ক্রমওয়েলের কন্যা লেডী ফ্রান্সেস, স্যর ফ্র্যান্সিস রসেলের মাতামহী ছিলেন। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণ সময়ে, লেডী রসেল, ফল্তায় পলায়ন করেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দেড় শতাধিক বৎসরের মধ্যে, এই স্থানগুলির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অনেকে নিত্য এই সব পথ অতিবাহিত করিয়া, আপিস, ব্যাঙ্ক ও কালেক্টারিতে যান—কিন্তু তাঁহারা জানেন—না, সেই পুরাকালে এই সমস্ত স্থান একদিন ভীষণ গোলাগুলি বর্ষণে, সমরক্ষেত্রের অংশরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।"

ম্যাঙ্গো-লেন্ বহুদিনের। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে, কাপ্তেন উইলস্ কলিকাতার যে নক্সা তৈয়ারি করেন, তাহাতে এই "ম্যাঙ্গো-লেনের" নাম লিখিত ছিল। বোধ হয়, এই গলিতে পথের ধারে, বা কোনস্থানে রসাল বৃক্ষের প্রাচুর্য্য জন্য, এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। ২৫ নং ম্যাঙ্গোলেন, অর্থাৎ যে বাড়ীতে আজকাল লায়াল-মার্শাল কোম্পানীর আফিস বসিতেছে, সেই বাড়ীটি পুরাকালে "ব্যাঙ্ক" ছিল। ব্যারেটো কোং, এই ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারী

ছিলেন। এখনও "ব্যারেটোস্-লেন" দ্বারা, এই ব্যারেটোর স্মৃতি সংরক্ষিত। জোসেফ্ ব্যারেটো, একজন ধনী পর্টুগীজ। তিনিই এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে এই ব্যাঙ্ক "ফেইল" হয়। জোসেফ্ ব্যারেটো, ইউরেশীয়ানদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। তিনি খুব ভালরূপ পারসী জানিতেন। মৃত্যুকালে তিনি অনেক টাকার সম্পত্তি, ধর্ম্মার্থে দান করিয়া যান।

ক্লাইভ্-ষ্ট্রীট।

লালদীঘির পূর্ব্বদিক ছাড়িয়া, এবার আমাদিগকে ক্লাইভ-ষ্ট্রীটে যাইতে হইবে। এই পথটী পলাশী-বিজেতা লর্ড ক্লাইভের স্মৃতিচিহ্ন। চিরকালই এই পথের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া আছে। কলিকাতার মধ্যে, ইহা অতি পুরাতন পথ। আজকাল যে বাটীতে রয়াল-এক্সচেঞ্জ বর্ত্তমান, লর্ড ক্লাইভ প্রথমে সেই বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস, এই বাটীতে বাস করেন। লর্ড কর্জ্জন এই বাড়ীটি প্রস্তরফলক দ্বারা চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সিসের আলিপুরেও একটী বাগানবাড়ী ছিল। এই বাগান-বাড়ীর বর্ণনাকালে ফ্রান্সিস্, বার্ককে লিখিয়াছিলেন (প্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড বার্কের পুত্র) "আলিপুরে আমার এক আবাস-বাটি আছে। সমগ্র বঙ্গদেশে সেরূপ সুন্দর বাড়ী আর নাই। আমি দেড়শত চাকর নিযুক্ত করিয়াছি। ঘোড়া গাড়ী সবই আছে। কিন্তু আমার কেমন একটা স্বভাবদোষ, যে আলিপুর হইতে কলিকাতায় গিয়া "হরণ" নামক ট্যাভার্ণে ক্লারেট-মদ্য দুই চারি গ্লাস না খাইলে, আমার মাথা ঠিক থাকে না।" সম্ভবতঃ ক্লাইভ-ষ্ট্রীটের এই বাড়ীতে, ফ্রান্সিস্ খুব কমই থাকিতেন। সেকালের কৌন্সিলের মেম্বর হইতে গবর্ণরেরা পর্য্যন্ত, দুইটী করিয়া বাড়ী রাখিতেন। বাগানবাড়ী সমূহ তাঁহাদের অতি প্রিয় ছিল। তাহার প্রমাণ হেষ্টিংসের হেষ্টিংস-হাউস্ ও লর্ড ক্লাইভের দমদমার বাগান-বাটী।

ফেয়ার্লি-প্লেস।

ফেয়ারলি-প্লেসের নাম, এখন আর কাহারও অপরিচিত নহে। প্রায় সহস্রাধিক কর্ম্মচারী এখন ফেয়ার্লি-প্লেসের ইষ্টইণ্ডিয়া রেল-আফিসে কাজ করেন। উইলিসন ফেয়ার্লি নামক এক সওদাগরের নাম হইতে, এই

পথের নামকরণ হইয়াছে। ইনি লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে বর্ত্তমান ছিলেন। ফেয়ার্লি সাহেব, সেকালের গবর্ণমেণ্টের পিল-খানার কণ্ট্রাক্টার ছিলেন। "হাতীর-খোরাক যোগান" একটা অসম্ভব ব্যাপার হইলেও, ইনি বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্টের সেনা-বিভাগে যে সকল হস্তী ও উষ্ট্র ছিল, তাহাদের খোরাক সরবরাহের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিলেন। বহুবার ইনি "গ্রাণ্ড-জুরীর" সদস্য হইয়াছিলেন। ফেয়ারলি গিলমার বলিয়া এক পুরাতন ইংরাজ সওদাগরী ফারমের, তিনি সিনিয়ার-পার্টনার বা অংশীদার ছিলেন। এই ফেয়ার্লি-প্লেসে, মিঃ ক্রুটেন-ডেনের উদ্যান-বেষ্টিত বিস্তৃত আবাস-বাটী ছিল। নবাবের কলিকাতা অবরোধের দ্বিতীয় রাত্রে, এই বাড়ী কামানের গোলায় অগ্নিদগ্ধ হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

ক্লাইভ-ষ্ট্রীটের একাংশ হইতে, ক্লাইভ-ঘাট-ষ্ট্রীট আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকে গঙ্গাতীরস্থ ঘাটটী, পূর্ব্বে "ব্লাইথস্‌-ঘাট" বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন গঙ্গাগর্ভ বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ডরোডের স্থান অধিকার করিয়া ব্যাপ্ত ছিল। এই "ব্লাইথস্‌-ঘাটের" চিহ্ন, উড্‌ সাহেবের ১৭৮৪ খৃঃ অব্দের ম্যাপে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে ইহা "ইস্মিথ্‌-ঘাটকা-রাস্তা" বলিয়া এ দেশীয় লোকের নিকট পরিচিত ছিল। কাপ্তেন ম্যাথ্যু স্মিথ, কোম্পানীর পোত-বিভাগে চাকরী করিতেন। পরে ইনি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া, হাবড়ায় একটী ডক নির্ম্মাণ করেন। এই স্মিথের নাম হইতেই "স্মিথ্‌-ঘাটকা-রাস্তা" নামকরণ হইয়াছিল। তাহার পরে, ইহা "ক্লাইভঘাট-ষ্ট্রীট" বলিয়া পরিচিত হয়।

ক্লাইভ ষ্ট্রীট ধরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, মেসার্স আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্সের সুবিখ্যাত ঔষধালয় পর্য্যন্ত গিয়া, আমাদের একবার বন্‌ফিল্ডের লেনে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বনফিল্ড লেন পুরাকালে, একটী পুরাতন রাস্তা। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে উডের ম্যাপে ইহার স্থান চিহ্নিত আছে। এই গলিতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে, মিঃ বন্‌ফিল্ড বলিয়া একজন প্রসিদ্ধ নীলাম-ওয়ালা বাস করিতেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শ্বশুড়াতে অনেক জমী জমা ছিল। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে ৫ই আগষ্ট তারিখে, সেকালের কলিকাতা গেজেটে, এই জমী নিলাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশ হইয়াছিল। "On Thursday the 2nd September next, will be sold by public outcry, by Mr Bonfield at his auction-room, if not before sold by private sale, that extensive piece of ground

belonging to Warren Hastings Esqr ; called Rishra (Ishara) situated on the Western Bank of the river, two miles below Serampur, consisting of 136 Bighas, 18 of which are Lakhrage-land or the land paying no rent." হেষ্টিংসের এই বাটীটি, একটী স্মৃতি-ফলক দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। এখন এই স্থানে "হেষ্টিংস-জুটমিল" স্থাপিত হইলেও ইহা এখনও ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের নাম ঘোষণা করিতেছে।

ক্যানিং-ষ্ট্রীট।

গঙ্গারধারে ষ্ট্রাণ্ডরোড হইতে আরম্ভ হইয়া, এই পথটী বরাবর চিৎপুর রোডে ফৌজদারী-বালাখানায় আসিয়া মিশিয়াছে। পূর্ব্বে ইহা "মুরগীহাটা" বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এখনও আছে। ভারতবর্ষের প্রথম ভাইস্‌রয় স্বনাম-প্রসিদ্ধ, লর্ড ক্যানিংএর নামে, এই পথটীর এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। পুরাকালে—এই অংশে, পর্টুগীজগণ বাস করিত। এখানে একটী বাজারে মুরগী-বিক্রয় হইত বলিয়া, "মুরগীহাট্টা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উডের ম্যাপে (১৭৮৪ খৃঃ) মুরগীহাট্টার অস্তিত্ব দেখা যায়। এই পথের সান্নিধ্যে, পর্টুগীজদিগের একটী পুরাকালের নির্ম্মিত গির্জ্জা আছে। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে অর্ম্মির ম্যাপেও এই গির্জ্জার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্ট্রাণ্ডরোডের পার্শ্বেই আরমানী-ঘাট। পুরাকালের এই আরমানী-ঘাট এখন মতিশীলের ঘাট বলিয়া পরিচিত। মহানুভব মতিলাল শীল, সামান্য অবস্থা হইতে নিজের উদ্যম ও প্রতিভা বলে ক্রোরপতি হন। তিনি কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ শীল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মতিলাল শীলের মত দাতা ও বদান্য লোক, এ যুগে অতি দুর্লভ। তিনি সেকালের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের অলঙ্কার-স্বরূপ ছিলেন। সামান্য শিশি-বোতলের ব্যবসা হইতে, তিনি পরিশেষে ক্রোরপতি হয়েন। বিলাতে জন্মিলে, তাঁহার কার্য্যময় জীবনের একটা ইতিহাস থাকিয়া যাইত। ধর্ম্মতলার পুরাতন-বাজারও স্বর্গীয় মতিলাল শীলের সম্পত্তি ছিল। মতি শীলের নাম, কলিকাতায় আজও সর্ব্বসাধারণে পরিচিত। তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ "শীলস্-ফ্রী-কালেজ।" কত দরিদ্র অবস্থাহীন ছাত্র যে এই বিদ্যালয়ে বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিয়া, ইহজীবনে অন্নসংস্থান করিতে পারিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান হ্যালিডে-ষ্ট্রীটে, মতিশীলের এই কালেজ-বাটী এখনও বর্ত্তমান। মতিবাবু, তাঁহার সমসাময়িক

কলিকাতার সর্ব্ববিধ হিতানুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। কলুটোলায় তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, এখনও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

মল্লিক-ঘাট, এই ষ্ট্রাণ্ড-রোডের উপর। হাবড়া পুলের নিকট ইহা অবস্থিত। বড়বাজারের মল্লিকবাবুরা, এই ঘাটটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। নয়ান মল্লিকের পুত্র রামমোহন বাবু, সাধারণের স্নানের জন্য এই ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। নয়ান মল্লিক, পলাশীর আমলের লোক। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর, কলিকাতার অধিবাসিগণের ক্ষতিপূরণ জন্য, যে কমিশন বসে, নয়ান মল্লিক সেই কমিশনে ছিলেন। তিনিও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, ৪৩৯২২৲ টাকা দাবি করিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানী-বাহাদুর ৫৯২২৲ টাকা মঞ্জুর করেন। লবণের ব্যবসায়ে ও জমী-জারাতের কাজে, নয়ান মল্লিক যথেষ্ট বিত্তসম্পন্ন হইয়া উঠেন। মৃত্যুকালে তিনি ক্রোর টাকা রাখিয়া যান।

রাজা উদমন্ত ষ্ট্রীট।

এই পথ বড়বাজারের মধ্যে। ক্লাইভ ষ্ট্রীট—হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ড-রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজা উদমন্ত সিংহ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা দেবী-সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও দেবী-সিংহ—নানা কারণে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, মহারাজা দেবীসিংহ বাঙ্গালার দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হন। উদ্‌মন্ত সিংহ, ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার অধীনে অনেক নগদী-সেনা ছিল। রেওয়া রাজার বিরুদ্ধে, গবর্ণমেণ্ট যে সময়ে অভিযান করেন, সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উদ্‌মন্ত সিংহ, কোম্পানীকে সেনা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। মুরশীদাবাদের নবাব-নাজিম আলিজার আমলে ১৮১০ হইতে ১৮২১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজা উদ্‌মন্ত, দেওয়ানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মুরশীদাবাদ নশীপুরের মহারাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর এই বংশাবতংশ। বর্ত্তমান নশীপুরাধিপতি বর্ত্তমানকালের একজন বিদ্যোৎসাহী, সর্ব্ব সৎকর্ম্মের পোষক ও লাট-কৌন্সিলের মেম্বর এবং সর্ব্বজন-জানিত ব্যক্তি।

হ্যারিসান রোড্।

হ্যারিসান-রোড্ কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরববান। চৌরঙ্গীর

শান্তভাব এখানে নাই বটে, কিন্তু এখানে যে সব প্রাসাদতুল্য ত্রিতল চতুস্তল ও পঞ্চতল বাটী আছে, তাহাদের নিকট চৌরঙ্গী এখন প্রাসাদ-সম্পদে পরাজিত। এই হ্যারিসান-রোড় লক্ষ্মীর আবাসস্থান—ইংরাজ-বাণিজ্যের সৌভাগ্য নিকেতন। কেন তাহা বোধ হয় খুলিয়া বলিতে হইবে না। হাবড়ার পুল হইতে আরম্ভ করিয়া, শিয়ালদহ পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। আর এই দীর্ঘ বিস্তারময় রাস্তার দুইধারে, অগণিত বাণিজ্য-বিপণী। ধরিতে গেলে হ্যারিসান রোড, মাড়োয়ারীদের সৌভাগ্য ও লক্ষ্মীলাভ-ক্ষেত্র। বড়বাজার কলিকাতার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বাজার। নানাবিধ পণ্য দ্রব্যপূর্ণ এত বড় বাজার ভারতের অন্য কোন নগরে আছে কি না সন্দেহ। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান, স্যর হেন্‌রি হ্যারিসনের নামে এই পথটীর নামকরণ হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক। ১৮৮৯ সালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়।

টিরেটা-বাজার ষ্ট্রীট।

চিৎপুর-রোডের উপর অবস্থিত, টিরেটা বা টেরিটিবাজার হইতে এই পথের নামকরণ হইয়াছে। এডওয়ার্ড টিরেটা নামক ভিনিস-দেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বাজারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে আমরা যে লটারির কথা বলিয়াছি, তাহার একটী বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় —১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই টিরেটা-বাজার এক "লটারিতে" উঠিয়াছিল। সেই বিজ্ঞাপনটী এই—"প্রথম প্রাইজ, এক সুবৃহৎ ও পাকাবাড়ী সমেত বাজার। ইহা এখন মিঃ টিরেটার দখলে আছে ও ইহার ভূমি পরিমাণ নয় বিঘা ও আটকাঠা।" এই বাজারের মধ্যে উত্তম বাঁধান পাকা রাস্তা, বারান্দাওয়ালা বাড়ী ও পাকা দোকান ঘর আছে। এই সম্পত্তির দাম, একলক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে টিরাটা-বাজারের এই দর ছিল। এখন কি হইয়াছে, একবার অনুমান করিয়া দেখুন। তখন টিরেটা-সাহেব এই বাজার হইতে মাসিক ৩৫০০৲ টাকা আয় দাঁড় করাইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই বহুমূল্য প্রাইজটী, ওয়েষ্টন সাহেবের অদৃষ্টে উঠে। এই ওয়েষ্টন সাহেবের লক্ষ্মী-ভাগ্য, হলওয়েল প্রদত্ত অর্থ হইতেই সূচিত হইয়াছিল। এই বাজার এখন বর্দ্ধমানাধিপের সম্পত্তি।

হরিণবাড়ী লেন।

২২নং টিরেটা বাজার ষ্ট্রীট হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্ব

হইতেই, এই স্থানটী "হরিণবাড়ী" বলিয়া পরিচিত। সম্ভবতঃ কলিকাতার বনজঙ্গলময় অবস্থার সময়, এই স্থানে প্রচুর হরিণ দেখা যাইত। এই লেনটী, উডের ম্যাপে (১৭৮৪ খ্রীঃ) অঙ্কিত দেখা যায়। এই হরিণবাড়ীর সান্নিধ্যে সেকালের পুরাতন জেলখানা ছিল। বর্ত্তমান লালবাজার পুলিসকোর্টের নিকট, সেখানে বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীট, বৌবাজার-ষ্ট্রীট, লালবাজার-ষ্ট্রীট্‌ ও চিৎপুর-রোড আসিয়া একটী চৌমাথায় পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে অপরাধীদিগকে ফাঁসী দেওয়া হইত। এখানে একটী poillry বা তুড়ুম-মঞ্চও স্থাপিত হইয়াছিল। এই তুড়ম-ওয়ালা শাস্তির সম্বন্ধে, আমরা সুপ্রীমকোর্ট প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছি।

সার্কিউলার রোড।

সর্কিউলার রোডের বিস্তৃতি, কলিকাতার অন্যান্য রাজপথের অপেক্ষা খুব বেশী। শ্যামবাজারের মোড় হইতে আরম্ভ করিয়া, বরাবর ইহা চৌরঙ্গীর পার্শ্ব দিয়া, ধরিতে গেলে একরূপ খিদিরপুর পুলের নীচে শেষ হইয়াছে। এই পথটীর দেশী নাম "বাহার-কা-সড়ক্‌" বা "বারসড়ক্‌"। যে সময়ে কলিকাতা ও তদুপকণ্ঠবর্ত্তী স্থানসমূহের সীমানা, লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে প্রথম বিঘোষিত হয়, সেই সময়ে ইহা সহর কলিকাতা বাহিরের সীমা ছিল। এই প্রাসাদময়ী রাজধানীর মধ্যে, এই পথটি দীর্ঘতায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। শ্যামবাজার হইতে বর্ত্তমান লাটগির্জ্জা পর্য্যন্ত, ইহার দূরত্ব তিন ক্রোশ। এই সার্কিউলার-রোডের যে বাড়িটী এখন ১৫৫ নম্বর বলিয়া চিহ্নিত, সেই বাটী স্বনামখ্যাত ইউরেশীয়ান কবি ও সুবিখ্যাত স্কুল-মাষ্টার ডিরোজিও সাহেবের বাটী। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণ বন্দ্যোঃ প্রভৃতি এই ডিরেজিওর ছাত্র। ডিরোজিও, তখনকার নব্য-বাঙ্গালীর চক্ষে আদর্শ শিক্ষক রূপে পরিগণিত ছিলেন। ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে, ভবিষ্যতে অনেকেই বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

বোণ্টস্‌-লেন।

অনেক পাঠক হয়ত এ ক্ষুদ্র গলিটীর অস্তিত্বই অবগত নহেন। রিপণ ষ্ট্রীটের ঠিক বিপরীত দিকে এই গলিটী বর্ত্তমান। এই বোণ্টস্‌ সাহেব কোম্পানীর আমলের একজন নামজাদা কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার

Considerations on Indian affairs নামক পুস্তকখানি তৎসাময়িক নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ইনি পলাশী আমলের লোক। ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে, কোম্পানীর কর্ম্মচারী হইয়াও, গুপ্তবাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া, তখনকার কর্ত্তারা, জোর করিয়া তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দেন। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পূর্ব্বোক্ত Considerations নামধেয় একখানি সুবৃহৎ পুস্তকের প্রচার করেন। এই পুস্তকে তিনি তৎকালীন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বোল্টস সাহেবের নাম হইতেই উক্ত গলির নামকরণ হইয়াছে।

কটন-ষ্ট্রীট।

কটন-ষ্ট্রীট, তুলাপটীর রাস্তা বলিয়া সর্ব্বজন পরিচিত। নামটী "কটন" হইলেও, ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রতিষ্ঠিত নহে। যদিও প্রাচীন কলিকাতার একজন প্রধান সেনাপতির নাম কটন ছিল, বড় লাটপাদরির নামও কটন ছিল, গবর্ণমেণ্টের একজন প্রধান সেক্রেটারির নামও কটন ছিল, তাহাহইলেও তাঁহাদের কাহারও নামে এই পথটীর নামকরণ হয় নাই। বহু পুরাকালে, জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা স্থাপনের অনেক পূর্ব্বে, এই স্থানে তুলা ও সুতার দোকান-পাট ছিল এবং নিত্য হাট হইত। এই জন্য ইহা সেই পুরাকালে "রুয়েহাটা" (রুই—হিন্দুস্থানী শব্দ, অর্থ তুলা) বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তাহার ইংরাজী নাম কটন-ষ্ট্রীট ও বাঙ্গালা নাম তুলাপটী।

ফিয়ার্স-লেন।

এই গলিটী সম্পূর্ণ আধুনিক। ফিয়ার্স-লেন নাম হইবার পূর্ব্বে, ইহার পুরাতন নাম আর কিছু ছিল কিনা, তাহা আমরা জানিনা। কলিকাতা হাইকোর্টের পিউনীজজ স্যর জন বড্ ফিয়ার্সের নামে এই পথটীর নামকরণ হইয়াছে। স্যর জন ফিয়ার ১৮৬৪ হইতে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জজীয়তী করেন। ইহার পর তিনি সিংহলদ্বীপের চিফ্‌জষ্টিস্ নিযুক্ত হইয়া ভারত ত্যাগ করেন। এ দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর, তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তৎকালীন বাঙ্গালীরা, এই জন্য ইহঁাকে শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষে দেখিতেন।

আমহার্ষ্ট-ষ্ট্রীট।

বহুবাজার-ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়া, ইহা সরাসর মাণিকতলা ষ্ট্রীটে

গিয়া মিশিয়াছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট যে যে স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীগণের বাস। এই পথের ৮৫নং বাটীতে স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায় বাস করিতেন। ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, তিনি ১১৩ নং সার্কিউলার রোডে বাস করিয়াছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের পনের বৎসর পরে, রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে, ব্রিষ্টলে এই অতুল প্রতিভাবান, ধর্ম্ম-সংস্কারকের দেহান্ত হয়। এখনও ব্রিষ্টলে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ বর্ত্তমান। এই রাস্তার সন্নিকটেই সুপ্রসিদ্ধ লং সাহেবের পুরাতন গির্জ্জা বর্ত্তমান। পাদরী লং-সাহেব, বাঙ্গালীদের উপকারার্থে, অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধুর অমর-লেখনী-প্রসুত, নীল-দর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া, ইনি হাইকোর্টে অভিযুক্ত হন। তাহাতে ইঁহার অর্থদণ্ড হয়। মহাভারতের অনুবাদক স্বনামধন্য ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, এই জরিমানার টাকা প্রদান করিয়া লং-সাহেবকে কারাদণ্ড হইতে উদ্ধার করেন।

এই আমহার্ষ্ট—ষ্ট্রীটের ৩২ নম্বরের বাড়ীর নিকট হইতে, "ক্যারিস্-চর্চ্চ-লেন" নামে আর একটী গলি চলিয়া গিয়াছে। ক্যারি, শ্রীরামপুরের স্বনাম প্রসিদ্ধ মিশনরী-সম্প্রদায়ের অন্যতম। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে, রেভারেণ্ড ক্যারি, সর্ব্বপ্রথমে এ দেশে আসেন। এরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায়পূর্ণ মিশনরী, বোধ হয় এদেশে আর দ্বিতীয় কেহ আসেন নাই। ক্যারি সাহেব, ব্যাপ্টিষ্ট-মিশনভুক্ত লোক ছিলেন। এই মিশনের অবস্থা তখন তত উন্নত ছিল না। ক্যারি সাহেবের পরিবারে, তাঁহার স্ত্রী, চারিটী পুত্র এক শ্যালিকা। এই সোসাইটীর নিকট হইতে তিনি মোটে পঞ্চাশটী টাকা বৃত্তি পাইতেন। কাজেই ইহাতে তাঁহার দিন চলিত না। এই জন্য ক্যারি সাহেব, সুন্দরবনের মধ্যে হোসেনাবাদ নামক একস্থানে গমন করেন। এখানে তিনি স্বহস্তে হলচালনা করিয়া কৃষিকার্য্য করিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার বিশেষ কিছু সুবিধা না ঘটায়, মালদহের উড্‌নী সাহেবের অধীনে, তিনি এক চাকুরী গ্রহণ করেন। এই স্থানে, তিনি উড্‌নী সাহেবের ফ্যাক্‌টারিতে কাজ করিতেন ও অবসর কালে বাইবেল বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও প্রচারকার্য্য করিয়া দিন কাটাইতেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও স্বনামখ্যাত জন মার্শমান সাহেব, এদেশে মিশনরীরূপে আসিয়া, শ্রীরামপুরে এক গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে ক্যারি সাহেবকে তাঁহারা মালদহ হইতে আনাইয়া লয়েন।

১৮০৭ খৃঃ অব্দে ফোর্ট-উইলিয়াম-কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ক্যারি-সাহেব এই কলেজে, সাহেবদিগকে বাঙ্গলাভাষা শিখাইবার ভারপ্রাপ্ত হন। শ্রীরামপুরেই এই ক্যারি সাহেবের মৃত্যু হয়।

এণ্টনি-বাগান-লেন।

এণ্টনি-বাগান-লেনের একটু প্রাচীন ইতিহাস আছে। এণ্টনি সাহেবের নামে, এই গলির নামকরণ হইয়াছে। এই এণ্টনি সাহেব, জবচার্ণকের আমলের লোক। এণ্টনি সাহেব, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার বা বড়িশার সাবর্ণ-জমীদারদের আদিপুরুষের, কাছারির একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তখন কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রামের ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী মৌজার সত্ত্বাধিকারী ছিলেন—বিদ্যাধর রায়। মজুমদার ইহাদের নবাবী-আমলের উপাধি। তৎপরে ইহাঁরা রায়চৌধুরী উপাধিলাভ করেন। বিদ্যাধরের পুত্র রামচাঁদ, ১৬২৮ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে কলিকাতা সুতালুটী ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয় বিক্রয় করেন। তখন নবাব মুরশীদ কুলিখাঁর আমল। নবাব, এই গ্রামত্রয় ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিতে তদধি-কারীগণকে নিষেধ করিলেও, রামচাঁদ তাহা শোনেন নাই। ভবিষ্যৎ কলিকাতা মহানগরীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, এই তিন খানি গ্রাম লইয়াই হইয়াছিল। একা রামচাঁদ নহেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আরও চারিজন জ্ঞাতি, ইংরাজদিগকে এই গ্রামগুলি বিক্রয় করেন।

বিদ্যাধরের কাছারিবাড়ী ছিল, বর্ত্তমান লালদীঘির পার্শ্ববর্ত্তী, এক ভূখণ্ডে। কাছারী বাড়িটী পাকা-কোঠা। তখন এস্থানে আর একখানিও পাকা কোঠা ছিল না। জবচার্ণক দেখিলেন—উপযুক্ত কোঠাবাড়ীর অভাবে, কোম্পানীর পুরাতন সেরেস্তাগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তিনি অগত্যা বিদ্যাধরের এই পাকা-কোঠাটি কিনিয়া লইলেন। কোঠা, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার প্রথম রেকর্ড-রুম হইল।

সেই পুরাকালে—এই কাছারী-বাড়ির নিকট, সাবর্ণদের প্রতিষ্ঠিত শ্যাম-রায় বিগ্রহের ঠাকুরবাড়ী ছিল। এই শ্যামরায়, পরে কালীঘাটে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ, সুপণ্ডিত মিঃ এ, কে, রায় বলেন—"এই শ্যামরায়ের দোল পর্ব্বোপলক্ষে লালদীঘির জল আবিরে লাল হইয়া যাইত। এইজন্য লালদীঘির এইরূপ নামকরণ।" পূর্ব্বোক্ত এণ্টনি সাহেব বিদ্যাধরের ম্যানেজার ছিলেন। দোল উপলক্ষে মহাসমারোহ হইত। লালদীঘিতে

একবার এই দোলের সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর জনকয়েক ফ্যাক্‌টার শ্যামরায়ের ঠাকুরবাড়ীতে জোর করিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন। এণ্টনি সাহেব, তাহাদিগকে ঢুকিতে দেন নাই। কথাটা জবচার্ণকের নিকট পৌঁছিলে, তিনি ঘোড়ার চাবুক লইয়া এণ্টনিকে প্রহার করেন। তাহার পর বিবাদ মিটিয়া যায়। ইহার পর হইতে, এণ্টনি সাহেব কলিকাতা ছাড়িয়া কাঁচড়াপাড়ায় বাস করেন। এখনও কাঁচড়াপাড়ায়, এণ্টনি সাহেবের বাড়ী ও হাটের স্থান লোকে দেখাইয়া দেয়। এই এণ্টনি সাহেবের পৌত্রই, বিখ্যাত কবিওয়ালা ফিরিঙ্গি-এণ্টনি।

চিৎপুর-রোড।

চিৎপুর-রোড, কলিকাতার একটী অতি পুরাকালের পথ। মোগল বাদসাহদিগের আমল হইতে এই পথটীর অস্তিত্ব। তখন ইহার দুই পার্শ্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যস্থলে, অপ্রশস্ত বনপথ। এই পথে যাত্রীরা, কাপালিক এবং শাক্ত-সন্ন্যাসীরা, সেই পুরাকালে চিত্রেশ্বরী-ঠাকুর দেখিয়া, জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন চৌরঙ্গীর মধ্য দিয়া, কালীঘাটে যাইতেন। হলওয়েল, এই পথটীর একাংশকে a road leading to Collegot বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চিত্রেশ্বরীর নাম হইতেই, এই পথটীর নাম "চিৎপুর" হইয়াছে। চিত্রেশ্বরীর মন্দির বহুকালের। স্বনামপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেবের আমলের, ব্লাকজমীদার গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় এই মন্দিরটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দেন। গোবিন্দরাম মিত্র, কুমারটুলির মিত্রগণের আদি-পুরুষ। পুরাতন কলিকাতার মধ্যে, তিনি একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তাঁহার নবরত্ন, আজও তাঁহার কীর্ত্তি-ঘোষণা করিতেছে। ১৭৩৭ অব্দের ঝড়ে, এই নবরত্নের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার বাড়ীর দুর্গোৎসবও, সেকালের কলিকাতার এক দর্শনীয় জিনিস ছিল। এই গোবিন্দরাম, কলিকাতার ব্ল্যাক-জমীদার ও সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। চোর ডাকাতেরা, তাঁহার নাম শুনিলে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। নবাব সেরাজ-উদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা লুঠ করেন, সেই সময়ে গোবিন্দরাম নিজের বরকন্দাজ ও কোম্পানীর কয়েকজন সিপাহী লইয়া নিজের সম্পত্তি রক্ষা করেন। অন্যান্য বাঙ্গালীদের মত, তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই। এই সুপ্রসিদ্ধ মিত্রবংশের এক শাখা, কাশীধামে প্রাসাদতুল্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া আজও বসবাস করিতেছেন।

এই চিৎপুর রোডের বিস্তৃতি ধরিতে গেলে—বহুদূর ব্যাপী। একদিকে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গীরোড, রসারোড ও অন্যদিকে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোড। সেকালে মুর্শিদাবাদ নবাবী-কেন্দ্র হইতে এই পথই কলিকাতা, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের প্রধান বর্ত্ম ছিল। বর্ত্তমান ফৌজদারী-বালাখানায় নবাবী-আমলে, ফৌজদারের কাছারি হইত। হুগলী তখন নবাবী শাসন-কেন্দ্রের একটী প্রধান অংশ ছিল। মুর্শিদাবাদের নীচেই—হুগলী। হুগলীতে একজন ফৌজদার থাকিতেন। ধরিতে গেলে, ফৌজদার দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। এই ফৌজদারের প্রতিনিধি যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন তিনি এই ফৌজদারী-বালাখানতেই থাকিতেন।

বৌবাজার ও বৈঠকখানা।

লালবাজারের মোড় হইতে আরম্ভ হইয়া, এই রাস্তা বরাবর পূর্ব্বদিকে শিয়ালদহের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। আগে অর্থাৎ পলাশী আমলে এই পথের দুইধারে বড় বড় গাছ ছিল। ইহা সেকালে Avenue to the Eastward বলিয়া পরিচিত হইত। এই পথের ধারে শিয়ালদহের নিকট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "বৈঠকখানা-বৃক্ষ।" পূর্ব্বে এইস্থানে একটী বৃহৎ বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের শান্ত-শীতল ছায়াতে, নানাস্থানের ব্যবসায়ীরা, অর্থাৎ যাহারা পুরাকালের কলিকাতায় বাণিজ্যার্থে যাতায়াত করিত, মনের আনন্দে বিশ্রাম করিত। প্রবাদ আছে, কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকও এই বৃক্ষতলে বসিয়া, বিশ্রামকালে প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় পাইপ টানিতেন। এ "বৈঠকখানা-বৃক্ষ" বহুদিন লোপ হইয়াছে। কিন্তু বৈঠকখানা নামটী আজও বর্ত্তমান। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলেও, এইস্থান "বৈঠকখানা" বলিয়া পরিচিত ছিল।

বহুবাজারের নাম—স্বনাম-প্রসিদ্ধ এই বাজার হইতেই হইয়াছে। বহুবাজারের প্রসিদ্ধ মতিলাল বংশের আদিপুরুষ, বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয়, তাঁহার এক পুত্রবধূকে এই বাজারটী দান করেন। "বধূবাজার" এই কথা হইতে "বহুবাজার" ও ক্রমশঃ তদপভ্রংশ "বৌবাজার" নামকরণ হইয়াছে। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দের ম্যাপে, লালবাজার হইতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত এই সমস্ত পথটী "বৈঠকখানা-রোড" বলিয়া চিহ্নিত ছিল। এই বৈঠকখানা-বৃক্ষটী অপজানের ম্যাপেও চিহ্নিত ছিল। আজকাল যে স্থানে শিয়ালদহ রেল-ষ্টেশন হইয়াছে, সেই স্থানেই বৈঠকখানা

গাছটী ছিল। এই বৈঠকখানাতেই "ব্রেড-এণ্ড-চিজ্" বাঙ্গালো বলিয়া সেকালের ইংরাজদের সুপ্রসিদ্ধ আড্ডা-গৃহটী বর্ত্তমান ছিল। এই বাঙ্গালোটী, কলিকাতার একটী বিখ্যাত ট্যাভারন্—বা সেকালের সাহেবদের জমায়তের আড্ডা। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে হিকিজ গেজেটে, এই বাঙ্গলা বিক্রয় সম্বন্ধে এক বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈঠকখানা অঞ্চলে, অনেক বাঙ্গালী বাস করিতেন। তবে বাঙ্গালী অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা এ অঞ্চলে যেন কিছু বেশী ছিল। পূর্ব্বে আমরা, মহরমের ও দুর্গাপূজার সময়, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে দাঙ্গার কথা বলিয়াছি—তাহা হইতেই প্রমাণ হয়—এ অঞ্চলে পলাশী-আমলের ৩০ বৎসর পরে অনেক লোকের বসবাস হয়। গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেব ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে "মাদ্রাসা বা পার্শিয়ান-কলেজ" স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসা সর্ব্বপ্রথমে এই বৈঠকখানাতেই স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে, এই বহুবাজার অঞ্চলে, অনেক সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র বাঙ্গালী বসবাস করেন। চিৎপুর রোডের ন্যায় বৌবাজার-ষ্ট্রীটও সর্ব্বদা জনপূর্ণ। ইহার দুইধারে, অলি-গলিতে, নানাস্থানে প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা সমূহ—নির্ম্মিত হওয়ায় ইহা যথেষ্ট জনপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বড়বাজারের মত, অনেক দোকান-পাট এখন এই পথের দুই পার্শ্বে বর্ত্তমান। বহুবাজার এখন কলিকাতার একটী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত-পল্লী।

শোভাবাজার রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

মহারাজ নবকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বড় বড় ইংরাজ ঐতিহাসিক অর্থাৎ অর্ম্মি, মিল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ, এই বাঙ্গালী-শ্রেষ্ঠের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। নবকৃষ্ণের দোষগুণ অনেক ছিল। কিন্তু তিনি যে সেকালের একজন প্রতিভাবান ও ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সত্য বটে, তিনি নন্দকুমারের ঘোর শত্রু ছিলেন—সত্য বটে, জীবনের অনেক কাজে তিনি ভ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি যে একজন সর্ব্বজন মান্য লোক ছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। সেকালের বাঙ্গালী, ইংরাজী জানিতেন না—নবকৃষ্ণ চেষ্টা করিয়া ইংরাজী ভাষায় দখল লাভ করেন। পারসী ও উর্দ্দুতে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে তিনি পারসী পড়াইতেন। পলাশী-সমরের সময়

মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর।

(শোভাবাজার রাজবংশের স্থাপয়িতা।)

তিনি ক্লাইভের সঙ্গে ছিলেন। যে সময়ে মুরশিদাবাদে সেরাজের ভাণ্ডার লুঠ হয়, সে সময়ে নবকৃষ্ণ—মুরশিদাবাদে। লর্ড ক্লাইভের চেষ্টাতেই, তাঁহার পদোন্নতি হয়। তিনি প্রথমে কোম্পানী-বাহাদুরের দ্বিভাষির কাজ করেন। তৎপরে তিনি কোম্পানীর "পলিটিকাল-বেনিয়ান" পদে উন্নীত হন। ধরিতে গেলে, শেষোক্ত পদটী অনেকটা বর্ত্তমানকালের ফরেণ-সেক্রেটারীর মত। নবাব সেরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর—গভর্ণর ড্রেক প্রভৃতি যখন ফল্‌তায় পলায়ন করেন—তখন, অসীম সাহস অবলম্বনে মহারাজ নবকৃষ্ণ নৌকা বোঝাই করিয়া, গবর্ণর ও তাঁহার সঙ্গীগণের জীবনরক্ষার্থে গোপনে খাদ্যাদি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। একদিকে নবকৃষ্ণ ও অন্যদিকে চুঁচুড়ার ডচেরা, যদি বিপন্ন ইংরাজদিগকে এই সময়ে সাহায্য না করিতেন—তাহা হইলে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। পরবর্ত্তীকালে মহারাজ নবকৃষ্ণ, ক্লাইব ও হেষ্টিংসের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন। তখন গবর্ণরের দেওয়ান আর মুন্সী নবকৃষ্ণই প্রাচীন কলিকাতার মধ্যে বড়লোক ছিলেন। ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে গভর্ণরের দেওয়ান, রামচাঁদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে দেওয়ানজী রামচাঁদ, সাড়ে বার লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, নবকৃষ্ণ মুন্সী কোম্পানীর নিকট ষাটটী মাত্র মুদ্রা মাসিক বেতন পাইতেন। কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধে নবকৃষ্ণ বাহাদুর, নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ইহা হইতেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ অনুমান করিয়া লউন। একবার মহারাজ নবকৃষ্ণ, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে এক লক্ষ টাকার জমীদারী দান করেন। কিন্তু তর্কপঞ্চানন মহাশয় "বিষয়-বিষ ও উহাতে আমাকে মাটী করিবে" বলিয়া সে দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

পলাশী-যুদ্ধের পর, কলিকাতার অধিবাসীদের যখন ক্ষতিপূরণের টাকা ও এওয়াজি জমী দেওয়া হয়—সেই সময়ে কুমারটুলি অঞ্চলে নবকৃষ্ণ অনেক জমী পান। নবকৃষ্ণের উন্নতির সহিত, এই সকল স্থান ক্রমশঃ ভদ্রলোকের বসবাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে নবকৃষ্ণের বংশধরেরা এই শোভাবাজারের অর্দ্ধেক অংশ অধিকার করিয়া আছেন।

শোভাবাজার, সভাবাজার ও সুবাবাজার, এই তিন প্রকারে ঐতিহাসিক ও কলিকাতার প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ, "শোভাবাজার" নামের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে কারণেই এই শোভাবাজার নাম হউক না কেন, শোভাবাজার যে নবকৃষ্ণের জন্য জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল, এই সিদ্ধান্তে কোন

সন্দেহই নাই। যে পথটী আজকাল গ্রে-ষ্ট্রীট নামে পরিচিত ও যাহা সার্কিউলার রোডে গিয়া মিশিয়াছে, এইরূপ প্রবাদ, যে এই সুদীর্ঘ পথটী মহারাজ নবকৃষ্ণের ব্যয়েই নির্ম্মিত। এখন আর একটী তদপেক্ষা কম প্রশস্ত পথ "মহারাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট" বলিয়া সাধারণে পরিচিত। মহারাজ নবকৃষ্ণের পুত্রদ্বয় রাজা রাজকৃষ্ণ ও রাজা গোপীকৃষ্ণের নামেও দুইটী লেন এখনও বর্ত্তমান। শোভাবাজার রাজবাটী প্রসঙ্গে পাঠক মহারাজার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।

নবাবী-আমলে রাজা রাজবল্লভ, ঢাকার ডেপুটী-গবর্ণর ছিলেন। কি জন্য তাঁহার সহিত নবাব সেরাজউদ্দৌলার মনোমালিন্য ঘটে, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস, ইংরাজ-গবর্ণর ড্রেকের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন, আর এই ব্যাপার লইয়া, নবাবের সহিত ইংরাজদের মনোমালিন্য ঘটে ও নবাব ইংরাজদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করেন, সে সব কথা এ স্থলে পুনরুল্লেখ করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।* ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই রাজা রাজবল্লভ হইতেই এই পথের নামকরণ হইয়াছে।

বাগবাজার-ষ্ট্রীট।

বাগবাজার কলিকাতার মধ্যে অতি পুরাতন স্থান। বহুকাল হইতেই এ অঞ্চলে—অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করিয়া আসিতেছেন। বাগবাজার-ঘাট হইতে বাগবাজার ষ্ট্রীটের আরম্ভ। আগে এই ঘাট—রঘুমিত্রের ঘাট বলিয়া পরিচিত ছিল। রঘুমিত্র,—হলওয়েলের আমলের নামজাদা ব্ল্যাক—জমীদার, গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র। বাগবাজারের নামের সহিত—"বাঘের" কোন সংস্রব নাই। আগে এখানকার জঙ্গলে যে বাঘ বাস করিত, আর সেই জন্যই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে—তাহা নয়। "বাগ" অর্থাৎ বাগান হইতে, সম্ভবতঃ এই নামোৎপত্তি। এই স্থানে পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বে "পেরিন্‌স্-গার্ডেন" বলিয়া

* যাঁহারা সেরাজের সহিত কি কারণে ইংরাজদের মনোমালিন্য ঘটে, তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত জানিতে চান—তাঁহারা মিঃ হিলের Bengal in 1756—87 নামধেয় তিন ভলম গ্রন্থগুলি পাঠ করিবেন। ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠক, কালীপ্রসন্ন বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ও অক্ষয়বাবুর সেরাজউদ্দৌলা ও নিখিলবাবুর মুরশীদাবাদ-কাহিনী পাঠ করুন।

একটী বাগান ছিল। পেরিং-বাগান যখন নির্ম্মিত হয়, তখন ক্লাইভ মান্দ্রাজে রাইটারি করিতেন, আর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সবে মাত্র কাশিম-বাজারের কুঠীতে কোম্পানীর চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছেন। নবাব সেরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে, এই Perrin's Garden ইংরাজদের সখের—ভ্রমণের স্থান ছিল। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে হলওয়েল সাহেব, কলিকাতায় যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বাগবাজারের নামোল্লেখ ছিল। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে এই বাগবাজার অঞ্চলটী কোম্পানী বাহাদুর প্রজাবিলি করেন। কিন্তু এই প্রজা যে কে, তাহার নাম পাওয়া যায় না। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দের উডের ম্যাপেও বাগবাজারের নামোল্লেখ ও স্থাননির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে কোম্পানী বাহাদুর গঙ্গার উপর চৌকী দিবার জন্য বাগবাজার সান্নিধ্যে ৩৩৮৲ টাকা ব্যয়ে এক রক্ষামঞ্চ প্রস্তুত করেন। এই স্থানে স্বল্প সংখ্যক গোরা ও কয়েকজন দেশীয় সেনা, এন্সাইন পিকার্ডের অধীনে, নবাব কর্ত্তৃক এই স্থান আক্রমণ সময়ে (১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দ) মহা সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছিল। বর্ত্তমান বাগবাজার ষ্ট্রীট, পুরাকালে "গন্পাউডার-ফ্যাক্টরী-রোড" বলিয়া পরিচিত ছিল। যেখানে বাগবাজার ষ্ট্রীট আজকাল চিৎপুর রোডে মিশিয়াছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। পেরিংস-গার্ডেনের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত সাধারণ রাস্তা ছিল, উহা বর্ত্তমান হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার পর বাগানের দক্ষিণদিক দিয়া, একটী সুড়িপথ-মাত্র চিৎপুর রোডে গিয়া মিশিয়াছিল। হলওয়েল সাহেব ১৭৫২ খৃঃ অব্দের ১১ ডিসেম্বর, কোম্পানীর নিকট হইতে ইহা প্রকাশ্য নীলামে ক্রয় করেন। তৎপরে এই স্থানে বারুদখানা তৈয়ারি হয়।

শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

শ্যামবাজার ষ্ট্রীট নামকরণ কেন হইল, তৎসম্বন্ধে একটু মত বিভিন্নতা দেখা যায়। অনেকে বলেন—পলাশী-আমলের সুপ্রসিদ্ধ শোভারাম বসাকের, শ্যামরায় বিগ্রহের নাম হইতে "শ্যামবাজার" হইয়াছে। হলওয়েলের তালিকা মধ্যে, এই স্থান "চার্লস-বাজার" বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ গৌরদাস বাবু, শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর ইত্যাদি নাম-করণের, কারণ এই শ্যামরায় ঠাকুর ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। অর্ম্মির ম্যাপে শ্যামবাজার ও শ্যামপুকুর স্পষ্টভাবে চিত্রিত। কিন্তু নব্যভারতের

প্রবন্ধ লেখক প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের ধারণা অন্যরূপ। তিনি বলেন—"পূর্ব্বে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ এ অঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর সান্নিধ্যে, তাঁহার নিজব্যয়ে খনিত, দীঘির নামই শ্যামপুকুর। শ্যামবাজারও তাঁহারই সম্পত্তি।" ইহাই যেন সঙ্গত সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। শ্যামবাবুর পুত্র মনোহর মুখোপাধ্যায় এই পল্লীর সান্নিধ্যে একটী বালাখানা বা বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অর্ম্মির ম্যাপে উক্ত বালাখানার চিত্র অঙ্কিত আছে। এখনও এই স্থান "বালাখানা-ষ্ট্রীট" বলিয়া পরিচিত। এই সকল কারণে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর সিদ্ধান্তই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট।

নন্দরাম সেন কলিকাতার একজন প্রাচীন অধিবাসী। কুমারটুলী ওয়ার্ডে, তাঁহার নাম সংযুক্ত এই গলিটী আজও বর্ত্তমান। এই নন্দরাম সেন কোম্পানীর প্রথম আমলে গোবিন্দরাম মিত্রের ন্যায় একজন ব্ল্যাক-ডেপুটী ছিলেন। ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় প্রথম কালেক্টার নিযুক্ত হন—রাল্‌ফ শেল্‌ডন্। নন্দরাম বাবু, এই শেলডনের সহকারী ছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী কালেক্টার, বেঞ্জামিনবৌচার তহবিল তছরূপ অভিযোগে, সেনজাকে পদচ্যুত করেন। ১৭০৭ খৃঃ অব্দের পর, নন্দরাম পুনরায় পূর্ব্বপদে নিয়োজিত হন। তহবিল তছরূপ অপরাধে, কোম্পানী যে সময়ে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করেন, সেই সময়ে তিনি, হুগলির মুসলমান ফৌজদারের নিকট পলায়ন করেন। কিন্তু ইংরাজ-কোম্পানির অধ্যক্ষ, হুগলীর ফৌজদারকে লিখিয়া, পুনরায় তাঁহাকে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় কলিকাতায় আনেন ও কারাবদ্ধ করেন। পরিশেষে নন্দরাম, কোম্পানীর দাবির টাকা দিয়া কারামুক্ত হন। "রথতলা-ঘাট" ইঁহারই নির্ম্মিত।

অভয়চরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

অভয়চরণ মিত্র মহাশয়, ব্লাক্-জমীদার গোবিন্দরামের বংশধর। অভয়বাবু ২৪ পরগণার কলেক্টার সাহেবের অধীনে দেওয়ানী করিতেন। প্রবাদ এই, তাঁহার গুরুকে তিনি লাখ টাকা দান করিয়াছিলেন।* কুমারটুলীর মিত্র-পরিবার বরাবরই ধনাঢ্য। অভয়চরণের পূর্ব্বপুরুষ

* হাটখোলার দত্ত পরিবারের কোন মহাত্মার সম্বন্ধে, গুরুকে এইরূপ লাখ-টাকা দিবার একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।

গোবিন্দরাম মিত্র পলাশী আমলে একজন খুব নামজাদা লোক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি।

কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।

এই কালীপ্রসাদ দত্তের পিতার নাম—চূড়ামণি দত্ত। কালীপ্রসাদের নামেই বর্ত্তমান রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। মহারাজ নবকৃষ্ণ, তখন নূতন বড় মানুষ, আর চূড়ামণি তাঁহার পূর্ব্বের বড়লোক। উভয়েই স্ব স্ব দলস্থ ব্যক্তি-গণের অধিনায়ক ছিলেন। নবকৃষ্ণের দলকে "রাজার-দল" বলিত। চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের সময়, একটা গোলমাল ঘটায় ও নবকৃষ্ণ তাঁহার দলস্থ কায়স্থ-গণকে সভাক্ষেত্রে যাইতে নিষেধ করায়, কালীপ্রসাদ,—বড়িশা-বেহালার তৎকালীন বিখ্যাত সাবর্ণ-চৌধুরী জমীদার সন্তোষরায়ের শরণাপন্ন হন। সন্তোষরায় স্বদলস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে লইয়া কালীপ্রসাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া এই মহাদায় হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। মহা বিপদ• হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কালীপ্রসাদ সন্তোষরায়ের সমভিব্যাহারি ব্রাহ্মণদের বিদায় ও পাথেয় জন্য অনেক টাকা দেন। কিন্তু এইরূপ দান লওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচনায়, মহাত্মা সন্তোষরায় তাহা কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণার্থে দান করেন। নব্যভারতের লেখক প্রাণকৃষ্ণ বাবুও এই কিম্বদন্তীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থ লেখক, বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরীদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য কোন কিছু জানিতে পারেন নাই।

সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট।

সুকিয়াস ষ্ট্রীটে, আজকাল অনেক ভদ্রলোকের বাস। এই রাস্তাটি কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া, বরাবর সার্কিউলার রোডে গিয়া মিশিয়াছে। সুকিয়াস্, প্রাচীন কলিকাতার একজন পুরাতন অধিবাসী। তিনি জাতিতে আর্ম্মিনিয়ান। বৈঠকখানাতে তাঁহার একটী বাগানবাটী ছিল। সুকিয়াস্ দান-খয়রাতে অনেক টাকা ব্যয় করেন। মুরগীহাটায় "সুকিয়াস্ লেন" বলিয়া আর একটী ক্ষুদ্র গলি, এখনও তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।

বৃন্দাবন মল্লিকের লেন ৪ নং ওয়ার্ডে। এই বৃন্দাবন মল্লিক যে কে, তৎসম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। তবে এই গলির নামটী, স্বর্গীয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাসবাটির জন্য যথেষ্ট বিখ্যাত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ২৫ নং বাটীতে বাস করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনকথা না জানেন, এমন শিক্ষিত-বাঙ্গালী খুব কমই আছেন। তাঁহার প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, বোধোদয়, চরিতাবলী পড়িয়া সকলেই প্রায় বাঙ্গলা শিখিয়াছেন। এরূপ স্বাধীনচেতা, দয়ার আদর্শমূর্ত্তি, ব্রহ্মণ্য-তেজের জ্বলন্ত আদর্শ, পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ খুব কমই বঙ্গদেশে জন্মিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মেট্রোপলিটন-কালেজ, তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। যতদিন এদেশে সংস্কৃত-কলেজ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন বিদ্যাসাগরের নাম কেহই ভুলিতে পারিবেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, পিতৃ-পরিচয়ে সর্ব্বত্র সম্মানিত। তাঁহার উপযুক্ত দৌহিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, "সাহিত্য" নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রের সম্পাদক। সুরেশচন্দ্র, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রের সহস্র বিভীষিকা ও প্রতিযোগিতাকে উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার জীবনের ব্রত "সাহিত্য" আজও দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। ইহার নিকটস্থ পল্লীতে ৬ নং মাণিকতলা রোডে, আর একজন মনীষি বাঙ্গালী বাস করিতেন। ইনি স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারে, ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। অশোকের রাজত্বকালের শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার ও মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া, ইনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেকালের এসিয়াটিক-সোসাইটির জর্ণালের, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের, গবেষণাময় প্রবন্ধ সমূহের বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি ইহাঁরই লেখনীপ্রসূত।

রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট।

ইহা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত। দরমাহাটা হইতে এই পথের আরম্ভ। রতন সরকারের সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে। প্রবাদ এই, রতন সরকার, জব চার্ণকের আমলের পূর্ব্বের লোক। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে "ফ্যাকন" নামক একখানি জাহাজ কলিকাতায় গার্ডেন-রিচে নঙ্গর করে। ইহা হইতেছে আড়াই শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা। কাপ্তেন ষ্টাফোর্ড এই জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এ জাহাজখানি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-জাহাজ। কাপ্তেন সাহেবের একজন দ্বিভাষীর প্রয়োজন হয়— কেন না তিনি এদেশের কোন ভাষাই জানিতেন না। "দ্বিভাষী"কে মাদ্রাজীতে "দুবাস" বলে। সাহেব নিকটস্থ গ্রামের লোকদিগকে

বলেন—"আমার জন্য একজন "দুবাস" আনিয়া দাও।" তাহারা সাহেবের কথা বুঝিতে না পারিয়া, একজন ধোপাকে পাঠাইয়া দেয়। সেই ধোপার তখন অদৃষ্ট প্রসন্ন। সে ইংরেজীর কোন কিছু না জানিলেও সামান্য দুই দশটা কথা জানিত। এই বিদ্যার সহায়তায় আর বুদ্ধির জোরে, সে কাপ্তেন ষ্টাফোর্ডের মনের ভাব বুঝিয়া লয়। ইহা হইতেই তাহার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। এই "দুবাস" রতন সরকারকে, কাপ্তেন ষ্টাফোর্ড সাহেব, কোম্পানীর দ্বিভাষীরূপে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই কাজ করিয়া রতন সরকার প্রচুর বিত্তশালী হইয়া উঠেন। আর এক রতন সরকার—পূর্ব্বকথিত ব্লাক-জমীদার, কুমারটুলী নন্দরাম সেনের অধীনে চাকরী করিতেন। তাঁহার নামেও একটী গলি আছে। এই দুইজন রতন সরকার একই ব্যক্তি কি না, তাহা এই সুদূর বর্ত্তমানে নিশ্চয় করিয়া বলা অতি অসম্ভব ব্যাপার। এই রতন সরকারের সম্বন্ধে, বর্ত্তমান কিম্বদন্তীটি মহাত্মা রামকমল সেনের অভিধানের মুখবন্ধে আছে।

রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট।

ইহা বর্ত্তমান বিডনষ্ট্রীট পোষ্টাফিসের সম্মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া, সরাসর মানিকতলা ষ্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র, রাজা গুরুদাসের নামানুসারে, ঐ পথের নামকরণ হইয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমারের আবাস-ভবন কোথায় ছিল, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। তবে অনুমান-সঙ্গত মত এই—চড়কডাঙ্গা-পল্লীতে, অর্থাৎ বর্ত্তমান বিডনস্কোয়ার যে স্থানে নির্ম্মিত, সেই জমীর উপর পুরাকালে এক বাটী ছিল, তাহাই মহারাজের আবাস স্থান। রাজা গুরুদাস, বাঙ্গালার পঞ্চম নবাব নাজিম মোবারক-উদ্দৌলার দেওয়ান ছিলেন।

মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

এই রাস্তাটী চোরবাগান পল্লীতে। এ পথের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বাঁশতলা ষ্ট্রীটের সম্মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া, ইহা কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। এই পথের ধারেই চোরবাগান মল্লিকগোষ্ঠীর প্রাসাদতুল্য আবাস-ভবন। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রাসাদের ন্যায়, সুবৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতায় আছে কি না সন্দেহ। "রাজেন্দ্র-মল্লিকের-চিড়িয়াখানা" মেটেবুরুজের নবাবের চিড়িয়াখানার নিম্নে। নবাব ওয়াজিদ আলিশা, লক্ষ্ণৌ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, মেটিয়াবুরুজে এক বহুদূর বিস্তৃত প্রাসাদ নির্ম্মাণ

করেন। এই প্রাসাদ-সংলগ্ন ভূমিতে এক সুবৃহৎ চিড়িয়াখানা ছিল ও বৎসরের মধ্যে একদিন অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী, তাহা সাধারণকে বিনাব্যয়ে দেখিতে দেওয়া হইত। কিন্তু রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের চিড়িয়াখানার দ্বার, চিরদিনই অবারিত। রাজেন্দ্র মল্লিকের অক্ষয়কীর্ত্তি—নিত্য সদাব্রত। এই কলিকাতা সহরে অনেক লক্ষপতি আছেন—কিন্তু এই রাজেন্দ্র মল্লিক্ ও আর দুই একজন ভিন্ন এরূপ কীর্ত্তি অতি অল্পলোকেই রাখিয়া গিয়াছেন। আজও অক্ষুন্নভাবে ইহা চলিয়া আসিতেছে। যে মুক্তারাম বাবুর নামে এই পথের নামকরণ হইয়াছে—তাঁহার পুরা নাম বাবু মুক্তারাম দে। মুক্তারাম বাবু বহুদিন ধরিয়া, সুপ্রীম-কোর্টের দেওয়ানী করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের চার্টার অনুসারে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হইলে—তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ভীমঘোষের লেন।

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে এই গলির আরম্ভ। ভীমঘোষের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ভীমঘোষ, সেকালের একজন বড় লোক ছিলেন। কিন্তু কৃপণ-স্বভাবের জন্য তাঁহার একটা খারাপ নাম ডাক হইয়াছিল। লোকজনকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া অল্প আহার দিতেন, ইহাই তাঁহার বদ্‌নামের কারণ।

বিশ্বনাথ মতিলালের লেন।

বহুবাজারের সান্নিধ্য হইতে, এই পুরাতন গলি আরম্ভ হইয়া বরাবর বিশ্বনাথ মতিলালের বাটীর দিকে গিয়াছে। মতিলালেরা শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়। চারিমেল ইহাদের ঘরে বাঁধা। বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয়, এই মতিলাল-বংশের স্থাপয়িতা। তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা আজও এই গলিতে বর্ত্তমান। বিশ্বনাথ মতিলাল, মাসিক আট টাকা বেতনে কোম্পানীর নুনের-গোলায় চাকরী আরম্ভ করেন এবং মৃত্যু সময়ে কম বেশ পনর লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যান। বর্ত্তমান বহুবাজার, তাঁহারই স্থাপিত। তাঁহার এক পুত্রবধূর নামে এই সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া, ইহা "বহুবাজার" বা বৌবাজার আখ্যা পাইয়াছে। এই মতিলাল-বংশীয় এক কন্যাকে, সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার মিঃ ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জি বিবাহ করেন। মিসেস ব্যানার্জ্জীর গর্ভজাত মিঃ শেলি ব্যানার্জ্জি এখন হাইকোর্টের

এক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। তাঁহার অপর পুত্র মিঃ আর, সি, ব্যানার্জ্জি একজন উদীয়মান বারিষ্টার।

বৈষ্ণবচরণ শেঠের ষ্ট্রীট।

বৈষ্ণবচরণ শেঠ—জনার্দ্দন শেঠের পুত্র। এই নামজাদা জনার্দ্দন শেঠ, ইংরাজের প্রথম আমলে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর ব্রোকার বা দালাল ছিলেন। জনার্দ্দন শেঠ, কোম্পানীর এই দালালী করিয়া, অনেক টাকা উপায় করেন। ইহাঁর বংশধর বৈষ্ণবচরণ, ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার প্রেরিত গঙ্গাজল ভিন্ন, ত্রৈলঙ্গদেশীয় রামরাজার পূজা উপলক্ষে অন্য গঙ্গাজল ব্যবহার হইত না। এই শেঠ-গোষ্ঠী মৌদ্গল্য-বংশীয়। ইহাদের আদি-পুরুষ মুকুন্দরাম, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সপ্তগ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া সর্ব্বপ্রথমে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দপুর তখন গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এজন্য শেঠেরা কলিকাতার "জঙ্গলকাটা-বাসিন্দা" বলিয়া উল্লিখিত। এই শেঠ-দিগের কুলদেবতা গোবিন্দজীউ। এই গোবিন্দজীউ, এখন টাঁকশালের নিকট, এক দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সুন্দর দেবমূর্ত্তি তিনশত বৎসরের পুরাতন।

বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট।

প্রাচীন কলিকাতায় দুইটী দুই রকমের প্রবাদ প্রচলিত ছিল। মিঃ এ, কে, রায়, তাঁহার সেন্সস্-রিপোর্টে এই দুইটীই উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রবাদবাক্যগুলি এই—

নন্দরামের ছড়ি।	গোবিন্দরামের ছড়ি।
উমিচাঁদের দাড়ি।	উমিচাঁদের দাড়ি।
হুজুরীমলের কড়ি।	নকুধরের কড়ি।
বনমালী সরকারের বাড়ী	মথুর সেনের বাড়ী।

নন্দরাম ও গোবিন্দরাম উভয়েই কোম্পানীর আমলে ব্ল্যাক-জমীদারের কাজ করিতেন। উভয়েরই নিবাস এক পল্লীতে অর্থাৎ কুমারটুলী অঞ্চলে। ব্ল্যাক জমীদারেরা, সেকালের কলিকাতার "ছোট-হাকিম" ছিলেন। উমিচাঁদ তাঁহার "দীর্ঘ-দাড়ির" জন্য প্রাচীন কলিকাতায় বিখ্যাত ছিলেন। বনমালী সরকার ও মথুর সেন তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার জন্য বিখ্যাত। নকু ধরের পুরা নাম—লক্ষ্মীকান্ত ধর। ইনি লর্ড ক্লাইভের নিকট চাকরী করিতেন।

বনমালী সরকার জাতিতে সদ্‌গোপ। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম সরকার। আত্মারাম, সর্ব্বপ্রথমে কুমারটুলিতে আসিয়া বসবাস করেন। বনমালী সরকার, কোম্পানী-বাহাদুরের পাটনার রেসিডেণ্ট-সাহেবের দেওয়ান ছিলেন, তৎপরে কলিকাতায় "ডেপুটী-ট্রেডার" হন। এই সময়ে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। নবাব সেরাজউদ্দৌলা যে বৎসর কলিকাতা আক্রমণ করেন—তাহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার এই প্রাসাদতুল্য বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। এই বাড়ীখানি, কুমারটুলী অঞ্চলে। নির্ম্মিত হইতে দশ বৎসরকাল সময় লাগিয়াছিল।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।

সেকালের যে সকল লোক, আফিং ও নিমকীর দেওয়ানী করিয়া বড়লোক হইয়াছিলেন—দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহাদের এক-জন। দেওয়ান দুর্গাচরণ, কোম্পানী বাহাদুরের পাটনা ওপিয়ম-এজেন্সির সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এই দেওয়ানী-চাকরী করিয়াই, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। বাগবাজারে গঙ্গারধারে, সাধারণের স্নানের জন্য তিনি একটী ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেন।

এই গলিটী দুর্গাচরণ পিতুড়ীর নামানুসারে হইয়াছে। পিতুড়ীরা কলিকাতায় বহুদিনের অধিবাসী। ইহাঁদিগের আদিনিবাস কোথায়, তাহার পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। তবে দুর্গাচরণ যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুর্গাচরণ, তেজারতি ও কণ্ট্রাক্টের কাজে প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হয়েন। পলাশী-যুদ্ধের পর, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের বা গড়েরমাঠের বর্ত্তমান কেল্লার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। দুর্গাচরণ, এই, দুর্গ-নির্ম্মাণ কার্য্য "কণ্ট্রাক্ট" লয়েন। শুনা যায়, এই ব্যাপারেই তিনি প্রচুর বিত্তশালী হন।

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।

সেকালের কলিকাতায় ডাক্তার দুর্গাচরণের নাম সর্ব্বগৃহেই পরিচিত ছিল। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে, তিনি যথেষ্ট সুনাম সঞ্চয় করেন। রোগ-নির্ণয়ে তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। লোকে দুর্গাচরণ ডাক্তারকে "সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি" বলিয়া বিবেচনা করিত। অনেক সাহেব-ডাক্তার তাঁহার

চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। অসংখ্য মৃতকল্প রোগীর প্রাণদান করিয়া, দুর্গাচরণ অশেষ কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। আজও অশীতিপর প্রাচীনদের মুখে, তাঁহার অদ্ভুত চিকিৎসা-কাহিনীর অনেক গল্প শুনা যায়। ডাক্তার দুর্গাচরণ, তালতলায় বাস করিতেন। দুর্গাচরণের প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ—তাঁহার গৌরববান পুত্র, অনারেবেল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় অদ্বিতীয় বাগ্মী ও প্রতিভাশালী সম্পাদক, বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছে। দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথের আর নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। উজ্জ্বল সূর্য্যকে প্রদীপ দিয়া দেখাইতে হয় না। সুরেন্দ্র বাবু, বারাকপুর মণিরামপুরে বাস করেন। সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গলী-পত্রিকা ও রিপণ-কলেজ, তাঁহার লোকবিশ্রুত কীর্ত্তিস্তম্ভ। দেশহিতব্রতে—আজও পর্য্যন্ত এই বৃদ্ধ বয়সে সুরেন্দ্রনাথ, অক্লান্তহৃদয়ে যৌবনের শক্তি লইয়া, কার্য্যময় জগতে বিরাজ করিতেছেন।

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট।

কলিকাতায় ঠাকুর-গোষ্ঠীর পরিচয় আমরা যথাস্থানে দিব। দর্পনারায়ণ—পরলোকগত মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন বাহাদুরের বৃদ্ধ পিতামহ। এই বংশের পঞ্চানন ঠাকুর,—গোবিন্দপুরের অধিবাসী ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহারা কলিকাতায় জঙ্গল কাটাইয়া বাস করেন। পঞ্চাননের পুত্র, জয়রাম, পাথুরিয়াঘাটায় প্রথম বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। দর্পনারায়ণ, ফরাসী-গবর্ণমেন্টের অধীনে দেওয়ানী করিয়া প্রচুর বিত্তের অধিকারী হন। তাঁহার নামে স্থাপিত একটী গলি, আজও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মনস্বী, সুপণ্ডিত প্রতিভাবান বাঙ্গালী খুব কমই জন্মিয়াছেন। বিলাতে তিনি "প্রিন্স দ্বারকানাথ" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রিন্স-দ্বারকানাথ, রাজা রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। দ্বারকানাথ, সর্ব্বপ্রথমে সুপ্রীমকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। তার পর তিনি চব্বিশ পরগণার নিমকী-বিভাগের দেওয়ানি-পদে নিযুক্ত হন। এই দেওয়ানী কার্য্যে, তিনি প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেন। তৎপরে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, একটী "ব্যাঙ্ক" স্থাপন করেন। তাঁহার এই ব্যবসায়ের অংশীদার, অনেক বাঙ্গালী

ও নামজাদা সাহেব ছিলেন। এতদ্ভিন্ন নীল, রেসম ও চিনির ব্যবসায় দ্বারাও দ্বারকানাথ প্রচুর বিত্তশালী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ দুইবার বিলাতে গিয়াছিলেন। প্রথমবারে তিনি আমাদের মাতৃপ্রতিম ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার নিকট যথেষ্ট সম্মানলাভ করেন। বিলাতে গিয়া তিনি আতিথ্য পরায়ণতায় ও পদোচিত ঐশ্বর্য্যবিকাশে এবং নানাবিধ হিতকর কার্য্যে—বিলাতের লোকের নিকট "প্রিন্স-দ্বারকানাথ" বলিয়া পরিচিত হন। বেলফাষ্ট নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। "কেন্সাল-গ্রীনে" তাঁহার সমাধি-স্থান এখনও বর্ত্তমান।

দ্বারকানাথের বংশের যশঃপ্রতিভা এখনও মলিন হয় নাই, বরং আরও সমুজ্জ্বলিত। যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাটী, লক্ষ্মী-সরস্বতীর লীলানিকেতন। দ্বারকানাথের পুত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্ব্বজন পূজ্য ও সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ বিশেষ যশস্বী। ইঁহারা সকলেই স্বনামধন্য। বঙ্গ-সাহিত্য এই বংশের নিকট বড়ই ঋণী। বাঙ্গালীর "রবি-কবি" দ্বারকানাথের উপযুক্ত পৌত্র। সম্প্রতি এই কবীন্দ্রের, বীণার ঝঙ্কারের মধুরতায় সমগ্র ইউরোপ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া, বাঙ্গালীর কবি রবীন্দ্রনাথ, সুবিখ্যাত "নোবেল-প্রাইজ" লাভ করিয়া, সমগ্র জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ—বাঙ্গালী সিভিলিয়ান কুলের উলজ্জ্বরত্ন। তিনি বোম্বাই-প্রদেশে তাঁহার কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিয়া এখন পেন্সন লইয়া বঙ্গ-সাহিত্যালোচনা করিতেছেন। "বোম্বাই-চিত্র" তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর—অশ্রুমতী, সরোজিনী প্রভৃতি কতক-গুলি সুন্দর নাটক অতীত যুগের বড়ই আদরের সামগ্রী ছিল। এখনও এই প্রবীণ বয়সেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যচর্চ্চা ছাড়েন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেবল যে পুত্র-গৌরবে যশস্বী, তাহা নহে। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আজও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আছেন। সুপ্রসিদ্ধ "ভারতী" নামক পত্রিকার সম্পাদকীয়-ভার, দেবী স্বর্ণকুমারী, বহুদিন ধরিয়া বহন করিয়া, এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনেও তাহাকে রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। মহিলা উপন্যাস-লেখিকাদের মধ্যে, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথিতযশা। তাঁহার দীপনির্ব্বাণ, ছিন্নমুকুল প্রভৃতি গ্রন্থ অতি উপাদেয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বর্গগত স্বামী, মিঃ জানকীনাথ ঘোষাল (মিঃ জে, ঘোষাল), কংগ্রেসের একজন নেতা ছিলেন। সর্ব্ববিধ

লোক হিতকর কার্য্যেই তাঁহার উৎসাহ ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আবাসবাটী, এই গলিতে অবস্থিত বলিয়া, গলিটির নামকরণ তাঁহার নামেই হইয়াছে।

গোকুল-মিত্রের গলি।

গোকুল-মিত্র, সেকালের বাগবাজারের একজন নামজাদা লোক। তাঁহার প্রাসাদ-তুল্য বাটী, আজও চিৎপুর-রোডের উপর বর্ত্তমান। এতবড় নাটমন্দির বা নাটমন্দির আর কোন বাটীরই নাই। বাগবাজারের "মদন-মোহন ঠাকুর" এই গোকুল মিত্রের বাটীতেই আছেন। গোকুল মিত্র, অতি ক্রিয়াবান লোক ছিলেন। দুর্গোৎসব, রাস, দোল, ইত্যাদিতে তাঁহার এই প্রাসাদতুল্য বাটী, বৎসরের সকল সময়ই কোলাহল-সঙ্কুল থাকিত। এখনও তাঁহার নির্ম্মিত পুরাকালের দোল ও রাসমঞ্চ বর্ত্তমান। কোজাগরী প্রতি-পদে, প্রতিবৎসর এই গোকুল-মিত্রের বাটীতে "অন্নকুট-মহোৎসব" এখনও হইয়া থাকে। প্রবাদ এই, মদনমোহন বিগ্রহ পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজাদের দখলে ছিল। বিষ্ণুপুরাধীপ রাজা দামোদর সিংহ, দেনার দায়ে ইহা গোকুল-মিত্রের নিকট এক লক্ষ টাকায় বন্ধক রাখেন। কিন্তু খালাস করিতে না পারায়, এ বিগ্রহ গোকুল মিত্রেরই হয়। আর একটী প্রবাদ আছে—গোকুল-মিত্র, বিষ্ণুপুরের মদন-মোহনের যুগল মূর্ত্তির অনুরূপ, আর একজোড়া রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন ও রাজাকে তাঁহার নিজের বিগ্রহ বাছিয়া লইতে বলেন। রাজা ঠিক চিনিতে না পারিয়া, নকল মদনমোহন লইয়া যান। আসল বিগ্রহ, মিত্রজারই হয়। গোকুল-মিত্রের পিতার নাম সীতারাম মিত্র। বালী—ইহাঁদের আদি বাসস্থান। তৎপরে কলিকাতায় বাস হয়। গোকুল মিত্র কোম্পানীর নিমকী-বিভাগে কাজ করিয়া বড়লোক হন। ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক। সেকালের কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজপত্রের দুই চারি স্থলে, মিত্রজার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিত্রজার প্রাসাদ-তুল্য বাটী, কলি-কাতার পুরাকালের একটী প্রধান দর্শনীয় জিনিস।

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই পথের উপর স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রাসাদ-তুল্য বাটী।

মহাভারতের অনুবাদ করিয়া, সিংহ মহোদয় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া লংসাহেবের যখন জেল ও জরিমানা হয়, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ই তাঁহার জরিমানার টাকা প্রদান করেন। বারাণসী ঘোষ, দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের জামাতা। দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ—কালী প্রসন্ন সিংহের পূর্ব্ব পুরুষ। বারাণসী ঘোষ—কলিকাতার তদানীন্তন কলেক্‌টার, আইন-আকবরির অনুবাদক—গ্লাডউইন সাহেবের অধীনে দেওয়ানী করিতেন। তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র বলরাম ঘোষ, ফরাসী গবর্ণর, স্বনামপ্রসিদ্ধ ডুপ্লের অধীনে চন্দননগরের ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন। এই বারাণসী ঘোষের নাম হইতেই বর্ত্তমান পথ্যাটীর নামকরণ হইয়াছে। বলরাম ঘোষের পুত্রের নাম—শ্রীহরি ঘোষ।

হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।

ফ্রেঞ্চ-গবর্ণর ডুপ্লের দেওয়ান—বলরাম ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহরি ঘোষ। এই হরি ঘোষ পরে, মুঙ্গেরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হন। হরি ঘোষ কোম্পানীর অধীনে দেওয়ানী করিয়া অনেক টাকা উপায় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচুর সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি দানধ্যানে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অনেক বেকার কর্ম্মহীন যোত্রহীন জ্ঞাতি-গোত্র ও আত্মীয়বর্গ, তাঁহার কলিকাতার আবাস-বাটীতে আশ্রয় লইয়া, তাহা কোলাহল-সঙ্কুল করিয়া তুলিত। অনাহূত এবং রবাহূতগণেরও নিত্য অন্নপ্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটিত না। এই জন্যই আজও কোন বাটীতে, বেশী লোক থাকিলে লোকে বলে—"এটা যেন হরি-ঘোষের আড্ডা।" হরি ঘোষ অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সারল্যের সুযোগ পাইয়া, এক অন্তরঙ্গ মিত্র, তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ অবস্থাটা তাঁহার বড়ই কষ্টে কাটিয়াছিল। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি মনের দুঃখে কাশীবাসী হন।

হুজুরীমল্‌স্‌ ট্যাঙ্ক লেন।

হুজরীমল্‌ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উমিচাঁদ বা আমীরচাঁদের খুব নিকট আত্মীয়। ইনি জাতিতে শিখ্‌। প্রাচীন কলিকাতায় হুজুরীমল

একজন বিত্তশালী লোক ছিলেন। বৈঠকখানা বাজারের নিকট তিনি একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী, এই পুকুরটী বহুকাল বুজাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এখানে হুজুরী-মলের পুকুর ছিল বলিয়া, ইহা হুজুরী-মলের ট্যাঙ্ক লেন নামে বিখ্যাত। কালীঘাটের-বাজার আজকাল যে স্থানে, সেই স্থানাধিকৃত সমস্ত জমী, হুজুরীমল্ বাবু, কোম্পানির নিকট কোনও কার্য্যের জন্য পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই জমীর উপর দেবালয় ও গঙ্গার তীরে এক ঘাট করিয়া দেন। কিন্তু দানপ্রাপ্ত জমীতে, এরূপ ভাবে দেবালয় ও সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত করিতে নাই, এরূপ একটা শাস্ত্রীয়-বিধান পাওয়ায়, তিনি নিজ তহবিল হইতে জমী কিনিয়া, গঙ্গাতীরে একটী ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেন।

কাশীঘোষের লেন।

কাশীঘোষ, রামদেব ঘোষের পুত্র। রামদেব সেকালের নদীয়ার রাজাদের দেওয়ান ছিলেন। রামদেবের পুত্র কাশীঘোষ, ফেয়ারলি ফারগুসান্ কোম্পানীর ফারমের সহকারী বেনিয়ান ছিলেন। সেকালে যাঁহারা সওদাগরী আফিসের মুচ্ছুদ্দী বা বেনিয়ান-গিরি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, বিত্তসম্পন্ন হইয়াছিলেন। কাশীঘোষ, মৃত্যুকালে অনেক টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান।

খেলাত-ঘোষের গলি।

পাথুরিয়া-ঘাটার ঘোষ বংশ, চিরদিনই ক্রিয়াবান, ও বিখ্যাত জমীদার। খেলাত ঘোষ মহাশয়ের প্রাসাদ-তুল্য আবাসভবন এখনও কলিকাতা পাথুরিয়া-ঘাটায় বর্ত্তমান। খেলাত-ঘোষ মহাশয়, ক্রিয়া কলাপাদির জন্য সেকালের সমাজে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ, তাঁহার বংশধর। রমানাথ বাবুও সাধারণ হিতকর কার্য্যে ও সভাসমিতিতে পূর্ণোৎসাহে যোগদান করিতেন। খেলাত-ঘোষ মহাশয়, দেওয়ান রামলোচন ঘোষের পৌত্র। রামলোচন ঘোষ, লেডী ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। খেলাত-চন্দ্রের খুল্লতাত, আনন্দনারায়ণ ঘোষ পুরাকালে ধর্ম্মতলায় একটী বাজারের অধিকারী ছিলেন। ইঁহার নামানুসারে এই বাজার সেকালে "আনন্দ-বাজার" বলিয়া পরিচিত ছিল।

কেশবচন্দ্র সেনস্ লেন।

স্বর্গগত কেশব সেনের নাম, পূর্ব্বযুগের লোকের নিকট খুব পরিচিত ছিল। যাঁহারা তাঁহার ধর্ম্মানন্দময় প্রসন্নমুখ দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। কেশব-বাবু, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য, জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আদিসমাজ ভুক্ত ছিলেন, তৎপরে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার কন্যার সহিত, স্বর্গীয় কুচবেহারাধিপের বিবাহের পর হইতে, তিনি সাধারণ-সমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, নববিধান-সমাজ স্থাপন করেন। কেশবসেনের ন্যায় ধর্ম্ম-বিষয়ক ইংরাজী-বক্তা এ দেশে খুব কম জন্মিয়াছে। তিনি বিলাতে গিয়া, বহুবার ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া তথাকার মনীষিবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। কেশববাবু, দেওয়ান রামকমল সেনের পৌত্র। রামকমল সেন মহাশয়, ২৪ পরগণার গরিফা হইতে, ১৮০০ খ্রীঃ অব্দের প্রথমে, কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন। বর্ত্তমান হিন্দু হোষ্টেলের সান্নিধ্যে যে গলিটী আছে, তাহাই সেন-গোষ্ঠীর কলিকাতার আদি বাটী। রামকমল সেন মহাশয়, সরকারী টাকশাল ও পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেশব বাবু হইতে, তাঁহার পিতৃপুরুষের গৌরব, দেশে বিদেশে ব্যক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্র যখন বিলাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিবার জন্য গমন করেন, সেই সময়ে তিনি খ্রীষ্টিয়ান-সমাজের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে, চির গৌরবান্বিতা মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ও রাজপরিবারবর্গের সহিত, তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারি তারিখে কেশবচন্দ্র সেন ইহলোক ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণদাস পালের লেন।

অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল, বঙ্গদেশের একটী উজ্জ্বল রত্ন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর অনেকে ভাবিয়াছিল, তৎকালীন হিন্দু সমাজের একমাত্র মুখপত্র "হিন্দু-পেট্রিয়টের" আর পুনরভ্যুদয় হইবে না। কিন্তু কৃষ্ণদাস ধাত্রীরূপে হিন্দু-প্রেট্রিয়টকে আজীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু-প্রেট্রিয়টের নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা, তাঁহার আমলে চিরদিনই সমানভাবে বর্ত্তমান ছিল। কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সম্পাদিত হিন্দু-পেট্রিয়ট, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ এবং বড়লাট ও ছোটলাটগণ, আগ্রহের

সহিত পাঠ করিতেন। কৃষ্ণদাসের বাল্য-জীবন অতি কষ্টে কাটিয়াছিল। কিন্তু তিনি ভগবদ্দত্ত প্রতিভাবলে, আত্ম-নির্ভরতার শক্তিতে একজন, সর্ব্বজন-জানিত লোক হইয়াছিলেন। হিন্দু-পেট্রিয়ট সম্পাদন, ব্রিটীশ-ইণ্ডিয়ান বা ভারতীয় জমীদার-সভার সম্পাদকতা, লাট-কৌন্সিলের মন্ত্রীত্ব প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ ব্যয়িত হয়। মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররূপে, তিনি করদাতাগণের একজন নিঃস্বার্থ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বড়ই সুখের কথা—এই উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান, অনারেবল রাধাচরণ পালও, মিউনিসিপ্যালিটীর গণনীয় কমিশনাররূপে ও লাট-কৌন্সিলের সদস্যরূপে পিতৃ-পদাঙ্কানুসরণে, বিবিধ লোক হিতকর কার্য্য করিতেছেন।

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর, লাট-কৌন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া, স্বদেশবাসীর যথেষ্ট হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। জমীদার-সভার সম্পাদক হইয়া, তিনি যে জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কার-স্বরূপ, বঙ্গীয় জমীদার-সভা, তাঁহার এক শ্বেত-প্রস্তরময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি, এখন হ্যারিসন-রোড ও কলেজ-ষ্ট্রীটের সঙ্গম-স্থলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, রাজপথবাহী—পান্থগণের নিকট, তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান কৃষ্ণদাস পালের ষ্ট্রীটেই, তাঁহার বাসভবন ছিল। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, রাধাচরণ বাবু, পৈতৃক বাসস্থানটী আজকাল নূতন ধরণে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মথুর-সেনস্ গার্ডেন লেন।

মথুর-সেনের পিতার নাম জয়মণি সেন। তেজারতি ও ব্যাঙ্কিং কারবারে, মথুরসেন প্রচুর বিত্ত-সঞ্চয় করেন। তাঁহার চারি ফটকওয়ালা বাটী, এখনও ধ্বংশাবস্থাতে তাঁহার অতীত ঐশ্বর্য্যেরকীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। কালের বিচিত্রগতিতে, তাঁহার কারুকার্য্যময় বৈঠকখানা গৃহে, এখন কাবুলীরা ভাড়াটীয়ারূপে বাস করিতেছে। সেনজার এই প্রাসাদতুল্য বাটীটি, বর্ত্তমানে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। মথুর সেনের বাটীর ফটক, লাটসাহেবের বাটীর অনুকরণে নির্ম্মিত। আজও পর্য্যন্ত নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটের উপর এ ফটক বর্ত্তমান। ইহার নিকটেই মথুর-সেনের ফুলবাগান ও ঠাকুরবাটী বর্ত্তমান ছিল। এখনও সেই ঠাকুরবাটী ও ফুলবাগানের অধিকৃত স্থান—বে-মেরামত অবস্থায় বর্ত্তমান। মথুরসেন জীবদ্দশায় প্রচুর বিত্ত-সঞ্চয় করিলেও, মৃত্যুকালে তাঁহার বংশধরদের জন্য বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই।

নীলমণি হালদারের লেন।

চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ ধনী, প্রাণকৃষ্ণ হালদারের নাম, বর্ত্তমান যুগের স্মৃতি বহির্ভূত হইলেও, অতীত যুগের নিকট তাহা অতি পরিস্ফুট। নোট ও কোম্পানীর-কাগজ জাল করিয়া, প্রাণকৃষ্ণ হালদার যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। তাঁহার প্রাসাদ-তুল্য আবাসবাটী ও বৈঠকখানা আজও বর্ত্তমান। এই জাল করা অপরাধে, প্রাণকৃষ্ণের দ্বীপান্তর হয়। আর তাঁহার ভ্রাতা নীলমণি, সহোদরের সহায়তাকারী বলিয়া দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। এই নীলমণি হালদার হইতেই, পথটীর নামকরণ হইয়াছে।

নীলমণি মিত্রের গলি।

যে প্রাসাদ-তুল্য আবাসবাটী বর্ত্তমানে দরজীপাড়ায় মিত্র-বাবুদের আবাসবাটী বলিয়া পরিচিত, তাহা নীলমণি মিত্র মহাশয়ের বাটী। নীলমণি মিত্র পলাশী-আমলের লোক। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর সহরবাসীদিগের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য, যে একটী কমিশন বসে, নীলমণি মিত্র, সেই কমিশনের সদস্য ছিলেন। মিত্রজা মহাশয়, কোম্পানীর অধীনে চাকরী করিয়া বড় মানুষ হন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেছেন।

নরেন্দ্রনাথ সেনের গলি।

রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর, দেওয়ান হরিমোহন সেনের পুত্র। দেওয়ান হরিমোহন, জয়পুরের মহারাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বহুদিন ধরিয়া, ইণ্ডিয়ান-মিরর নামক সুবিখ্যাত দৈনিক-পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ অবস্থায় ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধিলাভ করেন। কয়েকবার ইনি লাট-কৌন্সিলের সদস্যপদেও নির্ব্বাচিত হন। মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার রূপেও ইনি অনেকদিন কাজ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি বহুদিন ধরিয়া এটর্ণির কাজ করেন। দেশ-হিতকর অনেক কাজে তিনি যোগদান করিতেন। নরেন্দ্রনাথ একজন স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক সম্পাদক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেনের নামে, কলিকাতা সহরের মধ্যে এই গলিটী ও একটী সাধারণ ভ্রমণ-ক্ষেত্র বা "পার্ক" নির্ম্মিত হইয়াছে।

নন্দলাল মল্লিকের লেন।

পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক-বংশ—কোম্পানীর প্রথম আমলের অধিবাসী। নন্দলাল মল্লিক, রাজা শ্যামাচরণ মল্লিকের পুত্র।

এই মল্লিক-পরিবারের আদিপুরুষ, অতি পুরাকালে, পাথুরিয়াঘাটায় আসিয়া বসবাস করেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া, ইহাঁরা প্রচুর বিত্তশালী হয়েন। 'এই বংশীয় নন্দ মল্লিক মহাশয়ের নাম হইতে এই গলিটির নামকরণ হইয়াছে।

উমেশচন্দ্র দত্তের লেন।

এই গলিটী, কলিকাতার রামবাগান পল্লীতে। রামবাগানের দত্ত-বাবুরা বহুকাল হইতে সুবিখ্যাত। বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য ইহাঁদের খুব নামডাক। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের নাম, বঙ্গের সকল গৃহেই পরিচিত। রমেশবাবু বঙ্গভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রচার করেন। ইহাদের মধ্যে—বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সমাজ ও সংসার বলিয়া, উপন্যাসগুলি বঙ্গসাহিত্যে, বিশেষভাবে পরিচিত। জীবনের শেষ দশায় রমেশচন্দ্র, তাঁহার মাধবীকঙ্কণ ও সংসার নামক দুইখানি উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই দুইখানি পুস্তকের নাম Slave Girl of Agra এবং Lake of Palms. বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাঁহার উচ্চ অঙ্গের উপন্যাসগুলি, সংবাদপত্রের ও থিয়েটারের উপহাররূপে প্রদত্ত হইলেও, সৎসাহিত্যের ও প্রতিভার বিকাশস্থল বিলাতে, তাঁহার বাঙ্গলা উপন্যাসের অনুবাদগুলি উচ্চ মূল্যে বিক্রিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রমেশচন্দ্র ইংরাজীতে Civilisation in Ancient India প্রভৃতি কয়েকখানি গবেষণা-পূর্ণ সারগর্ভ ইংরাজী পুস্তক প্রণয়ন করেন।

রমেশচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবন অতি গৌরবান্বিত। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ১৩ই আগষ্ট ইহাঁর জন্ম হয়। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, বিহারীলাল গুপ্ত (B. L. Gupta) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র একই সময়ে (১৮৬৭ খ্রীঃ) বিলাতে সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য গমন করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারা সিভিলিয়ান হইয়া এদেশে আসেন। রমেশচন্দ্র অনেক স্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টরের কাজ করিয়া, পরিশেষে ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে

ডিভিজনাল-কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান, এই উচ্চ পদ লাভ করেন নাই। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে, রমেশচন্দ্র সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধিদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। সরকারী-কর্ম্মে অবসর লইয়াও, রমেশচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবন, এক দিনের জন্ত সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হয় নাই। লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে, বহুদিন ধরিয়া ইনি ভারতীয়-ইতিহাসের অধ্যাপকতা করেন। তৎপরে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া, বরোদা-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। প্রতিভার জয় সর্ব্বত্র। এই নূতন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে রমেশচন্দ্র যথেষ্ট যশঃসঞ্চয় করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামক বিদ্বৎ-সমিতির, ইনি প্রথম প্রেসিডেণ্ট। ১৯০৯ খৃঃ অব্দের জুনমাসে ইনি বরোদার প্রধান রাজ-মন্ত্রী হন, দুর্ভাগ্যক্রমে বেশীদিন এই মন্ত্রীত্ব কাজ করিতে পারেন নাই। ১৩১৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ তাঁহার দেহান্তর হয়। রমেশচন্দ্র রামবাগান দত্তপরিবারের উজ্জ্বল রত্ন। ইনি রসময় দত্তের ভ্রাতা পীতাম্বর দত্তের পৌত্র ও ঈশানচন্দ্র দত্তের মধ্যম পুত্র। রমেশচন্দ্রের উপযুক্ত জামাতা, প্রথিতনামা সিভিলিয়ান মিঃ জে, এন, গুপ্ত (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত) তাঁহার স্বর্গগত শ্বশুর-মহাশয়ের এক জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। এ জীবনবৃত্তান্তে রমেশচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক অপ্রকাশিত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। রমেশচন্দ্র প্রতিভাবান লেখক হইয়াও, বাঙ্গালীর নিকট প্রাণভরা আদর ও সম্মান পান নাই। তাঁহার বাঙ্গলা গ্রন্থগুলি মণিমুক্তার দরে বাঙ্গলায় বিক্রীত হয় নাই—কিন্তু কর্ম্ম-ভূমি ইংলণ্ড রমেশচন্দ্রের প্রতিভার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন।

রামবাগান দত্ত-পরিবারের রসময় দত্ত মহাশয়, ডেভিড্‌সন কোম্পানীর বুককিপার ছিলেন। রসময় বাবু, সেকালের কোর্ট-অব-রিকোয়েষ্টস্ নামক বিচারালয়ে একজন বিচারক রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মিঃ ও, সি, দত্ত মহাশয়, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান রূপে নিযুক্ত হন। তারপর ইনি মিউনিসিপ্যালিটীর কলেক্টারের কাজ করেন। ইঁহার ইংরাজী কবিতাগুলি সর্ব্বজন সমাদৃত। এই রামবাগান দত্ত পরিবারেই, মিস্ তরুদত্তের জন্ম হয়। বর্ত্তমান যুগের লোক, তরুদত্তকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তরুদত্ত রামবাগান দত্ত-বংশের গোবিন্দদত্তের কনিষ্ঠা কন্যা। ইঁহার

আর এক ভগ্নী ছিলেন, তাঁহার নাম অরু। তরু ও অরু উভয় ভগ্নীই পিতামাতার সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। তৎপরে তরু, ফ্রান্সে যান। ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করিয়া, ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে মিস্ তরু দত্ত বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন। এদেশে আসিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তরু দত্ত অনেক ফরাসী-কবিতা ইংরাজী-ভাষায় অনুদিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে A sheaf gleaned from the French Fields নাম দিয়া, তিনি এই খণ্ড কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। গোবিন্দ দত্ত মহাশয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তরু ও অরু উভয়েই অবিবাহিতা ছিলেন। ইংলণ্ড ও ফরাসী-মুলুকে, তরু কিছু বেশী পরিচিত। তাঁহার রচিত একখানি ফরাসী-ভাষার উপন্যাসও ছিল। তরুর উদ্দাম প্রতিভা-বিকাশ অতি অল্প বয়সেই হয়। তরু আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে, তাহার নাম হয়তঃ ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যে চির-বিরাজিত থাকিত। উভয় ভগ্নীই যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন।

অনাথদেবের লেন ও অনাথবাবুর-বাজার লেন।

অনাথনাথ দেব মহাশয়, সুবিখ্যাত রামদুলাল দে বা দুলাল-সরকারের পৌত্র। রামদুলালের দুই পুত্র—আশুতোষ ও প্রমথনাথ। ইঁহারা সাধারণে সাতুবাবু ও লাটুবাবু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রমথ বা লাটুবাবু, অনাথবাবুকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অনাথবাবু এখন তাঁহার পৈত্রিক-বাটীতে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানকালে সাতুবাবুর বাজারের সম্মুখে, যে সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা বিরাজিত, ইহাই দুলাল সরকার মহাশয়ের বাসভবন।

রামদুলাল লক্ষ্মীর বরপুত্র। ভাগ্যলক্ষ্মী ইঁহার উপর কিরূপভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—সে কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি কোটি-পতি হইয়া উঠেন। এরূপ সচ্চরিত্র, নির্লোভী, আত্মত্যাগী প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী, বর্ত্তমান যুগে উপকথা মাত্র।

রামদুলাল সরকার মহাশয়ের জীবনের কথা আমরা অতি সংক্ষেপে বলিব। দমদমা রেকুজানি গ্রামে, তাঁহার আদি-নিবাস। তাঁহার পিতার নাম বলরাম সরকার। বলরাম গুরুমশাই-গিরি করিয়া, অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়, বাঙ্গলায় তখন নবাবী আমল—দেশে বর্গীর-হাঙ্গামা। রামদুলালের পিতা, বর্গীর ভয়ে

গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে পলায়ন করেন। তাঁহার পত্নী অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। প্রান্তর-মধ্যে পত্নীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হওয়ায়, বলরাম সরকার মহাশয়, বড়ই বিপদে পড়িলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই প্রান্তর-মধ্যে, নিরাশ্রয় অবস্থায় রামদুলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন।

নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে, রামদুলাল অল্প বয়সেই পিতৃ-মাতৃ-হীন হন। তাঁহার একটী শিশু ভ্রাতা ও ভগিনীকে লইয়া তিনি বড়ই বিপন্ন অবস্থায় পড়িলেন। কলিকাতায় তাঁহার মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাস মহাশয় থাকিতেন। অন্য উপায় না দেখিয়া, তিনি ভাই-ভগ্নীকে লইয়া মাতামহের আশ্রয়ে আসিলেন।

মাতামহের অবস্থাও "অষ্টভক্ষ-ধনুর্গুণঃ" গোছ। সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দিন চলিত। কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি তাঁহার দুস্থ দৌহিত্রকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মাতামহী, হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ দত্ত-বংশোদ্ভব মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীতে পাচিকার কাজ করিতেন। রামদুলালও, দত্ত মহাশয়ের গৃহে আশ্রয়-লাভ করিলেন। তালপাতায় ও কলাপাতায় লিখিয়া, চেষ্টা ও উদ্যমবশে—রামদুলাল বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন।

মদন দত্ত মহাশয় দেখিলেন, বালকটী বেশ চৌকোশ ও পরিশ্রমী। তিনি তাহাকে বিল-সরকার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঁচ টাকা মাসিক বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। একবার রামদুলাল কোন দূরতর স্থানে বিল সাধিতে যান। পথে সন্ধ্যা হইয়া পড়ে। তাঁহার সঙ্গে অনেক টাকা ছিল। সে টাকা তাঁহার মনিবের। পথে চোর-ডাকাতের ভয়ও সে সময়ে যথেষ্ট। রামদুলাল ভাবিতেছেন, টাকাগুলি যদি চোর-ডাকাতে লয় ত মনিবকে গিয়া কি বলিব? উপস্থিত বুদ্ধিবলে, রামদুলাল নিজের গাত্রবস্ত্রাদি খুলিয়া, তাহাতে সেই টাকা বাঁধিলেন—এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায়, সেই টাকার পুটুলি মাথায় দিয়া, গাছতলায় শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইলেন। ভগবানের ইচ্ছায়, সে রাত্রে কোন চোর বা ডাকাত তাঁহার টাকা লইতে আসিল না। পরদিন রামদুলাল আসিয়া প্রভুর নিকট সমস্ত কথা বলিয়া, সেই টাকা বুঝাইয়া দিলেন। এই দরিদ্র বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সততা দেখিয়া দত্তজা মহাশয় দশ টাকা বেতন করিয়া তাঁহাকে শিপ-সরকারের কাজ দেন।

এই শিপ-সরকারী কার্য্যেই তাঁহার ভাগ্য-প্রসন্ন হইল। শিপিং-

অফিসের কাজকর্ম্ম, তিনি খুব ভালরূপ বুঝিতেন। সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে, গঙ্গার চড়ায় দুই একখানি জাহাজ প্রায় জলমগ্ন হইত। এ জলমগ্ন জাহাজগুলি, মালামাল সমেত বিক্রয় হইত। যাহারা এ সব জলে-ডোবা জাহাজ কিনিতেন, তাঁহারা ইহার মাল বেচিয়া টাকা পাইতেন। অবশ্য এটা ভাগ্যের কথা। কাহারও ভাগ্যে যথেষ্ট লাভ হইত, কাহারও বা ক্ষতি হইত। রামদুলাল অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে এই সকল জাহাজ কিনিলে লাভ কি ক্ষতি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেন।

একবার তাঁহার মনিব দত্তজা মহাশয়, তাঁহাকে এইরূপ একখানি জলমগ্ন জাহাজ কিনিবার জন্য চৌদ্দ হাজার টাকা গণিয়া দেন। রামদুলাল নিলামী-আপিসে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাঁহার আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায়, জাহাজখানি ইতিপূর্ব্বেই ডাক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর একখানি ডোবা-জাহাজ, তখনও নীলামের মুখে আছে। রামদুলাল দেখিলেন— দ্বিতীয় জাহাজখানি কিনিলেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। তিনি প্রভুর অনভিমতে, দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই জাহাজখানি, চৌদ্দ হাজার টাকায় কিনিলেন।

তাহার পর মুহূর্ত্তেই জাহাজের অধিকারী এক সাহেব আসিয়া উপস্থিত। সাহেবের বড় ইচ্ছা, ঐ জাহাজখানি তিনি কেনেন। তিনি যুবক রামদুলালকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিলেন, তাঁহাকে চৌদ্দ-হাজার টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু রামদুলাল কিছুতেই হটিলেন না। শেষ সেই সাহেব, এক লাখ চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়া সেই জাহাজ খরিদ করেন। এক মুহূর্ত্তে, বুদ্ধিবলে এক লাখ টাকা নগদ লাভ পাইয়া, রাম-দুলাল উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে, প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন ও তাঁহার সম্মুখে সেই এক লাখ চৌদ্দ হাজার টাকা গণিয়া দিলেন। দত্তজা মহাশয় এই যুবকের নির্লোভিতা ও প্রভুভক্তি দেখিয়া, বড়ই মোহিত হইয়া বলিলেন—"দুলাল! এই এক লাখ টাকা লাভ, তোমার বরাতেই হইয়াছে। আমার চৌদ্দ হাজার টাকা আমি লইতেছি। কিন্তু প্রালব্ধ-লব্ধ ঐ লাখ টাকা তোমার।"

এই ঘটনায় রামদুলালের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইল। এই লাখ টাকাকে মূলধন করিয়া, তিনি ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। সততার ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-বলে, তিনি অতুল ধনেশ্বর হইয়া উঠেন। এইবার তাঁহার খুব উন্নতির

সময় আসিল। তিনি সাহেব-পার্টনার বা অংশীদার লইয়া চারিখানি বাণিজ্য-জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। সুদূর আমেরিকার সহিত, তাঁহার চালানী বাণিজ্য-দ্রব্যের আদানপ্রদান চলিত।

মৃত্যুকালে তিনি এক কোটীর উপর টাকা রাখিয়া যান। আরও অধিক রাখিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু দান-ধ্যানেই তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হইত। ১২৩১ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়।

ইঁহার দানের কথাটা এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ, হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তিন হাজার এবং প্রত্যহ আপিসে বসিয়া ৭০৲।৮০৲ টাকা ইনি গরীবদিগকে দিতেন। অনেক গরীব-দুঃখী, তাঁহার বাটীতে নিয়মিতরূপে অন্ন পাইত। দরিদ্র-প্রতিবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে সন্ধান লইবার জন্য তিনি চাকর নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেলগেছিয়ার অতিথিশালায় এখনও অনেক লোক অন্ন পায়। দুই লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করিয়া, ইনি কাশীতে তেরটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে ইনি দুই পুত্র পাঁচ কন্যা রাখিয়া যান, ইঁহার শ্রাদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রামদুলাল সরকার মহাশয়, একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। টাকা হইলে অনেকেই দাম্ভিক হয়। কিন্তু ভগবান রামদুলালের চরিত্রে দাম্ভিকতা বলিয়া কোন কিছু দেন নাই। অতুল ধনেশ্বর হইলেও রামদুলাল একখানি চাদর গায়ে দিয়া, চটীজুতা পায়ে দিয়া, মদন দত্ত মহাশয়ের নিকট তাঁহার পূর্ব্ব বেতন দশটী টাকা আনিতে যাইতেন। মদন-বাবুর মৃত্যুর পর আর তিনি দত্তবাড়ীতে যান নাই। তাই বলি, হায় রে সেকাল! সেকালের বাঙ্গালীর যে মহত্ব ছিল, এখন কি তাহা আছে?

বলরাম দের ষ্ট্রীট।

এই পথটী যোড়াসাঁকো-পল্লী হইতে আরম্ভ হইয়া, বরাবর মাণিকতলা-ষ্ট্রীটে আসিয়া মিশিয়াছে। এই বলরাম-দের ষ্ট্রীটের যে অংশটী মাণিকতলা ষ্ট্রীটে মিশিয়াছে, তাহার অতি সান্নিধ্যে সিমুলিয়ার গোঁসাইদিগের বাটী। পাঠক মোটের উপর জানিয়া রাখুন—প্রভুপাদ বলাইচাঁদ গোস্বামী ও প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ

গোস্বামী, এই গোঁসাই-বংশ সম্ভূত। বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের বাটীর গায়েই ৬৯ নং বলরামদের ষ্ট্রীট। এই বাটীতে বঙ্গের ব্যারিষ্টার কুলতিলক, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ ডব্লু, সি, বোনার্জ্জির) পৈত্রিক বাসভবন। উমেশচন্দ্র বাঙ্গালীর অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যবহারজীবি, বঙ্গদেশে খুব কম জন্মিয়াছে। উমেশচন্দ্রের পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁর পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, বাঘাণ্ডা গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। তিনি কলিয়ার বার্ড কোংর আফিসের বড় বাবু বা মুৎসুদ্দি ছিলেন। সেকালের সুপ্রীম-কোর্টের মধ্যে, এই উকীল কোম্পানীর খুব প্রতিপত্তি ছিল। পীতাম্বর—সর্ব্বানন্দী-মেল ভুক্ত। পীতাম্বর, খিদিরপুরের সোনাই নামক স্থানে, এক ত্রিতল বাটীতে বাস করিতেন। এক যোত্রহীন মক্কেলের মোকদ্দমায়, তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেন। এক সময়ে উচ্চ অবস্থাসম্পন্ন, পরে যোত্রহীন এই অবীরা, পীতাম্বরের চেষ্টাতেই এই বাটী সম্বন্ধীয় সরিকানী মোকদ্দমা জেতেন। তাঁহার এমন কিছু ছিল না—যে তিনি উকীলের ফিঃ বা উপকারী পীতাম্বর তাঁহার জন্য যে অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা পরিশোধ করেন। শেষে এই ত্রিতল বাটীখানি, তিনি পীতাম্বরকে বিক্রয় করিয়া ঋণমুক্ত হন। এই বাড়ীর কম্পাউণ্ড পঁচিশ বিঘা জমী। পীতাম্বর, এই বাড়ী উত্তমরূপে মেরামত করিয়া প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় পরিণত করেন। এই বাড়ীতে পীতাম্বর অনেক ক্রিয়াকলাপ করিয়াছিলেন। দোল রাস প্রভৃতিতে খিদিরপুর, ভবানীপুর, বেহালা, কালীঘাট, কলিকাতা প্রভৃতি সমাজের ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইতেন।

পীতাম্বর, কুলক্রিয়ায় অগ্রগণ্য ছিলেন। এই দীন লেখকের পিতামহ ৺গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়, পীতাম্বরের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। গুরুচরণের আদিনিবাস—শান্তিপুর। শান্তিপুরের বিখ্যাত তেজস্বী পণ্ডিত লক্ষ্মীতলা পাড়ার ভট্টাচার্য্য-বংশীয়, রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গুরুচরণের প্রপিতামহ। রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক। তৎকালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মত, শান্তিপুরে তাঁহার সমকক্ষ দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিত খুব কম ছিল। এখন কালধর্ম্মে লক্ষ্মীতলা-পাড়ার এই ভট্টাচার্য্য বংশ নানাস্থানবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাঁদের এক শাখাভুক্ত স্বর্গীয় বাবু শ্যামলাল ও কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়। এই কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় হাবড়া-শালখিয়ার

বাস করিতেছেন। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ কে, এল, মুখার্জ্জি এণ্ড কোংর প্রতিষ্ঠা করেন।

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগ্নীকে বিবাহ করিবার পর এ দীন লেখকের পিতামহ গুরুচরণ, খিদিরপুরে আসিয়া বসবাস করেন। এই অধম লেখকের পিতৃদেব, স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই এক বয়সী। দুই ভায়ে বড়ই ভালবাসা ছিল।

উমেশচন্দ্রের পিতা, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন বিখ্যাত এটর্ণি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বাধীন-চেতা, ধর্ম্মভীরু এটর্ণি, খুব কমই জন্মিয়াছে। গিরিশচন্দ্র, ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বংশোদ্ভুতা, এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভেই উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। উমেশচন্দ্রের আর এক সহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিও এটর্ণি হইয়াছিলেন। কিন্তু অপরিণত যৌবনে, ডায়াবিটিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া, সত্যধন বাবু পরলোক গমন করেন। সত্যধনের পুত্রাদি নাই, তিন কন্যা। উমেশচন্দ্র, বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল-বংশের এক ভাগ্যবতী কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সদ্‌গুণসম্পন্না রমণীর গর্ভে, মিঃ শেলী কমলকৃষ্ণ বোনার্জ্জি ও মিঃ আর, সি, বোনার্জ্জি প্রভৃতি গণ্যমান্য বারিষ্টারগণের জন্ম হইয়াছে।

বাল্যকালে উমেশচন্দ্র পড়া শুনায় বড় অমনোযোগী ছিলেন। সখের থিয়েটারের উপর তাঁহার বড়ই ঝোঁক ছিল। একদিন কলিকাতার কোন সম্রান্ত পরিবারে, তাঁহাদের সখের দলের অভিনয় হয়। অভিনীত নাটক মাইকেলের—শর্ম্মিষ্ঠা। বোনার্জ্জি মহাশয় শর্ম্মিষ্ঠার ভূমিকা লইয়াছিলেন। প্রতিভা সকল কাজেই নিজের শক্তি প্রকাশ করে। শর্ম্মিষ্ঠার, কলাকৌশলময় অভিনয় সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। সেই সভায়, মহারাজ যতীন্দ্র-মোহন একজন দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে তিনি যখন পরিচয় পাইলেন—কলিকাতা সদর-দেওয়ানী আদালতের প্রধান এটর্ণি গিরিশ বাবুর পুত্র, এই শর্ম্মিষ্ঠার ভূমিকা লইয়াছেন—তখন তিনি আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ মগ্ন হইয়া বলেন,—"কি? গিরিশ বাবুর ছেলে! সে থিয়েটার করিতেছে।"

বোনার্জ্জি মহাশয়, প্রথমে ওরিয়েণ্টাল-সেমিনারী, তৎপরে হিন্দুস্কুলে পাঠ সমাপ্ত করেন। পাঠে অমনোযোগী দেখিয়া, তাঁহার পিতা গিরিশ-

চন্দ্র, তাঁহাকে "আর্টিকেল্ড-ক্লার্ক" করিয়া, নিজের আপিসে বাহির করেন। কিন্তু ভাগ্য, যশ ও প্রতিভা, এই আপিসের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে কেন? ভবিষ্যৎ ষ্টাণ্ডিং-কৌন্সিলের প্রতিভা, আইনভিজ্ঞতা, উকীলের আফিসের কক্ষ প্রাচীর মধ্যে বিলীন হইবে কেন? স্বাধীনচেতা উমেশ-চন্দ্রের এ এটর্ণি-গিরি ভাল লাগিল না।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে রোস্তমজী নামক এক পারসী সদাগর-প্রদত্ত বৃত্তি অবলম্বনে, উমেশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। তিনি পিতামাতার অজ্ঞাত-সারে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সাত্ত্বিক হিন্দু। তাঁহার পিতা, মহাষ্টমীর দিন দুর্গোৎসবের পূজার দালানে বসিয়া, এই সংবাদ পাইয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হন। গিরিশবাবুর বলরামদের ষ্ট্রীটের বাটীতে, খুব সমারোহে দুর্গোৎসব হইত। সেবার পূজার আনন্দ একেবারে নিভিয়া গেল।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দে, তিনি বারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। পিতার সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বেই লোকান্তরবাসী হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের ন্যায় পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান, খুব কমই দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বারিষ্টারি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এই আনন্দস্রোত, পিতৃবিয়োগ জনিত বিষন্নতার মধ্যে, ঢাকা পড়িয়া গেল।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার মাতা, প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় সমাজভুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। তদুত্তরে উমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"মা! যদি হিন্দুধর্ম্মের কোন বিশেষত্ব থাকে, স্বাতন্ত্র্য থাকে, পবিত্রতা থাকে, তাহা হইলে বিলাতে বাস করায় তাহা আমার গিয়াছে। আমি একটা শাস্ত্রীয়-অনুষ্ঠানের সহায়তায়, জাতে উঠিয়া তোমার ও কুলদেবতা রাধাকান্তের পবিত্রতা নষ্ট করিতে চাই না। তবে আমি তোমার খুব কাছেই থাকিব—যাহাতে তুমি সর্ব্বদা আমায় দেখিতে পাও—তাহাও করিব। সন্তানের কর্ত্তব্য যে সমস্ত কাজ, তাহা করিতেও আমি বিরত থাকিব না।"

ভবিষ্যৎ জীবনে, তিনি অক্ষরে অক্ষরে এ প্রতিজ্ঞা-পালন করিয়াছিলেন। খিদিরপুর সোনাই নামক স্থানে, তাঁহার পিতামহের যে বাড়ী ছিল, তাহার অবস্থা তখন অতি জীর্ণ। গিরিশবাবু সোনাই ত্যাগ করিয়া, তখন বলরামদের-ষ্ট্রীটের বর্ত্তমান বাটী খরিদ করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র পিতা-

মহের এই ভদ্রাসনের নবভাবে সংস্কার করিয়া, লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ভবিষ্যতে এইস্থানে এক প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা নিম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কম্পাউণ্ডের মধ্যে তিন চারিটী পুষ্করিণী-খনন করিয়া, তাহা জননীকে দিয়া প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। নবগৃহ প্রবেশের পূর্ব্বে, উমেশচন্দ্রের জননী, এই বাটীতে হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে গ্রহযাগ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করান। তাহার কয়েকমাস পরে, সাহেবী-ধরণে এই বাটীটি সজ্জিত করিয়া, উমেশচন্দ্র বহুদিন এই বাটীতে বসবাস করেন। এখন এ প্রাসাদ-তুল্য বাটীর চিহ্ন মাত্র নাই। খিদিপুরের-ডকে এই বাটী গ্রাস করিয়াছে। ইহার পর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, পার্কষ্ট্রীটের মধ্যে ৬নং সুবৃহৎ ত্রিতল বাটীটি খরিদ করেন। এই বাটীতে ১৮৫৯ হইতে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, সার জন পিটার গ্রাণ্টের আবাসস্থান ছিল। গ্রাণ্ট সাহেব, এই বাড়ীটিকেই লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরগণের প্রাসাদে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য, ভারত-গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে "বেল্‌ভেডিয়ার-প্রাসাদটী" লাট-সাহেবদের বাসের জন্য নির্ব্বাচিত করায়, ছোটলাট গ্রাণ্টের এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

উমেশচন্দ্র যে সময়ে সর্ব্ব প্রথমে ব্যারিষ্টারি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন—সেই সময়ে হাইকোর্টে আরও দুইজন বাঙ্গালী-ব্যারিষ্টার ছিলেন। ইহাদের একজন বঙ্গের অমর-কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও অপর ব্যক্তি স্বনামখ্যাত স্বদেশ-হিতৈষী মহাপ্রাণ মনোমোহন ঘোষ। মনোমোহন মফঃস্বলের ব্রিফ্‌ লইয়াই কিছু ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন, আর মাইকেলের ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে আদৌ মনোযোগ ছিল না। থাকিলে আমরা হয়ত মেঘনাদ বধ, তিলোত্তমা, ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্যগুলি, বঙ্গ-সাহিত্যের অলঙ্কাররূপে পাইতাম না। ক্রমে ক্রমে উমেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উদীয়মান ব্যারিষ্টার হইয়া পড়িলেন। দিনে দিনে তাঁহার যশঃপ্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। এই সময়ে সাহেব-ব্যারিষ্টারগণ দলে পুষ্ট—বাঙ্গালীর মধ্যে একা উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্র—শোভাবাজার রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট এ সময়ে যথেষ্ট সাহায্য পান। এইজন্ত উমেশচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম "কমলকৃষ্ণ সেলী বনার্জ্জি" রাখেন। উমেশচন্দ্রের আয় ভবিষ্যতে মাসিক দশ হাজার টাকার উপর হইয়াছিল। বাঙ্গালীর মধ্যে, ইনিই

প্রথমে Standing-Counsel হয়েন। একবার নয়, চারি চারিবার উমেশচন্দ্র এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট দুইবার তাঁহাকে হাইকোর্টের জজের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র, তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। উমেশচন্দ্র, ন্যাশান্যাল-কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহার স্থায়িত্ব জন্য, তিনি বিলাতে গিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বিলাতের "ইণ্ডিয়া" কাগজের জন্যও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। কয়েকবার ইনি জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে উমেশচন্দ্র, ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া শরীরের অসুস্থতা বশতঃ ইংলণ্ডে গমন করেন। লণ্ডনের সান্নিধ্যে "ক্রয়ডেনে" খিদিরপুর-হাউস নামধেয় এক প্রাসাদতুল্য বাটীতে উমেশচন্দ্র বিলাতে থাকিতেন। এবাটী তাঁহার নিজের সম্পত্তি। বিলাতে গিয়া তিনি প্রিভি-কৌন্সিলে প্রাকৃটিস্ আরম্ভ করেন। পসারও খুব জাঁকিয়াছিল। তৎপরে পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এ সময়ে চক্ষুরোগে আক্রান্ত হওয়ায়, তাঁহাকে কর্ম্মময় জীবন হইতে অবসর লইতে হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দ ২১ জুলাই, বিলাতের এই "খিদিরপুর-হাউসেই" ইহাঁর দেহত্যাগ হয়। বাহিরে সাহেবী-ভাবাপন্ন হইলেও উমেশচন্দ্র অন্তরে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী খুব কম জন্মিয়াছে। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ সেলি বোনার্জ্জি এখন হাইকোর্টের রিসিভার। অন্যতম পুত্র আর, সি, বোনার্জ্জি হাইকোর্টে বারিষ্টারি করিতেছেন।

দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট।

দয়ারাম বসু—পলাশী আমলের লোক। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর যে ক্ষতিপূরণের টাকা, কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে বিতারিত হইয়াছিল,—তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য, কয়েকজন বাঙ্গালী কমিশনার নিযুক্ত হন। দয়ারাম বসু—ইহাঁদের অন্যতম। ইহাঁর বংশোদ্ভূত দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর নাম হইতেই উল্লিখিত পথের নামকরণ হইয়াছে। ১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে দেওয়ান কৃষ্ণরামের জন্ম হয়। কৃষ্ণরাম লবণের ব্যবসায়ে যথেষ্ট ধনশালী হইয়া উঠেন। ভবিষ্যতে ইনি মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে হুলগীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময়, দেওয়ান কৃষ্ণরাম লাখ-টাকার চাউল বিতরণ করিয়া-

ছিলেন। দেওয়ান কৃষ্ণরাম, কাশীতে অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—এবং কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা ছিল, তাহার দুই-ধারে পথিকদের ব্যবহারের জন্য আম্রবৃক্ষ শ্রেণী বসাইয়া দেন। ৭৪ বৎসর বয়সে ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে, দেওয়ান কৃষ্ণরামের মৃত্যু হয়।

মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর গলি।

এই গলিটী শিমলা অঞ্চলে। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, আদর্শ বৈষ্ণব ও পরম ভাগবত ছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, পরম পণ্ডিত, বৈষ্ণব চূড়ামণি, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এখন বঙ্গের সর্ব্বত্রই পরিচিত। অতুলকৃষ্ণের বাহ্য-সৌন্দর্য্য যেমন মনোরম—তাঁহার অন্তরও সেইরূপ সুন্দর। এরূপ বিনয়ী শিষ্টাচারী, পণ্ডিত লোকের সহিত যাঁহারা একবার আলাপ করিয়াছেন—তাঁহারাই মোহিত হইয়াছেন। কার্য্যে, কথায়, ব্যবহারে, আচারে—ইনি আদর্শ-বৈষ্ণব। কেবল পাণ্ডিত্যের ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের জন্য নয়—অতুলকৃষ্ণ, বঙ্গদেশে একজন সুবক্তা বলিয়াও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত—প্রভৃতি অনেকগুলি বৈষ্ণবগ্রন্থ, ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

মতিলাল শীলের ষ্ট্রীট।

মতিলাল শীল (১৭৯২—১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দ) লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে জন্ম গ্রহণ করেন। মতিলালের প্রথম জীবন অবস্থাহীনতা নিবন্ধন সুখের ছিল না। এই মহাত্মার পিতার নাম চৈতনচরণ শীল। মতিলাল, বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখা-পড়া শিখিয়া যৌবনে কলিকাতার-কেল্লায় একটী কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি কর্ক ও বোতলের ব্যবসা করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। এই অর্থ—তাঁহার প্রথম লক্ষ্মীলাভ। স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার প্রথম পুরস্কার। ইহার পর ইনি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া, কলিকাতার বন্দরে যে সমস্ত বাণিজ্য জাহাজ আসিত, তাহাদের মুৎসুদ্দি পদে নিযুক্ত হন। কাপ্তেনদের নিকট এই মুৎসুদ্দীগিরি এবং মালামাল বিক্রয়ে ও ক্রয়ে মতিলাল বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে তিনি প্রচুর ধনেশ্বর। জাহাজের কাপ্তেনী ছাড়িয়া এই সময়ে মতিলাল, হৌসের মুৎসুদ্দিগিরি আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে, তিনি তিনটী বড় বড় নামজাদা সওদাগরী

আফিসের মুচ্ছদ্দী হন। মা লক্ষ্মীর কৃপাপাত্র হইয়া, মতিলাল তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ অনেক পুণ্যানুষ্ঠানে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইনি "শীল্‌স্‌-স্কুল" স্থাপন করেন। প্রথমে এই বিদ্যালয়ের এক টাকা বেতন ছিল। কিন্তু পরিশেষে মতিলাল বিদ্যালয়টীকে "ফ্রি" করিয়া দেন। এখন এটী কালেজে পরিণত হইয়াছে ও অনেক গরীবের ছেলে এই ধনকুবের মতিলালের কালেজে, বিনা বেতনে লেখা-পড়া শিখিয়া দুই পয়সা উপায় করিয়া খাইতেছে। এই কালেজের পরিচালনার জন্য, মতিলাল অনেক টাকা মূলধন দিয়া গিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মত—মতিলালও এক অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এ অতিথিশালা ই, বি, রেলওয়ের বেল-ঘরিয়া নামক স্থানে। আগে প্রতিদিন তিন চারিশত অতিথি-সেবা হইত। কলিকাতায় মেডিকেল-কলেজ স্থাপন জন্য, মতিলাল বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দান করেন। মতিলাল এক কথায় শরণাগত-পালক, বিপন্নের রক্ষক। পরোপকারের জন্যই বিধাতা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আরও অনেক সৎকার্য্যে, মতিলালের দান আছে। সব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিবার স্থান আমাদের নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে মতিলাল শীল মহাশয় গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। গঙ্গাতীরে সাধারণের স্নানের জন্য, ইনি একটী ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা "মতিশীলের ঘাট" বলিয়া পরিচিত।

প্যারীচরণ সরকারের ষ্ট্রীট।

যাঁহার ফার্ষ্টবুক, সেকেণ্ডবুক, থার্ডবুক পড়িয়া বাঙ্গালী প্রথম ইংরাজী শিখে—সেই মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার হইতেই, এই পথটীর নামকরণ হইয়াছে। ১৮২৩ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। হেয়ার সাহেবের স্কুলে ইনি প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিন বৎসর হেয়ার-স্কুলে পড়িয়া ইনি জুনিয়ার স্কলারশিপ্ প্রাপ্ত হইয়া, হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। পরে সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪০৲ বৃত্তি পান। স্কুল ছাড়িয়া, ইনি মাষ্টারী আরম্ভ করেন এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রণয়নেই, প্যারী-চরণ জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। হুগলী ব্রাঞ্চ ও বারাসত বিদ্যালয়ে মাষ্টারী করার পর, ইনি হেয়ার-স্কুলের হেড-মাষ্টার হন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে, বাঙ্গালীকে ইংরাজী ভাষায় অধ্যাপক করা হইত

না। প্যারীচরণই প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী ভাষার প্রথম অধ্যাপক। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, এডুকেশন গেজেট পত্রিকা প্রতিষ্ঠা হইলে, প্যারীচরণ তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হন। প্যারীচরণ ছাত্রদের বড়ই প্রিয় ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে দেবতার স্থায় ভক্তি করিত ও তিনিও তাঁহাদের পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। প্যারীচরণের চেষ্টায়, "সুরাপান-নিবারিনী-সভা" প্রতিষ্ঠা হয়। সাধারণকে সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্ম ইংরাজীতে Well-wisher ও বাঙ্গালায় "হিতসাধক" বলিয়া দুইখানি পত্রিকা প্রচার এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্ম প্যারীচরণ চোরবাগানে একটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার মহা দুর্ভিক্ষের সময়, প্যারীচরণ একটী অন্নসত্র খুলিয়া, অনেককে অন্ন দান করেন। ৫২ বৎসর বয়সে—বহুমূত্র রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার ফার্ষ্টবুক, সেকেণ্ডবুক প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থগুলি আজও সমাদৃত।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্বনামধন্য পুরুষ। পাথুরিয়া-ঘাটা ষ্ট্রীটে, তাঁহার প্রাসাদ যেখানে ছিল, এখন সেখানে "Tagore Castle" হইয়াছে। ইনি গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং মহারাজা বাহাদুর স্যর যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের খুল্লতাত। প্রসন্নকুমার, অতুল ধনেশ্বর ছিলেন। তিনি ওকালতী পাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখনও প্রাক্‌টিস করেন নাই। আবার অন্ম মতে, স্বশ্রেণীর ধনবানগণের মধ্যে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ প্রদর্শন করিবার জন্ম, ওকালতী করিয়া বৎসরে গড়ে দেড়লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে, যখন গভর্ণমেণ্ট লাখেরাজ-জমী বাজেয়াপ্ত করিবার জন্ম, প্রস্তাব করেন তখন প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর বেঙ্গল-হরকরা নামক সংবাদপত্রে, এই সম্বন্ধে তীব্রভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের এই আন্দোলন ও টাউনহলে এ সম্বন্ধে এক বিরাট সভা, ভবিষ্যতে সুফল প্রসব করিয়াছিল। তখনকার গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড, এই আন্দোলনের ফলে নিয়ম করিয়া দেন, যে পঞ্চাশ বিঘার অনধিক লাখেরাজ জমীগুলির বাজেয়াপ্ত বন্ধ হইল। লর্ড ড্যালহৌসীর শাসনকালে ব্যবস্থাপক-সভার সৃষ্টি হইলে প্রসন্নকুমার ঐ সভার ক্লার্ক-এসিষ্টাণ্টের পদে নিযুক্ত হন ও গভর্ণমেণ্টকে আইন-প্রণয়নে সাহায্য করেন।

বাঙ্গালীর মধ্যে, তিনিই বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম সভ্য হন, কিন্তু পীড়িত থাকায়, এ কার্য্য করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেণ্ট ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে, তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি দেন। তিনি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ৩০শে আগষ্ট দেহত্যাগ করেন।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের লেন।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, স্মল-কজ-কোর্টের জজ স্বনামখ্যাত হরচন্দ্র ঘোষের পুত্র। ইঁহাদের আদিনিবাস—বেহালা-সরশুনা। এখনও এই সরশুনায় ঘোষ পরিবারের আবাস-বাটীর নিকটে, রাজা বসন্তরায়ের খনিত কমলা ও বিমলা ও রায়দীঘি নামক তিনটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে। প্রতাপ ঘোষ মহাশয়, একজন বিখ্যাত জমিদার। বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে ইঁহার প্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ অট্টালিকা বিদ্যমান। প্রতাপচন্দ্র, বহুদিন কলিকাতা-কালেক্টারিতে "রেজিষ্ট্রার-অব-এসিওরেন্স" পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। এখন তিনি পেন্সন লইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, নির্জ্জনবাস করিতেছেন।

রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট।

এ রাস্তাটী, বর্ত্তমান বিডন-ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিসের পার্শ্ব দিয়া, বরাবর মাণিকতলা ষ্ট্রীটে গিয়া মিলিত হইয়াছে। রাজা গুরুদাস, মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র এবং নবাব মীরজাফরের আমলে, দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমারের শোচনীয় পরিণামের পর, গুরুদাস কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে যান। বর্ত্তমান বিডন-গার্ডন—এখন যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, জনপ্রবাদ এই—এই স্থানেই মহারাজা নন্দকুমারের আবাসভবন ছিল, এবং এই বাটী হইতেই, বৃদ্ধ মহারাজা সুপ্রীমকোর্টের জজ লিমেষ্টারের আদেশে গ্রেফ্‌তার হইয়া, সেকালের কলিকাতা-জেলে প্রেরিত হন।

রাজা কালীকৃষ্ণের লেন।

রাজা বাহাদুর কালীকৃষ্ণের নামানুসারে, এই পথের নামকরণ হইয়াছে। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পৌত্র। বিডন-স্কোয়ারের বর্ত্তমান উদ্যানে, এই কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের এক প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ লেন।

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ, মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পুত্র। হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতেন, এবং বহুদিন ধরিয়া তিনি শিয়ালদহের পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

রাজা গোপীমোহন ষ্ট্রীট।

রাজা গোপীমোহন দেব, মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পোষ্য-পুত্র। গোপীমোহন—সুপ্রীম-কৌন্সিলের মেম্বর মিঃ ষ্টেবলস্, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সার জেমস্ রিভেট কার্ণাক (প্রথম কমাণ্ডার ইন্‌চিফ) স্যার জন ম্যাকফারসন (বঙ্গের প্রতিনিধি-গভর্ণর) প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের দেওয়ানী করিয়াছিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের আমলে, ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে, গোপীমোহন "রাজা-বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক, গোপীমোহনকে বড়ই ভাল বাসিতেন। অনেক সময়ে রাজকার্য্যাদি সম্বন্ধে, তাঁহাকে ডাকিয়া পরামর্শ লইতেন। গোপীমোহন সংস্কৃত-ভাষায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য-লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সময় ন্যায় দর্শন ও উপনিষদ প্রভৃতির কূটতর্ক তুলিয়া ও তাহার মীমাংসা করিয়া তিনি অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিস্ময়োৎপাদন করিতেন। ভূগোল ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনা ছিল। হিন্দু-ভূগোলের মতে তিনি প্রচুর ব্যয়ে, পৃথিবীর একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করান। গোপী-মোহনই, সেকালের সর্ব্বজনবিদিত "ধর্ম্মসভা" স্থাপন করেন। ধনীদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে—ইনি তাহা শালিসি দ্বারা মিটাইয়া দিতেন। সংগীতশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে ১৭ই মার্চ্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র, স্বনামখ্যাত রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ লেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, স্যর রাজা রাধাকান্তের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮১৫ খৃঃ অব্দের জুন মাসে তাঁহার জন্ম। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে, ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা-বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের ৩০ এপ্রিলের গেজেটে, গবর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত বক্তব্যটী প্রকাশিত হয়—"রাজা রাধাকান্ত দেবের উন্নত চরিত্র, পরোপকার ব্রত, এবং তিনিও

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টকে যেরূপ ভাবে বরাবর সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন তজ্জন্য, ভাইসরয় ও সকৌন্সিল গবর্ণর়জেনারেল—কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেবকে (স্যর রাধাকান্তের পুত্র) রাজা-বাহাদুর উপাধি দান করিলেন।" রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ সংস্কৃত, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন। "কায়স্থকুল-সজ্জ-রক্ষিণী সভা", ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা জমীদার-সভা ও সমাজ-ধর্ম্ম-বর্দ্ধিনী সভার সভাপতিত্ব পদেও তিনি কয়েকবার বরিত হন। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর প্রজাহিতৈষী জমীদার ছিলেন। তাঁহার জমীদারীর মধ্যে অনেক স্থানে তিনি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন, ও গ্রামে গ্রামে নিম্ন-প্রাইমারী শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপন করেন। নানা সৎকার্য্যে অর্থসাহায্য, লোক হিতকর সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া, তিনি দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র, কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক পাথুরিয়া-ঘাটার সুবিখ্যাত মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈষ্ণবদাস মল্লিকের পোষ্যপুত্র। চোরবাগানে, এই রাজা বাহাদুরের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা "মার্ব্বেল-প্যালেস্" বলিয়া সাহেব মহলে পরিচিত। এতাদৃশ সুবৃহৎ রাজ-প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, কলিকাতায় খুব কমই আছে। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ আমরা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের পরিচয়ে দিয়াছি। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে রাজা-বাহাদুর প্রতিদিন অসংখ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোককে, আহার্য্য প্রদান করিতেন। এখনও পর্য্যন্ত ইঁহার বংশধরেরা, একটী অতিথিশালা বজায় রাখিয়াছেন। এই কলিকাতা সহরে, প্রত্যহ দুই তিন শত গরীব ভিখারী এই অতিথিশালা হইতে নিয়মিত অন্ন প্রাপ্ত হয়।

রমাপ্রসাদ রায় ষ্ট্রীট।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বনামখ্যাত, রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রের নাম রমাপ্রসাদ রায়। তাঁহার নাম হইতেই এ পথের নামকরণ হইয়াছে। রমাপ্রসাদ হাইকোর্টে ওকালতী কার্য্য করিয়া, প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই উকিলশ্রেণী হইতে সর্ব্বপ্রথমে প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ হাইকোর্টের জজরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু

বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটায়, তিনি হাইকোর্টের বেঞ্চে বসিতে পান নাই। রমাপ্রসাদ বিদ্যায় ও শক্তিতে পিতার সমকক্ষ না হইলেও, তাঁহার অনুপযুক্ত পুত্র ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত হিন্দী, পারসী ও ইংরাজী-ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পৈত্রিক বিষয়-আশয়ও তিনি নিজের বুদ্ধিবলে অনেক বাড়াইয়া গিয়াছেন। ২৪ পরগণা এবং অন্যান্য জেলায় ইহাদের জমীদারী আজও বর্ত্তমান। রমাপ্রসাদ রায়ের দুই পুত্র—বাবু হরিমোহন রায় ও বাবু প্যারীমোহন রায়। সুকিয়াজ্ ষ্ট্রীটে, ইহাঁদের কলিকাতার বাসভবন।

রামমোহন মল্লিকের লেন।

বড়বাজারের মল্লিক-বংশের নিমাই মল্লিক মহাশয়ের প্রথম পুত্র রামমোহন মল্লিক। ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে রামমোহনের জন্ম হয়। রামমোহন অতিশয় দাতা ও সদাশয় লোক ছিলেন। দেবসেবা ও অতিথিসেবায়, তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। লবণের ব্যবসায়ে, তিনি যথেষ্ট অর্থ লাভ করেন এবং অনেক বড় বড় জমীদারী কিনিয়া যান। মৃত্যুকালে তিনি এক ক্রোর টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে পিতার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য, বড়বাজারে গঙ্গার-তীরে তিনি একটী স্নানের-ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের লেন।

মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কে, সি, আই, ই, রাজা রাজকৃষ্ণের পুত্র এবং মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌত্র। মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ, তাঁহার সময়ে একজন সর্ব্বজন-বিদিত ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণ রাজকার্য্য ও সভা-সমিতিতে তিনি অবাধে যোগ দান করিতেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত জমীদার-সভা বা ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েসন, মহারাজ স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বড়-লাটের মন্ত্রণা-সভায় একজন সদস্যপদেও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

স্যার রাজা রাধাকান্তের লেন।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব, রাজা গোপীমোহনের একমাত্র পুত্র। শোভাবাজার রাজবংশের তিনি কুল-প্রদীপ। সুপ্রসিদ্ধ "শব্দ-কল্পদ্রুম

নামক অভিধান, তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী ও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁহার সময়ে, তিনিই কায়স্থ-সমাজের নেতা ছিলেন একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজা রামমোহন রায়ের তিনি ঘোর প্রতিযোগী ছিলেন। রামমোহন একদিকে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারমত প্রচারে মহোদ্যোগী—অন্যদিকে স্যার রাধাকান্ত তেমনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে, হিন্দুসভার পরিচালনা করিয়া প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব জীবনের শেষ অবস্থায় বৃন্দাবনে বাস করেন ও সেইখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

সীতারাম ঘোষের

বেহালা বড়িবার—ঘোষ-পরিবারের আদিপুরুষ এই সীতারাম ঘোষ। তাঁহার পুত্র অভয়চরণ ঘোষ। তাঁহার পৌত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ হরচন্দ্র ঘোষ। হরচন্দ্র ঘোষই—ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী-জজ। এখনও হরচন্দ্রের একটী প্রস্তর-মূর্ত্তি (Bust) ছোট আদালতের প্রবেশদ্বারে বর্ত্তমান। বেহালা-শরশুনা ও বড়িশায়, ইহাঁদের অনেক জমীজমা ও জমীদারী আছে। ডায়মণ্ডহারবার রোডের ধারে—রাজা মাণিকচাঁদের গড়খাদ করা যে সুবৃহৎ বাগান ছিল, তাহা পরে হরচন্দ্রের পুত্র—প্রতাপচন্দ্রের দখলে আসে। এখন এই সুবৃহৎ উদ্যানের সমস্ত অংশ—বেহালার ধনাঢ্য-জমীদার স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অম্বিকাচরণ রায়ের সম্পত্তি-ভুক্ত। রায় অম্বিকাচরণের উপযুক্ত পুত্র, অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ রায়, হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল, সাউথ-সুবার্ব্বন-মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের মন্ত্রণা-সভার একজন সদস্য।

শোভারাম বসাকের ষ্ট্রীট ও লেন।

শোভারাম বসাক, পলাশী-আমলের একজন বিখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী। এই শেঠ ও বসাকগণ কলিকাতার আদিম অধিবাসী। সর্ব্ব প্রথমে ইহাঁরা সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া, জঙ্গল কাটাইয়া, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সহিত সুতার ও কার্পাস-শিল্পের ব্যবসায়ে, শেঠ ও বসাকগণ প্রচুর ধনসঞ্চয় করেন। জনপ্রবাদ এই, হলওয়েল সাহেব, শ্যামবাজারের নাম এক সময়ে চার্লস-বাজারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শোভারাম চেষ্টা করিয়া, তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্যাম-বসাকের

নামানুসারে, পুনরায় ইহা শ্যামবাজারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আবার অন্যমতে, শ্যামবাজার নাম অন্য কারণ হইতে হইয়াছে। সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কলুটোলায় শোভারাম বসাকের নামে একটী ষ্ট্রীট ও বড়বাজারে একটী লেন আছে।

শঙ্কর ঘোষের লেন।

দৈবকীনন্দন ঘোষ, আড়পুলীর ঘোষ-পরিবারের আদি-পুরুষ। দৈবকীনন্দনই, সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার পুত্রগণের নাম—উদয়রাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, মনোহর, গোকুল ও গোরাচাঁদ ঘোষ। ইহারা আড়পুলীর ঘোষ-বংশ বলিয়া পরিচিত। দৈবকীনন্দনের পৌত্র, রামশঙ্কর ঘোষের নাম হইতে বর্ত্তমান গলিটীর নামকরণ হইয়াছে। রামশঙ্কর ঘোষ মহাশয়, "শঙ্কর-ঘোষ" নামেই সাধারণে পরিচিত ছিলেন। কোন ইংরাজ-কাপ্তেনের অধীনে, বেনিয়ানের কাজ করিয়া, শঙ্কর ঘোষ, প্রচুর বিত্তশালী হয়েন। এই অর্থের অধিকাংশই তিনি ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিয়া যান। কলিকাতা চোরবাগানের মোড়ে, অর্থাৎ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর, এই শঙ্কর ঘোষ-প্রতিষ্ঠিত "সিদ্ধেশ্বরী" কালীমন্দির আজও বর্ত্তমান। মন্দিরগাত্রে আবদ্ধ, প্রস্তরফলকে—"শঙ্কর হৃদয়-মাঝে কালী বিরাজে" এই কয়টী কথাই—শঙ্কর ঘোষের স্মৃতি, বর্ত্তমানের সহিত জড়িত করিয়া রাখিয়াছে।

বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট।

দয়ার সাগর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৌরবান্বিত নামে—এই পথের নামকরণ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এ পথটীর এরূপ নামকরণে বড় কিছু আসে যায় না। তাঁহার প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, বর্ণপরিচয় পড়িয়া, বাঙ্গালী কয়েকযুগ ধরিয়া তাহাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া আসিতেছে। এরূপ উদ্যোগী, শ্রমশীল, কর্ম্মবীর বঙ্গদেশে কেন—সমগ্র ভারতে আর দ্বিতীয় কেহ জন্মিয়াছেন কি না, তাহা জানি না। ১২২৭ সালে (১৮২০ খ্রীঃ অব্দে) বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জননীর নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাসের অবস্থা ভাল ছিল না। নয় বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে, বীরসিংহ হইতে বিদ্যাসাগর পদব্রজে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত-কালেজে ভর্ত্তি হন।

সংস্কৃত-ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, ব্যবহার প্রভৃতি শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিয়া, ১৮৪০ খৃঃ অব্দে কলেজ হইতে "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। ১৮৪১ খৃ অব্দে বিদ্যাসাগর ৫০৲ টাকা বেতনে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর প্রতিষ্ঠিত "ফোর্ট-উইলিয়ম" কালেজের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। এই ফোর্ট-উইলিয়ম কালেজ, বিলাত হইতে নবাগত সাহেব সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাহেবদের লইয়া কাজ করিতে হইত বলিয়া, বিদ্যাসাগর এই সময়ে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে অমানুষী প্রতিভাবলে ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় সুদক্ষ হন। ইহার পর ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে, তিনি পুনরায় সংস্কৃত-কলেজে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে, তিনি আবার ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে ৯০৲ টাকা বেতনে আবার সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে, প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হইলে, দেড়শত টাকা বেতনে তিনি এই সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ পদে বরিত হন। পরে তিনি এই কর্ম্মের জন্য ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান ও Special Inspecter of Schools পদে নিযুক্ত হওয়ায়, এই দুই কার্য্যের জন্য তাঁহার পাঁচ শত টাকা বেতন হয়। এই সময়ে হিন্দু-বালবিধবাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, বিদ্যাসাগর "বিধবা-বিবাহ" নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। এজন্য সমস্ত হিন্দু-সমাজ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। এমন কি অনেকে গোপনে তাঁহার প্রাণবধ করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্ভীক-হৃদয় বিদ্যাসাগর, ইহাতে বিচলিত হন নাই। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে, ইনি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা "বিধবা-বিবাহ-আইন" বিধিবদ্ধ করাইয়া লয়েন। বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়, ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি নানাস্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে তৎকালীন শিক্ষা-বিভাগের যুবক ডাইরেক্টার ইয়ং সাহেবের সহিত, কোন কারণে মনোবাদ ঘটায়, তেজস্বী বিদ্যাসাগর এক কথায় পাঁচশো-টাকা বেতনের চাকরীতে ইস্তফা দিয়াছিলেন, এবং বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠোপযোগী পুস্তক প্রণয়নে মনোযোগ দেন। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষা-জননীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধনের জন্য, এই সময়ে গদ্য-সাহিত্যের যুগ পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকের বিক্রয়াধিক্যই এই সময়ে তাঁহার অর্থো-

পার্জ্জনের প্রধান উপায় হইয়াছিল এবং ইহা হইতেই বিদ্যাসাগর প্রভৃত ধনশালী হয়েন। পরদুঃখে বিদ্যাসাগরের হৃদয় স্বতঃই বিচলিত হইত। এরূপ দানবীর, অধুনাতন যুগে খুব কমই জন্মিয়াছেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে (১৮৬১ খৃঃ অব্দে) নিজ জন্মক্ষেত্র বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছয়মাসকাল শত সহস্র বুভুক্ষুর জঠরজ্বালা নিবারণ করেন ও অনেক বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করেন। কলিকাতার মেট্রপলিটান-কালেজ তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে মেট্রপলিটানে বি, এ, ক্লাস খোলা হয়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর গবর্ণমেণ্টের নিকট সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। তাঁহার নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামেও তিনি একটী উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক অনাথ দরিদ্র-বালক তাঁহার অর্থসাহায্যে লেখা পড়া শিখিয়া, মানুষ হইয়াছেন। অত বড় বিদ্যাসাগরের জীবনের সব কথা, এই ক্ষুদ্র স্থানে বলা অসম্ভব। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৯এ জুলাই, বাঙ্গালীর বিদ্যাসাগর অনন্তধামে গমন করেন।

বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট।

কুমারটুলীর মজুমদার পরিবার বহুদিন হইতে বিখ্যাত। রামচন্দ্র ঘোষ, এই পরিবারের আদিপুরুষ। হুগলীর নিকটস্থ আকনা গ্রাম হইতে আসিয়া, ইনি সুতানুটীর অন্তর্গত কুমারটুলীতে বাস করেন। নবাবের নিকট হইতে ইনি মজুমদার উপাধি লাভ করায়, এই পরিবার তদবধি কুমারটুলীর মজুমদার-পরিবার বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। বলরাম মজুমদার এই রামচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতার পৌত্র। এই মজুমদার পরিবার কাশীতে শিব স্থাপনা—মাহেশে দ্বাদশ মন্দির নির্ম্মাণ, কলিকাতা কুমারটুলিতে ঘাট-প্রতিষ্ঠা দ্বারা কীর্ত্তিমান হইয়াছেন।

হিদেরাম ব্যানার্জ্জির লেন।

হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বা হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকালের কলিকাতার একজন গণনীয় লোক ছিলেন। তাঁহার নামেই বর্ত্তমান গলিটীর নামকরণ হইয়াছে। সেকালে বহুবাজার অঞ্চলে অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থের বসবাস হইয়াছিল। তাঁহারা কোম্পানীর আমলে ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরী দ্বারা প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হইয়াছিলেন। হৃদয়রাম একজন ক্রিয়াবান লোক ছিলেন। দোল-দুর্গোৎসবে তিনি অনেক অর্থব্যয় করিতেন।

কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট।

কাশীপ্রসাদ মিত্র, ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুর, গবর্ণমেণ্টের তোষাখানায় দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইঁহার অন্যতম পুত্র, বাবু গোপাল লাল মিত্র হাই-কোর্টের উকীল ছিলেন। কাশী মিত্র মহাশয়ের নামে আজও একটী ঘাট কলিকাতা সহরে বর্ত্তমান। এখানে শবদাহ হইয়া থাকে। এই ঘাট "কাশী-মিত্রের ঘাট" বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

কাশী-ঘোষের ষ্ট্রীট।

শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, সেকালের কলিকাতার একজন নামজাদা লোক। তিনি পারসী-ভাষায় অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামদেব ঘোষ, কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে বক্সীর কাজ করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। রামদেবের পুত্র রামলোচন। রামলোচনের পুত্র—কাশীনাথ ঘোষ। কাশী ঘোষ, স্বনামপ্রসিদ্ধ ধনী শ্রেষ্ঠ রামদুলাল দের পরম বন্ধু ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামদুলাল ক্রোরপতি হইবার পূর্ব্বে, মদন দত্তের সরকার ছিলেন। এই মদন-দত্তের পুত্র কাশীপ্রসাদ দত্ত মহাশয়, হিন্দু সমাজ বিগর্হিত অখাদ্যাদি খাওয়ায়, তৎকালীন কায়স্থ-সমাজ, ইঁহাকে একঘরে করিবার চেষ্টা পান। রামদুলাল, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব মনিব পুত্রকে জাতিতে তুলিতে এক "সমন্বয়" সভার অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে অনেক বড় বড় কুলীন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হন। এই কার্য্যে রাম-দুলালের দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু কাশী ঘোষও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই সমন্বয়ের ফলে—কাশীপ্রসাদ দত্ত পুনরায় কায়স্থসমাজে গৃহিত হন। কাশী ঘোষ, সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ফেয়ারলি ফারগুসান কোম্পানীর বাড়ীর মুৎসুদ্দি ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। দান-ধ্যানও তাঁহার বিস্তর ছিল। মৃত্যুকালে ইনি ছয় পুত্র রাখিয়া যান।

জগদীশনাথ রায়ের লেন।

এই গলিটী হরিঘোষের ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বাবু জগদীশনাথ রায়ের নামে এই গলির নামকরণ হইয়াছে। জগদীশ বাবু একজন স্বনামধন্য পুরুষ। কাঁচরাপাড়া হইতে আসিয়া, ইনি কলিকাতার

বসবাস করেন। কাঁচরাপাড়ায় বিখ্যাত বৈদ্য-বংশে ইঁহার জন্ম। পুলিশ-বিভাগে অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া, জগদীশ বাবু ডিষ্ট্রিক্ট-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হন। জগদীশনাথ, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমবাবু, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বিষবৃক্ষ' এই জগদীশনাথকে উৎসর্গ করেন। দীনবন্ধু, বঙ্কিম, জগদীশ নাথ—এই তিন জনই এক সময়ে সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন ও তিনজনেরই যশোভাগ্য একরূপ ছিল। জগদীশনাথের জামাতা, জয়পুরের প্রধান রাজমন্ত্রী, স্বর্গীয় সংসারচন্দ্র সেন। জগদীশ বাবুর পুত্র বাবু খগেন্দ্রনাথ রায় একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী। ইংরাজী বাঙ্গালা সাহিত্যালোচনায় ইনি বিশেষ বিখ্যাত। খগেন্দ্রবাবু কলিকাতা পুলিসের একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট।

মাণিকতলা-ষ্ট্রীট

এই মাণিকতলা ষ্ট্রীটের একাংশে রামবাগান পল্লীর সান্নিধ্যে, রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসুর বাটী। রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয় একজন কৃতকর্ম্মা পুরুষ। ইঁহাদের আদিনিবাস ২৪ পরগণা বহড়ু গ্রাম। বহড়ুর বসুরা এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ জমীদার। শ্যামসুন্দর, ইঁহাদের গৃহদেবতা। বৈকুণ্ঠনাথ আজীবন যে সঙ্গীতানুরাগী হইয়া আছেন, তাহার কারণই এই শ্যামসুন্দর। বাল্যকাল হইতেই তিনি কীর্ত্তনের ও সঙ্গীতের বড়ই অনুরাগী। প্রেসিডেন্সি-কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া, ইনি গবর্ণমেণ্ট টাঁকশালের নায়েব—দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে, ইনি শিয়ালদহ পুলিস-কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা পুলিসের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া, ইঁহাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে, ইনি কারেন্সি-আপিসের ডেপুটী-ট্রেজারার হন। ইহার পর বৎসর ইনি ভারত-সম্রাটের রাজকীয় টাকশালের দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে রায়-বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে বৈকুণ্ঠনাথ অতি সুদক্ষ। সেতার, সুরবাহার, এসরার ও মৃদঙ্গাদি যন্ত্রবাদনে ইঁহার অতুলনীয় দক্ষতা। সাহিত্য-পরিষদের ইনি একজন গণনীয় সদস্য। সর্ব্ববিধ লোক-হিতকর সভা সমিতিতে ইনি উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। অনেকগুলি নাটক ও মেলো-ড্রামা ইঁহার রচিত। এগুলি

কলিকাতার বেঙ্গল, ন্যাশান্যাল, এমারেল্ড প্রভৃতি থিয়েটারে, খুব দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। সঙ্গীতের সুর-যোজনায়, ইনি অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ন্যায় বৈকুণ্ঠনাথ ইংরাজী সাহিত্যেরও যথেষ্ট আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহার ন্যায় নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, ইংরাজী-ভাষায় সমালোচক খুব কমই আছেন। বৈকুণ্ঠনাথ একদিকে যেমন বিদ্যাবান, অন্যদিকে তেমনি পরোপকারী, সুহৃদ-বৎসল, সদালাপী ও মিষ্টভাষী। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে ইনি পেন্সন গ্রহণ করিয়া এখনও কর্ম্মময় জগতে সুস্থ শরীরে বিচরণ করিতেছেন।

কেশবচন্দ্র সেনের গলি।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের নাম হইতে এই গলির নামকরণ হইয়াছে। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, একজন অদ্বিতীয় বক্তা ও ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায়, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে ইনি নববিধান-সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। কুচবিহারের স্বর্গগত মহারাজ বাহাদুরের সহিত, কেশব বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ দেন। বর্ত্তমান কুচবিহারাধিপতি, এই কন্যার গর্ভজাত সন্তান ও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৌহিত্র। কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় অদ্বিতীয় ইংরাজী-বক্তা, এদেশে খুব কম জন্মিয়াছেন। কেশবচন্দ্র, দেওয়ান রামকমল সেনের পৌত্র। রামকমল সেন ১৮০০ খৃঃ অব্দে গরিফা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। রামকমল সেন, সরকারী টাকশাল ও বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের দেওয়ানী করিয়া প্রচুর বিত্তশালী হন। রামকমল সেনের বাটী লর্ড কর্জ্জন একটী ট্যাবলেট দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ৮ই জানুয়ারী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

বোসপাড়া লেন।

এই বোসপাড়া-লেন, অতি পুরাতন পল্লী ও অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন-কায়স্থ এই পল্লীতে বাস করেন। প্রসিদ্ধ নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, এই বাগবাজার বসু-পাড়াতেই জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—নীলকমল ঘোষ। পাঠশালাতে প্রতিভার আধার, গিরিশ-চন্দ্রের প্রথম হাতে খড়ি। তার পর তিনি গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে (বর্ত্তমান ওরিএন্টাল সেমিনারি) ও হেয়ারস্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করেন। দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ অর্থাৎ ১১ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ও ১৪

বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায়, গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা, এইখানেই শেষ হয়। গিরিশচন্দ্র, সর্ব্বপ্রথমে বাগবাজারে একটী থিয়েটারের দল করিয়া সধবার একাদশী অভিনয় করেন এবং ইহাতে নিমচাঁদের ভূমিকা লয়েন। পরে এই থিয়েটার, যোড়াসাঁকোর সান্ন্যাল-বাড়ীতে উঠিয়া আসে। ইহাই প্রথম ন্যাশানাল-থিয়েটার। প্রথমে ইহা অবৈতনিক ছিল। কিন্তু অধ্যক্ষেরা টিকিট বিক্রয় আরম্ভ করায়, গিরিশচন্দ্র ইহার সংস্রব ছাড়িয়া দেন। তৎপরে বিডন ষ্ট্রীটে, গ্রেট-ন্যাশনাল-থিয়েটার আরম্ভ হইলে, গিরিশচন্দ্র একশত টাকা বেতনে ইহার ম্যানেজার হন। এই সময় হইতে গিরিশচন্দ্রের অমৃত-নিস্যন্দিনি লেখনী হইতে, অমৃতধারা বর্ষিত হইতে আরম্ভ হয়। আমরা আজকাল বঙ্গীয় নাট্যশালাকে যে বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি, তাহা গিরিশচন্দ্রের জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল। ষ্টার ও মিনার্ভা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। বঙ্গীয় নাট্যশালার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার প্রধান উপলক্ষ্য গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার উপযুক্ত সঙ্গীদ্বয় বাবু অমৃতলাল বসু ও স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। গিরিশচন্দ্র গভীর জ্ঞানী ও লোকচরিত্র রহস্যজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কয়েকখানি নাটক যথা, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। এমন এক যুগ গিয়াছে—যে যুগে চৈতন্যলীলা ও বুদ্ধদেব, এই বঙ্গদেশে এক বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র নিজের কীর্ত্তিস্তম্ভ নিজে স্থাপন করিয়া দিব্য-ধামবাসী হইয়াছেন। অর্দ্ধেন্দু ও পূর্ণেন্দুর মত জ্যোতিঃবিকাশ করিয়া, মরজগতে চিরবিশ্রামলাভ করিয়াছেন, তবে সুখের বিষয় এই যে, অমৃতলাল বসু মহাশয় এখনও বর্ত্তমান। অমৃতবাবুর নূতন পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইনি দক্ষতার সহিত ষ্টার-থিয়েটারের অধ্যক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন। ব্যঙ্গরহস্য রচনায়, দীনবন্ধুর পর অমৃতলালের আসন। তাঁহার বিবাহ-বিভ্রাট, প্রভৃতি প্রহসন আজও সমাদরে সর্ব্বত্র অভিনীত। বিজয়বসন্ত, তরুবালা প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক ও অমৃতমদিরা নামক কাব্য প্রণয়ন করিয়াও অমৃত-বাবু যশস্বী হইয়াছেন। অমৃতলালের প্রতিভা, বহুবিষয়-প্রসারিণী। ভারত-বর্ষের ইতিহাস পাঠের জন্য, অমৃতলাল বহু অর্থব্যয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য ইংরাজি ইতিহাস গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, এক পাঠাগার স্থাপন করেন। নাট্যশালার বর্ত্তমান উন্নতির জন্য গিরিশচন্দ্রের ন্যায় অমৃতলালও জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছেন। নাট্যরথী, স্বনামপ্রসিদ্ধ বাবু অমরেন্দ্র নাথ দত্ত, সুপ্রসিদ্ধ অভি-নেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (গিরিশ বাবুর পুত্র) ও গিরিশচন্দ্রের শ্যালক

পুত্র—প্রসিদ্ধ অভিনেতা বাবু চুনীলাল দেব ও নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য ও নাট্যজগতে যশস্বী অভিনেতা। গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতির সহিত কলিকাতার থিয়েটারগুলির অস্তিত্ব সর্ব্ববিধায়ে বিজড়িত। গিরিশচন্দ্র নিজের কীর্ত্তি, নিজেই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একজন প্রধান ভক্ত-শিষ্য। গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনে রচিত তপোবল এবং শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অমৃতময় ফল।

নিমু গোঁসাইয়ের গলি।

আজও একটী প্রবাদ-বাক্য কলিকাতায় প্রচলিত আছে—যে "জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমাই, চৈত্রমাসের রাস।" নিমাইচাঁদ গোস্বামী, আহিরী-টোলা গোঁসাই-বংশের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। এখনও তাঁহার বংশধরেরা পৈত্রিক-ভদ্রাসনে বহু গোষ্ঠীরূপে বাস করিতেছেন। নিমু গোঁসাইয়ের রাস, সেকালের কলিকাতায় একটা দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। নানা দেশ হইতে দর্শকগণ এই রাস দেখিতে আসিত। চৈত্র মাসেই এই রাস হইত। এই গোঁসাই-বংশ এখনও উন্নত অবস্থাসম্পন্ন।

খেলাতচন্দ্র ঘোষের লেন।

খেলাতচন্দ্র ঘোষ, দেওয়ান রামলোচন ঘোষের পৌত্র। দেওয়ান রামলোচন, গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। আবার কোন কোন মতে, তিনি লেডি-হেষ্টিংসের বেনিয়ান ছিলেন। সাধারণতঃ তিনি গভর্ণরের দেওয়ান বলিয়াই পরিচিত। পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে এই দেওয়ান রামলোচনের বংশধরেরা—পাশাপাশি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, বহুদিন হইতে এ অঞ্চলে বাস করিতেছেন। পাথুরিয়া ঘাটার ঘোষবংশ, বিশেষতঃ খেলাত ঘোষ মহাশয়, অনেক ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া যশস্বী হন। খেলাতচন্দ্রের খুল্লতাত, আনন্দনারায়ণ ঘোষ। সেকালের ধর্ম্মতলার বাজার, সর্ব্বপ্রথমে আনন্দনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইহার নাম ছিল "আনন্দ-বাজার।" খেলাতচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্র, রমানাথ ঘোষ মহাশয় পিতার পদাঙ্কানুসরণে, ক্রিয়াকলাপাদি বজায় রাখিয়া, যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।

চূড়ামণি দত্তের পুত্রের নাম—কালীপ্রসাদ দত্ত। কালীপ্রসাদ দত্তের

নাম হইতেই এই গলিটীর নামকরণ হইয়াছে। চূড়ামণি দত্ত, শোভা-বাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক ছিলেন। চূড়ামণি ও নবকৃষ্ণের মধ্যে, স্ব স্ব সমাজের দলপতিত্ব লইয়া, অনেক মনোবাদ ঘটিয়াছিল। চূড়ামণি দত্ত সম্বন্ধে কয়েকটী গল্প আমরা ইতিপূর্ব্বে কালীঘাট-প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এক সময়ে কোন সামাজিক পাপের জন্য এবং শত্রুদের চক্রান্তে, চূড়ামণির পুত্র কালীপ্রসাদ, সমাজচ্যুত হয়েন। রাজারদলের লোকেরা প্রবল হইয়া, তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। সেকালে এইরূপ সামাজিক দলাদলির বড়ই প্রাবল্য ছিল—আর এই সব ব্যাপার লইয়া, উভয়পক্ষের মধ্যে যথেষ্ট মনোবাদ জন্মিত। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও রাজা নবকৃষ্ণের দল—চূড়ামণির দলকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। কালীপ্রসাদ দত্ত বিপদে পড়িয়া, বড়িষার সাবর্ণ-জমীদার সন্তোষরায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। সন্তোষরায় একজন পরোপকারী দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমীদার ছিলেন। তিনি কালীঘাট, ভবানীপুর, বেহালা, বড়িষা, শরশুনা প্রভৃতি স্থানের কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া, কালীপ্রসাদের পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হইতে দেন নাই। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, কালীপ্রসাদ তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের পাথেয় স্বরূপ কয়েক সহস্র টাকা দেন। সন্তোষ রায়—এই টাকা কাহাকেও লইতে না দিয়া, কালীঘাটের বর্ত্তমান কালীমন্দির নির্ম্মাণার্থে তাহা প্রদান করেন, ইহাই জনপ্রবাদ।

শম্ভুনাথ পণ্ডিতের লেন।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নাম, সর্ব্বসাধারণে পরিচিত। সর্ব্বপ্রথমে রমাপ্রসাদ রায় হাইকোর্টের বাঙ্গালী-জজ হন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটায়—শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়, জজীয়তী পদ লাভ করেন। হাইকোর্টের বিচারগৃহে এখনও শম্ভুনাথের একখানি প্রমাণ তৈলচিত্র বর্ত্তমান। শম্ভুনাথের পিতার নাম শিবনারায়ণ পণ্ডিত। ইঁহারা কাশ্মিরী-ব্রাহ্মণ। শম্ভুনাথ, ভবানীপুরে আসিয়া বসবাস করেন। সেকালের সুপ্রীমকোর্টের তিনি একজন নামজাদা উকীল ছিলেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি উকীল-সরকারের কাজও করিয়াছিলেন। ছোট-আদালতের তদানীন্তন জজ, রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়কে গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী-জজরূপে নির্ব্বাচিত করেন।

কিন্তু এই সম্মানসূচক উচ্চপদ প্রাপ্তির পর, তাঁহার সহসা লোকান্তর ঘটায় পণ্ডিত শম্ভুনাথ এই পদ লাভ করেন। শম্ভুনাথ পাঁচ বৎসরকাল ধরিয়া, এই জজীয়তী করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত সরস্বতী মহাশয়, একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনিও হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন এবং এসিয়াটিক-সোসাইটির একজন সদস্য ছিলেন। ভবানীপুরে এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের বংশধরেরা আজও বাস করিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।

দেশহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র, আমাদের পূর্ব্ব যুগের লোক। মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম, বর্ত্তমানে কেবল ভবানীপুরের একটী প্রশস্ত পথ দ্বারা সুরক্ষিত। এতদ্ভিন্ন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েসন বা জমীদার-সভায় ইঁহার নামে একটী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত আছে। হরিশ্চন্দ্র, দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান এবং ভবানীপুরে মাতামহাশ্রমে পালিত। ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে, তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী হইলেও, অবস্থা-বৈগুণ্যে বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রথমে ইনি টুলা কোম্পানীর আপিসে আট টাকা বেতনে সামান্য কাজে নিযুক্ত হন। তৎপরে ২৫৲ টাকা বেতনে মিলিটারী অডিট-আপিসে একটী চাকরী পান। পরে এই আপিসে তাঁহার ৪০০৲ টাকা বেতন হয়। ইংরাজী-ভাষার উপর ইঁহার খুব দখল ছিল। হিন্দুপেট্রিয়ট—হরিশ্চন্দ্রের অবিনশ্বর কীর্ত্তি। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি একাকী এই পত্রিকার সম্পাদন ভার পান। হিন্দুপেট্রিয়টের সম্মান তখন এত বেশী ছিল, যে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং, এই পত্রিকা পড়িবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিতেন। নীলকর হাঙ্গামার সময়, হরিশ্চন্দ্র মহাসাহসের সহিত প্রজাদের হইয়া লেখনী চালনা করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, যুক্তিপূর্ণ সন্দর্ভ সমূহ, হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়া ইনি গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেন, যে বাঙ্গালীর ন্যায় রাজভক্ত জাতি আর নাই। ১৮৬১ সালে ১৪ই জুন ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

সার্কিউলার গার্ডেনরিচ্ রোড।

এই পথটী খিদিরপুরের পুলের নীচে হইতে আরম্ভ হইয়া, বরাবর মেটিয়াবুরুজের দিকে গিয়াছে। খিদিরপুরে এই পথের ধারে, যে বাড়িটী এখন মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের দখলে, সেই বাটীতে

কবি মাইকেল মধুসূদন বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। সার্কিউলার রোড হইতে কিছুদূরে, কবিশ্রেষ্ঠ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাস-বাটী। খিদিরপুর ধরিতে গেলে, বঙ্গের তিনটী শ্রেষ্ঠ কবির লীলা-নিকেতন। হেমচন্দ্র এই সার্কিউলার গার্ডেনরিচ রোড হইতে, অর্দ্ধ মাইল দূরে পদ্মপুকুর নামক স্থানে বাস করিতেন। এই সার্কিউলার রোডের পশ্চিমদিক হইতে ভূকৈলাসের রাজবাটীর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সার্কিউলার গার্ডেনরিচ্ রোড, সরাসর মেটিয়াবুরুজে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই মেটিয়াবুরুজে অযোধ্যার নির্ব্বাসিত শেষ নবাব ওয়াজিদ আলিসার বাসভবন ছিল। এখন তাহা ভগ্নস্তুপে পর্য্যবসিত। সার্কিউলার গার্ডেন-রিচ রোডের একটী উদ্যানবাটীতে সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম জজ—স্যর উইলিয়ম জোন্স বাস করিতেন। বর্ত্তমানে বেঙ্গল-নাগপুর-রেলের কার্য্যালয় সমূহ স্থাপিত হওয়ায়, এ অংশটী বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

রসাপাগলা রোড।

সাধারণতঃ ইহা রসারোড নর্থ ও সাউথ নামে পরিচিত। চৌরঙ্গী হইতে আরম্ভ হইয়া এই পথটী টালিগঞ্জের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পথের ধারেই কালীঘাট, ভবানীপুর প্রভৃতি উপকণ্ঠবর্ত্তী নগর। কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, এই স্থান ভয়ানক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। যে স্থান আজকাল ভবানীপুর চড়কডাঙ্গা বলিয়া পরিচিত, সেই স্থান কালিমাতার আদি সেবায়েত ভুবনেশ্বরের দৌহিত্র হালদার মহাশয়-গণের কয়েক ঘরের বাসের জন্য, একটী ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়। আগে এই সব স্থানে চোর ডাকাতের বড় ভয় ছিল। এই রসারোডের মত সুদীর্ঘ পথ কলিকাতায় খুব কমই আছে। রাস্তাটীর এরূপ নামকরণ কেন হইল, তাহা অনুমান করা বড়ই কঠিন।

বৈষ্ণবচরণ শেঠের ষ্ট্রীট।

শেঠ ও বসাকগণ সপ্তগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া, জঙ্গল কাটাইয়া বসবাস করেন। ইঁহারা কলিকাতার আদিম অধিবাসী। আগে ইঁহারা গোবিন্দপুরে বাস করিতেন, সুতানুটী অঞ্চলেও কয়েক ঘরের বসবাস ছিল। কলিকাতায় নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের সময় গোবিন্দ-পুরের জমী গৃহীত হওয়ায়, তাঁহারা বড়বাজারে গিয়া বাস করেন।

এই বড়বাজারে, শেঠ-বংশের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ গোবিন্দজীউ, আজও বর্ত্তমান। কোম্পানীর প্রথম আমলে—যাদবেন্দু শেঠ, বৈষ্ণবচরণ শেঠ শোভারাম বসাক, বৃন্দাবন বসাক ও কৃষ্ণচন্দ্র বসাক, বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। বৈষ্ণবচরণ শেঠ পরম হিন্দু ও অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সোমনাথ ও দ্বারকানাথের স্নানের জন্য—আবার কোন কোন মতে, মান্দ্রাজ-প্রদেশের রামরাজা বিগ্রহের জন্য, তিনি শীলমোহর করিয়া গঙ্গাজল পাঠাইয়া দিতেন। এই ধার্ম্মিক বৈষ্ণবচরণের নামে বর্ত্তমান পথটীর নামকরণ হইয়াছে।

বিডন ষ্ট্রীট।

স্যর সিসিল বিডন ১৮৬২ খৃঃ অব্দের এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া, পাঁচ বৎসরকাল বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণরের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ছোট লাট বিডনের নামেই বর্ত্তমান বিডন-ষ্ট্রীটের নামকরণ হইয়াছে। কয়েকটী এদেশীয় নাট্যশালার জন্য, এই বিডন-ষ্ট্রীট, সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। এই বিডন-ষ্ট্রীটের উপরই, স্বর্গীয় রামদুলাল সরকারের প্রাসাদতুল্য আবাস-ভবন। স্যর সিসিল বিডনের নাম, কেবল এই পথটী নহে—"বিডন-গার্ডেনের" সহিতও বিজড়িত। এই উদ্যানটী সাধারণের সান্ধ্য-ভ্রমণ-ক্ষেত্র। কলিকাতা সহরের প্রধান জনপূর্ণ স্থানের মধ্যে এই উন্মুক্ত ভ্রমণক্ষেত্র, শ্রান্ত নগরবাসীগণের পক্ষে বড়ই আরামপ্রদ স্থান। জনপ্রবাদ, এখন যেস্থান অধিকার করিয়া বিডন-বাগান প্রতিষ্ঠিত, এইস্থানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের কলিকাতার আবাস-বাটী ছিল।

বেলভেডিয়ার রোড।

বাঙ্গালার ছোট-লাটগণের আবাসস্থান ছিল বলিয়া, বেলভেডিয়ার এখন সর্ব্বজন পরিচিত। এই বেলভেডিয়ার রোডের আশে পাশে, দূরে অদূরে, সেকালের অনেক উচ্চপদস্থ ও গণনীয় ইংরাজগণ বসবাস করিতেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রভৃতি এইস্থানে বাগান-বাটীতে বাস করিতেন। জনপ্রবাদ এই, মসনদ-বিচ্যুত হইয়া নবাব মীরজাফর যখন কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন, তখন এই বেলভেডিয়ার রোডের সান্নিধ্যেই, তাঁহার কলিকাতার আবাস-বাটী ছিল। এ সম্পত্তি পরে তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে দিয়া যান। আর একটী জনপ্রবাদ এই,

বর্ত্তমানে যেস্থানে জুওলজিকাল বাগান প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানে মীরজাফর-প্রণয়িনী, ইতিহাস প্রসিদ্ধ মণি-বেগমের জন্য একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। এখনও এইস্থানকে লোকে "বেগম-বাটী" বলিয়া থাকে। বেল-ভেডিয়ার রাজপ্রাসাদের পার্শ্বেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ Duel Avenue বা দ্বন্দযুদ্ধের স্থান। এইস্থানে কৌন্সিলের মেম্বর, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের সহিত, গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দ্বন্দযুদ্ধ হয়। ইহার অদূরেই কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য, বারওয়েল সাহেবের বাটী। এই বাটী বর্ত্তমানে Kidderpur House বলিয়া পরিচিত।

ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট।

গ্রেট-ইষ্টারণ হোটেলের পার্শ্ব হইতে, এই গলিটী আরম্ভ হইয়া বরাবর বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। ইহার পুরাতন নাম রাণী-মুদির গলি। নবাব সেরাজউদ্দৌলা, যখন কলিকাতার পুরাতন দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই রাণীমুদির গলি বা ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-ষ্ট্রীটের সান্নিধ্যে নবাব-সৈন্যের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য, একটী তোপখানা বা ব্যাটারি স্থাপিত হয়। এই পথের পার্শ্বেই ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান বা জমীদার সভা। এই জন্যই পথটীর এইরূপ নামকরণ। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ এ, কে, রায় ও মিঃ কটন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত এই—"বর্ত্তমান গ্রেট-ইষ্টারণ হোটেলের নিকট সেরাজ সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য, একটী ব্যাটারি বা তোপমঞ্চ স্থাপিত হয়। এখানে ইংরাজ পক্ষ প্রাণপণে নবাব সৈন্যকে বাধা দিয়াছিলেন। "রণমদ গলি" হইতে এই রাণী মুদী নামকরণ হওয়া সম্ভব।" রাণীমুদী বলিয়া কোন মুদী সেকালে এস্থানে ছিল কি না, তাহা বলা দুষ্কর। কেহ কেহ অনুমান করেন, চন্দ্রপাল হইতে যেমন চাঁদপাল-ঘাট নাম হইয়াছে সেইরূপ রাণীমুদী হইতে এই গলির সেইভাবে নামকরণ হইয়াছিল।

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের গলি।

মেডিক্যেল-কলেজের অপর পারে প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের গলি। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, এই গলিতে জীবনের শেষ অবস্থায়, বাস করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জ্জন, এই সর্ব্বজন পূজ্য প্রতিভাময় ঔপন্যাসিকের স্মৃতি-রক্ষার জন্য, ইহার বাটীর গায়ে একটী প্রস্তর-ফলক মারিয়া দিয়াছেন। কাঁটালপাড়ার পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আসিবার পর, বঙ্কিমচন্দ্র এই বাটীটী ক্রয় করেন। এই বাটীতেই তাঁহার জীবনের শেষভাগে রচিত

উপন্যাস ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। এই বাটী হইতেই "রাজসিংহের" নূতন সংস্করণ "সীতারাম" ও "প্রচার" পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আবাস-ভবনের জন্যই, এই গলিটী বর্ত্তমানে বিশেষ বিখ্যাত।

বজবজ-রোড।

ডায়মণ্ড-হারবার রোড হইতে আরম্ভ হইয়া, এই পথটী বরাবর বজবজ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই পথটী বহুদিনের। ক্লাইভ কর্ত্তৃক কলিকাতা উদ্ধারের আয়োজন সংবাদ পাইয়া, রাজা মাণিকচাঁদ এই বজবজের রাস্তা দিয়া সসৈন্যে পলায়ন করেন বলিয়া, একটা জনপ্রবাদ আছে। নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিয়া দুর্গাধিকার করিলে, ড্রেক ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রথমতঃ বজবজে পলায়ন করেন ও তৎপরে ফলতায় আশ্রয় লন। এক সময়ে এই পথ দিয়া কোম্পানীর সৈন্যগণ, বজবজ দুর্গে যাতায়াত করিত। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল পর্য্যন্ত, বজবজ দুর্গের প্রাধান্য বজায় ছিল। তৎপরে বজবজ-দুর্গের সমস্ত কামান ও সাজসরঞ্জাম, নবনির্ম্মিত কলিকাতা ফোর্ট-উইলিয়মে আনা হয়।

ডায়মণ্ড-হারবার রোড।

খিদিরপুর হইতে আরম্ভ হইয়া এই পথটী আলিপুর, মমিনপুর, দুর্গাপুর, বেহালা, বড়িশা, ঠাকুরপুকুরের মধ্য দিয়া, আমতলা ও রাজার-হাট হইয়া, সরাসর ডায়মণ্ড-হারবারে গিয়াছে। জনপ্রবাদ এই, মহারাজ নবকৃষ্ণ এই পথটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই পথ দিয়া কোম্পানীর সেনারা কুচকাওয়াজ করিতে, পুরাকালে ডায়মণ্ড-হারবার দুর্গে যাইত। যখন ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত রেল হয় নাই, তখন এই পথই ডায়মণ্ড-হারবার যাইবার প্রধান উপায় ছিল। আলিপুরের সান্নিধ্যে, ডায়মণ্ড-হারবার ও আলিপুর-রোডের সন্ধিস্থলে "বিজয়-মঞ্জিল"। এই বিজয়-মঞ্জিলে, বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি, মহারাজ স্যর বিজয়চন্দ্র মহাতপ বাহাদুর বাস করিয়া থাকেন। মহারাজের অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, ও দেশের সকল হিতকর কার্য্য ও সভা সমিতিতে যোগদান করেন।

সার্কিউলার রোড।

সার্কিউলার রোডটী, কলিকাতার পূর্ব্বপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া, শ্যামবাজার

হইতে চৌরঙ্গীর পার্শ্ববাহী হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বর্গীর-হাঙ্গামের সময়, মারহাট্টা—ডিচের খনিত স্তূপাকার মৃত্তিকাকে সমভূমি করিয়া, এই প্রশস্ত পথটী নির্ম্মিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে, ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়া, লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে তাহা শেষ হয়। তখন ইডেন-গার্ডেন ও ষ্ট্রাণ্ড-রোড বর্ত্তমান ছিল না। এই সার্কিউলার রোডই সেকালের সাহেব-মেম্‌দিগের সান্ধ্যভ্রমণের স্থান ছিল। সার্কিউলার রোড নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে, ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বড়ই ডাকাতের ভয় ছিল।

কলেজ-ষ্ট্রীট।

হেয়ার-স্কুল, হিন্দু-স্কুল, প্রেসিডেন্সি-কলেজ, মেডিকেল-কলেজ ও সংস্কৃত-কলেজ প্রভৃতি এই পথের সান্নিধ্যে ও আশে পাশে অবস্থিত বলিয়া এই পথটি, কলেজ-ষ্ট্রীট নামে সাধারণে পরিচিত। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এই তিনটীর সমবায়ে একটী দীর্ঘ পথ, শ্যামবাজার পর্য্যন্ত সরাসর চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতার দেশীয়াংশে এরূপ সুবৃহৎ বর্ত্ম, খুব কমই আছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী বা বিশ্ববিদ্যালয়, এই পথের পার্শ্বে অবস্থিত। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটী আইন-কলেজ, ইউনিভার্সিটী লাইব্রেরী প্রভৃতি নির্ম্মিত হওয়াতে এই পথের সৌন্দর্য্য ও গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কর্ণওয়ালিস-ষ্ট্রীট।

সুপ্রসিদ্ধ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের নামে, এই পথটী সাধারণে সুপরিচিত। এই পথের আশে পাশে অনেক নামজাদা বাঙ্গালী বাস করেন। সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ দুর্গাচরণ লাহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, এই পথের পার্শ্বে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দির, আর্য্য-সমাজ মন্দির, সঙ্গীত-সমাজ বেথুন-কলেজ, স্কটিশ-চার্চ্চ-মিশন কলেজ প্রভৃতি এই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত। রাস্তার নামটী ইংরাজী হইলেও এই পথটীর উভয় পার্শ্বে অনেক নামজাদা বড় বড় বাঙ্গালীর বাস। সকলের নামোল্লেখ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান এস্থানে অসম্ভব।

করপোরেসান ষ্ট্রীট ও জানবাজার ষ্ট্রীট।

আগে সমগ্র পথটী "জানবাজার ষ্ট্রীট" বলিয়া পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে ইহার একাংশের নাম করপোরেসন-ষ্ট্রীট হইয়াছে। কলিকাতা মিউ-

নিসিপ্যালিটীর প্রকাণ্ড অফিস, হিন্দুস্থান সমবায়-কোম্পানীর প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, এই পথের পার্শ্বে। করপোরেসন ষ্ট্রীট হইতে কিয়দ্দূর গেলে—স্যর ষ্টুয়ার্ট-হগ মার্কেট বা মিউনিসিপ্যাল-বাজার। এরূপ সুবৃহৎ বাজার কলিকাতায় আর কোন স্থানেই নাই। এই বাজারটী বর্ত্তমান প্রাসাদময়ী কলিকাতার গৌরব-চিহ্ন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীই এই বাজারের স্বত্বাধিকারী। ইহার পার্শ্বেই জানবাজার। জানবাজার "জনবাজার" (John Bazar) শব্দের অপভ্রংশ। অতি পুরাকালে জন নামধারী একজন সাহেব, এইস্থানে একটী বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রাণী রাসমণির প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা এই পথের উপর। ইহাই—"জানবাজারের মাড়-বাবুদের বাটী" বলিয়া সাধারণে পরিচিত। পরে এই রাণী রাসমণির সম্বন্ধে নানা কথা বলা যাইবে।

ক্রীক্-রো।

সুদূর অতীতের একটী "ক্রীক্" বা "খাল" হইতে এই স্থানটীর নাম ক্রীক্-রো হইয়াছে। পলাশী-আমলে অথবা তাহার বহু পূর্ব্বে, একটী খাল—আধুনিক ওয়েলিংটান স্কোয়ার হইতে আরম্ভ হইয়া, বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীটের উপর দিয়া বর্ত্তমান হেষ্টিংস-ষ্ট্রীট বহিয়া, গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এই খাল বুজাইয়া ফেলিয়া, বিত্তমান হেষ্টিংস-ষ্ট্রীট নির্ম্মিত হয়। অবশ্য পলাশী-যুদ্ধের পরই এই খালটী বুজাইয়া ফেলা হইয়াছিল। ক্রীক্-রো আজও সেই খালের বিলুপ্ত স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে।

ডিঙ্গা-ভাঙ্গা লেন।

ক্রীক্-রোর সান্নিধ্যেই, এই ডিঙ্গা-ভাঙ্গা পল্লী। পূর্ব্বোক্ত খালটী, ডিঙ্গাভাঙ্গার মধ্য দিয়া ধাপায় গিয়া মিলিত হইয়াছিল। হলওয়েলের গ্রন্থেও এই খালের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই খালের জলস্রোত নাকি অতি প্রবল ছিল। বিশেষতঃ বর্ষাকালে—জলের তোড় বড়ই বেশী হইত বলিয়া, এইস্থানে অনেক ডিঙ্গা বা নৌকা ডুবিয়া যাইত। এইজন্য এইস্থানের নাম "ডিঙ্গা-ভাঙ্গা" হইয়াছে।

শ্রীনাথ দাসের লেন।

এই গলিটী ওয়েলিংটন-ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সদর রাস্তা হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা—স্বনাম-প্রসিদ্ধ হাইকোর্টের উকীল, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস

মহাশয়ের প্রাসাদতুল্য বাটী পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাবু শ্রীনাথ দাস—হাইকোর্টের একজন নামজাদা উকীল ছিলেন। এই ওকালতী কাজে, তিনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। নানাবিধ ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া, শ্রীনাথ দাস মহাশয়, নিজের নাম কলিকাতা-সমাজে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার এক পুত্র, উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়, সুপ্রসিদ্ধ শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নামক দুইখানি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেন। সেকালের থিয়েটারে, এই দুইখানি নাটক একদিন মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। বাবু শ্রীনাথ দাসের অন্যতম পুত্র, বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম, এ; বি, এল, মহাশয় "সময়" নামক সুবিখ্যাত সংবাদ-পত্রের সম্পাদক।

আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গলি।

এ গলিটী স্বনামখ্যাত "অমৃতবাজার—পত্রিকার" জন্য বিশেষরূপে পরিচিত। আবার এই অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত, স্বর্গীয় বাবু শিশির কুমার ঘোষের নাম বিশেষরূপে বিজড়িত। এরূপ তেজস্বী, নির্ভীক ও স্পষ্ট-বাদী সম্পাদক, বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। যশোহর জেলার মাগুরার সুবিখ্যাত ঘোষবংশে শিশিরকুমারের জন্ম। এইস্থানে শিশিরকুমার, প্রথমে অমৃতবাজার পত্রিকা বলিয়া একখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রজার পক্ষ তিনি চিরদিনই সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। নীলকর-দিগের অত্যাচার দর্শনে ও তাহার প্রতিবিধানার্থে এবং সমস্ত ঘটনা গবর্ণ-মেণ্টের গোচরে আনিবার জন্য, বাঙ্গালা "অমৃতবাজারের" উৎপত্তি। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে, বাঙ্গালা অমৃতবাজারের প্রথম প্রচার হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া, গবর্ণমেণ্ট এক আইন প্রচার করেন। এই সময় হইতে, অমৃতবাজার ইংরাজীতে সম্পাদিত হইতে থাকে। আগে ইহা সাপ্তাহিক ছিল, পরে দৈনিকে পরিণত হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে অমৃতবাজার কার্য্যালয়, কলিকাতায় আসে। শিশির বাবু তাঁহার ভ্রাতৃগণ সহ কলিকাতাতেই বসবাস করিতে থাকেন। শিশিরকুমার একজন পরম বৈষ্ণব। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় Lord Gouranga এর জীবন-কথা সর্ব্বত্র সমাদৃত। "অমিয়-নিমাই-চরিত" প্রভৃতি সুবৃহৎ বৈষ্ণবগ্রন্থ ইঁহারই রচিত। শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনে, ইঁহারই চেষ্টায়, কলিকাতার বিডন-গার্ডনে একটী বাৎসরিক উৎসবানুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। অমৃতবাজার ভিন্ন Hindu Spiritual Magazine নামক

একখানি মাসিকপত্রও তিনি বাহির করেন। এখন এই অমৃতবাজার ও স্পিরিচুয়াল-ম্যাগাজিন পত্রিকা, শিশিরকুমারের সুযোগ্য সহোদর, বাবু মতিলাল ঘোষের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। জীবনের শেষাবস্থায়, শিশির-কুমার সহোদর মতিলালের হস্তে পত্রিকার ভার দিয়া, ধর্ম্মালোচনায় জীবন যাপন করিতেন। মতি বাবুও তাঁহার জ্যেষ্ঠের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত। আজও তাঁহার স্পষ্টবাদিতায়—অমৃতবাজারের পূর্ব্বগৌরব সংরক্ষিত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারি শিশিরকুমার স্বর্গারোহণ করেন। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল না।

অক্রুর দত্তের গলি।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জলের কলের নিকটেই, একটী গলির মধ্যে অক্রুর দত্ত মহাশয়ের সুবিস্তৃত বাস-ভবন। এই দত্ত-পরিবার নানা-কারণে কলিকাতা-সমাজে পরিচিত। অক্রুর দত্ত মহাশয়, কোম্পানীর আমলে, কমিশেরিয়েট বিভাগে কার্য্য করিয়া প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেন। বীরভূমের যুদ্ধ ব্যাপারে, তিনি ইংরাজ-সেনার সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাণী অত্যাচার ভয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি সেনা-ধ্যক্ষকে বলিয়া, তাঁহাদের নিরাপদ স্থানে রক্ষা করেন। নানাবিধ ক্রিয়াকলাপাদির জন্য, এই দত্ত-বংশ কলিকাতা-সমাজে বিশেষ পরিচিত। এই পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত, হোমিওপ্যাথি প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য করেন। সুপ্রসিদ্ধ মহিলা-কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী—যাঁহার বীণার-ঝঙ্কারে এক সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যে একটা নূতন আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছিল—তিনি এই দত্ত-পরিবারের কুলবধূ। এই দত্ত বাটীতেই সাবিত্রী-লাইব্রেরী বলিয়া এক "Free Circulating লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। এই সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব, দত্ত বাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনাতেই হইত। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি—এই সভার উৎসবে বক্তৃতাদি করিতেন। বাবু গোবিন্দলাল দত্তই এই সভার প্রধান কর্ম্মশক্তি। গোবিন্দ বাবুও তরুণ যৌবনে যথেষ্ট সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন।

কাঁটাপুকুর-লেন।

এই কাঁটাপুকুর-লেন—প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আবাস

বাটীর জন্ত বিশেষরূপে বর্ত্তমানে সুপরিচিত। এরূপ একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। "বিশ্বকোষ" নামক মহাভিধান এই নগেন্দ্রনাথের অক্ষয়-কীর্ত্তি। যখন রঙ্গলাল বাবুর হস্ত হইতে নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকোষ মহাগ্রন্থ সম্পাদন ভারগ্রহণ করেন, তখন কেহই আশা করেন নাই—যে তিনি এতাদৃশ পরিশ্রম ও ব্যয়বহুলকার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারিবেন। অনেক পরিশ্রম, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির চরমফল এই "বিশ্বকোষ"। শব্দকল্পদ্রুম অপেক্ষাও ইহার গৌরব অধিক। এই বিশ্বকোষই, নগেন্দ্রনাথের অবিনশ্বর-কীর্ত্তি। নগেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সুপরিচিত পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। অনেকগুলি বহুমূল্য, অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণ করিয়া তিনি বঙ্গভাষার প্রচুর উপকার সাধন করিয়াছেন। পুরাতন লুপ্তপ্রায় পুঁথি-সংগ্রহ, তাহার পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনই নগেন্দ্র বাবুর জীবনের মহাব্রত।

এই কাঁটাপুকুরের সান্নিধ্যে, বাবু নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসুর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা বর্ত্তমান। নন্দলাল বসু মহাশয়, একজন ক্রিয়াবান জমীদার ছিলেন। গয়া জেলায় ইঁহাদের এক বিস্তৃত জমীদারী আছে। মাধবচন্দ্র বসু মহাশয়ের তিন পুত্র—মহেন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও পশুপতি। মহেন্দ্র বাবু, বড়ই পরোপকারী ছিলেন। নন্দবাবু ও পশুপতি বাবু, কলিকাতা সমাজে সবিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সর্ব্ববিধ সাধারণ হিতকর কার্য্যে এই দুই ভ্রাতা, সমান উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছেন। নন্দলাল বাবু ও পশুপতি বাবু উভয়েই এখন পরলোকগত। এখন তাঁহাদের বংশধরেরা এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বসবাস করিতেছেন।

কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার।

বর্ত্তমান স্কটিশ-চার্চ্চ বা ভূতপূর্ব্ব জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনের সান্নিধ্যে, যে এক প্রাসাদতুল্য ত্রিতল অট্টালিকা দেখা যায়, তাহার অধিকারী বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। নীলাম্বর বাবুর নাম কলিকাতাবাসীর নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে ইহার জন্ম হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি ও সংস্কৃত কলেজ হইতে ইনি গৌরবের সহিত এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে বি, এল, পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে কাশ্মীর-রাজ্যের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইয়া নীলাম্বর বাবু যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। পরে তিনি কাশ্মীরের রাজস্ব-সচিবের পদও লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে, ইনি কলিকাতায় আসিয়া, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইনি, সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। অতীব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া, সম্প্রতি ইনি Special পেন্সন ভোগী হইয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সহকারী সভাপতির পদ হইতে অবসর লইয়াছেন।

রসা-রোড।

ভবানীপুর কালীঘাট হইয়া, রসা-রোড বরাবর টালিগঞ্জের দিকে চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ভবানীপুর থানার অনতিদূরে, ভবানীপুরের এই সদর রাস্তার উপর, একটী ত্রিতল বাটীতে, বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন মিষ্টার জষ্টিস স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় বাস করেন। স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুরের মধ্যে অতীতকালে একজন নামজাদা ডাক্তার ছিলেন। স্যর আশুতোষ, ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রথম জীবনে এই স্বনামধন্য মনীষি, সাউথ-সবর্ব্বন-স্কুলে এণ্ট্রান্স-ক্লাস অবধি অধ্যাপনা করেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সি-কালেজ হইতে এম্, এ, পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে এম, এ, উপাধি লাভ করেন ও তৎপরে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ উপাধি পান। বি, এল, পাশ করিয়া স্যর আশুতোষ হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯০১ খৃঃ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাঁর অমানুষিক প্রতিভা ও অদম্য উদ্যম, সর্ব্বদিক-প্রসারিণী। এরূপ প্রতিভাবান বাঙ্গালী, খুব কমই জন্মিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে ইনি অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া, বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উন্নতি—ইহাঁরই আমলে হইয়াছিল। ১৯০৪ খৃঃ অব্দে, স্যর আশুতোষ, হাইকোর্টের জজের পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক-সোসাইটীর সভাপতির পদে বরিত হন। সংস্কৃত-ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য—নবদ্বীপ-পণ্ডিত-সমাজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে, "সরস্বতী" উপাধি দান করেন। বর্ত্তমানে তিনি

এই ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ ছাড়িয়া দিয়াছেন ও তাঁহার স্থানে, স্বনাম খ্যাত সুপণ্ডিত ডাক্তার অনারেবল দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, বি, এল, মহোদয় বিরাজ করিতেছেন। স্যর আশুতোষ, হাইকোর্টের একটী উজ্জ্বলরত্ন। রাজদ্বারে সর্ব্ববিষয়ে সম্মানিত বাঙ্গালী, তাঁহার ন্যায় খুব কমই আছেন।

এই রসা-রোডের উত্তরাংশে, লণ্ডনমিশন কালেজের বাটীর পার্শ্বে—সুপ্রসিদ্ধ জজ দ্বারকানাথ মিত্রের আবাস-ভবন ছিল। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। আমতার নিকট আগুনসি বা আগুন্‌সে গ্রাম তাঁহার জন্ম-স্থান। জজ দ্বারকানাথের পিতা—হুগলী আদালতের একজন মোক্তার ছিলেন। আর দ্বারকানাথ হুগলীতেই তাঁহার—প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। তৎপরে হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হন। ইংরাজীতে তাঁহার খুব দখল ছিল। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে হিন্দুস্কুলে পঠদ্দশায়, তিনি "লর্ড বেকন, সম্বন্ধে একটী সন্দর্ভ লিখিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডি, এল, রিচার্ডসন, দ্বারকানাথের এই সুন্দর প্রবন্ধটীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া, তাঁহার সম্পাদিত লিটারেরী-গেজেটে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে অতীত যুগের স্বনামপ্রসিদ্ধ বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র (আলালের-ঘরের-দুলাল প্রণেতা) কলিকাতা পুলিশ-কোর্টের জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দ্বারকানাথ কিয়ৎকালের জন্য কিশোরী বাবুর কোর্টে ইণ্টারপ্রিটারের বা দ্বিভাষীর কাজ করেন। তৎপরে তিনি সেকালের সদর-আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। হাইকোর্টে, এক শম্ভুনাথ পণ্ডিত ভিন্ন, আর কেহই দ্বারকানাথের অদ্ভুত প্রতিভা বিকাশের আভাস পান নাই। শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়, তখন হাইকোর্টের জুনিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্লিডার ছিলেন। ক্রমে ক্রমে দ্বারকানাথের যশঃপ্রতিভা, আদালতের উকীল ব্যারিষ্টার ও জজেদের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। তখনকার চিফ্ জষ্টিস, স্যর বার্ণেস্ পিকক, তাঁহার আইন-অভিজ্ঞতায় বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ, সুবক্তা, সচ্চরিত্র উকীলের প্রতিভা দৃষ্টে অন্যান্য জজেরাও তাঁহার গুণমুগ্ধ হইলেন। সকলদিক উত্তমরূপে না ভাবিয়া, দ্বারকানাথ কোন মোকদ্দামা লইতেন না, আর তিনি বিশেষ বিবেচনার সহিত যে সব মোকদ্দামা গ্রহণ করিতেন, তাহাতে প্রায়ই জয়লাভ করিতেন।

১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দের নামজাদা রেণ্ট-কেসের (The Great Rent Case) মোকদ্দামায় দ্বারকানাথ ক্রমাগতঃ ছয় দিন ধরিয়া বক্তৃতা করেন। বেলা

এগারটা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পাঁচটা ছয়টা পর্য্যন্ত, সাতদিন ধরিয়া, দ্বারকানাথ অক্লান্তভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মোকদ্দমাটী "ফুল-বেঞ্চেই" হইয়াছিল। পরিশেষে দ্বারকানাথ এই মোকদ্দমায় জয়ী হন।

১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে, দ্বারকানাথ জজের পদে নিযুক্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ স্যর বার্ণেস পিকক, জষ্টিস ফিয়ার প্রভৃতি স্বনামখ্যাত জজগণ তখন হাইকোর্টের রত্নস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকায় দ্বারকানাথ, নিজের প্রতিভাবলে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ধর্ম্মাধিকরণের এক সমুজ্জ্বল রত্নরূপে পরিগণিত হইলেন।

অনেক সময়ে, জজ দ্বারকানাথ কোন কোন মোকদ্দমায়, তাঁহার সহযোগী জজগণের সহিত একমত হইতে পারিতেন না। তিনি স্বতন্ত্রভাবে নিজের রায় দিতেন। কিন্তু অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, প্রিভিকৌন্সিল, তাঁহার রায়ই বজায় রাখিতেন।

বিজ্ঞানালোচনায় দ্বারকানাথের খুব একটা সখ ছিল। এজন্য তিনি ফাদার লাঁফো নামক প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতাদি শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রস্তাবিত, বিজ্ঞান-সভায়, তিনি চারি হাজার টাকা চাঁদা দেন। দ্বারকানাথের সাহিত্যিক জীবনের কোন একটা বিশেষ বিকাশ হয় নাই। একবারমাত্র তিনি স্বর্গীয় শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত "মুখার্জ্জিস্‌-ম্যাগাজিন" পত্রিকায় Analytical Geometry সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লেখেন।

দুর্দ্দমনীয় ক্যানসার রোগে, দ্বারকানাথের জীবলীলার অবসান হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রোগে তিনি শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়, হাইকোর্টের জজেরা তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে আসিতেন। এমন কি স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর, তাঁহার একজন এডিকংকে পাঠাইয়া, রোগশয্যা-শায়ী দ্বারকানাথের তত্ত্ব লই-তেন। এই ক্যান্‌সার বা কণ্ঠনালী-ক্ষত রোগে, দ্বারকানাথ ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ২রা মার্চ্চ ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্বারকানাথের বৃদ্ধা মাতা উপযুক্ত পুত্ররত্ন হারাইয়া শোকে অতিশয় মূহ্যমান হইয়া পড়েন। দ্বারকানাথের তিন বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নী একে একে গতাসু হন। তাঁহার তৃতীয়া পত্নী বর্দ্ধমান বেনাপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার প্রাণগোবিন্দ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা। তাঁহারই অদৃষ্টে এই নিদারুণ বৈধব্য-যোগ ঘটে।

দ্বারকানাথের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াই, চিফজষ্টিস তাঁহার সহযোগীগণকে তখনই আহ্বান করিয়া একটী সভা করেন, এবং তাঁহার সম্মানার্থে তখনই হাইকোর্ট বন্ধ করিয়া দেন। স্বয়ং বড়লাট বাহাদুরও সরকারী-গেজেটে এক শোক-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের আয়ও যেমন ছিল, ব্যয়ও সেইরূপ হইত। তাঁহার বাটীতে অনেক অনাথ বালক সযত্নে প্রতিপালিত হইত। তিনি তাহাদের অন্নবস্ত্র ও স্কুলের বেতন পর্য্যন্ত দিতেন। তাঁহার জন্মভূমি আগুনসি গ্রামে, তিনি একটী ইংরাজী-স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। প্রতিবৎসরই তিনি নিজগ্রামে গিয়া মহা সমারোহে দুর্গোৎসব সমাধা করিতেন ও এতদুপলক্ষে অনেক কাঙ্গালী-ভোজন করাইতেন। বাঙ্গালা দেশের গৌরবের যাহা কিছু একবার যায়, তাহার সমযোগ্য, ভবিষ্যতে আর পাওয়া যায় না। দ্বারকানাথের মত প্রতিভাবান উকীল ও জজ একালে বড় কম দেখা যায়।

ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোড।

ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের মোড় হইতে, পদ্মপুকুর রোড আরম্ভ হইয়াছে। এই পদ্মপুকুর রোডের উপর, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের ত্রিতল প্রাসাদ-তুল্য আবাসবাটী বর্ত্তমান। স্যর রমেশচন্দ্রের, আদিনিবাস রাজার-হাট বিষ্ণুপুর। এই বিষ্ণুপুর ২৪ পরগণার দক্ষিণ-বিষ্ণুপুর নহে। দমদমার নিকট অবস্থিত। রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রপিতামহ কালীপ্রসাদ মিত্র, সেকালের নদীয়ার কালেক্টারের অধীনে কার্য্য করিয়া প্রচুর বিত্ত-সঞ্চয় করেন। তাঁহার পুত্রের নাম রামধন মিত্র। রামধন মুন্সেফের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামধনের পুত্রের নাম রামচন্দ্র মিত্র। রামচন্দ্র চব্বিশ পরগণার সদর-দেওয়ানী-আদালতে সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রসন্নচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, কাশীচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র নামে ছয় পুত্র জন্মে। প্রসন্নচন্দ্রের কিশোরে মৃত্যু হয়। উমেশচন্দ্র বর্দ্ধমান চকদিঘির জমীদার বাবুদের এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। কেশব বাবুর নাম, কলিকাতা সমাজের অতীত যুগের সঙ্গীতানুরক্তগণের নিকট অপরিচিত নহে। কারণ তিনি একজন উচ্চদরের পাখোয়াজী ছিলেন। কাশীচন্দ্র, ছোট-আদালতে ওকালতি করিতেন ও প্রবোধচন্দ্র হাইকোর্টের একজন নামজাদা এটর্ণি।

রামচন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র স্যর রমেশচন্দ্র। বহুকাল হইতেই রমেশচন্দ্র, বিদ্যাশিক্ষায় প্রগাঢ় মনোযোগী ছিলেন। রমেশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি-কলেজ হইতে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন।

উকীল হইবার পর, রমেশচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে সদর-দেওয়ানী-আদালতে ও তৎপরে হাইকোর্টে প্রাক্‌টিশ আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর কালের মধ্যে, তাঁহার যশঃপ্রতিভা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়।

জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, রমেশচন্দ্র হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ইনি জজীয়তী করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে, দুইবার তিনি মহামান্য হাইকোর্টের প্রতিনিধি চিফ্‌ জষ্টিস্ বা প্রধান-জজের পদলাভ করেন। এরূপ সৌভাগ্য চন্দ্রমাধববাবু ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালীরই এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। পাবলিক-সার্ভিস্-কমিশনের সদস্য রূপেও রমেশচন্দ্র বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। ইনি বড়-লাট-বাহাদুরের ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়া, যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ইহার পর রমেশচন্দ্র কে, সি, আই, ই উপাধি পান। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে, জুলাই মাসে রমেশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। ইহাঁর উপযুক্ত পুত্র বারিষ্টার মিঃ বি, সি, মিত্র মহোদয় এখন হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং-কাউন্সিল পদে নিযুক্ত আছেন।

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলি (ভবানীপুর)। *

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলি ও বর্ত্তমান হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোডের সন্ধিস্থলে, যে ত্রিতল প্রাসাদতুল্য বাটী বর্ত্তমান, তাহার অধিকারী স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ। ইনি হাইকোর্টের জজীয়তী করিয়া বর্ত্তমান সুস্থদেহে অবসর সুখ উপভোগ করিতেছেন। চন্দ্রমাধবের জন্মস্থান বিক্রমপুর। ইহাঁর পিতৃদেব রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, ডেপুটী-কালেক্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে ঘোষজা মহাশয়, ওকালতী পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কিয়ৎকাল বর্দ্ধমানের উকীল-সরকারের কাজও করিয়াছিলেন। তৎকালীন কালেক্টারের সহিত স্বাধীনচেতা চন্দ্রমাধবের বনিবনাও না হওয়াতে, তিনি এই উকীল-সরকারের পদ ত্যাগ করিয়া ডেপুটী-কালেক্টার হয়েন। তৎপরে এই ডেপুটীগিরি ত্যাগ করিয়া, তিনি হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস আরম্ভ করেন। দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় যে Rent-Case মোকদ্দমার প্রধান উকীল ছিলেন, সেই মোকদ্দমাতেই মনীষি

চন্দ্রমাধব, সহকারী উকীলের কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে চন্দ্রমাধব বাবু, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে বরিত হন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে অফিসিংয়েটিং চিফ্‌জষ্টিসের কাজও করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। স্যর চন্দ্রমাধব, তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের বিশ্রামাবসর কাল, নানাবিধ সামাজিক সংস্কার কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। কায়স্থগণের বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কার তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র অনারেবল যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ও বঙ্গসমাজে সুপরিচিত। যাহাতে ভারতীয় যুবকগণ ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া সুশিক্ষা লাভ করিয়া, স্বাধীন ভাবে গৌরবের সহিত জীবিকা সংস্থান করিতে পারেন, তজ্জন্য একটী সভা এই যোগেন্দ্র বাবুর চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়।

ষষ্ঠীতলা রোড (নারিকেল ডাঙ্গা)।

এই পল্লীতে অনেক অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী বসবাস করেন। বর্ত্তমানে ইহা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসভবনের জন্য সুবিখ্যাত। স্যর গুরুদাস জ্ঞানে, গুণে, অর্থে, অদ্বিতীয়। তিনি একজন নিষ্ঠাবৃত্তি-সম্পন্ন পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মণ্যের উজ্জ্বল আদর্শ। স্যর গুরুদাসের পরিচয় বঙ্গবাসীর নিকট বেশী করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। হেয়ারস্কুল ও প্রেসিডেন্সি-কালেজে এম, এ পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপন করিয়া, স্যর গুরুদাস সগৌরবে বি, এল পাশ করেন। ইহার পর বহরমপুর কালেজে, কিয়দ্দিবস আইনের অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে, ইনি হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। স্যর গুরুদাসের মত হিন্দু-আইনভিজ্ঞ ব্যবহারজীবি, খুব কমই জন্মিয়াছেন। এইজন্য ইউনিভার্সিটী হইতে ইনি ডি, এল, উপাধি পান। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দু-আইন অধ্যাপক পদে বরিত হইয়া, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Hindu Law, Stridhan and Marriage প্রভৃতি দায়ভাগ-রচিত বিষয় সমূহের উপদেষ্টা বা লেক্‌চারার পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ছোটলাট সাহেবের মন্ত্রীসভায় একজন সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে স্যর গুরুদাস, বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মাধিকরণ হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত

হন। উক্ত বৎসর গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "নাইট" উপাধি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস, কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর একটী অতি সমুজ্জ্বলরত্ন। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হইয়া, অতীব সুযশের সহিত এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট Indian University Commission বলিয়া একটী অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস অতি দক্ষতার সহিত, এই সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

স্যর গুরুদাস খাঁটি হিন্দু, সংস্কৃতজ্ঞ ও আদর্শ ব্রাহ্মণ। পাশ্চাত্য শিক্ষার কোন দোষই ইঁহাকে আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। এইরূপ বিনয়ী, সরলচিত্ত, আড়ম্বরবিহীন, মহাপণ্ডিত ও সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ বাঙ্গালী আজকালকার সমাজে অতি দূর্লভ। স্যর গুরুদাস ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। একাধারে তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। পুত্রভাগ্য, যশোভাগ্য, লক্ষ্মীভাগ্য—আর রাজ-দ্বারে ও সর্ব্বসাধারণের নিকট সম্মান, যাহা কিছু এই মানব-জীবনে স্পৃহনীয়, স্যর গুরুদাসের তাহার সবই হইয়াছে। স্যর গুরুদাসের মত মাতৃভক্ত সন্তান খুব কমই এদেশে জন্মিয়াছেন। দেশের সকল হিতকর কার্য্যে ও সভা-সমিতিতে ইনি সমুৎসাহে যোগদান করিয়া থাকেন। হাইকোর্টের জজীয়তী হইতে অবসর লইয়াও এখনও তিনি পূর্ণোৎসাহে এই কর্ম্মময় জগতে বিচরণ করিতেছেন।

গ্রে-ষ্ট্রীট।

এই গ্রে-ষ্ট্রীটে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাস করেন। রাস্তাটী আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট গ্রে সাহেবের নামে পরিচিত। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে গ্রে-ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলে, উত্তর দিকে যে একটী দ্বিতল বাটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকারী অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজ বাবু সারদাচরণ মিত্র। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সারদাচরণের জন্ম হয়। সারদা-চরণ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র। এম, এ পরীক্ষায় ইনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বি, এল পাশ করিয়া সারদাচরণ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ইনি একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জ্ঞান-আইনজ্ঞ ব্যবহারজীব। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে,

এই জন্য অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের জজীয়তী দেন। জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে, সারদাবাবু স্থায়ীভাবে এই পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে ইনি জজীয়তী—কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সারদাচরণও তাঁহার অবসর কাল, নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্যে অতিবাহিত করিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, তাঁহার অমূল্য সহায়তার নিকট যথেষ্ট ঋণী। সারদাচরণ বঙ্গসাহিত্যসেবী ও বঙ্গ-ভাষার একনিষ্ঠ সেবক। বাঙ্গালায় কায়স্থ-সমাজের ইনি শীর্ষস্থানীয় ও কায়স্থ-পত্রিকা ইঁহারই যত্নে পরিচালিত। কলিকাতার নানা স্থানে আরও অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাস করেন। সকলের পরিচয় দিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না। কাজেই অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও এই স্থানে কলিকাতার পথ সমূহের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে শেষ করিতে হইল।
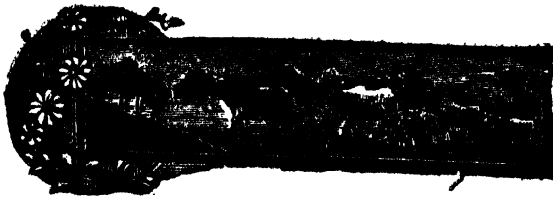
পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্ট-হাউস বা বড়লাট বাহাদুরের রাজপ্রাসাদ—গবর্ণমেণ্ট-হাউসে রক্ষিত গবর্ণর-জেনারেলগণের চিত্রপরিচয়—হাইকোর্টের ইতিবৃত্ত—বর্ত্তমান হাইকোর্টের জজ্‌দিগের নামের তালিকা—টাউনহল—টাউনহলে রক্ষিত চিত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ভূতপূর্ব্ব মেটকাফ্‌হল এবং ইম্পিরিয়েল-লাইব্রেরী—বেলভেডিয়ার রাজপ্রাসাদ—সেকালের বঙ্গদেশের ডেপুটী-গবর্ণরগণের নামের তালিকা—লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরগণের নামের তালিকা—জেনারেল পোষ্টাফিস—গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ্‌-আফিস—পেপার-করেন্সি আফিস—সম্রাট-বাহাদুরের টাঁকশাল—বেঙ্গল-ক্লাব—ইউনাইটেড্‌সার্ভিস-ক্লাব—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম—গবর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুল—মিউনিসিপ্যাল আফিস—স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ্‌মার্কেট বা মিউনিসিপ্যাল বাজার—সেনেট-হাউস ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটী—বেথুন-কালেজ—প্রেসিডেন্সি-হাঁসপাতাল—মেডিকেল-কালেজ হাঁসপাতাল—মেও-হাঁসপাতাল—জুওলোজিকাল গার্ডেন—বোটানিকেল গার্ডেন—ইডেন গার্ডেন—প্রিন্সেপ-ঘাট কলিকাতা সহরের প্রধান প্রধান ষ্ট্যাচু সমূহের পরিচয়—লর্ড নেপিয়র অব ম্যাগ্‌ডালা—গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট—স্যর উইলিয়াম পিল ষ্ট্যাচু—লর্ড অকল্যাণ্ড —লর্ড নর্থব্রুক্‌—লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক—ওয়ারেণ হেষ্টিংস—লর্ড ক্যানিং—লর্ড লরেন্স—ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া—লর্ড রবার্টস্‌—লর্ড ল্যান্সডাউন —লর্ড ডফারিন—স্যর জেমস্‌ আউটরাম—লর্ড মেয়ো—অক্টার্লোনি-মনুমেণ্ট —প্যানিয়টী প্রস্রবণ—কর্জ্জন উদ্যান (Park)—লর্ড হেষ্টিংস—দ্বারবঙ্গের মহারাজা—স্যর এস্‌লি ইডেন—স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলী—স্যর জন উডবরণ—হলওয়েল মনুমেণ্ট—লর্ড কর্জ্জন—লর্ড কিচ্‌নার—প্রসন্নকুমার ঠাকুর—ডেভিড্‌ হেয়ার—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর—রাজা কালীকৃষ্ণ দেব—মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন গুপ্ত—কালীঘাট মন্দির—সিদ্ধেশ্বরী মন্দির—পাকড়াশীর শিবমন্দির—আনন্দময়ীর মন্দির—ঠন্‌ঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী মন্দির—নিমতলা ঘাট—ধর্ম্মতলার মস্‌জেদ—মাণিকপীরের গোর—জুম্মাপীরের গোর—ওয়াজির আলির গোর—জব চার্ণকের গোর—কর্ণেল ওয়াট্‌সনের গোর—সর্জ্জন হ্যামিল্‌টানের গোর—মাইকেল মধুসূদন দত্তের গোর।

বর্ত্তমান কলিকাতা সহরের বিশিষ্ট স্থানগুলির পরিচয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ও সহরের সৌন্দর্য্যে কলিকাতা এখন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরী সমূহের মুকুটমণি। সপ্তদশ শতাব্দীতে জব চার্ণক, জঙ্গল ও বাদা ভূমি পূর্ণস্থানে, যে কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—এই দুই শতাব্দীতে, কালধর্ম্মে এখন তাহা ইন্দ্রের বৈজয়ন্তী হইয়া উঠিয়াছে। যদিও দিল্লী-নগরী আমাদের গৌরবান্বিত সম্রাট, পঞ্চম জর্জ্জের আদেশে ও আমাদের সর্ব্বজন প্রিয় বড়-লাট হার্ডিং বাহাদুরের অভিলাসানুসারে—ভারতের রাজধানীরূপে গৌরব লাভ করিয়াছে—তথাপি কলিকাতার সৌন্দর্য্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত। মহামান্য ভারতেশ্বর স্বমুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"যদিও দিল্লী আমার সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল, তথাপি কলিকাতার গর্ব্ব ও গৌরব কিছুতেই নষ্ট হইবে না।" ভারত সম্রাটের শ্রীমুখ-নির্গত ভবিষ্যৎবাণী এখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। এই রাজধানী পরিবর্ত্তনের ফলে, আমরা লর্ড কারমাইলের মত একজন উদারচেতা, লোকপ্রিয়, সহানুভূতিপূর্ণ, রাজনীতিজ্ঞ বঙ্গেশ্বর পাইয়াছি। তাঁহার আমলে কলিকাতায় অনেকগুলি প্রাসাদতুল্য নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হওয়ায় কলিকাতার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-গৌরব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কলিকাতার সেকালের বিখ্যাত বাড়ীগুলির একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিব।

গবর্ণমেণ্ট হাউস্ বা লাট-প্রাসাদ।

সেকালের কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট-হাউস—সর্ব্বপ্রথমে, প্রাচীন কলিকাতা দুর্গের মধ্যে ছিল। ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে কাপ্তেন আলেকজান্দার হ্যামিল্‌টান দুর্গমধ্যস্থ এই বাড়ীরই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রাসাদ-তুল্য সুবৃহৎ অট্টালিকা না হইলেও, শ্রীসৌন্দর্য্য সম্পন্ন বাসভবন ছিল বটে। বেঙ্গল-প্রেসিডেন্সির, সেকালের কলিকাতার-গবর্ণরগণ এই বাটীতেই বাস করিতেন।

নবাব সেরাজ-উদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা অধিকার ও লর্ড ক্লাইভ ও এড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন কর্ত্তৃক কলিকাতা পুনরুদ্ধারের পর, পুরাতন দুর্গমধ্যস্থ গবর্ণরী-আবাস-ভবনটী পরিত্যক্ত হয়। পরবর্ত্তীকালে দুর্গের দক্ষিণদিকে গঙ্গাতীরে একটী সুবৃহৎ বাড়ী গবর্ণরের আবাস জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে এই বাড়ীটীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে। এবং বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদের সান্নিধ্যে, তৃতীয় লাট-প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ইহা "বকিং-হাম-হাউস" বলিয়া সেকালের লোকের নিকট পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান ট্রেজারি এবং এই তৃতীয় প্রাসাদ ও ইম্পিরিয়াল-অফিস সমূহের পার্শ্বেই লাট-সাহেবের নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই বকিংহাম-হাউসে, বঙ্গের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস, প্রতিনিধি গবর্ণর স্যর জন ম্যাকফ্যারসন, লর্ড কর্ণওয়ালিশ ও স্যর জন শোর (লর্ড টেইন-মাউথ) বাস করিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংস সকল সময়ে এই বাড়ীতে থাকিতেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটে, ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের আর একটী নিজস্ব বাটী ছিল। এই বাটীর কতকাংশ এখনও বর্ত্তমান। বর্ত্তমানে ইহার বহির্দ্দিকটী সম্পূর্ণ নূতন ধরণে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বরণ-কোম্পানীর আফিস, এখন এই বাটীতে অবস্থিত। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, ব্যারনেস্ ইমহফের সহিত বিবাহ হওয়ার পর হইতে, হেষ্টিংস এই বাড়ীতেও মধ্যে মধ্যে বসবাস করিতেন। ইহার পরবর্ত্তীকালে—তিনি সহর ছাড়িয়া, তাঁহার আলিপুরের বাগান-বাটী, "হেষ্টিংস-হাউসে" বাস করিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের এই বাগান-বাটী বর্ত্তমান আলিপুর জজ-কাছারির নিকটে আজও "হেষ্টিংস-হাউস" বলিয়া পরিচিত। সরকারী কাজ পড়িলে, হেষ্টিংস কলিকাতায় আসিতেন, নচেৎ আলিপুরের নির্জ্জন আবাস-ভবনই তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। কলিকাতা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের এই বাটী ছাড়া, ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের নিজের একটী প্রাইভেট অফিস-গৃহও কলিকাতা সহরের মধ্যে ছিল। ওল্ডকোর্ট-হাউস ষ্ট্রীটের শেষাংশে—যেখানে ইতিপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা স্কট টমসন কোম্পানীর কার্য্যালয় ছিল, আর এখন যেখানে "এস্প্লানেড-ম্যানসন্" নামক পাঁচতলা সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, এই স্থানেই গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের প্রাইভেট-অফিসের সেই পুরাতন বাটিটী অবস্থিত ছিল। স্কটটমসান কোম্পানীর সুবিখ্যাত ডাক্তার ফেরিস, এই বাটীর একটী প্যানেলের কাচের উপর, হেষ্টিংসের নামের আদ্যক্ষরগুলি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন।

কলিকাতার পুরাতন লাট-প্রাসাদটী তদুপযুক্ত জাঁকালো ছিল না ও ইহার পার্শ্বে আরও অনেক ভদ্রলোকের বাড়ীঘর ছিল—যাহা গবর্ণর-জেনারেলের আবাস বাটীর অপেক্ষা দেখিতে ভাল। এইজন্য হেষ্টিংস, এইরূপ সামান্য বাড়ীতে থাকিতে পছন্দ করিতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি আলিপুরেই

থাকিতেন। কৌন্সিলের কিম্বা সরকারী অন্যান্য কাজ পড়িলে, তিনি কলিকাতায় আসিতেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে, গ্রাণ্ড প্রে, কলিকাতা দেখিতে আসেন। তিনি এই লাট-প্রাসাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"লাট সাহেব এসপ্লানেডএর নিকট, একটী দ্বিতল বাটীতেই বাস করেন। বাড়িটী দেখিতে তত জাঁকালো শ্রীসম্পন্নময়। ইহার আশেপাশের অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী-ঘর দেখিতে বরঞ্চ খুব ভাল। পণ্ডিচারির-গবর্ণরের বাড়ীও কলিকাতার লাটের বাড়ী অপেক্ষা বেশী শ্রীসৌন্দর্য্য-সম্পন্ন।" পাঠক! মনে রাখিবেন, আমরা সেকালের পুরাতন লাট-প্রাসাদের কথাই বলিতেছি।

এইজন্য এই সব আমলের বল, দরবার, লেভি ইত্যাদি কার্য্য, অতীত-কালে লাট-বাড়ীতে না হইয়া, পূর্ব্বোক্ত থিয়েটার-গৃহে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী-কালে কোর্ট-হাউসে হইত। এই "কোর্ট-হাউস" গৃহটী, লালদীঘির কোণে ও রাইটার্স-বিলডিংএর পার্শ্বে, বর্ত্তমান সেণ্টএণ্ড্রু গির্জ্জা যেখানে আজকাল বর্ত্তমান—সেই স্থানেই ছিল। থিয়েটার-গৃহটী, বর্ত্তমান ফিন্‌লে-মিউর কোম্পানীর অফিস-বাটীর অধিকৃত স্থানে ছিল। এখন তাহার কোন চিহ্নই নাই। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে, লর্ড ওয়েলেসলির প্রথম আমলেও এই থিয়েটার-গৃহে সরকারী উৎসবাদি হইত। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে ১৩ ডিসেম্বরের সরকারী-গেজেটে, একটী বিজ্ঞাপন ছিল—তাহা হইতেই এ কথা প্রমাণ হয়। সে বিজ্ঞাপনটী এই—"আগামী ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার, সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে, থিয়েটার-গৃহে একটী বল ও সপার হইবে। মাননীয় গবর্ণর-জেনারেলের অভিপ্রায় এই, উক্ত দিনে, কোম্পানী-বাহাদুরের কলিকাতাবাসী সিভিল ও মিলিটারী কর্ম্মচারিগণ, উক্ত সভায় যোগদান করিলে গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর বড়ই প্রীতিলাভ করিবেন।"

কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি এসব অসুবিধা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কোর্ট-অব-ডিরেক্টারদের সহিত লেখালিখি করিয়া, বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদ নির্ম্মাণের অনুমতি আনাইলেন। কাপ্তেন চার্লস ওয়াইএ্যাট নামক একজন স্থপতি, এই প্রাসাদ নির্ম্মাণের ভার পান। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি, এই প্রাসাদের প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর মহাসমারোহে প্রোথিত হয়। এই লাট-প্রাসাদ নির্ম্মাণে, তের লক্ষ টাকা খরচা হইয়াছিল। লং সাহেবের মতে "জমী কিনিতে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। গৃহ সাজাইবার জন্য চেয়ার টেবিল, সোফা, আলমারি, ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতিতে পঞ্চাশ হাজার

টাকা লাগিয়াছিল।" এই বাড়ীর বাহ্য-দৃশ্য ও নির্ম্মাণ-প্রণালী বিলাতের ডার্ব্বিশায়ারের "কেড্‌লষ্টন-হলের" মত। বিলাতের এই প্রাসাদ-তুল্য কেডলষ্টন-হল, বর্ত্তমানে, আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্জ্জনের সম্পত্তি। এই বাটী নির্ম্মাণ সময়ে, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি, কলিকাতার বর্ত্তমান ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের মধ্যে, একটী অট্টালিকায় বাস করিতেন। এখন এই বাড়ীটি "আউটরাম-ইন্‌ষ্টিটিউট" বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা মে, লর্ড ওয়েলেস্‌লী বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদে প্রথম প্রবেশ করেন। এই দিনে "শ্রীরঙ্গপত্তনের-বিজয়োৎসব" এই নব-নির্ম্মিত লাট-প্রাসাদেই, মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মুখেই অর্থাৎ উত্তরদিকে "গ্রাণ্ড-ষ্টেয়ার-কেস্‌" বা প্রাসাদে যাইবার বিস্তৃত অধিরোহিণী শ্রেণী। এরূপ সুদীর্ঘ সিঁড়ি কলিকাতায় কোন প্রাসাদ-তুল্য বাড়ীতেই নাই। সিঁড়ির উপর "পোর্টিকো" বা সুদীর্ঘ থামওয়ালা বারান্দা। রাস্তা হইতে এ বারান্দাটী বড় সুন্দর দেখায়। বড়লাট-সাহেবগণ সিমলা হইতে ইতিপূর্ব্বে যখন কলিকাতায় আসিতেন, কিম্বা কোন নূতন বড়লাট যখন বিলাত হইতে আসিতেন, তখন এই "পোর্টিকোর" নিম্নে, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ ও দেশীয় রাজন্যবৃন্দ সমবেত হইয়া, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতেন। রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবার পর, বঙ্গদেশের গবর্ণর-বাহাদুরকে এই স্থানে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এই অধিরোহিণী-শ্রেণীর সম্মুখের জমীতে, একটী পাখাওয়ালা সুবৃহৎ কামান আছে। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারেল লর্ড এলেন্‌বরা, চীনযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ, এই লুণ্ঠিত কামানটী এখানে সংস্থাপিত করেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউসের কম্পাউণ্ডের মধ্যে, এইরূপ আরও অনেকগুলি তোপ ব্রিটীশ-বাহিনীর বিজয়চিহ্ন স্বরূপ সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে শিখযুদ্ধে সংগৃহীত কামানগুলিই, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লাট-প্রাসাদটী এমন কৌশলের সহিত নির্ম্মিত, যে সকল ঋতুর সকল সময়েই, ইহার উপরিতলের কক্ষগুলি বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ পরিপূর্ণ থাকে। এই পর্টিকো'র উপরে, ভারত-সম্রাটের যে রাজচিহ্ন খোদিত আছে—লর্ড কর্জ্জন তাহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। আগে লাট-প্রাসাদের গাত্রটী, হরিদ্রাবর্ণে চুণকাম করা হইত। লর্ড কর্জ্জনের আমলে, ইহা শ্বেতবর্ণে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, প্রাসাদের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফার্ষ্ট-ফ্লোর বা দ্বিতলে ব্রেক-ফাষ্ট-রুম বা প্রাতরাশাগার। তাহার

পূর্ব্বদিকে কৌন্সিল-রুম, বা বড়লাট-বাহাদুরের মন্ত্রণাসভাগৃহ বর্ত্তমান। কাউন্সিল রুমের পূর্ব্বদিকে "থ্রোন-রুম", (Throne-Room) এইস্থানে টিপু-সুলতানের ব্যবহৃত, একখানি স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দ্বিতলের উপরই "ডাইনিং-রুম" বা ভারত-রাজপ্রতিনিধির ভোজনাগার। এই প্রাসাদের কয়েকটী বড় বড় হল, সাধারণ রাজকার্য্য সম্বন্ধে দরবার এবং লেভি প্রভৃতি উৎসব কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত।

সেকেণ্ড-ফ্লোর বা ত্রিতলে—"বলরুম"। বড়লাট-সাহেবের বাড়ীর বলরুমের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। এই হলের দুই ধারে, পঙ্কের কাজ করা সোণালি-রঞ্জিত অসংখ্য উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের স্তম্ভশ্রেণী। বলরুমের নিম্নভাগ, চকচকে পালিশ করা কাষ্ঠে নির্ম্মিত। উপরে অসংখ্য ঝাড় ও চতুর্দ্দিকে সোণালী মণ্ডিত দর্পণশ্রেণী।

এই লাট-প্রাসাদে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়গণের অনেক অয়েল-পেইণ্টিং বা দেহপ্রমাণ তৈল-চিত্র বর্ত্তমান ছিল। কোন গৃহে কিরূপ চিত্রাদি ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দিতেছি। এই চিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি অতি পুরাকালের।

বড়লাট বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব প্রাসাদে রক্ষিত চিত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(কৌন্সিল-চেম্বার বা মন্ত্রণাগৃহ।)

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
১। **ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ**—(জন্ম ১৭৮৫ খৃঃ অব্দ—মৃত্যু ১৮৫৬ খৃঃ) বর্ত্তমান বড়লাটের পূর্ব্বপুরুষ। ইঁহারই আমলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিখযুদ্ধ হয়। শিখযুদ্ধে জয়ী হওয়ায়, ইঁহার যশপ্রতিভা চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। ১৮৪৪—৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি লাটসাহেব ছিলেন।	জি, এফ্, ক্লার্ক।
২। **আর্ল অব্ এলগিন এবং কিংকার-ডাইন**—(জন্ম ১৮১১ খৃষ্টাব্দ—মৃত্যু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ)। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৩ খৃঃ অব্দ ইনি গবর্ণর-জেনারল ছিলেন।	ঐ ঐ।

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
৩। আরল মর্ণিংটন (ডিউক অব ওয়েলিংটন)—(জন্ম—১৭৬০ খৃঃ অব্দ, মৃত্যু ১৮৪২ খৃঃ অব্দ)। ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ, ইতিহাস-বিখ্যাত, অসাধারণ বীরপুরুষ।	সম্ভবতঃ ইহা মিঃ হোমের দ্বারা চিত্রিত।
৪। রবার্ট লর্ড ক্লাইভ কে, বি, (প্রথম লর্ড ক্লাইভ)—(জন্ম ১৭২৫ খৃঃ অব্দ—মৃত্যু ১৭৭৪ খৃঃ অব্দ।) ১৭৫৮ হইতে ১৭৬০ ও ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৬৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত ক্লাইভ্ বঙ্গের গবর্ণর ছিলেন। ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ পলাশী-সমর-বিজয়ী লর্ড ক্লাইভ্। ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা। সম্প্রতি লর্ড ক্লাইভের এক প্রস্তরমূর্ত্তি বেল্‌ভেডিয়ারে, লর্ড কারমাইকেল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই প্রস্তরমূর্ত্তি, ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল-হলে রক্ষিত হইবে।	ডান্সের দ্বারা চিত্রিত।
৫। ওয়ারেণ হেষ্টিংস—(জন্ম ১৭৩২ খৃঃ অব্দ—মৃত্যু ১৮১৮ খৃঃ)। ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ। কোম্পানীর প্রথম আমলের ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত। অতিরিক্ত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গদেশের (ফোর্ট-উইলিয়ামের) ইনি প্রথম গবর্ণর-জেনারেল। (১৭৭৪ খৃঃ)	প্রথম চিত্রকর ডেভিসের চিত্র হইতে মিস্ হকিন্সের কাপি। ডেভিসের কাপি বিলাতের ন্যাশান্যাল-গ্যালারিতে রক্ষিত। ইহা ভবিষ্যতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-হলে রক্ষিত হইবে।
৬। মার্কুইস অব্ কর্ণওয়ালিস, কে, জি,—(জন্ম ১৭৩৩ খৃঃ অব্দ—মৃত্যু ১৮০৫ খৃঃ অব্দ) বঙ্গদেশের দ্বিতীয় গবর্ণর-জেনারেল ও প্রথম প্রধান-সেনাপতি। দুইবার ইনি এই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রথমবারে (সেপ্টেম্বর ১৭৮৬ হইতে ১৭৯৩ খৃঃ অক্টোবর) ইঁহার আমলে "দশশালা-বন্দোবস্ত" প্রচলিত হয়। এ দেশেই ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।	ডেভিসের অঙ্কিত চিত্র।
৭। আরল অব্ মিণ্টো—(জন্ম ১৭৫১ খৃঃ অব্দ, মৃত্যু ১৮১৪ খৃঃ অব্দ) ইনি সম্প্রতি পরলোকগত ভারতের গবর্ণর-জেনারেল বা রাজপ্রতিনিধি, লর্ড মিণ্টোর পিতামহ।	চিনারি।

মন্ত্রণা-সভায় যাইবার বারান্দার দিকে।

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
৮। **ভাইকাউণ্ট হালিফাক্স**—(জন্ম ১৮০০ খৃঃ অব্দ, মৃত্যু ১৮৮৯ খৃঃ অব্দ) ১৮৫২—৫৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ইনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির "বোর্ড-অব-কন্‌ট্রোলের" প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।	জিঃ রিচমণ্ড, R. A.
৯। **লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক**—(জন্ম ১৭৭৪ খৃঃ, মৃত্যু—১৮৩৯ খৃঃ) ফোর্ট-উইলিয়াম-ইন্‌-বেঙ্গলের গবর্ণর জেনারেল—(১৮২৮-৩৪ খৃঃ) ১৮৩৪-৩৫ খৃঃ ইনি কোম্পানী-বাহাদুরের ভারতীয় অধিকার সমূহের প্রথম গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার আমলে সতীদাহ-প্রথা উঠিয়া যায় ও ঠগ-দস্যুদের দমন হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে, পারসীর পরিবর্ত্তে বঙ্গের আদালত-সমূহে, বাঙ্গলা ভাষার প্রথম প্রচলন আরম্ভ হয়।	ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ডের সংগৃহীত ছবির নকল।
১০। **আরল অব্ অক্‌ল্যাণ্ড**—(জন্ম ১৭৮৪ খৃঃ, মৃত্যু—১৮৪৯ খৃঃ) ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ১৮৩৬ হইতে খৃঃ ১৮৪২ খৃঃ। ইঁহার একটী পিত্তলময় প্রতিমূর্ত্তি ইডেন্‌-গার্ডেনের সম্মুখে আছে। ইঁহার সময়ে কাবুল-যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয়।	ষ্টুয়ার্ট উরলী।
১১। **মার্কুইস অব্ রিপন**—লর্ড রিপনের নাম ভারতবাসীর মনে চিরদিন জাগরিত থাকিবে। (জন্ম ১৮২৭ খৃঃ) ভারতের গবর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয়, (১৮৮০—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ)। ইঁহার আমলে সুপ্রসিদ্ধ "ইলবার্টবিল" পাস হওয়ায়, সমগ্র দেশে মহান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গের স্বায়ত্ত্বশাসন-প্রথা, ইঁহার আমলেই প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল।	ই, জে, পয়েণ্টার R. A.
১২। **মার্কুইস অব্ ডফারিন্ এণ্ড আভা**—(জন্ম ১৮২৬ খৃঃ, মৃত্যু ১৯০৩ খৃঃ অব্দ) সমগ্র ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনারেল	এফ্, হল, আর, এ

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
(১৮৮৪—১৮৮৯ খৃঃ অব্দ)। ইঁহার আমলে সমগ্র ব্রহ্মদেশ, ইংরাজ-বাহাদুরের দখলে আসে। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে "নাশানাল—কংগ্রেস" নামধেয় জাতীয়-মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। এই আমলে, আমাদের মাতৃ-প্রতিম স্বর্গীয় ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ বাৎসরিক রাজত্বকালের স্মৃতি-উৎসব, মহা সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছিল। লর্ড ডফারিণের আমলে, এদেশীয়গণ অধিক পরিমাণে উচ্চ রাজপদ লাভ করেন। লাট-পত্নী লেডি ডফারিণের যত্নে, এ দেশে "ডফারিণ-জেনানা-হাঁসপাতাল" প্রথম স্থাপিত হয়।	
১৩। ভাইকাউণ্ট ক্যানিং—(জন্ম ১৮১২ খৃঃ মৃত্যু ১৮৬২ খৃঃ) ভারতের গবর্ণর জেনারেল (১৮৫৬—৫৮ খৃঃ)। ইনি ভারতের প্রথম ভাইসরয় বা রাজ-প্রতিনিধি। ইঁহারই আমলে, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, ভীষণ "সিপাহী-বিদ্রোহ" আরম্ভ ও শেষ হয়। ইঁহার শাসনকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নিকট হইতে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সিপাহীগণ ইংরাজদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিল। কিন্তু দয়াবান ক্যানিং, পরিশেষে বিদ্রোহীদের প্রতি যথেষ্ট করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া, ইংরাজেরা ইঁহাকে বিদ্রূপচ্ছলে "Clemency Canning" বলিতেন।	সি, এ. মর্ণিউইক্।
১৪। মার্ক্ইস্ অব হেষ্টিংস্। (জন্ম ১৭৫৪ খৃঃ—মৃত্যু ১৮২৬ খৃঃ) ফোর্ট উইলিয়মের গবর্ণর-জেনারেল ও কমাণ্ডার-ইন-চিফ্ রূপে, ইনি ১৮১৩-১৮২৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে যাহাতে এদেশীয়েরা ইংরাজী ভাষায় উচ্চশিক্ষা পান, তাহার প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন, প্রতি বৎসর সাধারণ শিক্ষা-কার্য্যে, এক লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিবেন। লর্ড হেষ্টিংসের আমলেই ইহা কার্য্যে পরিণত হয়। ইঁহারই আমলে, রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতির নামধন্য	চিত্রকরের নাম অজ্ঞাত।

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
মহাত্মাগণের চেষ্টায়, কলিকাতায় "হিন্দু-কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যারি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড নামক তিনজন স্বনামখ্যাত পাদরীও এই সময়ে শ্রীরামপুরে একটী কলেজ স্থাপন করেন। ইহা এখনও বর্ত্তমান। এই মিশনরী সম্প্রদায়ের চেষ্টায় "সমাচার-দর্পণ" নামক প্রথম বাঙ্গলা-সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। এই সময়ে মেডিকেল-কলেজও স্থাপিত হইয়াছিল।	
১৫। **লর্ড লরেন্স**—(প্রথমে জন্ লরেন্স) (জন্ম ১৮১১ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৭৯ খৃঃ।) ভারতের ভাইসরয় ও গবর্ণর জেনারেলের পদে—ইনি ১৮৬৪—১৮৬৯ খৃঃ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার ন্যায় সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা সেকালে খুব কমই আসিয়াছিলেন। শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাব ইংরেজাধিকারে আসিলে, এই জন লরেন্স, সেই বিপ্লবময় স্থানে শান্তিস্থাপন করিয়া আসেন। ইনিই প্রথম "লর্ড লরেন্স"। গবর্ণমেণ্ট-হাউসের ঠিক সম্মুখে, মাঠের মধ্যে ইঁহার একটী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। ইঁহারই আমল হইতে বড়লাটসাহেবগণের শিমলা-শৈলে প্রথম বসবাস আরম্ভ হয়।	ভি, প্রিন্‌সেপ্ আর, এ।
১৬। **আরল মেয়ো**—(জন্ম ১৮২২ মৃত্যু ১৮৭২ খৃঃ)। ইনি ১৮৬৯ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। আণ্ডামান-দ্বীপে সূর্য্যাস্ত দেখিবার সময়, সিয়ারআলি নামক এক নিষ্ঠুর ওয়াহেবী-কয়েদী, পিছন হইতে ছোরা দ্বারা আঘাত করিয়া ইঁহাকে হত্যা করে।	এ, ই, ক্যাডি।

উত্তরপূর্ব্ব দিকের সিঁড়ির পথে।

(গ্রাউণ্ড-ফ্লোর)	
১৭। **সেখ করিমবক্স**—(লাট সাহেবের বড়-খানসামা) (১৮৪৮—১৮৭৭ খৃঃ)।	লর্ড ডালহৌসীর আমল হইতে, লর্ড লিটনের আমল পর্য্যন্ত, এই করিমবক্স লাট-প্রাসাদের হেড্-খানসামা ছিল। সাতজন বড়লাটের অধীনে এই ব্যক্তি হেড্-খানসামার কাজ করে।

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
(ফাষ্ট-ফ্লোর।)	
১৮। **আরল লিটন**—(জন্ম ১৮৩১ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৯১ খৃঃ) ইনি ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন। ইঁহার আমলে ১৮৮০ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী, মহারাণী ভিক্টোরিয়া—"ভারত-সাম্রাজ্ঞী" উপাধি গ্রহণ করেন। এজন্য দিল্লীতে একটী মহা-দরবার হইয়াছিল। ইহাই দিল্লীর প্রথম রাজসূয়-দরবার।	স্যার জে, ই, মিলেইসের তৈলচিত্রের নকল।
১৯। **আরল্ অফ্ নর্থব্রুক**—লর্ড নর্থব্রুকের একটী প্রস্তরমূর্ত্তি, হাইকোর্টের ঠিক সম্মুখেই অবস্থিত। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, লর্ড নর্থব্রুক বড়লাট সাহেবের পদে নিয়োজিত ছিলেন। ইঁহার আমলে আমাদের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বজন প্রিয় সম্রাট, সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স-অব-ওয়েলস রূপে ভারত-ভ্রমণে আসেন। সে সময়ের মহোৎসবের ব্যাপার, এখনও আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক।	ডব্লু, আউলেস।
(প্রথম ও দ্বিতীয়-ফ্লোরের মধ্যে)	
২০। **গবর্ণর জন্ জেফানিয়া হলওয়েল।** ইনি কলিকাতার জমীদার বা কলেক্টার ছিলেন। পরে গবর্ণর হন। নবাব সেরাজ-উদ্দৌলা, কলিকাতা আক্রমণ করিলে, হলওয়েল কিরূপ অসমসাহসের সহিত, কলিকাতা-দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণিত। কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্র, এই হলওয়েলের সহকারী বা ডেপুটী-জমীদার ছিলেন।	জোফানী নামক বিখ্যাত চিত্রকর।
ব্রেক-ফাষ্ট রুম। (Breakfast Room.)	
২১। **মার্কুইস অব ডেলহাউসি**—(জন্ম—১৮১২ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৬০ খৃঃ) ইনি গবর্ণর জেনারলের পদে	স্যর জে, ডব্লু, গর্ডন।

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
১৮৪৮—১৮৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। ইঁহার আমলে, ভারতবর্ষে প্রথম রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ-প্রতিষ্ঠা হয়। অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট, ইঁহারই আমলেই প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। রেল খাল প্রভৃতির উন্নতির সহিত, ইঁহার শাসনকালে সরকারী "পূর্ত্তবিভাগ" বলিয়া একটী স্বতন্ত্র বিভাগ সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ, দ্বিতীয় বর্ম্মা-যুদ্ধ, ইঁহার আমলের প্রধান ঘটনা। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইনি অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, অযোধ্যা-প্রদেশ ইংরেজাধিকার ভুক্ত করেন।	
২২। **আরল অব এলেন্‌বরা**—(জন্ম ১৭৯০ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৭১ খৃঃ) ১৮৪২—৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড অকলাণ্ডের সময়, কাবুল-যুদ্ধে সমস্ত ইংরাজ-সেনাই নিহত হয়। এই শোচনীয় ব্যাপারের প্রতিশোধ লইবার জন্য, লর্ড এলেনবরা পুনরায় ব্রিটিশ-সম্মান রক্ষার জন্য, কাবুলে সেনা প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল কাবুল অধিকার করিয়া—ইংরাজ-বন্দীদিগকে উদ্ধার করে। ইঁহার আমলে, সিন্ধুদেশের আমীরদের সহিত যুদ্ধ ঘটে এবং ব্রিটিশসৈন্য বিজয়ী হওয়ায়, সিন্ধুদেশ ইংরাজের দখলে আসে। গোয়ালিয়রের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলযোগ ঘটায়, লর্ড এলেনবরা, গোয়ালিয়রে সেনা-প্রেরণ করেন। মহারাজপুর ও পুর্ণিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে, সিন্ধিয়ার পক্ষ, ইংরাজের হস্তে পরাজিত হন। তৎপরে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইয়া, এই যুদ্ধের অবসান হয়।	জে, হেইস্‌।
২৩। **চার্লস থিওফিলস্ ব্যারণ মেট্‌কাফ**—জন্ম—১৭৮৫ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৪৬ খৃঃ। (ইনি ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের ২০এ মার্চ্চ হইতে ১৮৩৬ খৃঃ অব্দের ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ লর্ড অকল্যাণ্ড বিলাত হইতে ভারতে না পৌঁছান পর্য্যন্ত) গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া, লর্ড মেটকাফ, চিরস্মরণীয়	জে, হেইস্‌।

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি, চিরস্মরণীয় করিবার জন্য "মেটকাফ্-হল" নামক সুবৃহৎ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে লর্ড কর্জ্জনের আমলে ও তাঁহার চেষ্টায় এই সুবৃহৎ লাইব্রেরীটী গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইয়া, তাহ বর্ত্তমান "ইম্পিরিয়াল-লাইব্রেরীতে" পরিবর্ত্তন করিয়াছেন.	
২৪। জন শোর (ব্যারন টেন্‌মাউথ) লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর, ইনি অস্থায়ী ভাবে গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। (জন্ম ১৭৫১ খৃঃ—মৃত্যু—১৮৩৪ খৃঃ) ইনি প্রথমে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমলে, সিভিলিয়ান রূপে এ দেশে আসেন। রাজস্ব-বন্দোবস্ত কার্য্যে ইঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। যে "দশশালা-বন্দোবস্ত" প্রণোদিত করিয়া, লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাহার সুচনা,এই স্যর জন শোর সাহেবই করিয়াছিলেন। ইঁহার আমলে রাজস্ব-বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য ইনি, পরে লর্ড টেন্‌মাউথ উপাধি পান। ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক-সোসাইটীর একজন গণনীয় সদস্য ছিলেন।	অজানিত চিত্রকর।

থ্রোনরুম (Throne Room)

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
২৫। সম্রাট তৃতীয় জর্জ্জ (১৭৩৮—১৮২০)	এলান রামসে।
২৬। সার্লোটি সোফিয়া অফ মেক্‌লেনবর্গ ষ্ট্রেলিজ (সম্রাট তৃতীয় জর্জ্জের পত্নী)	
২৭। আরল অব আমহার্ষ্ট—(জন্ম ১৭৭৩ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৫৭ খৃঃ) ১৮১৩ লর্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ইহার পর জন এডাম্স নামক একজন সিভিলিয়ান, গবর্ণর-জেনারেলের কাজ করিয়াছিলেন। তৎপরে লর্ড আমহার্ষ্ট এদেশে আসেন। আমহার্ষ্টের আমলে বর্ম্মা ও ভরতপুরের যুদ্ধ হইয়াছিল।	সার টমাস লরেন্সের তৈল চিত্রের কাপি।
২৮। মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লি—(জন্ম— ১৭৬০ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৪২ খৃঃ।) ১৭৯৮ খৃঃ অব্দ হইতে	রবার্ট হেস।

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
১৮০৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ইনি ফোর্ট-উইলিয়ামের গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার ন্যায় সাহসী সেনাপতি ও অভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা, খুব কমই এদেশে আসিয়াছেন। এই জন্য ইংরাজ-ইতিহাস লেখকেরা, ইঁহাকে কোম্পানীর-আমলের "আকবর" বলিয়া উল্লেখ করেন। ইঁহারই হস্তে টিপু-সুলতানের ধ্বংশ-সাধন ঘটে এবং মহীশূর-রাজ্য পুনরায় হিন্দুরাজার দখলে আসে। দ্বিতীয় মারহাট্টা-যুদ্ধ, এই ওয়েলেস্‌লির আমলেই হইয়াছিল। ওয়েলেস্‌লি. বাহুবলে অনেক রাজ্য জয় করিয়া, ইংরাজ সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। ইঁহার সময়েই বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় এবং কলিকাতা সহরেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।	
২৯। ডিউক অব ওয়েলিংটন—(থ্রোন রুমের দ্বারের নিকট)।	রবার্ট হোম।
৩০। মহম্মদ আলি (কর্ণাটের নবাব) (১৭৫৪—১৭৯৫ খৃঃ অব্দ।)	এস, উইলসন।
৩১। রাজকুমার ডিউক অব ক্লারেন্স এণ্ড এভনডেল—কে,জি, (জন্ম ১৮৬৪—মৃত্যু ১৮৯২ খৃঃ)।	এ, সোভেল।
৩২। লেডি উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক—	এফ, আর, সে।
৩৩। শের আলি খাঁ—কাবুলের আমীর (১৮৬৩ খৃঃ হইতে ১৮৭৯ খৃঃ।)	অজানিত চিত্রকর।
৩৪। নেপালের স্বনামপ্রসিদ্ধ জঙ্গ বাহাদুর—(১৮৪৬ খৃঃ—১৮৭৭ খৃঃ)।	এফ, ব্রিগষ্টোক।
৩৫। যশোবন্ত সিংহ—(মহারাজা ভরতপুর) (১৮৫৩ খৃঃ—১৮৯৩ খৃঃ অব্দ)।	অজানিত চিত্রকর।
৩৬। টিপু সুলতানের দুই শিশুপুত্রের বিদায় গ্রহণ।	অজানিত।

ছবির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	চিত্রকরের নাম ও অন্যান্য মন্তব্য।
৩৭। **হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর**—(বর্ত্তমান নিজামের বাল্যকালের চিত্র)।	ডাউনার্ড।
৩৮। **আরল অব বিকন্‌সফিল্ড**—	
৩৯। **ফতে আলি সাহ**—(পারস্যের-সাহ) (১৭৯৮—১৮৩৪ খৃঃ অব্দ)।	মেহের আলি।
৪০। **মহেন্দ্র সিংহ**—(পাতিয়ালার মহারাজা) (১৮৬২—১৮৭২ খৃঃ)।	অজানিত।
৪১। **নবাব সাদত আলি খাঁ**—(অযোধ্যার নবাব) (১৭৯৮—১৮১৪ খৃঃ)।	আর, হোম।
৪২। **ফ্রান্সের সম্রাট পঞ্চদশ লুই**—(জন্ম ১৭১০ খৃঃ—রাজত্বকাল ১৭১৫—১৭৭৪ খৃঃ)।	কাল´তন লুঃ।
৪৩। **মেরী লেক্‌জিনস্কা**—(পঞ্চদশ লুইয়ের পত্নী।)	ঐ

মোটের উপর—লাট-প্রাসাদ ৮২ খানি সুবৃহৎ তৈলচিত্রে সুশোভিত ছিল। উপরে কতকগুলির পরিচয় আমরা সংক্ষেপে দিয়াছি, এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত চিত্রগুলিও লাট-ভবনের সম্পত্তি।

(১) টিপু সুলতানের পুত্রগণ, (২) ভুটান ও সিকিমের অধিপতি, (৩) ভারত সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, (৪) আগরার তাজমহল, (৫) মহারাজ বীরচন্দ্র দেব (ত্রিপুরাধিপতি), (৬) মুস্কিল-আসান, (৭) গোলাম আলি খাঁ (টিপুর বিশ্বস্ত মন্ত্রী), (৮) আলিরাজ খাঁ, (৯) নন্দরায়, (১০) রাজ খাঁ (টিপুর বিশ্বস্ত সেনাপতি), (১১) কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়া (মহীশূরের হিন্দুরাজা) (১৭৯৯—১৮৩১ খৃঃ অব্দ) ইনিই টিপুর পতনের পর, লর্ড ওয়েলেসলি কর্ত্তৃক মহীশূর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন, (১২) একখানি প্রাকৃতিক দৃশ্য, (১৩) চন্দ্রালোকে সমুদ্রতীরের দৃশ্য, (১৪) দ্বিতীয় আকবর সাহ (১৮০৬—১৮৩৭খৃঃ), (১৫) নদীকূলের দৃশ্য, (১৬) ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে যোধপুরের মহারাজার কলিকাতায় অভিষেক-দৃশ্য।

পূর্ব্বোক্ত চিত্রগুলির অধিকাংশই প্রমাণ-সাইজের এবং সেকালের নামজাদা বিলাতী চিত্রকরদের দ্বারা প্রস্তুত, বহুমূল্য তৈলচিত্র। এই চিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—হলের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

হাইকোর্ট।

হাইকোর্ট, টাউনহলের পশ্চিমদিকে "গথিক" (Gothic) প্রণালীতে নির্ম্মিত। ভারত-সম্রাটের প্রধান বিচারালয়, বঙ্গসাম্রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ—এই হাইকোর্ট। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে, ইহার ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, এই সুবৃহৎ বাড়ীটী সম্পূর্ণ হয়। ওয়ালটার গ্রাণভিল্ বলিয়া, পূর্ত্ত-বিভাগের একজন ইঞ্জিনিয়ার, এই আদালতগৃহের প্লান বা নক্সা প্রস্তুত করেন ও এই প্রকাণ্ড সৌধ তাঁহার তদারকীতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আদালত-গৃহটী, বিলাতের "ইপ্রেস-টাউনহলের" অনুকরণে নির্ম্মিত। বর্ত্তমান হাইকোর্টের পশ্চিমদিকে, সেকালের সুপ্রীম-কোর্ট ছিল। যে স্থানে আজকাল হাইকোর্ট নির্ম্মিত হইয়াছে, সেইস্থানের জমী অধিকার করিয়া, পূর্ব্বোক্ত সুপ্রীম-কোর্ট ও তিনজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের বসত-বাটী ছিল। সেইগুলি ভাঙ্গিয়া বিদ্যমানকালে তদধিকৃত স্থানে, এই হাইকোর্ট নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে, পুরাতন সুপ্রীম-কোর্ট বাটী নির্ম্মিত হয়। এই সুপ্রীম-কোর্টের নিকটে, সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার লঙ্গভিলি ক্লার্ক সাহেবের আবাসবাড়ী ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের আমলে, এই ক্লার্ক সাহেব একজন খুব নামজাদা ব্যারিষ্টার ছিলেন। প্রাচীন কলিকাতার হিতকর অনেক কার্য্য, তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। আগে এদেশে ইংরাজগণ বরফ খাইতে পাইতেন না। তাঁহার চেষ্টায়, কলিকাতা সহরে প্রথম "আইস-হাউস" বা বরফ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন জাহাজে করিয়া বরফ আসিত—এবং একটী গুদামে জমা থাকিত। বরফের সের সময়ে সময়ে এক টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়াইত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি হাইকোর্টের মধ্যে একটী "বার-লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বর্ত্তমান কালের, বিরাট বার-লাইব্রেরীর প্রথম সূত্রপাত। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, মেটকাফ-হল নির্ম্মিত হয়। এই ক্লার্ক সাহেবই, ইহার নির্ম্মাণ কমিটির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান কার্য্যকারী ছিলেন।

বর্ত্তমান এস্প্লানেড্ ও ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীটের সন্ধিস্থলে, আর একটী বাটী ছিল। "পঞ্চাশ" খ্রীষ্টাব্দের আমলে, এই বাটীতে উইলিয়ম মাক্ফারসন নামক একজন সাহেব বাস করিতেন। ইনি একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার ও সেকালের সুপ্রীম-কোর্টের মাষ্টারের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইহাঁর সহোদর

স্যর জর্জ্জ ম্যাক্‌ফারসন, পরবর্ত্তীকালে হাইকোর্টের জজ হন (১৮৬৪—১৮৭৭)। ওল্ডপোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটে, স্যর জেমস্ কল্‌ভিলির আবাস-বাটী ছিল। এই কলভিলি সাহেব, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সেকালের সুপ্রীম-কোর্টের এড্‌ভোকেট জেনারেল ছিলেন। ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ইনি সুপ্রীম-কোর্টে জজীয়তী করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যর উইলিয়ম পীল্, প্রধান বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, কলভিলি সাহেব, সুপ্রীম-কোর্টের চিফ্-জষ্টিস হন।

এক্ষণে পুরাতন সুপ্রীম-কোর্টের কথা বলিব। এই আদালত-গৃহটী দ্বিতল ছিল। উপরের তলায় "গ্র্যাণ্ডজুরী রুম্" (Grand Jury Room) আর নীচের তলায় আদালত-গৃহ ছিল। মারহাট্টা-খাতের সীমামধ্যস্থ অধিবাসীদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার বিচার জন্য, সেকালের মনীষি বিচারকগণ, এই নিম্নতলস্থ কক্ষগুলির শোভা-সম্বর্দ্ধন করিতেন। এই আদালত-বাটীর একটী কক্ষে সুপণ্ডিত স্যর উইলিয়ম জোন্সের বিশ্রাম-স্থান ছিল। স্যর উইলিয়ম ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম-কোর্টের পিউনী-জজ নিযুক্ত হন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, এই কলিকাতাতেই তাঁহার দেহান্ত হয়। স্যর উইলিয়ম, প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার গার্ডেন-রিচের "বাঙ্গলো" হইতে পদব্রজে আদালতে আসিতেন। আদালতের মধ্যস্থ এই বিশ্রাম-কক্ষটী তাঁহার জ্ঞানানুশীলনের পবিত্র মন্দির ছিল। অপরাহ্নে তিনি এই আদালত-গৃহের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া, পণ্ডিত ও মৌলবীদের নিকট সংস্কৃত ও আরবী, পারশী ভাষার পাঠ লইতেন। ইঁহাদের সাহায্যে তিনি সংস্কৃত ও উর্দ্দু ভাষার, বহুবিধ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করিতেন।

এই সুপ্রীম-কোর্ট ব্যতীত, তখন কলিকাতার সহরে আর একটী "আপিলেট্-কোর্ট" ছিল। বর্ত্তমান ঘোড়-দৌড়ের মাঠের পশ্চাৎদিকে, ভবানীপুর অঞ্চলে, যে প্রাসাদতুল্য বাটী, আজকাল "মিলিটারি-হাঁসপাতালে" পরিবর্ত্তিত, সেই বাড়ীতেই সেকালের জন্য এই আপীল-আদালত ছিল। এখানে দেওয়ানী ফৌজদারী, উভয়বিধ মামলাই নিষ্পত্তি হইত। সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া, এই আদালতের "জুরিস্‌ডিক্‌সান" বা বিচারসীমা নির্দ্ধারিত ছিল। পুরাকালের সাধারণের নিকট ইহা "সদর-দেওয়ানী-আদালত" বলিয়া পরিচিত ছিল।

ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টের ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ মার্চ্চের বিধান অনুসারে, সুপ্রীম-কোর্ট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চার্টারের বলে ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ফোর্ট-উইলিয়মের প্রথম গবর্ণর জেনারেল হন। সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি

হন—স্বনামখ্যাত স্যর ইলাইজা ইম্পি। এই আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এই—"To protect the natives from oppression and to give India the benifits of English Law. স্যর ইলাইজা ইম্পি হইতে, স্যর বার্ণিস পীকক্ পর্য্যন্ত, সেকালের সুপ্রীম-কোর্টে যে সমস্ত প্রধান জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা দ্বারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

সমগ্র বেঙ্গল-প্রেসিডেন্সির জন্য আরও দুইটী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের একটীর নাম "সদর-নিজামত-আদালত"। সমগ্র বঙ্গের ফৌজদারী-মামলা সমূহের আপীলের শুনানি এই আদালতে হইত। ইতিপূর্ব্বে দেওয়ানী-মোকদ্দমার আপীলের শেষ বিচারভার, সকৌন্সিল গবর্ণর সাহেবের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু নূতন চার্টার দ্বারা গবর্ণর ও কৌন্সিলের কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটায়, হেষ্টিংস, ইম্পিকে সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান জজীয়তী ছাড়া—সদর-দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ করিয়া দেন। ইম্পির প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। যাহা হউক, এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইম্পি মফঃস্বলের নিম্ন আদালতসমূহের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। বর্ত্তমান কালের নিয়মসমূহ ইম্পির প্রণোদিত এই নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে—এক নূতন আইনের বলে, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন আদালতের সমীকরণ হইয়া বর্ত্তমান হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের প্রথম চিফ্-জষ্টিস, স্যর বার্ণিস্ পিকক। তাঁহার সহযোগীরূপে দ্বাদশজন পিউনী-জজও এই আইনের বলে নিযুক্ত হন। হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, সদর-দেওয়ানী-আদালত, সদর-নিজামত-আদালত ও সুপ্রীম-কোর্টের লোপসাধন হয়। এই নব প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের জজেদের মধ্যে, আটজন কোম্পানী-বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব আদালত হইতে আসেন। বাকী চারিজনের মধ্যে, দুইজন (স্যর চার্লস্ জ্যাক্‌সন ও স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্) সুপ্রীম-কোর্টের জজ আর জজ নর্ম্মান ও মর্গান ব্যারিষ্টার-জজ। পূর্ব্বোক্ত আদালতত্রয়ের হস্তে যে সমস্ত বিচার ক্ষমতা ছিল—তাহা নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের জজেদের হস্তে অর্পিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের নূতন "লেটার্স-পেটেণ্ট" (Letter's Patent) দ্বারা, হাইকোর্টের জুরিস্‌ডিক্‌সান বা বিচারসীমা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়া যায়।

বর্ত্তমানে এই হাইকোর্টে অনেক বাঙ্গালী-জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

(আ)মরা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের হাইকোর্টের জজদিগের একটী তালিকা নিম্নে (দি)তেছি।

(চিফ্-জষ্টিস।)

অনারেবল জষ্টিস্ স্যর লরেন্স, হিউ জেনকিন্স (K. C. I. E.)

পিউনী-জজগণ।

অনারেবল স্যর এচ্, এ, ষ্টিফেন Kt. (বার-এট্-ল)
" জন জর্জ্জ উড্রোফ্ এম, এ ; বি, সি, এল্। (বার-এট্-ল)
" স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় Kt. K. C. I. E. M. A ; D. L.
" হারবার্ট, হোমউড্ I. C. S.
" চার্লস্, উইলিয়াম চিটি, বি, এ। (বার-এট্-ল)
" আরনেষ্ট, এডওয়ার্ড ফ্লেচার। (বার-এট্-ল)
" সৈয়দ সরফুদ্দিন। (বার-এট্-ল)
" হেন্‌রি, রেনেল, হল্যাণ্ড, কক্স I. C. S.
" হারবার্ট, উইলিয়াম, ক্যামেরান কারণডফ্ Kt. I. C. S ; C. I. E.
" দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
" নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম, এ ; বি, এল।
" উইলিয়াম টিউনন্ আই, সি, এস।
" আশুতোষ চৌধুরী। (বার-এট্-ল).
" সৈয়দ হাসান ইমান। (বার-এট্-ল)
" টমাস, উইলিয়াম রিচার্ডসন I. C. S.
" চার্লস, বিচক্রফট I. C. S.
" এডমণ্ড, পি, চ্যাপম্যান I. C. S.
" বসন্তকুমার মল্লিক I. C. S.

টাউন-হল।

হাইকোর্টের পার্শ্বেই কলিকাতার টাউন-হল। পূর্ব্বে আমরা যে "লটারি-কমিটির" কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের সহায়তাতেই এই সুবৃহৎ টাউন-হল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একবারের লটারিতে, ইহার নির্ম্মাণোপ-

যোগী টাকা না উঠায়, তজ্জন্য দুই তিন বৎসর ধরিয়া লটারি করিয়া টাকা তুলিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার আদেশে ও তত্ত্বাবধানে ১৮০৬—১৮০৭ খৃঃ মধ্যে, এই প্রাসাদ-তুল্য বাটী নির্ম্মিত হয়। প্রথমে সেণ্টএণ্ড্রু গির্জ্জার অতি সান্নিধ্যে, পুরাতন কোর্ট-হাউসের অধিকৃত স্থানে, কলিকাতা টাউন-হল নির্ম্মাণের কল্পনা হইয়াছিল। শেষ বর্ত্তমান স্থানই বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, গারষ্টিন ও অবেরী নামক দুইজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তায়, বর্ত্তমান টাউন-হল বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রয়োজনীয় রাজকীয় ঘোষণাসমূহ বা কোনরূপ সরকারী "প্রোক্লামেসন" (Proclamation) এই টাউন-হলের বিস্তৃত সোপানরাজির উপর হইতেই রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিঘোষিত হইয়া থাকে। আমাদের ভারত-সম্রাট রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর রাজ্যাভিষেক সংবাদ, এইস্থান হইতেই বিঘোষিত হইয়াছিল। এ দৃশ্য, বর্ত্তমানকালের অনেকেই চক্ষে দেখিয়াছেন।

টাউনহলের নীচের তলাটী, সাধারণ কার্য্যে খুব কমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে কোন কোন সরকারী আপিস স্থানাভাব জন্য, অস্থায়ী-ভাবে এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানকালে মিউনিসিপ্যাল-ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত, এই টাউন-হলেই প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান হাইকোর্ট নির্ম্মাণ সময়েও এইস্থানে অস্থায়ীভাবে ইহার কার্য্য চলিয়াছিল। এই টাউন-হলের সিঁড়ির উপরই, সুবিখ্যাত চিফ্ জষ্টিস স্যর জন নর্ম্মান, বিশ্বাসঘাতক আততায়ীর হস্তে ছোরা দ্বারা আহত হন।

টাউনহলের দুইটী প্রবেশ পথ আছে। একটী এস্প্ল্যানেড-রোর দিক দিয়া—অপরটী গবর্ণমেণ্ট প্রিন্টিংএর সম্মুখদিকে। সভা-সমিতি উপলক্ষে এসপ্লানেডের পথ দিয়াই, জনসঙ্ঘ টাউন-হলে প্রবেশ করেন।

এই পথ দিয়া প্রবেশ করিলেই, সর্ব্বপ্রথমে নিম্নতলে স্বর্গীয় মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের প্রস্তরমূর্ত্তি বা Bust পরিদৃশ্য হয়। ভিতরের দিকের হলে বেকন নামক প্রসিদ্ধ ভাস্করের খোদিত, স্বনামখ্যাত গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের সুবৃহৎ প্রস্তর-মূর্ত্তি বা ষ্ট্যাচু অপরদিকের বারান্দায়, প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের শ্বেত-মর্ম্মরময় সুবৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি বা ষ্ট্যাচু আছে। আগে এই হলের মধ্যে, পরবর্ত্তী গবর্ণর-জেনারেল মার্কুইস অব হেষ্টিংসের ষ্ট্যাচুও ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতকালে ইহা বর্ত্তমান ডালহৌসী-ইনষ্টিটিউটে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

টাউনহলের মধ্যে যে সমস্ত তৈল-চিত্র ও প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকের জানিয়া রাখা উচিত।

পূর্ব্বদিকের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলেই, প্রথমে স্যর হেনরি হ্যারিসানের প্রস্তর-নির্ম্মিত অর্দ্ধমূর্ত্তি বা Bust। এই হ্যারিসান সাহেব, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন ও বর্ত্তমান হ্যারিসান-রোড নামক সুপ্রশস্ত পথটী ইহাঁর নামেই পরিচিত।

দেয়ালের গায়ে—নিম্নলিখিত চিত্রগুলি আছে। (১) মেজর জেনারেল নট, (২) কেশবচন্দ্র সেন, (৩) স্যর চার্লস মেটকাফ।

উপরের তলায়—(১) ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, (২) মহারাণীর স্বামী প্রিন্স কন্‌সর্ট, (৩) জজ্ স্যর হেনরি নর্ম্মান, (৪) পি, এচ্ ক্যামেরান, (৫) স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, (৬) স্বনামখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

উপরতলে পশ্চিমদিকের দেয়ালে।—(১) হিজ্ রয়াল হাই-নেস্ ডিউক অব এডিনবরার গ্রাণ্ডকমাণ্ডার-অব্-ষ্টার-অব-ইণ্ডিয়া উপাধি লাভ উপলক্ষে—গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মেয়োর দরবার।

উত্তরদিকের দেয়ালে।—(১) পাদরী ডল্ সাহেব, (২) কৌন্সিলের-মেম্বর অনারেবল জেমস জিব্‌স আই, সি, এস; সি, আই, ই, (৩) মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী রবার্ট টর্ণবুল, (৪) কলিকাতার প্রথম সেরিফ্ মঞ্চারজী রস্তমজী, (৫) স্যর উইলিয়ম গ্রে—লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর (১৮৬৭-৭১), (৬) লেডি ডফারিন্, (৭) লেডি ল্যান্সডাউন্, (৮) স্যর রিভার্স টমসন (বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, (৯) পঞ্চম বিশপ ড্যানিয়েল, (১০) স্যর হেন্‌রি হ্যারিসন্।

দক্ষিণদিকের দেয়ালে।—(১) সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, (২) সুপ্রসিদ্ধ পাদরী ডাক্তার ডফ্, (৩) মান্দ্রাজের গবর্ণর, কর্ণেল কলিন্ মেকেঞ্জি (পরে সরভেয়ার-জেনারেল), (৪) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, (৫) ভারত গবর্ণমেণ্টের ফরেন্-সেক্রেটারী স্যর হেন্‌রি ডুরাণ্ড, (৬) বিশপ জনসন্, (৭) হেনরি লি, আই, সি, এস, (৮) রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, (৯) এফ, জে, জনষ্টন (বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের চিফ্-এঞ্জিনিয়ার)।

সমস্ত ছবি ও প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলির সবিস্তার ইতিহাস দিবার স্থান আমাদের নাই। এই টাউনহলে, স্বনামখ্যাত বাবু পিয়ারীচাঁদ মিত্র ও বাবু রাম-

গোপাল ঘোষের প্রস্তর-মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ব্যতীত স্যর হেনরি কটন, জজ প্রিন্সেপ, স্যর উইলিয়ম নট্, স্যর উইলিয়ম কেসমেণ্ট, চার্লস হে, ক্যামরান, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর উইলিয়াম গ্রে, মানেকজী রস্তমজী, স্যর চার্লস নিভেন্স, স্যর হেনরি রিকেট্‌স প্রভৃতি সেকালের নামজাদা সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণের ছবিগুলি এখনও বর্ত্তমান।

বড় বড় সভাসমিতি ও সাহেবদের-ভোজ, বল প্রভৃতি উৎসবে এই টাউনহল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান টাউনহল, প্রাসাদময়ী কলিকাতার গৌরব স্বরূপ। বহু জনসমাগমের স্থান সঙ্কুলান করিবার উপযুক্ত—এরূপ সুবৃহৎ দ্বিতল বাড়ী কলিকাতায় আর নাই।

মেটকাফ-হল ও ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী।

হেয়ার-ষ্ট্রীট ও ষ্ট্রাণ্ড-রোডের সন্ধিস্থলে, মেটকাফ-হলের এই প্রাসাদতুল্য সুন্দর অট্টালিকা বর্ত্তমান। অধুনাতনকালে ইহা "ইম্পিরিয়াল-লাইব্রেরী" নামে প্রখ্যাত। লর্ড কর্জ্জন, ভূতপূর্ব্ব মেটকাফ-হলের স্বত্বাধিকারীগণের নিকট ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ্ হইতে, এই লাইব্রেরীটি কিনিয়া লয়েন। তৎপরে নবভাবে সংস্কৃত হইয়া, তাঁহারই চেষ্টায়, ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। অধুনাতনকালে ইহার সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অসংখ্য নূতন পুস্তকাদি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ-মিউজিয়ম নামক লাইব্রেরীর অনুকরণে, ইহার কার্য্যপ্রণালী অনুষ্ঠিত হয়। ইহা কলিকাতা সহরের বিদ্যার্থীগণের, জ্ঞানালোচনার পবিত্র রত্ন-মন্দির। সর্ব্ববিষয়িণী পুস্তক ইহাতে আছে। পাঠকগণ বিনামূল্যে এই পাঠাগারে বসিয়া, পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারেন। সাধারণের পক্ষে—পুস্তকাদি বাটীতে আনিবার নিয়ম নাই, তবে বিশেষ বন্দোবস্তে আনিতে পারা যায়।

লর্ড মেটকাফের নাম, বঙ্গবাসী সহজে ভুলিবে না। তিনি বাঙ্গালীকে "মুদ্রাযন্ত্রের-স্বাধীনতা" নামক অমূল্য রত্ন প্রদান করেন। মেটকাফ সাহেব ১৮৩৫ হইতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত, অতি অল্প সময়ের জন্য, অর্থাৎ লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রস্থানের পর হইতে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের আগমন কাল পর্য্যন্ত, গবর্ণর-জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই স্মৃতি রক্ষার্থে, ইংরাজ ও এদেশীয় ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া, এই লাইব্রেরীটী

তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া স্থাপন করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, মেটকাফ-হল নির্ম্মাণের জন্য সভাসমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়।

এই মেটকাফ-হল প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, কলিকাতার জন সাধারণের ব্যবহার জন্য, একটী ছোট খাট লাইব্রেরী ছিল। ধরিতে গেলে, এটী সেকালের কলিকাতার প্রথম সাধারণ-পাঠাগার। এসপ্লানেড রোডে, ডাক্তার ষ্ট্রং বলিয়া একজন সাহেবের আবাস-বাটীতে, প্রাচীন কলিকাতার এই পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল। এই সাধারণ-পাঠাগার ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত ডাক্তার সাহেবের বাটীতেই থাকে, তৎপরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লিয়ন্স-রেঞ্জে, ফোর্ট-উইলিয়ম কালেজে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, মেটকাফ-হল নির্ম্মিত হইলে, এই পাঠাগার সেইস্থানে উঠিয়া যায়।

অতীব পুরাকালে, জব চার্ণকের পরের আমলে, বর্ত্তমান মেটকাফ-হলের অধিকৃত স্থানটী, হরিনারায়ণ শেঠের আবাস-ভিটা ছিল। তিনি বহুদিন এই বাটীতে বাস করিয়া পরবর্ত্তীকালে ইহা সাহেবদের ভাড়া দেন। কোম্পানীর আমলের সেকালের অনেক পদস্থ কর্ম্মচারী এই বাড়ী ভাড়া লইয়া বসবাস করিয়াছিলেন।

১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে, এই মেটকাফ-হল নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। এথেন্স মহানগরীতে "বায়ুদেবতার-মন্দির" (Temple of Winds) বলিয়া একটী পুরাকালের মন্দির আছে, তাহারই বহির্দ্দেশের সুন্দর নমুনাটী লইয়া, এই মেটকাফ-হলের সম্মুখভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মেটকাফ-হল সেকালের কলিকাতার মধ্যে, একটী গণনীয় সাধারণ পাঠাগার ছিল। তখন ইহার পর্য্যবেক্ষণ ভার, ট্রষ্টিদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই ট্রষ্টি ও শেয়ার-হোল্ডার বা অংশীদারগণের মধ্যে, অনেক পদস্থ ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছিলেন। চারি টাকা ও দুই টাকা, হিসাবে পুস্তক পাঠের জন্য চাঁদাও নির্দ্দিষ্ট ছিল। ক্রমে এই মেটকাফ-হলের আর্থিক ও সর্ব্ব বিষয়ক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে।

১৯০৩ খ্রীঃ অব্দের ৩০ জানুয়ারি তারিখে, বর্ত্তমান ইম্পিরিয়েল-লাইব্রেরীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তৎকালীন স্বনামখ্যাত বড়লাট, লর্ড কর্জ্জন এই পুস্তক-বহুল সাধারণ-পাঠাগারটী স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার চেষ্টাতেই, ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই বাটী ও পুরাতন লাইব্রেরী ক্রয় করিয়া লয়েন। ইহা সেই সময় হইতে একটী "ফ্রি-পাবলিক-লাইব্রেরীতে" পরিণত হয়। কি করিয়া এই পরিবর্ত্তন ঘটে—তাহার সমস্ত কথা, লর্ড কর্জ্জন

স্বমুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই ইম্পিরিয়াল-লাইব্রেরী-গৃহ খুলিবার দিন, তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারাংশ এই—"চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন আমার মনে গবর্ণমেণ্ট-অফিস এবং সাধারণের কার্য্যে ব্যবহৃত বাটীগুলি দেখিবার, একটা প্রবল বাসনা উদিত হয়। আমি শুনিয়াছিলাম, এই সহরের মধ্যে মেটকাফ-হল বলিয়া একটী সুবৃহৎ বাটী আছে ও তাহাতে একটী সাধারণ-পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত। একদিন আমি সেই বাটী দেখিতে যাই। লাইব্রেরীর সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিবামাত্র, প্রথমতলে "এগ্রিহর্টিকলচরাল-সোসাইটীর" অফিস-গৃহ, আমার চক্ষে পড়ে। ইহার অবস্থা তত সন্তোষজনক নহে। তৎপরে উপরে গিয়া লাইব্রেরীর অবস্থা যাহা দেখিলাম, তাহা আরও শোচনীয়! পুস্তক-গুলির অবস্থা অতি বিশৃঙ্খল। পুস্তকের মধ্যে উপন্যাসের অংশই অত্যধিক। অনেক পুস্তক শোচনীয় ভাবে ছিঁড়িয়াও গিয়াছে। দস্তরমত বাঁধানো নাই। পাঠাগারের পাঠক সংখ্যা দুই চারিজন। গৃহটীও পারাবত-সঙ্কুল। ইহার পর একদিন আমি গবর্ণমেণ্টের হোম-ডিপার্টমেণ্টের লাই-ব্রেরীটী দেখিয়া আসি। এই লাইব্রেরী, ভারত-গবর্ণমেণ্টের খাস্ সম্পত্তি। এখানে সাধারণের কোনরূপ প্রবেশাধিকার নাই। কেবল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরাই, এই পাঠাগারের পুস্তকাদি ব্যবহার করিতে সক্ষম। এইরূপ ব্যাপারসমূহ দেখিয়া, আমার মনে একটী উচ্চঅঙ্গের "ইম্পিরিয়েল-লাইব্রেরী" বা রাজকীয়-পাঠাগার স্থাপনের বাসনা জন্মে। আমি ভারত-গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে, লাইব্রেরীর সেয়ার-হোলডার ও এগ্রিহর্টিকলচরাল সোসাইটীর সদস্যগণের নিকট, এই বাটী ও লাইব্রেরী ক্রয় করিবার প্রস্তাব করি। ঐ সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, এই বাটীটির আমূল সংস্কার করাইয়া, ইহার চেয়ার টেবিল আলমারী পর্য্যন্ত নূতনভাবে প্রস্তুত করাইয়া, সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে এই পাঠাগার স্থাপন করিয়াছি। এই সময়ে লাট-কৌন্সিলে এ সম্বন্ধে একটী আইন পাশ করাইয়া, লাইব্রেরীটীকে গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্টকে সুপারিস করিয়া, ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য বাৎসরিক একটা অর্থ সাহায্যেরও বন্দোবস্ত করি। ইহার পুরাতন অব্যবহার্য্য অসার পুস্তকগুলিকে তৎপরে দূরীভূত করিয়া, অনেক টাকার নূতন পুস্তক কেনা হয়। এখন এই পাঠাগারে এক লক্ষের উপর পুস্তক আছে।"

লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতার মর্ম্মার্থ হইতে, পাঠক বর্ত্তমান ইম্পিরিয়াল

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কারণ জানিতে পারিলেন। এই পাঠাগারটীতে বসিয়া, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বিনামূল্যে পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারেন। একখানি ছাড়পত্র থাকিলেই, এই পাঠাগারে প্রবেশলাভ করা যায়। এই ছাড়ের জন্য, সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হয়। বিদ্যার্থী-গণের জ্ঞানতৃষ্ণার নিবৃত্তি ও গবেষণার পথ প্রশস্তকল্পে, এই সাধারণ রাজকীয়-পাঠাগার স্থাপন করিয়া, লর্ড কর্জ্জন একটী অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বেলভেডিয়ার রাজপ্রাসাদ।

বেলভেডিয়ার, বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণরগণের রাজ-প্রাসাদ। ইহা আলিপুরে অবস্থিত। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাটগণ, এই বেলভেডিয়ার-প্রাসাদেই বাস করিয়া গিয়াছেন।

আলিপুর নামটি কেন হইল, তাহার একটু ইতিহাস, আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে নবাব মীরজাফর, গবর্ণর ভান্সিটার্ট কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। ইহার পর তিনি মুরশীদাবাদ ত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় বসবাস করেন। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, বর্ত্তমান বেলভেডিয়ারের নিকটবর্ত্তী কোন একটী স্থানে, নবাব মীরজাফরের আবাসস্থান ছিল। আবার অন্য মতে, আলিপুরের বর্ত্তমান জজ-কাছারির অধিকৃত স্থানেই, নবাবের আলি-পুরের প্রাসাদ ছিল। বাঙ্গালার নবাব মীরজাফর আলির বসবাসের জন্যই, এই স্থান "আলিপুর" বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে মীর-জাফর পুনরায় নবাবী-গদিতে উপবেশন করেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যাইবার সময়, আলিপুরের অধিকাংশ সম্পত্তি তিনি গবর্ণর ওয়ারেণ-হেষ্টিংসকে দান বা বিক্রয় করিয়া যান। অতীত-কালের নানাবিধ ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়, গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের বসবাসের জন্যই, এই আলিপুর সেই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। হেষ্টিংসের জন্যই, কালীঘাটের গঙ্গার উপর প্রথম পুল নির্ম্মিত হয়— আর "হেষ্টিংস-হাউস" এখনও তাঁহার কীর্ত্তিঘোষণা করিতেছে।

১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে বেলভেডিয়ারের প্রথম নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে গবর্ণর সাহেবের জন্য, একটী বাগান-বাটী নির্ম্মাণের প্রস্তাব, বিলাতে কোর্ট-অব-ডিরেক্টারের নিকট গিয়াছিল। বেলভেডিয়ারে মিঃ ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডের বাটীটি কিনিয়া লইয়া, তাহা গবর্ণর-সাহেবের বাগান

বাটীতে পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু বিলাতের-কর্ত্তারা, এ প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করায়, তখন এ সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। ইহার পর ডচ্ এডমিরাল ষ্টাভোরিনসের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৭৭০ খৃঃ অব্দে এই বেলভেডিয়ারে গবর্ণরের বাগান-বাটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরাজ-গবর্ণর— ডচ্-গবর্ণর ও এডমিরালগণকে একবার নিমন্ত্রণ করেন। ষ্টাভোরিনস এই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন. তাহা হইতে প্রমাণ হয়, ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, বেল-ভেডিয়ারে, ইংরাজ-গবর্ণরের আবাস-বাটী বর্ত্তমান ছিল। পাঁচ বৎসর পরে গবর্ণর-জেনারেল হইয়া, ওয়ারেণ-হেষ্টিংস, আলিপুরে বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার লেখা হইতে প্রমাণ হয়, তখন তিনি এই বেলভেডিয়ারে (অবশ্য বর্ত্তমান প্রাসাদে নহে, কারণ এ প্রাসাদ তখনও নির্ম্মিত হয় নাই) কোন একটী বাড়ীতে বাস করিতেন। এই বাড়ীতেই তিনি, মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত, চক্রান্ত-মোকদ্দমার প্রধান নায়ক কমলউদ্দিন সেখের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এই কমলউদ্দিন, নন্দকুমারের নামে আনীত "জাল-মোকদ্দমার" একজন প্রধান সাক্ষী ছিল। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেণ-হেষ্টিংস, তাঁহার প্রিয়বন্ধু স্যর ইলাইজা ইম্পিকে, তাঁহার বাগান-বাটীতে কিয়দ্দিন বাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই বাগান-বাটী আলিপুর বেলভেডিয়ারের কোনও বাটী, কি হেষ্টিংসের ঋষড়ার বাগান-বাটী, কিছুই স্থির করা যায় না। ইহার পরবর্ত্তীকালে মিসেস্ ফে'র * একখানি পত্র হইতে প্রমাণ হয়, তিনি হেষ্টিংসের এই বেলভেডিয়ার বাটীতেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

রেভারেণ্ড ফারমিঙ্গার বলেন,—"নূতন বাড়ী প্রস্তুত করা এবং পরে সেই বাটী বিক্রয় করা, হেষ্টিংসের একটা বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। কলিকাতা ও আলিপুরে তাঁহার একাধিক বাটী ছিল। এই জন্য কোন্ বাটীতে তিনি বাস করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে স্থির করা বড়ই দুরূহ।" ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে—হেষ্টিংস এই বেলভেডিয়ার

* এই মিসেস্ ফেরের, পুরাকালের কলিকাতার একজন ব্যারিষ্টার-পত্নী। ইনি স্থলপথে সরাসর বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কালিকটে অবস্থানকালে, ইনি হায়দর আলির হস্তে বন্দী হন। মিসেস ফের লিখিত অনেক চিঠি-পত্র হইতে, সেকালের কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। গবর্ণর-পত্নী লেডী হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার খুব বন্ধুত্ব ছিল।

বাটীটি, মেজর টলিকে বিক্রয় করেন। এই মেজর টলিই, খিদিরপুরের বর্ত্তমান টলিস্-নালার খনক ও টালিগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। টলি সাহেব, এই বাটীতে প্রথমে বাস করিয়াছিলেন, পরে তিনি ইহা ভাড়া দেন। টলির মৃত্যুর পর ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে, তাঁহার এটর্ণি কর্ত্তৃক ইহা নীলামে বিক্রীত হয়। তৎপরে এই বাটী ব্রেরেটন বার্চ্চ নামক এক ইংরাজের সম্পত্তি হয়। (১৮১০ খ্রীঃ অব্দ)। বার্চ্চ সাহেবের পর, ইহা বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীর সম্পত্তি হইয়াছিল। (১৮২৪ খ্রীঃ অব্দ) এই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস স্থান কোথায়, তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি নাই। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এই বেলভেডিয়ার বাটী, জেম্স ম্যাকিলপ, নামক একজন ইংরাজের দখলে আসে। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে দেখিতে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি অনারেবল স্যর এডওয়ার্ড প্যাজেট কে, সি, বি, এই বাটীতে ভাড়াটিয়া ছিলেন।

১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ডালহৌসী, বিলাতের কর্ত্তাদের এক পত্র লেখেন। তাহার সার মর্ম্ম এই—"বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণরগণের জন্য স্বতন্ত্র আবাস-বাটী নির্ম্মিত হওয়া উচিত। এই বাটী গবর্ণমেণ্টের খরচায় খরিদ করা ও সাজান হইবে। ভারতের গবর্ণর-জেনারেল এবং বোম্বে ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির গবর্ণরদের জন্য যেরূপ স্বতন্ত্র আবাস-স্থান আছে, বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরদের জন্য সেইরূপ কোন কিছু হওয়া উচিত।" লর্ড ডালহৌসির এই মন্তব্যের ফলে ও চেষ্টায়, বেলভেডিয়ার বাটীটিই শেষ লাট-প্রাসাদের জন্য মনোনীত হয়। তখন এই বাটীটি সুপ্রীমকোর্টের এডভোকেট জেনারেল, রবার্ট প্রিন্সেপ সাহেবের দখলে ছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে এই বাটীটি ক্রয় করিয়া লয়েন।

তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরদিগের আমলে, এই বাটীর নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। স্যর উইলিয়াম গ্রে, স্যর এস্‌লি ইডেন, স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলী, স্যর চার্লস ইলিয়াট, স্যর রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরদের আমলে, এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার নানাস্থান নূতনভাবে নির্ম্মিত হইয়া ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালার গবর্ণর ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের চার্টারের বলে, গবর্ণর-জেনারেল অব ইণ্ডিয়া এবং গবর্ণর-অব-বেঙ্গল বলিয়া আখ্যাত হইলেন। এই গবর্ণর জেনারেলের হস্তে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া ছিল—যে তিনি ইচ্ছা করিলে একজন ডেপুটী-গবর্ণর নিযুক্ত করিতে পারেন। সমগ্র বঙ্গদেশের শাসনভার

এই ডেপুটীর হস্তেই ন্যস্ত হইত। ডেপুটী-গবর্ণরেরা, এই কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কোন বেতনাদি পাইতেন না। কোম্পানীর অধীনে, তাঁহারা পূর্ব্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকার সময়, যে বেতন পাইতেন—তাহা লইয়াই এই ডেপুটীর কাজ করিতে হইত। যে কয়জন ডেপুটী-গবর্ণর, এইভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকের জানিয়া রাখা উচিত।

(বঙ্গের ডেপুটী-গবর্ণরগণ) (১৮৩৭—১৮৪৯ খ্রীঃ)

(১)	এলেক্জাণ্ডার রস্	১৮৩৭ খ্রীঃ
(২)	কর্ণেল উইলিয়াম মরিসন সি, বি, (মান্দ্রাজ-আর্টিলারি)	১৮৩৮ খ্রীঃ
(৩)	টমাস ক্যাম্বেল রবার্টসন	১৮৩৯ খ্রীঃ
(৪)	স্যর টমাস হারবার্ট ম্যাডক্ সি, বি,	১৮৪৫—১৮৪৮
(৫)	মেজর-জেনারেল স্যর,জে,লিট্লার জি, সি,বি	.৮৪৯ খ্রীঃ
(৬)	অনারেবাল জে, এ, ডোরিন্	১৮৫৩ খ্রীঃ

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী, পার্লামেণ্টের নিকট এক নূতন চার্টার প্রাপ্ত হন। লর্ড ডালহাউসীর বিশেষ অনুরোধে, পার্লামেণ্ট বঙ্গের লেফ্টেনাণ্ট-গবর্ণরের পদ সৃষ্টি করেন। ইঁহার পর হইতেই লেফ্টেনাণ্ট-গবর্ণরগণ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার ভাগ্য পরিচালক হন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দ হইতে, ১৯০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত লেফ্টেনাণ্ট-গবর্ণরগণ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার মস্নদে বসিয়াছিলেন।

(বঙ্গের লেফ্টেনাণ্ট-গবর্ণরগণের নাম।)

নাম	নিয়োগ সময়	মন্তব্য
স্যর ফ্রেডরিক্ জেমস হ্যালিডে K. C. B.	১৮৫৪ খৃঃ (১লা মে)	১ম লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর।
স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট, K.C.B., G.G.M.G.	১৮৫৯ খৃঃ (১লা মে)	
স্যর সিসিল বিডন, K. C. S. I.	১৮৬২ খৃঃ (২৩ এপ্রিল)	ইঁহারই নামে বিডন ষ্ট্রীট।
স্যর উইলিয়াম গ্রে, K, C, S. I.	১৮৬৭ খৃঃ ঐ	ইঁহারই নামে গ্রে ষ্ট্রীট।
স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল M,P. K.C.S I. D.C.L.	১৮৭১ খৃঃ (১লা মার্চ্চ)	
দি রাইট অনারেবল, স্যর রিচার্ড টেম্পল M.P.C.S.I C.I.E.D.C.L.&	১৮৭৪ খৃঃ (৯ই এপ্রিল)	

নাম	নিয়োগ সময়	মন্তব্য
দি অনারেবল স্যর এস্‌লি ইডেন K.C.S.I.	১৮৭৭ খৃঃ (৮ই জানুয়ারি)* ঐ (১লা মে)	প্রতিনিধিরূপে* নিয়োগ।
স্যর ষ্টুয়ার্ট কলভিন্ বেলী K.C.S.I.C.I.E.	১৮৭৯ খৃঃ (১৫ই জুলাই হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)	প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ।
স্যর অগষ্টস্ রিভার্স টমসন্ K.C.S.I.	১৮৮২ খৃঃ (২৪ এপ্রিল)	
হোরেশ্ এবেল্ ককরেল্ C S.I.	১৮৮৫ খৃঃ (১১ই আগষ্ট হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর।)	প্রতিনিধি।
স্যর ষ্টুয়ার্ট কল্‌ভিন্ বেলী K.C.S.I.	১৮৮৭ খৃঃ (২রা এপ্রিল)	
স্যর চার্লস আলফ্রেড ইলিয়ট K.C.S.I.	১৮৯০ খৃঃ (১৭ই ডিসেম্বর)	
স্যর এণ্টনি প্যাট্রিক ম্যাকডনেল K.C.S.I.	১৮৯৩ খৃঃ (৩০এ মে)	প্রতিনিধি।
স্যর এলেকজান্দার মেকেঞ্জি K.C.S.I.	(১৮৯৫ খৃঃ ১৮ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের ৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত)	
স্যর চার্লস সিসিল ষ্টিভেন্স K.C.S.I.	(১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ২২এ জুন হইতে ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)	প্রতিনিধি।
স্যর জন উড্‌বরণ	১৮৯৮ খৃঃ	
স্যর জন বোর্ডিলন্	১৯০৩ খৃঃ	
স্যর এন্‌ড্রু ফ্রেজার	১৯০৪ খৃঃ	
স্যর উইলিয়াম ডিউক	১৯০৪ খৃঃ	

অসীম গৌরবান্বিত আসমুদ্র ভারতের-অধীশ্বর, মহাপ্রতাপান্বিত ভারতসম্রাট, পঞ্চম জর্জ্জের আদেশে ও আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয়, প্রজা-হিতৈষী, বড়-লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জের অভিপ্রায়ানুসারে, সমগ্র ভারতের রাজধানী এক্ষণে কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশ একটী স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হওয়ায়, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মত, একজন গবর্ণরের হস্তে বঙ্গের শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য, যে বঙ্গের প্রথম গবর্ণররূপে আমরা লর্ড কারমাইকেলের মত একজন উদারহৃদয়, প্রজাহিতৈষী দয়ালু গবর্ণর পাইয়াছি। বঙ্গেশ্বর কারমাইকেলের বিশেষ পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজনই নাই। তিনি নিজের গুণগরিমায়, প্রজা-বর্গের নিকট বিশেষরূপে সম্মানিত। বঙ্গের শিক্ষিত অন্তঃপুরিকাগণও

তাঁহার গৌরবান্বিত নামের সহিত পরিচিত। তাঁহার শাসনাধীন স্থান সমূহে, প্রজাকুল, তাঁহার নামোচ্চারণেও ধন্য হয়।

আমাদের বর্ত্তমান সর্ব্বজন প্রিয়, বড়লাট-বাহাদুরের দিল্লীতে অবস্থান হেতু, যদিও বঙ্গবাসীর সহিত তাঁহার একটু দূরসম্পর্ক হইয়াছে, তাহা হইলেও, আদর্শ প্রজারঞ্জিনী বৃত্তিদ্বারা, তিনি সমগ্র বঙ্গবাসীগণের মনে সর্ব্বদাই স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার সহানুভূতির ফলেই, বঙ্গদেশ একটী স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হইয়াছে ও সুদূর দিল্লীতে থাকিয়াও তিনি বঙ্গবাসীর রাজভক্তিতে প্রীত ও তাহাদের মঙ্গলসাধনে সর্ব্বদাই ব্রতী এবং বঙ্গবাসীকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

কলিকাতার লাট-প্রাসাদ, যাহাতে গবর্ণর জেনারেলগণ বাস করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহা বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের রাজপ্রাসাদ হইয়াছে। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরগণের বাসস্থান, বেলভেডিয়ার এখন গবর্ণমেণ্টের খাসে থাকিলেও, সেখানে কোন রাজকর্ম্মচারী বাস করেন না। কলিকাতা ও ঢাকা এই দুইটি নগরী বঙ্গদেশের প্রধান শাসনকেন্দ্র নির্ব্বাচিত হওয়ায়, বঙ্গেশ্বরকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া, সময়ে সময়ে ঢাকাতেও থাকিতে হয়।

জেনারেল পোষ্ট আফিস।

কোম্পানীর প্রথম আমলে—যখন ডাকের প্রচলন হয় নাই, তখন কলিকাতায় কোন পোষ্টাফিসই ছিল না। কোন্ সময়ে প্রথম পোষ্টাফিস স্থাপিত হয়, ডাকের কার্য্য আরম্ভ হয়, সেকালে চিঠি-পত্র ও পার্শেল প্রভৃতির মাশুল কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। আজকাল যে পথটী Old Post Office Street বলিয়া কথিত, সেইস্থানে পুরাকালে একটী ডাকঘর ছিল। ইহাই কলিকাতার প্রথম ডাকঘর। বর্ত্তমান বড় ডাকঘর ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। যেস্থানে এই ডাকঘর নির্ম্মিত হইয়াছে—সেইস্থানে পূর্ব্বে প্রাচীন কলিকাতা দুর্গের একাংশ বর্ত্তমান ছিল। প্রাচীন দুর্গ, অর্থাৎ যে দুর্গ নবাব সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করেন, তাহার বিশেষ কোন চিহ্ন না থাকিলেও, বর্ত্তমান বড় ডাকঘরের একাংশে, এখনও একটু বর্ত্তমান আছে। লর্ড কর্জ্জন, পুরাতন-দুর্গের কয়েকটী গৃহ, অতীতের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া দিয়াছেন। তাহার উপর কয়েকটী প্রস্তর-ফলকও সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন। পুরাতন-দুর্গের এই কয়েকটী কক্ষে এখন গবর্ণমেণ্টের মেল-ভ্যান থাকে ও
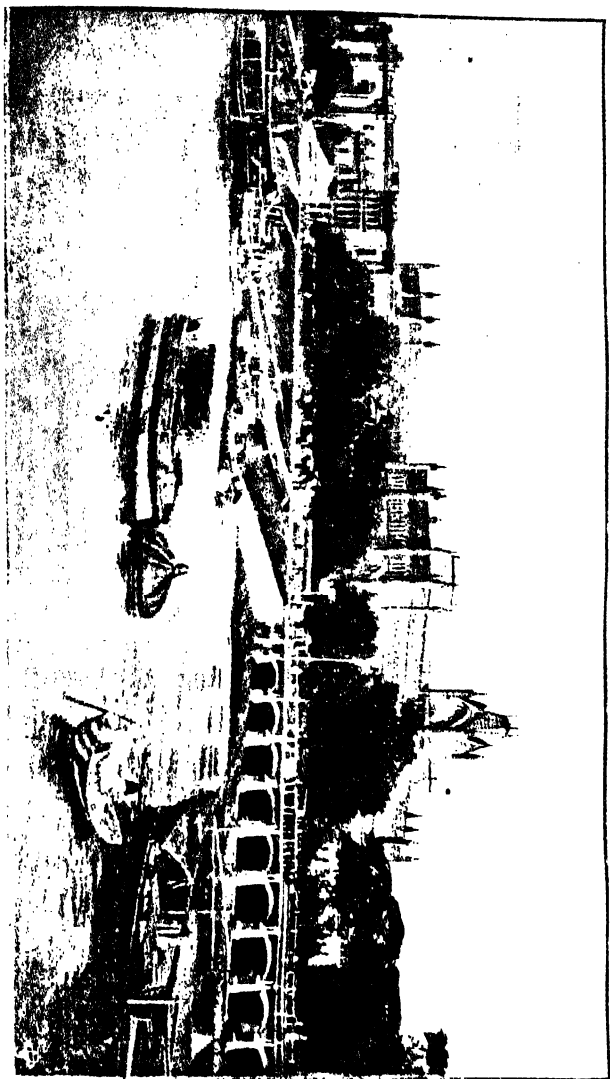
Post Office from Dalhousie Square. Calcutta.
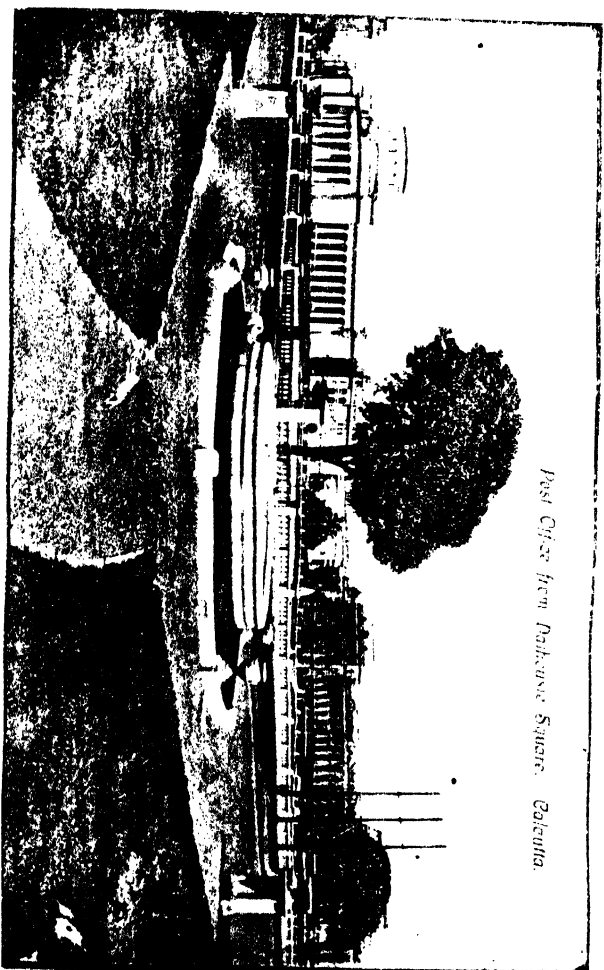
পোষ্টাফিসের বাবুদের টিফিনের বা জলখাবারের ঘর হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রাসাদতুল্য জেনারেল পোষ্টাফিস-বাটীটি, "ওয়ালটার গ্রাণ্ভিল্" নামক একজন সেকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান অনুসারে প্রস্তুত।

গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ-অফিস্।

একদিকে জেনারেল পোষ্টাফিস ও অপর দুইদিকে যথাক্রমে রাইটার্স বিল্ডিংস্ ও গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ-আফিস, এই কয়টী প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা দ্বারা, সেকালের ইতিহাস-বিশ্রুত লালদীঘির গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে। কোম্পানীর প্রথম আমলে, অর্থাৎ নবাবের কলিকাতা-আক্রমণের পূর্ব্বে, বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ-আফিসের অধিকৃতস্থানে, একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। কাপ্তেন উইলসের প্ল্যানে, এই পুষ্করিণীটী চিহ্নিত দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ সেই সময়ে এই পুষ্করিণী ভরাট করিয়া তদধিকৃত স্থানে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Calico Printer's Yard স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড ডাল-হাউসীর আমলে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপিত হওয়ার পর, গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ-ডিপার্টমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান প্রাসাদতুল্য বাটীটি ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। এই বাটীর দৃশ্য অতি সুন্দর। তিনটী ব্লকে বা অংশে ইহা গঠিত। প্রথম ব্লকে, অর্থাৎ যেটি ওল্ডকোর্ট হাউসের দিকে, এই ডিপার্টমেণ্টের নানাবিধ আফিস ছিল। মধ্যের ব্লকে, কলিকাতা সিগ্ন্যাল-আফিস। সর্ব্বশেষের ব্লকে—টেলিগ্রাফ চেক্ আফিস। বর্ত্তমানে Calcutta Central Telegraph এর জন্য, ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, ওয়েলেসলী প্লেসের পার্শ্বে এক প্রাসাদতুল্য নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। এখন পুরাতন বাটীতে, চেক্-আফিস ও ডাক-বিভাগের কয়েকটী আফিস আছে। নূতন টেলিগ্রাফ-বিল্ডিংসের নিম্নতলে, বুকিং আফিস বা তারে খবর পাঠাইবার স্থান। এইস্থানে মেজর জেনারেল ড্যানিয়েল জর্জ্জ রবিন্সন R. E. মহোদয়ের এক প্রস্তর-মূর্ত্তি (Bust) প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি টেলিগ্রাফ-ডিপার্টমেণ্টের প্রথম ডাইরেক্টার জেনারেল। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ইনি এই বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। বুকিং-আফিসের প্রবেশপথের দক্ষিণ দিকে একখানি প্রস্তর-ফলক আছে। এই ট্যাবলেট বা প্রস্তর-ফলক টেলিগ্রাফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডব্লু, বি, মেলভিল সাহেবের স্মৃতি-রক্ষার জন্য স্থাপিত হয়। মণিপুর-যুদ্ধের

সময়, এই মেলভিল সাহেব আসাম-ডিভিসনের টেলিগ্রাফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। মণিপুরের বিদ্রোহী সৈন্যগণ, আসামের চিফ-কমিশনর মিঃ কুইনটন, টেলিগ্রাফ্-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মেলভিল ও সিগনালার ও'ব্রায়েনকে নিহত করে। এখন এই প্রস্তরমূর্ত্তি ও ট্যাবলেট নূতন বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

পেপার-করেন্সি আফিস।

ডালহৌসী-স্কোয়ারের পূর্ব্বদিকে এই পেপার-করেন্সি আফিস। এই বাড়িটী ইটালিয়ান প্যাটার্ণে নির্ম্মিত। ইহাই গবর্ণমেণ্টের Office of Issue and Exchange of Government Paper Currency। এখানে টাকা, নোট, গিনি হইতে সিকি, দুয়ানি, আধুলি, পাই প্রভৃতির বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন হয়। পেপার-করেন্সির নিম্নতলে রিসিভিং ও ইস্যুইং আফিস। এই স্থানটীর দৃশ্য অতি মনোরম। হলটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হয়, যেন প্রকৃতই ইহা কমলার আবাস-ভবন। লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী টাকার নোট, সুদৃঢ় লোহার আলমারীতে এখানে সুরক্ষিত। এস্থান দিবারাত্র টাকার মধুর-নিক্কণে প্রতিধ্বনিত। বাড়িটী ত্রিতল। ইহার মধ্যে দ্বিতলাংশে ও ত্রিতলে, সরকারী আফিস ও পেপার-করেন্সির এসিষ্টাণ্ট কমিশনার সাহেবের বাস ভবন। নিত্য কার্য্যের প্রয়োজনীয়, বহু লক্ষ টাকা এই সব আলমারীতে থাকে। বাকী টাকা, কলিকাতা ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত। ইহাই গবর্ণমেণ্টের Reserve Treasury। এই বাড়িটী, সিপাহী পাহারার দ্বারা সুরক্ষিত। প্রথমে আগরা ও মাষ্টারম্যান ব্যাঙ্ক কোম্পানী (The Agra and Masterman's Bank Co.) এই বাটিটী তাঁহাদের নিজের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করান। কিন্তু উক্ত কোম্পানী ফেল হওয়ায়—গবর্ণমেণ্ট পেপার-করেন্সি আফিসের জন্য এই বাটিটী কিনিয়া লয়েন।

হিজ্ ম্যাজেষ্টিস্ মিণ্ট।

মিণ্ট বা টাঁকশাল ষ্ট্রাণ্ড-রোডের উপর। এই স্থানে ভারত-সম্রাটের ভারত-সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচলিত, টাকা তৈয়ারি হয়। বহু বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া টাঁকশাল-সংলগ্ন বাটীগুলি নির্ম্মিত। ইহার সীমানার মধ্যে কয়েকটি পুষ্করিণী আছে। ভিতরে টাকা তৈয়ারি করিবার জন্য যে সমস্ত এঞ্জিন আছে, তাহাতে জল সরবরাহ করিবার জন্য, এই সুবৃহৎ

পুষ্করিণীগুলি খনিত হইয়াছে। ধরিতে গেলে, টাঁকশালের দুইটি প্রধান বিভাগ আছে। একটীতে Copper বা তাম্র-মুদ্রা প্রস্তুত হয়, অপরটি Silver বা টাকা, সিকি আধুলি, দুয়ানি প্রস্তুতের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ষ্ট্রাণ্ড রোডের দুই পার্শ্বেই মিণ্টের কার্য্যালয়। দক্ষিণপার্শ্বে রাজপ্রাসাদের ন্যায় সুন্দর বাটী। বামপার্শ্বে ইঞ্জিনিয়ারের আবাস স্থান, রক্ষকদিগের কোয়ার্টার ও পুলিশ-সাহেবের বাসস্থান। মেজর ডব্লু, এন, ফর্ব্বস, আর, ই, এই টাঁকশাল বাটিটী নির্ম্মাণ করেন। এই সুন্দর বাটিটীর সম্মুখে অসংখ্য স্তম্ভশ্রেণী। বাহিরের দৃশ্য, এথেন্স নগরীর মিনার্ভা-দেবীর (Temple of Minerva) মন্দির-দৃশ্যের অনুকরণে নির্ম্মিত। জনরব—এই বাটীর ভিত্তি অতি গভীর। উপরে যতটা দেখা যায়, নীচেও নাকি ততটা ভিত্তি আছে। মিণ্ট সীমানার সুবৃহৎ পুষ্করিণীর পার্শ্বে, সিভিল ও মিলিটারী গার্ডগণের আবাসস্থান। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে কপার-মিণ্ট খোলা হয়। এই বাটির সীমানার মধ্যে Mint-Master, Accountant's Office, Record Room, Assay Office ও Laboratary আছে। এতদ্ভিন্ন ইহার মধ্যে কয়েকটী কারখানাও আছে। মিণ্ট-মাষ্টারের নিকট অনুমতি-পত্র লইতে পারিলে, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায়। বেলা ১১টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত রূপা গলান হয়; এই সময়েই টাঁকশাল দেখা উচিত।

এই টাঁকশালের একটী অতীত ইতিবৃত্ত আছে। পাঠকের তাহা শুনিয়া রাখা উচিত। পুরাকালে কৌন্সিলের এক মন্তব্যে প্রকাশ—

"১৭০৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, কোম্পানীর কলিকাতা কৌন্সিলের এক মন্তব্য হইতে দেখা যায়," বাঙ্গালার নবাব জাফর খাঁ (মুরশীদ কুলী খাঁ) কোম্পানীর মান্দ্রাজী-টাকা মোগলের খাজনা হিসাবে লইতে আপত্তি করিতেছেন। মান্দ্রাজী-টাকার জন্য, কোম্পানীকে অনেক বাঁটা দিতে হয়, এজন্য তাঁহাদের আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকে। আমরা নবাবের নিকট হইতে মুরশিদাবাদের টাঁকশালে টাকা প্রস্তুত করাইবার সম্মতি পাইয়াছি। যদিও বাদশাহ তাঁহার ফারমানে (১৭১৭ খৃঃ অব্দে) বিনাব্যয়ে নবাবী টাঁকশাল হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করাইবার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু এই নবাব জাফর-খাঁর প্রতিযোগিতায় তাহা হয় নাই। আমাদের কাশিমবাজারের কর্ম্মচারীরা এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছেন।" ইহার পর নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত

ক্লাইভের সন্ধিপত্রের পঞ্চমধারা অনুসারে, কোম্পানী মুরশিদাবাদ টাঁকশালেই টাকা প্রস্তুত করাইবার সম্মতি পান। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে মীরজাফরের আমলে, ইংরাজেরা কলিকাতায় নিজের টাঁকশালে টাকা প্রস্তুত করিবার সম্মতি পান। এই সময়ে জগৎশেঠগণ ভয়ানক প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন।”

“১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার টাঁকশালে, কোম্পানী বাহাদুর প্রথম টাকা তৈয়ারী করেন। এই টাকার একদিকে বাদশাহের মুখ ও অন্যদিকে পারসী লেখা ছিল। ১৭৭০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কলিকাতার এই টাঁকশালে পয়সা তৈয়ারি হয় নাই। তখন এদেশে কড়ির খুব প্রচলন ছিল। পয়সার কাজ কড়িতেই চলিত। জন প্রিন্সেপ বলিয়া একজন ইঞ্জিনিয়ার, কণ্ট্রাক্ট লইয়া কোম্পানী-বাহাদুরের জন্য টাকা প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ফলতায় ইহাঁর কারখানা ছিল। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে প্রিন্সেপ সাহেব,তাঁহার যন্ত্রাদি গবর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করিয়া যান।

১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট নিজে টাঁকশালের কাজ চালাইতে আরম্ভ করেন। এই পুরাতন টাঁকশাল, বর্ত্তমান ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেশনারি আফিসের অধিকৃত স্থানে ছিল। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান টাঁকশালের প্রাসাদতুল্য বাটীর ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হয়। এই বাটিটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে ছয় বৎসর লাগে। টাঁকশালের উপযুক্ত যন্ত্রাদি ও বাটী নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইংলণ্ডাধিপের মুখ-সমন্বিত মুদ্রা প্রথম প্রচলিত হয়।

বেঙ্গল-ক্লব।

বেঙ্গল ক্লব—চৌরঙ্গীর শোভা-সম্পদ-স্বরূপ। এটি উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান ইংরাজদের “Club House” বা আবাসস্থান। তিন চারিটি সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা লইয়া এই ক্লব স্থাপিত। বেঙ্গল-ক্লবের পূর্ব্বকার বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া, এক্ষণে তথায় একটী চতুস্তল প্রাসাদতুল্য বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এস্থানে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান রাজকর্ম্মচারী বাস করেন। সভ্য সংখ্যা, সাত শতের উপর। তিন প্রকার সভ্য আছেন। প্রথম, যাঁহারা এই বাটীতেই বাস করেন। দ্বিতীয়, যাঁহারা উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে থাকেন, এবং কলিকাতায় আসিলে, এখানে থাকিতে পান। তৃতীয়, যাঁহারা

কলিকাতাতেই থাকেন, অথচ এখানে বাস করেন না। এই ক্লাবের একজন প্রেসিডেণ্ট, একজন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা আছে। তাঁহারাই ভোট দ্বারা সদস্য বা মেম্বর নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। বড়-লাট, প্রধান-সেনাপতি, কৌন্সিলের-মেম্বর প্রভৃতি উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ, এই ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাবের মধ্যে একটী সুবৃহৎ পাঠাগার স্থাপিত আছে। তথায় ইউরোপের সর্ব্বদেশের সকল ভাষার পত্রিকাগুলি সংগৃহীত হয়। আজকালি যেখানে ক্লবের প্রাসাদতুল্য বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, পূর্ব্বে তথায় আর একটী দ্বিতল বাটী ছিল। এই বাটীতে স্বনাম-খ্যাত লর্ড মেকলে, বহুদিন ধরিয়া বাস করিয়া গিয়াছেন। স্বনাম-খ্যাত প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও সেকালের জঙ্গীলাট, লর্ড কম্বরমিয়ারও বহুদিন এই বাটীতে বাস করিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গল-ক্লাব সর্ব্বপ্রথমে ওল্ড-কোর্ট-হাউসে, বর্ত্তমান নিউম্যান কোম্পানীর অধিকৃত বাটীতে ছিল। তৎপরে ইহা ইলিসিয়াম রোডে, উঠিয়া যায়। বর্ত্তমানে ইহা চৌরঙ্গী রোডের উপর প্রতিষ্ঠিত ও নূতনভাবে নির্ম্মিত।

ইউনাইটেড-সার্ভিস-ক্লাব।

এই ক্লব গৃহটী পার্ক-ষ্ট্রীটের মোড়ের উপর। বেঙ্গল-ক্লবে যেমন সিভিল-সার্ব্বিসভূক্ত রাজকর্ম্মচারিরা বাস করেন, এই ইউনাইটেড-সার্ভিস-ক্লবে, সেইরূপ মিলিটারি বা সেনাবিভাগভূক্ত বড় বড় রাজকর্ম্মচারিরা থাকেন। "বেঙ্গল-মিলিটারি-ক্লব" এই নামে, ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথম সংস্থাপিত হয়। সেনাবিভাগভূক্ত উচ্চ কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত, সিবিল-বিভাগের জজ, মিলিটারি ও নৌসেনা বিভাগের পাদরীগণ, ইহার সদস্য হইতে পারেন। এখানেও বেঙ্গল-ক্লবের ন্যায় "ব্যালট" বা ভোট দ্বারা, মেম্বর নির্ব্বাচিত হয়। তবে বড়-লাট, প্রধান-সেনাপতি, চিফ্-জষ্টিস ও কৌন্সিলের-সদস্য প্রভৃতির নির্ব্বাচন বিনা ভোটেই হইয়া থাকে। এই ক্লবের সদস্য হইতে হইলে, দেড় শত টাকা প্রাবেশিক ফিঃ দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন লাইব্রেরী ব্যবহার করা ও বিলিয়ার্ড খেলার জন্য, স্বতন্ত্র মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা আছে। ইহার সদস্য সংখ্যা ছয় শতের উপর। যাঁহারা স্থায়ীভাবে এই ক্লব-গৃহে বাস করেন, তাঁহাদের জন্য সুবিধাকর স্থান নির্দ্দিষ্ট করা আছে।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম।

বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট, এই মিউজিয়ামের নাম সুপরিচিত। নিরক্ষর মূর্খ হইতে, শিক্ষিত সুপণ্ডিত পর্য্যন্ত, সকলেই ইহা বহুবার দেখিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে "যাদুঘর" বলেন। সাধারণের ইহাতে প্রবেশ সম্বন্ধে কোন বাধাই নাই, তবে এজন্য কয়েকটী বিশেষ দিন নির্ব্বাচিত আছে। ইহা এক কথায়, একটী উচ্চশ্রেণীর আনন্দপ্রদ শিক্ষাগার। সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকের, প্রত্নতত্ত্বানুশীলনকারীর আনন্দময় পরীক্ষা-ক্ষেত্র। অশোকের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বহু অতীত যুগের, হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের, স্থপতি-বিদ্যার, শিলালিপির, অনুশাসন ও প্রাচীন মুদ্রাদির পূর্ণ সমাবেশ, এই বাড়ীতে সংগৃহীত। খনিবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনার জন্য নানাবিধ উপাদান এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের পরিচয়ের জন্য, এক একখানি মুদ্রিত পুস্তক আছে। মূল্য দিয়া সেই Guide Book কিনিতে হয়। ইহা ত গেল পণ্ডিতদিগের পক্ষের ব্যবস্থা। সাধারণ লোকে, এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভালুক, গণ্ডার ও পক্ষী ব্যাঘ্র প্রভৃতির দেহাবশেষ ও অস্থি কঙ্কালাদি দেখিতে যায়। ভারতের সকল প্রদেশের শিল্পকলার নিদর্শন, ইহাতে সংগৃহীত।

বর্ত্তমান বাড়ীটী ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে সাধারণের জন্য খোলা হয়। এই বাটীর প্ল্যান, গবর্ণমেণ্টের সেকালের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ওয়াল্টার গ্রাণভিল সাহেব প্রস্তুত করেন। চৌরঙ্গীর দিকে ইহার পুরোভাগের পরিসর তিন শত ফিট। সদর ষ্ট্রীটের দিকে—২৭০ ফিট। বাড়ীটি আগে ত্রিতল ছিল—এক্ষণে চতুস্তল হইয়াছে। এরূপ সুবৃহৎ উঠানওয়ালা বাটী কলিকাতার সাহেব-পল্লীতে খুব কম আছে। ধরিতে গেলে, এই সুবৃহৎ মিউজিয়াম, এসিয়াটিক-সোসাইটির দ্বারাই প্রথম স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটী সাধারণ মিউজিয়াম স্থাপিত হইবে, এ সম্বন্ধে একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের বলে, ইহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হয়। এখানে যে সমস্ত কর্ম্মচারী কার্য্যে নিযুক্ত—তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেই বেতনাদি প্রাপ্ত হন।

কলিকাতার মিউজিয়াম একটী দর্শনীয় জিনিস। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অতীত যুগের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রশস্ত ক্ষেত্র। পূর্ব্বকার

সরকারী আইন অনুসারে, এই বাটীর মধ্যেই এসিয়াটিক-সোসাইটি গৃহ থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থাই হয়। কিন্তু মিউজিয়ামের জন্য সংগৃহীত অসংখ্য দ্রব্যাদির স্থান সংকুলান না হওয়াতে, গবর্ণমেণ্ট পুনরায় এক নূতন আইন প্রণয়ন দ্বারা, সোসাইটি অন্য বাটিতে স্থানান্তরিত করেন।

একুশ জন ট্রষ্টি দ্বারা, এই মিউজিয়ামের কার্য্যপ্রণালী নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পাঁচজন, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পাঁচজন ও এসিয়াটিক-সোসাইটির পক্ষ হইতে পাঁচজন ট্রষ্টি নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিগণ, ডাইরেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রকসান, ইহার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত এক-জন হিন্দু ও একজন মুসলমান সদস্য গ্রহণেরও ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুল।

মিউজিয়ামের পার্শ্বের বাড়ীতেই গবর্ণমেণ্টের আর্ট-স্কুল ও আর্ট-গ্যালারি প্রতিষ্ঠিত। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে, চিত্রবিদ্যার উন্নতি সাধনের জন্য "স্কুল-অব-ইণ্ডষ্ট্রীয়াল-আর্ট" নামক একটি শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ড্রয়িং, কাষ্ঠ, পিত্তল ও তামার উপর এচিং ও এনগ্রেভিং প্রভৃতি শিখাইবার জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। অবশ্য বিদ্যা-লয়টি সর্ব্বপ্রথমে, ফিরিঙ্গি ও এদেশীয় ছাত্রদের জন্যই খোলা হয়। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বিলাত হইতে, লক্ নামক একজন চিত্রবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত, এই শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের জন্য অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার পর হইতেই এই আর্টস্কুলের ক্রমোন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ে ড্রয়িং, অয়েল ও ওয়াটার-কলার পেইণ্টিং, এচিং, ইঞ্জিনিয়ারিং-ড্রয়িং, মডেলিং, উডএনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই আর্টস্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া অনেক বাঙ্গালীসন্তান, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। লক্ সাহেবের পর, মিঃ জবিন্স ও তৎপরে মিঃ হ্যাভেল এই বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ঠাকুর-গোষ্ঠীর স্বনামপ্রসিদ্ধ কলাশিল্পী, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ের একজন উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপক। এই স্কুলগৃহ-সংলগ্ন, গবর্ণ-মেণ্টের একটি আর্টগ্যালারি বা চিত্র-শিল্প-প্রদর্শনী স্থাপিত আছে। এই শিল্প-প্রদর্শনীতে, অতীত যুগের ভারতীয়শিল্প এমন কি পুরাতনকালের

মোগলবাদশাহগণের আমলের শিল্পবিদ্যার অনেক দুষ্প্রাপ্য চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে, এই প্রদর্শনী দেখিয়া নেত্রের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন।

মিউনিসিপ্যাল-অফিস।

কলিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটীর মত অর্থবান ও প্রসিদ্ধ মিউনিসিপ্যালিটী খুব কমই এদেশে আছে। বর্ত্তমান প্রাসাদতুল্য কলিকাতা মহানগরীর যাহা কিছু উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে,—তাহা এই মিউনিসিপ্যালিটীর সুব্যবস্থার জন্য। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ বাটীটি, কয়েকটী প্রধান প্রধান ব্লক বা বিভাগে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটীর সর্ব্ববিভাগীয় আফিস-সমূহ স্থাপিত। এই প্রাসাদের উপর, একটী "টাওয়ার" বা গম্বুজ আছে। বাটীর উচ্চতা ১০৫ ফিট। বিভাগীয় কার্য্যালয় ব্যতীত, এই সুবৃহৎ বাটীর মধ্যে, সেক্রেটারির আবাসস্থান, কাউন্সিল-চেম্বার, কমিটিরুম, প্রভৃতির স্থান সমাবেশও আছে। কাউন্সিল-চেম্বারটী দেখিতে অতি সুন্দর ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর গৌরবেরই উপযুক্ত। মিউনিসিপ্যাল-আফিসের সম্মুখে, হগ-সাহেবের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ বাজার। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ও পুলিশ-কমিশনার স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ-সাহেবের নামে এই সুপ্রশস্ত বাজারটী স্থাপিত হয়। বোম্বের ক্রফোর্ড-মার্কেট বিখ্যাত হইলেও, কোন অংশেই ইহার সমতুল্য নহে। বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সিভিলিয়ানগণ, মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান বা সভাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পুরাকালের এই সকল চেয়ারম্যানগণের মধ্যে, স্যর হেন্‌রি হ্যারিসনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্যর হেন্‌রি একাধিক্রমে ১৮৮১ হইতে ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, এই মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমানে সুপ্রশস্ত হ্যারিসন রোড, তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার আমলে, কলিকাতার অধিবাসিগণের জন্য, প্রচুর পরিমাণ কলের জল জোগাইবার ব্যবস্থা করা হয়। আগে ভবানীপুর, কালীঘাট, খিদিরপুর, টালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটী ছিল। ইহা সাউথ-সুবর্ব্বান মিউনিসিপ্যালিটী বলিয়া উল্লিখিত হইত। স্যর হেন্‌রি এই মিউনিসিপ্যালিটীকে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত মিলিত করিয়া দেন। অতীতকালের মিউনিসিপ্যালিটীর কথা বলিতে গেলে, স্যর

হেনরি হ্যারিসান, আর, টি, গ্রিয়ার, স্যর চার্লস এলেন, অনারেবল বাবু কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই কৃষ্ণদাস বাবুর পুত্র, অনারেবল রাধাচরণ পাল এখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর একজন গণনীয় সদস্য। কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী, বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বহুদিন ধরিয়া এই মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যানের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি পেন্সন লইয়া অবসর সুখসম্ভোগ করিতেছেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর প্রধানকীর্ত্তি—এই সৌন্দর্য্যশালিনী বৈজয়ন্তীতুল্য অট্টালিকা পূর্ণ উজ্জ্বল আলোকমালা মণ্ডিত, এই কলিকাতা মহানগরী।

স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ মার্কেট বা মিউনিসিপ্যাল-বাজার।

কলিকাতাবাসী ইংরাজ-সম্প্রদায়ের ও দেশীয়দের ব্যবহারের জন্য, সর্ব্ববিধ দ্রব্যজাতপূর্ণ একটী আদর্শ বাজারের বড়ই অভাব ছিল। এজন্য একটী ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে একটি কমিটি সংগঠিত হয়। এই কমিটি পুরাতন "ফেন্‌উইক্" বাজারটি ক্রয় করিয়া তাহার অধিকৃত স্থানে, একটি নূতন বাজার নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে, এই নব সংকল্পিত বাজারের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। জমীর মূল্য ও এই বাজারের গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য, ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, এই বাজারের নানাবিধ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আয় এবং উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। নূতন জমী ক্রয় করিয়া আরও কয়েকটি সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ বিপণী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাজারে একটি ক্লক-টাওয়ার বা ঘণ্টাঘর আছে। ধরিতে গেলে, এই বাজারটি কলিকাতা সহরের আদর্শ বাজার। সভ্য সমাজের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যাদি এখানে পাওয়া যায়। ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীটের মোড়ে, ধর্ম্মতলায় বাজার বলিয়া আর একটি বাজার ছিল। ইহার অধিকারী ছিলেন—বাবু হীরালাল শীল। প্রথম প্রথম এই বাজারের জন্য, মিউনিসিপ্যাল-মার্কেটের উন্নতির পথে বড়ই বাধা পড়ে। এজন্য জষ্টিস-অব-দি-পিসগণ—সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে, ধর্ম্মতলার এই পুরাতন বাজারটি ক্রয় করিয়া লয়েন। বর্ত্তমানে এই মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের অবস্থা অতি উন্নত। সন্ধ্যার পর ইহার আলোকোজ্জ্বল মূর্ত্তি বড়ই নয়ন তৃপ্তিকর। খাস বাজার ছাড়া, ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে, প্রভাতে ও সন্ধ্যার সময়, শাক-শবজীর বাজার বলিয়া

থাকে। সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেই এই বাজার হইতে জিনিস পত্রাদি ক্রয় করেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রুড্ইয়ার্ড কিপ্লিং তাঁহার The City of the dreadful Nights নামক পুস্তকে, ইহার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন।

সেনেট হাউস ও ইউনিভার্সিটী।

শিক্ষিত-সমাজকে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেখান নিষ্প্রয়োজন। কলেজ-ষ্ট্রীটে গোলদীঘির সম্মুখে, এই প্রাসাদতুল্য "সেনেট-হাউস" পবিত্র দেব-মন্দিরের ন্যায় বর্ত্তমান। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে এই বাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। ইহার বাহিরে সুন্দর কারুকার্য্যময় সুবৃহৎ স্তম্ভরাজি, তন্নিম্নে প্রশস্ত অধিরোহণী শ্রেণী। এই সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিলেই, প্রবেশ পথের দালানের উপর স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটী প্রস্তর মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ইউনিভার্সিটির হস্তে অনেক টাকা দিয়া যান, এবং তাহা হইতে Tagore Law Professorship বৃত্তি দেওয়া হয়। ভিতরের হলটির দৈর্ঘ্য ২০০ ফিট, বিস্তার ৬০ ফিট। এই হলের দুই পার্শ্বে দুইটি দালান। এ দালান ২০ ফিট প্রশস্ত। ইহার মধ্যে বহুবিধ পুস্তকপূর্ণ একটি ইউনিভার্সিটি-লাইব্রেরী ছিল। বর্ত্তমানে, সেনেট-হাউসের সীমা সরহদ্দের প্রচুর বিস্তৃতি ঘটায়, এবং ইউনিভার্সিটি ল-কলেজ এবং হার্ডিং-হোষ্টেল ও একটী লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মিত হওয়ায়, এই সেনেট-হাউসের সীমানা ও পরিসর বহুদূর ব্যাপী। মহারাজ দারবঙ্গেশ্বর, ইউনিভার্সিটী লাইব্রেরীর জন্য প্রচুর মুদ্রা দান করিয়াছেন। এই সেনেট হলের মধ্যে, অনেকগুলি অর্দ্ধকায় প্রস্তরমূর্ত্তি বা Bust আছে। প্রথম মূর্ত্তিটী উড্রো সাহেবের। মিঃ হেনরি উড্রো প্রথমে লা-মার্টিনিয়ার কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ভবিষ্যতে, ইনি স্কুল-ইনস্পেক্টার ও তৎপরে ডাইরেক্টার-অব-পাবলিক-ইনষ্ট্রক্সান পদে নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় মূর্ত্তি—জেমস সট্‌ক্লিফ (এম, এ,) সাহেবের। সট্‌ক্লিফ সাহেব, ২১ বৎসরকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। ইনি ১২ বৎসর কাল ধরিয়া ইউনিভার্সিটীর রেজিষ্ট্রারের কাজ করেন। তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসরকাল, তিনি শিক্ষাবিভাগের বড়-কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। তৃতীয় মূর্ত্তিটী—স্যর সিসিল বিডন কে, সি, এস, আই, মহোদয়ের। ইনি

বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন (১৮৬২-১৮৬৭ খৃঃ)। (৪) চার্লস এচ, টনি, এম, এ। ইনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত। প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষরূপে এরূপ মহাপণ্ডিত, খুব কম এদেশে আসিয়াছেন। সুবৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ "কথাসরিৎসাগর" ও ভবভূতির "উত্তররামচরিত" ইনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপ্যাল পদত্যাগ করিবার পর, টনি সাহেব ইউনিভারসিটীর রেজিষ্ট্রার ও তৎপরে ডাইরেক্টার অব-পবলিক-ইনষ্ট্রক্সান পদে নিযুক্ত হন। ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া, ইনি বিলাতে ইণ্ডিয়া-আপিসের লাইব্রেরিয়ানের পদে কয়েক বৎসরকাল কাজ করিয়াছিলেন। (৫) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি, আই, ই, ডি, এল। (জন্ম ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দ মৃত্যু ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দ।) ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। নূতনবিধ প্রত্নতত্ত্বাবিষ্কারের পথ, ইনিই ভবিষ্যৎ বঙ্গীয় ঐতিহাসিকের জন্য প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার মিত্রের বয়স যখন ২২ বৎসর, সেই সময়ে তিনি এসিয়াটিক-সোসাইটীর সহকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। দশ বৎসরকাল, তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে থাকায়, তাঁহার অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করে। এই দশ বৎসরের মধ্যে, তিনি সংস্কৃত পালি প্রভৃতি ভাষায় বিশেষরূপে দক্ষতা লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি, পারসী, হিন্দী, উড়িয়া, গ্রীক্, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট, স্যর রিচার্ড টেম্পল তাঁহার পাণ্ডিত্যে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—The most effectively learned Hindu of his day both as regard English and Oriental Classics. উড়িষ্যায় প্রাচীন-তথ্য বুদ্ধ-গয়া সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন ঘটনার আবিষ্কার করেন। তাঁহার Edicts of Asoka নামক পুস্তকে ভারত-সম্রাট অশোকের শিলালিপি সমূহের সম্পূর্ণ ইংরাজী ভাষান্তর সাধারণে প্রচার হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক-সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, টেক্সট-বুক কমিটির সভাপতি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান বা জমীদার-সভার অধ্যক্ষপদেও বরিত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত চিত্রগুলি ব্যতীত ইউনিভারসিটী হলে (ক) রায় মাধবচন্দ্র রায় বাহাদুর বি, এ, বি, সি, ই, এম, আই, সি, ই, (জন্ম ১৮৪১—মৃত্যু ১৯০২ খৃঃ)। (খ) ডাক্তার ত্রৈলক্যনাথ মিত্র

এম, এ, ডি, এল। (গ) ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতির চিত্রিত মূর্ত্তি স্থাপিত। ভিক্টোরিয়ার এই প্রতিকৃতিটী, মহারাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ইউনিভারসিটীকে উপহাররূপে দান করেন। এতদ্ভিন্ন রেভারেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রতিকৃতিও এই সেনেট-হাউসের মধ্যে আছে। স্বয়ং বড়লাট বাহাদুরগণ, ইহার "চ্যান্সেলারের" কার্য্য করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগে, মহাপণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ, অনারেবল মিষ্টার জষ্টিস্, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ডি, এল, স্বরস্বতী মহোদয়, ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া, অতীব দক্ষতার সহিত সর্ব্ববিধায়ে এই কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের ল-কালেজ, ইউনিভার্সিটী-লাইব্রেরী প্রভৃতি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও উদ্যমের নিকট যথেষ্ট ঋণী। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ভবানীপুরের স্বনামখ্যাত ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র ও বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ। তাঁহার ন্যায় এরূপ সর্ব্ববিষয়িণী প্রতিভাবান বাঙ্গালী, বঙ্গদেশে খুব কম জন্মিয়াছেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বর্ত্তমানে ভাইস-চ্যান্সেলারের উচ্চপদ হইতে অবসর লওয়ার পর, সুপণ্ডিত মহাপ্রাজ্ঞ, অনারেবল ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, বি, এল মহোদয় এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর মত যোগ্য ব্যক্তিকে, এই পদে নিয়োগ করায়, বঙ্গবাসী মাত্রেই গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ।

বেথুন-কলেজ।

অনারেবল জে, ই, ডি বেথুন মহোদয়ের চেষ্টায়, স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহ দানের জন্য, এই বেথুন-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ম্মময় জীবনের প্রথম অবস্থায়, বেথুন সাহেব বিলাতের হোম-আফিসের একজন কৌন্সলী ছিলেন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টের Law Member বা আইন-বিভাগের সদস্যরূপে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। বাঙ্গলার তৎকালীন ডেপুটী-গবর্ণর, অনারেবল স্যর জন লিট্‌লার সাহেব, এই বেথুন-কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত করেন। (১৮৫০ খ্রীঃ)। বেথুন কলেজে, বঙ্গদেশীয় বালিকারাই শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। এই কলেজ হইতে অনেক মহিলা, বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলেজের সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতে-

ছেন। এখন এই কলেজের সহিত একটী বোর্ডিং-হাউস সংশ্লিষ্ট। কলিকাতার মধ্যে স্ত্রীজাতির শিক্ষাবিধান জন্য, আরও দুই একটী বিদ্যালয় হিন্দু ও ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোনটীই এই বেথুন-কলেজের সমকক্ষ নহে। বেথুন-কলেজের প্রাইজ বিতরণ কার্য্য, প্রতি বৎসর মহা-সমারোহে নিষ্পন্ন হয় এবং এতদুপলক্ষে বড়লাট-পত্নী, প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলাগণ পারিতোষিক বিতরণ করিয়া থাকেন।

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতাল।

লোয়ার-সার্কিউলার-রোডের উপর, এই হাঁসপাতাল বাটীটি প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে সদর-দেওয়ানী-আদালত যে বাটীতে ছিল, তাহাতেই জেনারেল হাঁসপাতাল অস্থায়ী ভাবে কয়েক বৎসরের জন্য স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানকালে ইহা অসংখ্য কক্ষপূর্ণ এক চতুস্তল নবনির্ম্মিত বাটীতে, স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই হাঁসপাতাল সাহেবদের ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত। ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে, গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান হাঁসপাতালের নিকট জেনারেল হাঁসপাতাল স্থাপনের জন্য অনেকটা জমী ক্রয় করেন। ইহার পূর্ব্বে ইংরাজদের প্রথম হাঁসপাতাল, বর্ত্তমান সেণ্টজন গির্জ্জার নিকট ছিল। সেই সময় হইতে ইহার ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া, ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। সকল শ্রেণীর ইউরোপীয়গণই এই হাঁসপাতালে থাকিতে পারেন। একটী ডবল-রুমের বা দুইটী কক্ষের জন্য দৈনিক পাঁচ টাকা ভাড়া দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন একটী ঘরের জন্য তিন ও দুই টাকা পর্য্যন্ত দৈনিক ভাড়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ভাড়াতেই, ডাক্তারের খরচ, ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যয়নির্ব্বাহ হয়। এই হাঁসপাতালে ১২৫টী শয্যা, রোগীদের বিনাব্যয়ে দেওয়া হয়। সংক্রামক-রোগের চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র ওয়ার্ড আছে।

মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল।

কলেজষ্ট্রীটে এই সুবৃহৎ হাঁসপাতাল অবস্থিত। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, তদানীন্তন গবর্ণর-জনেরেল লর্ড ডালহৌসী এই হাঁসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পুরাকালের ফিভার-হাঁসপাতালের ফণ্ডের উদ্বৃত্ত টাকা, লটারি-কমিটীর সংগৃহীত অর্থ, পাইকপাড়ার স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের প্রদত্ত অর্দ্ধলক্ষ টাকা হইতে, এই

হাঁসপাতালের প্রথম কার্য্য সুচনা হয়। এই সহরের সুপ্রসিদ্ধ বরণ কোং হাঁসপাতাল বাটীটির একটী নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া দেন। বাড়িটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে, চারি বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বর, ইহা সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়। পুরাতনবাটীর সঙ্গে বর্ত্তমানে আরও কয়েকটী নূতন বাটী ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই হাঁসপাতালে তিন চারিশত রোগীর স্থান সমাবেশ হইতে পারে। মেডিকেল-কালেজ হাঁসপাতাল বাটীসংলগ্ন, ইডেন-হাঁসপাতালটী কেবল মাত্র স্ত্রীলোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, স্যর এস্‌লি ইডেনের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, এই হাঁস-পাতালের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কলিকাতার লাহা-বংশের বিখ্যাত ধনী বাবু শ্যামাচরণ লাহা, রায় অমৃতনাথ মিত্র বাহাদুর প্রভৃতি পরদুঃখকাতর হিন্দু মহাত্মাগণের বদান্যতায় একটী চক্ষুরোগের হাঁসপাতালও মূল হাঁসপাতালের সীমানিবদ্ধ হইয়াছে। হীরালাল শীলের বংশধর, চুনীলাল শীল মহাশয় Out Door Patient দিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র হাঁসপাতাল করিয়া দেন। এই হাঁসপাতাল সংশ্লিষ্ট, এজরা হাঁসপাতাল, স্বনামখ্যাত ইহুদী-সওদাগর বিবি এজরার ব্যয়ে নির্ম্মিত। মেডিকেল-কালেজ হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ-কার্য্যে, অনেক বাঙ্গালীধনী মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম হাঁসপাতালের মধ্যে একটী প্রস্তরফলকে লিখিত আছে। এই হাঁসপাতাল সমূহের একমাত্র অধ্যক্ষ বা সর্ব্বময় কর্ত্তা, মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব।

মেও হাঁসপাতাল।

ষ্ট্রাণ্ড-রোডের উপর, মেও-নেটিভ-হাঁসপাতাল প্রতিস্থাপিত। এই হাঁস-পাতালটী, এদেশীয় লোকের ব্যবহারের জন্য, প্রস্তুত হইয়াছে। প্রাচীন কলিকাতাতেও এদেশীয় লোকের চিকিৎসার জন্য একটী নেটিভ-হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল, স্যর জন শোরের (লর্ড টেন্‌মাউ) যত্নে এই প্রথম নেটিভ-হাঁসপাতালের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বর্ত্তমানে যে বাটীটি ফৌজদারি-বালাখানার মোড়ে অবস্থিত, সেই স্থানেই এই দেশীয় হাঁসপাতাল প্রথম খোলা হয়। অতীতকালে গবর্ণর শোর সাহেবের ও সেণ্টজন গির্জ্জার তৎকালীন জনৈক পাদরী রেভারেণ্ড জন ওয়েনের চেষ্টায়, এই দেশীয় হাঁসপাতালটী সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়।

অতি গরীব দুঃখী ও সহায়হীন লোকই তখন এখানে চিকিৎসিত হইত। পরে এই হাঁসপাতালটী ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীটের একটী বাটীতে উঠিয়া আসে। (১৭৯৬ খৃঃ)। তখন ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীটের উপর, মোটে তিন চারিখানি দ্বিতল-বাটী ছিল। স্যর জন শোর, গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই দেশীয় সাধারণ-চিকিৎসালয়ের সাহায্য জন্য, মাসিক পাঁচশত টাকা অর্থসাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সাধারণের নিকট সংগৃহীত চাঁদা দ্বারাও প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা উঠে। পরবর্ত্তীকালে এই দেশীয় হাঁসপাতালের খরচ পত্র বৃদ্ধি হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়া দেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে, এই মেও-হাঁসপাতাল কোন বায়ুপূর্ণ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব উঠে। তজ্জন্য গঙ্গার ধারে বর্ত্তমান বাটিটীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক, এই বাটীর ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন। বাড়ীর প্লান তৈয়ারি করেন—সুপ্রসিদ্ধ মেকিন্টস বরণ কোং। তিন লক্ষ টাকা, এই মেও-নেটিভ হাঁসপাতাল বাটী নির্ম্মাণে ব্যয় হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ হইতে ইহা সাধারণের ব্যবহারে আসে। এখানে প্রায় দেড় শতাধিক রোগীর শয্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। পরলোকগত বড়-লাট, লর্ড মেয়োর নামে ইহা প্রতিষ্ঠিত।

জুওলজিকেল গার্ডেন।

জুওলজিক্যাল গার্ডেন বা আলিপুরের-চিড়িয়াখানা, না দেখিয়াছেন—এমন বাঙ্গালী নাই বলিলেই হয়। এমন কি, বঙ্গের কুলমহিলারা পর্য্যন্ত, কালীঘাট তীর্থাদি দর্শনার্থে গমন করিলে, আলিপুরের চিড়িয়াখানা না দেখিয়া বাড়ী ফেরেন না। বর্ত্তমানে যে স্থানে এই রাজকীয় পশুশালাটী সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পুরাকালে একটী বস্তি ছিল। ইহাকে "জিরাট-বস্তী" বলিত। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণই এখানকার প্রধান অধিবাসী ছিল। বহুদিন হইতেই এই কলিকাতা সহরে, একটী সরকারী-পশুশালা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছিল। এ চেষ্টায় প্রধান উদ্যোগী ডাক্তার ফ্রেয়ার ও ডাক্তার স্কোয়েণ্ডলার (Dr. Schwendler.) ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে, এই বিষয়টী, বঙ্গের তদানীন্তন গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পলের মনোযোগ বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করে। এজন্য উক্ত বৎসরে, গবর্ণমেণ্ট এই বাগান নির্ম্মাণের জন্য জমীগ্রহণের আদেশ করেন। বস্তির লোকদিগকে ক্ষতিপুরণ করিয়া

দিয়া, সেই স্থানে এই বাগান নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি, এই বাগানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময়ে আমাদের স্বর্গগত ভারত সম্রাট, সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স-অব্-ওয়েলস্ রূপে, এদেশে আসিয়াছিলেন। এ ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করার উৎসবাদি তাঁহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহুদিনের পরিশ্রমে চেষ্টায় ও যত্নে বাগানের বর্ত্তমান অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বাবু রামব্রহ্ম সান্ন্যাল মহাশয়ের আমলে, এই বাগানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। অনেক এ দেশীয় বড় বড় রাজা, জমীদার এই বাগান নির্ম্মাণ কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও আরও অনেক বাঙ্গালী সম্ভ্রান্তগণের নাম, এই বাগানের সহিত এখনও সংশ্লিষ্ট।

বোটানিক্যাল গার্ডেন।

ইহা কলিকাতার উপকণ্ঠে শিবপুরে স্থাপিত। এতাদৃশ সুবৃহৎ রাজকীয় উদ্যান, এভারতে আর দ্বিতীয় নাই। ১৭৮৬খৃঃ অব্দে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, কর্ণেল কিডের পরামর্শানুসারে, এই বাগান স্থাপিত করেন। কর্ণেল কিড কোম্পানীর অধীনে একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এই কিডের নাম হইতেই বর্ত্তমান Kidderpur ও তদপভ্রংশ খিদিরপুর নামকরণ হইয়াছে। এই প্রশস্ত উদ্যানের পদদেশ চুম্বন করিয়া জাহ্নবী প্রবাহিতা হইতেছেন। বাগানের জমী পরিমাণ ২৭২ একার। এই বাগানের অধিকৃত ভূমির মধ্যে সেকালে মোগলের থানা ও মৃৎদুর্গ ছিল। এই থানা শব্দের অপভ্রংশ "টানা"। টানা দুর্গের অস্তিত্ব, জব চার্ণকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

এই বাগান প্রতিষ্ঠার প্রধান উপলক্ষ কর্ণেল কিড্, ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে, কোম্পানী বাহাদুরের মিলিটারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। তিনিই তদনীন্তন গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের নিকট এ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিলে—সকৌন্সিল লাট-সাহেব তাঁহার এই যুক্তি সঙ্গত প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া সুপারিস পত্র সমেত, তাহা বিলাতের কোর্ট-অব-ডাইরেক্টার সভার নিকট পাঠান। ডাইরেক্টারদের সম্মতি আসিলে, এই বাগানের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় ও কিড্ সাহেব ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ইহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করেন। এই বাগানের উন্নতির জন্য কিড্ সাহেব, জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এদেশের নানাস্থানে যত প্রকারের প্রয়োজনীয় বৃক্ষ

ও লতাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তাহার সবই সংগ্রহ করিয়া এই বাগানটীকে সৌন্দর্য্যময় করেন। তিনি যেগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহার ড্রয়িং বা নকশা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিড্ তাঁহার অন্তিম ইচ্ছাপত্রে এরূপ বাসনা করেন—যেন তাঁহার স্বহস্তে স্থাপিত এই বাগানের মধ্যেই তাঁহার সমাধি হয়। কিন্তু কোম্পানী-বাহাদুর, তাঁহার ন্যায় একজন উপযুক্ত উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ মহাপণ্ডিতের দেহ এই নির্জ্জন স্থানে সমাহিত না করিয়া, পার্ক ষ্ট্রীটের পুরাতন গোর-স্থানে তাঁহার সমাধির ব্যবস্থা করিয়া দেন। তবে এই বাগানে কিডের নামে একটী স্মরণ-চিহ্ন স্থাপিত আছে। নেপাল, ভুটান, আসাম প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তীস্থানের জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়া, তিনি তত্তৎস্থানের দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষলতাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আসাম প্রদেশ হইতেই তিনি দারুচিনি গাছের ক্ষুদ্র চারা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আনেন। এই চারাগুলি ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবকে তিনি প্রদান করেন। হেষ্টিংসের বিলাত প্রস্থানের পর, নানাপ্রকারের গাছ তাঁহার বাগান হইতে সংগৃহিত হইয়া, এই বাগানে রোপিত হয়। জনপ্রবাদ এই, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের এই বাগানে, এলাচি লবঙ্গ প্রভৃতিরও গাছ ছিল।

এই বাগানের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সুবৃহৎ বটবৃক্ষটী এখনও কর্ণেল কিডেরকীর্ত্তি কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। ইহার মধ্যস্থিত পালমিরা—বৃক্ষশ্রেণী শোভিত সুন্দর ভ্রমণ পথটী, বড়ই নেত্র তৃপ্তিকর। ইহার স্থানে স্থানে বিচিত্র লতাকুঞ্জ ও অর্কিড্-হাউস। বঙ্গদেশের ও ভারতের নানাস্থানে উৎপন্ন ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত লতাগুল্মাদি, এইস্থানে জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইহার কতক চেষ্টা সফল হইয়াছে, কতক বা হয় নাই। চায়ের প্রথম চাষ এই বাগানেই আরম্ভ হয়। এই চাষের ফল সন্তোষজনক হওয়ায়, ভারতের নানাস্থানে চাএর চাষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী এখন কাল ধর্ম্মে ঘোর চা-পায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। Cinchona Febrifuge বা কুইনাইনের চাষ প্রথমে এখানেই হয়। কুইনাইন সম্বন্ধে পরীক্ষা সফল হওয়ায়, এখন গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কুইনাইনের চাষ করিতেছিল। এই সিনকোণা বা দেশী কুইনাইন এখন এই ম্যালেরিয়া পীড়িত বঙ্গে, গরীবদুঃখীর এক মাত্র আশ্রয়স্থল। এই রাজকীয়-উদ্যানের পরবর্ত্তী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার বক্সবরা ও স্যর জর্জ্জ কিংএর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই মহা পণ্ডিতই—আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির ঔষধ ও লতাগুল্ম

প্রভৃতির একটী বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া, কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই সকল পুস্তক অবলম্বন করিয়া শ্রীরামপুরের পরলোকগত সিভিল সার্জ্জন, ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত Materia Medica of the Hindus নাম দিয়া একখানি পুস্তক রচনা করেন। পরবর্ত্তীকালে, ফৌজদারী-বালাখানার প্রসিদ্ধ কবিরাজ, স্বর্গীয় বিনোদলাল সেন মহাশয় ইহার একটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই রাজকীয়-উদ্যানের সৌন্দর্য্য চক্ষে না দেখিলে বুঝাইবার যো নাই। আশি বৎসর পূর্ব্বে, স্বনামখ্যাত বিশপ হিবার, তৎকালীন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের সহিত এই উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন—"It is not only curious but a picturesque and most beautiful scene and more perfectly answers Milton's idea of Paradise, except that it is on a deadflat instead of a hill than anything evel saw. বর্ত্তমানে এই বাগানে অনেক উন্নতি হইয়াছে ও তাহা দেখিবার জিনিস।

ইডেন গার্ডেন।

লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে এই বাগানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার ভগিনীদ্বয় মিসেস ইডেন, এই বাগানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায় এবং পদস্থ ইংরাজগণ প্রতিদিনই এই রমণীয় উদ্যানে সান্ধ্য-ভ্রমণে আসেন। জব চার্ণকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পর, লালদীঘিই ইংরাজদের প্রথম সান্ধ্যভ্রমণ স্থানরূপে নির্ব্বাচিত হয়। তারপর বাগবাজারের পেরিংস্-উদ্যান। মারহাট্টা-ডিচ্ বুজাইয়া ফেলিয়া, সার্কিউলার রোডের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে, লর্ড ওয়েলেস্‌লির ও তৎপরবর্ত্তী আমলে এই প্রশস্ত সার্কিউলার রোডই কলিকাতাবাসিগণের রমণীয় ভ্রমণস্থান রূপে বিবেচিত হইত। তাহার পর লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে জাহ্নবীতীরে এই সুন্দর রম্যোদ্যানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে, এই ইডেন গার্ডেনই সাধারণের ভ্রমণোদ্যানে পরিণত হয়। এতন্মধ্যস্থ কৃত্রিম হ্রদ ও বর্ম্মিজ-প্যাগোডা সুন্দর ভ্রমণ ক্ষেত্রগুলি দেখিলে অশান্ত প্রাণেও একটা শান্তি আসে। এই বর্ম্মিজ প্যাগোডা ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে বর্ম্মার যুদ্ধের বিজয় চিহ্নরূপে প্রোম হইতে ইংরাজ বাহাদুর কলিকাতায় লইয়া আসেন। সন্ধ্যার পর এই উদ্যানের বৈদ্যুতিক-আলোক-শোভিত মূর্ত্তি, নন্দনের শোভা বিকাশ করে।

কলিকাতা সহরের মধ্যস্থ ষ্ট্যাচু ও অন্যান্য-স্মৃতিচিহ্ন সমূহের পরিচয়।

(ময়দানে)।

"প্রিন্সেপস্-ঘাট।"

"প্রিন্সেপস্-ঘাটের" নাম না জানেন, এরূপ কলিকাতাবাসী খুব কমই আছেন। ষ্ট্রাণ্ডরোডের উপর—এই ঘাটটী প্রতিষ্ঠিত। এই ঘাটে, আগে বড়লাট-সাহেবগণ নদীপথে আসিয়া, কলিকাতায় নামিতেন। আমাদের সর্ব্বজন প্রিয় মহাগৌরবান্বিত ভারতেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও তাঁহার স্বর্গীয় জনক, সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডও কলিকাতায় আসিবার সময়, এই ঘাটে নামিয়াছিলেন। প্রিন্সেপ-ঘাটের ন্যায় সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ ঘাট কলিকাতায় আর দ্বিতীয় নাই। আগে এই ঘাটটীর পদমূল বিচুম্বিত করিয়া খরস্রোতা জাহ্নবী প্রবাহিতা হইতেন। কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যে, গঙ্গা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন ও এই ঘাটটীর পার্শ্ব দিয়া, পোর্ট-কমিশনারেরা বর্ত্তমানকালে এক প্রশস্ত রাস্তা বাহির করিয়া দিয়াছেন।

যাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য, এই ঘাট-প্রতিষ্ঠা হয়, সেই জেমস্ প্রিন্সেস্ সাহেব, ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ২০ বৎসর বয়সে, তিনি কলিকাতা টাকশালের Assay Master এর পদে নিযুক্ত হন। স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেব, তাঁহার পূর্ব্বে, এই সরকারী টাকশালে, "এসেমাষ্টারের" কাজ করিতেন। উইলসনের অবসর গ্রহণের পর, জেম্‌স প্রিন্সেপ এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। উইলসন সাহেব সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও এসিয়াটিক-সোসাইটীর একজন সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার Theatre of the Hindus নামধেয়, প্রাচীন হিন্দু নাটাকলার ইংরাজীতে লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থ, মৌলিক গবেষণাপূর্ণ। প্রিন্সেপ সাহেব উইলসনের সাহচর্য্য লাভ করিয়া, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বাদি অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হন। প্রাচীন শিল্পকলার দিকেই তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল। তাঁহার স্থপতি-বিদ্যানুশীলনের কয়েকটী ফল এখনও বিদ্যমান। কর্ম্মনাশা নদীর উপর, তিনি একটী পঞ্চখিলানময় সুবৃহৎ পুল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই পুল, বেনারস ও বেহারকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। এখনও এই পুল বর্ত্তমান। দাক্ষিণাত্যে, ঔরঙ্গজেবের মসজিদের ভগ্নপ্রায় মিনারগুলিরও ইনি পুনঃসংস্কার করেন। সুন্দরবন বিভাগে বাণিজ্য

কার্য্যের সুবিধার জন্য, তিনি একটী খাল খনন করিয়া দেন। বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান-মিউজিয়ম গৃহ, তাঁহারই পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ ফল। এসিয়াটীক-সোসাইটীর তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। এইজন্য সোসাইটীর সদস্যগণও তাঁহার একটী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায়, প্রিন্সেপ সাহেব ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে বিলাতে চলিয়া যান। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগ্‌ডালা।

প্রিন্সেপ-ঘাটের পূর্ব্বদিকে, লর্ড নেপিয়ারের ষ্ট্যাচু বা পিত্তলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। লর্ড নেপিয়ার ১৮৬১ হইতে ১৮৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, লাট কৌন্সিলের মিলিটারী-মেম্বরের কার্য্য করেন। ১৮৭০ হইতে ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কম্যাণ্ডার-ইন্‌চিফ্‌ বা প্রধান সেনাপতির কাজ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে, তিনি জিব্রালটারের গবর্ণর পদে নিয়োজিত হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল, লর্ড এলগিনের, পঞ্জাবের ধর্ম্মশালায়, সহসা মৃত্যু ঘটিলে, লর্ড নেপিয়ার, কয়েক মাসকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলের কাজও করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের প্রথম অবস্থায়, যখন তিনি রয়াল-ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে দার্জ্জিলিঙ-পাহাড়ে ইংরাজগণের জন্য একটী গ্রীষ্মনিবাস স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। লর্ড নেপিয়ারের চেষ্টায়, দার্জ্জিলিঙের অত্যুচ্চ শৈলমালার বক্ষভেদ করিয়া কয়েকটী পথ নির্ম্মিত হয়। এ পথগুলি এখনও বর্ত্তমান। আবিসিনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি প্রচুর যশঃসঞ্চয় করেন ও নেপিয়ার-অব-ম্যাগডালা বলিয়া সাধারণে পরিচিত হন। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে, ৮০ বৎসর বয়সে ইনি স্বদেশে দেহত্যাগ করেন।

গোয়ালিয়ার মনুমেণ্ট।

এই স্মৃতিস্তম্ভটী, কলিকাতা দুর্গের সান্নিধ্যে গঙ্গারধারে অবস্থিত। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে লর্ড এলেন্‌বরার আমলে, ইহা প্রথম নির্ম্মিত হয়। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের গোয়ালিয়ার যুদ্ধে, যে সমস্ত ইংরাজ সেনানী নিহত হন—তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য, লর্ড এলেনবরা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহার নিম্নভাগ জয়পুর-মার্ব্বেলে নির্ম্মিত। উপরিভাগে, একটী "ডোম" বা গোলাকার ছাদ আছে। গোয়ালিয়ার যুদ্ধের বিজয়চিহ্ন স্বরূপ যে সমস্ত কামান সংগৃহীত হয়—তাহা ঢালাই করিয়া এই ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

স্যর হিউ গফ্‌ এই যুদ্ধের সেনানায়ক ছিলেন। পুনিয়ার ও মহারাজপুর যুদ্ধক্ষেত্রে, যে সব ইংরাজ-সৈনিক, রণক্ষেত্রে জীবন-বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাদের নামসংযুক্ত একখানি স্মৃতিফলক ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। কেবল ইংরাজ-সৈন্য নহে, অনেক দেশীয় সৈন্যেরও ইহা কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। "Peer Baccass" প্রভৃতি নাম যে পীরবক্সের অপভ্রংশ বানান, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

স্যর উইলিয়াম পিল।

ইডেন-গার্ডেনের সম্মুখেই স্পিড্‌ নামক বিখ্যাত ভাস্করের খোদিত, পিল্‌ সাহেবের এই শ্বেত মর্ম্মরময় মূর্ত্তি—এখনও অতীতকালের এক শোচনীয় স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী মহাবিদ্রোহের সময়, স্যর উইলিয়াম পিল্‌, ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার "শ্যানন" নামক রণপোতের সেনানায়ক ছিলেন। স্যর কলিন ক্যাম্বেল, যে সময়ে লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিতে যান, পিল্‌ সেই সময়ে তাঁহার নৌসেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সহায়তার জন্য সহগামী হইয়াছিলেন। মার্টিনিয়ার কলেজে গোলাবর্ষণের সময়, পিল্‌ যুদ্ধের সম্মুখভাগেই ছিলেন। এজন্য তিনি বিপক্ষপক্ষের গুলিতে দক্ষিণপদে আঘাত প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য, অযোধ্যার নবাবের একখানি সুন্দর চেরিয়াট গাড়ী বন্দোবস্ত করা হয়—কিন্তু আজন্ম সৈনিক পিল্‌ বলেন—"আমি এই বহুমূল্য নবাবী-গাড়ীতে যাওয়া অপেক্ষা, সামান্য ডুলিতে একজন সামান্য সেলারের মত যাইতে পারিলে বড়ই সুখী হইব।" পিলের এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, অগত্যা ডুলির বন্দোবস্ত করাই হয়। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ডুলিতে ইতিপূর্ব্বে একজন বসন্তরোগীকে বহন করা হইয়াছিল। এই ডুলি সংক্রামক-রোগের বীজ-দূষিত হওয়ায়, কানপুরে পৌঁছিবার পর, পিল্‌ এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হন ও তাহাতেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তাঁহার ন্যায় দুঃসাহসী, সমরে অজেয়, নৌ-সেনাপতি, সেকালে এদেশে খুব কম আসিয়াছিলেন। স্যর উইলিয়ম্‌ পিলের ষ্ট্যাচু, আগে ইডেন উদ্যানের মধ্যে ছিল। এক্ষণে এই বাগানের সম্মুখে, কেল্লার ময়দানের এক বিশিষ্ট স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

লর্ড অকল্যাণ্ড।

লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের গবর্ণর

জেনারেল পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই লর্ড অকল্যাণ্ড ও তাঁহার ভগ্নীদ্বয় (মিসেস্ ইডেন) অবিবাহিত ছিলেন। তাঁহার সহোদরাদ্বয়ের প্রধান কীর্ত্তি কলিকাতার নন্দনকানন—বর্ত্তমান ইডেন-গার্ডেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড, কাবুলের আমীর সাহসুজার পক্ষ সমর্থন করায়, কাবুল-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি তাঁহার কৌন্সিলের সহযোগীরূপে, স্বনামপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলের সহায়তা লাভ করেন। তাঁহার আমলেই, মার্শম্যান সাহেব "Friend of India" নামক সমাচার পত্র প্রচার করেন। অক্‌ল্যাণ্ডের এই পিত্তল-প্রতিমূর্ত্তি, এখন ইডেন-গার্ডেনের বহির্দ্দেশে অবস্থিত। আগে ইহা উক্ত বাগানের মধ্যেই ছিল।

লর্ড নর্থব্রুক।

হাইকোর্টের যে পথ দিয়া জজেরা আদালত-গৃহে প্রবেশ করেন, সেই পথের অপর পার্শ্বে ভারতের ভূতপূর্ব্ব ভাইসরয়, লর্ড নর্থব্রুকের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ১৮৭২ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, তিনি গবর্ণর-জেনারেল ও বড়লাট-সাহেবের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার শাসন সময়ে, আমাদের ভূতপূর্ব্ব গৌরবান্বিত ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ রূপে এদেশে আসেন। ইঁহার আমলে ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। লর্ড নর্থব্রুকের একান্ত চেষ্টায়, এই মহাদুর্ভিক্ষের শান্তি হইয়াছিল। এই প্রজা-বৎসল শাসনকর্ত্তা, সেই সময় নিজে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানগুলি স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন। দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও, তিনি সিমলা-প্রবাসে যাওয়া বন্ধ করিয়া, আর্ত্ত প্রজাগণের দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

টাউনহলের সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র ময়দানে, লর্ড বেণ্টিঙ্কের পিত্তল-প্রতিমা সংস্থাপিত। ইনি ১৮২৮ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লাট-সাহেবের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই পিত্তল নির্ম্মিত ষ্ট্যাচুর গাত্রে সতীদাহের একটী চিত্র খোদিত আছে। কারণ, ইঁহার আমলেই এই ভীষণ সতীদাহ-প্রথা নিবারিত হয়। ১৮০৩ হইতে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি মান্দ্রাজের গবর্ণরী করেন। ইঁহার আমলে সতীদাহ ও ঠগী-নিবারণ, এদেশবাসীগণকে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য লর্ড মেকলে প্রণোদিত Education Bill পাশ, মেডিকেল

কলেজ প্রতিষ্ঠা, ভারতে ষ্টীমারের প্রথম প্রচলন ও বর্ত্তমান পেনাল-কোড্ বা ফৌজদারী-দণ্ডবিধি-আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়।

ধরিতে গেলে, এই লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল। কারণ ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাগণের পদবী ছিল—"Governor General of the Presidency of Fort William in Bengal." বিলাতে প্রত্যাগমনের পর, ইনি পার্লামেণ্টের সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে, ফ্রান্সের প্যারী-নগরীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ওয়ারেণ-হেষ্টিংস।

টাউনহলের বারান্দায়—বঙ্গদেশের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ-হেষ্টিংস সাহেবের, সুবৃহৎ শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ইংরাজাধিকারের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল হেষ্টিংস, এদেশের লোকের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এখনও—সুদূর পশ্চিম-প্রদেশে তাঁহার নামে রচিত—

"হাতীপর্ হাওদা, ঘোড়েপর্ জীন্,
জল্‌দি যাও, জল্‌দি যাও,
ওয়ারেণ হষ্টিন্।"

এই কবিতাটি অনেকের মুখে শুনা যায়। বোধ হয়, বেনারসের চেত্ সিংহের ব্যাপারের সময়, এই কবিতাটী রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মূর্ত্তিটী শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই মূর্ত্তির এক পার্শ্বে এক ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি এবং অপর পার্শ্বে এক মুসলমান মৌলবীর প্রতিকৃতি খোদিত আছে। স্যর রিচার্ড ওয়েষ্টমেকট বলিয়া একজন বিখ্যাত শিল্পী এই প্রস্তরমূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। এগার বৎসরকাল এদেশে শাসন-কর্ত্তৃত্ব করিয়া, ওয়ারেণ-হেষ্টিংস, সমগ্র ভারতে ইংরাজের শাসনশক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। বিলাতের ডেইলস্‌ফোর্ড নামক স্থানে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের মৃত্যু হয়। ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের মৃত্যুর পর, বিলাতে তাঁহার আরও দুইটী প্রস্তর-মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল। ইহার একটী, বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়া-অফিসে ও অপরটী বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ওয়েষ্টমিনিষ্টার-আবিতে রক্ষিত। বর্ত্তমান জজ-আদালতের পার্শ্বে "হেষ্টিংস-হাউস" ও কলিকাতায় তাঁহার আবাস-বাটী এবং হেষ্টিংস-ষ্ট্রীট, আজও এদেশে হেষ্টিংসের নাম সাধারণের মনে জাগরূক রাখিয়াছে।

লর্ড কর্ণওয়ালিস।

দশশালা-বন্দোবস্তের বিধাতা, লর্ড কর্ণওয়ালিসের, এক সুবৃহৎ প্রস্তর-মূর্ত্তি টাউনহলের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। ইহাঁরই আমলে, মহীশূর-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া, টিপু সুলতানের পতন হয় এবং পুনরায় ইহাঁরই চেষ্টায় মহীশূরের গদীতে হিন্দু রাজা প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই রাজবংশ, এখনও মহীশূরে রাজত্ব করিতেছেন। ১৭৮৭ খৃঃ হইতে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর-জেনারেলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয়বার গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। এদেশে আসিবার আড়াই মাস পরে, গাজিপুরে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন ও তথায় তাঁহার দেহান্ত হয়। বোম্বে, মান্দ্রাজ ও কলিকাতা এই তিনটী প্রধান সহরেই, তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

লর্ড ক্যানিং।

গবর্ণমেণ্ট-হাউসের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, এক তৃণাবৃৎ ক্ষেত্রে লর্ড ক্যানিংএর পিত্তল প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহাঁর শাসনকালে, সুপ্রসিদ্ধ সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর, ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন-কর্ত্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে ধরিতে গেলে, কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয়। লর্ড ক্যানিং—সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম রাজ-প্রতিনিধি বা ভাইসরয়এর পদ লাভ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বারাকপুরে লেডী ক্যানিংএর মৃত্যু হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং বিলাতে চলিয়া যান ও ইংলণ্ডে পৌছিবার কয়েক সপ্তাহ পরে, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

লর্ড লরেন্স।

লর্ড লরেন্সের এই ষ্টাচুটী, গবর্ণমেণ্ট-হাউসের দক্ষিণ দিকের ফটকের ঠিক সম্মুখে অবস্থিত। জন্ লরেন্স, কোম্পানীর আমলের একজন প্রতিভাবান সিবিলিয়ান ছিলেন। তাঁহার সুবন্দোবস্তের গুণেই, নববিজিত পঞ্জাবে সেই ভয়ানক সিপাহী-বিদ্রোহ সময়েও, কোনরূপ অশান্তি উপস্থিত হয় নাই। তাহার পূর্ব্বে বা পরে, সিবিল-সার্ব্বিস হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া কেহই ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বলাভ করেন নাই। তাঁহার আমলে, প্রথম শিমলা-শৈল-প্রবাস আরম্ভ হয়। ভুটানযুদ্ধ ও উৎকলের মহাদুর্ভিক্ষ, ইহাঁর শাসনকালের অক্ষ দুইটী প্রধান ঘটনা। ১৮৬৪ হইতে ১৮৬৮ খ্রীঃ

অব্দ পর্য্যন্ত, ইনি বড়লাটের কার্য্য করেন। লর্ড লরেন্স, বড়ই প্রজাপ্রিয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পদোচিত জাঁকজমক, তিনি খুব কমই পছন্দ করিতেন। অনেক সময়ে, পদব্রজে গড়েরমাঠে ও ইডেন-গার্ডেনের নিকটে পদচারণা করিতেন। এ সম্বন্ধে একটী রহস্যকর গল্প আমরা শুনিয়াছি। একবার এই বড়লাট-সাহেব লরেন্স, সামান্য বেশে সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হন। তখন নিয়ম ছিল, রাত্রি নয়টার পরে কেহ "গবর্ণমেণ্ট-হাউসে" প্রবেশ করিতে পারিত না। যে সিপাহী, পাহারা দিতে ছিল, সেও লাট-সাহেবকে, ইতিপূর্ব্বে চক্ষে দেখে নাই। কাজেই সে তাঁহাকে সামান্য ইংরাজ-কর্ম্মচারী ভাবিয়া, প্রাসাদ-প্রবেশে বাধা উপস্থিত করে। শেষ তাঁহার সেক্রেটারীদের মধ্যে দুই একজন এই ঘটনাক্ষেত্রে সহসা উপস্থিত হইয়া, সিপাহীকে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। বলা বাহুল্য, লর্ড লরেন্স এই সিপাহীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পদোন্নতি করিয়া দেন।

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

এই লরেন্স-ষ্ট্যাচুর অতি সন্নিকটে, বর্ত্তমান রেড-রোডের শেষ প্রান্তে ময়দানের মধ্যে, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পিত্তল-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। এই মাতৃরূপিনী, দেবীরূপিনী, ভারতের শাসন-কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করার পর হইতে, ভারতবাসী নানাবিষয়ে সুখশান্তি উপভোগ করিতেছে। তাঁহার আমলে, অনেক লোভনীয় উচ্চ রাজপদ বঙ্গবাসীর করতলগত হইয়াছে। রেলওয়ে প্রভৃতি দ্বারা বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি ও সর্ব্বস্থানে যাতায়াতের পথও সুগম হইয়াছে। তিনি ভারতীয়—প্রজাগণকে বড়ই স্নেহের ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার জীবনের শেষাবস্থায় তিনি হিন্দুস্থানী-ভাষা পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বকিংহ্যাম, ব্যালমোরাল, অসবরণ, উইণ্ডসর প্রভৃতি রাজপ্রাসাদে, ভারতীয় আরদালী বা সিপাহীগণ আজ্ঞা পালনের জন্য নিযুক্ত ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, জননীর নিকট হইতেই এই ভারত-প্রীতি গুণে অনুপ্রাণিত হন। তাঁহার পৌত্র, আসমুদ্র ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট, পঞ্চম জর্জও পিতামহীর সদ্‌গুণ সমূহের অধিকারী হইয়াছেন। অনেক সময়ে, তাঁহার শ্রীমুখ-নির্গত অভয় বাণীতে, আমরা তাঁহার ভারত-প্রীতির আভাস পাইয়াছি। এই পিত্তল মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ভারতেশ্বরী

ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণময়মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে, যেন আরও ভাল হইত। যাহা হউক, লর্ড কর্জ্জন প্রতিষ্ঠিত, ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল হল সম্পূর্ণ হইলে, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার আর একটী অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে। মস্তকে মুকুট, হস্তে রাজদণ্ড ও সম্রাজ্ঞীর বেশ-পরিহিতা, এক গৌরবময়ী নারীমূর্ত্তি এই ষ্ট্যাচুতে প্রকটিত। চিত্রের নিম্নভাগটী সবুজবর্ণ আইরিশ্-মার্ব্বেল মণ্ডিত। সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশে, শিল্প, সাহিত্য ও সুবিচারের প্রস্ফুট মূর্ত্তি। নিম্নে একজন গুর্খা, সিপাহী বেশে ঢাল তরোয়াল হস্তে দণ্ডায়মান। মোটের উপর এই চিত্রটী ভাস্করের শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন। মহারাণীর রাজভক্ত প্রজাগণের অর্থসাহায্যে, এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত। তাঁহার ষষ্ঠি বৎসরব্যাপী রাজত্বকাল, স্মরণীয় করিবার জন্য, ইহা গঠিত হইয়াছিল। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট, লর্ড কর্জ্জন, মহারাণীর এই মূর্ত্তি বিশেষ সমারোহের সহিত উন্মোচন করেন। বর্ত্তমানে এই মূর্ত্তিটি গড়ের মাঠে স্থাপিত থাকিলেও, ভবিষ্যতে ইহা ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল হলে স্থানান্তরিত হইবে। এই মূর্ত্তি ভিন্ন, মহারাণীর আর একটী সুন্দর মর্ম্মর মূর্ত্তি এসিয়াটিক-মিউজিয়মের গৃহ মধ্যে স্থাপিত আছে। এই মূর্ত্তিটী বর্দ্ধমানাধিপতি স্বর্গীয় মহাতপচাঁদের প্রদত্ত।

লর্ড রবার্টস্।

লর্ড রবার্টস্, ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল পর্য্যন্ত, ভারত-সাম্রাজ্যের প্রধান-সেনাপতি ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রাপ্ত, চৌদ্দটী পিত্তলের কামান গলাইয়া, তাহা হইতে এই ষ্ট্যাচু নির্ম্মিত হইয়াছে। কাবুল, কান্দাহার, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগরা, খোদাগঞ্জ, অম্বালা, আবিসিনিয়া (১৮৬৭), লুসাই, আফগানিস্থান (১৮২৮—১৮৪০) পিওয়ার-কোটাল; সুতার-গর্ত্তন, চারাসিয়া, শেরপুর প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রের নাম এই ষ্ট্যাচুর গায়ে লিখিত। এই ষ্ট্যাচুর একদিকে "যুদ্ধ" ও অপরদিকে "জয়" এই দুইটী ঘটনা পিত্তলে খোদিত। যুদ্ধচিত্রের সম্মুখে শিখ, দক্ষিণে হর্স-আর্টিলারি, বামে হাইল্যাণ্ডার ও গুর্খা সৈন্য চিত্রিত আছে। মিঃ বেট্স নামক একজন ইংরাজ-ভাস্কর, এই পিত্তল প্রতিমা প্রস্তুত করেন। লর্ড রবার্টসের বীর-কীর্ত্তির পরিচয় যেস্থানে পিত্তলের অক্ষরে লিখিত, তাহার নিম্নে I now bid farewell to the Army of this Country both British and Native এই কয়েকটী কথা লেখা আছে।

লর্ড ল্যান্সডাউন।

লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ভারতসাম্রাজ্যের ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড রবার্টসের ষ্ট্যাচুর মত, ইহাঁর পিত্তল-প্রতিমাটীও ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত এগারটী পিত্তলের কামান গলাইয়া প্রস্তুত করা হয়। বেট্‌স ও ফোর্ড নামক দুইজন ভাস্কর এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। ইহাঁর আমলে, নির্ব্বাচন প্রথা দ্বারা বড়লাট সাহেবের মন্ত্রণা-সভায় সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা প্রথম প্রচলিত হয়। লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালেই "মণিপুরের হত্যাকাণ্ড" সংঘটিত হয়। ভারতে আসিবার পূর্ব্বে লর্ড ল্যান্সডাউন ক্যানেডার গবর্ণর ছিলেন। ভারতীয় রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ইনি ইংলণ্ডের ওয়ার-মিনিষ্টার বা প্রধান যুদ্ধসচিব পদে নিযুক্ত হন।

লর্ড ডফারিন্।

বর্ত্তমান রেড-রোডের সম্মুখে, লর্ড ডফারিনের পিত্তল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সার এডগার বোয়েম নামক সুবিখ্যাত শিল্পী, এই ষ্ট্যাচু নির্ম্মাণ করেন। লর্ড ডফারিন্ ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ম্মা-বিজয় ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে ইংরাজাধিকারের সীমা নির্দ্দেশ ও শান্তিস্থাপন, লর্ড ডফারিনের আমলের প্রধান ঘটনা। লর্ড ডফারিনের পত্নী, লেডী ডফারিনের চেষ্টায় ও যত্নে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সুচিকিৎসার জন্য, একটী ফণ্ড ও জেনানা-হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়। বর্ম্মা-বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার আদেশ অনুসারে, ইনি "মার্কুইস অব ডফারিন্ এণ্ড আভা ও আরল অব আভা" উপাধিলাভ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ অবস্থা ইনি সুখে কাটাইতে পারেন নাই। বোয়ার-যুদ্ধে লেডী স্মিথ অবরোধকালে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লর্ড আভা, মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্যর জেমস্ আউটরাম।

পার্ক-ষ্ট্রীটের ও আউটরাম-রোডের সন্ধিস্থলে, স্যর জেম্‌স আউটরামের অশ্বারূঢ় পিত্তল-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। আউটরাম, একজন প্রকৃত যোদ্ধা ও অসমসাহসিক সেনাপতি ছিলেন। গজনী, খেলাত, পারস্য প্রভৃতির যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, এই জেনারেল আউটরামের শক্তি ও সাহসের জন্য, অবরুদ্ধ লক্ষ্ণৌ-নগরীর উদ্ধার

সাধন হয়। মধ্যভারতের ভীলজাতির সহিত অবাধে মিশিয়া, নিজের শক্তিবলে, ইনি তাঁহাদের সুশান্ত করেন। এরূপ জনপ্রবাদ আছে, যে তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়, দুর্দ্ধর্ষ বন্য ভীলদিগের মধ্যে বিচরণ করিতেন। এই স্যর জেমস্ আউটরামই অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ্ আলি সাহকে, রাজ্যচ্যুত করিয়া, অযোধ্যা-প্রদেশ ইংরেজাধিকারভুক্ত করেন। আউটরামের ন্যায় দুঃসাহসিক যোদ্ধা সেনাপতি, সে আমলে খুব কম ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেন—তাঁহার ষ্ট্যাচুতে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে, স্যর জেমস্ আউটরামের মৃত্যু হয়।

লর্ড মেয়ো।

গড়ের মাঠের মধ্য হইতে যে রাস্তাটী ধর্ম্মতলার দিকে গিয়াছে, সেই পথের উপর লর্ড মেয়োর ষ্ট্যাচু প্রতিষ্ঠিত। আমাদের স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন ১৮৭৫ খ্রীঃ প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্‌রূপে এদেশে আসেন, তখন তিনি এই পিত্তল-প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেন। লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার আমলে "ভারত-গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের" প্রাণপ্রতিষ্ঠা হওয়ায়, এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতির সূচনা আরম্ভ হয়। নানা স্থানে খাল-খনন, নূতন পথ্যা-নির্ম্মাণ ও রেলওয়ের প্রসার ব্যাপ্তি, ইঁহার আমলেই হইয়াছিল। ভীষণ গুপ্ত আততায়ীর হস্তে, লর্ড মেয়ো পোর্টব্লেয়ারে আহত হন। তাঁহার মৃতদেহ, প্রথমে কলিকাতায় আনা হয়, তৎপরে তাঁহার জন্মভূমি আয়ার্লণ্ডে পাঠান হইয়াছিল। ইহার ঠিক ছয় মাস পূর্ব্বে, অন্য একজন পাঠান-ঘাতক কর্ত্তৃক, হাইকোর্টের চিফ্‌জষ্টিস, নর্ম্মাণ সাহেবও নিষ্ঠুর ভাবে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন নূতন হাইকোর্ট নির্ম্মিত হইতেছিল বলিয়া, টাউনহলেই হাইকোর্ট বসিত। জয়পুরের রাজোদ্যানে, লর্ড মেয়োর আর একটী ষ্ট্যাচু আছে।

অক্টারলোনী মনুমেণ্ট।

মফঃস্বলের অনেক লোক কলিকাতা দেখিতে আসিলে, "মনুমেণ্ট" দেখিয়া যান। এই মনুমেণ্ট ধর্ম্মতলার মাঠে সংস্থাপিত। স্যর ডেভিড অক্টার্লোনীর স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের জন্য, সাধারণের চাঁদায়, এই মনুমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ এই সুবৃহৎ মনুমেণ্টের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। অক্টার্লোনী সেকালের একজন বীরসেনানী ছিলেন।

View from top of Ochterlony Monument. Calcutta.
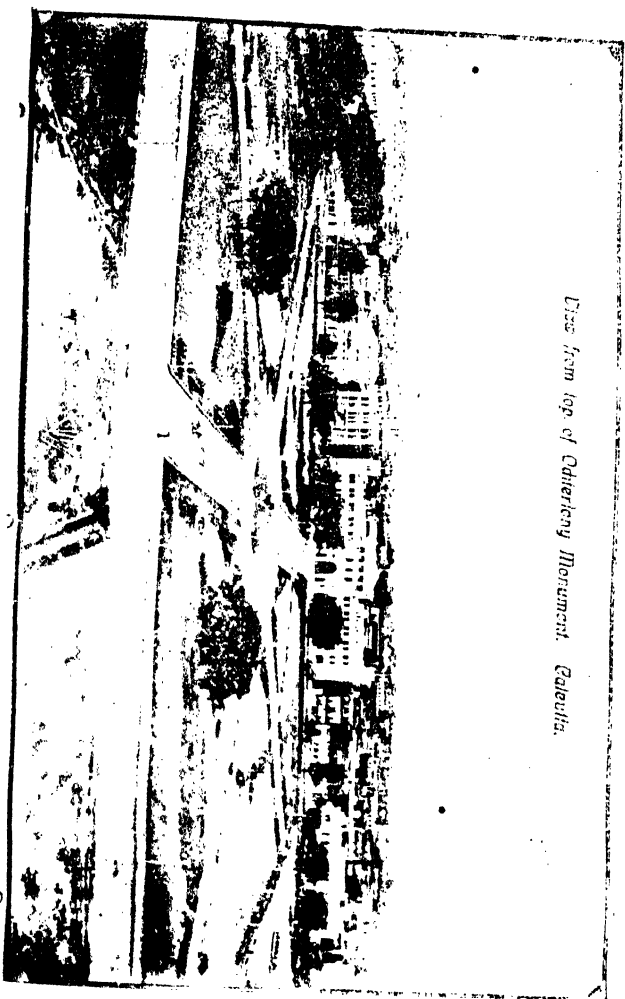
মালওয়া ও রাজপুতনায় ইনি প্রথমে রেসিডেন্টের কাজ করিতেন। নেপাল-যুদ্ধে ইঁহার সুনাম ও যশঃপ্রতিভা সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এই মনুমেণ্টটী ১৫২ ফিট উচ্চ। ইহা নির্ম্মাণ করিতে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এই মনুমেণ্টের চূড়ার উপর উঠিলে, কলিকাতা সহরের দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়। কলিকাতার পুলিস-কমিশনার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিলে, এই মনুমেণ্টের উপরে উঠিবার পাশ পাওয়া যায়। অক্টার্লোনি, সুপ্রসিদ্ধ সেনানী স্যর আয়ার কুটের আমল হইতে যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী হন। হাইদার আলির আমল হইতে, পরবর্ত্তী অনেক বিখ্যাত যুদ্ধে, এই অক্টার্লোনী বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে মাণ্টয় তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনের শেষাবস্থায় তিনি মালটার গবর্ণর হইয়াছিলেন।

প্যানিয়টী ফাউণ্টেন।

ওল্ডকোর্ট হাউস ও এসপ্লানেড রোর নিকটে, একটী ফাউণ্টেন বা সাধারণের জলপানের স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। ডেমিট্রিয়াস প্যানিয়টী সাহেবের স্মরণার্থে, এই প্রস্রবণটী সাধারণের ব্যবহারের জন্য ধর্ম্মতলার কর্জ্জন-বাগানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই প্যানিয়টী সাহেব ৪২ বৎসর কাল ধরিয়া, ভিন্ন ভিন্ন বড়লাট সাহেবদের সহকারী প্রাইভেট-সেক্রেটারীর কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রস্রবণটী জয়পুরের মার্ব্বেল-পাথরে প্রস্তুত। লর্ড কর্জ্জনের চেষ্টাতেই এই স্মৃতিচিহ্নটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লেডি কর্জ্জনের ফাউণ্টেন।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের পত্নী, পরলোকগতা লেডী কর্জ্জনের স্মৃতিরক্ষার্থে, ধর্ম্মতলায় বর্ত্তমান "কর্জ্জন-পার্ক" নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কর্জ্জন-পার্ক নামক ভ্রমণোদ্যানটী, ধর্ম্মতলার বর্ত্তমান ট্রাম-আড্ডার পার্শ্বে। এই স্থানে, পূর্ব্বে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। তাহা বুজাইয়া ফেলিয়া ও এস্প্লানেডের কয়েক বিঘা জমী লইয়া, এই ক্ষুদ্র পার্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে, অনেক ইংরাজ ও বাঙ্গালী এইস্থানে বেড়াইতে আসেন। উদ্যানটীর চারিদিক লোহার-রেলিং দিয়া ঘেরা। মধ্যে সুবিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ও কঙ্করময় ভ্রমণপথ। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে লেডী কর্জ্জনের এক সাংঘাতিক পীড়া হয়। সেই সময়ে কলিকাতাবাসিগণ তাঁহার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। এই জন্য লেডী-কর্জ্জন, কলিকাতাবাসীকে একটী

"প্রস্রবণ" প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাই "লেডী-কর্জ্জনের ফাউণ্টেন" নামে বিখ্যাত।

লর্ড হেষ্টিংস।

ডালহৌসী ইন্‌সটিউটের বারান্দায়, গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসের শ্বেত প্রস্তরময় মূর্ত্তি স্থাপিত। ইনি আরল ময়রা এবং লর্ড হেষ্টিংস এই দুই নামেই পরিচিত। ১৮১৩ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁর আমলে, বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ড-রোড ও ময়দান মধ্য-বর্ত্তী পথগুলি প্রথম নির্ম্মিত হয়। পুরাকালে, এই ষ্ট্রাণ্ড-রোড গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ভারতীয় রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর, লর্ড হেষ্টিংস, মাল্‌টার গবর্ণর পদে নিযুক্ত হন এবং এই মাল্‌টাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সাধারণের চাঁদায়, লর্ড হেষ্টিংসের এই শ্বেত মর্ম্মরময় মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা।

ডালহৌসী-স্কোয়ারের কোণে, লালদীঘির এক প্রান্তে, হেয়ার-ষ্ট্রীটের মোড়ের উপর, মহারাজা স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর, মহারাজা অব দ্বারভাঙ্গার শ্বেতপ্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত। মহারাজ বীরবেশে তরবারি হস্তে গদীতে উপবিষ্ট, এইভাবেই মূর্ত্তিটী সংগঠিত। অন্‌স্লো ফোর্ড নামক জনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ-স্থপতি এই মূর্ত্তিটী গঠন করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের তদানীন্তন গবর্ণর স্যর এনড্রু ফ্রেজার সাহেব কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ৪৩ বৎসর বয়সে মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা মহারাজা স্যর রামেশ্বর সিং বাহাদুর, দ্বারবঙ্গের গদিতে আরোহণ করেন। দ্বারবঙ্গ রাজ্যের আয় ত্রিশ লক্ষের উপর। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর বড়-লাট বাহাদুরের কৌন্সিলের সদস্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্ববিধ লোক হিতকর কার্য্যে ও সভা সমিতিতে তিনি যোগদান করিতেন।

স্যর এস্‌লি ইডেন।

লালদীঘির বাগানের মধ্যে রাইটার্স-বিল্ডিংসের সম্মুখে, বঙ্গেশ্বর স্যর এস্‌লি ইডেনের প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপিত। ইনি ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। ২৯ বৎসর বয়সে, তিনি গবর্ণমেণ্টের বোর্ড অব

রেভিনিউএর জুনিয়ার-সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন। ৩১ বৎসর বয়সে বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্টের চিফ্-সেক্রেটারী হন। ৪২ বৎসর বয়সে, বর্ম্মার চিফ্-কমিশনারের পদ লাভ করেন। তৎপরে ৪৬ বৎসর বয়সে বঙ্গদেশের ভাগ্যবিধাতারূপে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন। জনপ্রবাদ এই—"ইলবার্ট বিল" তিনিই প্রথম প্রণয়ন করিয়াছিলেন। স্যর এস্‌লি ইডেন, একজন প্রজার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ, সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গের বর্ত্তমান উন্নতি, তাঁহার আমলেই হইয়াছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইডেন-হাঁসপাতাল, দার্জ্জিলিঙ্গের ইডেন স্যানিটারিয়ম, চিরদিনই তাঁহার কীর্ত্তি-ঘোষণা করিবে।

স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলি।

স্যর ষ্টুয়ার্ট কলভিন বেলি, কে, সি, এস, আই, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আসামের চিফ্ কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেলি সাহেব, বড়লাটের কৌন্সিলের সদস্যগিরি করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯০ পর্য্যন্ত, ইনি বঙ্গদেশ শাসন করেন। এদেশের রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া, স্যর ষ্টুয়ার্ট, বিলাতের ইণ্ডিয়া-অফিসে পলিটিকাল-ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। ইনি সেকালের হেলিবারি-কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ সিভিলিয়ান। ইঁহার পিতা মিঃ উইলিয়াম বটারওয়ার্থ বেলি, ১৮২৮ খৃঃ অব্দে কয়েক মাসের জন্য বঙ্গের গবর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্টের এদেশ হইতে প্রস্থানের পর ও লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের এদেশে আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইনি মার্চ্চ হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ছয়মাসকাল, গবর্ণরের কাজ করিয়াছিলেন। স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলী, একজন প্রজারঞ্জক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বেলি সাহেবের শ্বেত প্রস্তরময় মূর্ত্তি, অর্ণিক্রফট নামধেয় একজন বিখ্যাত শিল্পীর হস্ত প্রসূত।

স্যর জন উডবরণ।

স্যর জন উডবরণ, কে, সি, এস, আই মহোদয়, ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার আমলে কলিকাতার কপালীটোলা অঞ্চলে প্রথম প্লেগ দেখা দেয়। এই প্লেগ উপলক্ষে, সেই সময়ে লোকের মনে কিরূপ আতঙ্কের উদয় হয়, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া

প্লেগের টীকা দিবেন, দুষ্টলোকে এইরূপ একটা জনরব রটাইয়া দেওয়ায়, সমগ্র কলিকাতা সহরের অধিবাসিগণ অতিশয় সন্ত্রাসিত হইয়া উঠেন। দলে দলে লোক কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। তার পর গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায়, এ আতঙ্কভাব অপসারিত হয়। প্রজাপ্রিয় স্যর জন উডবরণ, লোকের মনের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য, প্রায়ই অশ্বারোহণে সহরের দেশীয় পল্লীগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। স্যর জন উড্‌বরণ প্রজাপ্রিয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এ দেশেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

হলওয়েল মনুমেণ্ট।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ডে যে সব ইংরাজের শোচনীয় মৃত্যু সংঘটিত হয়, তাঁহাদের স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষার্থে—স্বনামপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব, একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। প্রাচীন কলিকাতা-দুর্গের সম্মুখে একটী খাত ছিল। অন্ধকূপ-হত্যার পরবর্ত্তী দিবসে, সেই খাতে সমস্ত মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পরে এই খাত বুজাইয়া ফেলা হয়। হলওয়েল এই নরকঙ্কালপূর্ণ খাতের উপর একটী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের আমলে, হলওয়েল প্রতিষ্ঠিত এই স্মৃতি-চিহ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ইহার প্রায়- আশী বৎসর পরে, লর্ড কর্জ্জন এই স্মৃতিস্তম্ভটী নূতনভাবে, বর্ত্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। লর্ড কর্জ্জনের স্থাপিত এই স্মৃতিচিহ্নের একটু বিশেষত্ব আছে। হলওয়েলের স্থাপিত মনুমেণ্টে সেরাজের নামটী জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন মিঃ হিলের সংগৃহীত ১৭৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের রেকর্ডগুলি পাঠে, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, যে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সেরাজ-উদ্দৌলা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নহেন, এইজন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মনুমেণ্টে, নবাবের নামটী প্রস্তর-ফলক হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লর্ড কর্জ্জন।

লর্ড কর্জ্জনের নাম নানাকারণে বাঙ্গালীর নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। ইঁহারই আমলে, বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হয়। এই ব্যাপার লইয়া সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে একটা হুলস্থূল বাধিয়া যায়। বর্ত্তমানযুগের বঙ্গবাসীমাত্রেই সে ঘটনা জানেন। সুতরাং তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের সর্ব্বজন প্রিয় বড়লাট, লর্ড হার্ডিংএর আমলে, এই দ্বিধা-বিভক্ত বঙ্গদেশ আবার এক হইয়া যায় এবং ইহারই ফলে, আমরা প্রজারঞ্জক

শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেলকে গবর্ণররূপে পাইয়াছি। লর্ড কর্জ্জনের আমলে, ফ্যামিন্-কমিশন ও ইউনিভারসিটী-কমিশন বসে। পুলিশের সর্ব্ব বিভাগের সংস্কারের জন্য, পুলিশ-কমিশনও বসিয়াছিল। সমগ্র ভারত-বর্ষের পুরাকালের স্মৃতিচিহ্নগুলি রক্ষা করিয়া, লর্ড কর্জ্জন তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। লর্ড কর্জ্জনের আমলে, ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ১৯০৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি তারিখে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, সিংহাসনাধিরোহণ করেন। এতদুপলক্ষে লর্ড কর্জ্জন দিল্লীতে একটী বিরাট দরবারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জ্জনের আমলে তিব্বত যুদ্ধ ঘটে। লর্ড কর্জ্জন, সর্ব্ব বিষয়ে একজন প্রতিভাবান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, চৌরঙ্গী-রোডের ও আউটরাম ষ্ট্রীটের সন্ধিস্থলে, লর্ড কর্জ্জনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

লর্ড কিচ্‌নার।

লর্ড কিচ্‌নার, লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালে, সমগ্র ভারতের জঙ্গীলাট বা কমাণ্ডার ইন্‌-চিফ্‌ ছিলেন। বর্ত্তমানকালে, তাঁহার মত, বীরাগ্রগণ্য রণকুশল সেনাপতি খুব কমই আছেন। তাঁহার সমর-প্রতিভা, দিকদিগন্তে বিঘোষিত। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময়, লর্ড কিচেনার War Minister এর পদে নিযুক্ত হইয়া অতুলনীয় প্রতিভার সহিত, সমগ্র ব্রিটিশবাহিনী পরিচালিত করেন। লর্ড কিচেনার, সেনাবিভাগের বহুবিধ সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। গড়ের মাঠে কেল্লার সান্নিধ্যে, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল, এই পিত্তল-প্রতিমার প্রথম আবরণ উন্মোচন করেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পরিচয়, আমরা ঠাকুর-গোষ্ঠীর বিবরণ প্রদানকালে পূর্ণভাবে দিব। প্রসন্নকুমারের প্রদত্ত দানেই "Tagore Professorship of Law" নামক হিন্দু-আইন সম্বন্ধীয় লেক্‌-চারের ব্যবস্থা হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর একজন আইনজ্ঞ ব্যবহারজীব ও সর্ব্ববিধ দেশহিতকর কার্য্যের সমর্থক ছিলেন। এই প্রস্তর মূর্ত্তির নিম্নে— "জন্ম ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ ২১ ডিসেম্বর ও মৃত্যু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ আগষ্ট"—এই কথাগুলি খোদিত। বঙ্গবাসীগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বড়লাট সাহেবের

কৌন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত হন। বাঙ্গলার ছোটলাট-কৌন্সিলেও তিনি একবার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ওকালতি করিয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বৎসরে দুইলক্ষ টাকা পর্য্যন্ত উপায় করিয়াছেন। পরে তিনি ওকালতি ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া, সাধারণ হিতকর কার্য্যে মনোযোগ দেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক উইল করিয়া, প্রসন্নকুমার সাড়ে ছয়লক্ষ টাকা ধর্ম্মার্থে ও শিক্ষাকার্য্যের উৎসাহের জন্য দান করিয়া যান। ইহার মধ্যে, তিনলক্ষ টাকা "Tagore Law Professorship"এর জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। তাঁহার পুত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করায়, প্রসন্নকুমার জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে, তাঁহার উত্তরাধিকারী করিয়া যান। প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেকালের একজন আদর্শ জমিদার, আদর্শ ব্যবহারজীব ও আদর্শ দাতা ছিলেন।

ডেভিড্ হেয়ার।

বর্ত্তমান হেয়ার-স্কুল—ডেভিড্ হেয়ারের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু তাহা হইলেও, কলেজ ষ্ট্রীটের গোলদীঘিতে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ এখনও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রেসিডেন্সি কালেজের মাঠেও তাঁহার একটী শ্বেত-প্রস্তরময় মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। হেয়ার সাহেব, এদেশীয় ছাত্রদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। এদেশীয়গণ যাহাতে ইংরাজি ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে, তজ্জন্য তিনি জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ডেভিড্ হেয়ার স্কট্ল্যাণ্ডের অধিবাসী। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথমে তিনি ঘড়ীর ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। পরে নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া এদেশীয় জনসাধারণের শিক্ষা ও উন্নতির মহাব্রতে জীবন সমর্পণ করেন। জীবনে তিনি যাহা কিছু উপায় করিয়াছিলেন সবই বঙ্গদেশবাসীর জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ যে জমীর উপর স্থাপিত, তাহা এই মহানুভব ডেভিড্ হেয়ারের দান করা সম্পত্তি। মেডিকেল কালেজের উন্নতির জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। শবদেহ ব্যবচ্ছেদ ভয়ে তখন কোন বাঙ্গালী ছাত্র, মেডিকেল কালেজে প্রবেশ করিতে চাহিত না। ডেভিড্ হেয়ারের চেষ্টায় তাহাদের এই কুসংস্কার দূরীভূত হয়। কেবলমাত্র ইংরাজী

শিক্ষার সুব্যবস্থার দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল তাহা নহে—সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার সম্বন্ধেও তিনি অনেক সুব্যবস্থা করেন। এখনও প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যুর দিনে, একটী উৎসবের মহদনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বাঙ্গালার বিদ্যাসাগর, তাঁহার নিজের কীর্ত্তিস্তম্ভ নিজেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে গোলদীঘির প্রবেশ-পথে, তাঁহার একটী প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বময় জীবনকথা বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া বলা অনাবশ্যক। কারণ বিদ্যাসাগরকে না জানেন, এমন বাঙ্গালীই নাই। মোটের উপর কথা হইতেছে এই—সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হইতে কর্ম্মময় জীবন আরম্ভ করিয়া, বিদ্যাসাগর পরিশেষে এই মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল বা প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য আর মেট্রোপলিটান-কলেজ এবং বঙ্গভাষা যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন বিদ্যাসাগরের স্মৃতি রক্ষার জন্য অন্য কোনরূপ নূতন বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইবে না।

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর।

কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসান রোডের মধ্যস্থলে, স্বর্গীয় অনারেবল রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত। ১৮০৯ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে জুলাই মাসে, কৃষ্ণদাসের স্বর্গলাভ ঘটে। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-সভার সম্পাদক পদে নিযুক্ত থাকিয়া, তিনি এই বঙ্গীয় জমীদার-সভাটীকে নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররূপে, তিনি দরিদ্র করদাতাদের পক্ষসমর্থনে জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াছেন। সেকালের হিন্দুপ্রেট্রিয়াট—কৃষ্ণদাসের জ্বলন্ত কীর্ত্তি। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, রাজনীতিজ্ঞ সম্পাদক খুব কমই জন্মিয়াছেন। আইন প্রণেতারূপে, লাটকৌন্সিলে প্রবেশ করিয়া তিনি সমগ্র ভারতের ও বঙ্গদেশের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া কর্ম্মবীর কৃষ্ণদাস, এই মরজগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া—রাজদ্বারে ও সাধারণের নিকট অযাচিত সম্মান লাভ করিয়া লোকান্তরবাসী হইয়াছেন। তাঁহার উপযুক্তপুত্র অনারেবল

রাধাচরণ পালও পিতৃপদাঙ্কানুসরণে দেশের ও দশের হিতসাধন করিতেছেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে, রাজা কালীকৃষ্ণের জন্ম হয়। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মৃত্যুর পর রাজা কালীকৃষ্ণ, হিন্দু কায়স্থ-সমাজের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর একজন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক গ্রন্থ তিনি ইংরাজীতে অনূদিত করিয়া, এদেশের ও ইউরোপের সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-ভাজন হয়েন। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, সাধারণ সভাসমিতি ও অন্যান্য দেশ হিতকর কার্য্য সমূহে যোগদান করিয়া, সাধারণের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে তিনি সর্ব্বজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর দেহত্যাগ করেন। বিডন-বাগানের প্রস্তরমূর্ত্তি ব্যতীত, টাউনহলেও তাঁহার আর একখানি তৈলচিত্র আছে।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে, কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের জন্ম হয়। ফরিদপুর জেলার খাণ্ডারপাড়া গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও রাজবৈদ্য অভিরাম কবীন্দ্র দ্বারকানাথের পূর্ব্বপুরুষ। দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ, গোপালকর "রসেন্দ্র-সার-সংগ্রহ" নামে প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন। মুরশীদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া, দ্বারকানাথ কলিকাতায় চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করেন। চিকিৎসাসম্বন্ধে শীঘ্রই তাঁহার সুযশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রাজপুতানার মেওয়ার রাজবংশের যুবরাজের পীড়া হইলে, রাজসরকার গবর্ণমেণ্টের নিকট একজন সুবৈদ্য চাহিয়া পাঠান। বাঙ্গালী বৈদ্য দ্বারকানাথই, এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া, মেওয়ারে প্রেরিত হন। এই রাজকুমারের চিকিৎসায় তাঁহার যশঃপ্রভা সুদূর রাজপুতানা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। দ্বারকানাথ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ১৯০৬ খৃঃ অব্দে, ইঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন।

কবিরাজদের মধ্যে দ্বারকানাথই সর্ব্বপ্রথমে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃঃ অব্দে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়।

কালীঘাট মন্দির।

কালীঘাট-প্রসঙ্গে আমরা এই শক্তিপীঠ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। বর্ত্তমান কালীমন্দির, নবাবী আমলের শেষভাগে নির্ম্মিত। কামদেব ব্রহ্মচারী, যিনি মহারাজ মানসিংহের গুরু ছিলেন ও বড়িশার সাবর্ণগণের আদিপুরুষ, তাঁহার সময়েই এই কালীঘাটের কথা সাধারণ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। প্রবাদ এই, যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়, কালীর জন্য সেবায়েত বন্দোবস্ত ও একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তখন এই স্থান ভীষণ বন জঙ্গল-পরিপূর্ণ ছিল। বসন্তরায়ের নিয়োজিত কালীর সেবায়েত, ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র-বংশ বর্ত্তমান হালদার মহাশয়গণ। বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে, যে সকল কিম্বদন্তী আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে, বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। ধরিতে গেলে, এই মন্দিরটী একশত পাঁচ বৎসর হইয়াছে। কালীক্ষেত্র-রক্ষক ভৈরব নকুলেশ্বর আগে এক পর্ণকুটীরের মধ্যে থাকিতেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তারাসিং বলিয়া একজন পঞ্জাবী, বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দুর্গাপূজার কয়দিন, নীলষষ্ঠী, চড়ক, শিবরাত্রি ও কালীপূজা উপলক্ষে এবং যোগ ও গ্রহণের দিনে এই শক্তিপীঠ মহাতীর্থ কালীঘাটে খুব জনতা হয়।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির

অপার চিৎপুর রোডে—বাগবাজার পল্লীতে এই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখনও সুপ্রশস্ত চিৎপুর-রোডের পার্শ্বে মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। কিন্তু এরূপ জনপ্রবাদ আছে—পুরাকালে জাহ্নবী এই পথ পর্য্যন্ত প্রবাহিতা ছিলেন। বাগবাজারের মদনমোহন স্থাপিত হইবার বহুপূর্ব্বে, এই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির বর্ত্তমান ছিল। এই মন্দিরে অতি পুরাকালে—অর্থাৎ পলাশী-আমলের পরও, নরবলি হইয়া গিয়াছে এরূপ প্রমাণ, সেকালের সরকারী-গেজেট হইতে আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। এক সন্ন্যাসী, এই কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্ত্তীকালে কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের বংশধর, বাবু অভয়চরণ মিত্র বর্ত্তমান দেবস্থানটী নির্ম্মাণ

করিয়া দেন। বর্ত্তমানের কালীপ্রতিমা মৃত্তিকা-গঠিত। কিন্তু ইহার স্থাপয়িতা সন্ন্যাসী যে প্রস্তরমূর্ত্তি পূজা করিতেন, তাহাও নাকি এই মন্দিরের মধ্যে আছে। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে, চিত্রেশ্বরী বলিয়া আর এক অতি পুরাকালের কালীঠাকুর বর্ত্তমান। তখন এই চিৎপুর রোড অতি অপ্রশস্ত বনপথ মাত্র ছিল। সন্ন্যাসী ও কাপালিকেরা এই জঙ্গলময় পথ ধরিয়া বর্ত্তমান বেণ্টিঙ্কষ্ট্রীটের মধ্যে দিয়া, চৌরঙ্গীর জঙ্গল-মধ্যস্থ অপ্রশস্ত পথাবলম্বনে কালীঘাটে আসিতেন।

পাকড়াশির শিবমন্দির।

বহুবাজার কেণ্ডারডাইন লেনের মধ্যে কয়েকটী শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এ মন্দিরগুলি পলাসী মহাসমরের পরে নির্ম্মিত। লর্ড ক্লাইভের আমলে, যখন কলিকাতার নূতন দুর্গ, গড়ের মাঠের অধিকৃত স্থানে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ত্রিলোকরাম পাকড়াশী এই মন্দির ও নবরত্ন নির্ম্মাণ করেন। পাকাড়াশী মহাশয় ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। একটা জনশ্রুতি এই, কেল্লার প্রাচীর ও গড়খাই প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য যেরূপ ভাবে ইষ্টক প্রস্তুত করান হইয়াছিল, পাকড়াশী মহাশয় সেইরূপ পাকা ইট দ্বারা, এই মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করান। মন্দিরগুলির নির্ম্মাণপ্রণালী ও ইষ্টকাদির ব্যবস্থা দেখিলে তাহা প্রকৃত বলিয়াই বোধ হয়। দেওয়ান অব ফোর্ট-উইলিয়ামের পদ, কোম্পানীর আমলে প্রথম সৃষ্ট হয়। এখন ইহার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান গড়ের মাঠের কেল্লা বা নূতন ফোর্ট-উইলিয়াম নির্ম্মাণের ভার অনেক বাঙ্গালীর উপর ন্যস্ত হয়। ইঁহারা লোকজন কুলীমজুর জোগান দিতেন, মালমসলা জোগাইতেন—এমারত নির্ম্মাণের তদারকী কাজও করিতেন। এই কাজ করিয়া—সেকালে দুইজন লোক প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করিয়া ছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন দুর্গাচরণ পিতুড়ি ও অপর ব্যক্তি এই পাকড়াশী দেওয়ানজী। দুর্গাচরণ পিতুড়ির নাম, বৌবাজার পল্লীর একটী গলিতে সুরক্ষিত। আর পাকড়াশী মহাশয়ের নাম—এই শতাব্দী পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন শিবমন্দিরগুলি আজও ঘোষণা করিতেছে।

আনন্দময়ীর মন্দির

নিমতলা ঘাটের পল্লীতে, এই দেবী আনন্দময়ীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এ মূর্ত্তি বহুকালের পুরাতন—শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, একজন মোহান্ত

গঙ্গাতীরে সর্ব্বপ্রথম এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। গঙ্গা—তখন বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ডরোড পর্য্যন্ত প্রবাহিতা ছিলেন। নিমতলার পুরাতন দাহঘাট ইহার পরিচয়। আনন্দময়ী সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে। এ কিম্বদন্তীটি এই— জগন্নাথ বলিয়া একজন লোক খড়ের ব্যবসা করিত। এই জগন্নাথ, পূর্ব্বোক্ত মোহন্তের অতি ভক্ত ছিল। মৃত্যুর সময় মোহন্তঠাকুর—জগন্নাথের হস্তেই আনন্দময়ীর সেবার ভার দিয়া যান। জগন্নাথের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া, সে নারায়ণ মিশ্র নামক এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণকে, এই কালীস্থান ও তাহার পার্শ্বস্থ জমী বিক্রয় করে। মিশ্র মহাশয় ঘোর শাক্ত ছিলেন। তিনি দেবীর নিত্যপূজার ও সেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দেন। নারায়ণ মিশ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরদেব মিশ্র, এই দেবমন্দিরের সেবায়তের কার্য্য করেন। হরদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভাগিনেয় নিমতলা ষ্ট্রীটের জমীদার, স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উত্তরাধিকারসূত্রে এই মন্দিরটী প্রাপ্ত হন। মাধব বাবুর পর, স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে এই আনন্দময়ী কালীর সেবার ভার অর্পিত হয়। বর্ত্তমানে বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার-বংশীয় বাবু ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই মন্দিরের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। আনন্দময়ী আগে এক পর্ণকুটীরের মধ্যে থাকিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারগণ বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই কালীমূর্ত্তি প্রস্তর-নির্ম্মিত। বর্ত্তমানে এই আনন্দময়ী দেবীর মন্দির সর্ব্বদাই জাঁকজমক-পূর্ণ। কালীপূজা ও দুর্গাপূজার সময় এখানে মহাসমারোহে পূজা পাঠাদি হইয়া থাকে। সন্ধ্যার আরতির সময়, অনেক ভক্ত হিন্দু এইস্থানে আরতি দর্শনার্থে সমবেত হন।

ঠন্‌ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালী।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর—ঠন্‌ঠনিয়ায় সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। এই কালীমূর্ত্তি মৃত্তিকানির্ম্মিত। কিন্তু পূর্ব্বে, ইহার আর এক মূর্ত্তি প্রকটিত ছিল। উদয়নারায়ণ বলিয়া একজন শাক্ত ব্রহ্মচারী এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বহস্তেই দেবীর পূজা করিতেন। তখন এ অঞ্চলে লোকের বসতি এত অধিক ছিল না। অধিকাংশ স্থান বন জঙ্গলাবৃত ছিল। উদয়নারায়ণ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পর, হালদারবংশীয় একজন পুরোহিত এই দেবী-মন্দিরের ভার লয়েন। এই সময়ে, বাঙ্গলা ১১১০ সালে, ঠন্‌ঠনিয়ার

প্রসিদ্ধ ধনী ও কালীভক্ত শঙ্কর ঘোষ মহাশয়, বর্ত্তমান মন্দিরটী ও প্রতিমা-খানি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই মন্দিরগাত্রে আজও—

শঙ্করহৃদয় মাঝে
কালী বিরাজে।

লিখিত একখানি প্রস্তর-ফলক সংযোজিত আছে। এই প্রস্তরফলকখানির লিখিত "শঙ্কর" শব্দটী দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। শঙ্কর ঘোষ মহাশয় এই কালী মন্দিরের পার্শ্বে একটী শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

নিমতলা ঘাট।

নিমতলাঘাট, কলিকাতার ন্যায় জনপূর্ণ সহরের মহাশ্মশান। দম্ভ, ঐশ্বর্য্য, আত্মগরিমা ও ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিবিকাশ এই মহাশ্মশানেই পর্য্যবসিত হয়। সেকালের নিমতলাঘাট আনন্দময়ীমন্দিরের নিকটেই ছিল। বর্ত্তমান-কালে গঙ্গা দূরে সরিয়া যাওয়ায় পোর্টকমিশনারগণ প্রচুর অর্থব্যয়ে এই মহাশ্মশানটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার পার্শ্বে, স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়, শবযাত্রীদিগের ও মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীগণের অবস্থানের জন্য, একটী দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যথেষ্ট পুণ্যসঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। এই নিমতলা শ্মশানক্ষেত্র—জ্ঞান ও বৈরাগ্যের শিক্ষাভূমি। কলিকাতা সহরের নামজাদা যত বড় বড় লোক, বাণীর অতি প্রিয়পুত্রগণের দেহের ভস্মাবশেষ, এই স্থানেই রক্ষিত। রামগোপাল, কৃষ্ণদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রভৃতির পবিত্র চিতাভস্মে, এই স্থান মহাতীর্থে পরিণত। নিমতলা শ্মশানঘাটের ন্যায় সুপ্রশস্ত ও সুবৃহৎ দাহক্ষেত্র বঙ্গদেশে আর কোথাও নাই। নিমতলাঘাটের একটু দূরে স্বর্গীয় কাশীনাথ মিত্রের ঘাট। ইহা সাধারণের নিকট "কাশীমিত্রের ঘাট" বলিয়া পরিচিত। নিমতলা ঘাটের দাহকার্য্যাদির ব্যয় সম্বন্ধে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী একটী মূল্যের তালিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারেই সাধারণকে দাহ-কার্য্যের খরচা দিতে হয়। অক্ষম ও যোত্রহীনগণের ব্যয় মিউনি-সিপ্যালিটীই বহন করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মতলার মসজেদ।

ধর্ম্মতলার মোড়ে, কুক্ কোম্পানীর আড়গড়ার পার্শ্বে, যে সুবৃহৎ মিনার সম্বলিত মস্‌জেদটী আছে—তাহা "ধর্ম্মতলার মস্‌জেদ" বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত।

মহীসুরের স্বনামখ্যাত টিপু সুলতানের পুত্র, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, ১৮৪২ খৃঃ অব্দে, এই মস্‌জেদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের শাসনকালে এই সুবৃহৎ মস্‌জেদ নির্ম্মিত হয়। এই মস্‌জেদের উপর একখানি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে— "This Musjid was erected during the Government of Lord Auckland G. C. B. by the Prince Gholam Mahomed son of the late Tippoo Sultan, in gratitude to God and in commemoration of the Honourable Court of Directors granting him arrears of his stipend in 1840."

টিপুর পতন হইলে, তাঁহার বংশধরেরা ইংরাজবাহাদুরের বন্দীরূপে টালিগঞ্জে স্থানান্তরিত হন। গোলামমহম্মদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোম্পানীবাহাদুর ভাতা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এখনও টিপুর বংশধরেরা টালিগঞ্জে বাস করিতেছেন। ইঁহারা "টালিগঞ্জের নবাব" বলিয়া পরিচিত। টিপুর অধঃপতনের পর—কোম্পানী এক হিন্দু রাজবংশধরকে মহীসুর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমান মহীসুর রাজ্যেশ্বর এই হিন্দু রাজারই বংশোদ্ভূত।

মাণিকপীরের গোর।

অপার-সর্কিউলার রোডের ও মাণিকতলা ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে, এই মাণিকপীরের গোরস্থান অবস্থিত। পীর সৈয়দ হোসেনউদ্দিন সাহ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া, এইস্থানে ধর্ম্ম-সাধনা আরম্ভ করেন। তিনিই সাধারণ্যে "মাণিকপীর" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই স্থানে উক্ত মাণিক-পীরের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। মাণিকপীর সম্বন্ধে কোন বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এই মস্‌জেদটী যে শতাধিক বৎসরের পুরাতন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জুম্মাপীরের গোর।

বড়বাজার ক্লাইভষ্ট্রীটে, এই জুম্মাপীরের গোর অবস্থিত। এতৎসম্বন্ধে একটী অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তখন এই স্থানের সান্নিধ্যে গঙ্গানদী প্রবাহিতা হইতেন। গঙ্গার তটেই সেকালের সুতানুটী-ঘাট। এই সুতানুটী-ঘাটের উপর, নন্দরেশ্বর মহাদেব স্থাপিত ছিলেন ও এখনও ষ্ট্রাণ্ড-রোডের পার্শ্বে এই নন্দরেশ্বর বিরাজিত। এ লিঙ্গ মূর্ত্তি দুইশত বৎসরের পুরাতন। কাশীনাথ বলিয়া একজন সামান্য ব্যবসায়ী, উত্তর-পশ্চিম

প্রদেশ হইতে আসিয়া, সেকালের সুতালুটীতে দোকান-পাট করিতেন। কাশীনাথ মধ্যে মধ্যে হুগলী ও বাঁশবেড়ে হইতে মালপত্র কিনিয়া আনিয়া, কলিকাতায় ব্যবসা করিতেন। একবার কাশীনাথ, হুগলী হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। এক ফকির তাঁহাকে বলে—"তুমি দয়া করিয়া আমায় কলিকাতায় পৌছিয়া দাও।" কাশীনাথ তাঁহাকে তাঁহার নৌকায় তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় আসেন ও ফকিরের যথাসাধ্য পরিচর্য্যা করেন। তদবধি ফকিরসাহেব, কাশীনাথের দোকানের পার্শ্বেই থাকিয়া যান। তখন লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল। এই ফকির, পরে "জুম্মাসাহ" বলিয়া পরিচিত হন। এক সময় লর্ড কর্ণওয়ালিসের দপ্তরে, একটী দেওয়ানী পদ খালি হয়। ফকির জুম্মাসার উপদেশে ও নির্ব্বন্ধে, কাশীনাথ এই দেওয়ানী পদের জন্য দরখাস্ত করেন। কাশীনাথ লেখাপড়া না জানিলেও ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই পদলাভ ঘটে। ফকিরের অদ্ভুত কৃপায় কাশীনাথ দেওয়ানীপদ লাভ করিয়া, প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হন। ভবিষ্যতে ইনি দেওয়ান কাশীনাথ বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ—দেওয়ান কাশীনাথ, জুম্মাসার মৃত্যুর পর, তাঁহার সমাধিস্থানে একটী সুন্দর অট্টালিকা করিয়া দেন। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে, এই অট্টালিকা প্রস্তুত হয় ও ইহা এখনও বর্ত্তমান। প্রতিদিন অসংখ্য হিন্দু মুসলমান বড়বাজারের এই পীরস্থানে সিন্নি দিতে আসেন। কাশীনাথ, চেষ্টা করিয়া গুমনসাহ বলিয়া এক ফকিরকে এই দরগার মতোয়ালিরূপে নিযুক্ত করেন এবং ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর পীরোত্তর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

ওয়াজির আলির গোর।

বামনবস্তী পুলিশ সেক্‌সনের এলাকাধীনে, কাশিয়াবাগানে ওয়াজির-আলির গোর প্রতিষ্ঠিত। এই ওয়াজির আলি অযোধ্যার রাজবংশোদ্ভব। তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্তই শোচনীয় ঘটনাময়, এজন্য তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। ইনি অযোধ্যার দাতা-নবাব আসফউদ্দৌলার পোষ্য-পুত্র। নবাব আসফউদ্দৌলা সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে—"যিস্কো না দে মৌলা, উস্‌কো দে আসফউদ্দৌলা।" ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে, নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। ওয়াজির আলি অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা অপরাধে, তিনি রাজ্যচ্যুত হয়েন ও নবাবের ঔরসজাত পুত্র সাদত আলি অযোধ্যার সিংহাসন পান।

গবর্ণমেণ্ট রাজ্যচ্যুত ওয়াজির আলিকে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়া, বেনারসে যাইতে বলেন। এই সময়ে মিঃ চেরী, বেনারসের রেসিডেণ্ট ছিলেন। তখন লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল। মিঃ চেরী একদিন ওয়াজীর আলিকে প্রাতরাশের জন্য নিমন্ত্রণ করেন (১৭৯৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি)। ওয়াজীরের মনে এক কু উদ্দেশ্য জাগিয়া উঠে, যে তিনি মিঃ চেরীকে এই সুযোগে হত্যা করিবেন। তিনি অনেক পারিষদ সঙ্গে লইয়া চেরীর আবাসস্থানে উপস্থিত হন। এই সদস্যবর্গের মধ্যে অনেক গুণ্ডা, বদমায়েস ছিল। তাহারা বস্ত্রের মধ্যে গোপনে অস্ত্রাদি লইয়া যায়। আহারাদির সময়ে সুযোগ পাইয়া, ওয়াজিরআলি সহসা মিঃ চেরীকে আক্রমণ করেন।

মিঃ চেরী আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই এই অতর্কিত আক্রমণে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া কাপ্তেন কনওয়ে ও মিঃ গ্রেহাম বলিয়া আর দুইজন ইংরাজও নিহত হইয়াছিলেন। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর, ওয়াজির আলি, সদলবলে বেনারসের জজ, মিঃ ডেভিসের আলয়ে উপস্থিত হন। * এখানে যথাসম্ভব বাধা প্রাপ্ত হইয়া এই নরঘাতক নবাবপুত্র বেরারে পলায়ন করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বেরার হইতে ধরিয়া আনিয়া কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। সতর বৎসরকাল এইভাবে অবরুদ্ধ থাকিবার পর, প্লুরিসি বা বক্ষপ্রদাহ রোগে ৩৬ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার সমাধির সময় মোটে ১০৲টী টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এইজন্য একজন ইংরাজ লেখক বলিয়া গিয়াছেন—"তাঁহার কবরের জন্য ১০৲ টাকামাত্র ব্যয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিবাহের সময় নবাব আসফ-উদ্দৌলা ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।" কলিকাতা কাশিয়াবাগানেই এই হতভাগ্য নবাবপুত্রের সমাধি হয়।

* মিঃ ডেভিস অসমসাহসের সহিত এই সময়ে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পরিজনবর্গকে তেতালার ছাদে তুলিয়া দেন ও একটীমাত্র বর্শা হস্তে, শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করেন। সিঁড়ির প্রবেশমুখেই এই যুদ্ধ হয়। পরিশেষে পরাজিত ওয়াজির আলি পলায়ন করেন। আমি বেনারসে অবস্থানকালে—মিঃ ডেভিসের আত্মরক্ষার এই স্থানটী দেখিয়া আসিয়াছি। লর্ড কর্জন, তাঁহার এই বিপত্তি-কাহিনী একখানি ট্যাবলেটে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ডেভিস সাহেবের এই কুঠীটি এখন কাশীনরেশের সম্পত্তি। ইহা "নন্দেশ্বর-কুঠী" বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। এই বাটীর সীমানার মধ্যে "নন্দেশ্বর" বলিয়া এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

জব চার্ণকের গোর।

জব চার্ণকের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমানে কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা, জব চার্ণকের সমাধির উপর একটী মসোলিয়াম বা সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সেণ্টজন চর্চ্চের সীমানার মধ্যে এই মসোলিয়াম প্রতিষ্ঠিত। আমরা ইহার একখানি প্রতিকৃতি পুস্তকে দিলাম। সম্ভবতঃ ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে এই সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়। জব চার্ণকের মনুমেণ্টের উপর যে, প্রস্তর ফলকখানি আছে, তাহা লাটিন ভাষায় লিখিত। জব চার্ণক ১৬৫৫-৫৬ খ্রীঃ অব্দে, এদেশে আসেন। তৎপরে তিনি কাশিমবাজার কৌন্সিলের জুনিয়ার মেম্বর হন। কাশিমবাজার হইতে তিনি পাটনায় বদলী হন। এই অসমসাহসী জব চার্ণক কি প্রকার উদ্যমের সহিত, বাঙ্গালার তৎকালীন নবাব সায়েস্তাখাঁর সহিত যুঝিয়াছিলেন, তাহার ইতিবৃত্ত আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে দিয়াছি। বড়ই দুঃখের বিষয়, কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণকের কোন প্রতিকৃতি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে এই পুস্তকের শেষভাগে তাঁহার স্বাক্ষরের একটী প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। যতদিন এই কলিকাতা মহানগরীর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন জব চার্ণকের নাম ইহার স্থাপয়িতা রূপে সাধারণের স্মৃতিপথ বহির্ভূত হইবে না।

এডমিরাল ওয়াটসনের গোর।

কর্ণেল ওয়াটসন বা এডমিরাল ওয়াটসনের গোরও এই সেণ্টজন গির্জ্জার মধ্যে অবস্থিত। ইনি সেরাজের কলিকাতা দখলের পর বৎসর, লর্ড ক্লাইভের সহিত একযোগে কলিকাতার পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার গোরের উপর লিখিত আছে—"এইস্থানে "হোয়াইট" নামক রণপোতের ভাইস-এডমিরাল ও ইংলণ্ডেশ্বরের নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি চার্লস ওয়াটসনের দেহ নিহিত আছে। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে ইনি গতাসু হন। ৪৪ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দ ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ইনি গিরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ ১১ই জানুয়ারি ইনি কলিকাতার পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩এ মার্চ্চ, ইনি চন্দননগর দখল করেন।" যাঁহারা ১৭৫৬ ও

১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত, তাঁহাদের নিকট এই এড্‌মিরাল ওয়াটসন অপরিচিত নহেন।

সার্জ্জন হ্যামিল্‌টানের গোর।

সার্জ্জন হ্যামিল্টানের নাম—মোগল রাজত্বের ও কোম্পানীর প্রথম আমলের ইতিহাস পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। ইনিই দিল্লীর সম্রাট ফেরোকসিয়ারের পীড়া আরাম করিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাকর কতকগুলি স্বত্বলাভ করিয়াছিলেন। এই সার্জ্জন হ্যামিল্টানের দিল্লীগমন প্রভৃতি ব্যাপারের একটী বিবরণ আমরা যথাস্থানে দিয়াছি। ১৭০৯ খৃঃ অব্দে ইনি কোম্পানী বাহাদুরের "সেরবোরণ" নামক জাহাজের ডাক্তাররূপে ভারতে আসেন। ১৭১১ খৃঃ অব্দে কলিকাতার বাণিজ্যকেন্দ্রে. কোম্পানীর অধীনে "দ্বিতীয় চিকিৎসকের" (Second Surgeon) পদ লাভ করেন। কোম্পানী-বাহাদুর কর্ত্তৃক সরম্যান প্রমুখ যে দৌত্যাভিযান, সম্রাট ফেরোকসিয়ারের দরবারে ১৭১৪ খৃঃ অব্দে প্রেরিত হয়, হ্যামিলটন সেই অভিযানের চিকিৎসকরূপে দিল্লীতে গমন করেন। ১৭১৫ খৃঃ অব্দে বাদসাহকে রোগমুক্ত করায়, বাদসাহ তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার দেন তদ্ব্যতীত তাঁহাকে কয়েকটী বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। এমন কি, যে অস্ত্র সহায়তায় তিনি দিল্লীশ্বরের পীড়া আরোগ্য করেন, সেগুলিও বাদসাহ সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এই সুযোগে—অন্যবিধ পুরস্কার প্রার্থনা না করিয়া, স্বদেশহিতৈষী, স্বজাতির মঙ্গলকামী এই স্বার্থত্যাগী হ্যামিলটান সাহেব, ইংরাজ-কোম্পানীর বাণিজ্য-কার্য্যের সুবিধার উদ্দেশ্যে কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুর নামক গ্রামত্রয় ক্রয় করিবার জন্য—অনুমতি বা সনন্দ প্রার্থনা করেন। হ্যামিলটনের এইরূপ গরিমাময় আত্মত্যাগের জন্যই, বর্ত্তমান কলিকাতার প্রসার বৃদ্ধি হয়। এই তিনখানি গ্রামই কোম্পানীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী। দিল্লী হইতে প্রত্যাগমনের পরই ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বরে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। চার্ণকের সমাধির নিকটেই ডাক্তার হ্যামিলটানের সমাধিটী অবস্থিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের গোর।

এই কলিকাতা সহরে, সার্কিউলার রোড সমাধি-ক্ষেত্রে, কবিকুলশিক্ষ মাইকেল মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভটীই বঙ্গবাসীর বিশেষ সম্মানের সমাধিস্তম্ভ।

মেঘনাদবধ মহাকাব্য-রচয়িতা, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি খণ্ডকাব্য প্রণেতা, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি নাটক প্রণেতা, বঙ্গভাষার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা, মাইকেলের জীবনের বিস্তৃত ঘটনা আজকাল শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত নহে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেলজীবনী, কবীন্দ্র মধুসূদনের ঘটনাময় জীবনের নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। মধুসূদনের জন্মস্থান, যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম। ১৮২৪ খৃঃঅব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, জননীর নাম জাহ্নবী দাসী। মধুসূদন—প্রথমাবস্থায় গ্রামের স্কুলে অধ্যায় কার্য্য শেষ করিয়া, ইংরাজী শিক্ষার জন্ম হিন্দুস্কুলে প্রবেশ করেন। ইংরাজী ভাষার সহিত এই নবীন যৌবনে তিনি গ্রীক্ ও লাটিন ভাষাও শিক্ষা করেন। হিন্দু মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে, তিনি মান্দ্রাজে চলিয়া যান। মান্দ্রাজে অবস্থানকালে, তিনি Captive Lady বলিয়া একখানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই ইংরাজী গ্রন্থখানি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। মান্দ্রাজ প্রবাস কালেই মধুসূদন মান্দ্রাজ কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং ভবিষ্যতে এই রমণীর সহিত বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলে, হেনরিয়েটা নাম্নী আর এক ইংরাজ রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

১৮৫৮খৃঃ অব্দে, মধুসূদন মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আসার পর, জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রথমে তাঁহাকে পুলিস-কোর্টে চাকরী গ্রহণ করিতে হয়। এই সময়েই মধুসূদনের কাব্যময় জীবনে মধুর ঝঙ্কার উঠে। মধুসূদন প্রথমে রত্নাবলী নাটকের এক ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। আগে মধুসূদন বঙ্গভাষার চর্চ্চায় বিমুখ ছিলেন। কিন্তু তিনি বাণীর বরপুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন—এজন্য স্বয়ং বীণাপাণি তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার সাহিত্যিক জীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে মধুসূদন—কৃষ্ণকুমারী, শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী নাটক, একেই বলে সভ্যতা (প্রহসন), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (প্রহসন), মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি রচনা করেন। যাঁহারা মধুসূদনের এই সমস্ত গ্রন্থাবলীর সহিত পরিচিত, তাঁহাদিগকে কবিবরের অমানুষিক প্রতিভার নূতন পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজনই নাই। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে মধুসূদন ব্যারিষ্টার হইবার জন্য, বিলাত যাত্রা করেন। এই প্রবাস-জীবনে, ভাগ্য বিড়ম্বনায় তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হয়। দয়ার

সাগর বিদ্যাসাগর, এই সময়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য না করিলে, তিনি বড়ই বিপদে পড়িতেন। মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর মধ্যে "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" তাঁহার প্রবাসকালে, সুদূর ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে লিখিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে, মধুসূদন ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। মধুসূদন বড়ই অপব্যয়ী ছিলেন। বুঝিয়া সুঝিয়া চলিতে পারিতেন না। এই জন্য তাঁহার ভয়ানক অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটে। ব্যারিষ্টারি কার্য্যে, মধুসূদন কোন উন্নতিই করিতে পারেন নাই। পত্নী বিয়োগের পর, মধুসূদনের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। রোগের চিকিৎসার উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ না থাকায়, তিনি জেনারেল হাঁসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে, ২৯এ জুন রবিবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার জীবনান্ত হয়। মধুসূদন দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না। কিন্তু শেষ জীবনে বাঙ্গালার এই অমর কবিকে অর্থাভাবে সাধারণ হাসপাতালে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে, মধুসূদন তাঁহার পুত্র-কন্যাদির ভার তাঁহার প্রিয়বন্ধু স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের উপর দিয়া যান। মনোমোহন বাবুও পুত্রবৎ স্নেহে, মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়ানকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের এই পুত্র, এখন গবর্ণমেণ্টের অধীনে Opium Agent এর উচ্চপদে নিযুক্ত।

মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ মহাত্মাগণের চেষ্টায় ও সাধারণের চাঁদায় সর্কিউলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে মধুসূদনের যে সমাধিস্থান আছে—তাহার উপর নিম্নলিখিত প্রস্তর ফলক তাঁহার স্মৃতিচিহ্নরূপে সংযোজিত।

দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে,
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী, কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্তমহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

পাইকপাড়া রাজবংশ (দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ)।

এই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের পূর্ব্বের বাসস্থান মুর্শিদাবাদ জিলায় কান্দিগ্রামে ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম হরকৃষ্ণ সিংহ। তিনি মুসলমান রাজগণের আমলে প্রচুর ধনসংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্র বিহারীর দুই পুত্র—রাধাগোবিন্দ ও গঙ্গাগোবিন্দ। রাধাগোবিন্দ, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ও নবাব সিরাজদ্দৌলার অধীনে খাজনা-সংক্রান্ত পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ভবিষ্যৎকালে খাজনা সংগ্রহের ভার ইংরাজের হস্তে যাওয়াতে তিনি এসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ায় পুরস্কার স্বরূপ একটী "সইয়ারমহল" অর্থাৎ হুগলীতে বাণিজ্যের শুল্ক আদায়ের স্বত্ব পাইয়াছিলেন।

১৭৯০ অব্দে এই "সইয়ারমহল" ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার বদলে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে হুগলীতে বাৎসরিক ৩৬৯৮৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই বংশের বংশধরগণ আজিও সেই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তৎকালের বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করেন। এজন্য তিনি গবর্ণমেণ্টে সম্মানিত হন। তাঁহার দানশীলতা সুবিখ্যাত। মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে "দেওয়ান" পদে নিযুক্ত করেন এবং সুবা-সংক্রান্ত বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ মৃত্যুকালে পুত্র প্রাণকৃষ্ণের ভার জ্যেষ্ঠ রাধাগোবিন্দের হস্তে ন্যস্ত করেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমলেই পাইকপাড়া রাজবংশ যথেষ্ট ধনশালী হইয়াছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ, মাতৃশ্রাদ্ধে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যেরূপ যশঃসঞ্চয় করেন, গঙ্গাগোবিন্দের মনেও সেইরূপ একটা যশসঞ্চয়ের অভিলাষ হয়। মহম্মদ রেজা খাঁ যখন বাঙ্গালার রাজস্ব বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা, গঙ্গাগোবিন্দ সেই সময়ে তাঁহার অধীনে প্রধান কর্ম্মচারী বা কানুনগো পদে নিযুক্ত ছিলেন। গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, এজন্য গঙ্গাগোবিন্দ এই কাজে ক্রমে ক্রমে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে, গঙ্গাগোবিন্দের চাকরী যায়। এই সময়ে কৌন্সিলের সদস্যেরা বিরোধী হওয়ায় ও নন্দকুমার হেষ্টিংসের

প্রতিযোগিতা করায় কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার একচ্ছত্র ক্ষমতার হ্রাস হয়। হেষ্টিংস পূর্ব্ব ক্ষমতা লাভ করিলে, গঙ্গাগোবিন্দ পুনরায় তাঁহার দেওয়ান রূপে নিযুক্ত হন। তখন এদেশে "দশশালা বন্দোবস্ত" প্রচলিত হয় নাই। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর জমীদারী সমূহ জমীদারদের সহিত বিলি বন্দোবস্ত হইত। এই সময়ে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হস্তে এইরূপ বন্দোবস্তের ভার পড়ায় তিনি কমলার কৃপানেত্রে পতিত হন। জমীদারেরা গঙ্গাগোবিন্দের এ রূপ একচ্ছত্র ক্ষমতাবৃদ্ধি দেখিয়া, তাঁহাকে বড়ই ভয় করিয়া চলিতেন। গঙ্গাগোবিন্দকে সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে কাহারও জমীদারী থাকিত না। এমন কি নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দের কৃপাভিখারী হইয়াছিলেন। নদীয়া রাজসংসারে কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের একটী পুরাতন প্রবাদ বাক্যই এই—

"দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য, ভরসা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ।"

গঙ্গাগোবিন্দ দুর্গাপূজা, দোল, রাস, পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতি কার্য্যেই যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। নিত্য নৈমিত্তিক দান, ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান, দেবসেবা, দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও অতিথি সেবার বন্দোবস্ত প্রভৃতি ছাড়া মাতৃশ্রাদ্ধ ও পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্রের (লালাবাবুর) অন্নপ্রাশনের সময়, তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপার রাজসুয়যজ্ঞের মত হইয়াছিল। নানাদেশ হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আহুত ও অনাহুত ব্যক্তিগণ এই শ্রাদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিলেন। পথে যে কোন লোক বলিত—"দেওয়ানবাড়ীর শ্রাদ্ধ দেখিতে যাইতেছি", চটীওয়ালারা তাহাদিগকে বিনামূল্যে সিধা ও থাকিবার স্থান দিত। অবশ্য গঙ্গাগোবিন্দের বন্দোবস্তেই এরূপ হইয়াছিল। এই সমারোহ ব্যাপারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু তিনি নিজে না আসিয়া, পুত্র শিবচন্দ্রকে পাঠাইয়া দেন। শিবচন্দ্র দেখিলেন—"গঙ্গাগোবিন্দ যে ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই এ কলিযুগের রাজসূয় ব্যাপার।" কিন্তু সকল কার্য্যেই যেন একটা সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার অভাব। গঙ্গাগোবিন্দ আত্ম গরিমায় মত্ত হইয়া কুমার শিবচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত আয়োজনই দেখাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন দেখিলেন কুমার?" শিবচন্দ্র রহস্য করিয়া বলিলেন—"হাঁ যা দেখিলাম, তাহা যেন দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার বলিয়াই বোধ হইল।" গঙ্গাগোবিন্দ কিন্তু হটিবার পাত্র নহেন। তিনি

বলিলেন "না কুমার! এ ত দক্ষযজ্ঞ নয়। তার চেয়েও একটা বড় ব্যপার। দক্ষযজ্ঞে শিবের অধিষ্ঠান হয় নাই। কিন্তু আমার এ মাতৃযজ্ঞে স্বয়ং শিব অধিষ্ঠিত।" বলা বাহুল্য শিবচন্দ্র এই কৌশলময় উত্তরে একটু অপ্রতিভ হইলেন। পৌত্রের অন্নপ্রাশনের সময়, গঙ্গাগোবিন্দ ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণপত্রে খোদিত লিপি দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

দেওয়ান প্রাণকৃষ্ণ, জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার দয়া এবং দানশীলতা প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র, দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, ওরফে লালা বাবু। ইনি কিছুকাল বর্দ্ধমান ও কটকের কালেক্টরের দেওয়ান ছিলেন। লালাবাবু যৌবনেই সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন এবং যথেষ্ট আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। বহুদিন তীর্থ ভ্রমণ করিবার পর, তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাস করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের কয়েকটী আখ্যান পাঠকবর্গের শুনিয়া রাখা উচিত। লালাবাবুর বৈরাগ্য গ্রহণ সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধীয় অনেক গল্পের মূলে আবার সত্য ঘটনাও নিহিত থাকে। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে লালাবাবু তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন—এমন সময়ে, একজন ধীবর তাহার সঙ্গীকে ডাকিতেছিল—"ওরে বেলা গেল যে! পারে কখন যাবি রে?" সে বোধ হয় গঙ্গার ওপার হইতে এ পারে মাছ বেচিতে আসিয়াছিল। আর তাহার কাজ শেষ হইয়া যাওয়ায়, তাহার সঙ্গীকে এভাবে আহ্বান করিতেছিল। লালাবাবু এই সামান্য কথাটার মধ্যে একটা গভীর ভাব দেখিতে পাইলেন। তিনি যেন ভগবৎ-প্রেরিত সঙ্কেত-বাণীতে শুনিলেন—ভগবান তাঁহাকেই যেন এই সংকেত কথায় সাবধান করিয়া দিলেন। তিনি মনে জানিলেন, "আমারও ত দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, পারে যাইবার সময় হইয়াছে।" এই কথায় তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায়, তিনি বৃন্দাবন চলিয়া যান। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ বাক্য এই, প্রথম যৌবনে পিতার সহিত মনোবাদ হওয়ায়, ইনি স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের জন্য, বর্দ্ধমান জেলায় সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। তৎপরে ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ইনি সরকারী বন্দোবস্তী মহল সমূহের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একটা জমীদারী পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার পথে সন্ধ্যার সময় এক গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হন। সেইস্থানে শুনিলেন এক রজক-কন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছে—"বাবা বেলা যে গেল। বাসনায় আগুন দাও।" সেকালে

কদার-বাসনার ক্ষারে কাপড় কাচা হইত বলিয়া, রজক-কন্যা তাহার পিতাকে এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু লালাবাবু মনে মনে ভাবিলেন—"কই আমারও ত জীবনের বেলা গেল। দিন ত শেষ হইয়া আসিতেছে। বাসনার দাস হইয়া সুখে ও বিলাসে জীবন কাটাইতেছি, বাসনায় আমি আগুন ধরাইতে পারিলাম কই?"

ত্রিশ বৎসর বয়সে, লালাবাবু মথুরাবাসী হয়েন। ধনী-সন্তানের এরূপ অদ্ভুত বৈরাগ্য, বাঙ্গালীর ইতিহাসে অতি দুর্লভ। বৃন্দাবনে, লালাবাবুর নাম এবং তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ এখনও পূর্ণ-শক্তিতে সঞ্জীবিত আছে। কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া এক বিগ্রহ ও তৎসংলগ্ন সেবাবাড়ী তাঁহার ব্যয়ে এখনও পরিচালিত হইয়া, তাঁহার কীর্ত্তি-ঘোষণা করিতেছে। আজও পর্য্যন্ত এখানে সদাব্রত ব্যবস্থা আছে। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁহার ২৫ লক্ষটাকা ব্যয় হইয়াছিল। রাজপুতানা হইতে মার্ব্বেল পাথর আনাইয়া, এই বিগ্রহ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে, লালাবাবুকে এক মহাবিপদে পড়িতে হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ওরফে লালাবাবু, এই সময়ে পছন্দমত প্রস্তর ক্রয় করিবার জন্য, স্বয়ং রাজপুতানায় যান। তখন স্বনামপ্রসিদ্ধ লর্ড মেটকাফ, রাজপুতানার পলিটিকাল-রেসিডেন্ট। এই সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে, তিনি রাজপুতানার কয়েকটী রাজাকে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। লালাবাবুও তখন রাজপুতানায় ছিলেন। রাজপুতানার একজন স্থানীয় রাজা, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হওয়ায়, লর্ড মেটকাফের মনে সন্দেহ হয়, যে লালাবাবু তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিয়া বিরুদ্ধাচারী করিয়াছেন। এই সন্দেহবশে, তিনি লালাবাবুকে দিল্লীতে লইয়া যান। সেইস্থানে তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান হওয়ায় প্রকাশ পায়, যে তিনি সেই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। স্যর চার্লস, লালাবাবুর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, তৎকালীন দিল্লীর-সম্রাটের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। দিল্লীশ্বর, লালাবাবুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, লালাবাবু বলেন—"সম্রাট! আমি সর্ব্বত্যাগী ভিখারী। উপাধির লোভ ও ইহলোকের গর্ব্বচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াই আমি বৈরাগ্য-মার্গ অবলম্বন করিয়াছি। রাজোপাধিতে আমার আর কোন প্রয়োজন নাই।"

চল্লিশ বৎসর বয়সে লালাবাবু বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত "মাধুকরী" ব্রতাবলম্বন

করেন। এই সময় হইতে ইনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে, দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। মাত্র একমুষ্টি তণ্ডুলের অন্ন, উদর পোষণার্থে তাঁহার নিত্য প্রয়োজন হইত। ইহার অতিরিক্ত ভিক্ষা তিনি কখনই করিতেন না।

মথুরার শেঠেরা বিখ্যাত ধনী। অভিমান বশে, তিনি এতদিন শেঠ বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যান নাই। একদিন সহসা তাঁহার মনে হইল—"কই! এখনও ত অভিমান দমন করিতে পারিলাম না। এক সময়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের উপর বসিয়াছিলাম, তাহার ত সবই ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু এখনও ত আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাই যদি পারিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শেঠগৃহে ভিক্ষা করিতে যাইতাম। যে শেঠেরা আমায় দেখিলে ইতিপূর্ব্বে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত, তাহাদের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে যাইতে যখন আমার এত আপত্তি, তখন বুঝিতেছি এখনও আমি প্রবৃত্তির দাস হইয়া আছি। আত্মাভিমান, দম্ভের মূর্ত্তিভেদ বইত কিছুই নয়।" এই সব চিন্তায় কাতর হইয়া, সেইদিনই তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে শেঠগৃহে উপস্থিত হইলেন। শেঠেরা তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া, বাষ্পাকুললোচনে মহাসমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। আর তিনি শেঠবাড়ীতে মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রসন্নমুখে স্বগৃহে চলিয়া আসিলেন।

গল্পচ্ছলে লালাবাবুর জীবনের অনেক কথা, আজও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ ভক্তমালের বঙ্গানুবাদকারী, পবিত্রচেতা কৃষ্ণদাস বাবাজী, লালাবাবুর ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু ছিলেন বলিয়া একটা প্রবাদ শোনা যায়।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি লালাবাবুর এত গভীর অনুরাগ ছিল যে, তাহা একরূপ গোঁড়ামীতে পরিণত হইয়াছিল। যখন বজরা করিয়া গঙ্গার উপর দিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন, সেই সময়ে মহাপবিত্র শাক্ততীর্থ বারাণসীতে অবতরণ করেন নাই। পাছে নদীগর্ভ হইতে বারাণসীর কায়া দেখিতে হয়, এজন্য ভৃত্যদিগকে তাঁহার বজরার জানালার পর্দ্দাগুলি ফেলিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, এইজন্য তাঁহার অপঘাত মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুকাহিনীর প্রবাদটীও অতি অদ্ভুত। একজন দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলেন যে, "ক্ষুরে" তাঁহার অপমৃত্যু হইবে। এজন্য এই অতর্কিত অপঘাত মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য, তিনি ক্ষৌরকর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। কিন্তু ভাগ্য-রেখার শক্তি অতিক্রম করিবার ক্ষমতা ত ক্ষুদ্র মানবের নাই। একদিন লালাবাবু বৃন্দাবনের

রাজপথে ভিক্ষার্থে বাহির হইয়াছেন। তখন তিনি মৌনাব্রতাবলম্বী সন্ন্যাসী মাত্র। কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহেন না। সেই সময়ে, গোয়ালিয়ারের মহারাণী, রাজপথ দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে লোকজন এবং অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। লালাবাবুর ধর্ম্মময় জীবনের কথা শুনিয়া, তিনি তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য, বহুদিন হইতেই ব্যগ্র ছিলেন। রাণী পাল্কী হইতে নামিয়া, পদ বন্দনার জন্য, লালাবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হন। লালাবাবু রাণীকে পদস্পর্শ করিতে দিবেন না এই ভাবিয়া, যেমন পশ্চাৎ দিকে হটিয়া যাইবেন—সেই সময়ে রাণীর কোন অশ্বারোহীর একটা ঘোড়া সহসা ক্ষেপিয়া উঠায়, তাহার ক্ষুরের আঘাতে তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হন। এই আঘাত, পরিণামে সাংঘাতিক অবস্থা ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া দেয়। অন্য একটী প্রবাদমতে, গিরি-গোবর্দ্ধনের নিভৃত গুহায়, তিনি যোগসাধনে ও ভগবচ্চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন। এই সময়ে একদিন সহসা পিচ্ছিল প্রস্তর-পথে পদস্খলন হওয়ায়, তিনি ভূপতিত হইয়া আহত হন। তাহাতেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে। যাহাই হউক না কেন, লালাবাবুর যে অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছিল এ কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। এই দান-বীর, কর্ম্ম-বীর, ধর্ম্ম-বীর, লালাবাবু বা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ৪০ বৎসর বয়সে, হিন্দুর পুণ্যময় বৈষ্ণবতীর্থে দেহ রক্ষা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বা লালাবাবুর পত্নীর নাম রাণী কাত্যায়নী। রাণী কাত্যায়নীর পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণ। শ্রীনারায়ণ অপুত্রক হওয়ায় দুইটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম রাজা প্রতাপ সিংহ ও রাজা ঈশ্বর সিংহ।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ শ্রীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ দত্তক-পুত্র। রাজা প্রতাপসিংহের আমলে, পাইকপাড়া রাজবংশের যশপ্রভা চারিদিকে প্রচারিত হয়। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ইনি রাজা-বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সি, আই, ই, উপাধিও তিনি লাভ করেন। প্রতাপসিংহও পিতামহের ন্যায় অনেক সৎকার্য্যে দান ধ্যান করিয়া, যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। মেডিকেল-কলেজে ফিভার-হাঁসপাতাল বা জ্বর-রোগীদের আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণার্থে, তিনি প্রচুর মুদ্রাদান করেন। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগেছিয়ার বাগান (Belgachia Villa) একটী সুন্দর রম্যোদ্যান। এখানে আদম এবং ইভের একখানি বহুমূল্য প্রাচীন তৈলচিত্র আছে। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে, আমাদের স্বর্গীয় সম্রাট, সপ্তম এডওয়ার্ড যখন প্রিন্স অব ওয়েলস্

রূপে এদেশে আসেন, তখন এই বেলগেছিয়া-ভিলায়, বঙ্গবাসী ধনী সন্তানগণ তাঁহাকে একটী প্রীতি-ভোজ প্রদান করেন। ধরিতে গেলে, এই বেলগেছিয়া উদ্যানই বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মভূমি। ষ্টেজ বাঁধিয়া সাধারণের সম্মুখে অভিনয় করার চেষ্টা—পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপসিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজা-বাহাদুর স্যর যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টাতেই হইয়াছিল। মাইকেলের অনেক নাটক এই বাগানে প্রথম অভিনীত হয়। বর্ত্তমান প্রণালীর এদেশীয় ঐক্যতানবাদন বা "কনসার্ট" এই বেলগেছিয়ার বাগানেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, গীতবাদ্যাদির বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায়, বেলগেছিয়ার বাগানে "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ৩৯ বৎসর বয়সে, দেহত্যাগ করেন। তাঁহার গিরিশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র নামে চারি পুত্র হয়। শরচ্চন্দ্রের পুত্রের নাম বীরেন্দ্রচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইনি পৈত্রিক বাসস্থান কাঁদিগ্রামে, একটী হাঁসপাতাল পরিচালনার জন্য এক লক্ষ পনের হাজার টাকা প্রদান করেন। কুমার পূর্ণচন্দ্র, ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন ও ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। কান্তিচন্দ্র ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র, কুমার ইন্দ্রচন্দ্র প্রথমে অতি ভোগ-বিলাসী ছিলেন। এক সময়ে সমগ্র কলিকাতা রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য-গরিমা প্রকাশে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। হারিংটান-ষ্ট্রীটে, এক প্রাসাদতুল্য বাটীতে, রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাস করিতেন। ঐশ্বর্য্য-জনিত ভোগ-বিলাসে বিতৃষ্ণা জন্মিলে, তিনিও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ লালাবাবুর মত সংসার-বিরাগী হয়েন। "বোধানন্দনাথ স্বামী" নাম ধারণ করিয়া, জীবনের শেষাবস্থায় তিনি নানাস্থানে সন্ন্যাসী-বেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে, রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের দেহান্ত হয়। এখন কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, তাঁহার বংশের উজ্জ্বল প্রদীপরূপে অবস্থান করিতেছেন।

এই পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কোম্পানীর আমলে একজন ক্ষমতাপন্ন ও গণনীয় লোক ছিলেন। দান, ধ্যান ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা এই রাজবংশের প্রধান কীর্ত্তি। ইতিহাসে গঙ্গাগোবিন্দের সুনাম না থাকিলেও তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ও তাঁহার বংশধরগণের গৌরব-কীর্ত্তি ও দানশৌণ্ডতা, তাঁহার নাম, বঙ্গদেশে

চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কোম্পানীর আমলে, যে সমস্ত শক্তিবান মনস্বী বাঙ্গালী জন্মিয়াছিলেন, বর্ত্তমানকালে তাঁহাদের আদর্শ অতি দুর্লভ। তাঁহাদের দোষও অনেক ছিল, কুকীর্ত্তিও অনেক ছিল, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারা অসীম ক্ষমতাবান ছিলেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ মহারাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, মহারাজ নন্দকুমার রায় প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পাইকপাড়া রাজবংশ সম্বন্ধে বলিবার আরও অনেক কথা থাকিলেও, স্থানাভাবে অতি সংক্ষেপে শেষ করিতে হইল।

নাটোর রাজবংশ।

ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব কামদেব রায়, লস্করপুর পরগণার মৌজা নাটোরে বাস করিতেন। তিনি নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে বারাইহাটীর তহশীলদার নিযুক্ত হন। এই নরনারায়ণ, পুটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কামদেবের তিন পুত্র—রামজীবন, রঘুনন্দন, ও বিষ্ণুরাম। ইহাঁদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠটী কামদেবের জীবিতাবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। রঘুনন্দন, প্রথমে দর্পনারায়ণের (নরনারায়ণের কনিষ্ঠভ্রাতা) মোক্তার ছিলেন, পরে মুসলমানদিগের আইন-কানুনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, তিনি নায়েব-কানুনগো হন। অতঃপর তিনি নবাব মুরশীদকুলী খাঁর রায়রায়ান এবং দেওয়ানের অর্থ-সচিব পদ লাভ করেন। সরকারী জমির বন্দোবস্তে এবং অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায়, তিনি নবাব সরকার হইতে রাজা উপাধি এবং জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রাজা রঘুনন্দন, এই সম্পত্তিটী তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামজীবনকে প্রদান করেন। রামজীবনও ১৭০৪ খৃঃ অব্দে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। কালক্রমে, তিনি ভিতারিয়ার জমিদার রামকৃষ্ণ, বনগাছি পরগণার চৌধুরী ভগবতী ও গণেশনারায়ণ, রাজসাহীর জমিদার রাজা উদিতনারায়ণ, ভূষণার জমিদার রাজা সীতারাম রায় প্রভৃতির জমিদারীর উত্তরাধিকারী না থাকাতে, অথবা রাজস্ব প্রদানের অসামর্থ্যের জন্য, সেগুলি নিজের জমিদারীভুক্ত করেন। অবশেষে এই জমিদারী এত বিস্তৃত হইয়া উঠে, যে বঙ্গের সমস্ত প্রধান প্রধান জেলায় এমন কি মুঙ্গের এবং ভাগলপুরেও রামজীবনের অধিকার বিস্তৃত হয়। ইহার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ প্রায় দুই কোটী টাকা এবং মুসলমান রাজসরকারে দেয় রাজস্বের পরিমাণ ৫২,০০০৲ ৫৩,০০০৲ টাকা ছিল।

১৭০৬ অব্দে রাজা রামজীবন দিল্লীর সম্রাট, বাহাদুর-সাহের নিকট হইতে, রাজাবাহাদুর উপাধির সনন্দ ও অসংখ্য খিলাত লাভ করেন এবং রাজচ্ছত্র, দণ্ড, জয়ঢক্কা প্রভৃতি ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। রাজা রামজীবন এবং রাজা রঘুনন্দন উভয়েই তাঁহাদের জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্য রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জমীদারী মধ্যস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ শাসনভারই স্বহস্তে লইয়াছিলেন। এক কথায় তাঁহারা তখন বঙ্গদেশের একাংশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। রাজা রামজীবনের পত্নী; রামকান্ত রায়কে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রাজা রামকান্তও মৃত্যুকালে নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার দুই শিশু পুত্র তাঁহার জীবিতকালেই দেহত্যাগ করে। এই রামকান্তের পত্নীই বঙ্গবিশ্রুতা মহারাণী ভবানী। মহারাণী ভবানী, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর ৫৮ বৎসর জীবিতা ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকাহিনী কেবল বাঙ্গালায় নহে, ভারতের অধিকাংশ স্থানেই আবালবৃদ্ধ বনিতার পরিচিত। কথিত আছে, এই প্রাতঃস্মরণীয়া, বঙ্গমহিলা পুণ্যকার্য্যে এবং দানে, পঞ্চাশ কোটীরও উপর টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পোষ্যপুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ, সাবালক হইয়া সমস্ত জমিদারীর পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং সম্রাট শাহ-আলমের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ-পৃথ্বীপতি-বাহাদুর" উপাধিপ্রাপ্ত হন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে, চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সময়ে, স্বকীয় জমিদারীর অধীনস্থ তালুকদারগণের ব্যবহারে বীতরাগ হইয়া, মহারাজা রামকৃষ্ণ জমিদারীকার্য্যে অমনোযোগী হইয়া পড়েন এবং সমস্ত মনোযোগ ধর্ম্মার্জ্জনে উৎসর্গ করেন। এই অবসরে তাঁহার ভৃত্যগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া স্ব স্ব ভাগ্যগঠনে সচেষ্ট হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জমিদারী সংস্থাপনও করিয়াছিলেন। এই শেষোক্তগণের মধ্যে নড়াল রাজবংশের কালীশঙ্কর রায় এবং দীঘাপতিয়া রাজবংশের দয়ারাম রায়ই প্রধান। ইহাঁরা উভয়েই নাটোর-রাজবংশের দেওয়ান ছিলেন।

রাজা রামকৃষ্ণের এই ঔদাসীন্য দেখিয়া, মহারাণী ভবানী পুনরায় জমিদারীকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নবাব সরকার তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। এই সময়েই তাঁহার সুবিশাল

জমিদারী কতকগুলি পরগণা ও ডিহিতে বিভক্ত হইয়া বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।*

মহারাজা রামকৃষ্ণ ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুই পুত্র কুমার বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। এই সময়ে জমিদারীর আয় মাত্র ২৭,০০,০০০৲ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। মহারাজা রামকৃষ্ণ তাঁহার জমিদারী পূর্ব্বেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ মহারাজা বিশ্বনাথ ১৮,০০,০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং কনিষ্ঠ মহারাজা শিবনাথ সমস্ত দেবোত্তর ও লাখেরাজ জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর অংশের বার্ষিক মোট লাভ ৯,০০,০০০৲ টাকা। মহারাজা বিশ্বনাথ ও মহারাজা শিবনাথ উভয়েই বিষয়কার্য্যে অত্যন্ত অমনোযোগী ছিলেন, কাজেই তাঁহাদিগের জমিদারীর অবস্থা উত্তরোত্তর দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল।

মহারাজা বিশ্বনাথ, নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী মহারাণী কৃষ্ণমণি, মহারাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র, সাবালক হইবার অল্পদিন পরেই দেহ-ত্যাগ করেন। তিনিও নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পত্নী মহারাণী শিবেশ্বরী, মহারাজা গোবিন্দনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। মহারাজা গোবিন্দনাথও অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করায়, তাঁহার পত্নী জগদীন্দ্রনাথ রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কুমার জগদীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে, "মহারাজা" উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনিই এক্ষণে নাটোর রাজবংশের বড় তরফের উজ্জ্বল কোহিনুর।

অনারেবল মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ, একজন সাহিত্যসেবী। লাট-কৌন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়া তিনি দেশের হিতসাধন করিতে সর্ব্বদাই অগ্রসর। নানাবিধ লোক হিতকর সভাসমিতিতেও তিনি মহোৎসাহে যোগদান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি "মানসী" পত্রিকার সম্পাদকীয়

* ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলেন—ভুষণার তালুকই বহুবিধ পরগণায় বিভক্ত হইয়া বিক্রয় হইয়া যায়। নলদী, সাহজালাল, সাতোড় মুকিমপুর প্রভৃতি বড় বড় তালুকগুলিও এই দশা প্রাপ্ত হয়। আড়পাড়ার বড় তালুকখানি গোবরডাঙ্গা জমীদার বংশের আদিপুরুষ খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্রয় করেন। ঠাকুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ গোপীমোহন ঠাকুর, কানেশাপুর ডিহি সারুপুর তালুক কিনিয়া লয়েন। (Westland's Jessore. p. 63.)

ভার গ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের মধ্যে বাণীর এরূপ একান্ত সেবক অতি অল্পই আছেন।

মহারাজা শিবনাথের কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার বিধবা পত্নী, কুমার আনন্দনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইনিও নানা সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। ১৮৪৭ অব্দে রাজা আনন্দনাথ, তাঁহার পিতামহের অধিকৃত "মহারাজাধিরাজ-পৃথ্বীপতি-বাহাদুর" উপাধি লাভ করিবার নিমিত্ত সরকার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ১৮৬৬ অব্দের জুন মাসে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C. S. I. উপাধি প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরেই রাজসাহী-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার অন্যান্য সৎকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা-বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। রাজা আনন্দনাথ, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার চারিপুত্র—কুমার চন্দ্রনাথ, কুমার কুমুদনাথ, কুমার নগেন্দ্রনাথ ও কুমার যোগেন্দ্রনাথ রায়। কুমার চন্দ্রনাথ রায় ১৮৬৯ অব্দে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের জীবদ্দশায় তাঁহার দুইভ্রাতা কুমার কুমুদনাথ রায় ও কুমার নগেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু হয়। রাজা চন্দ্রনাথও নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর ছোট তরফের সমস্ত সম্পত্তি কুমার যোগেন্দ্রনাথেরই অধিকারে আইসে। যোগেন্দ্রনাথের পুত্রের নাম কুমার যতীন্দ্রনাথ।

নদীয়া রাজবংশ।

(মহারাজ-রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়।)

নদীয়া রাজবংশের রায়-রাজগণ, স্বনাম প্রসিদ্ধ মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের মধ্যে, ভট্টনারায়ণ পুত্র নিপূ হইতে তাঁহাদিগের বংশ গণনা করেন।

আদিশূর তাঁহাকে যে কয়খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, ভট্টনারায়ণ—সেই কয়টী এবং তাঁহার স্বক্রীত গ্রামগুলি একত্র মিলাইয়া, একটী জমিদারী গঠিত করিয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণের অধঃস্তন ত্রয়োদশ পুরুষোদ্ভূত—বিশ্বনাথ প্রথমে গৌড়াধিপতির নিকট কর্ম্ম প্রার্থী হইয়া গমন করেন। গৌড়েশ্বর তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাৎসরিক কর প্রদানে স্বীকৃত করাইয়া লইয়া, নদীয়ার রাজপদ ও কাঁকদি প্রভৃতি পরগণা

প্রদান করেন। ইঁহার অধস্তন পুরুষগণের নাম—রামচন্দ্র, সুবুদ্ধি, ত্রিলোচন, কংসারি, ষষ্ঠীদাস ও কাশীনাথ। কাশীনাথের আমলে কোন এক সময়ে, সম্রাট্ আকবরের নিকট করস্বরূপে, ত্রিপুরারাজ কয়েকটী হস্তী উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কথিত আছে, এই হস্তীযুথের মধ্যে, একটী হস্তী সহসা উন্মত্ত হইয়া নদীয়ার অধিবাসিগণের বিস্তর অনিষ্ট করায়, রাজা কাশীনাথ তাহাকে হত্যা করেন। প্রবাদ আছে, যে কাশীনাথের দ্বারা বাদসাহী হস্তী নিহত হওয়ায়, নবাব তাঁহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন। যাহাই হউক, এই সময়ে কাশীনাথের পত্নী অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। তিনি, পলায়ন করিয়া—হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেইখানেই এক পুত্র প্রসব করেন।

এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষা ও স্বভাবচরিত্র গুণে হরেকৃষ্ণের প্রিয় হওয়াতে, হরেকৃষ্ণ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে পোষ্যপুত্র লইয়া পলাসী ও জলাঙ্গীর মধ্যবর্ত্তী জমিদারী প্রদান করিয়া যান। এই সময় হইতে রাম—রামচন্দ্র সমাদ্দার নামে অভিহিত হইতে থাকেন। রাম-সমাদ্দারের চারি পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস, মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে কানুনগো পদে নিযুক্ত হন এবং ভবিষ্যতে "মজুমদার ভবানন্দ" উপাধি প্রাপ্ত হন। মজুমদার ভবানন্দ দুর্গাদাস, উপাধি ও কানুনগো পদ হইতে অবসর লইয়া, বল্লভপুরে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং কুড়ি বৎসর ধরিয়া তাঁহার পিতার জমিদারী শাসন করেন। ভবানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ—হরিবল্লভ, জগদীশ ও সুবুদ্ধি, ফতেপুর, কোদালগাছি ও পাটকাবাড়িতে তাঁহাদিগের আবাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। ভবনান্দ, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সময়ে মানসিংহকে সাহায্য করায়, সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে নদীয়ার রাজপদ পুনঃপ্রদান করেন এবং তৎসহ "মহারাজা" উপাধিও দান করেন। ইতিপূর্ব্বে এই রাজপদ, তাঁহার পিতামহ কাশীনাথের মৃত্যুর পর বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে মানসিংহের সহায়তায় ভবানন্দ মহৎপুর, নদীয়া, সুলতানপুর প্রভৃতি চৌদ্দখানি পরগণা জমীদারীরূপে প্রাপ্ত হন। (১৬০৬ খ্রীঃ অব্দ)।

মহারাজ ভবানন্দ, মাটিয়ারী ও দিনলিয়াতে দুইটী নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ভবানন্দ প্রথমে তাঁহার রাজ্য, তিন পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দরামের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, এই প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করায়, মহারাজা

ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলেন—"তুমি নিজের জন্য জমীদারী অর্জ্জন করিয়া লও।" এইজন্য তিনি গোপালকে তাঁহার জমীদারী দান করিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ, দিল্লীর সম্রাটের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় প্রার্থনা অবগত করান এবং সম্রাটও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কুশদহ ও উখুড়া পরগণা প্রদান করেন।

ভবানন্দ মজুমদারের মৃত্যুর পর গোপাল ও গোবিন্দরাম তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ব্যতীত, পিতার নিকট হইতে কিছুই লয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও গোবিন্দরাম নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন, কিন্তু গোপালের রাঘব নামে এক পুত্র ছিলেন। পরে তিনিই সমগ্র রাজ্যলাভ করেন।

গোপালের মৃত্যুর পর, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব, ভ্রাতৃদ্বয়কে যথাযোগ্য পিতৃসম্পত্তির অংশ দিয়া, মাটিয়ারি হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই পল্লীতে, সে সময় গোয়াল্লা প্রভৃতি অশিক্ষিত জাতি বাস করিত। রাঘবের আমলে এই স্থানে ব্রাহ্মণের বসবাস হয়। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট ব্রহ্মোত্তর লইয়া এই স্থানে বসবাস করায়, ইহা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান হইয়া উঠে।

রাঘব, রেউই গ্রামে এক সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহা শিবের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁহার পুত্র—রুদ্র রায়, রেউইএর নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া কৃষ্ণনগর রাখেন এবং সেখানে একটী নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। তিনি সাধারণের প্রভূত উপকার করায় পুরস্কার স্বরূপ দিল্লীর-সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজা" উপাধি, কয়েকটী পরগণা এবং তাঁহার প্রাসাদের উপর রাজকীয় বিশিষ্ট সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ, একটী "কাঙ্গড়া" নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি লাভ করেন। ইহার পরিবর্ত্তে মহারাজা রুদ্ররায় এক সহস্র গাভী, তাঁহার নিজের ওজনের পরিমাণ স্বর্ণ এবং অন্যান্য অনেক মূল্যবান সামগ্রী দিল্লী দরবারে নজররূপে প্রেরণ করেন।

রাঘবের দুই পুত্র। তাঁহাদের নাম রুদ্ররায় ও প্রতাপনারায়ণ রায়। রুদ্র রায় তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধিশালী থাকায়, পিতার মৃত্যুর পর প্রকারান্তরে সমস্ত জমীদারী দখল করেন। ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে ১৬৭৬ খ্রীঃ অব্দে ফারমান পাইয়া, তিনি মহাসমারোহের সহিত রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। এই ফারমানে বাদসাহের অনুগৃহীত ব্যক্তিরূপে তিনিও নিজের রাজপ্রাসাদের উপর "কাঙ্গড়া" নির্ম্মাণ করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন।

রুদ্ররায়ের আমলে, তাঁহার নবস্থাপিত রাজধানীর যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি ঢাকা হইতে কারিগর আনাইয়া সুন্দর চক ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান। কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত এক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দিয়া, তিনি সাধারণের যাতায়াতের কষ্টমোচন করেন।

রুদ্ররায়ের দুই মহিষী। জ্যেষ্ঠার গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং কনিষ্ঠার গর্ভে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। পৈত্রিক জমীদারী লইয়া রামচন্দ্র ও রামজীবনের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছিল। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর, রামজীবন জমীদারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু জমীদারী তাঁহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণ, নবাবের সহিত কৌশল করিয়া, তাঁহাকে ঢাকায় কারারুদ্ধ করান ও পৈত্রিক জমীদারী দখল করেন। এই রামকৃষ্ণের সময়ে, শোভাসিংহের বঙ্গবিপ্লবকারী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

শোভাসিংহের দলভুক্ত বিদ্রোহী, হিম্মৎ সিং রামকৃষ্ণের আমলে নদীয়া-রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। সম্রাটপুত্র আজিম-উসান, হিম্মৎখাঁকে দমন করিবার জন্য যখন বর্দ্ধমানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। এই সময়ে রামকৃষ্ণও কলিকাতার তৎকালীন ইংরাজ শাসনকর্ত্তার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করায়, ইংরাজেরা রামকৃষ্ণের অধীনে অনেক সৈন্য রাখিয়া দেন। রামকৃষ্ণের প্রতি আজিম-উসানের এই অনুগ্রহে, মুরশীদকুলী জাফর খাঁ বিরক্ত হন এবং ছল করিয়া তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া গিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

রামকৃষ্ণ, কারাগারে বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে আজিম উসান অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, জাফরখাঁকে লিখিয়া পাঠান—"নদীয়া-রাজ্য অবিলম্বে রামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হউক।" কিন্তু রামকৃষ্ণের অন্য উত্তরাধিকারী না থাকায়, তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনকে কারামুক্ত করিয়া উক্ত রাজ্য প্রদান করা হয়। জাফর খাঁ, রামজীবনকে এক সময়ে তাঁহার দেয় বার্ষিক সরকারী খাজনার হিসাব করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে ডাকিয়া পাঠান। এই মুর্শিদাবাদেই রামজীবনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রঘুরাম রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরেই জাফর খাঁ কর্ত্তৃক তিনি মুর্শিদাবাদে বন্দী হন। রঘুরাম অতি অসমসাহসী বীরপুরুষ ছিলেন বলিয়া, তিনি রঘুবীর বলিয়া সাধারণে পরিচিত। নবাব

মুরশীদকুলী খাঁর আমলে, তিনি রাজসাহীর রাজার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির কার্য্য করিয়া নবাবকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু জমীদারীর রাজস্ব বাকী ফেলায়, ভবিষ্যতে তিনি নবাব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। রঘুরামের যথেষ্ট দানশীলতা ছিল। তিনি পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের উপর বিরক্ত থাকায়, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র, দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে অনুমতি পত্র আনাইয়া, পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হন।"

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় নামক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই উপলক্ষে, তাঁহার বিশলক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই যজ্ঞসভায়, সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সমেত হইয়া তাঁহাকে "অগ্নিহোত্রী-বাজপেয়ী-শ্রীমান্ মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়" উপাধি প্রদান করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, একদা মৃগয়া ব্যাপদেশে বর্ত্তমান শিবনিবাস নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং এই স্থানের সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হইয়া, তথায় একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং নদীয়া, কুমারহট্ট, শান্তিপুর ও ভাটপাড়া এই চারিটী পণ্ডিতসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহু সহস্র বিঘা নিষ্কর জমী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকত্বে যে সমস্ত পণ্ডিত অবস্থান করিতেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি সুবিখ্যাত। শ্রীকান্ত, কমলাকান্ত, বলরাম, শঙ্কর, দেবল, মধুসূদন, রামপ্রসাদ সেন, বিখ্যাত কবি ভূমেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, নৈয়ায়িক শরণ তর্কালঙ্কার ও জ্যোতির্ব্বিৎ অনুকূল বাচস্পতি। নৈয়ায়িক কালিদাস সিদ্ধান্ত তাঁহার সভাপণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, হুগলীর অন্তর্গত সুগন্ধোর গোবিন্দরাম রায় রাজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। চরকে তাঁহার অসীম বুৎপত্তি ছিল। তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম আগমবাগীশ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তন্ত্রসার রচয়িতা। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে কালীপূজা, এবং কালীপূজার রাত্রিতে পথ ও বাটী প্রভৃতি আলোকিত করিবার প্রথা প্রচলিত করেন। এই প্রথা এক্ষণে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আগমবাগীশ নামে অভিহিত হইতেন। কৃষ্ণচন্দ্রই, বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। তাহার সভার আর একটী উজ্জ্বল রত্ন—অন্নদামঙ্গল রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র। সঙ্গীত ও স্থপতিবিদ্যার উন্নতি সাধনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। বারাণসীর জ্ঞানবাপীর মধ্যে সুবৃহৎ অবতরণিকা

শ্রেণী তিনিই নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহার সময়ে, তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে হিন্দুসমাজের নেতৃত্বস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

মহারাজা রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের সময়ে নদীয়া রাজ্যের যশ ও প্রতিপত্তি এবং আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কবি ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গলে প্রকাশ—

রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশীদাবাদ
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথীথাদ।
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার
পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুর বড়গঙ্গাপার।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চারি সমাজের অর্থাৎ নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ ও কুশদ্বীপের কর্ত্তা ছিলেন। নদীয়া জেলার এমন কোন ব্রাহ্মণ নাই, যিনি মহারাজ বাহাদুরের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর পান নাই। অপরিসীম দানশীলতার জন্যই নদীয়ারাজ্যের রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই এক এক সময়ে সরকারী সদর-মালগুজারি দিতে অপারক হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবাব কর্তৃক কারারুদ্ধ হইতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের একখানি দানপত্র স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার সমসাময়িক রাণী ভবানীর মত দানশীলতার জন্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেন। নবদ্বীপের গৌরব রবি, তাঁহার সময়েই পুনরায় প্রবল তেজে জ্বলিয়া উঠে। আবার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

শান্তিপুরের লক্ষ্মীতলা-পাড়ায় সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত, রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মহারাজের গুরু ছিলেন। কোন কারণে রাজার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায়, তিনি তাঁহার সাহচর্য্য ত্যাগ করেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনকালে, বাঙ্গালার রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া আসিয়াছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরাজগণের বিবাদকালে, তিনি নবাব কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, ইংরাজগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরাজগণকে যে অমূল্য সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ লর্ড ক্লাইভ তাঁহাকে "রাজেন্দ্র-বাহাদুর" উপাধি এবং পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত বারটী কামান উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। এই কামানগুলি আজিও নদীয়ার রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলে,

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্র, মেয়াদী বন্দোবস্ত অনুসারে বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। শিবচন্দ্রও পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক এবং সুবিদ্বান ছিলেন। নিয়মিত সময়ে সরকারী রাজস্ব না দিতে পারায়, শিবচন্দ্রের আমলেও অনেক বিষয় হস্তান্তর হইয়া যায়। এজন্য তিনি ভগ্নহৃদয়ে ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। মহারাজ শিবচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ইহাঁর দানশীলতা সুবিখ্যাত।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময়, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ প্রণোদিত দশশালা-বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র, আপন জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র ব্যতীত আর সকল পুত্রের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। তাঁহারা এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু দশশালা-বন্দোবস্ত প্রচলনের পর, পৈতৃক-জমীদারীর অংশ পাইবার জন্য তাঁহারা আদালতে নালিস রুজু করিয়া দেন। এই মোকদ্দমার খরচ জোগাইতে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায়, নদীয়া রাজের বহু মূল্যবান সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিষয়কর্ম্মে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। বড়ই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া, তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। ঈশ্বরচন্দ্র, অঞ্জনা নদীতীরে, শ্রীবন নাম দিয়া এক সুরম্য হর্ম্ম নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানেই তিনি আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত থাকিতেন। পরিশেষে উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া বহুদিন অজ্ঞানাবস্থায় থাকার পর ৫৫ বর্ষ বয়সে (১৮০২ খ্রীঃ) লোকান্তর গমন করেন। সারদামঙ্গল প্রণেতা বিনয় বাক্‌পতি নামক এক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। (বিশ্বকোষ) রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় প্রায় অর্দ্ধেক জমীদারী তাঁহার হস্তবহির্ভূত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্রও পিতার ন্যায় অপব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার আমলে ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে, নদীয়া রাজের একটী মূল্যবান জমীদারী, উখ্‌ড়া পরগণা, কোম্পানী বাহাদুরের প্রাপ্য বাকী খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া যায়। আত্মীয় স্বজন ও বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীদের দোষে এই সব হইতেছে এরূপ একটা সংস্কার জন্মাইবার পর, তিনি সংসার বিরাগী হইয়া পড়েন। তাহার বুদ্ধির দোষে চুরাশী পরগণার নদীয়া রাজ্য, পাঁচ সাতখানি পরগণায় পর্য্যবসিত হয়। নবদ্বীপে তিনি দুইটী বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার একটীতে কালীমূর্ত্তি ও অপরটীতে শিবমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

গিরীশচন্দ্রের রাজত্বকালে কবি "রসসাগরের" বা কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর যশোরাশি চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। ১২৪৮ সালে অগ্রহায়ণ মাসে রাজা গিরীশচন্দ্র

মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পোষ্য-পুত্র কুমার শ্রীশচন্দ্র রায় নদীয়া রাজের উত্তরাধিকারী হন।

শ্রীশচন্দ্র, স্বীয় চেষ্টায় উখড়া পরগণার কতকাংশ উদ্ধার করেন। তিনি পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং হিন্দু সঙ্গীতের উৎসাহদাতা ছিলেন। নানাবিধ সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া তিনি যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনগর-কলেজের স্থাপনার সময় তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কুমার শ্রীশচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "মহারাজা-বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ৩৮ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্র উত্তরাধিকারী হন। রাজা সতীশচন্দ্র ১৮৭০ অব্দের অক্টোবর মাসে, মসৌরীতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠাপত্নী রাণী ভুবনেশ্বরী ক্ষিতীশচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কুমার ক্ষিতীশচন্দ্র রায় নাবালক থাকায়, রাণীর জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে যায়।

বর্ত্তমানে রাজকুমার ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়, এই ইতিহাসবিশ্রুত নদীয়া-রাজ্যের অধিকারী। মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী সুশিক্ষিত ও সৎকর্ম্মে উৎসাহশীল।

কাশীমবাজার রাজবংশ।

এই সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশ, দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী—ওরফে কান্তবাবু, কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কান্তবাবু বঙ্গের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুগ্রহে প্রচুর বিত্তশালী হইয়া, বিখ্যাত হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে মিঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস, যখন ইংরাজের কাশিমবাজারের বাণিজ্য-কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময় নবাব সিরাজউদ্দৌলা কুঠী আক্রমণ করিয়া হেষ্টিংস প্রভৃতিকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু হেষ্টিংস কোন উপায়ে পলায়ন করিয়া, কান্তবাবুর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। হেষ্টিংসের এই দুঃসময়ে, কান্তবাবু তাঁহার কলিকাতায় পলায়নের উপায় করিয়া দেওয়ায় এবং নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখায়, হেষ্টিংস তাঁহার প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ হন। অতঃপর ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে যখন তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, তখন কান্তবাবুকে তাঁহার দেওয়ানের পদ প্রদান করেন।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী, গবর্ণমেণ্টের নানাকার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করায় এবং অসাধারণ রাজভক্তির পরিচয় দেওয়ায়, মিঃ হেষ্টিংস তাঁহাকে গাজীপুর ও আজিমগড় জেলায় অবস্থিত "জুহা-বেহারা"

নামক একটী জায়গীর এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথকে "রাজা-বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত, ১১৯৫ সালের পৌষ মাসে ইং ১৭৮৮ অব্দে, পুত্র লোকনাথকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া দেহত্যাগ করেন।

রাজা লোকনাথ নন্দী বাহাদুর, পিতার মৃত্যুর পর ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে শেষ কয়েক বৎসর দুরারোগ্য কঠিন রোগে ভুগিয়া, তিনি ১২১১ সালের বৈশাখ, (ইং ১৮০৪ খ্রীঃ) অব্দে পরলোক গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র কুমার হরিনাথ এক বৎসরের শিশু। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে কুমার হরিনাথ সাবালক হন এবং ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে, লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ দানশীল ছিলেন। তাঁহার অসংখ্য দানের মধ্যে, হিন্দুকলেজ স্থাপনের জন্য ২০,০০০৲ টাকা দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১২৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, (ইং ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন।

১২৪৭ সালে, ইং ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে কুমার কৃষ্ণনাথ সাবালক হন এবং পর বৎসর, লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে, রাজা-বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা কৃষ্ণনাথ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং দানশীল ছিলেন। এক সময়ে স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র C. S. I. কে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেন।

রাজা কৃষ্ণনাথ বাহাদুর, ভাগ্যলিপিফলে, ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের ৩১ অক্টোবর তারিখে আত্মহত্যা করেন। রাজার মৃত্যুর পর কাশিমবাজার রাজবংশের সমস্ত সম্পত্তি, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী রাজা কৃষ্ণনাথের উইলের বলে, স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন। রাজা কৃষ্ণনাথের বিধবা পত্নী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, সামান্যমাত্র স্ত্রীধনের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন।

যাহা হউক অল্পদিন পরেই মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বামীর সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর বিরুদ্ধে সুপ্রীম-কোর্টে এক মোকদ্দমা রুজু করেন। পরিত্যক্ত সম্পত্তির উইল প্রস্তুতকালে, রাজা কৃষ্ণনাথের অব্যবস্থিত-চিত্ততা প্রমাণ হওয়ায়, মহারাণীই এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন। এই সময়ে কাশিমবাজার রাজবংশের জমিদারীর ভয়ানক দুরবস্থা ঘটে। কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে এবং তাঁহার দেওয়ান রাজীব-

লোচন রায় বাহাদুরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিষয়কর্ম্মে অসামান্য দক্ষতায়, কিছুদিনের মধ্যেই জমিদারীর অবস্থা পুনরায় উন্নত হইয়া উঠে।

মহারাণী স্বর্ণময়ী C. I. ১২৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, ইং ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতাকুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৫ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে) তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার বিশাল জমিদারী বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজপুর, মালদহ, রঙ্গপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া, বর্দ্ধমান, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণায় এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গাজীপুর ও আজিমগড় জেলায় বিস্তৃত। কলিকাতা এবং সহরতলীতেও তাঁহার প্রচুর সম্পত্তি আছে। রঙ্গপুর জেলার সুবিখ্যাত "বাহারবন্দ-পরগণা" তাঁহার বৃহত্তম জমিদারী এবং তাঁহার নদীয়ার জমিদারীরও একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইতিহাস-বিখ্যাত পলাসীর প্রান্তর, এই জমিদারীর অন্তর্গত।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর ঐকান্তিক রাজভক্তি, সাধারণের উপকারের জন্য নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অসীম দানশীলতার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "মহারাণী" উপাধি প্রদান করেন। সেই বৎসরেই ১৩ই অক্টোবর তারিখে, কাশিমবাজার রাজবাটীতে একটী দরবার অনুষ্ঠান করিয়া বিভাগীয় কমিশনার মিঃ মোলোনি তাঁহাকে রাজকীয় সনন্দ প্রদান করেন।

১৭৮৪ অব্দের মহা দুর্ভিক্ষের সময়, মহারাণী স্বর্ণময়ীর অকাতর দান ও দুর্ভিক্ষক্লিষ্টের জীবনরক্ষাকল্পে অক্লান্ত আত্মত্যাগে প্রীত হইয়া, গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে ১০ই মার্চ্চ তারিখে ঘোষণা করেন, "মহারাণী স্বেচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকেই উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করুন না কেন, তাঁহাকেই মহারাজা উপাধি প্রদান করা হইবে।" অতঃপর তাঁহার বদান্যতায় অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া, ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C. I. নামক সম্মানজনক উপাধি (Member of the Imperial Order of the Crown of India.) দান করেন। সেই বৎসরের ১৪ই আগষ্ট তারিখে, কাশিমবাজার রাজবাটীতে দরবার করিয়া প্রেসিডেন্সী-বিভাগের কমিশনার মিঃ পীকক, এই গৌরবান্বিত বঙ্গমহিলাকে রাজ সম্মানের নিদর্শন প্রদান করেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী ব্যতীত আর কোন বঙ্গ-মহিলাই এই উচ্চ সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই।

এই দরবারে মিঃ পীকক যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে

মহারাণী স্বর্ণময়ীর অসংখ্য দানের একটী হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাব অনুসারে ১৮৭৬-৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার দানের পরিমাণ একাদশ লক্ষ টাকা। ১৮৭৮ অব্দের ২২শে আগষ্ট তারিখের ইংলিশম্যান পত্রিকা কমিশনার পীককের অভিভাষণ ও এই বিস্তৃত দানের একটী তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অসংখ্য দানের মধ্যে, যে কয়েকটীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইতে এই দান পরিমাণ আরও কয়েক লক্ষ টাকা বেশী হয়। এই সমস্ত ঘটনা হইতেই মহারাণীর অসাধারণ দানশীলতার ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর এই সকল সদ্‌গুণের পূর্ণবিকাশের সহায়তা কল্পে তাঁহার মনস্বী দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহারই দূরদর্শিতা ও বিষয়কার্য্যে পারদর্শিতাই মহারাণীকে এতদূর গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ী এখন স্বর্গবাসিনী এবং বঙ্গদেশে আর যে তাঁহার ন্যায় দানশীলা রমণী জন্মিবে তাহারও সম্ভাবনা নাই।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারী আমাদের বাঙ্গালী জমীদার কুলরত্ন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় উদার হৃদয়, মনস্বী ও দানশীল উত্তরাধিকারীর আমলে কাশিমবাজার রাজবংশের পূর্ব্বগৌরব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, গৌরবান্বিতা মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভাগিনেয়। ইঁহার পিতৃদেবের নাম নবীনচন্দ্র নন্দী। মাতার নাম গোবিন্দসুন্দরী। গোবিন্দসুন্দরী রাজা কৃষ্ণনাথের ভগ্নী। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র শ্যামবাজারে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেহান্ত ঘটিলে, উত্তাধিকারীর অভাবে, কাশীমবাজার রাজষ্টেট্ রাণী হরসুন্দরীতে গিয়া অর্শে। কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধা, তীর্থবাসিনী রাণী হরসুন্দরী, এই বিষয় উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় তাঁহার দৌহিত্র, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে অর্পণ করেন। মহারাণীর উত্তরাধিকারীকে গবর্ণমেণ্ট মহারাজ উপাধিদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এজন্য মণীন্দ্রচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "মহারাজ-বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গদীতে আরোহণ করেন।

এই বহুবিশ্রুত দানশীল রাজবংশের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ইহার গৌরব-কীর্ত্তি আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সরলচিত্ত, সুবিনয়ী, সুপণ্ডিত সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে উৎসাহদাতা, ঐশ্বর্য্য-গৌরবে আড়ম্বর শূন্য, জমীদার বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। মহারাজ

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাঁহার কর্ম্মগুণে ও দানশীলতার জন্য, একজন প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাত্মারূপে গণ্য।

বিষয় কর্ম্মে মহারাজের খুব দক্ষতা। জমীদারী সম্বন্ধে সকল কার্য্যই ইনি নিজের চোখে দেখিয়া থাকেন। এজন্য জমীদারী ও বিষয় সম্পত্তিরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মহারাজ নিজে একজন সাহিত্য-সেবী, সুতরাং বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীগণ ইহাঁর নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মিলন, কাশীমবাজার রাজবাটীতেই হয়। মহারাজ এই সময়ে একটী সময়োচিত অভিভাষণ পাঠে, সমাগত বিশ্বমণ্ডলীকে আবাহন করিয়াছিলেন। তাঁহারই দান-প্রদত্ত জমীতে, বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদের বর্ত্তমান প্রাসাদতুল্য বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বাহাদুর, লাটকৌন্সিলের একজন গণনীয় সদস্য। যাহাতে দেশের ও দশের হিতসাধন হয়, এরূপ সৎকার্য্যে দান করিতে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। নিজের আদর্শ চরিত্রের জন্য, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বিনয় সৌজন্যমণ্ডিত, রাজশ্রী সমন্বিত মুখমণ্ডল দেখিলে যথার্থই একটা ভক্তির উদ্রেক হয়। মহারাজ পরম হিন্দু, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী" নামক ধর্ম্মসভা ইহাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত।

বর্দ্ধমান রাজবংশ।

নিম্নবঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী বর্দ্ধমান-রাজবংশ, কপূর-ক্ষত্রিয় জাতীয় আবু রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে আবু রায়, পঞ্জাব প্রদেশ হইতে এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, বর্দ্ধমানে বসবাস করেন। এইস্থানে তিনি ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে ফৌজদারের অধীনে চৌধুরী ও কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত হন। আবু-রায়ের পুত্র বাবু-রায়, বর্দ্ধমানের জমীদারী ক্রয় করিয়া তাঁহার বংশের ভবিষ্যৎ প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্রের নাম ঘনশ্যাম রায়, এবং তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়। কৃষ্ণরাম রায় দিল্লীর সম্রাট আলমগীরের নিকট হইতে বাদসাহী-ফারমান লাভ করেন এবং এই সনন্দের সহিত আরও অনেকগুলি জমিদারী লাভ করেন। ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত, চেতোয়া ও বর্দ্দার তালুকদার শোভা-সিংহ, আফগান সর্দ্দার রহিম খাঁর সাহায্য লইয়া বিদ্রোহী হয় এবং রাজা কৃষ্ণরাম

রায়কে হত্যা করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করে। কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র জগৎরাম রায়, ঢাকায় পলাইয়া গিয়া তত্রস্থ শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুর্ব্বৃত্ত শোভা-সিংহ, একসময়ে কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যার মর্য্যাদা নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, সেই সাহসী রাজকুমারী, তাহাকে ছুরিকাঘাতে নিহত করেন। পরিশেষে শোভাসিংহের সৈন্যদল বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া হুগলী আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই বিদ্রোহ সময়ে—সুতালুটীতে ইংরাজগণ, চন্দননগরে ফরাসীগণ এবং চুঁচুড়ায় ওলন্দাজগণ বিদ্রোহীগণের ভয়ে ভীত হইয়া, তাহাদিগের বাণিজ্য কুঠীগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য, নবাব নাজিমের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া এবং নবাবের অনুমতিক্রমে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। শোভাসিংহের বিদ্রোহের পূর্ণবিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি।

শোভাসিংহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, জগৎরাম রায় ঢাকা হইতে ফিরিয়া আইসেন এবং বিনাকষ্টে পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন। সম্রাট আলমগীর, তাঁহাকে একখানি নূতন ফারমান প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৭০২ খৃঃ অব্দে জগৎরাম গুপ্তশত্রুর হস্তে নিহত হন। তাঁহার দুই পুত্র, কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ও মিত্ররাম রায়। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠই, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনিও দিল্লীর-সম্রাটের নিকট হইতে "ফারমান" প্রাপ্ত হন। নিজের চেষ্টায়, তিনি পৈতৃক জমীদারীতে—চাতুয়ান, ভুরস্থট, বার্দ্দা ও মনোহরসাহী, প্রভৃতি পরগণাগুলি যোগ করেন। তিনি ইহার পর ঘাটালের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রকোণা ও বার্দ্দার রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের রাজ্য এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বালঘরার রাজার নিকট হইতে কয়েকটী জমিদারী কাড়িয়া লন। ভবিষ্যতে তিনি বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সময়েই মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব বা বর্গীর-হাঙ্গাম আরম্ভ হওয়ায়, বিষ্ণুপুর রাজের সহিত সন্ধি করিয়া, উভয়ে একত্রে মারহাট্টাগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন।

মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র চিত্রসেন রায়, পৈত্রিক জমিদারী আরও বর্দ্ধিত করেন। তিনিই প্রথমে, সম্রাট সাহ-আলমের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা চিত্রসেন রায় ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, তাঁহার খুল্লতাত পুত্র

ত্রৈলোক্যচন্দ্র ওরফে তিলকচন্দ্র রায়, তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। সম্রাট সাহ আলমের নিকট তিলকচন্দ্র "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" উপাধি এবং পাঁচহাজারী মন্সবদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মারহাট্টাগণ দেশব্যাপী লুটপাট দ্বারা, প্রজাবর্গের অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়াছিল। ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, সম্রাট শাহ-আলম তাঁহার পুত্র তেজচন্দ্রকে পৈতৃক উপাধি "মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর" প্রদান করেন এবং উক্ত উপাধি তাঁহার বংশানুক্রমিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারী, জমিদারীর বন্দোবস্তের জন্য তাঁহার হস্ত হইতে জমিদারীর যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৭৮০ খৃঃ অব্দে তিনি তাহা ফিরাইয়া লয়েন। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সময়, মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সহিত গবর্ণমেণ্টের এই বন্দোবস্ত হয়, যে তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর ৪০১৫১০৯৲ টাকা রাজস্ব প্রদান করিবেন এবং ইহা ব্যতীত পুলবন্দী (বাঁধ সারাইবার খরচ) হিসাবে ১, ৯৩, ৭২১৲ টাকা সরকারে সরবরাহ করিবেন। কিন্তু বিষয়কার্য্যে মহারাজার পারদর্শিতার অভাবে, শীঘ্রই তাঁহার দেয় রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়াতেও কোন ফল হইল না। অবশেষে ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে, বোর্ড অব রেভেনিউ তাঁহার বিশাল জমিদারীর কিয়দংশ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এই জমীদারীর কিছু কিছু অংশ সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ সিংহ, ভাস্‌তাড়ার ছকু সিং, জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় বাবুগণ ও তেলেনিপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুরা ক্রয় করেন। ইহা-সত্বেও মহারাজা তেজচন্দ্র বেনামীতে অধিকাংশ সম্পত্তি নিজেই ক্রয় করিয়া লয়েন এবং এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু না হইলে বোধহয় সমস্ত অংশই এই ভাবে পুনরুদ্ধার করিয়া লইতেন। যাহা হউক কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহারাজা বৈষয়িক অবস্থার যথেষ্ঠ উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন। সাধারণের হিতার্থে, তিনি বর্দ্ধমান হইতে কালনা পর্য্যন্ত একটী সুবৃহৎ রাজপথ এবং মগরাতে একটী পুল প্রস্তত করিয়া দেন। *বর্দ্ধমান সহরের বাহ্যিক উন্নতি তাঁহার সময়েই হইয়াছিল।*

১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে মহারাজা তেজচন্দ্রের মৃত্যু হইলে, এক দুষ্ট ব্যক্তি আপনাকে রাজকুমার প্রতাপচন্দ্র নামে অভিহিত করিয়া রাজ-সম্পত্তি পাইবার জন্য আদালতে এক মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করে। প্রতাপচন্দ্র নামে স্বর্গীয় মহারাজের এক পুত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আদালতের মীমাংসায়, এই প্রতাপচন্দ্র পরিশেষে

জাল বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং সমস্ত সম্পত্তি মহারাজা তেজচন্দ্রের পোষ্যপুত্র মহ্‌তাব-চন্দ্রকে প্রদত্ত হয়। এই "জাল-প্রতাপচাঁদের" ব্যাপার লইয়া তখন এক মহা হুলস্থুল হইয়াছিল। সঞ্জীববাবুর জাল প্রতাপচাঁদ পুস্তকে ইহার প্রচুর বিবরণ আছে।

মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাবচন্দ্র বাহাদুর বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ জমিদার ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে একটী দরবার করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। সাঁওতাল বিপ্লবের সঙ্কটকালে এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ, বিশ্বস্তভাবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লী-দরবারে, তাঁহার জীবিতকালের জন্য ১৩টী কামান-ধ্বনির সম্মান লাভ করেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটী শ্বেতপ্রস্তরমূর্ত্তি এসিয়াটিক সোসাইটীকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন এই মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। ইহা এখনও কলিকাতার মিউজিয়ম গৃহে বর্ত্তমান আছে।

মহারাজ মহাতাপচাঁদ বর্দ্ধমান রাজ্যের ও নগরের অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, তিনি অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের এক বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন। ইহা "বর্দ্ধমান-রাজবাটীর মহাভারত" বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

কালনার সমাজবাটীতে মহারাজ মহাতাপচন্দ্রের একটী সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন আছে। তাহা দেখিবার জিনিস।

তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজ আফতাবচাঁদ বর্দ্ধমানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ আফতাব সুশিক্ষিত, সৎকর্ম্মপরায়ণ ও সাধারণ হিতকর কার্য্যে মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু অতি তরুণ বয়সে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর, মহারাজ আফ্‌তাপ চাঁদের মৃত্যুর পর, বর্দ্ধমান সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। (১৮৮৭ খৃঃ অব্দ ২৩ জুলাই)। এই তরুণবয়স্ক মহারাজই গবর্ণমেণ্টের নিকট স্থায়ীভাবে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান অধিপতি, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর, একজন উচ্চশিক্ষিত, সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যের সমর্থক এবং উৎসাহদাতা ও সর্ব্বজন পরিচিত রাজ্যেশ্বর। বর্ত্তমান

কালে তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর নিকট অজানিত নহে। ধনীসন্তান হইয়াও, তিনি বিশ্রামাবসর কাল বঙ্গ-সাহিত্যালোচনায় কাটাইয়া থাকেন। Studies নামক একখানি চিন্তাপ্রসূত ইংরাজি-গ্রন্থ ও "বিজয়-গীতিকা" নামক গ্রন্থখানি মহারাজের ইংরাজী ও বঙ্গভাষানুশীলনের ফল। সম্প্রতি মহারাজ-বাহাদুর ভারতবর্ষ নামক মাসিক পত্রিকায়; একটী ধারাবাহিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেছেন। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে, মহারাজ বিজয়চাঁদ ইউরোপে দেশভ্রমণে যান। সর্ব্বস্থানেই তিনি পদোচিত সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে, ইনি বাঙ্গলার লাট-কৌন্সিলের সদস্যরূপে মনোনীত হন। ওভারটুন-হলের প্রকাশ্য সভায় বাঙ্গলার ছোটলাট স্যর এনড্রু ফ্রেজারকে অসম সাহসের সহিত রক্ষা করিয়া, ইনি একদিন যথেষ্ট সৎসাহসের ও রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এ ঘটনা এখনও অনেকের স্মৃতিপথে জাগরূক।

এই সৎসাহসের ও রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে ইনি কে, সি, আই, ই নামক সম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর মুক্তহস্তে অর্থ দান করিয়া থাকেন। ১৯১০ খৃঃ অব্দে ইনি বড়লাটের সভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। ভারত-সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর কলিকাতায় আগমনকালে, ইনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। গত বৎসরের বর্দ্ধমান বন্যার সময়, মহারাজ বাহাদুর বহু চেষ্টা করিয়া প্রজাবর্গের কষ্ট দূর করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ, কলিকাতা আলিপুরে "বিজয়মঞ্জিল" নামে এক শোভনদর্শন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার কলিকাতার বাসভবন।

ভূকৈলাস রাজবংশ।

এই প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর। ইনি কন্দর্প ঘোষালের পৌত্র। ব্রাহ্মণবংশধর পবিত্রচেতা এই কন্দর্প ঘোষাল, প্রচুর ধনশালী ছিলেন। সার্দ্ধৈক শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধিকৃত স্থানে, প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামে বাস করিতেন। গোবিন্দপুর গ্রামটী কোম্পানী বাহাদুর যখন দুর্গনির্ম্মাণের জন্য অধিকার করেন, তখন তিনি খিদিরপুরে উঠিয়া যান। তাঁহার দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ও গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। গোকুলচন্দ্র বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মিঃ ভেরেলষ্টের দেওয়ান হইয়া, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ১৭৭৯ অব্দে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের মৃত্যুর পর, সমস্ত সম্পত্তি

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজা জয়নারায়ণের দখলে আইসে। মহারাজা জয়নারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের একমাত্র পুত্র।

মহারাজা জয়নারায়ণ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনে কিছুকাল সন্‌দ্বীপের কানুনগো ছিলেন। তিনিই প্রথমে খিদিরপুরের নিকটস্থ ভূকৈলাসে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, এই জন্য তিনিই প্রকৃতপক্ষে এই বংশের গৌরব প্রতিষ্ঠাতা। এইস্থানে তিনি স্বর্ণময়ী পতিতপাবনী দেবীর জন্য, একটী সুন্দর মর্ম্মরখচিত দেবায়তন নির্ম্মাণ করেন এবং শিবগঙ্গা ও সত্যগঙ্গা নামধেয় দুইটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। ইঁহার আমলেই রাজবাটীর চারিদিক গড়খাই বা পরিখা দ্বারা বেষ্টন করা হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি ভূকৈলাসে দুইটী সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শিবরাত্রির সময়ে, এখানে আজও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এখনও ভূকৈলাস রাজবাটীতে, এই পুণ্যাত্মা জয়নারায়ণের একটী প্রতিমূর্ত্তি এক মন্দির মধ্যে রক্ষিত আছে। তাহা নিত্যই দেবমূর্ত্তির মত পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত হয়। পতিতপাবনী দেবী, স্বর্ণনির্ম্মিত দেবী প্রতিমা। ইহার মর্ম্মর মণ্ডিত মন্দিরটী দেখিবার জিনিস।

জয়নারায়ণ, দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজা-বাহাদুর" উপাধি এবং ৩৫০০ ঘোড়সওয়ার রাখিবার সনন্দ প্রাপ্ত হন। জয়নারায়ণ ইংরাজী, পারসী, সংস্কৃত, আরবী ও বাঙ্গলা ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের উন্নতির অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিভিন্ন জাতীয় বালকগণকে বিনাব্যয়ে সংস্কৃত, বাঙ্গলা, হিন্দি, পারসী ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য, বহুব্যয়ে বারাণসীতে একটী কলেজ স্থাপন করেন। ইহা "জয়নারায়ণস্ কলেজ" বলিয়াই সাধারণে পরিচিত ছিল। এই কলেজ, আজও তাঁহার কীর্ত্তিঘোষণা করিতেছে। কলেজটী বারাণসীর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে মিশনারীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। মহারাজা জয়নারায়ণ তাঁহাদিগের হস্তে, কলেজটী এবং ইহার পরিচালনার জন্য, প্রচুর অর্থ ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি বারাণসীতে "গুরুধাম" নামে একটী ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া "করুণানিধান মহাদেবের" নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর, অশীতিপর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল, কাবুল-যুদ্ধের সময় ইংরাজদের সাহায্য করার জন্য, লর্ড এলেনবরোর নিকট হইতে এই অত্যাবশ্যকীয়

উপকারের ও অন্যান্য দানশীলতার পুরস্কারস্বরূপ সরকার হইতে "রাজা-বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বারাণসী-অন্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অন্ধগণ, বিনাব্যয়ে খাদ্য ও বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইত। তাঁহার সময়ে ভূকৈলাসে এক যোগমগ্ন সুন্দরাকৃতি মহাপুরুষ, সাধারণ সম্মুখে আবির্ভূত হন। এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে কেহই কথা কহিতে বা পান ভোজন করিতে কিম্বা বস্ত্র পরিধান করিতে দেখে নাই। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, সকল জাতীয় লোকই প্রত্যহ দল বাঁধিয়া ভূকৈলাসে উপস্থিত হইত। হিন্দুগণ—স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে, পুষ্প ও নৈবেদ্য দিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। কথিত আছে—এই মহাপুরুষকে কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী "শিবপুরের-চর" হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। ইনি তথায় গঙ্গার জোয়ারের সময়, জলের উপরে ভাসমান থাকিতেন। তাঁহার সুন্দর শরীরের কতকাংশ শৈবালে সমাচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, ভূকৈলাসে আনীত হইবার অল্পকাল পরেই ইনি কথা কহিতে এবং ভোজন করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি ভূকৈলাসের রাজবংশীয়গণের মধ্যে যে কেহ কোনরূপ আদেশ করিতেন, ইনি নাকি তাহাই সম্পাদন করিতেন।

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের সাত পুত্র। কুমার কাশীকান্ত ঘোষাল, কুমার সত্যপ্রসাদ ঘোষাল, কুমার সত্যকিঙ্কর ঘোষাল, কুমার সত্যচরণ ঘোষাল, কুমার সত্যশরণ ঘোষাল, কুমার সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল এবং কুমার সত্যভক্ত ঘোষাল।

কুমার সত্যকিঙ্কর ঘোষাল প্রথমে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে, রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ, পিতার লোকান্তরের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে—রাজকুমার সত্যচরণ ঘোষাল মহাশয় ভবিষ্যতে বিষয়ের অধিকারী হন। পরে ইনি রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর নানা সৎকার্য্যে প্রভূত অর্থ দান করিয়া এই রাজবংশের গৌরব রক্ষা করেন। তাঁহার দুই পুত্র—কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল ও কুমার সত্যসত্য ঘোষাল। কিন্তু রাজা সত্যচরণের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা, কুমার সত্যশরণ ঘোষাল "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর সুপণ্ডিত এবং পরহিতকারী ছিলেন,

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C. S. I. উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় একটী কন্যা ব্যতীত তাহাদের সব কয়টাই বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কন্যাটীর সহিত প্রেসিডেন্সী-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হয়। রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুরের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে, গবর্ণমেণ্ট রাজা সত্যচরণ ঘোষালের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার সত্যানন্দ ঘোষালকে "রাজা-বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর, ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য এবং কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য ছিলেন। তিনি সাধারণের হিতার্থে অনেক লোকহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন। কুমার সত্যসত্য ঘোষাল (রাজা সত্যচরণের দ্বিতীয় পুত্র) এবং কুমার সত্যকৃষ্ণ ঘোষাল এই বংশের আরও দুইজন কৃতী বংশধর। কুমার সত্যকৃষ্ণ ঘোষাল সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং কলিকাতা পুলিশের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

ইঁহাদিগের জমিদারী ত্রিপুরা, ভুলুয়া, বাখরগঞ্জ, ঢাকা এবং চব্বিশপরগণা জিলায় অবস্থিত। ইঁহাদিগের বিশাল জমিদারীর সরকারে দেয়—বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১,৫০,০০০৲ দেড় লক্ষ টাকা।

ভূকৈলাস রাজ-পরিবার, নদীয়া ও নাটোরের মত অনেক ব্রাহ্মণকে প্রচুর ব্রহ্মোত্তর দিয়া গিয়াছেন। পতিতপাবনী দেবীর পূজার সময়, এই রাজবাটীতে দুর্গাষ্টমী ও ঝুলনে খুব জাঁকজমক হইয়া থাকে। ঝুলনের সময় দশভূজা স্বর্ণময়ী পতিতপাবনী দেবীকে, দ্বিভুজ মুরলীধারী কৃষ্ণমূর্ত্তিতে পরিণত করা হইত। এই দীন লেখকের জন্মস্থান ও প্রথম নিবাস, ভূকৈলাস রাজবাটীর পশ্চিমদিকে বাদামতলা লেনে ছিল। এখন তাহা খিদিরপুর "ডকের" সীমানা ভুক্ত হইয়াছে।

দীঘাপতিয়া রাজবংশ।

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা, দয়ারাম রায় মহাশয় প্রথমে নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের অধীনে একজন সামান্য আমলা ছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই জমিদারী কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায়, তিনি নাটোররাজ কর্ত্তৃক দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন।

দয়ারাম, বঙ্গবিজেতা মহারাণী ভবানীর আমল পর্য্যন্ত, নাটোরের জমিদারীর দেওয়ান ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যেই প্রচুর ধনসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুরশিদাবাদের নবাব, যখন যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়কে গ্রেপ্তার করেন, তখন দয়ারাম তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন এইজন্য নবাব সরকার হইতে তিনি "রায়-রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন। দয়ারাম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং স্বধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। দরিদ্রের প্রতি দয়া, তাঁহার চরিত্রের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। তিনি রাজসাহীতে অনেকগুলি "টোল" স্থাপন করিয়াছিলেন। যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বিনাদিনের গোপাল দেব এবং দীঘাপতির রাজবাটীর কৃষ্ণজী, গোবিন্দজী ও গোপালজী নামক তিনটী বিগ্রহ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তিনি গয়কু ও হাগুরিয়াতে দুইটী দীঘি, স্বীয় জমিদারীতে কতকগুলি সুবৃহৎ পুষ্করিণী এবং রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে একটী চৌকী বা গড়, খনন করাইয়াছিলেন। দয়ারাম রায়ের পুত্র জগন্নাথ রায় তাঁহার মৃত্যুর পর অল্পদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। জগন্নাথ রায়ের এক পুত্র প্রাণনাথ রায়। ইনি মাতৃশ্রাদ্ধে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

প্রাণনাথ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র প্রসন্ননাথ রায়, সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার সমকালীন জমিদারগণের মধ্যে, দানশীলতা ও মহত্ত্বে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি দীঘাপতিয়া হইতে বোয়ালিয়া পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৩৫০০০৲ টাকা প্রদান করেন। অন্যান্য প্রচুর দান ব্যতীত, তিনি দীঘাপতিয়ায় একটী স্কুল এবং নাটোর ও বোয়ালিয়ায় একটী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহাদিগের পরিচালনের জন্য এক লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দান করেন।

রাজা প্রসন্ননাথ রায় ১৮৫৪ অব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজা-বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ অব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজসাহী জিলায় সহকারী-ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি দীঘাপতিয়ার রাজবাটীর আমূল সংস্কার করিয়া, প্রাসাদটীকে সুদৃশ্য ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলেন। তাঁহার আমলে রাজবাটীর একপার্শ্বে একটী সুন্দর নাচঘর ও অন্য পার্শ্বে একটী সিংহদালান নির্ম্মিত হয়। রাজবাটীর সুবৃহৎ তোরণ-দ্বারও তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত। তাঁহার আমলে হোলী ও

ঝুলন-উৎসবের সময় রাজবাটী অসংখ্য আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া নূতন শোভার বিকাশ করিত এবং নৃত্য, গীতবাদ্য ও আতসবাজী প্রভৃতিতে একটা মহোৎসবের সূচনা হইত। এই উৎসব সময় সেখানে বহুসংখ্যক পদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ও জমিদারগণের নিমন্ত্রণ হইত।

১৮৬১ অব্দে রাজা প্রসন্ননাথ রায় দেহত্যাগ করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পোষ্যপুত্র প্রমথনাথ রায়, পিতার উইল অনুসারে কলিকাতা ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনের ছাত্ররূপে পাঠাভ্যাস করেন। এই সময় তাঁহার বুদ্ধিমতী জননী, তাঁহার অভিভাবিকা ছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে, তিনি সাবালক হন। সাবালক হইয়া প্রথমেই, রামপুর-বোয়ালিয়ায় তাঁহার পিতৃস্থাপিত হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের পাকাবাটী নির্ম্মাণের জন্য তিনি ১০,০০০৲ টাকা ব্যয় করেন। দীঘাপতিয়া হইতে রামপুর-বোয়ালিয়া পর্য্যন্ত, যে রাস্তাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সংস্কারকল্পেও তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যের জন্য, তৎকালীন ছোটলাট বাহাদুর কর্ত্তৃক তিনি বিশেষ-ভাবে প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে বিভাগীয়-কমিশনার গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে রিপোর্ট করেন, যে—"কুমার প্রমথনাথ রায় নানা সৎকার্য্যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তিনি নানা সদ্‌গুণে বিভুষিত এবং নিম্নবঙ্গের জমিদারদিগের মধ্যে—সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ও জমীদারী পরিচালন কার্য্যে অতি সুদক্ষ। অতএব তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" রাজোপাধি দেওয়া হউক।" এই রিপোর্টের ফলে লর্ড মেয়ো তাঁহাকে রাজোপাধির সনন্দ প্রদান করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

দীঘাপাতিয়া রাজবংশের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী রাজা পি, এন. রায় ও তাঁহার ভ্রাতাগণ। বর্ত্তমানে তাঁহারাই এই ষ্টেটের মালিক। ইঁহারা বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যসেবী ও সৎকর্ম্মে দানশীল।

শোভাবাজার রাজবংশ।

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাণসোণা বা কর্ণসুবর্ণ গ্রামে, এই বংশের আদি বাসস্থান ছিল। ইঁহারা চিত্রপুরের দেব-বংশোদ্ভব মৌলিক কায়স্থ। পরে, এই রাজবংশের একটী সংক্ষিপ্ত বংশবৃক্ষ দেওয়া হইল।

এই দেববংশের আদিপুরুষের নাম শ্রীহরি। পীতাম্বর এই শ্রীহরি হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। ইনি নবাব সরকার হইতে "খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর প্রচুর ধান্যসম্পত্তি ছিল। কথিত আছে, একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে, ইনি বহুসংখ্যক উচ্চ বংশোদ্ভব কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাদিগের যাতায়াতের সুবিধার জন্য, একটী ক্ষুদ্র নদীর কিয়দংশ ধান্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া, নদী পার হইবার সেতুস্বরূপ করিয়া দেন। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা, তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়ে এবং পীতাম্বর দে মহাশয় সেই সময় হইতে "ধান্য-পীতাম্বর" এই নূতন নামে অভিহিত হন। পীতাম্বর, স্বীয় সমাজে গোষ্ঠীপতি ছিলেন। পীতাম্বর দেবের চারিজন প্রপৌত্র পৈতৃক বাসগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্নগ্রামে যাইয়া বসবাস করেন। চৌধুরী উপাধিধারী জ্যেষ্ঠ শিবদাস—মলুই গ্রামে, মধ্যম নিত্যানন্দ-সোদপুর গ্রামে, তৃতীয় চতুর্ভুজ—তালা গ্রামে এবং কনিষ্ঠ শ্রীনাথ—ধলেপুর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে মধ্যম, তৃতীয় ও কনিষ্ঠ "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের বংশধর কাশীনাথ "মল্লিক" এবং বিজয়াবল্লভ "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁরা নিত্যানন্দ হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। বিজয়াবল্লভের প্রপৌত্র বিদ্যাধর, সোদপুর ত্যাগ করিয়া প্রথমে নাজরা ও পরে নিতাড়া গ্রামে বাস করেন। ইহাঁর ছয় পৌত্রের মধ্যে চতুর্থ দেবীদাস রায় "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মুড়াগাছা পরগণার (২৪ পরগণা) কানুনগো পদে নিযুক্ত হন। ইহাঁর ছয় পুত্র। তন্মধ্যে চতুর্থ, সহস্রাক্ষ মজুমদার, নবাব মহব্বতজঙ্গ কর্ত্তৃক তাঁহার পৈতৃক কর্ম্ম অর্থাৎ মুড়াগাছা পরগণার কানুনগো পদে নিযুক্ত হন। পঞ্চম রাজেন্দ্রনাথ, মজুমদার সরকার উপাধি পাইয়া, কাঁমারপোল গ্রামে বাস করেন এবং কনিষ্ঠ রুক্মিণীকান্ত নবাব কর্ত্তৃক মুড়াগাছা পরগণার অপ্রাপ্ত বয়স্ক বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমীদার, কেশবরাম রায়চৌধুরীর বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হন এবং নবাব-সরকার হইতে "ব্যবহর্ত্তা" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামেশ্বর ব্যবহর্ত্তা, পৈতৃক পদে নিযুক্ত হন কিন্তু তাঁহার আমলে নবাব-সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব বাকী পড়ায়, সাবর্ণ জমীদার কেশবরাম তাঁহাকে নিজালয়ে কারারুদ্ধ করেন। রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র রামচরণ দেব মুর্শিদাবাদে গিয়া তদানীন্তন রায়-রায়ানের নিকট পরিচিত হয়েন এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মুড়াগাছা পরগণার ভার গ্রহণ করেন। রায়রায়ান-তাঁহাকে উক্ত

পরগণার "উদেদারী" পদ প্রদান করেন। অতঃপর রামচরণ, পিতার উদ্ধারসাধন করেন এবং প্রতিহিংসা সাধনোদ্দেশ্যে কেশবরামকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে কেশবরাম কারামুক্ত হইলে, তাঁহার দ্বারা অনিষ্টাশঙ্কা সম্ভাবনা ভাবিয়া, মুড়াগাছা ত্যাগ করিয়া রামচরণ প্রাচীন কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। অতঃপর তিনি নবাব কর্ত্তৃক হিজলী, তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের নিমক-মহলের কর-সংগ্রাহক কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায়, নবাব তাঁহাকে কটকের সুবাদারের অধীনে দেওয়ানী পদ প্রদান করেন। তৎকালীন আর্কটের নবাবের ভ্রাতা মনিরুদ্দীন খাঁ সহোদরের সহিত বিবাদ করিয়া মুর্শিদাবাদে নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর আশ্রয় লাভ করিয়া মুরশীদাবাদে ছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ ভবিষ্যতে এই মনিরুদ্দিনকে কটকের সুবাদারী দিয়া উড়িষ্যায় বর্গী দমনার্থে প্রেরণ করেন ও রামচরণ তাঁহার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। জনশ্রুতি এই, এই কটক-যাত্রার পথে সুবাদার মনিরুদ্দীন খাঁ ও তাঁহার দেওয়ান রামচরণ, পিণ্ডারী দস্যুগণ কর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত হইয়া নিহত হন।

রামচরণের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী তিনটী শিশু পুত্র ও পাঁচটী কন্যা লইয়া বড়ই বিভ্রাটে পড়িলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে আবার তাঁহাদের গোবিন্দপুরের বাটী গঙ্গার ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়ায়, দেওয়ান রামচরণের পত্নী নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। রামচরণের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণের দুর্দ্দশা ঘটিবার আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। রামচরণ উড়িষ্যা যাত্রাকালে হুগলীর বিখ্যাত সওদাগর খোজা ওয়াজিদের হস্তে সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ভার প্রদান করিয়া যান। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই খোজা ওয়াজিদেরও মৃত্যু হওয়ায়, রামচরণ পত্নী অর্থাভাবে সম্পূর্ণরূপে সহায়শূন্য হন। এই সময়ে গঙ্গার ভাঙ্গনে বসতবাটী ধ্বংশপ্রাপ্ত হওয়ায়, গোবিন্দপুরেই আর একখানি বাটী নির্ম্মিত হয়, কিন্তু দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য উক্ত স্থান প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানী আড়পুলীতে কয়েক বিঘা জমী ও কয়েক সহস্র টাকা তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার পরে রামচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসুন্দর, আড়পুলীর জমী বিক্রয় করিয়া সুতালুটীর মধ্যস্থিত পাবনার বাগান (আধুনিক শোভাবাজার) নামক স্থান জমী ক্রয় করিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করান। যাহা হউক, অত্যন্ত সাংসারিক কষ্টেও রামচরণ-পত্নী

পুত্র তিনটীকে সুশিক্ষিত করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করেন নাই। অবশেষে জ্যেষ্ঠ রামসুন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, পঞ্চকোটের দেওয়ান হন এবং সাংসারিক অস্বচ্ছলতা দূর করেন। অতঃপর তিনি ও মধ্যম মাণিক্যচন্দ্র ১১৭৯ হিজরীতে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রায় উপাধি ও এক হাজারী মনসবদারের পদ প্রাপ্ত হন। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ইহাদিগেরই কনিষ্ঠ সহোদর।

নবকৃষ্ণ ১১৩৯ সালে (১৭৩২ খ্রীঃ অব্দে) মুড়াগাছার পৈতৃক-বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন গোবিন্দপুরেই তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে জননীর যত্নে ইনি, আরবী, পারসী, উর্দ্দু ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অর্থোপার্জ্জন চেষ্টায়, ইনি প্রথমে কলিকাতায় ধনকুবের লক্ষ্মীকান্ত ধরের (নকু ধর) সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতায় ইংরাজ মহলেও পরিচিত হন। কিন্তু নবকৃষ্ণের বংশধরেরা এ কথা অস্বীকার করেন। এই সময়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামান্য কেরাণী ছিলেন, তিনি নবকৃষ্ণকে তাঁহার পারসী-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংস ও নবকৃষ্ণ সমবয়স্ক ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ মিত্রতা জন্মিয়াছিল। ইহার তিন বৎসর পরে হেষ্টিংস সাহেব কাশিমবাজারের কুঠীতে প্রেরিত হইলে, নবকৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গে যান।

কাশীমবাজারে বাসকালে, নবকৃষ্ণ হেষ্টিংসের দূতরূপে মধ্যে মধ্যে কলিকাতার কৌন্সিলে আসিতেন, সুতরাং নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রথমে যে ষড়যন্ত্র হয়, তিনি তাহা সম্পূর্ণই অবগত ছিলেন। এই ষড়যন্ত্র সংবাদ অবগত হইয়া, নবাব যখন কলিকাতা আক্রমণ করিতে আইসেন, তখন তিনি কাশীম-বাজারের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া হেষ্টিংস প্রভৃতি কুঠীয়াল ও রেসিডেণ্টকে বন্দী করেন। নবকৃষ্ণ এই সময়ে, হেষ্টিংসকে কান্তবাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের এই দুঃসংবাদ দেন। নবকৃষ্ণেরই সহায়তায়, কলিকাতার ইংরাজগণ পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইবার অবসর পাইয়াছিলেন।

অল্পকাল পরেই নবাব কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, চিৎপুরের মধ্যে ছাউনী স্থাপন করিলেন। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে, মুরশিদাবাদে নবাবের বিরুদ্ধে আর একটী ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভ এই সময়ে কলিকাতার ইংরাজগণের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন।

রাজবল্লভের দূত, কলিকাতার তদানীন্তন গভর্ণর ড্রেকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিল, যেন রাজার পত্রখানি একজন বিশ্বস্ত হিন্দুকে দিয়া পাঠ করান হয় এবং সেই বিশ্বস্ত হিন্দুই যেন ইহার উত্তর লিখেন। ড্রেক, নবকৃষ্ণকে দিয়া গোপনে পত্র পড়াইলেন এবং তাহার উত্তর লিখিয়া দিলেন। অতঃপর বিশেষ ভাবে এই ষড়যন্ত্রের লেখাপড়া কাজ কর্ম্মের জন্য, মুন্সী তাজউদ্দীনকে বরখাস্ত করিয়া, ড্রেকসাহেব নবকৃষ্ণকে কোম্পানীর মুন্সীপদে নিযুক্ত করিলেন। এই পদের বেতন ৬০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

নবকৃষ্ণের কার্য্যদক্ষতায়, ড্রেক ও হলওয়েল বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার হস্তে, ক্রমে গুরুতর রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত করা হইল। সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতা লুণ্ঠন করিয়া, কলিকাতায় আলীনগর নামকরণ করিয়া চলিয়া গেলে, মান্দ্রাজ হইতে কর্ণেল ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ কলিকাতা উদ্ধারার্থে আগমন করেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ, নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া চন্দননগর আক্রমণ করিলে, নবাব পুনরায় কলিকাতা আক্রমণের জন্য কলিকাতার পূর্ব্বদিকস্থ হালসির-বাগানে ছাউনি করিলেন। কূটনীতিজ্ঞ ক্লাইভ, তাঁহার সৈন্যবলের সম্বন্ধে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য, নবকৃষ্ণকে নানাবিধ উপঢৌকন সমেত, দূতরূপে নবাবের নিকট পাঠাইলেন। নবকৃষ্ণ প্রকাশ্যভাবে দূতস্বরূপ গিয়া নবাবের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার ক্রোধশান্তির চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যবলের বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইয়া ক্লাইভকে জানাইলেন। পরদিন কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে, তাঁহারই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ক্লাইভ অসতর্ক নবাবসৈন্যকে আক্রমণ করেন। এদিকে নবকৃষ্ণ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে ৩০০ গোপ আনাইয়া হালসির বাগান, নন্দনবাগান ও বজবজ প্রভৃতি স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরাজ-সৈন্যগণ যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহারাও অমনি চারিদিক হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিতে লাগিল। ইহাতে নবাবের সৈন্যগণ ইংরাজপক্ষকে বহুবলশালী মনে করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। ক্লাইভ, বিনা আয়াসেই কলিকাতা উদ্ধার করিলেন। ক্লাইভ, নবকৃষ্ণের এ কার্য্যকুশলতা কখনও বিস্মৃত হন নাই।

রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন—১৭৫৬ খৃঃ অব্দে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন নবকৃষ্ণ আপনার জীবনের

প্রতি মমতা না রাখিয়া, ফল্‌তায় পলায়িত জাহাজবাসী ইংরাজদিগকে, জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসকাল রসদ যোগাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি এরূপ দুঃসাহসিক ভাবে কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে না পারিলে, নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে ইংরাজগণকে এভাবে সাহায্য না করিলে, তাঁহাদিগকে যে ভীষণ বিপদে পড়িতে হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে, নবাবের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, নবকৃষ্ণই তাহাতে ইংরাজপক্ষের যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন। ক্লাইভই তাঁহাকে ছদ্মবেশে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়াছিলেন।

ধরিতে গেলে, নবকৃষ্ণই ইংরাজপক্ষ হইতে পলাশীর-যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি যে শুধু নবাবের ওমরাহগণের সহিত পরামর্শে ইংরাজপক্ষের মুখপাত্র ছিলেন তাহা নহে, উপরন্তু বহু জমীদারকে তিনিই ইংরাজপক্ষের সহায় করিয়া তুলেন। আবার যখন নবাবের ভীষণ অগ্নিবৃষ্টির সম্মুখে ইংরাজগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনিই ক্লাইভের দূতরূপে মীরজাফরের নিকট উপস্থিত হইয়া ইংরাজের জয় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর, মীরজাফরের সিংহাসনারোহণের দিন, নবকৃষ্ণ দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবাবের ধনাগার পরীক্ষার সময়েও তিনি লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে ছিলেন। কথিত আছে, নবাবের প্রকাশ্য কোষাগার ব্যতীত একটী গুপ্ত ধনাগারও ছিল। ইংরাজেরা এ সংবাদ রাখিতেন না। তাঁহারা প্রকাশ্য ধনাগারের দুই কোটী টাকা বিভাগ করিয়া লইবার পর, মীরজাফর, আমীর বেগ খাঁ, ইংরাজদিগের দেওয়ান রামচাঁদ রায় (আন্দুল রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ) ও মুন্সী নবকৃষ্ণ এই গুপ্ত ধনাগার হইতে আট কোটী টাকার স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদি গ্রহণ করেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের জীবন চরিত লেখক বলেন, একথার মূলে কোন বিশ্বাস যোগ্য সমর্থক প্রমাণ নাই। যে কোন কারণেই হউক, নবকৃষ্ণ এই সময়ে প্রচুর বিত্তশালী হইয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর, দুর্গোৎসবের অত্যল্প দিন মাত্রই অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু নবকৃষ্ণ সেই অল্প দিনের মধ্যেই সুবৃহৎ পূজার দালান নির্ম্মাণ করাইয়া, মহাসমারোহে শোভাবাজার রাজ-বাড়ীতে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। কলিকাতার বহু পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী এই পূজায় উপস্থিত

ছিলেন। শোভাবাজার রাজবংশের পুরাতন বাটীতে নবকৃষ্ণ নির্ম্মিত পূজার দালান এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মীরজাফরের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, ইংরাজগণ যখন তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে মসনদ প্রদান করিতে সঙ্কল্প করেন, তখন নবকৃষ্ণের মধ্যস্থতাতেই তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত ও সন্ধি প্রভৃতি স্থিরীকৃত হয়। মীর-কাসিম শ্বশুরের পক্ষে কলিকাতার বাকী রাজস্ব মিটাইতে আসিয়া-ছিলেন, কাজেই যোগাযোগ ঠিক ঘটিয়া গিয়াছিল। ইহার পর, মীরজাফর আবার যখন বাঙ্গালার মসনদে বসেন তখনও নবকৃষ্ণ ইংরাজের ফারসী দপ্তরে কার্য্য করিতেছিলেন এবং টাকা কড়ির বাকীর হিসাব করিতেন। মীরজাফরের নিকট পাওনা ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে তাঁহার দেওয়ান নন্দকুমার এক দফায় ২ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার চিঠিতে লিখিত ছিল "কোন্ তোড়ায় কিরূপ টাকা আছে, তাহার এক ফর্দ্দ মুন্সী নবকৃষ্ণকে পাঠান হইল।" কারণ প্রত্যেক নবাবের আমলে টাকার ওজন বিভিন্ন হইত এজন্য বাটা স্থির করাও নিতান্ত সহজ কাজ ছিল না।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ যখন এদেশে পুনরায় গভর্ণর হইয়া আইসেন তখন তিনি বুঝিলেন, নবকৃষ্ণ দেশমধ্যে একজন গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি ইংরাজ ও নবাব উভয় পক্ষেই সম্মানিত ও সুপরিচিত। নবাব-সরকারে নবকৃষ্ণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি অনেক সময় মুরশীদাবাদের প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ, কলিকাতায় ইংরাজদের পাঠাইয়া দিতেন।

মীরকাসিমের সহিত যুদ্ধের সময় মহারাজ নবকৃষ্ণ, মেজর আডাম্‌সের বেনিয়ান হইয়া, তাঁহার সঙ্গে যান এবং মেজর সাহেব রণক্ষেত্রে আহত হইলে, বহু কৌশলে তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করেন। এই সময়ে মহারাজ নন্দকুমার, বিহার প্রবাসী দিল্লীর সম্রাটের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন এই সন্দেহ করিয়া, জেনারেল কার্ণাক নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে সংকল্প করেন এবং গবর্ণর ভবিষ্যতে ভ্যান্সিটার্টের লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া যখন ক্লাইভ মহারাজকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রামে নির্ব্বাসিত করিতে সঙ্কল্প করেন, তখন নবকৃষ্ণের অনুরোধে মহারাজ নন্দকুমার সে যাত্রা বিপদোত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ইহার পর—অযোধ্যার নবাবের সহিত দিল্লীর সম্রাটের বিবাদের মীমাংসা ও কোম্পানীর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী-প্রাপ্তির

ব্যাপারে, নবকৃষ্ণ ক্লাইভের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। কথিত আছে—অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে প্রাপ্ত এলাহাবাদ ও কোড়া প্রদেশ দুইটী বাদসাহকে প্রদান করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এই দেওয়ানী প্রার্থনার পরামর্শ, নবকৃষ্ণই ইংরাজ পক্ষকে প্রদান করিয়াছিলেন।

যাহা হউক রাজকার্য্যের সর্ব্ব বিভাগেই বিশেষ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করায়, ক্লাইভ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, বাদসাহের নিকট হইতে তাঁহাকে "রাজা-বাহাদুর" উপাধি প্রদান করান। বাদসাহও তাহার উপর অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ, তাঁহাকে পাঁচহাজারী মন্সবদার পদে নিযুক্ত করিয়া বাদসাহী ওমরাহ-শ্রেণীভুক্ত করেন এবং তিন হাজার সওয়ার, পাল্কী, নাকাড়া, তোগ নামক ধ্বজা, আশাসোটা প্রভৃতি প্রদান করেন। নবাব সুজাউদ্দৌলাও তাঁহাকে একটা "খিলাৎ" প্রদান করেন।

অতঃপর রাজা বলবন্ত সিংহের সহিত জমিদারী বিষয়ক বন্দোবস্ত করিবার জন্য, মহারাজা নবকৃষ্ণ লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে কাশী যাত্রা করেন। এই সময়েই বিশ্বেশ্বরের নাটমন্দিরে তিনি "নবকৃষ্ণেশ্বর" নামে এক শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার পর পাটনায় সিতাব রায়ের সহিত গোলযোগের মীমাংসা করিয়া, ক্লাইভ তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন এবং তাঁহার কার্য্যের জন্য কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। এই জন্য তিনি পুনরায় বাদসাহের নিকট হইতে (১৭৭৬ খৃঃ অব্দে) নবকৃষ্ণের জন্য "মহারাজা-বাহাদুর" উপাধির সনন্দ আনাইয়া দেন। বাদসাহও স্বয়ং নবকৃষ্ণকে ছয়-হাজারী মন্সবদারের পদে উন্নীত করিলেন। ইহার অল্প-দিনের মধ্যেই এক দরবার করিয়া, ক্লাইভ তাঁহাকে "মহারাজা-বাহাদুর" উপাধি ও ছয়-হাজারী মন্সবদার পদের ফারমান, ঘোড়া, জোড়া, চামর, শিরপেচ, ছাতা, পাখা, হাতী, ঝালরদার-পাল্কী, ঘড়ী ও তলোয়ার এই সমস্ত খিলাৎ এবং নানা রত্নালঙ্কার প্রদান করেন।

নবকৃষ্ণের কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া, ক্লাইভ তাঁহার হস্তে কতকগুলি প্রধান প্রধান কার্য্য ভার প্রদান করেন। এ যাবৎ ফারসী-দপ্তর বরাবরই তাঁহার হস্তে ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরজবেগী-দপ্তর (আবেদন-পত্রাদি গ্রহণ বিভাগ), মালখানা (ধনাগার), ২৪ পরগণার মাল-আদালত, চব্বিশ পরগণার তহসীল-দপ্তর (২৪ পরগণার কালেক্টারী কাছারী) প্রভৃতিও

তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। এই সকল কার্য্য তাঁহার শোভাবাজারের রাজবাটীতেই সম্পন্ন হইত।

ইহার পর মহারাজা নবকৃষ্ণের মাতৃবিয়োগ হয়। কথিত আছে—মাতৃশ্রাদ্ধে মহারাজ নবকৃষ্ণ, নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বাঙ্গালার তখনকার সমস্ত রাজা, মহারাজা ও জমীদারবর্গ এই শ্রাদ্ধ-সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে সংঘটিত অভূতপূর্ব্ব মহোৎসবের বিচিত্র শোভার বাহার ও তাঁহার অসাধারণ ঐশ্বর্য্যময় অবস্থার জন্যই নবকৃষ্ণের বাস-পল্লীর নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থানের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া, সভাবাজার বা শোভাবাজার হইয়াছে এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন।

ক্লাইভের পর মিঃ ভেরেলেষ্ট কলিকাতার গভর্ণর হন। ক্লাইভের ন্যায় তিনিও নবকৃষ্ণকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন এবং ভাল বাসিতেন। ভেরেলেষ্টের সময়ে, নবাব মনিরউদ্দৌলা ইংরাজগণের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া নবকৃষ্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এই সময়ে ইংরাজের অনুগ্রহে প্রভূত ধনশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে—কিন্তু সমাজে তাঁহার পদগৌরবোপযুক্ত প্রতিপত্তিই ছিল না। এতদিন সৌভাগ্য অর্জ্জন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এ দিকে মনোযোগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধের সময়, তিনি বুঝিতে পারেন সামাজিক বিষয়ে তাঁহার গৌরব তখনও তাঁহার অর্থ ও পদগৌরবের উপযুক্ত হয় নাই। তিনি দেখিলেন যে মহারাজা নন্দকুমার, সমগ্র হিন্দু সমাজের উপর অবাধে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে, এই সময়ে নন্দকুমারের প্রতিপত্তি কমিয়া আসিতেছিল। নানা কারণে ইংরাজগণ তাঁহার উপর ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট হইতেছিলেন। নন্দকুমারের শত্রুপক্ষের প্ররোচনায়, ভেরেলেষ্ট তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে উপযুক্ত সুযোগে, নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের সামাজিক প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন।

১৭৭২খ্রীঃ অব্দে মহারাজা নবকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার ভাগ্যবিধাতা হইয়া আসেন। হেষ্টিংসের আমলে নবকৃষ্ণের প্রতিপত্তি অসাধারণরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৭৭৫ অব্দে অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার মাতার সম্পত্তি সম্বন্ধে মিঃ ব্রিষ্টো যথেচ্ছ বন্দোবস্ত করায়, নবকৃষ্ণ এ বিষয়ে তদন্তের জন্য প্রেরিত হন। ১৭৭৮ অব্দে হেষ্টিংস

নবকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মহাল নপাড়া প্রভৃতির বদলে তাঁহাকে সুতালুটীর তালুকদারী প্রদান করেন। এই সময়ে সুতালুটি উত্তরে বাগবাজারের খাল, পূর্ব্বে অপার সারকিউলার রোড, পশ্চিমে ভাগীরথী ও দক্ষিণে বড়বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতালুটী তালুকের মধ্যে, কেবল কয়েকটী মাত্র ভূমিখণ্ড ইংরাজ কোম্পানী খাসে রাখেন। হেষ্টিংস, মহারাজা নবকৃষ্ণের সহিত এই বন্দোবস্ত করেন—"চৌকীদারী ব্যতীত সমস্ত তালুকের বার্ষিক রাজস্ব ১২৩৭৮/১০ নিয়মিতভাবে কোম্পানীর ধনাগারে দাখিল করিতে হইবে। কৃষিকার্য্য ও সাধারণের শ্রীবৃদ্ধিসাধন জন্য, যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তালুকদারীর উপযুক্ত গৌরব বজায় রাখিয়া প্রজাদের সম্বন্ধে যথার্থ বিচার করিতে হইবে। কোন প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করিলে, উহার তিনগুণ টাকা দণ্ডস্বরূপ কোম্পানীকে দিতে হইবে।"

সুতালুটীর তালুকদারী পাইবার পর, নবকৃষ্ণের সহিত কুমারটুলীর দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্রের ভদ্রাসন জমীর কর লইয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। পুরাকালে এই গোবিন্দরাম কোম্পানীর অধীনে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত বহুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের সহিত এই দেওয়ান গোবিন্দরামের পৌত্র, দেওয়ান অভয়াচরণের মোকদ্দমা হয়। কিন্তু বিলাতের কোর্ট-অব-ডিরেক্টারদের বিচারে অভয়াচরণ জয় লাভ করেন। নবকৃষ্ণের আর এক মোকদ্দমা হইয়াছিল, বিখ্যাত ধনী চূড়ামণি দত্তের সহিত। এই মোকদ্দমা মিটিবার পূর্ব্বেই চূড়ামণির মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। চূড়ামণি কিরূপে নবকৃষ্ণকে অপদস্থ করিয়া "যম জিনিতে" গিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

ইহার কিছুকাল পরে, বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচাঁদের মৃত্যু হইলে, তাঁহার নাবালক পুত্র তেজচন্দ্রের ৮৭৪৭২৭৲ টাকা রাজস্ব বাকী পড়ে। হেষ্টিংসের অনুরোধে, নবকৃষ্ণ ঐ টাকা বর্দ্ধমানাধিপতিকে ঋণদান করেন এবং তাঁহার জমীদারীর তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করেন। তিনি বর্দ্ধমানের রাজ-সরকার হইতে বার্ষিক ৫০০০০৲ টাকা পারিশ্রমিক পাইতেন। যাহা হউক অল্প দিন পরেই মহারাণীর সহিত মতান্তর হওয়ায়, তিনি ঐ ম্যানেজারী পদ ত্যাগ করেন।

এই সময়ে নবকৃষ্ণের অদৃষ্টে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সংঘটিত হইল। মহম্মদ রেজা খাঁ তাহার পরম বন্ধু ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় মহম্মদ

রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেলে, হেষ্টিংস্ মহারাজা নন্দকুমারের হাত হইতে একে একে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি মহারাজ নন্দকুমারের হস্ত হইতে "জাতিমালা" কাছারীর ভার গ্রহণ করিয়া, তাহা মহারাজা নবকৃষ্ণকে প্রদান করেন। এই ব্যাপারে নবকৃষ্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

নবকৃষ্ণ একে একে সাতটী বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কাহারও পুত্র সন্তান না হওয়ায়, তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর রামসুন্দরের তৃতীয় পুত্র গোপীমোহন দেবকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই ১৭৮২ খৃঃ অব্দে, তাঁহার চতুর্থ পত্নী একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। এই পুত্রই রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ইহার দুই বৎসর পরে, রাজা গোপীমোহনের পুত্র রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের জন্ম হয়। রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের বিবাহকালে, নবকৃষ্ণ বাদসাহের নিকট হইতে মন্সবদারের পদের ব্যবহার্য্য সওয়ারের মধ্যে, চারি হাজার সিপাহী আনাইয়া বরের অনুগামী করাইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠীপতি হন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২ নবেম্বর তারিখে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর দিবস, অভ্যাসানুযায়ী বেলা দুই ঘটিকার সময়, তিনি বিশ্রামার্থে শয্যায় শয়ন করেন। পরে সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে মৃতাবস্থায় শয্যার উপর দেখা যায়। মৃত্যুকালে তিনি সাত পত্নী, ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহন, পুত্র রাজকৃষ্ণ এবং গোপীমোহনের পুত্র দেখিয়া যান। পুত্র ব্যতীত তাঁহার চতুর্থ পত্নীর গর্ভে দুইটী কন্যা এবং প্রথমা পত্নীরও একটী কন্যা-সন্তান হইয়াছিল।

মহারাজ নবকৃষ্ণের অনেক সদ্গুণ ছিল। তিনি ধার্ম্মিক, বিনয়ী, বিদ্যানুরাগী ও পরোপকারী ছিলেন। বিষয়কর্ম্মে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তিনি একটী পণ্ডিতসভা করিয়া পণ্ডিতপ্রধান জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, শ্রীকণ্ঠ, কমলাকান্ত, বলরাম, শঙ্কর, চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা ছিল। "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি লাভের পর, তিনি স্বকীয় বাসভবনে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। শ্রীগোবিন্দ নামক বিগ্রহ প্রস্তুতের পর, তিনি নবদ্বীপাধিপতির অগ্রদ্বীপস্থ গোপীনাথ

বিগ্রহ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কৌশল করিয়া স্বগৃহে লইয়া আসেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, এই ঘটনার কথা গবর্ণরের গোচর করিলে, নবকৃষ্ণ গোপীনাথ ফিরাইয়া দিতে আদিষ্ট হন। এ দিকে নবকৃষ্ণও গোপীনাথের অনুরূপ আর একটী গোপীনাথ প্রস্তুত করাইয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আসলটী বাছিয়া লইতে বলেন। গোপীনাথের পুরোহিত, স্বপ্নে গোপীনাথের আদেশ পাইয়া, ঘর্ম্ম-চিহ্ন দর্শনে আসলটী বাছিয়া লয়েন। ইহাতে নবকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দ ও দ্বিতীয় শ্রীগোপীনাথকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হন। তাঁহার এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়, বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, সাঁইবনের নন্দদুলাল, খড়দহের শ্যামসুন্দর, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিগ্রহ তাঁহার ভবনে আনীত হইয়াছিল।

পণ্ডিতগণের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা নবকৃষ্ণ বহু গায়ককে মাসিক সাহায্য প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। কবির দল ও আখড়াই গানের জন্য প্রসিদ্ধ রামনিধি গুপ্ত (নিধি বাবু), হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হরুঠাকুর), নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালা তাঁহার সভায় প্রতিপালিত হইতেন।

এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য বহুবিধ দানও ছিল। তৎকালে গঙ্গায় বড় বড় জাহাজ কেবল কলাগাছি পর্য্যন্ত আসিতে পারিত। যাত্রীগণের সুবিধার জন্য তিনি বেহালা হইতে কুল্‌পী পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ দীর্ঘ একটী পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেন। উহা "রাজার-জাঙ্গাল" নামে বিখ্যাত হয়। আজিও এই পথ বর্ত্তমান আছে।

কেবল স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতি নহে, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতায় গির্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য হেষ্টিংস ইংরাজ মহল হইতে মাত্র ৩৬০০০৲ টাকা চাঁদা তুলিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু নবকৃষ্ণ একাকীই পুরাতন কেল্লার নিকটবর্ত্তী গোরস্থান ও গোলা বারুদের আড্ডার জমী ৪৫৭৭৭৲ টাকায় ক্রয় করিয়া ইংরাজগণকে দান করেন। এইস্থানে যে গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়, তাহাই সেণ্ট্-জন্‌ চার্চ্চ বা পাথুরে-গীর্জ্জা। নবকৃষ্ণের এই দান সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

হেষ্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠার টাকা নবকৃষ্ণ প্রদান করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস কোম্পানীর প্রাপ্য তাঁহার ঋণ মিটাইবার জন্য, মহারাজ নবকৃষ্ণের নিকট হইতে খত লিখিয়া, তিন লক্ষ ঋণ গ্রহণ করেন, ইহারই কতকাংশ হইতে মাদ্রাসা প্রস্তুত হয়।

শোভাবাজার রাজবংশের বংশবৃক্ষ।
(দেওয়ান্) রামচরণ দেব।
রাম সুন্দর
মাণিক্যচন্দ্র
মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর
কৃষ্ণমোহন
ব্রজমোহন
গোপীমোহন
(নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র)
রাজা গোপীমোহন
রাজা রাজকৃষ্ণ
রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কে, সি, এস্, আই
রাজা বাহাদুর রাজেন্দ্র নারায়ণ
রাজা শিবকৃষ্ণ
রাজা বাহাদুর কালীকৃষ্ণ
রাজা দেবীকৃষ্ণ
রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ
রাজা মাধবকৃষ্ণ
মহারাজ কমলকৃষ্ণ
মহারাজ বাহাদুর স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ কে, সি, এস্, আই
রাজা যাদবকৃষ্ণ
নীলকৃষ্ণ
রাজা বিনয়কৃষ্ণ
(কুমারগণ) ব্রজেন্দ্র
গোপেন্দ্র
শৈলেন্দ্র
দীপেন্দ্র
মাধবেন্দ্র
ধীরেন্দ্র
জিতেন্দ্র

ইহা ব্যতীত কলিকাতা শোভাবাজারে—রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট এবং বাগবাজার ও কুমারটুলীতে গঙ্গার দুইটী ঘাট তাঁহারই কীর্ত্তি।

শক্তি ও অর্থের আধিক্য ঘটিলে, অনেকেরই পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, কিন্তু নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে এ যুক্তি বিশেষ সারবান নহে। কোম্পানীর কাগজপত্র হইতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে একটী মাত্র কারণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায়।

বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে বিখ্যাত ছিয়াত্তরে-মন্বন্তর সংঘটিত হয়, এই সময়ে নবদ্বীপাধিপতির প্রচুর রাজস্ব বাকী পড়ায়, তাঁহার কর্ম্মচারিগণ, রাজ্য ইজারা-বিলির প্রস্তাব করেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ ও কলিকাতার অন্যান্য বণিকগণ, ইজারা লইতে সম্মত হন। অতঃপর এই প্রস্তাবিত ইজারাদারগণ, খাজনা তহশীল করিতে আরম্ভ করিয়া, লোভবশতঃ নবদ্বীপাধিপতির স্বত্বনাশ করিতে উদ্যত হওয়ায়, তিনি পুনরায় জমিদারী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে ইজারাদারগণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করায়, তিনি ইজারাদারগণের বিপক্ষে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আদায়ের দাবী দিয়া অভিযোগ উপস্থিত করেন। নবকৃষ্ণ প্রভৃতি এই অভিযোগের কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। এই অভিযোগের মীমাংসার কোনও বিবরণ কোম্পানীর কাগজপত্রে পাওয়া যায় না।

ইহা ব্যতীত, শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলি সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হয়।

মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র, মহারাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর "শব্দকল্পদ্রুম" নামক এক সুবৃহৎ সংস্কৃত কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়া তাহা বিনামূল্যে দান করিয়াছিলেন। মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

মহারাজা নন্দকুমার।

মহারাজা নন্দকুমার খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, সম্ভবতঃ ১৭০৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরাজশক্তির অভ্যুদয়ের সময়ে, সম্ভ্রম গৌরব, প্রতিপত্তি ও প্রতিভায় মহারাজ নন্দকুমার অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার বহুঘটনাপূর্ণ জীবনী সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে, একখানি সুবিস্তৃত পুস্তক হইয়া পড়ে, এই জন্য আমরা এখানে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-কথার অবতারণা করিব।

মহারাজা নন্দকুমার কাশ্যপ গোত্রের পীতমুণ্ডী-গ্রামী, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পীতমুণ্ডী-গ্রামীরা কুলীন নহেন। তাঁহারা প্রথমে গৌণকুলীন ও পরে শ্রোত্রিয় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের ধবল ও মলিন নামে দুই শাখা আছে। নন্দকুমার ধবল শাখায় জন্মিয়াছিলেন। ইঁহার বংশীয়গণ কৌলিক উপাধি "পীতমুণ্ডী" পরিত্যাগ করিয়া "রায়" উপাধিতেই অভিহিত হইয়া আসিতেছিলেন। নিম্নে মহারাজার বংশবৃক্ষ দেওয়া হইল ;—

কাশ্যপ গোত্রীয়
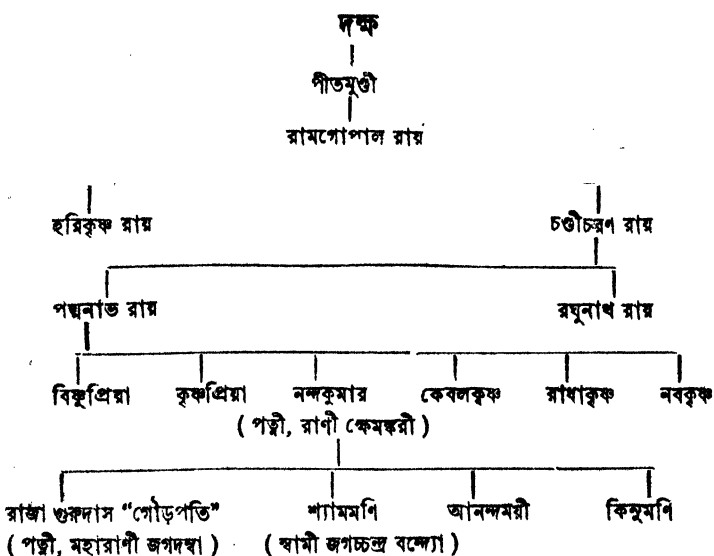
মুরশিদাবাদ জিলার জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত, জরুল গ্রামে নন্দকুমারের পূর্ব্বপুরুষের নিবাস ছিল। পরে রামগোপাল রায়, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত (অধুনা বীরভূমের) ভদ্রপুর (ভাদুর) গ্রামের আচারভ্রষ্ট মথুরানাথ মজুমদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, জ্ঞাতিবর্গের উৎপীড়নে ভদ্রপুর গ্রামেই আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণের প্রথমা পত্নীর গর্ভে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভ রায় জন্মগ্রহণ করেন।

নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভ রায়, বিচক্ষণ নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর অধীনে ফতেসিংহ, ঘোড়াঘাটা ও সাতশইকা এই তিনটী খাস পরগণার করসংগ্রাহকের (আমীন) পদে নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমার পরে পিতার

শিক্ষাধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, তাঁহারই সহকারী বা নায়েব-আমীনপদে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ তাঁহার বিষয়-কর্ম্মে দক্ষতার কথা নবাবের কর্ণগোচর হয়।

১৭৪০ অব্দে সরফরাজ খাঁর পতনের সহিত, আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। এই বিপ্লবের সময়, নন্দকুমারের বয়স ৩৫ বৎসর। বিপ্লব-শান্তির পর তিনি নবাব কর্ত্তৃক হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমীন নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহা হইতেই, তিনি এক বিষম বিপদে পতিত হন। তৎকালে আমীনগণ আদায়ের সমস্ত টাকা এক-কালে নবাব সরকারে পাঠাইতেন না। যেমন যখন আদায় হইত, তেমনি ভাবেই টাকা পাঠাইতেন। কয়েকটী অসুবিধার জন্য, সরকারে নন্দকুমারের ৮০ হাজার টাকা, অনাদায়ের দরুণ বাকী পড়ে। আইনানুসারে এ টাকার জন্য তিনিই দায়ী ছিলেন। আবার অন্যদিকে, তাঁহার তহ-শীলের পীড়াপীড়িতে, প্রজা ও জমীদারগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, নবাব আলিবর্দ্দির খালসা-দেওয়ান রায় রায়ান চয়েন রায়ের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। দেওয়ান ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মুর্শিদাবাদে আহ্বান করিলেন এবং বাকী টাকার জন্য অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। এই বিপদের সময়, তাঁহার পিতা তাঁহার এই ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। ইহার পর নন্দকুমার, নবাব শাহ আমেদজঙ্গের নায়েব, হোসেন কুলী খাঁর নিকট একটী কর্ম্ম প্রার্থনা করেন, কিন্তু খালসা-দেওয়ান বাহাদুরের বিরুদ্ধতায়, তাঁহার চাকুরী হইল না। অতঃপর নন্দকুমার উপায়ান্তর না দেখিয়া নানা কৌশলে প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর সহিত পরিচিত হইলেন।

এই সময়ে তাঁহার অদৃষ্টে আর একটী বিপদের সূচনা হইতেছিল। সৈন্যদলের বেতন বাকী পড়ায়, মুস্তাফা খাঁ কয়েকটী জমীদারী হইতে স্বয়ং টাকা আদায় করিয়া লইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহাতে পীড়নের আশ-ঙ্কায় জমীদারগণ এ ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য নন্দকুমারের শরণাপন্ন হন। নন্দকুমার স্বয়ং জামীন হইয়া জমীদারগণকে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করি-লেন বটে, কিন্তু উক্ত জমীদারগণ যথাসময়ে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন না। মুস্তাফা খাঁ, যথাসময়ে টাকা না পাওয়াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দকুমারকে বন্দী করিতে সঙ্কল্প করিলেন। নন্দকুমার কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। অনন্তর কিছুদিন পরে

মুস্তাফা ও দেওয়ান রায় মজকুরের মৃত্যু হইলে, তিনি পুনরায় মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া বহু চেষ্টায় সাতশইকা পরগণার আমীনের পদ লাভ করেন। কিন্তু এই কর্ম্মে তাঁহার প্রয়োজনমত আয় হয় নাই বলিয়া, তিনি অল্পদিন পরেই উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহাকে বড়ই অর্থ-কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে তাঁহার অর্থকষ্ট এতদূর বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে, যে হুগলী হইতে মুর্শিদাবাদে আসিবার উপযোগী অর্থের অভাবে, তাঁহাকে নিজের ব্যবহার্য্য একখানি বহুমূল্য শাল বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদে কিছুদিন অবস্থানের পর, নবাব সিরাজউদ্দৌলা নন্দকুমারকে হুগলীর ফৌজদারের অধীনে চাকুরী প্রার্থনা করিতে পাঠান। নন্দকুমার, নবনিযুক্ত ফৌজদার হেদায়ৎ আলীর অধীনে দেওয়ানী পদের প্রার্থী হন, কিন্তু তাঁহাকে বিফল-মনোরথ হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। এই সকল কারণে, তাঁহার অর্থকষ্ট এই সময়ে চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। যাহা হউক ইহার কিছুদিন পরে, মহম্মদ ইয়ার-বেগ খাঁ পুনরায় হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হইলে, নন্দকুমার তাঁহার বন্ধু সাদকউল্লার সহায়তায়, তাঁহার নিকট পরিচিত হন এবং তাঁহার অধীনে দেওয়ানী-পদ প্রার্থনা করেন। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষে ইয়ারবেগ সাহেব তাঁহাকেই দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। নন্দকুমারের আর্থিক কষ্ট দূর হইল এবং এই সময় হইতেই তিনি "দেওয়ান-নন্দকুমার" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

তিন বৎসর পরে ফৌজদার ইয়ার বেগ খাঁ, পুনরায় পদচ্যুত হন এবং দেওয়ান নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে নিকাশ দিতে আসেন। মুর্শিদাবাদে তাঁহার এক বৎসর বিলম্ব হয়। ইতোমধ্যে নবাব আলিবৰ্দ্দি খাঁ দেহত্যাগ করিলেন। যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইংরাজগণের সহিত বিবাদ বাধাইয়া বসিলেন এবং এই সংস্রবে রাজা মাণিকচাঁদকে কলিকাতায় ও মির্জ্জা মহম্মদ আলীকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু মহম্মদ আলীর দ্বারা শাসনের সুব্যবস্থা না হওয়ায়, নবাব তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ওমরউল্লাকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন এবং নন্দকুমারকে পুনরায় তাঁহার দেওয়ান করিয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে আবার ওমরউল্লাকেও পদচ্যুত করিয়া নন্দকুমারকেই হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন।

ক্লাইভ এই সময়ে চন্দনগর আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। নবাব এই সংবাদে বিরক্ত হইয়া, নন্দকুমারকে ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য রাজা দুর্ল্লভরামকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। এদিকে ইংরাজেরা এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া কলিকাতা-নিবাসী রাজা হুজুরী মলের ভগিনীপতি আমীরচাঁদকে (উমিচাঁদ) হুগলীতে পাঠাইলেন। তিনি ইংরাজদিগের পরামর্শ মত নন্দকুমারকে নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে, ফরাসী-দিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ করিলেন। উমিচাঁদের নিকট সিরাজের বিরুদ্ধে ওমরাহগণের ষড়যন্ত্রের বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া, নন্দকুমার ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইলেন। অনেকে অনুমান করেন, নন্দকুমারের এই আনুগত্য স্বীকারের অন্তরালে একটা গভীর উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল। তিনি তৎকালীন উদীয়মান ইংরাজ-শক্তির বিপক্ষে প্রকাশ্যভাবে দণ্ডায়মান না হইয়া কৌশলে তাহার দমনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

অতঃপর নন্দকুমারের কৌশলে, দুর্ল্লভরাম মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া গেলেন। ইংরাজগণ চন্দননগর আক্রমণ করিয়া তাহা জয় করিয়া লইলেন। একে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য এই সময়ে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহার উপর চন্দননগর জয় করাতে, ইংরাজের শক্তি যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইল। নবাব এই সময়ে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিয়া হুগলীতে অন্য একজন ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য্য কারণ সম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, নন্দকুমার পরিশেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর, মীরজাফর বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলে নন্দকুমার ক্লাইভের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার সহায়তায় ইংরাজগণের চন্দননগর জয়। ইহা ব্যতীত রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার যেরূপ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল, তাহাও ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। যাহা হউক, লর্ড ক্লাইভের দেওয়ানরূপে তিনি অসামান্য কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়া ইংরাজগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিপত্তিও এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, এই সময়ে লোকে তাঁহাকে "কালা-কর্ণেল" নামে অভিহিত করিত।

ক্লাইভ তাঁহার আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ, নবাবকে অনুরোধ করিয়া, হুগলী হিজলী প্রভৃতি স্থানের দেওয়ানী, নন্দকুমারকে প্রদান

করাইলেন এবং কোম্পানীর অধীনেও একটী দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের ভার দিলেন। নবাব মীরজাফর, সন্ধির প্রতিশ্রুত টাকা শোধ করিতে না পারায়, নদীয়া ও বর্দ্ধমানের রাজস্ব আদায় করিবার ক্ষমতা, ইংরাজগণকে ছাড়িয়া দেন। নন্দকুমার ১৭৫৮ অব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে, ইংরাজ পক্ষ হইতে এই দুই স্থানের তহশীলদারী পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ দুই স্থানের রাজাদিগকে ডাকাইয়া খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত স্থির করিয়া লন।

ইহার অল্পদিন মাত্র পরেই, এক বিশেষ ঘটনায় নন্দকুমারকে নবাব-সরকারের চাকুরী পরিত্যাগ করিতে হয়। নবাব মীরজাফর এই সময় বড়ই অর্থকষ্টে পতিত হন। এইজন্য তিনি সর্ব্বদাই রাজা রায়দুর্ল্লভ ও জগৎশেঠের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। অবশেষে রায়দুর্ল্লভের সহিত নবাবের বিবাদ বাধিয়া যায়। ইহার উপর আবার ঢাকার শাসনকর্ত্তা নবাবপুত্র মীরণ, রাজা রায়দুর্ল্লভের নিকট ঢাকা-বিভাগের হিসাবপত্রের নিকাশ তলব করেন। এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে উৎপীড়িত হইয়া, রায়দুর্ল্লভ নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহায়তায় কলিকাতায় পলায়ন করিতে সমর্থ হন। এই ব্যবহারে নবাব তাঁহাদিগের উভয়েরই উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু নন্দকুমারের নিকট হইতে ইংরাজগণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে অভয় দান করিলেন। অতঃপর নবাব প্রকাশ্যভাবে নন্দকুমারের কোন ক্ষতি করিতে না পারিয়া, তাঁহার প্রতি কার্য্যের দোষ ধরিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে নন্দকুমার ক্রমে ক্রমে উত্যক্ত হইয়া নবাব সরকারের চাকুরী পরিত্যাগ করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নন্দকুমার ইংরাজগণের অধীনে, নদীয়া ও বর্দ্ধমানের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। নবাবের সহিত ইংরাজের বন্দোবস্ত অনুসারে, এই রাজস্ব আদায় হইয়া প্রথমে নবাব-সরকারে ও পরে তথা হইতে ইংরাজ-কোম্পানীর নিকট যাইবার কথা ছিল। কিন্তু নন্দকুমার কাউন্সিলের সরাসরি ব্যবস্থা অনুসারে, তহশীলের টাকা একেবারেই কলিকাতায় লইয়া আসিতে লাগিলেন। ইহাতে নবাব-দরবারের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট ওয়ারেণ হেষ্টিংস, প্রকৃত ব্যাপার না জানিয়া, তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং কাউন্সিলের নিকট এই ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য জানিতে চাহেন। ক্লাইভ ইহার উত্তরে তাঁহাকে প্রকৃত সংবাদ অবগত করিলেও নন্দকুমারের এতদূর, প্রভুত্ব, হেষ্টিংসের মনঃপূত হইল না। নিজের স্বার্থে আঘাত

লাগায়, তিনি নানা উপায়ে নন্দকুমারের প্রভাব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়েই ক্লাইভ, নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করায়, তিনি নন্দকুমারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। হেষ্টিংস, রাজস্বের টাকা স্বহস্তে আদান প্রদান করিয়া, ইহার মধ্য হইতে কৌশলে কিছু নিজের তহবিলে ফেলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু কলিকাতা-কাউন্সিল, রাজস্ব-সম্বন্ধে নবাবকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখিতে মনস্থ করিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন।

ক্লাইভের পর ভান্সিটার্ট কলিকাতার গভর্ণর হইয়া আসিলেন। তিনি প্রথমতঃ নন্দকুমারকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার শত্রু হেষ্টিংসের প্ররোচনায়, তাঁহাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ভান্সিটার্ট, মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া, মীরকাসিমকে সিংহাসন প্রদান করেন। মীরজাফর পদচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আলিপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং নন্দকুমারের প্রতি পূর্ব্ব বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া, তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া পড়েন। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে ইংরাজের প্রাধান্য বৃদ্ধিতে নন্দকুমারেরও ক্ষমতা লোপ হইতেছিল। তিনি মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য, বিহার-প্রবাসী সম্রাট সাহ আলমের সহিত অতি গোপনে পত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দৈবদুর্ব্বিপাক-বশতঃ এই ষড়যন্ত্রের একখানি পত্র ইংরাজগণের হস্তগত হয়। অতঃপর নন্দকুমারের বাটী খানাতল্লাসী করিয়া ভান্সিটার্ট আরও কতকগুলি গুপ্ত পত্র প্রাপ্ত হন। হেষ্টিংস এই সকল পত্র পাইয়া মহা গণ্ডগোল আরম্ভ করেন এবং নন্দকুমার কোন প্রকারে এ যাত্রা অব্যাহতি পান।

এই সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ গুপ্তভাবে ব্যবসায় চালাইয়া, কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছিলেন। এ সম্বন্ধে কতকগুলি চিঠিপত্র নন্দকুমারের হস্তে পতিত হওয়ায়, নন্দকুমার সেইগুলি লইয়া কাউন্সিলে এক আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইহাতে বহু ইংরাজ, তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। যাহা হউক, এই আন্দোলনের ফলে কোম্পানীর কর্ম্মচারী মহলে দুইটী দলের সৃষ্টি হয়। এক দলে হেষ্টিংস ও ভান্সিটার্ট এবং অপর দলে আমিয়ট ও এলিস্ মুখপাত্র হন। বিহারের গোলমাল মিটাইবার জন্য কলিকাতায় নবাগত কর্ণেল কূটকে পাটনায় পাঠান সাব্যস্ত হইলে, কূট—আমিয়ট ও এলিসের পরামর্শে নন্দকুমারকে তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরূপে সঙ্গে লইয়া যান। নন্দকুমারের ইচ্ছা ছিল,

স্বাধীনচেতা নবাব মীরকাসিমকে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিয়া, তাঁহাকে ইংরাজদমনে প্রবৃত্ত করিবেন, কিন্তু নবাব তাঁহার অসীম ইংরাজানুরক্তির নিমিত্ত অবিশ্বাস করিয়া, তাঁহাকে নিজপক্ষে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই।

এই সময়ে "রামচরণ রায়" স্বাক্ষরিত কয়েকখানি গুপ্তলিপি আবিষ্কার হওয়াতে, নন্দকুমার আবার ইংরাজের সন্দেহনেত্রে পতিত হন। এই সকল পত্রে, ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস ছিল। এজন্য গভর্ণর তাঁহাকে প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া দেন। কিন্তু ইহার অল্প দিন পরে, মীর-কাসিমের পতনের পর, মীরজাফর যখন পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করিতে চাহেন। ইংরাজ পক্ষ প্রথমে এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেও, অবশেষে নবাবের অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইলেন। সম্রাটের সহিত সন্ধি হইবার পর, নবাব মীরজাফর আলি খান্ বাদসাহের নিকট হইতে "মহারাজা" উপাধি আনাইয়া নন্দকুমারকে প্রদান করিলেন। এই সময়ে নন্দকুমার দেওয়ান হইয়া, রাজস্ব আদায়ের যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত করেন।

মহারাজ নন্দকুমারের বিহারে অবস্থানকালে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের এক গুপ্ত পত্র, ইংরাজগণ ঘটনাচক্রে ধরিয়া ফেলেন। ইহাতে সপ্রমাণ হইল, নন্দকুমার বাদসাহের সাহায্যে ইংরাজদের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং বলবন্ত সিংহ এই ব্যাপারে মধ্যস্থ হইয়াছেন। এই পত্র পাইয়া ইংরাজেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। জেনারেল কার্ণাক নন্দকুমারকে প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু রাজা নবকৃষ্ণ ও অন্যান্য বহু সম্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ অনুরোধে, অবশেষে তিনি এ কার্য্যে নিরস্ত হন।

ইহার পর দুই বৎসরকাল ধরিয়া, নবাবের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য নন্দকুমার ইংরাজগণের সহিত প্রচুর বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতি ইংরাজগণের বিরক্তি ও ক্রোধ ইহাতে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হইলে, এই তর্ক বিতর্ক পরিসমাপ্ত হয়। মীর জাফরের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র নজমউদ্দৌলা নবাব হইয়া, নন্দকুমারকে দেওয়ান' নিযুক্ত করিবার জন্য, লর্ড ক্লাইভকে অনুরোধ করেন; কিন্তু ক্লাইভ এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ক্লাইভ এই সময়ে দ্বিতীয়বার গভর্ণর হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে নন্দকুমারের বন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে ভান্সিটার্টের তীব্র মন্তব্য পাঠ

করিয়া তাঁহার উপর বীতরাগ হইয়া উঠেন। মহারাজ নন্দকুমার পদচ্যুত হওয়ায়, তাঁহার স্থানে মহম্মদ রেজা খাঁ বঙ্গের নায়েব-সুবাদার হইলেন। ক্লাইভ, নন্দকুমারকে কেবল পদচ্যুত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না—পরন্তু তাঁহাকে চট্টগ্রামে নির্ব্বাসিত করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু এ বারেও মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, নন্দকুমার এ ঘোর বিপত্তি হইতে বাঁচিয়া যান।

ইহার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা দেওয়ান হওয়া সত্ত্বেও মহম্মদ রেজা খাঁকেই তাঁহাদিগের প্রতিনিধিরূপে, নায়েব দেওয়ান করিয়া দিলেন। এই মহম্মদ রেজা খাঁ ইতঃপূর্ব্বে নায়েব-সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, মুসলমান সমাজের উপর বড়ই আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাজা নন্দকুমারও হিন্দু-সমাজের সর্ব্ববাদিসম্মত নেতা ছিলেন।

নন্দকুমার সরকারী কার্য্য পরিত্যাগের পর, কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্লাইভ ক্রমে ক্রমে ভান্সিটার্টের শাসনের অনেক নিন্দা শুনিতে পাইয়া, নন্দকুমারকে উক্ত শাসনের একটী যথাযথ বিবরণী লিখিতে আদেশ করেন। নন্দকুমার উপযুক্ত তথ্যানুসন্ধান করিয়া, এক বিবরণী লিখিলে, ক্লাইভ এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের পর, ইহার সত্যতা-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া, তাহা বিলাতে লইয়া যান। ইহাতে নন্দকুমার ভান্সিটার্ট কর্ত্তৃক আপনার চরিত্রের উপর আরোপিত কতকগুলি অভিযোগ মিথ্যা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

লর্ড ক্লাইভের পর ভেরেলেষ্ট বাঙ্গালার গভর্ণর হন। তিনি প্রথম প্রথম নন্দকুমারকে বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু শেষে তাঁহার শত্রুপক্ষের প্ররোচনায়, তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়েন। কথিত আছে, মহারাজা নবকৃষ্ণ এই সময়ে নন্দকুমারের যথেষ্ট শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকারে ভেরেলেষ্টের বিরক্তি বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার কারণও ছিল। নন্দকুমার তখন সর্ব্ব বিষয়ে দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু নবকৃষ্ণ প্রভৃত ধনসঞ্চয় করিয়াও সমাজে কিছুমাত্র আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই নন্দকুমারের এই সামাজিক প্রতিপত্তির উপর তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, অর্থের সঙ্গে সঙ্গে নবকৃষ্ণ

অত্যধিক অত্যাচার পরায়ণও হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহারা নবকৃষ্ণের দ্বারা উৎপীড়িত হইত, তাহারা মহারাজা নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। নন্দকুমার ইহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। ইহাও তাঁহার উপর নবকৃষ্ণের ক্রোধের আর এক কারণ।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্টিয়ার সাহেব বঙ্গদেশের গভর্ণর হন। ইঁহার সময়েই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" আরম্ভ হয়। নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ, এই মন্বন্তরের অনুচরের ন্যায় ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বনাশকর অত্যাচারের তালিকায় বাঙ্গালার ইতিহাস কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে, তিনি বাজারের সমস্ত চাউল স্বয়ং ক্রয় করিয়া লইয়া, অত্যধিক উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং সরকারী তহবিল হইতে বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইহার উপর রাজস্ব আদায়ের জন্য, পৈশাচিক অত্যাচারেরও বিরাম ছিল না। প্রজার কষ্টে অত্যন্ত কাতর হইয়া, মহারাজা নন্দকুমার স্বীয় ব্যয়ে বিলাতে একজন এজেণ্ট পাঠাইয়া, ডিরেক্টারগণকে এই অত্যাচার-সংবাদ অবগত করান। এই প্রতিনিধি প্রেরণের ফলে, বিলাতের কর্ত্তারা হেষ্টিংসকে নন্দকুমারের সাহায্যে, সর্ব্বাগ্রে মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার করিতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস, মহম্মদ রেজা খাঁ ও পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা সিতাব রায়কে ধরিয়া আনাইলেন এবং বাধ্য হইয়া মহারাজা নন্দকুমারের উপরই এ বিষয়ের তদন্তের প্রধান ভার প্রদান করিলেন। এমন কি সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ, তিনি নন্দকুমারকে সমগ্র বঙ্গদেশের আমীন নিযুক্ত করিবার আশা পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন। গভর্ণরের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া, নন্দকুমার উভয়ের তহবিল-তছরুপাতের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁ নবাব-সরকারের বহুবিধ মূল্যবান রত্নালঙ্কার, হস্তী, অশ্ব এবং ১১৭২ সাল হইতে ১১৭৮ সাল পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে বাঙ্গালা ও ঢাকার রাজস্ব হইতে ২০ কোটী টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মন্বন্তরের সময় বাজারের সমস্ত চাউল একচেটিয়া করিয়া অত্যন্ত উচ্চদরে বিক্রয় করেন। এতদ্ভিন্ন কয়েকটী সরকারী-সম্পত্তির উপস্বত্ব নিজে ভোগদখল করিতেছিলেন। হুগলীর ফৌজদার রেয়াজউদ্দিন মহম্মদ খাঁ, শ্রীহট্টের ফৌজদার মহম্মদ আলী খাঁ, কোম্পানী বাহাদুরের নিকট প্রায় এক লক্ষ টাকার দায়ী ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর, তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি কোম্পানীর হস্তে না দিয়া, রেজা খাঁ নিজে ক্রোক করিয়া ভোগদখল করিতেছিলেন। পদচ্যুত হইয়াও নায়েব

সুবাদারের পদোচিত জায়গীর ও জমীদারী তখন পর্য্যন্ত দখল করিতে ছাড়েন নাই। আর সিতাব রায় ১১৭৩ (ফসলী) সালের প্রথম হইতে ১১৮১ (ফসলী) সালের শেষ পর্য্যন্ত, কমবেশ নব্বই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। নন্দকুমার এ বিষয়ে প্রমাণ জন্য, বহু গণ্যমান্য সাক্ষীও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া, মহম্মদ রেজা খাঁ হেষ্টিংসকে দশ লক্ষ ও নন্দকুমারকে দুই লক্ষ এবং সিতাব রায় হেষ্টিংসকে চারি লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে চাহেন, কিন্তু হেষ্টিংস ও নন্দকুমার উভয়েই ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহার অল্পদিন পরে, নজমউদ্দৌলার নাবালক পুত্র মোবারকউদ্দৌলা সিংহাসন গ্রহণ করিলে, তাঁহার অভি-ভাবক হইবার জন্য তাঁহার মাতা বহু বেগম ও তাঁহার বিমাতা মণি-বেগম উভয়েই আবেদন করিয়াছিলেন। মণিবেগম, নন্দকুমারের মধ্যস্থতায় হেষ্টিংসকে আড়াই লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদান করিতে চাহেন। ইহার পর নন্দকুমার স্বীয় পুত্র গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করিলে, হেষ্টিংস তাঁহার নিকট হইতেও কিছু নজর চাহেন। নন্দকুমারও লক্ষাধিক টাকা প্রদান করিয়া, মণিবেগম ও গুরুদাসের নিয়োগপত্র সংগ্রহ করেন। রাজা গুরুদাসের নিয়োগ-ব্যাপারে, হেষ্টিংস কাউন্সিলের মতামত উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন।

তাহার পর মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের বিচার চলিতে লাগিল। ইহাঁদিগের বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও, হেষ্টিংসের দুই বর্ষব্যাপী বিবেচনার ফলে ও বিচারে তাঁহারা নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেন। সিতাব রায় মুক্তিলাভের পর অল্পকাল মাত্রই জীবিত ছিলেন। যাহা হউক, হেষ্টিংস সাধারণের চক্ষে নন্দকুমারকে এইরূপে অপদস্থ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, পরন্তু ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এই মোকদ্দমার বিবরণী বিলাতে পাঠাইবার সময়, তাহাতে তাঁহাকে শঠ, প্রবঞ্চক, অকৃতজ্ঞ প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করেন। ইহার পর পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি মত, মহারাজাকে বঙ্গদেশের আমীনপদে নিযুক্ত করা দূরে থাক, কি অপরাধে তাঁহাকে এরূপ গালি দেওয়া হইয়াছে, হেষ্টিংস তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

এই সময়ে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ, ভারতের শাসন-কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য "রেগুলেটিং-অ্যাক্ট" বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন-অনুসারে, হেষ্টিংস বঙ্গদেশের গভর্ণর জেনারেল হইলেন এবং তাঁহার

সাহায্য করিবার জন্য জেনারেল ক্লেভারিং, কর্ণেল মন্‌সন ও ফিলিপ ফ্রান্‌সিস ও বারওয়েল নামে চারিজন অতিরিক্ত সভ্য কাউন্সিলের সদস্যরূপে নিযুক্ত হন। ইহা ব্যতীত, কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের বিচার-পদ্ধতি সুসংস্কৃত করিবার জন্য, সার ইলাইজা ইম্পে প্রধান বিচারপতি এবং হাইড, লিমষ্টের ও চেম্বার্স নামক আর তিনজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি সরকারী বিচারকরূপে নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতি ইম্পে, গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন এই সকল নব-নিযুক্ত কর্ম্মচারী চাঁদপাল ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সম্মানার্থ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গপ্রাকার হইতে ২৭টী তোপধ্বনি হইল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য কয়েকজন সামান্য মাত্র কর্ম্মচারী ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। হেষ্টিংসের এই অহঙ্কার-পূর্ণ ব্যবহারে, তাঁহার সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট নবাগত সদস্যবর্গ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। যাহা হউক, তাঁহারা ইহার পর সভায় হেষ্টিংসের কৃতকর্ম্মের ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং এই ব্যাপারে অনেকটা নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা দেবীসিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, মিঃ গুড্‌ল্যাড, মুক্তিপ্রাপ্ত রেজা খাঁ ও মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতি হেষ্টিংসের অনুচরগণ কর্ত্তৃক জমীদার ও প্রজাবর্গ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারা প্রতীকারের আশায় নন্দকুমারের শরণাপন্ন হইলেন। একেই ত নন্দকুমারের উপর হেষ্টিংস প্রথম হইতেই বিরূপ ছিলেন, ইহার উপর আবার এক্ষণে তাঁহাকে তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বলিয়া ধারণা জন্মিল।

এ দিকে কাউন্সিলের সভ্যগণের সহিত নন্দকুমারের পরিচয় হইল। তাঁহারা নন্দকুমারের সম্যক পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকেই হেষ্টিংসের অবিচার ও অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহের ভারগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। নন্দকুমারও ইদানীং হেষ্টিংসের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি এই প্রস্তাবিত ভার গ্রহণ করিতে সহজেই স্বীকৃত হইলেন।

ইহার পর তিনি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ একত্র করিয়া এক আবেদন-পত্র প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা কাউন্সিলের সদস্য মিঃ ফ্রান্সিসের হস্তে প্রদান করিলেন। এই সময়ে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধমতাবলম্বী মিঃ ফ্রান্সিসের সহিত নন্দকুমারের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হইতে দেখিয়া, হেষ্টিংস

নন্দকুমারের সর্ব্বনাশের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। বর্দ্ধমানের রাজস্ব আদায় লইয়া রেসিডেণ্ট মিঃ গ্রেহামের সহিত নন্দকুমারের পূর্ব্ব হইতেই মনান্তর ছিল। বোলাকিদাস শেঠ নামক একজন আগরওয়ালা মণিকারের মৃত্যুর পর, হিসাবাদি লইয়া তাহার আমমোক্তার মোহন-প্রসাদের সহিত নন্দকুমারের বিবাদ হইয়াছিল। আর নন্দকুমারের আপন জামাতা কুণ্ডঘাটা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বশুরের সহিত তুলনায় নিজের হীনতার জন্য শ্বশুরের উপর অকারণে বিরূপ ছিলেন। হেষ্টিংস নন্দকুমারকে জব্দ করিবার মতলবে এই তিন ব্যক্তিকে হস্তগত করিলেন। এ দিকে কাউন্সিলের সদস্যগণের সহিত হেষ্টিংসের প্রকাশ্য বিবাদ চলিতে লাগিল। হেষ্টিংস তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই বাধা পাইয়া দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন।

ইহার পরে যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহাতে তদানীন্তন কলিকাতা তথা সমগ্র বঙ্গদেশে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। সমগ্র হিন্দু সমাজ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যাপারটী ইতিহাস-বিখ্যাত—"নন্দকুমারের ফাঁসী।"

নন্দকুমারের ফাঁসী-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান, অথবা উভয় পক্ষের দোষগুণ বিচার, বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এখানে সংক্ষেপে কেবল ঘটনাগুলির উল্লেখ করিলাম মাত্র।

হেষ্টিংস নন্দকুমারের সর্ব্বনাশে কৃতসংকল্প হইয়া কমলউদ্দিন খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে হাত করিয়া তাঁহার নামে একটী মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, কিন্তু এই মোকদ্দমার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া উঠায়, হেষ্টিংস নিরাশ হইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একখানি অঙ্গীকার-পত্র জালের অভিযোগ আনীত হয়। তৎকালে ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে—অর্থাৎ তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জের বিধানানুসারে "জাল" এবং "খুনের" অপরাধের দণ্ড একরূপই ছিল। এজন্য হেষ্টিংস এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

মীরকাসিমের আমল হইতে বোলাকিদাস জহুরীর, জহরতের কারবার ছিল। নন্দকুমারের সহিত বোলাকিদাসের কারবার চলিত। মীরকাসিমের আমলে, নন্দকুমার এক ছড়া মুক্তার কণ্ঠী, এক খানি কলকা, একটী শিরপেচ ও চারিটী হীরকাঙ্গুরী বোলাকিদাসকে বিক্রয় করিতে দেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় কাশিমবাজার লুঠ হওয়ায়, বোলাকিদাসের নিজের মালামালের

সহিত এগুলিও লুঠ হয়। অতঃপর বোলাকিদাস, নন্দকুমারকে সেই দ্রব্যগুলির মূল্যবাবৎ ৪৮,০২১৲ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেন এবং শতকরা চারি আনা সুদ দিতেও স্বীকার করেন। এই দলিলে মাতাব রায় (মহাতাপ রায়), মহম্মদ কমল ও বোলাকির উকীল সিলাবৎ সাক্ষী হইয়া সহি করেন। তৎপরে বোলাকি, নিজের সহি ও মোহর করিয়া দিয়া, উহা নন্দকুমারকে প্রদান করেন।

কোম্পানীর নিকট বোলাকির দুই লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। বোলাকির মৃত্যুর পর এই টাকা আদায় হইলে, তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক পদ্মমোহন দাস নন্দকুমারের পাওনা টাকা পরিশোধ করেন। অতঃপর পদ্মমোহনের মৃত্যুর পর, বোলাকির এক আত্মীয় গঙ্গাবিষ্ণু এই টাকার হিসাব লইয়া নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু নন্দকুমার পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার-পত্রের বলে, এই মোকদ্দমায় জয়ী হন।

এক্ষণে হেষ্টিংসের মনে সেই মোকদ্দমার কথা উদয় হইবামাত্র, তিনি বোলাকির আমমোক্তার মোহনপ্রসাদকে দিয়া, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে বোলাকির উক্ত অঙ্গীকার-পত্র জাল করার দাবীতে, এক অভিযোগ উপস্থিত করাইলেন (১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে)। অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রীম কোর্টের জজেরা তৎকালীন সেরিফ মিঃ ম্যাক্রেবীকে আদেশ দিয়া, নন্দকুমারকে কারারুদ্ধ করাইলেন। নন্দকুমারের মত গণ্যমান্য সমাজনেতা পদস্থ ব্যক্তিকে সাধারণ কারাগারেই থাকিতে হইয়াছিল। সাধারণ্যে বিশেষ আন্দোলন সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা জজগণ সঙ্গত মনে করেন নাই। কারাগারে নন্দকুমার উপর্য্যুপরি তিন দিন জলগ্রহণও না করায়, অবশেষে কারাগারের উঠানে একটী তাঁবু খাটাইয়া, সেই খানেই তাঁহাকে স্নান পূজার ও আহারের অধিকার দেওয়া হয়।

৮ই জুন জাল মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। ৯ই জুন প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে, অন্য তিন জন বিচারপতি এবং ১২ জুন জুরী বিচার আরম্ভ করিলেন। কয়েকদিন ব্যাপী মোকদ্দমার পর অবশেষে ১৫ই জুন অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বিচার হইয়া তৎপরদিন মহারাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

নন্দকুমার দণ্ডাদেশের পর ২২ দিন যাবৎ কারাগারের একটী দ্বিতল গৃহে আবদ্ধ ছিলেন। নবাব মবারকউদ্দোলা কাউন্সিলে এই মর্ম্মে একটী পত্র প্রেরণ করেন যে, ইংলণ্ডাধিপতির নিকট এই ব্যাপার লিখিয়া পাঠান

হউক এবং তাঁহার আদেশ না আসা পর্য্যন্ত, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড স্থগিত থাকুক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নবাবের এ অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই।

৫ই আগষ্ট তারিখে, খিদিরপুরের নিকট কুলীবাজারে (আধুনিক হেষ্টিংস) মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী হইয়া গেল। কথিত আছে, বহু স্বধর্ম্মানুরক্ত ব্রাহ্মণ এই ঘটনার পর কলিকাতায় বাস করিতে ভীত হইয়া, গঙ্গার অপর পারে যাইয়া বাস করেন।

জানবাজারের মাড়বাবুগণ।

(রাণী রাসমণি)

পলাশী-যুদ্ধের চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, এক দরিদ্রের গৃহে প্রীতিরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গলা ভাষা ও গণিত শিক্ষা করিয়া ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, মাতৃ-পিতৃহীন প্রীতিরাম, রামতনু ও কালীপ্রসাদ নামক দুই কনিষ্ঠ সহোদর সহ কলিকাতায় জানবাজারের তদানীন্তন বিখ্যাত জমিদার মান্নাবাবুদিগের পুরস্ত্রী, তাঁহার পিতৃস্বসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অল্প ইংরাজি ভাষা শিখিয়া দালালী ও ফোর্টউইলিয়ম দুর্গে ইংরাজসৈন্যের রসদ যোগাইবার কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে ফোর্টের জনৈক পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া প্রীতিরাম তাঁহার সহিত ঢাকায় গমন করেন ও তথায় উক্ত ইংরাজের সহায়তায়, নাটোর রাজসরকারে এক বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ বৎসর বয়সে, প্রীতিরাম সঞ্চিত অর্থসহ নাটোর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, আশ্রয়দাতা মান্না-পরিবারের, যুগলমান্নার একাদশ বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ ফলে, জান-বাজারের কয়েকখানি বাড়ী ও ষোল বিঘা জমি যৌতুক লাভ করেন। এই বিবাহের ফলস্বরূপ ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম পুত্র হরচন্দ্র এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতায় আসিয়া, প্রীতিরাম আমদানী ও রপ্তানীর কার্য্য করিতেন। পরে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বরণ কোম্পানী নামক তদানীন্তন ইংরাজ-বণিকদলের মুৎসুদ্দি পদে নিযুক্ত হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে, নাটোররাজের অধিকারস্থ কয়েকটী পরগণা লাটে উঠিলে, দেওয়ান শিবরাম সান্ন্যালের সহায়তায়, প্রীতিরাম উনিশ হাজার টাকায়, মকিমপুর পরগণা খরিদ করিলেন। কনিষ্ঠ সহোদর কালীপ্রসাদ নবক্রীত পরগণার নায়েবী কার্য্যভার গ্রহণ

করিয়া এই জমীদারী হইতে কলিকাতার বাটীতে বাঁশ, কাঠ, মৎস্য প্রভৃতি চালান দিতে লাগিলেন। প্রীতিরাম ঐ সকল পণ্য বিক্রয়ের জন্য, বেলেঘাটায় একটি আড়ত স্থাপন করিলেন। সেকালে অনেকগুলি বাঁশ একত্রে বাঁধিয়া নদীতে ভাসাইয়া আনা হইত। ইহাকে চলিত কথায় "বাঁশের মাড়" বলে, বংশ-ব্যবসায়ী প্রীতিরাম এইরূপে "মাড়" নামক ব্যবসায়গত উপাধি লাভ করেন। এই সময়েই বেলেঘাটায় একটি লবণের আড়ত স্থাপিত হয়।

প্রীতিরাম, পুত্রদ্বয়কে তৎকালসুলভ শিক্ষা প্রদান করিয়া, তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে, কনিষ্ঠ রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ ও সেই বৎসরেই স্ত্রীবিয়োগ হইলে, প্রীতিরাম পরবৎসর পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দেন। সে স্ত্রীও বিবাহবৎসরেই গতায়ু হন। ঐ বৎসরেই জ্যেষ্ঠপুত্র হরচন্দ্র একমাত্র বিধবা রাখিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রীতিরাম, কনিষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্রের তৃতীয়বার বিবাহ দেন। রাজচন্দ্রের এই সহধর্ম্মিণী, উত্তরকালবিখ্যাতা রাণী রাসমণি। প্রীতিরামের জীবদ্দশায় রাজচন্দ্র ও রাসমণির দুইটি কন্যা—পদ্মমণি ও কুমারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে প্রীতিরাম, জানবাজারের বর্ত্তমান সুবৃহৎ পারিবারিক আবাস নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। সার্দ্ধ ছয়লক্ষ মুদ্রা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে চৌষট্টি বৎসর বয়সে, প্রীতিরাম দাস পরলোক গমন করেন।

প্রীতিরামের মৃত্যুর পর, পুত্র রাজচন্দ্র পিতার ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান ও উন্নতিবিধান করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে কলভিন কাউই কোম্পানীকে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া, তিনি তসরের চাদর, মৃগনাভি, অহিফেন, নীল প্রভৃতি দ্রব্য বিলাতে রপ্তানী করিতেন। রাজচন্দ্র ব্যবসায়দক্ষ ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। নিলামে পঁচিশ হাজার টাকার অহিফেন ক্রয় করিয়া সেই দিনেই পঁচাত্তর হাজার টাকায় তাহা বিক্রয় করতঃ, তিনি একদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করেন।

পিতৃবিয়োগ বৎসরেই রাজচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ী ভূমিষ্ট হন। পর বৎসর রাজচন্দ্র জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজচন্দ্রের পত্নী রাসমণি এক মৃতপুত্র প্রসব করিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ী একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করিলে, রাজচন্দ্র পরবৎসর কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার সহিত করুণাময়ীর স্বামী মথুরামোহন

বিশ্বাসের বিবাহ দেন। মথুরামোহন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রথম ভক্ত।

রাজচন্দ্র প্রভূত অর্থোপার্জ্জন ও বিষয় সম্পত্তি করিয়া গিয়াছিলেন এবং সৎকার্য্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন। তিনি দশ বার জন ছাত্রের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পত্নীর প্রার্থনায়, সাধারণের স্নানের জন্য, রাজচন্দ্র "বাবুঘাট" প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে একটী রাস্তা নির্ম্মাণ, বেলেঘাটার খালখনন, নিমতলায় পুরাতন ঘাট ও মুমূর্ষুনিবাস স্থাপন, আহীরিটোলার ঘাট নির্ম্মাণ, মেটকাফ্ হলে পাঁচহাজার টাকা দান এবং হিন্দুকলেজে ও দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে অর্থসাহায্য প্রভৃতি বিবিধ সদনুষ্ঠান তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ দর্শনে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজচন্দ্রকে "রায়" উপাধিমণ্ডিত করেন। রাজসম্মান লাভের তিন বৎসর পরে, পয়ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে, রায় রাজচন্দ্র দাস পরলোক গমন করেন। রাজচন্দ্রের নির্ম্মিত ঘাট, তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের সম্মানার্থে ও সাধারণের স্নানের জন্য নির্ম্মিত হয়। এই ঘাট এখনও বর্ত্তমান, এবং "বাবুঘাট" বলিয়া, সাধারণে বিখ্যাত ও ইডেন গার্ডেনের সান্নিধ্যে সংস্থাপিত।

রাজচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী রাসমণি দাসী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হালিসহরের নিকবর্ত্তী এক গণ্ডগ্রামে কোন কৃষ্ণভক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস ও মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। হরেকৃষ্ণর কয়েকটী পুত্র ছিল, একমাত্র কন্যা রাসমণি তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার সন্তান। হরেকৃষ্ণ শ্রমজীবি ছিলেন। কায়িক পরিশ্রমে যাহা-কিছু উপার্জ্জন করিতেন, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহার সমস্তই ব্যয়িত হইত এবং সঞ্চয়ের জন্য প্রায় কিছুই থাকিত না। তিনি বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন এবং কন্যা রাসমণিকে স্বয়ং লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে, রাসমণির মাতৃ-বিয়োগ হয়।

রাজচন্দ্রের দ্বিতীয় বার স্ত্রী-বিয়োগ হইলে, বধূ অন্বেষণে প্রেরিত প্রীতিরামের লোক, হালিসহরে জাহ্নবী তীরে জীর্ণ বস্ত্র পরিধানা, গৌরবর্ণা, পরম লাবণ্যময়ী রাসমণিকে দেখিয়া ও তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহাকেই রাজচন্দ্রের ভাবী-পত্নী মনোনীত করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে একাদশ বর্ষ বয়সে

রাসমণি রাজচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হন। রাজচন্দ্র রাসমণির পিতৃ-গৃহে প্রাপ্ত শিক্ষার যথেষ্ট উৎকর্ষ বিধান করেন। তাঁহাদের তেত্রিশ বৎসরের দাম্পত্যজীবন, পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাসমণির পিতৃ-বিয়োগ ও তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে রাজচন্দ্র পরলোক গমন করিলে, রাসমণি পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, পতি-পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

রাসমণি তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিশালিনী ছিলেন। ভাগীরথীতে মৎস্য ধরিবার জন্য, ধীবরগণের উপর করস্থাপনের চেষ্টা এই প্রতিভাময়ী রমণীর অব্যর্থ কৌশলে নিষ্ফল হইয়াছিল। পতিবিয়োগের পর বৎসর, রাসমণি জান-বাজার বাটীতে মহাসমারোহে রাসোৎসব করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রথ-যাত্রার জন্য এক রৌপ্যরথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এ রথ এখনও বর্ত্তমান। এই জন্য দুইটী উৎসব ব্যতীত রাসমণি শরৎকালে আনন্দময়ী শারদীয়া প্রতিমার বাৎসরিক অর্চ্চনার অনুষ্ঠান করিতেন। লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহার স্বভাবতঃই একটা উৎসাহ ছিল। সোনাই, বেলেঘাটা ও ভবানী-পুরের বাজার, কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষু নিবাস, হালিসহরে জাহ্নবী তীরে ঘাট, সুবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কতকদূর পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে তীর্থযাত্রা করিয়া, রাসমণি ধর্ম্মকামনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। পুরীধামে তিনি তিন খানি বৃহৎ ও কয়েকখানি ক্ষুদ্র সুবর্ণ-মুকুট, জগন্নাথদেবকে প্রদান করেন ও সর্ব্বসাধারণকে এক দিন মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। এই তেজস্বিনী ও দয়াবতী রমণী, দয়া ও দানমুগ্ধ জনসাধারণ কর্ত্তৃক, "রাণী রাসমণি" নামে অভিহিত হইতেন।

দেবালয় নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া, রাসমণি বারাণসীতে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে বারাণসী প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাইতে হইলে ধনীর পক্ষে জলপথই প্রশস্ত ছিল। বিশ্বেশ্বর দর্শনাভিলাষিণী রাণী রাসমণি, প্রয়োজনীয় খাদ্য, রক্ষক, চিকিৎসক, অনুচর এবং আত্মীয়বর্গ সমভিব্যাহারে বারাণসী যাত্রার উদ্দেশ্যে, পঁচিশখানি বজরা সজ্জিত করাইলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার এ সঙ্কল্প সহসা পরিবর্ত্তিত হইল। তখন বঙ্গে ঘোর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। রাসমণি গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া বজরায় যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ছিল, তাহা দরিদ্রসাৎ করিলেন। বারাণসীর পরিবর্ত্তে, তিনি নিম্ন বঙ্গে ভাগীরথী

তীরে দেবালয় নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। এই সদিচ্ছার পরিণতি, পুণ্যভূমি দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন ও সুবিখ্যাত কালী-মন্দির। বারাণসীতে ক্রীত ভূমিখণ্ডে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৯ মার্চ্চ (১৩০০ সাল ৬ই চৈত্র) সোমবার রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোকানাথ বিশ্বাস "ত্রৈলোক্যেশ্বর" নামক শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, দেব-সেবার নিত্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, মাসিক চারি শত টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন।

রাসমণি তাঁহার জামাতা মথুরামোহনের উপর স্থান নির্ব্বাচন ও দেবালয় নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করেন। দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরতী-তীরে কোম্পানীর বারুদাগারের দক্ষিণে, কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের হেষ্টিং নামক এক জন ইংরাজ এটর্ণী, কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বসবাস করিতেন। মথুরামোহন এই কুঠী সমেত, ষাট বিঘা জমী ক্রয় করিয়া, তাহাতে দেবালয় প্রস্তুত করিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে মে (১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতি-বার স্নানযাত্রার দিবসে, রাসমনির ইষ্টদেবতার নামে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই উপলক্ষে সেই শুভদিনে নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থান, এমন কি সুদূর কাণ্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা, প্রভৃতি স্থান হইতে আমন্ত্রিত বহু অধ্যাপক, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ সমাগত হয়েন এবং প্রত্যেকে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং পাথেয় ও বিদায় হিসাবে, অন্যূন একটি স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়া-ছিলেন। দেবালয় নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, রাসমণি নয়লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন এবং পাঁচলক্ষ মুদ্রা বিনিময়ে, ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলায়, ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণা ক্রয় করিয়া তাহা দেবালয়ের সম্পত্তি করিয়া দেন। রাসমণির এই কীর্ত্তির অনুকরণে তাঁহার কন্যা জগদম্বা দাসী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, ১২ই এপ্রিল (১২৮১ সাল ৩০শে চৈত্র) তিনলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে, বারাকপুরের সন্নিহিত টিটাগড়ে অন্নপূর্ণার মন্দির এবং দৌহিত্রের পুত্রবধূ গিরিবালা দাসী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন (১৩১৮ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার, দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আগড়পাড়ায় রাধাকৃষ্ণের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

রাসমণি তাঁহার মকিমপুর জমীদারীর প্রজাগণকে, নীলকরের ভীষণ অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন এবং প্রজার মঙ্গলের জন্য দশসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে, মধুমতীর সহিত নবগঙ্গার খালের সংযোগ বিধান করেন। এই নবখনিত খালের নাম টালার খাল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের সময় যখন সকলেই কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে ব্যস্ত, রাসমণি

সেই সময়ে বিস্তর কাগজ খরিদ করিয়াছিলেন। সেই অশান্তি ও গোল-যোগের সময়, তিনি কোম্পানীকে ছয়টী হস্তী, প্রচুর খাদ্য ও অর্থদান করিয়াছিলেন। চব্বিশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্যময় জীবন যাপনের পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১২৬৭ সাল ৯ই ফাল্গুন) মঙ্গলবার জ্বর রোগে এই পুণ্যবতী রাণী রাসমণি পরলোকে গমন করেন।

দক্ষিণেশ্বরের একখানি ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় ইহার লেখক। প্রসাদবাবুর লিখিত কাহিনী হইতে পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি সংগৃহীত হইল।

দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ।

(জোড়াবাগান)

দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র এবং রাজা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র। তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত কেটিয়ারী নামক গ্রাম হইতে আসিয়া, কলিকাতায় বসতি করেন এবং গভর্ণমেণ্টের অধীনে পাটনার আফিমের কুঠীর দেওয়ান হইয়া, প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। ইংরাজী ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি ইংরাজ ও দেশীয় সকলের কাছেই সমাদৃত হইয়াছিলেন। তিনি নিমতলায় একটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহা তখনকার বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ককে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং নিমতলার আনন্দ-ময়ীর মন্দির, তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দির সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।

দেওয়ান রাধামাধব, কলিকাতা ও সহরতলীতে বহু সম্পত্তি, উড়িষ্যায় অনেকগুলি জমিদারী এবং বহু অর্থ রাখিয়া যান। তাঁহার পাঁচ পুত্র— নবকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, শম্ভুকৃষ্ণ, শিবকৃষ্ণ ও তারাকৃষ্ণ। ইহাদের মধ্যে প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চমপুত্রের সন্তানাদি হয় নাই। দ্বিতীয় তৃতীয়ের প্রত্যেকের দুই কন্যা। শিবকৃষ্ণ তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। তিনি ননীমোহনকে পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

শিবকৃষ্ণ প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তিনি নানা প্রকার ঘোড়া ও গাড়ী ভাল বাসিতেন। একজন শ্রেষ্ঠ দরের অশ্বারোহী বলিয়াও তাঁহার একটা প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু একটী বিশেষ দোষ ছিল। তিনি গাড়ী চালাইয়া যাইবার সময় তাঁহার গাড়ীর নিকটে যে কেহ

আসিত, তাহাকেই চাবুক মারিতেন, এই দুর্ব্যবহারে অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়া উঠে। তিনি পৈত্রিক জমিদারী সংক্রান্ত এক মোকদ্দমায় চৌদ্দ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরিত হন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, নির্ব্বাসন মুক্তির পর ফিরিবার পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বীপান্তরের পূর্ব্বে, তিনি মহেশের বাৎসরিক রথযাত্রা উৎসবের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। জনপ্রবাদ এই, যে দীপান্তরকালে সুদূর আণ্ডামানে তিনি মহা সমারোহে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।

শেঠ ও বসাক বংশ।

শেঠগণ প্রথমে গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু পরে সুবর্ণগ্রাম, ঢাকা, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ এবং হুগলী জিলার হলুদপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা প্রথমে সূত্রপ্রস্তুতের কার্য্য করিতেন, কিন্তু পরে বস্ত্রাদির ব্যবসাদার হইয়া পড়েন। তাঁহারা ব্যবসায়ের অনুরোধে, বঙ্গের প্রত্যেক বড় বড় সহরেই বাস করিতেন এবং ভারতে পর্টুগিজ ও ওলন্দাজগণের আগমনের সময় হইতে কলিকাতায় ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রবাদ আছে —পলাশীর যুদ্ধের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, ধনশালী শেঠগণ তথনকার জঙ্গলময় কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং গোবিন্দজীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার জন্য একটী মন্দির উৎসর্গ করেন। কলিকাতা নগরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর, শেঠগণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বসাকগণকে আনয়ন করিয়া কলিকাতায় সংস্থাপিত করেন। বসাকগণের সহিত বিবাহের আদান প্রদানই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। বসাকগণও ধনী ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে আলিবর্দ্দি খাঁর আমলে, ব্যবসায়-ব্যপদেশে মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে বাস করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ইদানিন্তনকালে কলিকাতার শেঠ ও বসাকগণের সঙ্গে উক্ত স্থানের বসাকগণের বিবাহাদি চলে না।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী যখন বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তখন তাঁহারা শেঠ ও বসাকগণের গোবিন্দপুরের জমির পরিবর্ত্তে, তাঁহাদিগকে বড়বাজারে জমি প্রদান করেন। শেঠগণ, এই সময়ে তাঁহাদের কুলদেবতা গোবিন্দজীউকে বড়বাজারে স্থানান্তরিত করেন। বড়বাজারে স্বর্গীয় বৈষ্ণবদাস শেঠের আবাসবাটীর সান্নিধ্যে, বর্ত্তমান টাকশালের নিকট এই মূর্ত্তি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। শেঠ ও বসাকগণের মধ্যে

তৎকালে কেবল পাঁচজন মাত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম—যাদবেন্দু শেঠ ও বৈষ্ণবদাস শেঠ, শোভারাম বসাক, বৃন্দাবন বসাক ও কৃষ্ণচন্দ্র বসাক। যাদবেন্দু শেঠ ও বৈষ্ণবদাস শেঠ অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। যাদবেন্দু শেঠ কলিকাতার বাঁশতলা গলির ৫ নং বাটীতে রাধাকান্তজীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহটী পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল। প্রবাদ আছে, বৈষ্ণবদাস শেঠ গঙ্গাজলে কলসী পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া এবং তাহাতে শীলমোহর করিয়া সোমনাথ ও দ্বারকানাথ দেবের পূজার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রপৌত্রগণ পর্য্যন্ত এই প্রথা বজায় রাখিয়াছিলেন।

যাদবেন্দু শেঠের দুইজন বংশধর—চৈতন্যচরণ শেঠ ও আনন্দচন্দ্র শেঠও অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর চৈতন্যচরণের নানা সদ্‌গুণ ও বদান্যতার জন্য তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে চল্লিশ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। রাধাকৃষ্ণ শেঠের পুত্র মাধবচন্দ্র শেঠ, চৈতন্যচরণ ও আনন্দচন্দ্র উভয়েরই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

যাদবেন্দুর আর একজন বংশধর নন্দলাল শেঠের পৌত্র, রাধাকান্ত শেঠ হিন্দুকলেজের প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর K. C. S. I. তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার পুত্র প্রিয়নাথ শেঠ।

তারিণীচরণ বসাক, শোভারাম বসাকের বংশধর রাধাকৃষ্ণ বসাকের পুত্র। বৃন্দাবনচন্দ্র বসাকের বংশধরগণ কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বসাকের বাসভবন বিডন স্কোয়ারের নিকট চিৎপুর রোডের উপর আজিও অবস্থিত রহিয়াছে।

এই শেঠ ও বসাকবংশ কলিকাতার অতি প্রাচীন অধিবাসী। কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও ইঁহারা বেতড়ের হাটে, পর্টুগীজদিগের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। জবচার্ণক জঙ্গলের মধ্যস্থিত স্থানে, কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে, শেঠগণ গোবিন্দপুরে ও সুতালুটীতে বাস আরম্ভ করেন। প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাসের সহিত এই শেঠ ও বসাকগণের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। এই বংশের পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবচরণ শেঠ মহাশয় অতি ধার্ম্মিক ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। বৈষ্ণবচরণ শেঠ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে

লিপ্ত থাকিয়া, প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দানধ্যান প্রভৃতি কার্য্যে ইঁহারা সবিশেষ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় বাসকালে তাঁহাদের জ্ঞাতি গোত্র অনেক বাড়িয়া উঠে, এইজন্য তাঁহারা কলিকাতার নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। এই শেঠগণের মধ্যে হরিনারায়ণ শেঠ কোম্পানীর প্রথম আমলে বিশেষ ক্ষমতা সঞ্চয় করেন। বর্ত্তমান মেটকাফ-হল যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থান অধিকার করিয়া হরিনারায়ণের বাসভবন ছিল। এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। শোভারাম বসাক পলাশীর যুদ্ধের সময় ও পরে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার নামের কয়েকটী পথ ও গলি আজিও তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে।

রামদুলাল দেবের বংশ।

রামদুলাল দেব ওরফে দুলাল সরকার অতি সামান্য অবস্থা হইতে যশঃ এবং সমৃদ্ধির শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতা বলরাম দেব, দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি নামক গ্রামে বাস করিতেন এবং শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। বর্গীর-হাঙ্গামায় (১৭৫১-৫২ খৃঃ অব্দে) বলরাম পৈতৃক বাসভবন পরিত্যাগ করেন। রামদুলালের জন্মের অল্পকাল পরেই, তাঁহার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হয় এবং তিনি মাতামহের আশ্রয়ে পালিত হন। তাঁহার মাতা প্রতিবেশীদের সাহায্যে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন এবং তাঁহার মাতামহী বহু কষ্টভোগের পর হাটখোলায় ধনবান ব্যবসায়ী মদনমোহন দত্তের বাটীতে পাচিকাবৃত্তি গ্রহণ করেন। রামদুলালও এই মদনমোহন দত্তের বাটীতে থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই স্থানে তিনি বাঙ্গালা ও তখনকার কালের উপযোগী সামান্য মাত্র ইংরাজী শিক্ষা করেন। অতঃপর মদনমোহন বাবু তাঁহাকে প্রথমে ৫৲ টাকা বেতনে বিল-সরকার ও তৎপরে ১০৲ বেতনে জাহাজ-সরকার করিয়া দেন। দুর্ভাগ্য বিতাড়িত এই রামদুলাল এক সময় এক মহত্ত্বময় কার্য্য দ্বারা স্বীয় ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া লয়েন। এক দিন তিনি নিলামওয়ালা টুল্লো কোম্পানীর অফিসে, তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে স্বেচ্ছায় ১৪০০০৲ টাকায় একখানি জলমগ্ন জাহাজ কিনিয়া লন। তিনি টাকা জমা দিয়া চলিয়া আসিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় সেই জাহাজ ক্রয়েচ্ছু একজন সওদাগর সাহেব আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং কিছু কম এক লক্ষ টাকা মূল্যস্বরূপ দিয়া সেই জাহাজ ক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন।

রামদুলাল এই সমস্ত টাকা প্রভুকে ফিরাইয়া দিতে চাহিলে, প্রভু মদনমোহন বাবু, তাঁহার সততা দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমস্ত টাকা দান করেন। এই টাকাই রামদুলালের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের ভিত্তি। অতঃপর রামদুলাল আমেরিকার সওদাগরগণের এজেণ্ট এবং কলিকাতার অনেক সওদাগরের বেনিয়ান হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন।

রামদুলাল অশেষ সদ্‌গুণ সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও দানশীলতা অসাধারণ ছিল। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময়, টাউনহলের মিটিংএ তিনি সর্ব্ব-সমেত নগদ এক লক্ষ টাকা দান করেন। হিন্দু-কলেজ নির্ম্মাণকালে, তিনি ৩০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। কাশীতে ত্রয়োদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেও তাঁহার ২২২০০০৲টাকা ব্যয় হয়। ৭৩ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণ ৫লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন।

রামদুলালের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয়া পাঁচটী কন্যা এবং আশুতোষ ও প্রমথনাথ নামক দুইটী পুত্রের জননী। আশুতোষ ও প্রমথনাথ (সাতু বাবু ও ল্যাটু বাবু) সর্ব্ববিষয়ে পিতার নাম রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা নানা সৌখীন কার্য্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করাতে, কলিকাতা-অঞ্চলে "বাবু" নামে অভিহিত হইয়া-ছিলেন। তখনকার বাবুর অর্থ বর্ত্তমান কালের বাবুর অর্থ হইতে বিভিন্ন ছিল। তাঁহাদের মত বাবু—তখন খুব অল্পই ছিল। সাতুবাবুর পুত্র গিরীশচন্দ্র পিতার জীবদ্দশাতেই দুইটী কন্যা রাখিয়া পরলোকে যান। সাতুবাবুর দুইটী কন্যা ছিল। একজন—চারুচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রের জননী ও অন্যটি রাম-বাগানের উমেশচন্দ্র দত্তের পত্নী। প্রমথবাবুর দুইটি বিধবা পত্নীর প্রত্যেকেই এক একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের নাম—মন্মথনাথ ও অনাথনাথ।

রামদুলাল দের বিশাল সম্পত্তি, তাঁহার বংশধরগণের অপরিমিত খরচাদির জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা কতক কমিয়া গিয়াছে। কথিত আছে, প্রাতঃ-স্মরণীয় রামদুলাল দে মহাশয় ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। রাম-দুলাল যেমন অতি নিঃস্ব অবস্থা হইতে স্বাবলম্বন ও ভাগ্যবলে, কোটীপতি হইয়াছিলেন, তেমনি নানাবিধ সৎকার্য্যে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠায় পূজা পার্ব্বণে ও অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যে অসংখ্য অর্থব্যয় করিয়া, নিজের নাম চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে বাবু অনাথনাথ দেব, এই দেববংশের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি একজন দানশীল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ হিন্দু—ও কায়স্থ কুলের রত্নস্বরূপ।

দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বংশ।

(জোড়াসাঁকো)

শান্তিরাম সিংহ, কোম্পানীর আমলে কালেক্টার মিঃ মিড্‌লটন ও সার টমাস্ রমবোল্ড সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পাটনা ও মুর্শিদাবাদ জিলা সম্বন্ধীয় কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন।

দেওয়ান শান্তিরাম, জাতিতে কায়স্থ। তিনি স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু ছিলেন। নানাবিধ পুণ্যকার্য্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। তিনি বারাণসীতে একটী বৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দুই পুত্র—প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ও জয়কৃষ্ণ সিংহ। জ্যেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ, কোম্পানীর সাধারণ ধনাগারের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র--রাজকৃষ্ণ সিংহ, নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণের এক পুত্র—নন্দলাল সিংহ। রাজকৃষ্ণ সিংহের পুত্র মহেশচন্দ্র সিংহ। মহেশচন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র এবং হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বলাইচন্দ্র। প্রাণকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র নবকৃষ্ণের সন্তানাদি ছিল না এবং তৃতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন।

নন্দলাল সিংহের পুত্র—সুবিখ্যাত মহাভারত-কার কালীপ্রসন্ন সিংহ। কালীপ্রসন্ন—সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রসিদ্ধ পুস্তক "হুতোম-পেঁচার-নক্সা" রচয়িতা এবং মহাভারতের অনুবাদ তাঁহার অমূল্য অক্ষয়কীর্ত্তি। মহাভারত প্রকাশকালে, তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল এবং ইহারই ফলে উড়িষ্যার বহু মূল্যবান জমিদারী ও কলিকাতার বেঙ্গল-ক্লাব প্রভৃতি বহু মূল্যবান সম্পত্তি তাঁহার হস্ত বহির্ভূত হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, তিনি যে নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন, ইহা তাঁহার সমসাময়িক সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

কালীপ্রসন্ন, বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা সার রাধাকান্ত দেব যেমন শব্দকল্পদ্রুমের প্রচার দ্বারা সাধারণে যশস্বী হইয়া গিয়াছিলেন—কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, সেইরূপ হিন্দুর কল্পবৃক্ষ অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারতের অনুবাদ করিয়া যশস্বী হয়েন। এইজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম আজও প্রত্যেক বঙ্গবাসীর স্মৃতিপটে জাগরুক। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতনাটক বেণীসংহার ও বিক্রমোর্ব্বশীর প্রথম অভিনয়, তাঁহার

চেষ্টাতেই, তাঁহার নিজ বাটীতে হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধকাব্য এই সময়ে প্রচারিত হয়। কবি মধুসূদনের সম্মানের জন্ত কালীপ্রসন্ন বাবু, নিজের প্রাসাদতুল্য বাটীতে একটী সভা আহ্বান করেন। এই সভায় তিনি মাইকেলকে একটী অভিনন্দন পত্র ও ক্লারেটমদ্যপানোপযোগী এক রৌপ্যময় পাত্র দান করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ, সর্ব্ববিধ দেশহিতকর সাধারণকার্য্যে যোগদান করিতেন। অসংখ্য পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকায়—তাঁহার বিদ্যালোচনার প্রবৃত্তি অতি প্রবল হইয়া উঠে। টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" ও কালীপ্রসন্নের "হুতোম-পেঁচার-নক্সা" প্রভৃতি পুস্তক, সেকালের বঙ্গ সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। সেকালের কলিকাতার বাঙ্গালী-সমাজের দোষ গুণ "হুতোমে" অতি উজ্জলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে এই শ্রেণীর পুস্তক রুচিপ্রদ না হইলেও, অতীত যুগে ইহার যথেষ্ট আদর ছিল। "হক-কথা" বলিয়া আরও একখানি এই শ্রেণীর সমাজ চিত্র, ইহার পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হয়। ইহার প্রণেতা যে কে, তাহার কোন পরিচয় নাই।

সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে, আট বৎসর অতীত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ, এই সুবৃহৎ গ্রন্থ বিনামূল্যে সুধীসমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন। ধরিতে গেলে, জোড়াসাঁকোর সিংহবাটীর সমুজ্জ্বল রত্ন এই কালীপ্রসন্ন সিংহ বা "কালী-সিঙ্গি"। লংসাহেব নীলদর্পণের ভাষান্তর করিয়া যে সময়ে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন, মহানুভব কালীপ্রসন্ন, তাঁহার সেই বিপত্তিকালে জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করিয়া, লংসাহেবকে কারাদণ্ড হইতে মুক্ত করেন। কালীসিংহের উপযুক্ত পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় বর্ত্তমানে পিতার সুনাম রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। হিন্দু-প্রেট্রিয়ট পত্রিকা, এখন তাঁহারই তত্ত্বাবধারণে নূতনভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তিনি অতি বিনয়ী, সদালাপী ও সৎকর্ম্মে উৎসাহশীল।

কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠী।

মানে, সম্ভ্রমে, বিদ্যায় ও যশোগৌরবে কলিকাতার ঠাকুর-গোষ্ঠী, ভারতের সর্ব্বত্র বিখ্যাত। যোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর মহাশয়গণ, একই বংশ সম্ভূত। এই গোষ্ঠীর বিশেষত্ব এই, একাধারে এই বংশে বাণী ও কমলার বরপুত্রগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহাদের সকলের সম্বন্ধে বিশদভাবে

বলিতে গেলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা পুরাকালে যাঁহারা স্বনাম-ধন্য ও প্রথিত-যশা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাই বলিব। কেননা আমাদের স্থান অতি সংক্ষেপ।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে, ভট্টনারায়ণ এই গোষ্ঠীর আদি পুরুষ। ভট্টনারায়ণের পুত্র নান্দু বা নৃসিংহ কুশারীর বংশে, ইহাঁদের উদ্ভব। ইহাঁরা রাঢ়ীশ্রেণী ভুক্ত এবং পিরালী-দোষযুক্ত। কিন্তু তাহা হইলেও, ধনে মানে ও ঐশ্বর্য্যে ইহাঁরা সর্ব্বজনবিদিত।

এই বংশের আদিনিবাস, যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটিয়া পরগণায় ছিল। এতদ্বংশীয় পঞ্চানন ঠাকুর, সর্ব্ব প্রথমে কলিকাতায় আগমন করেন। তখন কলিকাতা বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। সুতালুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গণ্ডগ্রাম, তখন ধীরে ধীরে জনপূর্ণ হইতেছিল।

পঞ্চানন ঠাকুর মহাশয়, কলিকাতায় গোবিন্দপুরে আসিয়া বসবাস করেন। পুরাকালের এই গোবিন্দপুরের স্থানাধিকার করিয়া বর্ত্তমান ফোর্টউইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনে, আমিনের কার্য্য করিতেন। পলাশী-যুদ্ধের পর, যে সময়ে গড়ের মাঠের বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মিত হইবার বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া যায়, সেই সময়ে গোবিন্দপুরের অনেকের বাড়ীঘর সেই স্থানে ভাঙ্গা পড়ে। ইহাঁদের অনেকে গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া সুতালুটী অঞ্চলে চলিয়া যান। জয়রামও এই ঘটনায় বাসচ্যুত হইয়া, পাথুরিয়াঘাটায় আসিয়া বসবাস করেন। কোম্পানী সে সময়ে ২৪ পরগণার জমীদারী প্রাপ্ত হন, কর্ম্মকুশল জয়রাম, সেই সময়ে এই সুবৃহৎ জেলার বিলি-বন্দোবস্ত কার্য্যে, কোম্পানীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে জয়রামের মৃত্যু হয়।

জয়রামের চারি পুত্র। আনন্দীরাম, দর্পনারায়ণ, নীলমণি ও গোবিন্দরাম। প্রথম ও চতুর্থের বংশ নাই। দ্বিতীয় দর্পনারায়ণ ও নীলমণির বংশধরেরাই এখন কলিকাতা সমাজ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। দর্পনারায়ণের বংশধরেরা সিনিয়ার-ব্রাঞ্চ ও নীলমণির বংশধরেরা ঠাকুর গোষ্ঠীর জুনিয়ার-ব্রাঞ্চ বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

পঞ্চানন ও তৎপুত্র যে সময়ে গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন, সেই সময়ে গোবিন্দপুরে ব্রাহ্মণ সংখ্যা বড় কম ছিল। এই জন্য অন্য জাতীয় অধিবাসীরা, তাঁহাদের "ঠাকুর" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পরে ইহা

উপাধিরূপে দাঁড়াইয়াছে। এখন এই ঠাকুর শব্দটী ইংরাজীর স্রোতমুখে Tagore এ পরিণত হইয়াছে।

দর্পনারায়ণ সেকালের যুগে, একজন কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা খুব ভালরূপ জানিতেন। তিনি তদানীন্তন ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের অধীনে দেওয়ানী চাকরী ও স্বাধীন ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হন। এই সময়ে নাটোরের জমীদারী সমূহ বিক্রীত হইতে আরম্ভ হওয়ায়, দর্পনারায়ণ রঙ্গপুরে এক জমীদারী ক্রয় করেন।

দর্পনারায়ণ দুই সংসার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন, পিয়ারীমোহন বলিয়া পাঁচপুত্র হয়। কোন কারণে বাধ্য হইয়া, রাধামোহন ও কৃষ্ণমোহনকে তিনি বিষয় হইতে বঞ্চিত করেন। পঞ্চম পুত্র পিয়ারীমোহন বাকৃশক্তি হীন ছিলেন। অন্যান্য দান ব্যতীত বিশহাজার টাকা তিনি দেব-সেবার জন্য বন্দোবস্ত করেন। সম্পত্তির বাকী অংশ তিনি সকল পুত্রকেই সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া যান।

দর্পনারায়ণের দ্বিতীয়পুত্র গোপীমোহন, পুত্র সৌভাগ্যে বড়ই যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর হরকুমার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর বঙ্গদেশের উজ্জ্বলরত্ন। এই হরকুমারের পুত্রই স্বনামখ্যাত মহারাজা স্যর যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর বাহাদুর ও রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। প্রসন্ন-কুমারের জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলিয়া এক পুত্র জন্মে।

গোপীমোহন ঠাকুর, মহা সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন। সে কালের অনেক পদস্থ ইংরাজ, এমন কি গবর্ণর-জেনারেলগণও এই উৎসব ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটন, এক বার এই পূজাক্ষেত্রে আহূত হইয়া নৃত্যগীতাদি উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে টানা-পাখার দড়ী ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, পাখাখানি মহাবেগে নীচে পড়িয়া যায়। সৌভাগ্য ক্রমে, জেনারেল-সাহেব এই দৈব বিপদজনিত আঘাত হইতে বড়ই বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

গোপীমোহন সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাবিস্তার কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও ঘটক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে নিয়মিতরূপে প্রতিপালিত হইতেন। সঙ্গীতালোচনায় তাঁহার একটা স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ ছিল। পশ্চিম প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, বারাণসী, আগরা, দিল্লী প্রভৃতি

স্থানের প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদকগণ তাঁহার সঙ্গীত-সভায় আসিতেন। ইহাঁরা কালোয়াতী দেখাইয়া গোপীমোহনের নিকট প্রচুর পুরস্কার লাভ করিতেন, অথবা বেতনভোগীরূপে তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন।

রাধাগোয়ালা, সেকালের একজন প্রসিদ্ধ লাঠিবাজ ও কুস্তিগীর। এই রাধাগোয়ালা, গোপীমোহনের বেতনভোগী ভৃত্য ছিল। প্রাচীন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারেটো কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী—ব্যারেটো সাহেবের সহিত, গোপীমোহনের খুব বন্ধুত্ব ছিল। ব্যারেটোও তাঁহার বন্ধু গোপী-মোহন ঠাকুরের ন্যায় পালোয়ান পুষিয়া, তাহাদের লড়াই দেখিতে ভাল বাসিতেন। তিনি প্রায়ই গোপীমোহনের সুঁড়ার বাগানে উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার ও গোপীমোহনের অধীনস্থ পালোয়ানদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখি-তেন। এই পালোয়ানদের মধ্যে রাধাগোয়ালাই শ্রেষ্ঠ ছিল। গোপী-মোহন তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও, রাধাগোয়ালা তাঁহার বংশধরগণের নিকট নিয়মিত বৃত্তি পাইয়াছিল।

লখেকাণা বা লক্ষ্মীকান্ত, সে সময়ে বিদ্রুপপূর্ণ কবিতারচনার জন্য বড়ই প্রসিদ্ধ ছিলেন। কালীমির্জ্জা, সেকালের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। এই দুই জনই গোপীমোহনের সভা অলঙ্কৃত করেন।

নানাবিধ সৎকার্য্যে গোপীমোহনের দান ছিল। কন্যাদায়, মাতৃদায়, পিতৃদায়গ্রস্তগণকে সাহায্য করা, অধ্যাপকগণকে বৃত্তিদান করা, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে উৎসাহ দান করায়, তিনি কখনও কৃপণতা করেন নাই। একবার তিনি রাজসাহী জেলায় এক জমীদারী ক্রয় করেন। তাঁহার দেওয়ান গোন্দলপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় রামমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এই জমীদারী খানি তিনি অতি অল্প মূল্যে কিনিতে সক্ষম হন। কিন্তু পরিশেষে রামমোহনের প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ, এই নবক্রীত জমীদারী তিনি তাঁহাকেই দান করেন। এখনও রামমোহনের বংশধরেরা এই জমীদারীর স্বত্বভোগ করিয়া আসিতেছেন।

গোপীমোহন, নবস্থাপিত হিন্দুকালেজের Hereditary Governor পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই হিন্দুকলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের উপকারার্থে তিনি অনেক বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া যান।* অনেক দরিদ্র অর্থহীন ছাত্র, তাঁহার ব্যয়ে প্রতিপালিত হইত।

শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত গোপীমোহনের যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। উভয় বন্ধুতে পাগড়ী বিনিময় করিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন।

কিন্তু ভবিষ্যতকালে কোন সরিকানী মোকদ্দমায় তিনি রাজা গোপীমোহন দেবের (স্যর রাজা রাধাকান্তের পিতা) সহায়তা করায়, রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত তাঁহার এই বন্ধুত্ব-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়।

গোপীমোহন ঠাকুর, সংস্কৃত, ফ্রেঞ্চ, পর্টুগীজ, ইংরাজী, পারসী, উর্দ্দু প্রভৃতি নানা ভাষা জানিতেন। মূলাজোড়ের কালীবাড়ী তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। সূর্য্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার নামধেয় গোপীমোহনের ছয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম চারি জনের কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই।

হরকুমার ও প্রসন্নকুমার স্বনামধন্য মহাপুরুষ। হরকুমারের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মহারাজা বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কনিষ্ঠ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইঁহারা অতীতযুগের বঙ্গ-সমাজের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। হরকুমার সংস্কৃত ভাষায় অতীব দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতচর্চ্চা, পূজাপাঠ ও দেবারাধনাতেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতীত হইত। দক্ষিণার্চ্চ-পারিজাত, হরতত্ত্ব-দীধিতি, পুরশ্চরণ-পদ্ধতি, শিলাচক্রার্থবোধিনী প্রভৃতি সংস্কৃত-গ্রন্থ তাঁহারই বিরচিত। এরূপ মহা সাত্বিক, স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্, মহাপণ্ডিত ধনীসন্তান, বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়।

মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেকালের বাঙ্গালী-সমাজের একজন নেতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ-পণ্ডিত, সেকালে খুব কমই ছিল। প্রসন্নকুমার সম্বন্ধে, আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক কথাই বলিয়াছি। ঠাকুর-আইন সম্বন্ধে বৃত্তি এই প্রসন্নকুমারের গৌরবময় দানকীর্ত্তি।

হরকুমারের প্রথম পুত্র মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ১৮৩১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, হিন্দু-কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া বাড়ীতে সাহেব শিক্ষকদের নিকট ইংরাজী ও পণ্ডিতগণের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ২১ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে, খুল্লতাত প্রসন্নকুমারের শিক্ষাধীনে ইনি জমিদারী সম্বন্ধীয় বিষয়কার্য্যাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ইনি ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সভার সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড মেয়োর আমলে—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর "রাজা-বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে সময়ে ভারত-সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন, সেই সময়ে লর্ড লিটন রাজা যতীন্দ্রমোহনকে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করেন।

তৎপরে ইনি, কে, সি, এস, আই ও পুরুষানুক্রমে "মহারাজা-বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়া, ঠাকুরবংশের মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, আদর্শ ধনীসন্তান ছিলেন। এরূপ সামাজিক, সহৃদয়, সৎকর্ম্মে উৎসাহশীল, বিদ্যোৎসাহী জমীদার বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। রাজদ্বারে তাঁহার মত সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁহার সময়ে খুব কমই ছিল। বঙ্গীয় বিধবাদের দুঃখ দূরীকরণার্থে, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কাশীর দেবালয়ে, মূলাজোড়ের মন্দিরে, নিত্য সদাব্রতের অনুষ্ঠান হয়। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন আজীবন হিন্দু-ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহার পাথুরিয়াঘাটার রাজবাটীতে, আজও মহা সমারোহে শারদীয়া-পূজা হইয়া থাকে। স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর, বঙ্গ-সাহিত্যের একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি নিজে অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক, বাঁঙ্গলা কবিতা-পুস্তক, নাটক ও প্রহসনাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান নাট্যশালার প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা ইঁহারই যৌবন সময়ে হয়। অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি আজীবন সাহিত্য, সঙ্গীত ও নানাবিধ সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। কলিকাতার জমীদার-সভার সভাপতিরূপে, ইনি দক্ষতার সহিত বহুদিন কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। মহারাজের পারিবারিক সুবৃহৎ পুস্তকাগারটী, তাঁহার জ্ঞানালোচনার কীর্ত্তিরূপে আজও বর্ত্তমান। বড়-লাট, ছোট-লাট হইতে অনেক গণ্যমান্য রাজা মহারাজাগণ, যতীন্দ্রমোহনের প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের কবিকুলতিলক মাইকেল মধুসূদন, মহারাজের নিকট হইতে সর্ব্ববিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের মুদ্রাঙ্কণব্যয়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনই প্রদান করেন।

মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর, বর্ত্তমানে স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের উত্তরাধিকারীরূপে বিরাজ করিতেছেন। বয়সে নবীন হইলেও, ইনি পিতার বিবিধ সদ্‌গুণ সমূহের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ইঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মত, ইনিও রাজদ্বারে যথেষ্ট সম্মানলাভ করিয়াছেন। পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে, মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার বাহাদুর, কলিকাতাবাসিগণের প্রতিনিধিরূপে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া, ইংলণ্ডে গমন করেন ও তথায় যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। ইটালিতে ভ্রমণ কালে ইনি ইউরোপের মহা সম্মানিত পোপের

নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিলেন। প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ যখন কলিকাতা পরিদর্শনে আগমন করেন, সেই সময়ে মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার, তাঁহার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা ত্যাগ সময়ে, সম্রাট্‌পুত্র ইঁহাকে "স্যর" বা "নাইট" উপাধি-মণ্ডিত করিয়া যান। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েসনের সম্পাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, ইনি দেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছেন। ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়েল-হল, ও ইণ্ডিয়ান-মিউজিয়ামের ইনি একজন ট্রষ্টী। সর্ব্ববিধ সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ও এতৎসম্বন্ধীয় সভা-সমিতিতে মহারাজ স্যর প্রদ্যোৎকুমার বাহাদুরের গভীর সহানুভূতি দেখা যায়। ১৮০৮ হইতে ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ইনি কলিকাতার সেরিফের পদে কার্য্য করেন। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশলাভ করেন। আমাদের গৌরবান্বিত, রাজরাজেশ্বর, ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের কলিকাতায় শুভাগমন সময়ে, মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার, অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই শুভাগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ, ভারতসম্রাট্, মহারাজ বাহাদুরকে নিজের নামাঙ্কিত স্বর্ণমণ্ডিত একগাছি বহুমূল্য ছড়ি উপহার দেন।

রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, হরকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র ও স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের সহোদর। ইনি "ছোটরাজা" বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার দেহান্ত ঘটে। হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রে ইঁহার আজীবন অনুরাগ ছিল। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন, আজীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়া নানাবিধ পুস্তকাদি প্রণয়নে, হিন্দু-সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাধান্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার এই সাধু উদ্দেশ্যের পুরস্কার স্বরূপ, ইনি সভ্যজগতের রাজন্যবর্গের ও অনেক বৈজ্ঞানিক-সমিতির নিকট উপাধি-সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে, ইনি আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া ও ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী হইতে "ডক্টর-অব-মিউজিক" নামক গৌরব-জনক উপাধি লাভ করেন। এ পর্য্যন্ত কোন ভারতবাসীই এ উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি ইউরোপের অনেক স্বাধীন রাজন্যবর্গের নিকট, এই সঙ্গীতবিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য, সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যন্ত্রক্ষেত্র-দীপিকা, ছয় রাগের জীবন্ত-মূর্ত্তি, রত্নাবিষ্কার-বৃন্দক প্রভৃতি ৫০ খানি সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, ইঁহার গৌরবময় কীর্ত্তি।

জয়রামের দ্বিতীয় পুত্র দর্পনারায়ণের বংশের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার তৃতীয় পুত্র নীলমণি ঠাকুরের কথাই বলিব। ভ্রাতৃবিবাদ, বঙ্গসংসারে চিরদিনই আছে,—সেকালেও ছিল। এই ভ্রাতৃ-বিবাদে নীলমণি ঠাকুর পৈত্রিক আবাস স্থান ত্যাগ করিয়া যোড়াসাঁকোতে বাস করেন। সেকালের কলিকাতার সুবিখ্যাত বৈষ্ণবচরণ শেঠ, নীলমণি ঠাকুরকে বসবাসের জন্য যে জমীবিক্রয় করেন, তাহার কতকাংশের উপরই এই আবাস বাটী নির্ম্মিত হয়।

নীলমণি ঠাকুর কোম্পানীর অধীনে সেরেস্তাদারী কর্ম্মে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেন। নীলমণি ঠাকুরের পাঁচ পুত্র হয়। তাহাদের মধ্যে প্রথম ও পঞ্চম নিঃসন্তান। তৃতীয় রামমণির তিন পুত্র। তাঁহাদের নাম রাধানাথ, দ্বারকানাথ ও রমানাথ।

মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, প্রথমে ইউনিয়ান-ব্যাঙ্কের দেওয়ানরূপে কার্য্য করেন। রাজা রামমোহন রায়ের ইনিও একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-সভা স্থাপনের ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী এবং দশ বৎসর কাল তাহার সভাপতিত্ব করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহায়তায়, ইনি বহুদিন ধরিয়া "ইণ্ডিয়ান-রিফরমার" পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে নিযুক্ত হন। রমানাথ ঠাকুর নিজে একজন জমীদার হইলেও প্রজার সত্ত্ব সংরক্ষণে, তিনি প্রভূত যশঃ সঞ্চয় করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে রমানাথ ঠাকুর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে "মহারাজা" উপাধি লাভ করেন। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক অনেক রাজনৈতিক ব্যাপারে, রমানাথ ঠাকুরের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে মহারাজা রমানাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেন।

১৭৯৪ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে, দ্বারকানাথের জন্ম হয়। দ্বারকানাথ পারসী-ভাষায় বেশ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেকালের সুবিখ্যাত সেরবোরন সাহেবের বিদ্যালয়ে, তাঁহার প্রথম শিক্ষা সমাপ্ত হয়। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ, রাধানাথ বিদেশে চাকরী করিতেন। দ্বারকা-নাথ বিষয় কর্ম্ম খুব ভালরূপই বুঝিতেন, কাজেই পৈত্রিক জমীদারীর ভার তাঁহার উপরই পড়ে।

দ্বারকানাথের প্রতিভা সর্ব্ববিষয়িণী। তিনি আইন পাশ করিয়া, প্রথমতঃ মোক্তারের কার্য্য আরম্ভ করেন। স্বাভাবিক প্রতিভাবলে, তিনি বাণিজ্য

ব্যবসায় ব্যাপারেও বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় নিমকী-বিভাগের চাকরী খুব গৌরবজনক রাজকর্ম্ম ছিল। দ্বারকানাথ দক্ষতা ও প্রতিভাবলে নিমকী-বিভাগের সামান্য সেরেস্তাদারি পদ হইতে দেওয়ানীপদ লাভ করেন। এমন কি, তিনি কষ্টম ও অহিফেন-বিভাগের দেওয়ানী-পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু চাকুরীতে দ্বারকানাথের ততটা স্পৃহা ছিল না। তিনি স্বাধীনভাবে বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইবার মনস্থ করিয়া, কার ও প্রিন্সেপস্ নামক দুইজন ইংরাজের সহিত, একযোগে "কার-ঠাকুর" নামধেয় এক বাণিজ্যাগারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বাঙ্গালীর প্রথম স্বাধীন চেষ্টা-সম্ভুত বাণিজ্য-কুঠী। ইতিপূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালীই এরূপ বিস্তৃতভাবে ব্যবসায় করেন নাই। দ্বারকানাথের এই কার্য্যে প্রীত হইয়া, তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে এ সম্বন্ধে এক উৎসাহসূচক পত্র লিখিয়া ব্যক্তিগতভাবে সম্মানিত করেন। ইহার পর দ্বারকানাথ আরও কয়েকজন অবস্থাপন্ন ইংরাজের সহিত মিশিয়া, "ইউনিয়ান-ব্যাঙ্ক" স্থাপন করেন। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক বেশী দিন চলে নাই।

কার-—ঠাকুর কোম্পানির লিপ্ত থাকিয়া, দ্বারকানাথ প্রচুর অর্থ লাভ করেন। এই কুঠীর আয়ে, দ্বারকানাথ রাজসাহী, পাটনা, রঙ্গপুর, যশোহর প্রভৃতি জেলায় অনে জমীদারী ক্রয় করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রব রাজা রামমোহন রায়ের সহিত দ্বারকানাথের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। দ্বারকানাথ দেশের ও দশের হিতার্থে, অনেক ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-কলেজ, মেডিকেল-কলেজ প্রভৃতির স্থাপনের সময় তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। সতীদাহ নিবারণ ব্যাপারের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়, উচ্চপদস্থ ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে সামাজিক মিশ্রণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কয়েকবার তাঁহার বাটীতে গিয়া আমোদ প্রমোদে যোগদান করিয়াছিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড দ্বারকানাথকে বঙ্গদেশীয়গণের মুখপাত্র স্বরূপ বিবেচনা করিতেন এবং অনেক সময়ে এতদ্দেশীয় ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে সদুপদেশ দিবার জন্য, তিনি লাট-সাহেব কর্তৃক আহূত হইতেন।

১৮৩২ খৃঃ অব্দে দ্বারকানাথ বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালীই—ইংলণ্ডে যান নাই। তখন কালাপানিতে গেলে

লোকের জাতি যাইত। কিন্তু স্বাধীনচেতা দ্বারকানাথ, সমাজ শাসনের ভয়ে, এ কার্য্যে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই।

দ্বারকানাথের এই সংসাহস দেখিয়া, সেকালের ইংরাজেরা টাউনহলে এক প্রকাণ্ড সভা করিয়া, তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র দেন। বিলাতে গিয়া, তিনি তদ্দেশবাসিগণের বিশেষ সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর ডাইরেক্টারেরা, তাঁহার সম্মানের জন্য একটী প্রীতি-ভোজ প্রদান করেন। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়াও, দ্বারকানাথকে তাঁহার রাজ-প্রাসাদে একদিন ভোজের আয়োজন করিয়া নিমন্ত্রণ করেন। মহারাণী তখন বাকিংহাম-প্রাসাদে থাকিতেন। সুতরাং এই প্রাসাদেই ভোজের আয়োজন হয়। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালিই এরূপভাবে রাজসম্মান লাভ করেন নাই। বড়মানুষীর জন্য দ্বারকানাথ বিলাতে "প্রিন্স-দ্বারকানাথ" বলিয়া সর্ব্বসাধারণে পরিচিত হন। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে সেই ভোজের দিনে মুদ্রিত, কয়েকটী নূতন বিলাতী স্বর্ণ-মুদ্রা উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে, তিনি দ্বারকানাথকে তাঁহার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট ও তাঁহার নিজের একখানি ছবি উপহাররূপে প্রদান করেন। সেই ছবি এখনও কলিকাতা টাউনহলে আছে।

দ্বারকানাথ, কেবল যে ভারতেশ্বরী ভিক্‌টোরিয়ার নিকট সমাদৃত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। রোমনগরীতে ভ্রমণ ব্যপদেশে উপস্থিত হইলে, তিনি রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সর্ব্বজনীন ধর্ম্মগুরু, পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বলা বাহুল্য, পোপ মহাসমাদরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের অধিপতি লুই ফিলিপের দরবারেও, বাঙ্গালী দ্বারকানাথ মহা সমাদরে পরিগৃহীত হন।

দ্বারকানাথ ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে, ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণ ও ম্লেচ্ছদেশে বাস হেতু প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন, কিন্তু তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। দ্বারকানাথের ব্যয়েই সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী (পরে গুডিভ্‌ চক্রবর্ত্তী) পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা-শিক্ষার্থে সর্ব্বপ্রথমে বিলাতে গমন করেন।

ইহার পর দ্বারকানাথ ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে, দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। এবার তিনি, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ইংরাজ-সেক্রেটারিকে সঙ্গে লইয়া বিলাতে যান। পথিমধ্যে কায়রো-নগরীতে তিনি মহম্মদ আলি পাশার দরবারে সম্মানিত

হন। তৎপরে ইটালি দেশে গমন করেন। এখানকার রাজ-দরবারেও তিনি যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন লাভ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের অধিপতির গৃহেও তিনি এইবারে পনর দিন, সম্মানিত বিদেশীয় অতিথিরূপে পূজিত হইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে, জুনমাসে বিলাতে তিনি সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া পড়েন।৮' এই পীড়াতেই তাঁহার দেহান্ত হয়। বিলাতের "কেনস্যাল-গ্রীন" নামক গির্জ্জাক্ষেত্রে দ্বারকানাথের সমাধি হইয়াছিল। তাঁহার সমাধির সময় ভারতেশ্বরী চারিজন অশ্বারোহী সৈনিক পাঠাইয়া দেন। দ্বারকানাথের শবাধারে ইংরাজী ও বাঙ্গলাভাষায়, রূপার পাতে—"বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতার জমীদার-৫২ বৎসর বয়সে—১৮৪৬ খৃঃ অব্দের ১লা আগষ্ট মৃত্যু" এই কয়েকটী কথা লেখা ছিল।

দ্বারকানাথের মৃত্যুসংবাদ এদেশে পৌছিলে, একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। তৎকালীন ছোটলাট স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের নেতৃত্বাধীনে, টাউনহলে এ জন্য এক শোক সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দ্বারকানাথের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে প্রতিভাশালী বাঙ্গালী খুব কমই জন্মিয়াছেন।

দ্বারকানাথের তিন পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সর্ব্বজন-বিদিত ও "মহর্ষি" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়া সর্ব্ব সাধারণে সম্মানিত। ধর্ম্মময় পবিত্র জীবন ও আজীবন ধর্ম্মালোচনার জন্য, বঙ্গসমাজে ইনি "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনব্যাপী চেষ্টায়,—আদি ব্রাহ্মসমাজের শক্তি সুদৃঢ় হয়। সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহার চিরদিনই উৎসাহ ছিল। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ—সর্ব্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি তাঁহার কবিত্ব প্রতিভায় পাশ্চাত্য জগতকে মুগ্ধ করিয়া—সুপ্রসিদ্ধ "নোবেল-প্রাইজ" লাভ করিয়াছেন। ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে Poet Laureate of Asia বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটীও তাঁহাকে গৌরবান্বিত ডাক্তার উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট।

কিরূপ অসমসাহসিকতা, অধ্যবসায় বলে, ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ভারতবর্ষে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন, তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আমরা পূর্ব্বে দিয়া আসিয়াছি। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ইতিহাস-বিখ্যাত "সিপাহী-বিদ্রোহ" ঘটে। কিন্তু ইংরাজ শক্তির অদম্য সাহস ও রণকৌশলে, এই বিদ্রোহ-অনল নির্ব্বাপিত হইয়া পুনরায় সমগ্র ভারতে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ খৃঃঅব্দে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর হস্ত হইতে, ইংলণ্ডের তদানীন্তন সম্রাজ্ঞী, ভারতজননী ভিক্টোরিয়া, স্বহস্তে এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ভিক্টোরিয়ার মত অসীম শক্তিশালিনী, প্রজার মাতৃরূপিনী সম্রাজ্ঞী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেহ জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি ভারতীয়গণকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহার প্রমাণ—রাজ্য গ্রহণের পর রাজঘোষণা। ভারত সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়া ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণাপত্র, ভারতের প্রধান প্রধান সহরে, ইংরাজী ও সকল প্রদেশের স্থানীয় ভাষায় পঠিত হয়। এই ঘোষণাপত্রই, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অমূল্য দান ও ভারতবাসীর চির গৌরবের জিনিস। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, সন্তানবৎ প্রজাপালন, তাহাদের গুণানুসারে উচ্চ রাজপদ প্রদান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রচলিত আইন-কানুনের স্বত্ব উপভোগ, প্রভৃতি নানা ব্যাপার এই ঘোষণা পত্রে উল্লিখিত ছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে—লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম রাজ-প্রতিনিধি বা "ভাইসরয়" পদে নিযুক্ত হন। কোম্পানীর আমলে, ভারতের প্রধান শাসনকর্ত্তা, গবর্ণর-জেনারেল নামে অভিহিত হইতেন। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে সমগ্র ভারতের রাজধানী এই কলিকাতার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই যুগেই বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটীর প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট প্রভৃতির সুব্যবস্থা, প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ও রাজপথ সমূহ দ্বারা নগরীর সৌন্দর্য্য সাধন, প্রভৃতি লোকহিতকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়। আজ কাল আমরা কলিকাতায় যে উন্নতি দেখিতে পাইতেছি, তাহা ভিক্টোরিয়ান-যুগেই হইয়াছিল।

লর্ড ক্যানিংএর পর, লর্ড এলগিন লর্ড লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড নর্থব্রুক,

লর্ড লিটন, লর্ড রিপন, লর্ড ডফারিন, লর্ড ল্যান্সডাউন, লর্ড এলগিন, লর্ড কর্জ্জন, লর্ড মিণ্টো ভারত-সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি বা ভাইস্‌রয়ের কাজ করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানে স্বনামখ্যাত লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় আমাদের রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয়। তাঁহার ন্যায় সমদর্শী, রাজনীতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ, প্রতিভাবান, সহৃদয় ও প্রজার প্রতি সমবেদনাপূর্ণ শাসনকর্ত্তা, খুব কমই এদেশে আসিয়াছেন। ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের হিত সাধনার্থে তিনি যেরূপ আত্মত্যাগ ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা ভারতবাসীকে চিরদিন তাঁহার গুণানুরক্ত করিয়া রাখিবে। সমগ্র বঙ্গদেশকে একজন গবর্ণরের শাসনাধীনে আনিয়া ও বিভক্ত বঙ্গের সম্মিলনসাধন করিয়া, তিনি বঙ্গবাসীকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

লর্ড কর্জ্জন যখন এদেশের রাজপ্রতিনিধি, সেই সময়ে ভারতবাসীকে কাঁদাইয়া, মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া দেবলোকে প্রস্থান করেন। মাতৃপ্রতিম মহারাণীর শোকে সমগ্র ভারত, গভীর শোকাচ্ছন্ন হয়। সেই পবিত্র মৃত্যুর স্মরণার্থে, কলিকাতা গড়ের মাঠে যে বিরাট শোক-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি, আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

মহারাণীর স্বর্গলাভের পর, তাঁহার সর্ব্বগুণান্বিত জ্যেষ্ঠপুত্র, আমাদের গৌরবান্বিত ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বিবিধ সদগুণশালিনী মাতার, সমস্ত মহৎ গুণের তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন. এজন্য ভারতবাসীগণ তাঁহার রাজত্বকালে যথেষ্ট সুখ সম্ভোগ করে। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মত শান্তিপ্রিয়, উদারপ্রাণ সম্রাট এ জগতের কোন দেশের সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেন নাই। ভারতবাসীকে তিনি বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, যে এইরূপ উদারচরিত পিতৃপ্রতিম রাজ্যেশ্বরের স্নেহ হইতে আমরা অকালে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে প্রথম আরোহণ করিবার দিনে; এই প্রার্থনা করেন—"হে দয়াময় বিধাতা! আমায় শক্তি দিন, ক্ষমতা দিন—যেন আমি প্রজার হিতসাধন করিতে পারি।" কিন্তু অধিক দিন তিনি ইংলণ্ডের চিরগৌরবান্বিত রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আবার ভারতে শোকের ক্রন্দন জাগিয়া উঠে।

কিন্তু জগতে চিরদিন শোকের দিন থাকে না। সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে

সেই জন্য আবার আনন্দের দিন আসিল। সর্ব্বজনপ্রিয়, সম্রাট, সপ্তম এড-ওয়ার্ডের স্বর্গলাভের পর, আমাদের বর্ত্তমান গৌরবান্বিত সম্রাট, পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরি সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রজাবৃন্দ তাঁহাদের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী রূপে পাইয়া, মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া ও সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের শোক ভুলিয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিনি একবার ভারত ভ্রমণে আসেন। এই সময়ে ভারতীয় প্রজার রাজ-ভক্তিতে তিনি বড়ই প্রীত হইয়া, তাহাদের সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন।

নব সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের শুভাভিষেক মহোৎসব, ভারতের ইতিহাসে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা। ভারতবাসী যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহাই তাহা-দের অদৃষ্টে সফলস্বপ্নের মত হইয়া দাঁড়াইল। ১৯১১ খৃঃ অব্দে, আমাদের সর্ব্বজন পূজিত সম্রাট জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরী, ভারত রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার জন্য এদেশে আসেন। এ সময়ে দিল্লীতে এক বিরাট দরবারের অনুষ্ঠান হয়। এই দরবারের উৎসব ব্যাপার এখনও সকলেরই স্মৃতিপটে সমুজ্জলভাবে জাগরিত।

সম্রাটের অভিষেক এবং দিল্লী-দরবারের সময়, সমগ্র ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এই সময়ে রাজরাজেশ্বর সম্রাটের আদেশে, ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব্বজনপ্রিয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ, অতীতকালের গৌরবান্বিত দিল্লীনগরীকে সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে ঘোষণা করেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমল হইতে কলিকাতা এতাবৎকাল সমগ্র ভারতের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল, কিন্তু গৌরবান্বিত ভারত-সম্রাটের ঘোষণানুসারে, ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী এই সময়ে দিল্লীতে উঠিয়া যায় এবং কলিকাতা বঙ্গ-সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ইহাই কলিকাতার ইতিহাসের একটী প্রধান স্মরণীয় ঘটনা।

এই রাজধানী পরিবর্ত্তনের ফলে, বঙ্গদেশ একজন প্রাদেশিক লাট সাহেবের বা গবর্ণরের শাসনাধীনে আইসে। বঙ্গবাসীর ভাগ্যফলেও এই পরিবর্ত্তনবশে, লর্ড কর্জ্জনের আমলের দুইভাগে বিভক্ত বঙ্গদেশ এক হইয়া যায়। এই যুক্তবঙ্গের একাধিপত্য ও শাসনভার, লর্ড কারমাইকেলের হস্তে অর্পিত হয়। লর্ড কারমাইকেলের মত একজন উদারচেতা, সহানুভূতিপূর্ণ

শাসনকর্ত্তাকে বঙ্গ-সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা রূপে পাইয়া, সমগ্র বঙ্গদেশ আজ গৌরবান্বিত ও বঙ্গবাসীগণ ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় আনন্দে উৎফুল্লচিত্ত। অবশ্য এই উদার দানের জন্য, আমরা সর্ব্বজনপ্রিয় বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের নিকট অতি কৃতজ্ঞ।

দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও, কলিকাতার প্রাধান্য পূর্ব্ববৎ অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশের রাজধানীপদে বরিত হইয়া অতীত যুগে—গৌড়, ঢাকা, রাজমহল, মুরশীদাবাদ প্রভৃতি নগরী যে গৌরব উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, বঙ্গদেশের রাজধানীরূপে, কলিকাতা আজ সেই গৌরব লাভে গরীয়সী।

পাঠক! একবার কল্পনাবলে দুইশতাধিক বৎসর পূর্ব্বের বনজঙ্গল সমাচ্ছন্ন কলিকাতার চিত্র কল্পনা করিয়া লউন। বর্ত্তমানকালের গড়ের মাঠের কেল্লা হইতে প্রাসাদময়ী চৌরঙ্গী একদিকে ও অপর দিকে বর্ত্তমানকালের হাটখোলা, বাগবাজার প্রভৃতি জনপূর্ণ পল্লী। এই সীমার মধ্যে বনজঙ্গলসমন্বিত, শ্বাপদসঙ্কুল, বাদাভূমিপূর্ণ, সর্ব্ববিধ রোগের নিবাস, চোর ডাকাতদের উপদ্রবে সর্ব্বদা অশান্তিময়, প্রাচীনকালের সেই কলিকাতা সুতালুটী ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামত্রয় বর্ত্তমান ছিল। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে যেন বিচিত্র মায়াবলে সেই জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন কলিকাতা, এখন গ্যাসালোকপূর্ণ, প্রস্তরময় প্রশস্ত রাজপথ-মণ্ডিত বিদ্যুতালোকোজ্জল, প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা শ্রেণীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে চৌরঙ্গীর যে জঙ্গলে বাঘ ডাকিত, চোর ডাকাতেরা নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিত, এখন সেখানে সেণ্টপল বা লাট-গির্জ্জা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ও প্রাসাদতুল্য অট্টালিকারাজি বিদ্যমান। স্থান পরিবর্ত্তনে সেই জঙ্গল ও বাদাভূমি পূর্ণ, অস্বাস্থ্যকর কলিকাতা এখন গ্যাসালোক রঞ্জিত বিদ্যুতালোকমণ্ডিত, গগনস্পর্শী সুবৃহৎ প্রাসাদসমূহে পরিপূর্ণ। বঙ্গদেশের রাজধানীর যাহা কিছু স্মরণীয় শোভাসম্পদ ও গৌরবের। কলেবর বৃদ্ধি দেখিয়া, আমরা এই স্থানেই লেখনী সংযত করিলাম।

সকল সৎ কর্ম্মের শেষে স্বস্তি উচ্চারণ করিতে হয়। তাই আমরা প্রাণের আবেগে, ভক্তির উচ্ছ্বাসে—এই সুবিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা চির গৌরবান্বিত ও চিরযশোপ্রভামণ্ডিত, ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরার জয়োচ্চারণ করিয়া পুস্তকখানি পরিসমাপ্ত করিলাম।

ভগবানের কৃপায় আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী দীর্ঘায়ু, চিরসুখী ও চির জয়যুক্ত হউন।